

• মোচাকের নিয়মাবলী •

১। মোচাকের বার্ষিক টানা—৫০০ টাকা,
বাগ্মিশক—২০০ নয়া পয়সা এবং প্রতি সংখ্যার
মূল্য—০.৪৫ নয়া পয়সা। বৈশাখ মাস হ'তে বৎসর
আরম্ভ। যে কোনও মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। কোন সংখ্যা না পেলে সেই মাসের
২০ তারিখের মধ্যে আনাতে হ'বে, নচেৎ উক্ত সংখ্যা
পাওয়া যাবে না। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হ'লে
পূর্ব-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আনাতে হ'বে।
চিঠি-পত্র এবং বন্নিভার কুপনে লব্ধ সময়েই গ্রাহক
নব্বের উরেখা বাকী চাই। গ্রাহক নব্বের উরেখা না
বাকলে টানা জমা করা সম্ভব হয় না। নতুন গ্রাহক
হলে 'নতুন' কথাটি দেখা বাকী দরকার।

৩। দেখা পাঠাতে হ'লে সকল সময়েই নকল
রেখে পাঠাতে হ'বে। উপযুক্ত ডাকমাতল না দেওয়া
বাকলে অবনোদিত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয়
না। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না
দেওয়া বাকলে সে দেখা গ্রাহ্য হয় না।

৪। এজেন্সীর অঙ্ক ৫ টাকা অগ্রিম জমা
রাখতে হয় এবং কমপক্ষে ৫ কপি ক'রে পত্রিকা
নিতে হয়।

৫। বিজ্ঞাপনের হার :—সাধারণ ১ পাতা—
১০০ টাকা, ২ পাতা—২০০ টাকা, ৩ পাতা—৩০০
টাকা। কভারের পাতার হার দ্বিগুণ।

শিশু-সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
ছেলেবেলার গল্প	১'০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	
ডালিম গাছে মো	২'০০
রাঙাধানের খই	২'০০
বারোমাসের ছড়া	৩'০০
ইন্দিরা দেবী	
সব সেরা সঞ্চয় (গল্প)	১'২৫
পুষ্প বহুর	
ভুতুড়ে (গল্প)	১'৭৫
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়	
যুধপাতি (উপন্যাস)	১'৭৫
বিমল মিত্র	
ইয়ালিং (উপন্যাস)	১'২৫
লীনা দত্তগুপ্তা	
টাকার গাছ (গল্প)	১'৫০
জাহানারা বেগম চৌধুরী	
স্কুলের মেয়ে (গল্প)	১'২৫
সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	
জলের কথা (বিজ্ঞান)	১'৭৫
বিমল দত্ত	
সিংখুড়োর গল্প	২'০০
শিবরাম চক্রবর্তী	
সম্পাদকের বিপদ (মটিক)	১'৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

মোচাক

৪৩শ বর্ষ, ১৩৬৯

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র

শ্রীমুখীচন্দ্র সরকার সম্পাদিত



এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাটজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		একটি আত্মগুপি কবিতা—বরণ বিবাস	১৮৬
অভিধান দেখা—যোগেশচন্দ্র বাগল	৩৪	একটি শিকার অভিধান	
অভিনব অভিজ্ঞতা—বিমলাশুপ্রকাশ রায়	৫২৪	—পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়	
অন্ন কথার গল্প—অন্নদেব রায়	৫৪৫	একদা সকাল বেলায়—দেড়কড়ি শর্মা	৬
আ		এপ্রিল ফুল—আনন্দকুমার গুপ্ত	৪২
আকেল গুহুম—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৬	এরা ভুল করে—মনীগোপাল চক্রবর্তী	১৭১
আগমনী—গোপাল চৌধুরি	২৬৭	এলো আহ্মান—শিবরায় চক্রবর্তী	৫০৫
আমরা চা খাই কি বিষ খাই		এলো গুই বসন্ত—শিউলি গুপ্ত	৫২২
—হামিনীকান্ত সোম	১১১	এ্যাটম-চালিত জাহাজ—সন্ধানী	৩২
আবিনে—বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	২৮০	ও	
আলোক-বর্ষ কাকে বলে ?	৫৫৪	ও আমার শরৎ মেয়ে	
ই		—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২৭৫
ইলেকট্রিক মাছ	৫৮২	ওয়াটার্নর হৃদ	২০৮
ইনস্পেক্টর—বগেন্দ্ৰনাথ মিত্র	৩১৫	ক	
উ		কবিতা নহ—ঘোড়ার ডিম	
উৎসব-মুখর ইংল্যান্ড—মহুলা ঘোষ	৩৭	—পরিতোষকুমার চন্দ্র	২৮৩
এ		করলায় আগুন—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪
এই মুহূর্তে—প্রভাকর মাকি	৪২৩	কয়েকটি ছড়া—দ্বিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫৮
এই নদ্র কলিকাতা		কাকে-মহুরে—অনিলেন্দু চক্রবর্তী	১৩
—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩২৪	কাবলি বেড়াল—প্রদ্বন্দ্রচন্দ্র বসু	৪৮২, ৫১৬, ৫৬৬
		কালপেচা—অমলেন্দু ভট্টাচার্য	১৮২
		কিইটু মি'য়া—নীরজ বিবাস	১০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কিশোর ক্রাবের কীর্তিকাহিনী		গ্রীষ্ম-বর্ষা—গোপাল ভৌমিক	৩২
—ঐকান্ত মন্ডী	৪৬২	গ্রীষ্মের হৃদয়—যশুহৃদয় চট্টোপাধ্যায়	১১২
কিশোরের পণ—কুমুদবল্লভ মল্লিক	২০৭	ঘ	
কুঁড়ে ও জলদেবতা—তরুণ সান্যাল	৪৭২	ঘড়ির চোঁট ঘাড়ে—শিবরাম চক্রবর্তী	৩৪০
কুক্কোত্র ভ্রমণ—রামপদ মুখোপাধ্যায়	৪৬১	চ	
কেমন হতো—হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪০	চতুর ঘাত্তী—ঈশচন্দ্র চক্রবর্তী	৪৫৬
কেটে মর্দার—স্বত্রত জিপাঠী	২১৮	চিন্তাপাঠের ম্যালিক—এ. সি. শরকার	১২৭
খ		চোরের দলে—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩
খুড়ো—অমিত রায়	৪২২	ছ	
খেলাধুলার খবর—মেহুড়ে ৪০, ৮৪, ১৪৫, ২০০, ২৪২, ৩০৭, ৩৫২, ৪০৫, ৪৫৪, ৫০১, ৫৪৭, ৫৮১		ছড়া—অমিলকুমার বিশ্বাস	১৫৫, ৩১৩
খোকার সাধ—জসীম উদ্দীন	২৮৩	ছড়া—পলাশ মিত্র	৩২১
গ		ছায়া—রবি গুপ্ত	
গল্প—স্বকমল দাশগুপ্ত	৩১২	ছোট-কা—শিউলি গুপ্ত	৩৭৬
গল্প হ'লেও সত্যি—বর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১	জ	
গল্প হ'লেও সত্যি—বীরেন্দ্রলাল ধর	২৬৮	জয়ন্ত জগদ্বান ভাই—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৪৮১
গল্পে গল্পে বিজ্ঞানের উন্মেষ—		জাতকের গল্প—প্রদীপকুমার চক্রবর্তী	৪৩৩
—বিমলাম্বপ্রকাশ রায়	৫৭	জানি আমি আমার হবে জয়—	
গল্প ঘাহু—বঙ্গীপদ চট্টোপাধ্যায়	৫১০	পতিভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০২
গোলাপ-পাপড়ী—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	৩২২, ৩২২, ৪২৫	জাহ্নবী—বন্দনা চট্টোপাধ্যায়	১৮৭
গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা—	৪১, ২০, ১৪৩, ১২৮, ৩৫৩, ৪৫০, ৫০০, ৫৮৩	জালামুখীতে—রামপদ মুখোপাধ্যায়	৩৬৬
গ্রীষ্মকালে—ওয়ালিউর রহমান	৪৬	জালামুখীর পথে—রামপদ মুখোপাধ্যায়	২৩০
		ট	
		টেরিয়ার—বিমল দত্ত	৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ত		নবগয়ের একটি উপকথা—সুত্রত জিপাঠী	৫১৩
তিন পয় ও পৃথিবী—দুর্গাধাস সরকার	২৮১	নদীঘের খেলা—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৫০৭
তিনটি ছবি—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১২০	নীল সেলেটে মানা রং—বিমল দত্ত	৫৫৫
তোতাপাখির পাকামি—শিবরাম চক্রবর্তী	৪৫২	নেড়ার মৃত্যু—রবিদাস সাঁহা রায়	৫৩০
তোমরা—দৌরীকুমোহন মুখোপাধ্যায়	২৭	নোতার দাম গির্জার কুম্বো—সত্যানী	৬৮২
তোমাদের পৃথিবীতে—প্রভাকর মাঝি	৮১		

প

দ		পটলার পণ—আন্ততোষ সান্নাল—	৩০৬
দ্বীচির অস্থিহান—প্রফুল্লচন্দ্র বসু	৪০১	পড়া—যোগেন্দ্রনাথ বাগল	২৬৩
দাড়িঘের দাকলিপি—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১, ১০৫, ১৮০	পণ্ডিতদের লাহনা—জয়দেব রায়	৩৮০
দাড়ির কুল—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৪	পয়লা আবার—শিউলি গুপ্ত	১১৩
দাহুর গল্পবলা—সত্যীকুমার নাগ	৫৭৭	পরহিতব্রতী—স্বনৈলকুমার গুপ্ত	৩২০
দুই বৈদী—ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৩৬	পরীক্ষার আগের রাতে	
দুই ভাই—রনোজ বসু	৬৫২	—স্বপর্ণা মুখোপাধ্যায়	৪২৮
দোলের তোল—		পদ্মবাহু কে ৭—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	
			২৩, ৭২, ১১৮

ছড়া ও ছবি : স্বর্ষ রায়

৫২০

ধ		পাখীদের কূচ-কাণ্ডগাজ—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	৪২১
ধাঁধার পাতা—৪৫, ২৩, ১৪৭, ২০১, ২৫২, ৩১০		পাচটি বালি ইঁস—শিলাদিত্য	২২
৩৫৫, ৪০৩, ৪৪৭, ৫০০, ৫৪৬, ৫২১		পূজার উপহার—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৭১
		পূজার দিনে—প্রভাকর মাঝি	২৭০
		পোল্ট—অসমত মুখোপাধ্যায়	৬০, ১০৭, ১৫৭, ২২৫

ন

নতুন বই—২২, ১৪৮, ২৫৪, ৩১২, ৩৫২, ৪৪৬, ৫৫০		প্রজাপতি—পরিচয় গুপ্ত	৪৪১
নববর্ষ—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে সংগৃহীত	২	প্রাদাস—হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৩০
নবাবী আমল—বিমল রিড	১৭, ৭৫, ১২৫, ১৭৫		
২০২, ৩৪৫, ৩৮২, ৪৪১, ৪২৩, ৫৩৭		ফ	
		ফায় মেথোনি—বীরভদ্র	১৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব		ঘ	
বড়দা বাবেন খড়দা—নির্মলেন্দু গৌতম	৪৭২	মধুচক্র—মধুদি ৪৭, ২৫, ১৪২, ২০৭, ২৫৫, ৪০৭,	
বন্ধুত্ব বন্ধা—সৌগীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২০২	৪৫৫, ৫০০, ৫৫১, ৫২০	
বল্লভী—প্রমোদকর আভাষী	২৮২	মনে রেখো—আশুতোষ সান্নাল	২০৮
বর্ধা—হুশীল রায়	১৫১	মহাযুদ্ধের ইতিহাস—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৬৫
বর্ধা দিনের গল্প—হুশীল রায়	৩০২	মি'ও মি'ও ম্যা'ও—স্বধাংশু গুপ্ত	৪২০
বর্ধা—বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১১৭	মিথ্যে নয়—রাণা বহু	১৫০
বালা-ভাঙা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪১১	ম্যাজিক শেখ—বি. দাস	৩৩৪
বাবুই—এর বাসা—	২৬৮	ম্যাজিকের বেলা—হুনির্মল রায়	৪৮০
বিধানচন্দ্র—'সত্যবান'	১৭৪	য	
বিনিকে নিয়ে বিমানে—শিবরাম চক্রবর্তী	৬৮	য	
বিরেকানন্দ—বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ	১২১	হৃদসাধ—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৫৫০
বিহঙ্গ কথ্য—হুশীল রায় চট্টোপাধ্যায়	৩০৬	র	
বীরসন্ন্যাসী—মুপেন্দ্র ভট্টাচার্য		রাখাল-বন্ধু—বন্দে আলী মিয়া	১৬
বুড়োবুড়ির গল্প—হুশীলকুমার গুপ্ত	২৮২	রাজা—হুশীলকুমার গুপ্ত	৪২৪
বৈদ্য ষাণ্ড—শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৮২	রাত হুপুর—বিকাশ বহু	১১৬
বৈচি সাঙ্ঘ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৫৭	রাত্রির বন্দী—হুশীলকুমার গুপ্ত	৩৭২
বৈশাখী বড়—বিভা সরকার	১	রিপ ত্যান উইকল—সন্দ্বানী	২২১
ব্যাঙ্কের লাক—হুনির্মল ভট্টাচার্য		ল	
ব্রাসেলসে বিধান রায়—বিক্রমাদিত্য	২৪০	ল	
ভ		লগুন কোথায় বাবেন—আবেদ হোসেন	৫৪২
ভয়—পুশ বহু	২৮৭	লাল চৈনিক—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	৪২০
ভয় নাই—প্রমোদকর বহু	২১১	লেট গাড়ির ছড়া—স্বধাংশু গুপ্ত	১৮০
ভয়ংকর—ধনঞ্জয় পাল	৪২৮	লোকে চিম্টি কাটে কেন!—শুভা বোম	৩৮১
ভাৰতেও খারাপ লাগে—শিবরাম ঘোষ	২০৭	লোকোত্তর বিধানচন্দ্র—	
ভূগোলের প্রশ্ন—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৫৭	সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২২৪
ভোরে ওঠো—শচীন মিত্র	১২	লোটা—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৬৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		সিষ্ট—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬৫
শঙ্করামের সংগঠন—বপনবুড়ো	২৭৬	শীল ও গুদালরাদের কথা	
শয়তান চীন—মিনতি মুখোপাধ্যায়	৪৪৫	—প্রবোধবন্ধু সেনগুপ্ত	৪১৩
শরীরের জন্তে জল—ডাক্তার	২৮১	সুবিচার—কগিভূষণ বিশ্বাস	৪৭৪
শান্ত ছেলে—অরুণেন্দু মল্লী	১৬৪	দৈনিক—বিভা সরকার	৪৫৭
শালিক গো—নির্মলেন্দু গৌতম	৩৭৫	সোনার মোড়া দিনগুলি—বিস্মল দত্ত	৩২২
শীতের সকাল—স্বধীরঞ্জন সাহা	৪৩২		
শেখানের চানাকি—মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়	৩৭০	হ	
শ্রীধননাথের মন্দিরের কথা—সত্যগোপাল পান		হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০২
স		হবেই হবে জয়—মধুসেন চট্টোপাধ্যায়	৫১২
সংগীতে বিবেকানন্দ—সনৎকুমার গুপ্ত	৫২৮	ইন্ডিচাঁচার কথা—যজ্ঞীপদ চট্টোপাধ্যায়	২৪৭
সংস্কৃত ব্যাকরণ—অশ্বিনীকুমার গুপ্ত	৫১১	হামলা—গোপাল ভৌমিক	৫২১
সবজ্ঞাতার আসর—সত্যানী	৫৬৫	হারকিউলিসের বারোটি কর্ভার—সত্যানী	২২২
সাত ভাই—কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র	৭২	হিসাবের খেলা—গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৩০৪
সাপ ও বেঁজি	১২৪	হীরেলালের কাহিনী—সৌরীন্দ্রমোহন	
সাবধান—আশুতোষ দাভাল	৪২৭	মুখোপাধ্যায়	৪৮২
সার নেহি দিয়া—ইন্দিরা দেবী	৪৪২	হেমন্ত ও বসন্ত—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	২
	২৮৫	হেমন্তের ভোরে—অরুণ ভট্টাচার্য	৩২৮

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

বৈশাখ--১৩৬৯

7563 [১ম সংখ্যা

.০১২/২০

বৈশাখী-বাড়

শ্রীমতী বিভা সরকার



ঝড় উঠেছে ? বৈশাখী বাড়

ভাই বলে ভয় কি !

আম হুড়ানোর ধুম ভেগেছে

তুই মজা নয় কি ?

সোনা ঘোদের লুকোচুরি

লাগছে নাকি ভালো ?

জুই চামেলী বেলী গুলো

গন্ধ আরও ঢালো !

ঝড় উঠেছে ? বৈশাখী বাড়

তপ্ত প্রাণের দিন

যথা-দিনের একলা মাঠে

রাখাল বাজায় বীণ ।

বৈশাখ যে নিয়ে আসে

কল-পাকানোর ধবর,

প্রজাপতি পাখনা মেলে

গুঞ্জরী ঘায় ভ্রমর ।

নববর্ষ

(বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে সংগৃহীত)

“নীল আকাশে সোনার তুয়ার
আপনি খুলে গেল ;
নূতন খেলা খেলবে বলে
নূতন বছর এল ।

পুরাতনের ভুলের লাজে
বনের ঝরা ফুলের মাঝে,
লুকান ব্যাথা—সুকান সাধ
ফেল গো আজি ফেল ;

নূতন নিয়ে নূতন প্রাণে
নূতন খেলা, খেলা ।”

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

৯ / ১৩১৯

“হে সুন্দর নববর্ষ তোমার সভায়
হাসিছে প্রকৃতি আজি ধরি নব সাজ,
প্রীতি-ভক্তি-প্রেম অর্ঘ্যে পূজিয়া তোমায়
সাধিতে মঙ্গল ব্রত জগতের কাজ ।
যদিও সুবাস তার দিগন্ত ব্যাপিয়া
ছড়িয়ে পড়েনি আজো ; শূললিত তানে,
আজো সে গাহেনি গান চিত্ত বিশোহিয়া,
তথাপি সে মুক্ত হৃদে, স্নেহ ধারা দানে ।
আজিও সে উদ্‌যাপিতে পুণ্যব্রত তার
মাগিছে হে নববর্ষ আশিস তোমার ।”

অমরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রকৃতি—১৩১৬

“আজি আমি নববর্ষে আবার যে ভাই
ভালোবেসে ছুটি কথা শুনাইতে চাই ।
এ কথা রাখিও মনে, বিচিত্র ধরায়
জীবন উন্নতি বিনা ব্যর্থ হয়ে যায় ।”

রমণীমোহন রায়

মুকুল—১৩১৩

“সাজিয়া মুকুলে কুলে
কোকিল কাকিল ভুলে
সোহাগের পুতুলির প্রায়
বর্ষ তুমি এলে পুনরায় !

হইয়া খেলার সাথী

বায়ু করে মাতামাতি
জীর্ণপাতা চৌদিকে ছড়ায়
মেঘের দোলার পরে
ছলিয়া পুলক ভরে
বিজলীর পতাকা উড়ায় ।

প্রয়োজন নাহি মনে

উৎসবের আয়োজনে
মহানন্দ আজিকে ধরায়,

মঙ্গল কলস ঘারে

নহবতে বারে বারে
সমাদরে স্বাগত জানায় ।”

প্রিয়ম্বদা দেবী

মুকুল—১৩১৯

চোরের দলে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক রাত। রাত প্রায় নিশ্চুতি রাতে ছদ্মবেশে অজানতে রাজ্য পরিদর্শনে বেরোন। কখনো মাল্লেম ভিখারী, কখনো ফেরিওয়াল, কখনো বিদেশী, কখনো সাধুসন্ন্যাসী—এই ভাবে বেরিয়ে তিনি রাজ্যের সব খবরাখবর সংগ্রহ করেন। কোথাও দুঃখ অভাব বা অস্তায় দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করেন। তাঁর এভাবে বেকন্মার কথা রাজ্যের কোনো মাহুষ জানে না—না তাঁর রাণী, না তাঁর মন্ত্রী না মন্ত্রী-রক্ষীরা!

সে রাতে রাজা চোর সঙ্গে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখেন, একটা গলির মুখে পাঁচজন লোক বলে কিসের ধন্যনা-কল্লনা করছে। তাইবের ভাবভঙ্গী ভালো মনে হলো না। নিরাসা পথে মাহুষ দেখে তারা বললে—কে তুমি?

রাজা টোক গিলে বললেন—মিথ্যা বলবে না ভাই, আমি চোর চুরি করতে বেরিয়েছি, কিন্তু একা মাহুষ ভাগবাগ তেমন জানি না। তাই নন্দী খুঁজছি।

তারা বললে—আমরা চোর, চিবমিন চুরি করি।

রাজা বললেন—আমাকে নেবে তোমাদের সঙ্গে? তারা বললে—গুণী মাহুষ ছাড়া আমরা যাকে-তাকে সঙ্গে নিই না—তোমার যদি কোনো গুণ থাকে...

রাজা বললেন—তোমাদের কার কি গুণ আছে শুনি?

তারা তখন তাদের গুণের কথা বললে—এক নম্বর চোর বললে—কুতুর, বেড়াল, শেয়াল, পাখীর ডাক শুনে আমি বুঝতে পারি তারা কি বলছে।

দুই নম্বর চোর বললে—আমার হাতের দড়ি ছুঁড়লে সাত-মহলা পুরীর ছায়ে গম্বাল পুঁতে আটকায়—সে দড়ি ধরে আমরা এক-একজন করে পুরীর ছায়ে উঠতে পারি স্বচ্ছন্দে।

তিন নম্বর বললে—দেওয়ালের আর ছাদের গন্ধ শুঁকে আমি বলতে পারি—কোন ঘরে ধনরত্ন আছে—আর কোন ঘরে ধনবস্তু নেই।

চার নম্বর বললে—যে মাহুষকে একবার আমি দেখবো—মিসকালো অমাবস্কার রাতেও যদি সে আমার পাশ দিয়ে চলে যায় তো যিনিব আলোয় ডাকে ততদিন পরেই দেখি—দেখে ঠিক চিনতে পারবো।

পাঁচ নম্বর বললে—আমার এই হাত—এ-হাতের ছোঁয়ার লোহার দরজা, দেওয়ালের

পাখর সরে যায়—আর আমার এই হাত বুলোবামাত্র সে দরজা, সে দেয়াল, যেমন ঠিক তেমনি ছুড়ে যায়। চোরেরা তাদের গুণের কথা বলে রাজাকে ভিজ্ঞান করলো—এখন বলে তোমার কোনো গুণ আছে কিনা।

রাজা বললেন—আমার একটি গুণ আছে—যদি কারো গারদে বন্ধর বা ঈশির হুম্ব হয়, তা'হলে আমি যদি মাথা নেড়ে বলি—না, তা'হলে তার গারদ আর ঈশির হুম্ব বন্ধ হয়।

তখন চোরেরা খুশী হয়ে বললে—বটে, এমন গুণি সঙ্গীই তো আমরা চাই। সব সময়ে তুমি, যদি ধরা পড়ি হয় গারদ না হয় ঈশির হুম্ব হবে বিচারে—দে হুম্ব বন্ধ হয় যদি তা'হলে তো মার-দিস্-কেলা! তোমাকে দলে নেবো—আজ থেকে তুমি হলে আমাদের সঙ্গী। তারপর চুরি করতে বেরনো। রাজাকে নিয়ে তারা এলো রাজপুরীর সামনে, বললে—আজ রাজপুরীতে চুরি!

রাজার ছ'চোখ হলো বড় বড়—রাজা অবাক! তিনি বললেন—বেশ!

পুরীর দেউড়িতে সেপাই-সাত্তীদের নজর এড়িয়ে সকলে এলো অন্ত দিকে—সেখানে ছিল একটা কুহুং—কুহুংটা হঠাৎ তাদের দিকে ভৌ ভৌ করে ডেকে সরে গেল।

প্রথম চোর বললে—ও বললে—অবাক কাও চোরের দলে রাজা!

তখন সকলে হো হো করে হেসে উঠলো—শোনো কথা! আমাদের দলে আবার রাজা কে?

রাজাও হাসতে হাসতে বললেন—যা বলেছো!

তারপর দু'নম্বর চোর দড়ি ছুঁড়লো—দড়ির গুদিকটা সাত-বহলা পুরীর ছাদের আলসের গজাল আটকে দিলে—তখন দড়ির মই তৈরী হলো। আর সেই মই বয়ে দু'জনে উঠলো ছাদে। ছাদে উঠে তিন নম্বর চোর ছায়ে ঘুরে ঘুরে নিঃবাস টেনে গন্ধ শুকতে লাগলো—শুকতে শুকতে কখনো বলে—এর নীচে দাসীদের ঘর—এর নীচে বস্ত্র কেতাব-পত্র—এর নীচের ঘরে খাবার-দাবার—তারপর এক জাহগার এসে গন্ধ শুকবে বললে—এর নীচে রাজার তোশাখানা।

তখন চার নম্বর চোর হাত বুলিয়ে ছাদের দরজা খুললো—নিশ্চিতি পুরীর মিঁড়ি দিয়ে তোশা-খানার সামনে এসে চার নম্বর চোর তোশাখানার দরজা খুললো—খুলে, খুলি ভরে টাকা যোহর সোনারানা হীরে-জহুরং খলিতে বস্ত্র ধরে—সব দখলো—সবিয়ে, তারপর চার নম্বর চোর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা খুললো—সকলে সেই খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো পথে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে—একটা ভাঙ্গা হাঙ্গিরে একেবারে নিভেদের আত্মনিয়ম।

আস্তানায় এসে চোরাই হালের ভাগ-বাটোয়ারা হলো—পাঁচ নম্বর চোর আর রাজা—ছ' ভাগ হলো। প্রত্যেকে এক এক ভাগ নিলে—রাজাকেও নিতে হলো। তাঁর ভাগ। এবার ঘে-ঘার বাড়ী ফিরবে। রাজা ফিরলেন পুরীতে। তিনি বললেন—তোমাদের নাম ঠিকানা বলো—তাই সব দরকার বুঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে তো।

চোরেরা বললে তাঁদের নাম ঠিকানা। রাজা তাঁদের নাম ঠিকানা শ্রেনে পুরীতে ফিরলেন।

পরের দিন সকালে হৈ হৈ কাণ্ড—তোলাখানার খালাকী এসে দড়েরে জানালো তোলাখান। লুট—অথচ দরজা দেওয়াল-সিন্ধুকের তালা পর্যন্ত অটুট। কি করে কি হলো! ভয়ে খালাকী কাঁপছে—রাজা বললেন যন্ত্রীকে—পাঁচজন্যের নাম আর ঠিকানা দিচ্ছি যন্ত্রী—এখনি এইসব ঠিকানায় সাত্তী পাঠান—তাঁদের গ্রেফতার করে আনবে—আর সেই সঙ্গে তাঁদের ঘরে যে সব জিনিস পাবে সব নিয়ে আসবে—এখনি।

সাত্তীরা গিয়ে পাঁচ চোরকে ধরে নিয়ে এলো—সেই সঙ্গে চোরাই হাল। রাজা বললেন বিচারককে—এদের বিচার করুন।

চোরাই হালহুদ চোর গ্রেফতার—বিচারে বিচারক বললেন—এমন চুরি, পাঁচজন্যেরই ফাঁসি হবে।

তখন সেই পাঁচ নম্বর চোর বললে রাজার দিকে চেয়ে—আপনি তো আমাদের সঙ্গে ছিলেন, বলেছিলেন শুণী মাহুদ—আপনি মাথা নেড়ে 'না' বললে ফাঁসির হুকুম বদ হয়। দলের লোক আমরা—আপনাকে সভায় দেখেই চিনেছি—এখন দলের এই পাঁচজন্যের ফাঁসি বন্ধ করুন—মাথা নেড়ে বলুন 'না'।

রাজা হাসলেন—হেসে মাথা নেড়ে বললেন 'না' ফাঁসি হবে না—আমার হুকুম, ফাঁসির হুকুম বদ।

চোরাই হাল উদ্ধার হয়েছে—রাজা তাঁদের ভালো করে খাওয়ালেন—তাবপন বললেন—এত শুণ নিয়ে কেন চুরি করো—রাজার কাছারিতে চাকরি করো—ভালো চাকরি দেবো, ভালো মাইনে পাবে, বাড়ী-ঘর দাদ-দাদী পাবে।

পাঁচ চোর রাজাকে প্রণাম করে একসঙ্গে বলে উঠলো—মহারাজের জয় হোক।

একদা সকাল বেলায়

(গল্প-কবিতা বা অম্লি লক্ষ)

শ্রীনেড়কড়ি শর্মা

একদা সকাল বেলায়
সুখদা মজুমদারের
ছোট ভাই সুখেন্দুলাল
বাগানে ঘণ্টাব্যনেক
বেড়িয়ে ফেরার পথে
দোকানে খাবার কিনে,
ঠোঙাটা বাগিয়ে ধরে,
কৌচাট একটু ভুলে,
চেতলার মোড়ের মাথায়
রাজপথ পেরিয়ে যেমন
ছুটপাতে উঠতে বাবে,
কোথা থেকে এমন সময়
হঠাৎ এক চিলের ছানা
ডান মেনে এগিয়ে এসে
হৃদ ক'রে ঠোট দিয়ে সেই
খাবারের মন্ত ঠোঙা
ছোট মেরে চললো নিয়ে
কাছের এক অশঙ্ক গাছে—
দেখা যায় ঐ অনুরে—
তাদের ঐ ছোট্ট বাসায় ।

সুখেনের হাত থেকে যেই
ঠোঙাটা চললো উড়ে,
রাখার সকল লোকে—
ছেলে আর বুড়োর দলে,
বাড়ারের বগলী হাতে
যত সব চাকুরে বাবু,
'হ্যানিটি- ব্যাগ' হাতে ঐ
ক্রক-পর্য্য হুমসো খুঁকু,
পথের ঐ খোঁটা কুলী,



বাবুদের চোটা চাকর,
সুখ-পা রিক্স-ওলা,
বাবু-লাই ট্যাক্সি-ওলা,
'বাসে'র ঐ শিখ-ভাইতার',
'টামে'র ঐ 'কন্-ডাক্তার',
পাড়ার ঐ কোন্ ডাক্তার,
উকিল আর সেই মোক্তার,
দাড়ি আর পাগড়ি নেড়ে,
তেড়ে কেউ লাফিয়ে উঠে,
এক সাথে উঠলো হেসে
চিলের ঐ কাণ্ড দেখে ।

বোকারাম সুখেন্দুলাল
চেরে রয় ইন্দার মত,
মাথাটা ওপর দিকে
ভুলে চায় আকাশ পানে,
ছুটো তা'র ডাব ডাবে চোখ
চেরে রয় চিলের দিকে ।

মন তা'র দুখে ভরা,
চোখে জল উপ্ছে ওঠে—
এখন আর করবে কি সে ?
আর তা'র পরমা তো নেই—
যাতে সে আবার খাবার
কেনে গো দোকান থেকে !

একে তো খাবার গেল,
তা'র ওপর পথের লোকে
কত সব ঠাট্টা করে,
উপদেশ দিচ্ছে কেহ,

দিল বা মাখনা কেউ,
দেখালো মহাশূন্যতা।—

• • •

বাছা রে! ছুটু চিলে
নিলে তোর খাবারগুলো?
কলিকাল এরেই বলে—
জোর ঘা'র ম্লুক তারি।
ও খোকা! কলকাতাতে
এসেছ নতুন বৃষ্টি?
শহরের রকম-সকম
বৃষ্টি বা নেই কো জানা?
এখানে সবাই চালাক—
শুধু যে মা'হু-তা নয়,
পশু আর পাখীর মলেও
ঠকাত্তে চায় সকলে।
এতটুকু অপাবধানী
হয়েছ যেই তুমি হায়,
অমনি দেখবে তোমার
পকেটে নেই কো টাকা।
নিয়েছে গাট-কাটাতে।
নয় তো নেই 'কাউটেন'।
নতুবা 'ট্রামে'র টিকিট
বিলুপ্ত উধাও হোলো।
'ট্রামে'তে জুতো খুলে
পা তুলে আরাম করে
বসবে যেই তুমি, বাস—
জুতো নেই এক মিনিটেই!
'স্ট্রিকেন্স' পাশেই রেখে
সবে যেই বসলে তুমি,
কোথা গেল 'বাসে'র ভিড়ে
সেটা গো এক নিমেষে?
নিয়ে মোট মূটের মাখায়
চলেছ তাহার পিছে,
এ কি হায়, কোথায় মূটে?

হোলো কি শূন্যে হাওয়া?
বলি তাই, শুনছ খোকা—
শহরে সামলে চোলো—
না হ'লে নিজেই তুমি
হারাবে পথের মাঝে।
জানো তো ছেলে-ধরা
কত সব ঘুরছে পথে—
তাদেরি খপ্পরেতে
বুজি বা পড়বে কবে!

• • •

মা'হুই করছে ক্ষতি
মা'হুই, প্রতাহ বে—
করছে শত্রুতা সে
যতটা— তেমন কি আর
পশু আর পাখীর মলে
মা'হুইয়ের করছে ক্ষতি?

• • •

থাকে বাধ বনের মাঝে—
থেকো খুব সাবধানে হে—
এ তো বেশ সহজ কথা,
অথচ করতেছে বাস
যে পশু চন্দ্রবেশে
মা'হুইয়ের সমাজ মাঝে—
কি সে তা'র কবল থেকে
পাবে ভাই তোমরা ছাড়া?

• • •

আরো তাই বলছি শোনো—
এ কথা কেই বা ভাবে—
শহরের চিলগুলি সব
কে খেয়ে থাকবে তা'রা?
তাদেরও খাবার তো চাই—
সে কথা ছলছ কেন?
কানীতে অনেক লোকে
বীররের জন্তে রোজই

কলা আর শুকনো ছোলা
ছড়িয়ে দেয় কত বে!
এখানেও কেউ বা দেখে—
পায়রা পুষছে কত,
পুষছে ময়না, টিরা,
হুমান্, বেড়াল, কুকুর,
বিলিতি ইদুর-ছানা,
ধরগোশ, কাকাতুরা,
মুমিরা, চন্দনা বা,
লাল মাছ, মগুং, বেজী।
এরা যায় দোনা দানা,
মোটরে পাচ্ছে হাওয়া,
গরীতে 'ফ্যানে'র তলার
মনিষের সঙ্গে থাকে।
আদরে আর 'গোবরে'
লাজ এদের কছে মোটা।
চিড়িয়া-খানায় দেখে—
হিপোরা পাচ্ছে খানা,
ম্যাওরা ফল পায় বীদরে,
হাতিরা গিলছে কলা।

বেগী তেল ঝর মাথাতে
তাঁরে তেল যোগায় নখে—
ছুনিয়ার এই তো রীতি,
ছুতীরে কেই বা তাখে?
কাক, চিল, চড়াই পাখী—
এদের আর পুষছে কে বা?
এদের আর খাওয়াচ্ছে কে?
অবিচার নয় কি এটা?
তাই তো পিদের তাড়ায়
তোমার ঐ খাবারটুকু
ছোঁ মেবে ঐ বেচারা
নিরে যায় বাসার পানে।
দেখ গো বাসায় যে তাঁর

বুড়ো বাপ, বোনটি ছোট—
ছুটো দিন পায়নি খেতে
খিদেতে খুঁচ্ছে তাঁরা।
তাদের ঐ কতক মুখে
কে খাবার যোগায় বলে?
নয় কি তাঁদের অভাব
তোমারও চাইত বড়?
বড় জোর বাড়ি গেলে
বকুনি ধাবে ডুমি,
হয়তো কানটি ধ'রে
কবে কেউ— খাবার কোথা?
তাই নয় সফল করে
থাকো গে একটু তুমি—
সুখাতুর পাখীর আশিস
পাবে তাই স্বপ্ন ত'রে।
গরীবের কল্লো তুমি
দিলে যে খাবার আজি—
এ কাজের নেই ভুলনা,
এই কাজ বড় দামী।
ছুতী ঐ পাখীর তরে
না দিলে তোমার খাবার,
না খেয়ে থাকবে সে হার
সারাটি দিবস ধ'রে।
তোমার ঐ খাবার থেকে
কিছুটা কম যদি খাও,
কি এমন ক্ষতি বলে
হবে তাই তোমার তাতে?
অথচ তাই পেয়ে যে
পাখিটির জীবন বাচে!
স্বপ্নেনের মুখে হাসি
দেখ ঐ উঠলো কুটে—
মন তাঁর উঠলো ভ'রে,
যদিও হাতটি খালি।



হেমন্ত ও বসন্ত

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সে অনেকদিন আগেকার কথা।

ওই যে প্রকাণ্ড নীল আকাশ, ওর ওপরে দেব-রাজ্য। সে রাজ্যে দেবতারা থাকেন।

দেবতাদের মধ্যে সবার বড় হলেন স্বর্ঘ। তাঁর সম্মান সব চেয়ে বেশি। কারণ তিনি দেবতাদের রাজা। আকাশের ওপর তাঁর প্রাসাদটিও তাই সব চেয়ে ভাল। তেমন প্রাসাদ আর কোন দেবতার নেই।...

সেই দেব-রাজ্যের একটিমাত্র মেয়ে। আর সেই মেয়েও অপক্কপ সুন্দরী। সবাই বলে, রাজকন্তার রূপের তুলনা নেই।

এমন যে রাজকন্তা, তার এবার বিয়ে হবে। এখনো কিছু ঠিক হয়নি। কথাবার্তা চলছে। আসা-বাওয়া হচ্ছে। স্বর্ঘরাজার মেয়ের বিয়ে। দেবতা ছাড়া আর কারো সঙ্গে তো হ'তে পারে না। তাই দেবতারা সব আসছে একে একে।

স্বর্ঘমেয়ের প্রাসাদে এসে তারা বিয়ের ইচ্ছের কথা জানাচ্ছে।

কিন্তু রাজকন্তার কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। একে একে সবাইকেই সে বলছে, 'না'।

এদের কাউকে তার পছন্দ নয়। এদের কাউকে সে বিয়ে করবে না। আকাশের সব দেবতা এসে একে একে ক্রিয়ে গেল। কারো সঙ্গেই বিয়ে হ'ল না রাজকন্তার।

সকলে ফিরে যাবার পর তারা দু'ভাই এল। দু'ভাই দুটি ক্ষুদ্র দেবতা। হেমন্ত বড় ভাই আর বসন্ত ছোট।

দু'জনে একসঙ্গে তারা দেবরাজ্যের প্রাসাদে গেল না। বড় ভাই হেমন্ত গেল আগে। প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে সে রাজকন্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে।

রাজকন্তা তো প্রথমে দেখা দিতেই রাজি হ'ল না। শেষে অনেক বলা-কওয়ার পর হেমন্তের সঙ্গে সে দেখা করলে। কিন্তু তাকেও রাজকন্তার পছন্দ হ'ল না। হেমন্তের কোন কথাই শুনলে না সে। তাকে গ্রাহ্যই করলে না, বলতে গেল!

হেমন্ত আর কি করে? দুখ তার করে ফিরে এল প্রাসাদ থেকে।

বসন্ত বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে সে বললে,—

'তুমি আর রাজকন্তার কাছে যেও না। তার ভারী অহংকার। তার সঙ্গে দেখা ক'রে কোন

লাভ নেই। সে কোন কথাই শুনতে চায় না, কথার জবাব পর্যন্ত দেয় না। আমাকেই সে যখন কিরিয়ে দিয়েছে, তুমি গেলে তো আরো অপমান হবে। তাই বলছি, রাজকন্টার কাছে যেও না।’

বসন্ত কিন্তু তার কথা শুনলে না। সে ঠিক করলে রাজকন্টার সঙ্গে সে দেখা করবেই। নিজের ওপর তার বিশ্বাস খুব। রাজকন্টা তাকে কিছুতেই অপছন্দ করবে না—এই তার ধারণা।

সে হেমন্তকে বললে, ‘কেন যাব না? তুমি দেখে নিও, রাজকন্টার সঙ্গে আমার নিশ্চয় বিয়ে হবে। আমি তোমার সঙ্গে বাজি রাখতে পারি এই নিয়ে। যদি সে আমার কিরিয়ে দেয় তা’হলে তোমার কাছে বাজি হেরে যাব। আর যদি রাজকন্টা আমার বিয়ে করে তা’হলে তুমি আমার কাছে বাজি হারবে। এই আমার কথা।’

হেমন্ত বললে, ‘বেশ, তাই হবে।’

বসন্ত কিন্তু তখন রাজকন্টার কাছে গেল না। আগে সে গেল নিজের মায়ের কাছে।

রাজকন্টার দেরকম মেজাজ শুনলে, তাতে বেশ তৈরি হয়ে বাঙা দবকার। তাকে খুশি করবার জন্যে রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে। ছই করে আর সবাইকার মতন হাজির হয়ে কোন লাভ নেই।

এই সব ডেবে বসন্ত মায়ের কাছে গেল। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘মা, কি করে রাজকন্টাকে ছই করব?’

তার মা বললে, ‘রাজকন্টার কাছে তুমি নতুন রকমের সাজ করে যাও। তোমায় একটি চমৎকার পোশাক হবে দিচ্ছি। এটি আগাগোড়া ফুলের কুঁড়ির তৈরি। এ রকম জিনিস তো আর কেউ পরে তার কাছে যায়নি। তোমাকে এই কুঁড়ির সাজে দেখলেই সে খুব খুশি হবে, আর পছন্দ ক’রে ফেলবে।’

এই ব’লে হেমন্ত-বসন্তের মা সেই অপছন্দ পোশাকটি তৈরি করে দিলে। পা থেকে গলা পর্যন্ত সমস্তই শুধু ফুলের কুঁড়িতে ভরা। আর কোন কিছুই তার মধ্যে নেই। সেলাই পর্যন্ত নেই। বিনী-সুতোয় গাঁথা। আগাগোড়া শুধু লিলাক আর উইন্তারিয়া ফুলের বাহার।

মা তারপর তেমনি শুধু কুঁড়ি দিয়ে একজোড়া জুতোও বসন্তের জন্যে তৈরি ক’রে দিলে। আর মাথায় পরবার ফুলের মুহুট। হাতে দিলে তীর-ধনুক। সবই ফুলের কুঁড়ি দিয়ে গড়া। যেমন চমৎকার, তেমনি নতুন।

এই কুঁড়ির পোশাক পরে, মাথায় মুহুট, হাতে তীর-ধনুক নিয়ে যখন বসন্ত সাজলে—কিন্দর তাকে দেখাতে লাগল।

তারপর এই অপছন্দ ফুল-সাজে সেজে সে দেখা করতে গেল রাজকন্টার সঙ্গে।

প্রাশাসের ফটক পার হয়ে সে যখন রাজকন্টার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন বসন্তের শাক্ত রূপে রঙে ঝলমল করছে। এতক্ষণে সমস্ত কুঁড়ি ফুটে ফুটে ফুল হয়ে উঠেছে। চারদিক ভরে গেছে মিষ্টি গন্ধে। সমস্ত-কোটা ফুলের গন্ধ স্বর্গদেবের প্রাশাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

বসন্ত দেখামে আসবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে এসেছে টাটকা ফুলের গন্ধ। রাজকন্টার কাছে বসন্তের পৌছবার কথা যেন জানিয়ে দিয়েছে।...

একদিকে এত ফুলের এমন মিষ্টি গন্ধ! রাজকন্টার ভারী ভাল লাগল। এ কি অপূরণ ফুল-শাক্ত! আগে তো কখনো দেখা যায়নি? ফুলের মুহূর্ত, ফুলের পোশাক, ফুলের জুতো, ফুলের তীর-ধনুক। সবই শুধু লিলাক আর শাদা উইস্টারিয়া।

রাজকন্টার মন খুশিতে ভরে গেল।

সে বসন্তকে বললে, 'আমি তোমাকেই বিয়ে করব।'

তারপর খুব ধুমধাম করে রাজকন্টার সঙ্গে বসন্তের বিয়ে হয়ে গেল।...

ওদিকে ভীষণ বেগে রইল হেমন্ত। রাজকন্টা শেষে বসন্তকে বিয়ে করলে! বসন্ত তার ওপর ক্ষিপ্তে বাবে? বসন্তের কাছে তা'হলে এবার তাকে বাজি হারতে হবে?

হেমন্ত বসন্তকে বললে, 'আমি তোমায় কিছু দেব না।'

শুনে তাদের মায়ের খুব রাগ হ'ল। হেমন্তকে সে বললে, 'এ তোমার ভারী অন্যায়। নিজের কথার ঠিক নেই। তুমি যদি কথা না রাখো, আমি তোমায় শাস্তি দেব।'

কিন্তু হেমন্ত কিছুতেই বাজি হারতে রাজি হ'ল না।

তখন তাদের মা বললে, 'দাঁড়াও। এবার তোমায় শাস্তি নিতে হবে।'

এই বলে সে একটা বড় ফাঁপা বাঁশের টুকরো নিয়ে এল। তার মধ্যে ভর্তি করলে পাথর আর ছুন। তারপর সেই বাঁশের চারিদিকে পাতা জড়িয়ে একটু উঁচুতে টাঙিয়ে রাখলে। একটা উঁচুন জেলে বসিয়ে দিলে বাঁশের নীচে। আর সেই আগুন থেকে ধোঁয়া বেকতে লাগল গলগল করে।

তারপর সে হেমন্তকে বললে, 'এই বাঁশে জড়ানো পাতাগুলো যেমন ধোঁয়ায় দিন দিন শুকিয়ে বাবে, তোমারও দশা হবে তেমনি। এই সব ছুন যেমন জল হয়ে গলে বাবে, তোমার প্রাণও শেষ হয়ে বাবে তেমনি। পাথরগুলো একটু একটু করে নীচে ডুববে। তেমনি তোমার শক্তি, তোমার রূপ, দেখতে দেখতে সব মিলিয়ে বাবে মাটিতে। এই হ'ল তোমার শাস্তি।'

সেই শাস্তির কথা শোনবার পর থেকে হেমন্তের মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

ভাল মুখে আর আনন্দ নেই, হাসিখুশির ভাব নেই। শারাদিন সে কেমন এক দুখে আচ্ছন্ন

হয়ে থাকে। চেহারা তার শুকনো, বিবর্ণ দেখায়। রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সে কাঁদে। টপ্, টপ্ করে, বরষে পড়ে তার চোখের জল।

সে বে হেমন্ত !

তারই পেছনে পেছনে তো আসে হিম-বুড়ো ষীত !—গাছপালা শুকিয়ে, পাতাবাহার ঝড়িয়ে, সবুজ রঙ শেষ করে দিয়ে। ঠাণ্ডায় ঘেন সব মরে যায় !

কিন্তু বসন্ত ভেমন নয়। সে আনন্দে ঝলমল করছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কত চমৎকার রঙ। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘেন আসে নতুন জীবন। চারদিকে ঘেন প্রাণের দাড়া জাগে। ছন্দে-গন্ধে-আনন্দে সে কি হুমর !

সে বে বসন্ত !

অপরূপ সেই ফুল-কুঁড়ির পোশাক পাবে সে আসে। প্রতি বছর সে আসে হিম-বুড়োকে দূর করে দিয়ে।

সে এলেই তো ফুল ফোটে, রঙ ধরে।

লিলাক আর উইন্তারিস্সার কুঁড়ি ভরে ওঠে ফুলে-ফুলে। আর তার সেই বিয়ের কথা লোকের মনে পড়ে যায় : অনেক দিন আগে বসন্তের কেমন করে বিয়ে হয়েছিল স্বর্ঘদেবের মেয়ের সঙ্গে !

ভোরের ওঠে।

খ্রীষ্টান মিত্র

ভোর হ'লো, ভোর হ'লো

সোনালী আলোক !

ওই পাখি যায় ডেকে

খুকু খোলো চোখ।

রয় কুঁড়ি ডাল ভ'রে

কোটে ধীরে সব !

মৌমাছি যায় নাচি

করে কলরব।

শন্ শন্ বায়ু বহে

মধুমাখা ক্ষণ !

রোজ এই ভোরে ওঠা

সুরু ক'র পণ।

ভোর ভোর উঠে পড়

ভাল রবে মন !

নও এক শুধু ভূমি

আরো যত বোন।

কাক-মনুরে

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

সারাটা বেশে পাখী নেই একটাও। পাখী যে নেই তা অবশিষ্ট কথায় নয়—আছে ছবিতে। ছবির পাখী—গাছের ডালে সবুজ পাতার মধ্যে নয়, খাঁচায় ধাঁড়ো নয়। ছিল এমন এক বেশ।

সেই বেশেরই নদী-পথে একদিন এক পান্থি ভেসে চলছিল আর সেই পান্থিরই ধাঁড়ের উপর একটি পাখী। মিশারী পাখী—ঝড়ে-জলে পড়লে, আশমে-বিগমে পথ হারালে, মিশা বলে দেয়।

লোকজন ভিড় করল এসে নদী-তীরে—পাখী দেখতে। জ্যান্ত পাখী—ছবিতে নয়, ছড়াতে নয়, একেবারে জ্যান্ত পাখী। আর, সদাগর কূলে নাও ভিড়াল—সেই ভিড়ের হেতুটা দেখতে।

ততক্ষণ চারদিকে রটে গেছে সেই জ্যান্ত পাখীর কথা। ছেলেরা ছুটল, মেয়েরা ছুটল, ছুটে এল ছেলে কোলে বো, লাঠি ভর ক'বে ধীরে ধীরে আসতে লাগল বুড়ো-বুড়ীরা। এমন সে বেশের লোক—বারা কখনো পাখী দেখেনি। সকলেই চোখ গোল গোল করে চাইতে লাগল পাখীটার দিকে, বলাবলি করতে লাগল কিসকিন করে।

“বাঃ! কী সুন্দর রঙ, মাথার চুলের মতো কালো, কান্নলের মতো কালো।”

“আহা কী গড়ন! যেমন জুইপুট, তেমন লম্বা ধরনের—টানা-পোড়েনে।”

“আহা হা, কী মনোহর চোখ দুটি, রাজকন্নার গায়ে যেন বলমল-বলমল একজোড়া মনি।”

“বাঃ বাঃ বাঃ—কী সুন্দর ঠোঁট, যেমন ঠোঁটের রঙ, তেমন গায়ের রঙ!”

“বাহা বাহা, কী বাহার পা দু'খানি, ঠিক ঘেন—” সকলেই কুঁকে পড়ে পাখীটার গায়ে একটু হাত ছোঁতে চায়, একটু আদর করতে চায়। তারপর একজন সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বললে—
“এই অপভ্রংশ পাখীটার নামটি, মহাশয়?”

সদাগর বল বেশ গম্ভীর ভাবেই—“বায়স”, আদর করে ডাকি কাক।”

কী আশ্চর্য, কাকও অমনি ভেঁকে উঠল—কা কা! আহা কী মিষ্টি ডাক, কান যেন জুড়িয়ে গেল, প্রাণ শীতল—বলাবলি করে সবাই। দর্শকদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি বললেন—“মহাশয়, পাখীটিকে আমাদের কাছেই তো রেখে নেতে হচ্ছে!”

"কিন্তু এ যে আমার পোষা পাখী, দামী পাখী!"—সদাগর বুকে কথা বলে।

"তা দামী পাখী, দামও দিচ্ছি আমরা।"

"কত?"

"এক মোহর।"

"এক মোহরে এ পাখী পাওয়া যায় না।"

"বেশ, দুই মোহর দেব!"—কত যে দাম বুঝতেই পারে না এ দেশের লোকেরা, কোনোদিন পাখীর কারবার করেনি তো।

"দুই কেন, মশ মোহরেও এ পাখী দিতে পারব না।"—বলে সদাগর।

"বেশ, সেই মশ মোহরই দিচ্ছি।"

সদাগর তখন দিবে মিল পাখীটা। মুখে অবশ্য বললে—"এ নামে তো দেওয়া উচিত নয়, তবে নেহাত আপনাদের আগ্রহ দেখলাম। তাছাড়া, সদাগর বাহুব আপনাদের দেশের সঙ্গে লেনদেনই তো কামনা করি।

এখন এই পাখী নিয়ে সারাটা বাজ্যে মহা হৈ চৈ। কাককে রাখা হ'ল সোনার খাঁচার, বেতে দেওয়া হ'ল—দুধ, দই, সন্দেশ আর দামী দামী ফল। সকলের মুখেই এখন শুধু কাক আর কাক! কাকের ভয়ে এমন কি কাকা-কাকীদেরও আমর-কদর বেড়ে গেল—শব্ব দুটো গুনতে একই রকম কিনা!

ভারপর। সেই দেশেই আবার এল সদাগর। এবারে বাড়ির উপরে নিয়ে এল এক পোষা ময়ূর! তুড়ি দিলে সান্তরঙা পেখম মেলে—একখানা রক্তকরা পট! ডাক দিলে সাড়া দেয়—কী আকুল তার স্বর! মনে হয় লম্বা আর বীণী বাজছে একই সঙ্গে!

বাজার লোক ভেঙে পড়ল এবার নদীর ঘাটে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল নতুন পাখীর রূপের ছটা, গুণের ঘটা। সকলেই এসে বাড়ি হেলিয়ে-দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, আর দেখে। প্রাণ মন জুড়িয়ে শোনে, আর শোনে—ডাক শোনে। যত দেখে তত দেখতে ইচ্ছে করে, যত শোনে তত শুনতে ইচ্ছে হয়।

কেউ বলে—"আহা, হাজার হাজার রায়বহু নেবে এসে লেগে আছে ওর পালকে-পালকে।"

কেউ বলে—"আহা, পেখম তো নয়, দেবীর পট!"

কেউ বলে—"আহা, গলার বেন নীলকান্তমণি গলে : লে পড়ছে!"

কেউ বলে—"আহা, চোখ দুটি বেন পদ্মগাবর্ণি!"

কেউ বলে—“তুঁটিট ঘেন সাতরাজার এক রাজ-মুহুট!”

সবাই বলে—“এ শাপী আমাদের দিয়ে যান। যা লাগে আমরা তাই দেব।”

সদাগর—“এর ডাকতো শোনেনই নি!”—অমনি কিনা ডেকে উঠল ময়ূর—কে-কা কঃ কঃ।

মনে হ’ল, সব্বার মনটুকু নিয়ে ঐ ডাকটুকু ঘেন চল গেল কোথায়—দিগদিগন্তের শেষে কোন
অগ্নির দেশে!

“না, এ পাখী আমরা চাই-ই—বত লাগে!”

সদাগরও বলল বুকেমুখে—“নাম চাই একশত মোহর!”

লোকজন অবশিষ্ট দ্বাদশি করল কিছুটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একশত মোহরই দিতে বাজি হ’ল।
হাতে হাতে টাকা উঠে এল কিছুটা, বাকীটা দিল ধনী লোকেরা। সব্বাই মিলে এবারে ময়ূরকে ঘিরে
রাখল একটা বাগান-বাড়ীতে—রাজ্যের ঠিক বুকের মাঝখানে!

লোকের মুখে মুখে এখন শুধু ময়ূর আর ময়ূর! কাছ থেকে দূরে ময়ূর আর ময়ূর! সারাটা
দেশ এসে ঘনিয়ে বসল ঘেন একটি ময়ূরের পেখমের তলায়।

দেখতে দেখতে রাজ্যে আর এমন লোক রইল না—ময়ূর যে দেখতে আসেনি। লোক চলাচল
নিয়ন্ত্রণ কববার জন্তে নতুন নতুন যানবাহন আর নতুন নতুন আইনকাঠন হ’ল। সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্ত ময়ূর-বাড়ী লোকে লোকারণ্য। লোকে এক এক বাড়ীর নামকরণ করতে লাগল
ময়ূর-বাড়ী।

শুধু তাই নয়, আশ্রয় ক’বে ছেলেমেয়েদের নাম রাখা হ’ল ময়ূর, কেকা, কলাপী, শিবী।

ময়ূর কার দিকে তাকায় তাই নিয়ে বাজি রাখে ছেলেমেয়ে থেকে বুড়োবুড়ীরা। ময়ূর যদি
ডাকে—কাকে ডাকল তাই নিয়ে ছড়োছড়ি।

এখন আর কাকের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। খাবারও দেয় না, খবরও নেয় না।
যারা আসে—আসে পুরানো অভ্যাগের টানে, আর কাক দেখে বলে—“ইস্, কী বিক্সি দেখতে! কী
বিক্সি কালো! কী বিক্সি ঠোটটা!”—ময়ূর দেখে কাকে অকচি ধরে গেছে।

এদিকে কাকের এসব নিশ্চে তবু সহ হয়, থিদের জালা জো আর সহ হয় না। একদিন কাক
তাই খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে গেল কা কা রবে!

রাখাল-বন্ধু

বন্দে আলী মিয়া

রাখাল ছেলে বন্ধু আমার
তোমার সাথে যাবো তোমার গায়,
সবুজ মাঠে রইবো বসি
গাছের তলে ঘন পাতার ছায় ।
কিচির-মিচি করবে পাখী
ছপুর বেলা বগলা খেতে আসি—
ঠোকর লেগে পড়বে খসে
গায়ে মুখে পড়বে রানি রানি ।
কুড়াবো তার ছ'হাত দিয়া
কোঁচড় আমার নেবো তাহে ভ'রে—
চলবে বায়ু ছুঁইয়ে মেয়ে
শুকনো পাতার শব্দে পায়ের পরে ।
হেথায় বসি তোমার সাথে
নিরিবিলাি খেলবো ছপুর বেলা—
চারপাশেতে ছড়িয়ে দেবো
পাথর কুচি শুকনো শামুক মেলা ।



তোমার গায়ে যাবো রাখাল
তোমার সাথে দহের ও-পার দিয়া—
পাতার বাঁশী তোমার মুখে
বাজবে বন্ধু নাচবে আমার হিয়া ।
ভাটির বেলা আকাশ কোণে
মেঘে মেঘে যেন আগুন জ্বলে—
পড়বে ররি তাহার কণা
তোমার গায়ে—দহের গহিণ জ্বলে ।
গরুরা সব ফির্বে ঘরে
খুরের ঘায়ে উড়বে রঙিন ধূলি
চিল শকুনি চলবে উড়ে
পাতার বাসা খুঁজবে গো বুলবুলি ।
ছুটেবে তারা আশ'মানেতে
ফুলের মতন সাঁঝ না হতে হতে—
রাখাল তব হাতটি ধরে
চলবো পিছু আলের পথে পথে ।





(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালবেলা বাইরে কে বৃষ্টি এসে ডাকতে লাগলো—নিবারণদা, নিবারণদা—
কিন্তু ঘরের-বৌ বাইরে বেরোতে পারে না। বাড়িতে কেউ কেউ নেই যে সামনে গিয়ে
জবাব দেয়। ঘরা আসে তারা ডেকে-ডেকে কিরে ঘায়। কেউ জানে না নিবারণ গেছে
মুশিলাবাদে। গয়লা-বউ ছিল। সে-ই বাইরে এসে বললে—জামাই নেই গো—

—কোথায় গেল নিবারণদা? আবার সরিসী হয়ে গেল নাকি?

—তা জানিনে বাছা,—বলে গয়লা-বৌ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

এমনি করেই ক’দিন ধরে লোক এসে ডেকে-ডেকে কিরে গেল। বাঁজুজ্জেশমশাইও নেই।
কোথায় গেছে কেউ জানে না। মুহূন পেয়াদাও নেই। জমিদার-বাড়ি থেকে রোজ সিধে আসে।
চাল-ভাল-ছুন-ভেল-মশলা আসে। কোনও ভাবনা নেই আর গঙ্গামণির। এতদিন পরে খাওয়া-
দাওয়ার ভাবনাটা চুকেছে ঘা’হোক। গঙ্গামণির গায়ে আবার রাতা লাড়ি উঠেছে, পায়ে আলতা
লেগেছে। উঠোনে লাউ-এর চারা লাগিয়েছে গঙ্গামণি। ধানি-লঙ্কার চারা লাগিয়েছে। এখন
পাড়ার বউ-মি আসে ছ’চাবজন, এসে হ’লও বসে গল্প করে। গয়লা-বউ এসে বসে।

কেউ জিজ্ঞেস করে—হাফটা সংসারী হলো, তবু ভালো—

কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করে—জুনেছি নাকি কত রকম বাজি করতে পারে, তা সত্যি গা?

গঙ্গামণি বলে—কে জানে যা, আমি কিছু দেখিনি—

তা তুমি জিজ্ঞেস করো না কেন বাছা? সবাই যে বলে ছেলে নাকি ভেঙে জানে! বলে

নাকি ছেলে আকাশে উড়তে পারে, জলে ডুবে থাকতে পারে। কুসুমন্তর নিয়ে বাঘ হয়ে যেতে পারে !

কথাটা আর কারো জানতে বাকি নেই। গরাণহাটি গাঁয়ের সবাইই কানে গেছে কথাটা। সবাই জানে নিবারণ সংসারী হলে কী হবে, ভেতরে-ভেতরে এখনও সন্ধ্যানী। গেল্ল্যাপরে না বটে, তিলকও কাটেনা বটে, মাছ-মাংস-পেঁয়াজ-বহন সবই খায়, কিন্তু এখনও বাড়ির পেছনের ঝঞ্জে গিয়ে জপ-তপ করে। অনেকে নাকি দেখেছে ঝঞ্জে গিয়ে। রাত তিন প্রহরের সময় হঠাৎ মাঝে-মাঝে বেন একটা আঙনের ডেলার মত নপ-নপ করে জলে ওঠে। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে পারে না। মাঝে-মাঝে বোম্-বোম বলে একটা শব্দ হয়। লোকে বলে—ও নিবারণ, নিবারণ পিশাচ-সিদ্ধ হচ্ছে—

কথাগুলো এতদিন গন্ধামনির কানে বায়নি। শুনে সে-ও অবাক হয়ে গেল। নিবারণ চলে ঘাবার পরই বেশি করে কানে এল। এত ক্ষমতা মানুষটার! কেউ বললে—নিবারণকে রাত্তির বেলা গাছে-গাছে বাতুড়ের মত উড়ে বেড়াতে দেখেছে। কেউ বললে—ইছামতীর জলে কুমীরের পিঠে চড়ে ভাগতে দেখেছে। আবার কেউ বললে—নিবারণকে দেখা গেছে অন্ধকারে আঙনের ওপর বসে পুজো করতে, আর গাল ছুলিয়ে বোম্-বোম্ শব্দ করতে।

বুড়ীরা বলে—তা তুমি কিছু দেখনি যেহে? তুমি কিচুছ জানতে পারো না?

গন্ধামনি বলে—কই, মাসীমা, আমি তো কিছুই টের পাই না। যেমন সবাই ভাত-ভাল খায়, সবাই খায়-দায়-ঘুমায়, তেমনি তোমার জামাইও করে, কিছু তো বুঝতে পারি না আমি—

—তা এবার এলে একবার জিজ্ঞেস কোরনা, লোকে বা বলে তা সত্যি কিনা!

সেদিন হঠাৎ গরাণহাটিতে এক কাণ্ড হলো। ইছামতীর দুই ধারে নলখাগড়ার বনের মধ্যে চারটে ছিপ এসে লাগলো। তখন নিশ্চিতি রাত। গরাণহাটির গাঁয়ের লোক তখন ঘুমে অসাড়। কেউ টের পাবার কথা নয়। হঠাৎ রে-রে-রে-রে শব্দে সবাই চমকে উঠেছে। ভাকাত পড়েছে জমিয়ার বাড়ি। লাঠি-সোটা নিয়ে কালো-কালো ভূতের মতন একদল লোক মশাল নিয়ে কাঁপিয়ে পড়লো বাতুজ্জেশাই-এর চতীমণ্ডলের ওপর। মুকুম্ব তখন নেই। কিন্তু আর সবাই আছে। ভাকাতের চীংকার শুনে কেউ আর ঘর থেকে বেরোয় না। সবাই দরজায় হড়কো এটে পড়ে রইল। মাঝে-মাঝে শুধু 'হর-হর-মহাদেও' শব্দ আদতে লাগলো কানে। বাতুজ্জেশাই বাড়িতে নেই, সবাই জানতো। সেই হযোগে ভাকাতরা বাতুজ্জেশাই-এর বাড়িতে ঢুক পড়লো। কার্টের লখা দরজা ভেঙে হড়মুড় করে গিয়ে পড়লো একবারে অন্ধরমহলে। অন্ধরমহলে ঢুকে পড়তে পারলে আর রক্ষে নেই। তখন লোহার সিন্দূকের, তাল ভাঙতে আর ঘেরি

হবে না। জমিদার-বাড়িতে সোনা-রূপো-তাম্র-পেতলের অভাব নেই। মোহরই আছে কতকালের জমানো তারও ঠিক নেই। সাত পুরুষের জমানো ধন-মৌলত সমস্ত কিছু নিয়ে যাবে ডাকাত। সেই অন্ধকার অমাবস্তার রাতে ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে গঙ্গামনি ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

গয়লা-বউ পাশে শুয়েছিল। বললে—ভয় কী? আমি তো রয়েছি রে—

গঙ্গামনি বললে—যদি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়—

ঘরে আগুন দিচ্ছেও দিতে পারে ডাকাতরা। নবাবী-আমলে ঘরে আগুন দেওয়া তো তুচ্ছ কথা। ভিটে থেকে উদ্ধার করে ছেড়ে দিতে পারে। ডাকাত তো ডাকাত, নবাবের পেয়াদারিও ডাকাতের চেয়ে কিছু কম নাকি : সোনা-রূপো দেখলেই নবাবের দরকারে খবর চলে যায় কানাদুখোয়। তখন জুলুম হয়, তখন ডাকাতি হয়। এ-দব জিনিষ সহ্য করা অভ্যাস আছে গরীবহাটির লোকদের।

গঙ্গামনির সারা রাত ঘুম হলো না সেদিন। গয়লা-বউএরও হলো না। পরবহাটির কারোই ঘুম হলো না। গলা কাটিয়ে ডাকাতের দলের সেই 'হর-হর-মহাদেও' আওয়াজে কারো ঘুম হবার কথাও নয়। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ও এমন হয়েছে। গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে বর্গীর অত্যাচারে। কিন্তু সে-দব তখন গেছে। এখন আবার উৎপাত। গরীবহাটির লোকের বুক ভয়ে চিপ্‌চিপ্‌ করতে লাগলো। সবাই ভাবলে যদি এই সময়ে নিবারণ থাকতো গো! সে থাকলে ডাকাতদের বাণ মেয়ে চিট্‌ করে মিত!

কিন্তু দকাল বেলা সবাই বাঁড়ুজ্জেশাই-এর বাড়ি গিয়ে দেখলে—অবাক কাণ্ড!

ডাকাতরা এসেছিল লুণ্ঠপাট করতে। কিন্তু বাঁড়ুজ্জেশ-বাড়ির সিং-দরজা পর্বত এসে আর ঢোকেনি। চিংকার করে সারা গাঁ মাং করেছে। তবু ভেতরে ঢোকেনি। একটা জিনিসেও হাত দেয়নি। যেমন এগেছিল তেমনি আবার রে-রে-রে-রে শব্দ করতে করতে ইছামতীর ছিপে গিয়ে উঠেছে। আবার কখন চলেও গিয়েছে কেউই টের পায়নি।

এমন হলো কী করে? এমন ডাকাতির কথা তো কেউ ভাবেনি।

কেউ কেউ বললে—এমন হয় মাঝে-মাঝে,—মা-কালী মানা করেছে—

আর একজন বললে—তাই কখনও হয়? মা-কালী কখনও মানা করতে পারে?

একজন বললে—কেন মানা করবে না, মা-কালীর নির্দেশ না-পেলে তো ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসে না—

আর একজন জিজ্ঞেস করলে—তাহলে এল কেন?

বাঁড়ুজ্জেশাই-এর পাইক বললে—ডাকাতরা তো দরজা ভাঙছিল, কিন্তু কোথেকে কী হলো

কে জানে, হঠাৎ কালো মতন মৃতি একটা সামনে এসিয়ে এল। হাতে খাঁড়া নিয়ে উঠিয়ে নাচতে লাগলো ডাকাতদের সামনে, আর সবাই ধমুকে দাড়িয়ে গেল—

অবাক কাণ্ড! হারা গুনছিল তারাও তাকাব হয়ে গেল। আর অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। মা-কালী নিজে এসে ঠেকিয়েছে ডাকাত! গুনতে গুনতে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। জয়-মা, জয়-মা কালী! মায়ের লীলা বোঝা তার! চক্রবর্তীমশাইও গুনছিল। বললে—ভুবনভাষাতেও একবার এই রকম হয়েছিল গো। সেখানে তিনটে ডাকাতকে মা-কালী খাঁড়া দিয়ে কেটে একেবারে কুচি-কুচি করে ফেলেছিল।

কে একজন বললে—ডাকাত বেটাৱা দয়ত আসবার সময় ভালো করে মা-কালীর পুজো করে আসেনি হে—

আর একজন বললে—দেখবে বাড়ি গিয়ে এতক্ষণ ডাকাতরা মুখে রক্ত উঠে মারা গেছে, মায়ের রাগ বড় সাংঘাতিক রাগ—

সত্যিই, সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। মশালের আগুনে সিং-বরজার কাঠটার তখনও পোড়া দাগ রয়েছে। সামনের বারান্দার ওপর ডাকাতদের ফেলে যাওয়া একটা বাম-কাটাৱী তখনও পড়ে আছে। সেখানে তুলে রাখা হলো। বাড্ডুক্ষেমশাই এলে দেখাতে হবে। এ নিশ্চয়ই জীবন-চৌধুরীর কাজ। জীবন-চৌধুরীই এই কাণ্ডটি করিয়েছে। সোজা আগলে ঘি ওঠে না বেধে ডাকাত লেলিয়ে দিয়েছে।

চক্রবর্তী মশাই বললে—সব বেধে দাঁও হে, বাড্ডুক্ষেমশাই এলে দেখাতে হবে—মা-কালী বাঁচিয়েছেন এ-যাত্রা তাই রকে—

কিন্তু মা-কালীই বা বাঁচাতে গেলেন কেন? এত দয়া কেন হলো হঠাৎ বাড্ডুক্ষেমশাই-এর ওপর? ডাকাত যেমন সব বাড়িতে পড়ে, তেমনি পড়লেই পারতো! তেমনি সব লুণ্ঠাঠি করে নিয়ে গেলেই পারতো। কেউ তো ঠেকাবার ছিল না!

কথাটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না কারোব কাছেই।

শুধু ডাকাত-পড়াই নয়। আরো অনেক কাণ্ড হলো কশমিরের মধ্যেই। আশপাশের গায়ে কাকে-কাকে লোক মরতে লাগলো হঠাৎ। কী হলো? ইছামতীর ওপারে হলো ত্রিনাথপুর। ত্রিনাথপুরে দুপুরবেলাই কান্না উঠলো ঘরে-ঘরে। আজ এ-বাড়িতে লোক মরে তো পরের দিন পাশের বাড়িতে। গায়ে গুটি বেহোয়, না গরম হয়, আর তারপরেই পট করে মারা যায় মানুষ। কবিবাজ অড়ি-বুটি কিছুতেই কিছু হয় না। মাদুলী-তাগা-তাবিল কিছুমাত্র বাকি

রইল না। সব চেটাই হলো। আশেপাশের সব গাঁয়েই ছড়িয়ে পড়লো রোগ। প্রথমে জ্বীনাখপুর, তারপর মামুলপুর, তারপর হাসানাবাদ। তারপর মাথা নদীয়ায় কাঠার রোল উঠলো। কোতোয়ালীতে খবর গেল। নবাব-সরকারে খবর গেল। কে আর কী করবে! গরানখাটির লোকরাও ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাতে লাগলো। এবার এ-গ্রামেও মহামারী নামবে বুঝি! মঙ্গল-চণ্ডীভলায় গিয়ে পুজো দিয়ে এল সবাই, মানত্ করে এল। হে মা-মঙ্গলচণ্ডী, হে মা-মহামারী, তুমি আমাদের বাঁচিও মা! আমরা ছেলে-মেয়ে-স্বামী-পরিবার নিয়ে ধর করি। তোমার দয়া হলো, তোমার ধানে জোড়া-জোড়া পাটা বলি দেব। আমাদের দেখো মা তুমি।

আর সত্যিই আশ্চর্য! সত্যিই গরানখাটিতে একটা লোকও মরলো না। একটা লোকও অরে ভুগলো না। আশেপাশের সমস্ত গাঁয়ে যখন মহামারী আসন পেড়ে বসেছে, তখন গরানখাটিতে বেশ নিশ্চিন্তি, বেশ নিরাপদ।

তবু গঙ্গামণির ভয় যায় না। রাত্রে গয়লা-বউএর পাশে শুয়ে বলে—কী হবে যদি? সে মাহুঘটা কোথায় গিয়ে রইল, বড় ভয় করছে যে—

গয়লা-বউ বলে—জামাই-এর অন্তে ভয় করিস নে মেয়ে, মা-কালী তাকে বাঁচাবেন,—

—কিন্তু যদি ডাকাতের ধরে?

—ডাকাতের ধরবে জামাইকে? তাহলে এত মন্তব্য শিখেছে কী-করতে?

কিন্তু তবু যেন গঙ্গামণির বুকটা কেমন টিপ্-টিপ্ করে ওঠে। চারদিকে যে-সব কাণ্ড কানে আসে তাতে ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। একটা দিনও যেন আর কাটিতে চায় না। বাঁদুজ্ঞে-মশাই-এর বাড়ি থেকে চাল-ভাল-ছন-তেল সিঁধে আসে বটে, কিন্তু শুধু খাওয়াটাই কী সব? শুধু খেলেই কি শান্তি?

তা বেশি দিন আর ভয়ে ভয়ে কাটাতে হলো না। একদিন ভোরবেলা কাক-পক্ষী জাগবার আগেই হঠাৎ দরজার ওপর ধাক্কা পড়লো।

গয়লা-বউই প্রথমে বললে—কে?

—আমি নিবারণ!

ধড়মড় করে উঠে পড়েছে গঙ্গামণি! গয়লা-বউ দরজা খুলে দিয়ে বললে—বড় ভাবিয়ে তুলেছিলে বাবা তুমি, মেয়ে তো ভেবে ভেবে অস্থির তোমার অন্তে—

গয়লা-বউ বাইরে চলে যেতেই গঙ্গামণি তাতাতাড়ি পা-ধোবার জল নিয়ে এল। এসে পা ধুয়ে দিলে। বললে—কী ভাবনাতেই যে পড়েছিলুম—

নিবারণ বললে—কেন ভাবনা কেন?

গঙ্গামণি বললে—ভাবনা হবে না ? জানো কর্তার বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—

ডাকাত ? ডাকাত গুমনি পড়লেই হলো ? ডাকাত কী করবে ?

গঙ্গামণি বললে—আর একটু হলে যদি চালে আগুন ধরিয়ে দিত ?

নিবারণ গামছা দিয়ে পা মুছতে মুছতে বললে—আগুন অমনি ধরিয়ে দিলেই হলো ? আমি যে দণ্ডি কেটে দিয়ে গিয়েছিলুম।

—দণ্ডি ?

নিবারণ বললে—হ্যাঁ, আমি যে ঘাবার আগে দণ্ডি কেটে দিয়ে গিয়েছিলুম। দণ্ডির ভেতরে ঢুকে ডাকাতের সাধা নেই কিছু করে—ডাকাতেরও কিছু করতে পারবে না। আর চারদিকে যে এত মহাহারী হয়েছে, তা গরান্বাটিতে কিছু হয়েছে ?

গঙ্গামণি অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—সত্যি ?

নিবারণ বললে—সত্যি না তো কি মিথ্যে ? এই দেখ না, এবার জীবন চৌধুরীর কী হয় ! মূর্খিলাবাসে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে এসেছি—

—কী বন্দোবস্ত করে এলে ?

নিবারণ বললে—এবার সিরাজউদ্দৌলাই নবাব হবে—সব বন্দোবস্ত পাকা—

(ক্রমশঃ)

শক্তিশালী জুগার

অনেককাল আগেকার কথা। ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জুগার। তাঁর নাম তোমরা হয়ত অনেকই শোননি। যৌবনকালে তাঁর মত অগাধস্ত বলশালী লোক পৃথিবীতে খুব কমই ছিল। তিনি যে আফ্রিকার জঙ্গলে কত বাঘ সিংহ মেরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি এমন দৌড়তে পারতেন যে ঘোড়াও তাঁর কাছে হার মানত। ঐ দেশের আর একজন দৌড়বাজ খুবকের সঙ্গে একবার তাঁর প্রতিযোগিতা হয়। স্থির হয় যে তাঁরা উভয়ে ১২ ঘণ্টা অনবরত ছুটবেন। কিন্তু ঐ খুবক ১১ ঘণ্টা ছোট্টার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং জুগার ১২ ঘণ্টা দৌড়ানোর পরও ক্লান্ত না হয়ে বয়ঃ পথে একটি সিংহের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন। ঐই ঘটনা সারা পৃথিবীকে তখন আশ্চর্য করে দেয়।



পশুরাজ কে ?

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

পশুরাজ কে, এই প্রশ্নের সহজ ও সাধারণ উত্তর সিংহ !

আকৃতি ও প্রকৃতিতে, আফ্রিকার বনের পরিবেশে বিশেষ করে, সিংহেরই রাজ্যাসনের যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ও পুরাতনের উপাখ্যানেও সিংহকেই পশুরাজ বলা হয়েছে। বিদেশী লেখকদের মধ্যে হার্ন এ বিষয়ে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঐ একই মত দিয়েছেন।

একজন বিখ্যাত শিকারী ও লেখক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিশেষ দিনের ঘটনার বিবরণে দিচ্ছেন যে, সিংহ সাধারণ হিংস্র শাপল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। ঘটনাটি এই রকম :—

পূর্ব আফ্রিকার এক অঞ্চলে "শাকারি"—অর্থাৎ শিকার ও ভ্রমণ—করতে গিয়ে একবার তিনি এক বিশাল জঙ্গলের মধ্যে জলু জাতীয় আদিম শিকারী ও পশুপালকদের গ্রামে গিয়েছিলেন। জায়গাটা শিকারের পক্ষে ভাল এবং সেখানের আদিম অধিবাসীদেরও সহজ সরল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বভাব দেখে তিনি সেখানে কিছুদিন তাঁবু ফেলে বাস করেছিলেন, শিকার ও লেখার মালমসলা

যোগাড় করার চেষ্টায়। সে অঞ্চলের লোকের ভাষাও তিনি বুঝতে ও বলতে পারতেন, হতরাং তাদের জীবনের নানা দিক দেখে শুনে তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল। তারা প্রায় সবাই সাহসী ও সোজা প্রকৃতির লোক ছিল। খোলা প্রান্তরে গরু ভেড়া ছাগল চরিয়ে, শুধু বর্ষা ও মৃগুর নিয়ে বনের পশু মেয়ে তাড়িয়ে তাদের পুরুষদের দিন চলতো। মেয়েরা সারাস্ত ফলমূল ভুট্টা জোয়ার ইত্যাদির চাষ করে, গরু ছাগলের দুধ দিয়ে সংসারের সব দিক দেখতো। এদের পুরুষদের নিতৌক বীরত্বের কথা বিদেশীদেরও জানা ছিল এবং অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে সেই বীরত্বের কাহিনী আফ্রিকার ইতিহাসেও আছে।

যে দলের গ্রামে এই ইংরাজ লেখক ছিলেন সে দলের সর্দারের এক ছেলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাব হয়। সে ছেলের বয়স শুধুমাত্র ২৬২৭ বৎসরের মত। বলিষ্ঠ, উন্নতশির ছয় ফুট লম্বা শরীর, কথাবার্তা সহজ ও সরল, চোখের চাহনি বোলামেলা, সে যেন স্বভাবজাত রাজপুত্র। ব্যবহারেও তাঁর উদার হৃদয় মনের পরিচয় দিত। এই লেখক তার সঙ্গে ঘুরে ঘিরে খুবই বন্ধুত্ব পাতিয়ে কেন্দ্রলেন অল্পদিনেই।

পরিচয় একটু বেশী হতেই লেখক জানলেন যে, তাঁর ঐ বন্ধুর বিয়ে হয় নাই যদিও তার সমবয়স্ক প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এবং এটাও লক্ষ্য করলেন যে, যদিও তার সঙ্গে কারও অসন্তোষ নাই তবুও অন্তরঙ্গ বলতে চার পাঁচ জন সমবয়স্ক ছাড়া আর কেউ নেই। নিম্নের পরিবারেও সে যেন একটু খাপছাড়া হয়ে আছে। এরকমটা কেন হয়েছে তার কারণ জিগেস করতে লেখক-মশায় ঐ সর্দারের এক আত্মীয়ের কাছে শুনলেন, ছেলেটার আর সবই ভাল কিন্তু তার স্বভাব যেন কেমন একটু অন্তরঙ্গের এবং সেইজন্যেই তার বিয়েও হয়নি—যদিও বিয়ের বয়স হয়েছে এবং ওকে বিয়ে করার মত পাত্রীও আছে ভাল—এবং অন্য সকল সমসর্গারের যুবক ও পূর্ববয়সের পুরুষদের সঙ্গেও সে মিশতে পারেনি। কারণটা আরও খুলে বলতে বলার আত্মীয়টি বলেন :—“আমাদের জাতের নিয়ম অনুসারে বোদ্ধা শ্রেণীর পুরুষমাজেই তার পৌরুষের পরিচয় দেয় সিংহের সঙ্গে লড়ে। এ ছেলে শরীর, সামর্থ্য ও বংশ হিসাবে বোদ্ধা, কিন্তু ও কিছুতেই সিংহের সঙ্গে লড়তে চায় না। হয়তো সেটা ওর জেদ বা খেয়াল, কিন্তু ক্রমে তাতে ওর কাপুরুষ অপবাদ রটতে পারে। ওর বিয়ে হবার বাধাও হচ্ছে ঐ কারণেই এবং সবটা জড়িয়ে এটা আমাদের লজ্জার কারণ পাড়াচ্ছে। ওর গারে রাজবস্ত্র রয়েছে সেটা ওর বোকা উচিত।”

ব্যাপারটা বুঝে, লেখক মশায় সেই সর্দার পুত্রকে জিগেস করলেন, কেন সে সিংহের সঙ্গে লড়তে চায় না। তাতে সে উত্তর দিল : “বেশ, আমি উচ্চবংশের বলে আমার মানমর্দাদ আছে, সাহসী বীরের সন্তান বলে আমি গৌরবের অধিকারী, এ সব আমি জানি। কিন্তু সিংহও

কি ঠিক তাই নয় ? সেও কি পশুর রাজকুলের বংশধর বলে, সাঁহসী ও তেজস্বী বলে, গরীয়ান নয় ? আমাদের যেমন এ সকলের উপর অধিকার আছে, ওরও কি তেমনই সকলের এলাকায় আধিপত্য নেই ? তবে অকারণে আমি ওর সঙ্গে শত্রুতা করতে বাব কেন ?”

একথা শুনে লেখক চূপ করে গেলেন, কিন্তু সর্দার পুত্রের বন্ধুদের মধ্যে এক বিশালবক বোচ্চা দাঁত মাঝা গায়ে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে চিহ্ন দেখা বাজিল—মাথা উঠু করে তার দিকে তাকিয়ে বলে, “ঠিক কথা, কিন্তু আমরা যদি ওদের সঙ্গে লড়ে এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে না দিই যে আমাদের অধিকার কোথায়, তবে আমাদের গল্প ভেড়া ছাগল কি একটাও থাকবে ? সে সব আছে শুধু এই কারণে যে, সিংহেরা জানে আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তু মারা মানে, তাদের নিজের মরণ ডেকে আনাব সমান। এই অধিকার রক্ষার ক্ষমতা ও সাহস তোমার আছে কিনা তার প্রমাণ না দেওয়াতেই তো তোমার মর্যাদা বাজে। তুমি কি চাও যে তোমার অধিকার অস্ত্রে নেয় এবং তোমার উপযুক্ত যে পাত্রী তাকে অস্ত্রে বিয়ে করে ?”

বন্ধুর কথা শুনে সর্দার-পুত্র খানিক চিন্তা করে খুব সহজ ভাবেই বলল :

“তোমার কথাই ঠিক। বেশ, কাল সকালেই আমি প্রমাণ দেব। তোমরা সব ব্যবস্থা কর।”

এ কথা বলে সে সম্পূর্ণ অস্ত্র কথা পাড়লো, যেন সিংহের সঙ্গে শুধু বর্ষা আর চামড়ার ঢাল নিয়ে লড়াই একটা তুচ্ছ ব্যাপার। বন্ধুর দলও গভীরভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। কিন্তু তাদের চোখের চাউনি ও গবিত পা-কেলার ধরনে বোঝা গেল তারা কি পরিমাণে খুশি হয়েছে এ ব্যবস্থায়।

রাজ্যে সর্দারের সেই আত্মীয় ধনুর্বাণ জানালেন লেখক-মশায়কে এই কথা তোলার ক্ষেত্রে। তিনি বললেন; “পরদিন সকালেই অস্ত্র দূরের সকলে ঐ পরীক্ষা হবে এবং লেখক যেন তৈরী থাকেন ওদের সঙ্গে যেতে, এ কথা বলতেও তিনি ভুললেন না।” লেখক যে রাজী হলেন ঐ পরীক্ষা দেখতে যেতে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরদিন খুব ভোরে তৈরী হয়ে হাতে ভাল ম্যাগাজীন রাইফল নিয়ে লেখকমশাই তাঁর খেকে বেরিয়েই দেখলেন যে, সর্দারের ছেলে তার পাঁচজন বন্ধু এবং তিনজন বয়স্ক পুরুষ সঙ্গে নিয়ে সিংহের সঙ্গে লড়াইতে যেতে প্রস্তুত হয়ে, ওর ক্ষেত্রে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের সঙ্গে পুরা হুন্ডের অস্ত্রশস্ত্র। হাতে আসে-গাই (লম্বা কলা দেওয়া বর্ষা) ও বেহের সমান লম্বা ঢাল। তাদের সাজসজ্জাও হুন্ডে বাওয়ার মত—সে এক অপক্লপ দৃশ্য ! সাহেব বেরোতেই সবাই এগিয়ে চললো দূরের পাহাড়তলীর দিকে। লেখক শুনলেন সে দিকে এক সিংহ দলের আওয়ান, ভোরের দিকে গেলে তাদের দেখা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাঁরপর বা হয় একটা ঘটবেই। সর্দারের ছেলের মুখ প্রশান্ত, তবে

তার এই আফালনের ফ্রাবাে দলপতি সঙ্গ সঙ্গই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেধে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং সেই তলাটে কাপতে থাকলো ভীষণ গর্জনের নিমানে ও গুই বিরাট ঝাপড়ের প্রবল হাঁকডাক লক্ষ্যবন্দ ও মারধোরের শব্দে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো যে দলপতির প্রচণ্ড মার ও কামড় খেয়ে অস্ত্র সিংহটা দাঁড়াতে পারছে না। এক বিষম ধাক্কা মারের পালা চললো। সবশেষে দুজনই পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মার ও পাটা মার চালালো অল্পক্ষণ; তারপর অস্ত্র সিংহটা ছিটকে পড়া বাক্তই নোড় দিয়ে খোয়াইয়ের পাড় বেয়ে উঠে পালিয়ে গেল। দলপতি সে দিকে ফিরে স্থির হয়ে দেখলো এবং তারপর ধীর চালে খোয়াই পার হয়ে, যে দিকে আমাদের সর্দার পুত্র এবং তার পিছনে বোদ্ধার দল দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে উঠে এগিয়ে এলো। অল্প এগিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্ট ভঙ্গীতে মাথা তুলে জুলু ঘোড়াদের বানিক দেখে সে ফিরতে বাচ্ছে এমন সময় সর্দার পুত্র কয়েক পা এগিয়ে হাঁক দিল— “হো ইতুনা (সর্দার) দাঁড়াও একটু! তুমি আমার বোগ্য বন্ধু, আমি তোমার সঙ্গে মিতালি পাতাব।” এই বলে সে তার বর্ণী চাল নামিয়ে রেখে, সম্মুখে ফুলহুড় একগোছা ঘাস তুলে, (জুলুদের শাস্তি ও মৈত্রীর প্রতীক), হুঁহাতে সামনে ধরে, সোজা সম্মুখ গতিতে এগিয়ে গেল সেই ভয়ানক দুর্দান্ত জীবের কাছে। যখন প্রায় মুখোমুখি তখন সে সিংহের দিকে তাকিয়ে বলে, “সাবান বন্ধু! তোমার জয় হোক।” এই বলে সে ঘাসের গোছা নিয়ে সিংহের প্রায় মুখের কাছে রাখলো।

হাঁক শুনেই সিংহ সোজা ও সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সর্দার পুত্রের অস্ত্র ফেলে ঘাসের গুচ্ছ তোলা এবং পরে এগিয়ে কাছে চলে আসা, সবই সে দেখলো অপলক দৃষ্টিতে এবং অচল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। শুধু তার ক্ষিত কেশর, ঘন নিঃশ্বাস এবং দেহের খাড়াটান ভাবভঙ্গীতে বুঝা যাচ্ছিল যে তার যুদ্ধের উত্তেজনা তখনো দায়নি।

অস্ত্র মিকে সর্দারের সঙ্গীর দল তাদের বন্ধুবাবের ঐ কাণ্ড প্রথমে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে দেখলো। তারপর সে যতই এগোতে লাগলো সেই দাক্ষাৎ যমের মত প্রকাণ্ড উত্তেজিত সিংহের দিকে, সঙ্গী বোদ্ধারদলও চাল ও বর্ণী দ্বারা মৃষ্টিতে ধরে নিঃশব্দে ও নিশ্চল অবস্থাতেই তীর লাগানো ও গুণটানা ধমুকের মত উচ্চত ও জাগ্রত চেতন অবস্থায়, অথটনের জন্ত প্রস্তুত হতে থাকল। তাদের নিঃশ্বাস-প্রবাসে, তীব্র ও তীক্ষ্ণ চাহনিত্তে এবং শরীরের মাংসপেশীর কঠিন ও কম্পমান অবস্থায় জানান দিতেছিল যে তাদের উৎকর্ষ ও উত্তেজনা সর্দার পুত্রের প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সমানে বেড়ে চলেছে। সাহেবও প্রথমে হতভম্ব হয়েছিলেন, পরে যত সম্ভব নিঃশব্দে রাইফেলের বোন্ট টেনে ত্রীচের মধ্যে গুলি ভরে নিয়ে আগ্র বিপদের জন্তে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

সদারপুত্র যখন সিংহের মুখের সামনে, সামান্য ছ'হাত তুলতে, নু'কে ঘাসের গুচ্ছ রাখলে, তখন একমুহুরে ছ'শাততনের সঙ্গে মিশ্রিত টেনে আটকানোর শব্দে নাহেব চমকে দেখলেন যে, ঘোড়ার চলার শব্দই বিষম উত্তেজনাও ধরধর করে কাঁপছে। আবার সামনে ফিরে তাকিয়ে নাহেব দেখলেন, সদারপুত্র ঘাসের গুচ্ছ সাজিয়ে বেগে দৌড়া হয়ে দাঁড়ালো। এক মুহুরের ভিত্তি সিংহ ও মাড়ব হির হয়ে পরস্পরকে দেখলো, তারপরই সর্দারপুত্র পন্টার লেপাইয়ের মত, নিবেদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঘুরে সিংহের দিকে পিছন ফিরে, সহজগতিতে তার সঙ্গীদের দিকে চলে আসতে লাগলো। তার পিছনে যে এক সাফাং বনের মত ভয়ঙ্কর উত্তেজিত সিংহ, রয়েছে একথা যেন তার মনে স্থানও পায়নি, এরকম ভয়ঙ্কর শাস্ত প্রদর্শনভাবে সে এগিয়ে এলো।

এক সিংহটার রক্ত গরম হয়ে আছে লড়াই দাঙ্গা করে, উপরন্তু মাছুষটা পিছন ফিরে চলেছে, এতো মরণ ভেঁকে আবার সামিল! বিপর্যাস ভ্রমে নাহেব রাইকেল বাগিয়ে ধরছেন, এবং অন্তরাণ্ড লাকিয়ে এগোবার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে যে সময়, তখন এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে তাক লেগে গেলো সবাই। সকলে দেখলে, যে সিংহটা প্রথমে হিরভাবে সর্দারপুত্রের পিছন ফিরে চলে যাওয়া দেখলো, পরে সে এক পা এগিয়ে মাথা তুলিয়ে সেই ঘাসের গুচ্ছ শু'কে আবার সেখানে দাঁড়িয়ে হির দৃষ্টিতে আর একবার সর্দারপুত্রের দিকে তাকালো। তারপরই সে নালার দিকে ফিরে মম্বর তুলকি চলে নিজ পরিবারের সঙ্গে যোগ দিতে বসেছিল। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দিকের চলার উদ্বেগ-উত্তেজনাও গেল এবং সবাই নিঃশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হোলো। সর্দার পুত্র ফিরে এলে তার ঘোড়া সঙ্গীদের মধ্যে বয়োঃজ্যেষ্ঠ যে সে শুধু প্রসন্ন মুখে বললে—“হী, তোমার গায়ে রাক্ষরক আছে বটে!”

নাহেব দেখলেন অন্ত সকলের মুখও আনন্দে, সম্মুখে ও সম্মুখের ভঙ্গীতে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝলেন যে এই মিতালি পাতামোর কাণ্ডটায় ঐ দুর্ধর্ষ জলু ঘোড়াদের কাছেও অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছে, এবং সর্দার পুত্রের সম্পর্কে সন্দেহ বা অপবাদের লেশমাত্রও আর নেই কাকুর মনে। সকলেই খুশি মনে ফিরে চলেন গ্রামে।

নাহেব লিখেছেন তার ঐ অসাধারণ জলু বুঝক বন্ধুরই কথা। সেই সঙ্গে সিংহকে পশুরাজ কেন বলা হয় তারও একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই সত্য ঘটনা বলে লেখা কাহিনীতে। যদি এই বিবরণ সত্য ঘটনারই হয়, তবে বলতে হবে সিংহ অন্ত সকল হিংস্র বাঘের থেকে বেশ কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। অন্ত কোনও বনের হিংস্র পশু ঐ রকম পরিবেশে বাহুর মিতালির আস্থান অত সহজে গ্রহণ করতো না এটা নিশ্চয়। এই রকম নানা কথা কাহিনীতে দেখানো হয়েছে যে,

প্রাচ্যের ব্যাপ্তবাহী। শক্তি-সামর্থ্যে, ধূর্ত রক্তপিপাসু ও হিংস্র প্রকৃতির সত্ত্বে এবং শিকারে সাহস ও দক্ষতার কারণে, এর খ্যাতি সিংহের চাইতে অনেক বেশী।

প্রাগৈতহ্যবিদেরা বলেন যে, আমাদের দেশ ছিল সিংহেরই এলাকা এবং এদেশের আবহাওয়া সিংহেরই উপযোগী। এখানে পুরাণ ইত্যাদিতে সিংহের নামই সাধারণভাবে পাওয়া যায়, বাঘ বা শাহালের নাম কচিৎ কদাচিৎ উল্লেখিত হয়েছে। জীব-বিজ্ঞানী পণ্ডিতদের মতে বাঘ উত্তর এশিয়া থেকে এসে সিংহ তাড়িয়ে রাজত্ব দখল করেছে। অবশ্য দু'ব প্রাচীনকালে, আদিম মানুষের যুগে এই সব অঞ্চলে 'বজ্রদন্ত' বাঘ (sabre tooth Tiger) নামে এক প্রকাণ্ড ও ভীষণ শাপন ছিল যার দেহের গঠন ছিল কতকটা চিতাবাঘের মত, যদিও আকারে সেটা বাঘের চাইতে বড়ই ছিল। প্রাগৈতহ্যবিদেরা বলেন যে, বাঘের আক্রমণের সাহসে শীড়াতে না পেয়ে সিংহ ক্রমে ক্রমে হটে বাঘ—এদেশের মজল ও প্রান্তর থেকে। তবে শত বৎসর পূর্বেও যে সমস্ত উত্তর ভারতের বনে-জঙ্গলে ও পার্বত্য এলাকায় অসংখ্য সিংহ ছিল, তারও বহু প্রমাণ আছে।

৪ঠা মে

সেন্ট. জন এথুলেন্সের পতাকা দিবসে

মুক্ত হস্তে দান করে আর্থের সেবায়

সহায়তা করুন।



টেরিয়ার শ্রীবিমল দত্ত

পুষেছি এক টেরিয়ার
বলছি শোনো কেরিয়ার—
নবাব যেন এশিয়ার
ক'রে বেড়ায় খেচ্ছাচার।
কুশন 'পরে শয়ন তার
ধমক দিলে মুখটি ভার।
এই আমাদের টেরিয়ার !

পিনের মত দাঁতের ধার
সুড়সুড়ি দেয় পায় সবার।
সবার যেন সে ইয়ার—
অত্যাচারী—দিনেমার !
ছোট ছুটি আঁখি তার
ছুট্টমিতে একোয়ার—
এই আমাদের টেরিয়ার !

ঘুরছে বাড়ীর চারিধার
একটি ছুটে পগার পার।
ধরতে গেলে নাইক আর—
টিকির নাগাল পাওয়াই ভার।
ভয়-ভাবনা নাইক তার
টানছে আঁচল দিদিমার।
এই আমাদের টেরিয়ার !

ছোট্ট মোদের টেরিয়ার
ফন্দি জুতো চিবোবার—
কোথায় দিদির কফটার
ভ্যানিটি-ব্যাগ্ কোথায় মার ?
নামের ঝুলি ঠাকুর্দার,
সুতোয় গুলি মাসীমার ?
দেখ্ দেখ্ দেখ্—কোথায় আর !
সাব্ ড়েছে এই টারিয়ার !

সাবান-খেকো জানোয়ার—
নয়ক দৈত্য দানো আর
বাড়ীর সবার পপুলার—
পুতুলরাণীর গলার হার
টুকুন্ সোনা নামটি তার
নিন্দে করে সাধি কার
এই আমাদের টেরিয়ার !

অভিধান দেখা

ত্রিভোগেশচন্দ্র বাগল

তোমরা হয়ত কথার কথার ‘ডিক্শনারী’ বলে থাক। এটি ইংরেজী শব্দ, এর বাংলা মানে ‘অভিধান’। ইংরেজীতে অভিধানের সংখ্যা প্রচুর। বড়, ছোট, যাকারি কত অভিধানই আমরা দেখতে পাই। বাংলা ভাষায়ও অভিধান কিছু কিছু রয়েছে। আরও নতুন নতুন কত অভিধান হতে পারে। সংস্কৃতে অভিধানকে বলা হয় ‘কোষ’ বা কোষ-গ্রন্থ। আগেকার দিনে এটিকে বিজ্ঞার একটি অঙ্গ বলে ধরা হ’ত। টোল ও চতুশ্চাঠীতে যেমন কাব্য ও ব্যাকরণ পড়ান হ’ত, তেমনি কোষগ্রন্থও অলাদা করে পড়বার বেওয়ারাজ ছিল। আধিকার যিনের স্থল-কলেজে ইংরেজী বাংলা অভিধান পড়ানর রীতি নেই।

তবে কি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে? এর উত্তরে তোমাদের এই কথাই বলব—না, এর প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও কমেনি, বরং দিন দিন বিবিধ বিজ্ঞার চর্চা বেড়েই চলেছে, আর সেই সঙ্গে নতুন নতুন শব্দেরও আমদানী হয়েছে। এর মানে সব আমরা পাব ঐ অভিধানে।

ছেলেবেলা থেকেই এই অভিধান দেখা অভ্যাস করা দরকার। তোমরা পড়ার বই-এ কত নতুন নতুন শব্দ পাও। গুরু বা শিক্ষক মশাই ক্লাসে তার মানে ক্ষুদ্র বলে বান। তা সব তোমরা তখন-তখনই মনে ধরে রাখতে পার না। আবার বাড়ীতে বসে মানের বই থেকে তোমরা সেই নতুন শব্দগুলির অর্থ কিছু শিখে নাও। কিন্তু শব্দের ঠিক ঠিক মানে মনে করে নিতে হলে, শব্দের আসল মানেটি জানতে হলে, অভিধানের সাহায্য নেওয়া তোমাদের একান্ত দরকার।

আমাদের ছেলেবেলার স্তন্যদাম, কেউ কেউ ইংরেজী চেম্বার্স ডিক্শনারী প্রায় সবটাই মুখস্থ করে ফেলেছেন। তোমরা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবে। কিন্তু তখন এমন একটি ব্যাপার চোখে দেখেছি যার ফলে এ কথার আমরা আদৌ বিম্বিত হইনি। আমরা তখন চতুর্থ শ্রেণীতে (ক্লাস ফোর) পড়ি। আমাদের ইংরেজী পড়াতেন অক্ষরবাবু। তাঁর পুরো নামটি এত দিন পরে আর মনে করতে পারি না। তবে তাঁর চেহারা চোখের সামনে জল্ জল্ করছে। বেশ মোটামোটা, ভারি কি মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি আমাদের ক্লাসে বসেনই আসতেন, দেখতাম সঙ্গে চেম্বার্স ডিক্শনারী। এখানি তখনকার দিনে “ইংরেজী

অভিধান রূপে বেশ চানু ছিল। আমাদের পড়া দিয়ে—কখন কখন টাক্ করতে বলে তিনি এক মনে ঐ অভিধানখানি পড়তেন। অনেক কানায়ুবা করত এখানির অর্ধেকই নাকি তাঁর মুখ!।

অক্ষয়বাবুকে ছেলেবেলায় ঐরূপ অভিধান দেখতে বা পড়তে দেখে আমাদের একটা পরোক্ষ লাভ হয়। কয়েক বৎসরের ভিতরেই আমরা—অন্ততঃ আমাদের কেউ কেউ অভিধানের গৌড়া হয়ে উঠি। নিম্নের কথা তোমাদের একটু বলি। তখন ঘট্ট শ্রেণীতে (ক্লাস সিক্স) উঠেছি। কি জানি কেন, প্রথম থেকেই দ্বির করি এবারে আর কোন মানের বই কিনব না। বৈদ্যনাথব গান্ধীজীর ইংরেজী বাংলা অভিধান কেনা হ'ল। এ বছরের ইংরেজী বই-এ দেখি বিশ্বর নতুন শব্দ। দীর্ঘরাত্রি জেগে অভিধান দেখে দেখে ইংরেজী শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ বের করতাম এবং একখানি খাতায় সবগুলি টুকে রাখতাম। এতে এত সময় কেটে যেত যে, রাত্রে আর কিছুই পড়া হ'ত না। তবে এই রকম অভিধান দেখার ফলে আমার ইংরেজী শব্দগুলির বিভিন্ন রূপের অর্থের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকে। এই অভিধান দেখার প্রেরণা পাই অক্ষয়বাবুর নিকট থেকে।

কলেজে পড়ার সময়ের কথাও তোমাদের একটু বলি। সিটি কলেজে এসে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হলাম। কয়েকজনই আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। তাঁদের ভিতরে অধ্যক্ষ হেরথচন্দ্র মৈত্রের কথা তোমাদের বলব। তিনি দু-চার লাইন পড়াতেই অভিধান আনবার আদেশ দিতেন বোয়ারাকে। দেখতাম ঘণ্টা শেষ হওয়ার মুখে তাঁর সামনের টেবিলটি অভিধানে ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু অভিধান কেন, পড়া বোকাবার জন্তে অস্ত্রান্ত বইও আনাতেন। পড়াতে পড়াতে বেখানেনই একটি নতুন শব্দ পেতেন, অভিধান দেখে ঠিকঠিক মানে বের করে আমাদের বলতেন। বার বার অভিধান দেখার বক্তৃতার ছেদ পড়ত বটে, কিন্তু তিনি বড়টুকু পড়াতেন তাতে আমাদের মনে দাগ কেটে যেত। অমন করে অভিধান দেখার কথা জীবনে ভুলতে পারিনি।

অভিধান দেখার অভ্যাগটি কিন্তু প্রথম থেকেই তোমাদের করে নিতে হবে। সেদিন এক বন্ধুর মুখে একটি কাহিনী শুনলাম। কাহিনী হলেও সত্যি। তোমরা জানেনক্রমোহন দাসের নাম শুনেছ কি? এখনও না শুনেলে পরে হয়ত তাঁর কথা জানবে। গতমুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সাংবাদিক নানাবিধ সরকারী চাকুরে ছিলেন তাঁরা। ইংল, কলেজ, হাসপাতাল কতই না তাঁরা স্থাপন করেন। ব্যবসা করতেও যে কেউ কেউ না গিয়েছেন এখন নহ। জানেনক্রমোহন দাস জায়গা থেকে "খোজু-খবর নিয়ে তাঁদের জীবনী লিখতেন। 'প্রবাসী'তে তার প্রায় সবটাই আগে বের

হয়। তিনি পরে এগুলি নিয়ে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' বই প্রকাশ করেন। তবে তাঁর প্রধান কাজ ছিল কিন্তু অল্প ধরনের। একখানি বড় বাঙালী অভিধান সংকলন করে তিনি অমর হয়েছেন। কাহিনীটি তাঁর সম্বন্ধেই।

ছেলেবেলায় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পড়ার কৌশল ছিল খুবই। তিনি নতুন নতুন বই পড়তেন, আর তাতে কত নতুন শব্দ তাই দেখতেন। কিন্তু ক'টা শব্দেরই বা তিনি মানে আনেন? বড়দের নিকট আনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাদের মুখে তিনি প্রায়ই এই কথা দুটি শুনতেন— "অভিধান দেখ।" তিনি নতুন শব্দ পেলেই অভিধান দেখতেন। এতে করে খালি শব্দের মানেই জানা হ'ত না, বিশ্বের নতুন নতুন শব্দও তিনি আয়ত্ত করে ফেলতেন। এর ফলে, বাঙালী সাহিত্যের শব্দ সম্পর্কের তিনি হয়ে ওঠেন একজন প্রধান ভাণ্ডারী। এ সময় থেকে একখানি ভাল অভিধান সংকলনের কথাও তাঁর মনে জাগে। বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে তিনি একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান সংকলনে সমর্থ হন। বাংলা ভাষার বড় অভিধান রয়েছে এখানি তার শীর্ষস্থানে বলা চলে।

অভিধান দেখার কৌশল আরম্ভ করতে হবে ছেলেবেলা থেকেই। বড়দের নিকট থেকেই এ কৌশল মেনে নিতে পার। আগ্রহাল মানের বই-এর চড়াছড়ি। ঘেঁষি ছেলেমেয়েরা এর উপরই বেশী নির্ভর করছে। অভিধান দেখার কথা এখন যেন আর মনেই আসে না। এ কিন্তু ভাষা শেখার পক্ষে মস্ত বড় কাঁটা, বাধাও বলতে পার। ম্যাট্রিক পাশ একটি ছেলেকে বহু বছর আগে অভিধান ঘেঁষে একটা শব্দের একটি মানে বের করতে বলি, কিন্তু কিছু সময় অপেক্ষা করে ঘেঁষি সে তখনও অভিধানের পাতা হাতছাড়ে! অর্থাৎ কিনা সে অভিধান ঘেঁষতেই শেখেনি। কি গছার কথা। ডোমরা কিন্তু অভিধান দেখা অভ্যাস করবে নিশ্চয়ই।

পোর্ট্রেট-লিথোগ্রাফ বা স্মার্টফকনি

প্রায় তিনশ' ছেচক্লিপ বছর আগে ইংলণ্ডে (পোর্ট্রেট-লিথোগ্রাফ) রাজকবির পদের সৃষ্টি হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু লেখক এই সম্মানের পদ লাভ করেছেন। ১৬১৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বেন জনসন প্রথম পোর্ট্রেট-লিথোগ্রাফের সম্মান লাভ করেন। মহাকবি সেক্সপীয়ার যে বছর দেহত্যাগ করেন, সেই বছরেই এই পদটির সৃষ্টি হয়। বেন জনসনের পর রাজকবি হন স্যার উইলিয়াম ডেনাস্ট। ইনি থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন এবং ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে প্রথম মেরেদের নিয়ে অভিনয় প্রচলিত করেন। এরপর ড্রাইডেন, সাপে ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ব্যক্তির রাজকবির সম্মান লাভ করেন। এই পদ সম্মানের হলেও, অনেকে এই পদ পেতেও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উৎসব-মুখর ইংল্যান্ড

শ্রীমতী মকুলা ঘোষ

উৎসব মানেই আনন্দ। আর আনন্দই জীবনকে হৃদয় ক'রে তোলে। মানুষের জীবন আজ নানান সংঘাত ও সংগ্রামের মাঝে জড়ান। এ সবকে দূরে সরিয়ে মানুষের মন সত্যিকার আনন্দ চায়। কিন্তু সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনের ধারা ও গতি সহজ নয়—জটিলতার ভরা। তাই উৎসবের দিনে মানুষের মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। শুধু আমাদের দেশ কেন—সব দেশেই উৎসবের আবেদন সমান ভাবে সকলের মনে নাড়া দেয়।

এ দেশেও শীতের তুহিন স্পর্শ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসব-মুখর হয়ে ওঠে। England, Scotland, Wales এবং Ireland সব স্থানেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশিষ্টতা নিয়ে এই উৎসব অঙ্গুলিত হয়।

এ দেশে বসে উৎসব অঙ্গুলিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে ওয়েলস-এর Llangollen-এর জুলাই-মাসের উৎসবটি সত্যিই অভিনব। Unesco-র ডিরেক্টর জেনারেল Dr. Luther Evans এই উৎসব দেখবার পর বলেছেন যে, ওয়েলস-এর অতীত সভ্যতা এই উৎসবের মাঝে বিকাশ লাভ করেছে। এই উৎসবের মাধ্যমে ওয়েলস-এর বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই উৎসবের আবেদন ওয়েলস-এর সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের অঙ্গতম উৎসবের পর্দায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ধারা এই উৎসবে যোগদান করেছেন, তাঁরা সবাই Dr. Luther-এর এই উক্তির সঙ্গে একমত হবেন।

Llangollen ওয়েলস-এর একটি ছোট্ট শহর। খরতোষা Dee নদী এই শহরের কোল ঘেঁষে একৈক্যে চলে গেছে। Dee নদীর উপর চতুর্দশ শতাব্দীর সেতুটি বহু পুরাতন হলেও—বর্তমান কালে এটি বিশ্ববৈজ্ঞানিক ও সৌন্দর্যের মিলনসেতু হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই উৎসব পালনের পেছনে একটি চমৎকার ঘটনা লুকিয়ে আছে। Mrs. Eleanor Butler এবং Miss. Larah Ponsonby দু'জনেই আহার্যল্যাপ্তের সম্রাজ্ঞী বরের মেয়ে। পারিবারিক অশান্তির জন্য নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে Llangollen-এ পালিয়ে আসেন আজ থেকে দু'শত বৎসর আগে। Llangollen-এর অধিবাসীরা এই অতিথিদের সাধব অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের গ্রহণ করেন। এই দুই অতিথির আগমন উপলক্ষ্য-করে বছরের পর বছর উৎসবের মাঝে আজ বিশ্বের সবাইকে তারা আঙ্গান জানায়। এবারের উৎসবে ত্রিশটির উপর জাতি তাদের জাতীয় পোশাকে, তাদের

নিজস্ব পরীক্ষাতি ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে উৎসবকে মাতিয়ে তোলে। তাছাড়া ছয়দিনব্যাপী এই অস্থানে সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত হয়।

Llangollen-এর উৎসব ছাড়া গ্রেটব্রিটেনে আরও বহু উৎসব অঙ্গীকৃত হয়ে থাকে। তবে লণ্ডন থেকে বাইরের শহরগুলিতেই বেশীভাগ উৎসব অঙ্গীকৃত হয়। লণ্ডনের উৎসবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আগামী পঞ্চবার্ষিক চলচ্চিত্র উৎসবের কথা। কিছুদিন বামেই এ-উৎসব শুরু হবে। এ উৎসবে দেখান হবে বিভিন্ন দেশের নামকরা বা পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি।

আগেই বলেছি শীতের শেষ হতেই যে উৎসব শুরু হয়, সে উৎসব চলতে থাকে বিভিন্ন স্থানে হেমস্তের শেষ অবধি। বেশীভাগ ক্ষেত্রেই এই সব উৎসব-চলে এক সপ্তাহ ধরে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছ'তিন সপ্তাহ ধরেও চলে। আবার Glyndebourne, Pitlochry এবং Stratford-upon-Avon-এর উৎসবগুলি মাসের পর মাস ধরেই চলে।

এবার এদেশের কয়েকটি বিশেষ উৎসবের কথা বলছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে Aldeburgh-এর সংগীত ও কলা-উৎসব। লণ্ডন থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে এই Aldeburgh শহর। Suffolk-এর পূর্বপ্রান্তে সাগরতীরে এই শহরটির এক আপন বৈশিষ্ট্য আছে। জুন মাসের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি থেকে শুরু করে দশদিনব্যাপী এই উৎসবটি অঙ্গীকৃত হয়। এ দেশের অপেরা সম্প্রদায়, রাগপ্রধান সংগীত, বক্তৃতা, নাটক ও প্রদর্শনীর মাঝে এ উৎসব সুখর হয়ে ওঠে।

Yorkshire-এর উৎসবটিও এদেশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইয়র্ক অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় শহর। লণ্ডন থেকে ১২৪ মাইল দূরে। মধ্যযুগীয় ধর্মমন্দির ও সুসংরক্ষিত প্রাচীর এ শহরের শোভা। এখানেই জুন থেকে শুরু করে তিন সপ্তাহব্যাপী পৃথিবী বিখ্যাত রহস্ত-নাটকের পরিবেশন, সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও প্রদর্শনী এই উৎসবকে উপভোগ্য করে তোলে।

এবার স্কটল্যান্ডের কথা কিছু বলি। এই স্কটল্যান্ডের Pitlochry নাট্যোৎসব এই ক'বছরেই বেশ নাম করেছে। প্রকৃতির লীলাভূমিতে এই নাট্যোৎসব এপ্রিল থেকে শুরু করে পাঁচমাসব্যাপী একটানা চলতে থাকে। পার্বত্য উপত্যকা Perthshire-এর বুকে উৎসব রঙ্গমঞ্চটি এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত যে হাজার হাজার দর্শককে চমক লাগিয়ে দেয়। এই অস্থানে বহু খ্যাত আধুনিক, প্রাচীন, বিদেশী ও স্কটিশ নাটক প্রদর্শিত হয়।

এই কিছুদিন আগে স্কটল্যান্ডের এডিনবারা শহরে আন্তর্জাতিক সংগীত ও নাট্যোৎসব এবং সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র উৎসবও খুব জনাকুলমকের মধ্যে অঙ্গীকৃত হয়ে গেল।

এর পরেই নাম করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে Bath-এর উৎসবের কথা। লণ্ডন থেকে ১০০ মাইল দূরে এই বাথ শহর। Somerset-এর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘনকৈর কাছে খুবই প্রিয়। এখানেই মে অথবা জুন মাসে দশদিনব্যাপী এই উৎসব অচলিত হয়। Mr. Yehudi Menuhin এই উৎসবের পরিচালনা করেন। বহু-সংগীতে একাত্তান ছাড়া, নাটক ও ব্যালে এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ।

অমর কবি ও নাট্যকার Shakespeareকে স্মরণ করে তাঁর জন্মস্থান Stratford-upon-Avon-এ এপ্রিল মাস থেকে শুরু করেন মাস যাবৎ যে নাট্যাংসব চলতে থাকে, তা সত্যিই অভিনব। Avon নদীর তীরে অবস্থিত Shakespeare Memorial Theatre আশ্রয় নাট্যা-ঘোদি ও Shakespeare অমৃত্যুগীতের কাছে বিশেষ প্রিয়। Shakespeare-এর নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে ধারা বিশেষজ্ঞ ও পায়বশী তাঁরাই নাটক পরিচালনা ও অভিনয় করেন।

এই সব উৎসব ছাড়াও আরো বহু উৎসব এ দেশে হয়ে থাকে। তবে বেশীরভাগ উৎসবই গ্রীষ্মকালে অচলিত হয়। এই সময়কার উৎসব-মুখর ইংল্যান্ডকে ভোলবার নয়।*

* বি, বি, দি, যেতার 'বিচিত্র'র সৌন্দর্যে।

গ্রীষ্ম-বর্ষা

শ্রীগোপাল ভৌমিক

গরমটা যেই পড়ে
খোকা আইটাই করে।
রোদে পুড়ে নেয়ে তেতে
ঝুলে রোজ হয় যেতে।
বাড়ি ফিরে খুলে ফ্যান
খোকাবাবু ঘুম দেন।
ফ্যান নেই ঘরে যার
কতটুকু মুখ তার?
মনে মনে ভাবে তাই
জল হলে বেঁচে যাই।

একদিন অবশেষে
কালো মেঘ আসে তেঙ্গে।

আকাশটা ফেলে ঘিরে
নামে জল ধীরে ধীরে।
তোড়ে আসে তারপর,
সাঁঝ আসে, হয় ভোর,
সবকিছু একাকার,
খোকা করে ঘর-বার।
পথ ঘাট ভরা জলে
কচিং মাছ চলে।
ব্যাঙদের সভাতলে
ঝিল্লির সানাই চলে,
লাগে সব একঘেয়ে
খোকা। তাবে এগু চোয়ে
ঢের ভাল রোদে পোড়া,
খুশি মত যায় বোরা।

কেমন হতো !

শ্রীহরিশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বেশ হতো মা ছোড়দি যদি হ'ত আমার মত—
আমি হতাম দিদি, পেতাম গয়না-গাঁটি যত ;
ভোর না হ'তে অনেক রাতে
বেতের সাজি ছলিয়ে হাতে
দলবঁধে ফুল কুড়িয়ে নিতাম, শিউলী-বকুল কত,
আমি যদি হতাম দিদি, দিদি আমার মত !
শ্রাম মাস্টার আসত মখন, কষত দিদি ঝাঁক,
গাঁথছি মালা নিয়ে তখন শিউলী ফুলের ঝাঁক ;
পূজোর সময় যত্ন ক'রে
আলিম্পনে দেউল ভ'তে,
তোর দেওয়া সেই কাপড় পড়ে বাজিয়ে দিতাম শাক—
দিদি তখন কষত বসে বিচ্ছিরি সব ঝাঁক ।
হুপুর বেলা ভারত-কথা শুনব মা তোর মুখে,
দিদি তখন ভাইটি হ'য়ে নিচ্ছে পড়া টুকে ।
কানমলা চড় খাচ্ছে কত,
এক পা খাড়া সত্তের মত,
নইলে মালয় জাপান খুঁজে মরছে মাপের বুকে—
মনের স্মৃতি গর তখন শুনছি মা তোর মুখে ।
রাত হ'লে মা অবাক হব তারার জোনাক দেখে,
দিদি তখন খুঁজছে নদী কোথায় গেছে বঁকে ;
ফুলের গন্ধ স্নিহ্ন-হিয়ে
যতই আনুক আমেজ নিয়ে
খুঁজতে হবে নদী গেছে কোনখানেতে বঁকে—
দু'চোখ ভরে আমি তখন নিচ্ছি স্বপন এঁকে ।

মোচাক

মোচাকেতে ভরা মধু, জলছে মোমের বাতি,
অগ্নির দ্বন্দ্ব আনন্দে তাই উঠেছে আলি মাতি।
কতই পেটেখুটে রে তাই গজছে এই চাক
অলস হলে তার মাঝেতে থেকেরি যেত ঠাক।
এই কথাটি জানে অগ্নি তার ছোট্ট ভুবনে
তাই তো মধুভরিয়েছে তার, দিনের পরে দিনে।
আমরা মাগ্ব কাণ করিব এই ভুবনে শুধু
সকরিব জল-চাকে জানের হত মধু।
অলস হয়ে থাকলে পরে পড়বে সবাই কাকে,
ছোট্ট অগ্নি সেই কথাটি শোনার যে তার ভাকে।
আজকে এসো পণ করি সব গড়ব নতুন চাক
ভরব মো-এ দরদ দিয়ে শোনার এ-মোচাক ॥

প্রাণনাথ পাল

একটি ছেলের কাহিনী

তোমাদের মধ্যে কেউ কি কিশোরের
নাম শুনেছ? নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।
কিশোর হচ্ছে এমন একটি ছেলে যে সব সময়
তার ভিনিস হাটাজে।

কিশোর তার পেন্সিল, কলম, বই,
খাতা, আমাকাপড়, নার্সেল, ঘুড়ি, লাটাই
সব হাটাজে—কিশোর সব সময়েই ভিনিস
হাটাজে। ছেলের হাটানো অড্যান বেবে
তার যা একদিন বললেন—কিশোর, বেশি
যাও, কোনদিন নিজেই হারিয়ে আসিস না
যেন। কিশোর বাড়ি বেড়ে বললে—সে কথা
তুবি ভেব না যা। নিজেই হাটাবো এমন
ছেলে আমি নই।

কিশোরের বয়স তখন ষণ বছর। তার
যা তাকে খুশে ভর্তি করে দিলেন। কিশোর
খুব আনন্দের সঙ্গেই খুশে বেতে লাগলো।
কিশোরের ক্রাফ-টিচার আনন্দবাবু খুব কড়া
লোক ছিলেন। কোন ছেলে তার ক্রাসে
খাতা, বই বা পেন্সিল-কলম আনতে ভুলে

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

গেলে তিনি ভীষণ দকাবদি করতেন।
কিশোর এই ক্রাসে এসে দাক্ষ মুছিলে পড়লো,
কারণ সে সবই ভুলে যায়—কিছুই মনে
থাকে না। প্রথম পেন্সিল, কলম হাটাজে
হুক করে আর আনন্দবাবু বকুনি খায়।

একদিন আনন্দবাবু ছেলের বসলেন—
তোমার সব খাতা, কলম বার কর, লিখতে
যেবো। আর সব ছেলেরা খাতা কলম বার করে
বসলো। কিশোর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ভাব,
আমি কলম খুঁজে পাচ্ছি না। গভীরকণ্ঠে
আনন্দবাবু বললেন—বেশ তবে পেন্সিলে
লেখ। কিশোর তার পেন্সিলও খুঁজে
পেল না। আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল
—ভাব, পেন্সিলও খুঁজে পাচ্ছি না। বোধ
হয় আনন্দবাবু এই ছেলেটিকে বেহের চোখেই
দেখতেন, তাই নিজের কাউন্টেন পেনটা তিনি
কিশোরকে দিলেন লিখতে। আনন্দবাবু
ক্রাসটা ছিল টিকিনের আগের পিরিয়ডে;
তাই বক্টা পড়তেই ছেলেরা বৈ বৈ করতে
কতে বেহিয়ে গেল—কিশোরও তারের
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিছু পেনটা সে আনন্দবাবুকে
কোত্ত মিতে ভুলে গেল।

টিকিন শেষ হতে আবার আনন্দবাবু
ক্রাস। আনন্দবাবু ক্রাসে ঢুকেই কিশোরের
উদ্দেশ্যে বললেন—কিশোর চ্যাটাকী, আমার
পেন কোথায়? কিশোর লজ্জিত ও কুণ্ঠিত
হয়ে বললেন—খুঁজে পাচ্ছি না ভাব।

আনন্দবাবুই এবার রাগবার শাল। টেবিলে খুব জোরে একটা ঘুমি ঘেঁরে তিনি বললেন—সকাল থেকে বালি খুঁজে পাচ্ছি না আর খুঁজে পাচ্ছি না... শেষ পর্যন্ত হতভাগা আমার অমন সখের পেনটাও হারালি নাকি? কাল যদি আমার জন্যে একটা পেন না কিনে নিয়ে আসিস তা'হলে দেখবি মজা! কথাগুলো বলেই তিনি হাপাতে লাগলেন। কিশোর ছলছল চোখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

খুল থেকে ফিরেই মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিশোর চললো পেন কিনতে। রাগায় চলতে চলতে তার জুতার কিতেটা গেল খুলে; তাই সে টাকাটা পকেটে না রেখে ফুটপাতের উপর রেখে, হেঁট হয়ে জুতার কিতে বাঁধতে লাগলো। সেখান দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, কিশোরকে অস্বাভাবিক দেখে সে কোশলে টাকাগুলো হস্তগত করলো। কিশোর টাকার খোঁজ না করে দোকানের দিকে চলতে লাগলো। দোকানে জিনিস পছন্দ করে দাম দিতে বাবার সময় দেখে টাকা নেই... টাকা কোথায় গেল? জিনিসটা না নিয়ে টাকার সন্ধানে যেখানে দাঁড়িয়ে ছুতো বাঁধছিল সেখানে গেল, কিন্তু টাকা পেল না—কি করেই বা পাবে? অদূরে একটা পার্ক ছিল। সেই পার্কের একটা বেজিতে গিয়ে কিশোর গালে হাত দিয়ে বললো।

খানিকক্ষণ পরে সে গুনলো খুব মিহি গলায় কে যেন বলছে—কি ভাবছ, কিশোরবাবু? কিশোর পিছন ফিরে দেখে, একজন লোক খুব লম্বা আর রোগা, তার দিকে ঘেঁর-ডেরে চেয়ে বলছে—কি ভাবছ কিশোরবাবু? তোমার হারিয়ে যাওয়া টাকার কথা? কিশোর তার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ,

টাকার কথাই ভাবছি। তুমি কি আমার টাকার সন্ধান দিতে পারো? লোকটি বললে—টাকার সন্ধান দিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন একটা জিনিস দিতে পারি যার জন্য তুমি আজ পর্যন্ত বা বা জিনিস হারিয়েছ, তা সমস্ত পেয়ে যাবে। কিশোর তার দিকে কক্ষণদৃষ্টি মেলে বললে—দাও... দাও না ভাই, সেই জিনিসটা। লোকটি কিশোরের হাতে জুড়ে দিলে চমৎকার একটা সবুজ রঙের পাখর। দিয়ে বললে—তুমি হারানো জিনিসের কথা এই পাখরটার দিকে চেয়ে মনে করলেই, ফিরে পাবে। এই বলে কোথায় যে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল!

কিশোর পাখরটির দিকে চেয়ে যা যা সে আজ পর্যন্ত হারিয়েছে, তাদের কথা চিন্তা করতে লাগল। সেখতে দেখতে সমস্ত হারানো জিনিস হাটতে হাটতে তার সামনে এসে হাজির হলো। কিশোর ভীষণ ভয় পেয়ে জানহারা হয়ে ছুটতে লাগলো। হারানো জিনিসগুলোও তার পিছন পিছন ছুটতে লাগলো। অবশেষে পরিশ্রান্ত হয়ে কিশোর এসে একটা গাছের তলায় বসলো।

হঠাৎ দেখে, একি সে তো গাছতলায় বসে নেই! সে পার্কের বেজিতেই শুয়ে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। তা'হলে সবই স্বপ্ন... হারানো জিনিস সত্যি তা'হলে তাকে তাড়া করেনি। কিশোর সেদিন থেকে মূঢ়প্রতিজ্ঞ হলো, জিনিসের যত্ন করবে—কোনও জিনিস কোনমতেই কোনদিন আর হারাবে না।

কুনালী জ্ঞপর্ণা মুখোপাধ্যায়

(বয়স ১০ বৎসর)



মুঠুড়ে

রূগজি ট্রফির ফাইনাল

রূগজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে এবার ওঠে গতবারের বিজয়ী বোম্বাই দল এবং রাজস্থান। ফাইনাল খেলাটি হয়েছিল বোম্বাইয়ের মাঠে। বোম্বাই দল রাজস্থান দলকে এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে জয়ী হয়। বোম্বাই দল এই নিয়ে পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করল। বালু গুপ্তে ও দিয়াদকরের বোলিং এবং ওরাদেকারের ২৩৫ ও রামচাঁদের শত রান বোম্বাই দলের জয়লাভের পথ সহজ করে দেয়। দুই ইনিংসে বালু গুপ্তে ও দিয়াদকরের বোলিং এ্যাডামেরজ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬১ রানে ৬ ও ৮৭ রানে ৭ উইকেট।

জাতীয় হকি ফাইনাল

এবার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার গতবারের রানার্স-আপ পাঞ্জাব রাজ্য দল: ভূপালের আয়েবাবাগ স্টেডিয়ামে ভূপালের

বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় ১-০ গোলে জয়ী হয়ে সপ্তবিংশতিতম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলমান লাভ করে রতনধামী কাপ লাভ করেছে। পাঞ্জাব রাজ্য দলের আত্মজাতিক ব্যাতি-সম্পন্ন সেন্টার ফরওয়ার্ড বর্শন সিং দ্বিতীয়ার্থের অষ্টম মিনিটে জয়চুক গোলাট দেন। প্রথম দিন খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছিল। আঙ্গ থেকে বারো বছর (১৯৫০) আগে পাঞ্জাব দল এই একই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ১-২ গোলে হেরে রানার্স-আপ হয়েছিল।

দল বদল

কয়েক দিন আগে ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের পালা শেষ হয়েছে। অস্কান্ত বছরের মতো এবারের নাম-ভাকওয়ালা খেলোয়াড় পুরনো ক্লাব না ছাড়লেও, গত-জুগতিক প্রথায় ১৫ মার্চ ধর্মতলা স্ট্রিটে আই, অফ, এ, অফিসের সামনে শত শত ক্রীড়ামোদী ভিড় জমিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে এক সময় ভিড়ের চাপে রাজ্যের হাম-বাম চলা বন্ধ হয়ে যায়। জানা গেছে যে, এবার প্রায় পাঁচশ' ন'জন ফুটবল খেলোয়াড় ছাড়পত্রে সই করেছেন দল বদল করে অস্কান্ত ক্লাবের পক্ষে খেলবার সন্ত; অবশ্য এঁদের ডেভার কিছু খেলোয়াড় আপন আপন স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নিয়ে আগের অর্থাৎ পুরনো ক্লাবেই থেকে যান। শোনা

সিঁয়েছিলো এ বছর বলরাম, রামবাহাদুর, আর্নেল সিং, রহমান, কানন প্রমুখ খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্লাব ছেড়ে দেবেন, কিন্তু বাশোনা গিয়াছিলো তা শুভবমাত্র। জানা গিয়েছে, মহামেডান স্পোর্টিং এয়ার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খেলোয়াড় আনছেন। মোহনবাগানে ভারতীয় নৌবাহিনীর স্টপার অ্যাটেনীর খেলার সম্ভাবনা আছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উত্তর প্রদেশের হাফব্যাক সেনগুপ্তকে খেলোয়ার চেষ্টা করছেন।

—

ভারত বনাম ওয়েস্ট-ইন্ডিজ : পর পর কয়েকটি টেস্ট ম্যাচ

ভারতে এম, সি, সি-র সঙ্গে টেস্ট খেলার কিছুদিন পরেই ভারতীয় ক্রিকেট দলকে টেস্ট-খেলার জন্যে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ বেতে হয়। কিন্তু কে ভেবেছিল তাদের খেলায় এইরকম বিপর্যয় ঘটবে। এ পর্যন্ত যে ১০টা ম্যাচ খেলা হয়েছে, তার কল্যাণ এইরূপ—৪টি খেলায় ড্র; ১টায় জয়লাভ এবং হার ৪টি খেলায়। ভারতীয় দল ৪টি টেস্টে হেরেছে। ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার প্রধান কারণ—দলের ব্যাটিং বিপর্যয়। আর একটি কারণ হচ্ছে—খেলোয়াড়দের শারীরিক অস্থিতি এবং খেলার আঘাত লাগার ঘটনাগুলি।

টেস্ট সিরিজের ৪টি খেলার মধ্যে পরপর

চারটি খেলায় জয়ী হয়ে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ‘রাবার’ লাভের সম্মান পেয়ে যায়। ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে এ পর্যন্ত চারটি টেস্ট সিরিজের খেলা হয়েছে এবং ওয়েস্ট-ইন্ডিজ প্রত্যেকটি সিরিজে ‘রাবার’ সম্মান লাভ করেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম টেস্ট সিরিজে ১-০ খেলায়, ১৯৫২-৫৩ সালের দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজে ১-০ খেলায়, ১৯৫৮-৫৯ সালের তৃতীয় টেস্ট সিরিজে ৩-০ খেলায় এবং ১৯৬২ সালের চতুর্থ টেস্ট সিরিজে ৪-০ খেলায় ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ‘রাবার’ লাভ করেছে। কেবলমাত্র ১টা খেলা এখন বাকী।

ওয়েস্ট-ইন্ডিজের কাঠে বোলার হলের বল খেলতে না পারার দরুণই ভারতবর্ষের এই দুর্ভোগ। হল বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাঠে বোলার। সমান দূরের কথা হলের কাছাকাছি কাঠে বোলারও ভারতীয় দলে নেই। খালি হল কেন, গিবস্ ইত্যাদি আরও কাঠে বোলার বিপক্ষ দলে আছে। তারা ভারতীয় দলকে একেবারে কাবু করে দিয়েছে। খালি বল নয়, কিছু ‘বাল্পার’ বল দিয়ে ভারতীয় দলকে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ একেবারে বিপর্যস্ত করেছে এখার। বাল্পার বলের আঘাতেই ভারতীয় অধিনায়ক কপ্তুইয়ের গুরুতর ভাবে আহত হন—এবং অত্যন্ত দুরূহ অস্ত্রোপচারের পর তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়।

—

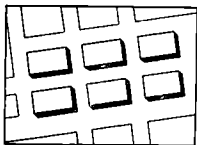


রেখা বিচার

১। নীচে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মধ্যে এক বা একাধিক দরল রেখা আছে। ক্ষেত্রগুলি কিন্তু পর্যায়ক্রমে সাজানো নেই। (ছবি দেখ) কি ভাবে সাজালে ক্ষেত্রগুলি পরপর বসানো

বাজিকর

ঠিক হবে ছবিটি দেখে বল। কোনও নতুন ক্ষেত্র দেওয়ার দরকার হবে কি ?



চারদিকে ফোটা দিবে লাইন করে বেখাও, কত কম সময়ে সে সবগুলি কুঠরির চারদিকে ঘুরে আসতে পারবে।

ছয় চরণের কে এ ?

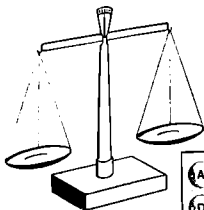
- ৩। কালবরণ ছয়টি চরণ
পেট কাটলে নাইক মরণ,
নাম বলো ভাই করে শ্রবণ।

কুঠরি-ঘোরা

২। পাশের ছবিটির মাঝখানে ছয়টি কুঠরি আছে (কালো, ঘোটা দাগ)। ঐ কুঠরিগুলিতে আছে মূল্যবান রত্ন-অলঙ্কার। একজন সশস্ত্র প্রহরীকে রাখা হয়েছে ঐ কুঠরিগুলির চারদিকে ঘুরে পাহারা দেওয়ার জন্য। কুঠরিগুলির

বল তো এরা কে ?

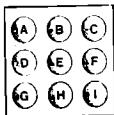
৪। গাছ থেকে একটি ফল পড়ল। ফলটি পড়ার শব্দ সে শুনল, সে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ফলটি দেখতে পেল না। যে দেখল সে জানতে পারল না, আর যে শুনতে, দেখতে বা জানতে পারল না,—সেই পেল। অথচ তারা কেউই বিকলেগ্রন্থ নয়। বল তো এরা সবাই কে ?



পালা-বাটখারা

৫। ছবিতে একটা দাড়ি-পালা ও ওজনের
অল্প নয়টি বাটখারা দেখতে পাচ্ছ। এই বাটখারা-
গুলির সব কটিরই এক ওজন—কেবল একখানি
বাটখারার ওজন অন্তরকম আছে। দাড়ি-পালার

ঐ বাটখারাগুলি চাপিয়ে বলতে
পার—কোন বাটখারার ওজন
অল্প রকম? মনে রাখবে দাড়ি-
পালাটি তিন বারের বেশি
ব্যবহার করতে পারবে না।



সাজাবার কায়দা

৬। এক থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি এমনভাবে সাজাও যাতে এক সংখ্যা দু'বার না পড়ে
এবং তাদের যোগফল ঠিক পুরো ১০০ হয়।

(উত্তর আগামীবার বেকবে)

গত মাসের প্রশ্নোত্তর

১। A এবং B খুলে যাবে—গিট হবে না।

C এবং D খুলে যাবে না—গিট হবে।

২। পাশের ছবি দেখ





একটি বছর শেষ হয়ে গেল। বছরের পর বছর তারপর বছর এমনি করে পৃথিবীর জীবন বেড়েই চলেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তন আসে প্রকৃতির জগতে—ফুল ফাটে, পাতা বার হয়, আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে, আবার কখনও নেমে আসে বৃষ্টি ধারা, কখনও গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা নিঃশেষে নিংড়ে নেয় পৃথিবীর সবুজ কোমলতা। আর মানুষ কালের পরিমিকে চিহ্নিত করেছে

মাস, সপ্ত—বৎসরের হিসেব দিয়ে। সেই হিসেব অনুযায়ী একটি বছর শেষ হয়ে আর একটি বছর শুরুলাভ করেছে। আজকের দিনে তাই নতুন বছরের উৎসব। এই নববর্ষটি প্রতি বছরই তাকে আমরা নতুন আশা, উদ্দীপনা, উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে আস্থান করছি।

এবার এলো ১৩৬২ সাল।

তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি নববর্ষের প্রথম প্রভাতে। নববর্ষের সূচনাতেই আর একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখো—তা হলো ১৯শে বৈশাখ। শতবর্ষপূর্তির উৎসব আমাদের আছো শেষ হয়ে যাযনি—তবু এই দিনটিকে বিশেষ করে, বিশেষ ভাবে আমরা পেতে চাই। প্রতি বছরের মত এবারও তোমাদের বলছি, এই দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করতে। পৃথিবীর সর্বত্র যে 'স্বরণোৎসব' চলেছে সে কথা মনে হলে আপনিই ক্ষুর পূর্ণ হয়ে ওঠে। আজকের দিনে নতুন বছরের আস্থান তাই তার বাণী দিয়েই পূর্ণ করে তুলতে পারি বেন—“এই মতিমায়িত জগতের নববর্ষ আমাদের জীবনের মধ্যে যে গোরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গোরব, আলোকে বিচরণ করিবার গোরব, এই আকাশতলে আসান হইবার গোরব, তাই যদি পরিপূর্ণভাবে চিন্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিঘাষ নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই।”

বছরের হিসাব করতে গিয়ে মনে পড়লো—তোমাদের প্রিয় মোচাকের বয়স হলো ৪৩ বৎসর। ডাবো একবার ব্যাপারটা! আমরা ছোটবেলার এই মোচাকের মুখ পাঠিকা ছিলাম, এমনকি আজকের দিনে অনেক নামকরা সাহিত্যিক প্রথম দিকে এর গ্রাহক ছিলেন এবং প্রথম লেখা তাঁদের মোচাক-এ প্রকাশিত হয়। একজন সাহিত্যিকের লেখার এই মোচাকের কথা পড়েছিলাম। লেখাটি হাতে করে কত ভয়ে ভয়ে তিনি সম্পাদক মশাই-এর কাছে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশিত হবার আশা ছেড়ে দিয়েই, কিন্তু তারপর বহন তাঁর লেখাটি মোচাকের পাতার আশুপ্রকাশ করলো—সেদিনের সেই আনন্দ এখনকার পরিণত বয়সে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। এই দেখ আমিও তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি প্রায় কুড়ি বছর ধরে। সেদিন যারা গ্রাহক ছিলে আজ তারা অনেকে অনেক ভাবে বড় হয়েছ, কেউ কেউ বাবা মা হয়েছ। ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বলি শোনো, প্রায় বছর খানেক আগের কথা,—একটি উৎসব সন্ধ্যার বহুদিন পর অনেক পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ আনন্দ অনুভব করে গল্প

করেছি—অনেকের মধ্যে থেকে একটি ঘেঁষে উঠে এসে হাসিমুখে প্রশ্নাম করলো। তার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা মুঠে উঠেছে—আমি কে বলুন দেখি! মাথার হাত দিয়ে বলুন, কে তুমি বলতো? মুখখানি খুব পরিচিত কিন্তু নাম মনে করতে পারছি না। সে তেমন হাসিমুখে ধাড়িয়ে রইল—ভাবনাও বটে, বলুন না? ততক্ষণে আমিও নামটা মনে করে কেলিছি তাই বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলাম, মনে হচ্ছে, তুমি বাঁচির কুকা। খুব জোরে হেসে উঠলো যেহেঁট—আমি কিছু ভুল করলাম কিনা ভাবছি—এমন সময়—আর একটি ঘেঁষে—টিক ঘেঁষে নর বধু—এগিয়ে প্রশ্নাম করে বললে, মধুদি, মনে রেখেছেন তাহলে—কিন্তু কুকা আমি, ও আমার মেয়ে চন্দ্রা! আমি বললাম, আমি ভুলেই গেছি কুকা। মাছবানে এতদিন চলে গেছে—মেয়েটি তো একেবারে তোমার মত। তোমার এই চেহারা এই আমি শেখবার দেখেছি। ওকে দেখে তাই সেই কথাই মনে হলো। একবারও ভাবিনি মাকের এতগুলি দিন চলে গেছে, তুমিও অনেক গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ। খুব আনন্দ পেলাম সত্যি, কিন্তু তোমার মেয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিলে আমরা কত বড় হয়ে গেছি আর আমাদের চেয়েও বড় হয়েছি মৌচাক। তেতাল্লিশ বছর ধরে মৌচাক তোমাদের আমাদের পুরুষাচ্যুত্রে কত আনন্দই না দিয়ে চলেছে। আমরা তোমরা সকলেই এর মধ্যে থেকে কত জ্ঞানের মণিমাণিক্য, আনন্দের স্বাদ, উৎসাহের প্রেরণা পেলাম, পাচ্ছি—আবার আগামী কালের বন্ধুদের জন্যও সে প্রস্তুত হচ্ছে। ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে, আনন্দও হয়। আর মৌচাকের কথা ভাবলে ছোটবেলার মৌচাক নিয়ে ভাই বোনদের সঙ্গে কাড়াকাড়ির মুহুর্তি এতকাল বাদেও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মৌচাক দীর্ঘায়ু হোক। নতুন বছরের আর একটি প্রার্থনা হুক্ত হলো। তোমাদের সকলকে এই মৌচাকের মাধ্যমেই পেরেছি, বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে আপন হয়ে দেখা দিয়েছে, একটি ধারার মিলেছে এই মধুচক্রে।

চন্দ্রাবতী ও মালা বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা—দীর্ঘদিন দিল্লী-প্রবাসের পর কোলকাতায় এসেছ শুনে—ডালো লাগলো। কুকা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া: অন্তত্ব অভিন অভিনি দেববর্ষণ, কোলকাতা—অন্তত্ব, এই এত অল্প বয়সেই তুমি হাজার সেকেন্ডারী দিচ্ছ? আশ্চর্য—মাত্র তেরো বছর বয়স লিখেছ, শুনে খুব খুসী হলাম। রণেন্দ্রকুমার লাহিড়ী, তেজপুর—তেজপুর ছেড়ে এখানে এসে ভাল কুলে লেখাপড়া করছো—খুব ভাল খবর। বক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী ও শ্রাবণী কোলকাতা—তোমাদের এপ্রিল কুলের ঘটনাটা খুব মজার লাগলো।

তোমাদের মধুদি

ঐক্যবাহিনী সরকার কর্তৃক ১০ বক্সি চাটুজো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও ডাক্তার প্রভু প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৪৫ নম্বা পয়সা

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ - ১৩৬৯

[২য় সংখ্যা]

এপ্রিল ফুল

শ্রী আশীষকুমার গুপ্ত



এপ্রিল ফুল আজ এপ্রিল ফুল
তুল ক'রে কেউ যেন করিস্নে তুল।
যদি কেউ বাঁটি নিয়ে তারপরে চাপা দিয়ে
বলে এতে মাংস তো রয়েছে প্রতুল।
বাঁটি খুলে ঠেকে যাবি খাটি বিলকুল।

এপ্রিল ফুল আজ এপ্রিল ফুল
সবে ভাবে কারে আজ দিতে পারে গুল।

যদি কেউ চিঠি লেখে
 খামেতে ঠিকানা দেখে
 খুলিসনে সেই খাম হোসনে বেড়ুল ।
 চিঠি ফাঁকা শুধু লেখা 'এপ্রিল ফুল' ।

এপ্রিল ফুল-এ কই এপ্রিলে ফুল ?
 বল্ মান চটপট করিসনে ভুল ।
 গোপাল, দেবু ও ছকা তোরা এপ্রিলে 'বোকা'
 ফুল কোথা থোকা থোকা ? আজ শুধু গুল্ ।
 এপ্রিল ফুল-এ সেই এপ্রিলে ফুল ।

এপ্রিল ফুল আজ এপ্রিল ফুল
 এমন মজার দিন জগতে অতুল ।
 কলা খেয়ে একী মজা ! নকলেই খায় গাজা
 ব'সে ব'সে ভাবে আরো দিতে হবে গুল্ ।
 মাথাতে চিন্তা খেলে মন চুলবুল ।

রাম ঠকা ঠকালাম, নেই কোনো ভুল ।
 খানিকটা দেখালাম সর্বের ফুল ।
 কবিতা বলতে এসে
 ফাঁকি দিয়ে, শুধু ক'ষে
 গুল্ দিয়ে টেনে এনে বুদ্ধির ফুল ।
 বারে বারে শোনালাম 'এপ্রিল ফুল' ।

দাড়িষের দারুলিপি

তীর্থভ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের মধ্যে বারা মহাতারত পড়েছ তারা ঘট্টাৎকরের হামা হিড়েখের কথা নিশ্চয় জানো, কিন্তু হিড়িষের ঠাকুরদার পিশখত্তর দাড়িষের নান কেউ শোনোনি বোধহয়। শুনবে কোথা থেকে, ব্যাসদেবের তখন জন্মই হয়নি তো, কে তাদের কথা লিখবে বলা? আমিই কি জানতুম, দৈবাৎ জেনে ফেলেছি। হঠাৎ সেদিন চম্পিশ পরগণার খড়সা গ্রামে বেড়াতে গিয়ে শুনলুম একটা পুতুর কাটতে কাটতে নাকি মাত হাত লম্বা একপাটি খড়ম বেঁধেয়েছে, আর তাঁর গায়ে নাকি কি সব লিখন পাওয়া গেছে। আমি তো না পড়ে পণ্ডিত, এখানে-সেখানে তাম্রশাসন শিলালিপি ঘেঁটেছি দু'চারখানা। পুতুর পাড়ে গিয়ে দেখি এক বটগাছের তলায় খড়ম বাঁধাজীকে মাটির বেদী করে বসানো হয়েছে আর সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেক করে শাস্ত্রবাক্য বলে একাদশীর দিন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে নেই বুঝিয়ে সেদিনকার মতো সিঁদুর মাখানো বন্ধ করলুম। তারপর কাছে গিয়ে দেখি কাঁদায় জলে অশ্লষ্ট ব্রাহ্মী অক্ষরে শৈশাটীভাষার লেখা দারুলিপি একখানা! আমি পেটের কয়েক পংক্তি পড়েছিলুম, তারপর কমকম করে বৃষ্টি নামল। ভক্তের দল কে কোথায় পালান তার ঠিক নেই, আমিও তাড়াতাড়ি জীর্ণ খড়মটীকে কতকগুলো খড় চাপা দিয়ে বাসায় ছুটলুম। পরের দিন বৃষ্টি থামতে দেখি কোথায় খড়ম কোথায় কি! সেইখানে এক বিরাট উই-এর চিপি, তা থেকে কালকের সেই দারুলিপির অক্ষরগুলো বেন বাদল-পোকা হয়ে ফুহুফু করে ডানা মেলে উড়ে চলেছে। অগত্যা দাড়িষ উপাখ্যানের সবটা তোমাদের শোনাতে পারলুম না, খড়সা দানবী তাঁর স্বামী দৈত্যবান্ধ দাড়িষের সাতহাত লম্বা খড়মে যে সাতটি গল্প লিখেছিলেন তার একটি গল্প কেবল তোমাদের শোনাচ্ছি আজ। বুঝতেই পারছ দানবীর চোখে দেখা সব সত্য ঘটনা।

সে বহু যুগ পূর্বের কথা, তখন অধু বীণে দৈত্য-দানবদেবই রাজত্ব ছিল। উত্তর থেকে দেবতার দল আর তাদের ধামাধরা পুঁচকে পুঁচকে মাহুগুলা এসে তখনও ছলে বলে তাদের শাশ্বতবীণে উপাঙাতে কিংবা মারাণ্ডকুতির ওধারে তাড়িয়ে দিতে পারে নি। তখনও মাহুগু দু'চার শ' এখানে-ওখানে যে না ছিল তা নয়, তারা ছিল নেহাৎই ভালোমাহুগু, দৈত্যদের হাতের পাচ। নিকারে বেঁধেই যেদিন হাতী, মোষ, বুনো ঘর, বাঘ বা গভীর ছুঁত না, সেদিন দৈত্যরাজ দাড়িষ তাঁর স্তম্ভবনের রাজত্ব থেকে দু'চারটে মাহুগুের বাচ্চা নজরানা আদায় করতেন। তার বধলে তিনি তাঁর শ্রমী সেই মাহুগুলিকে অন্ত দৈত্যদানবদের এবং বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের

আক্রামণ থেকে রক্ষা করতেন। বড়মের মাণ শুনেই দ্রুত পাহাছ দৈত্যরাজের শরীরটি ছিল কমশক্ষে পক্ষাশ হাত লগা, হুতরাং ছুঁচারাট মাহুয তো তার কাছে জলখাবার। তবে হুদরবনের বাঘ, শিয়াল, বানর আর বাংলা দেশের মাহুয খেয়ে খেয়ে তাঁর জাতভাই অন্ত দৈত্য-রাক্ষসদের তুলনায় তাঁর রুচি এবং বুদ্ধিটা একটু পেকেছিল বেশী—তা মানতেই হবে। তাঁর স্ত্রী বড়বা ছিলেন তখনকার দিনের রীতিমতো বিদূষী মহিলা, নিজের নামে যে গ্রামটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে অনেকগুলি মাহুযকে শাক পাতা ছাগল ভেড়া খাইয়ে তিনি মাহুয করে তুলেছিলেন ; তাদের কাছ থেকে লিখতে-পড়তেও শিখে নিয়েছিলেন। সেকালে দৈত্য এবং রাক্ষসদের মধ্যে বিয়ে ধা চলত, ভাবও ছিল খুব। রাক্ষসরাজ বাবণ ছিলেন দাড়িঘের আপন মাসভূতো সবকীর্ণ পিস্তৃতো ভারবাহাই, আর মহমানের ছিলেন বড়বার দাক্ষ্য বোনপো বউ—এর পিস্পাভক্তীর বোনঝি জামাই। হুতরাং লতার সেনা, রেওচার পাহা, ভরপুতের খেত পাখর, চুনাবের লাল পাখর এবং গয়র কালো পাখর দিয়ে একথানা রাজপ্রাসাদ তৈরি করা দাড়িঘের পক্ষে মোটেই শক্ত হতনি। তা সে বাড়ী তো নয়, যেন ইন্দ্রপুরী, সাত্তলুও ই করে চেয়ে দেখবার মতো। বাড়ীটার সাতটা মহল, ধাপে ধাপে উঠেচে তাদের ছাচ, এক এক মহল তাঁর আগের মহলের চেয়ে একশ হাত উঁচু। বেত পাখরের, সবুজ পাখরের, কালো পাখরের, লাল পাখরের, এইরকম সাতটি মহল ভাঙে বাস করত কিন্তু মোটে সাতজন : দাড়িঘ, বড়বা, দাড়িঘের দুই চাকর এরও, বেরও, বড়বার দুই দাসী জালাখা, গোদাখা আর বাঁধুনি জগদম্বা। সব শেষ মহলটা ছিল সাতশ' হাত উঁচু প্রায় একটা পাহাড়ের মতো। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর চুড়োর ছিল বিরাট এক সোনার কলস, তাঁর ওপরে মই দিয়ে উঠে চারদিকে দেখা আর রোজ সকাল সন্ধ্যায় জগদম্বা বাঁধানো ছিল দৈত্যরাজের নিত্যকর্ম। তা চাড়াও তাঁর অনেক রকম খেয়াল ছিল। প্রথম মহলটার একশ' হাত উঁচু ঘরখানা ছিল তাঁর চিড়িয়াখানা, দ্বিতীয় মহলে অর্থাৎ দুশ' হাত উঁচু ঘরটাতে ছিল তাঁর ব্যামামশালা, তৃতীয় মহলে ছিল তাঁর বিরাটশালা। সেই ঘরের ছাচ থেকে চার কোণে সোনার শিকল দিয়ে ঝোলানো একটা একশ' হাত লম্বা ত্রিশ হাত চওড়া পালক ছিল, বাস মহমানবের হাতের তৈরি। মণিরয়ে ঝলমল হাতীর দাঁত আর সোনা দিয়ে তৈরি সেই বিরাট পালকে বসে দৈত্যরাজ দাড়িঘ রোজ কিছুক্ষণ দোল খেতেন, মেঘভর শাড়ী পড়ে মেঘবরণ কল্পা বড়বা তখন বসতেন তাঁর পাশে, জালাখা গোদাখা দু'পাশে চামর দোলাত। কোনো দিন বা ঘড়া ঘড়া রক্ত দিয়ে দোল খেলা হ'ত সেখানে, আকাশ-পথে বেতে বক্ষ বক্ষ দিগ্ধ গম্বেরা থমকে দাঁড়াতে তাঁদের সেই জ্বলন খেলা দোল খেলা দেখতে। এর পরেও ভিতর দিকে ছিল স্নানশালা, পানশালা রন্ধনশালা, শয়নশালা। দৈত্যরাজ ছিলেন একটু ভোজনবিলাসী, রাণী বড়বাও কাঁচা মাংস একেবারে খেতে পারতেন না,

নিত্য নৃত্তন শিকাবাব, কোর্না, কোপ্তা, কলিয়া, চক্ৰডি-সঙ্গডি ছাচড়া, ঘণ্ট বাঁধতেম তিনি নানা জীবজন্তুর টাটকা মাংস দিয়ে। জগদমহারও বান্ধার হাতবশ ছিল, বিশেষ করে মাংসের মাধার মুড়িঘণ্ট দে যেমন বাঁধত, তেমন খড়খা নিজেও পারতেন না।

যাক, এমনি করে দিনগুলো বেশ সুখেই কাটছিল, কিন্তু মাঝ থেকে এল এক উড়ো বিপদ। জম্বুদ্বীপের দক্ষিণদিকে সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলো দ্বীপ ছিল অনেক দূরে দূরে। তার মধ্যে লম্বাটে ছিল সভ্যতাব্য বসবাসের বাস আর আশ্রয়ানে ছিল অসভ্য কতকগুলো দৈত্যের আড়া। এই দৈত্যগুলি অসভ্য হ'লে কি হবে, এদের শরীর ছিল যেমন প্রকাণ্ড, গায়েও তেমনি ছিল অসম্ভব জোর। তাদেরই মধ্যে একটা দৈত্য কি বকম করে একটা তিমি মাছের পিঠে চড়ে এসে হাজির হ'ল বাংলাদেশের দক্ষিণে সাগর দ্বীপে। বাংলাদেশের এখনকার মানচিত্র দেখলে তখনকার অবস্থাটা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না, স্তম্ভরথ রাজা গঙ্গার পাল কেটে তখনও দক্ষিণ দেশের জলাশয়ের জল বার করে দেননি, ফলে তখন চারদিকে ছোটো ছোটো দ্বীপ আর বড়ো বড়ো জলা ছিল, সেগুলোকে বলত মহ; যেমন ধরে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চাকদহ, আড়িগাহ, খড়দহ শিয়ালদহ। এখন এই দৈত্যটা সাগর দ্বীপে বাসা বেঁধে স্তম্ভরথের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে এসব দ্বীপগুলোতে শিকার ধরে বেড়াতে লাগল। তার ফলে থেকে থেকে দৈত্যরাজ দাড়িঘের শিকারে টান পড়তে লাগল। প্রথমটা তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি, শেষে একদিন খড়বার পরামর্শে তিনি তাঁর চাকর ঘেরওকে পাঠালেন খোঁজ নিতে। ঘেরও বাহুবলি জ্ঞানভ, সে পাখীর রূপ ধরে দেশ-বিদেশ ঘুরে পাকা খবর নিয়ে এল, সাগর দ্বীপে একটা বিকটমূর্তি দৈত্য এগেছে তার নাম তিমিদি। আগে আগে তিমি-মাছ খেয়েই থাকত, সম্প্রতি বেনী তেল খেয়ে মন্দিরি হওয়ায় বাঘ ভালুক শিয়াল হরিণ যা পাচ্ছে থাকছে। লোকটার অনবল ধনবল কিছুই নেই, বাঘের চামড়া শেলাই করে পরে, হাতীর চামড়ার তাঁবু বানিয়ে বাস করে। শুনে দৈত্যরাজ দাড়িঘ তেলেবেগনে জলে উঠলেন। হাঁক দিলেন, "নিয়ে আর ব্যাটার মাথা।" ঘেরও হাত জোড় করে বললে, "মহারাজ, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব? একটা নিবেদন ছিল।"

দাড়িঘ দাত হাত দাড়িঘ মধ্যে আঙুল চালিয়ে বললেন, "তা নির্ভয়েই বলে ফেল।" ঘেরও বললে, "বলি কি তার চেয়ে লগ আমার মাথাটাই আপনি লিন। ও কাছটি বড়ে সহজ হবেন না, আছে।"

দৈত্যরাজ বিরক্ত হয়ে হাঁক দিলেন, "এরও।"

এরও তখন রত্ননশালায় ঢুকে চুপি চুপি জগদমহার কাছ থেকে দুটো মাংসের বড়া চেয়ে বাচ্ছিল, সমস্তটা একগালে পুড়ে দিয়ে পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে ছুটে এল।

দৈত্যরাজ ধমক দিয়ে বললেন, “কোথায় ছিলি হতভাগা! মাড়া নিতে পারিস না।”

ঘেরও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, বললে, “ওর গাল গলা ফুলেছেন, মহারাজ, মুখে রা ছুটেছেন না আজ সকাল থেকে। কাল সেই যে বাঘের দিগদাঁড়াটা গলার ছুটেছিলেন—

দৈত্যরাজ ধমক দিলেন, “তুই চুপ কর। ভাখ এরণ্ডে, তোর দাদা এই ঘেরওটা একেবারে অপদার্থ। একটা বাজে দৈত্যর মাথা আনতে বলছি, তা পারবে না বলছে। তুই পারবি? ব্যাটা লাগর ধীপে থাকে, যা ব্যাটার মূতুটা ছিঁড়ে নিয়ে আস। আসবার সময় ছ’বার নোনা জলে ফুলকুচো করে আসিস, তোর গলার বাধা সেরে যাবে।”

এরও মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালে, অর্থাৎ “হে আজ্ঞে।”

দৈত্যরাজ প্রশংস হয়ে বললেন, “তবে যা, দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়। ঢাল তলোয়ার শাল জ্বল বা লাগে নিয়ে নে। কিছু জলখাবার খাবি তো খেয়ে বা রন্ধনশালা থেকে।” এরও এতক্ষণে মুখের খাবারটা গলার মধ্যে ঢালান করে দিয়েছে। কহজোড়ে বললে, “আজ্ঞে, ত্রন্দনের জন্ত বিলম্ব উচিত হবেন না, মহারাজই আমার আহ্বার, মহারাজই আমার নিদ্রা। আপনি বখন বলছ, তখন প্রস্থানে হেরি নয়। তবে রাণীমার হাতের অপরাধটা আর বোধ হয় খাওয়া হ’ল না। সেই তিমি-খেগো পেরব্ব মূনির উলরে একবার প্রবেশ করলে একদম অজীর্ণ হয়ে যাব।”

এরও একটু শুদ্ধ কথা বেনী বলত, তবে সব কথার মানে জানত না, কিছু বললে ফেলত; পরমায়কে বলত ‘অপরাহ্ন’, ‘অগস্ত্যকে বলত ‘গেরব্ব’, জীর্ণকে বলত ‘অজীর্ণ’। খড়খা তার কথা শুনে হেসে কেললেন, বললেন, “মহারাজ, এরা সবাই ভয় পাচ্ছে, ছেড়ে দিন এখন।”

রাড়িখ রাড়ি চুয়ে বললেন, “তবে চাই না কাউকে, আমি নিজেই যাব ফুড়। দেখি ব্যাটা কত বড়ো তিমিছিল। এরণ্ডে, ঘেরও, লে আও তলোয়ার।”

খড়খা বললেন, “মহারাজ, তার চেয়ে এক কাজ করুন। দৈত্যটাকে খাগতানুকের প্রজা করে রাখুন। খাজনা ধ’রে ব্যাগার খাটিয়ে নিম। যারবার কর্তাও আপনি, রাখবার কর্তাও আপনি, যদি কথা শুনে না চলে তখন মারতে কতক্ষণ?” রাজার মেজাজ, তাততেও বতক্ষণ, ঠাণ্ডা হ’তেও ভতক্ষণ।

রাড়িখ খুশি হয়ে বললেন, “ঠিক বলেছ। যা, ডেকে নিয়ে আর ব্যাটাকে। এরণ্ডে ঘেরও, ফুলনেই বা।” ঘেরও হাতজোড় করে বললে, “মহারাজ, রাজা-রাজড়ার ব্যাগার, লফরের মুখের কথার কি কাজ হয়? আপনি নেগন দাও।” অগত্যা খড়খা বাঁড়ের রক্ত দিয়ে পিশাচী ভাধার লিখন দিলেন। তার মোটামুটি অর্থটা এই :

বলতে বলতে টপ টপ ক'রে জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে। বানী খড়খা তখন উঠে এসে তাকে সাহায্য দিলেন। বললেন, “তুই ভাবছিস কেন এরও দূত অবস্থা। তোক কিছু বলবে না তিমিঙ্গিল। তুই লিখন নিয়ে ঘাবি, লিখন নিয়ে আসবি, কোনো ভয় নেই। না আসে তো চিঠি দেবে তো একথানা।”

অগত্যা এরও ঘেরও বণ্ডনা হ'ল। তিমিঙ্গিলের বাড়ী পর্যন্ত আর যেতে হ'ল না তাদের, গাংখৈ দেখা হয়ে গেল দৈত্যটার সঙ্গে। বেচারা ক'দিন শিকার পায়নি, পেটের জালায় কাকবীণে এসেছিল ছাঁচার মুঠো কাকের মত্বানে। দৈত্যরাজের দূতেরা তাকে দেখেই সাঠাঙ্গে প্রণাম করলে। তিমিঙ্গিল তুক কুঁচকে বললে, “বঙাতি বলে মনে হচ্ছে। কে হে তোমরা ছোকরা ? এত বেটে কেন ?”

ঘেরও বললে, “আমরা আপনার ছিচরণের লফর, দৈত্যরাজ দাড়িধের দূত। তিনি আপনার কস্ত এই লেখন দিয়েছে। পড়লেই সব পেতায় যাবেন, আজে।”

লিখন দেখে তিমিঙ্গিল তো অবাক। বললে, “এসব কি হিজিবিজি আঁচড় কেটে এনেছিস ? কে তোব দৈত্যরাজ ? কি চায় সে আমার কাছে ?” (আগামীবার সমাপ্য)

প্রাসঙ্গিকান্লে

গুয়ালিউর রহমান

প্রীতকালে ঝড়ের সময় আম কুড়াবার তরে।
ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে সব আমবাগানে চলে।
আমবাগানে সব বিলে আনন্দে গান গায়
গাছের থেকে পড়ে আম সকলে কুড়ায়।
এই সময়ে দুপুর বেলা নাইকো কারো ঘুম
আমতলাতে আম কুড়াবার পড়ে গেছে ধুম।
বিকালবেলা হাসি খেলার বসে গেল মেলা
চুপটি ক'রে এলো যদি দেখ তাদের খেলা।
'তাইয়ে নাইয়ে না'র স্বরে হাসির ছড়াছড়ি
উদাস হাওয়ার ছোয়া লেগে মন উঠেছে ভারি।

আমবাগানে আমশাখাতে ঝড় হচ্ছে যত
পাকা পাকা আমগুলো সব কবছে অবিরত।
দক্কাবেলা ছেলেমেয়েরা আম কুড়িয়ে শেষে
একই সাথে বাড়ী ঘেরে সবাই মিলেমিশে।
ভোরবেলাত আবার সবাই ঘুম থেকে উঠে
খলি হাতে আমবাগানে আন কুড়াতে ছুটে।
মোট। ছেলের বুদ্ধি পাকা হবে গো আর কবে
দস্তি মেয়ের কাণ্ড দেখে-অবাক ঘেন সব।
আজ্ঞাবি সব কাণ্ড যত দেখেখি কো কেউ
শিশুর মনে তাঁড় কবরছে আজকে ঘুমীর ডেউ।

গল্পে গল্পে বিজ্ঞানের উন্মেষ

— ১০১ — শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় —

(প্রথম অধ্যায়)

‘কথাক্সলেন বালানাং বিজ্ঞানতথং কথ্যতে’

জ্যোতি। তোমরা নৌকোর গুণটানা দেখেছ ত ? আচ্ছা, বল ত, গুণ যে টানে, সে ত নদীর পাড় থেকে পাড়ের দিকেই টানে, কিন্তু নৌকোটা পাড়ের দিকে না গিয়ে, নদীর একটা দিকেই সমানে চলতে থাকে, এ কেন হয় ?

তাপস। সঙ্গে সঙ্গে মাঝি ধরে থাকে হাল, সেইজন্তে পাড়ের দিকে যায় না।

জ্যোতি। বাঃ! ঠিক বলেছ। মাঝি তার হালের জোরে নৌকোটাকে চালাতে চেষ্টা করে নদীর অপর পাড়ের দিকে। দুই দিকের টান একসঙ্গে পেয়ে নৌকোটা হৃদিকের কোনো দিকেই না গিয়ে যায় মাঝ বরাবর, অর্থাৎ নদীর একটা দিকে। তোমরা একটা ইট বা ঢিলকে যদি দুটো রশি দিয়ে বেঁধে একসঙ্গে সমান জোরে একজন টানো উত্তর-পূর্ব কোণার দিকে, আর একজন টানো উত্তর-পশ্চিম কোণার দিকে, তবে দেখবে সেটা ঘাবে ঠিক সোজা উত্তর দিকে।

আচ্ছা, তোমরা অনেক সময় একটা ঢিলে সূতো বেঁধে বন্‌বন্‌ করে তোমাদের চারদিকে ঘুরিয়ে খেলা কর। ঢিলটার তখন তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবার একটা গতি থাকে, তাকে বলে কেন্দ্রাভিগ গতি। আর সূতোটা দিয়ে ঢিলটা টানা রয়েছে তোমার দিকে বলে, এ টানটাকে বলা হয় কেন্দ্রাভিগ গতি। সেই জন্তে ঢিলটা দুটো শক্তির মাঝখান দিয়ে কেবল ঘুরতে থাকে তোমার হাতের মুঠোটাকে কেন্দ্র ক’রে। যদি হঠাৎ সূতোটা ছেড়ে দেও, তবে ঢিলটা ছুটে তোমার কাছ থেকে দূরের দিকে চলে যাবে কেন্দ্রাভিগ শক্তির জোরে। পৃথিবী এবং অহাদ্ভ গ্রহগণ যে সূর্যকে বেঁটন করে ঘুরছে তাও ঠিক এই ঢিলটা ঘোরার মতো। দুটো শক্তির ফলে। মহাকাশের ফলে সূর্য গ্রহকে টানছে, আর গ্রহদেরও একটা নিজস্ব গতি রয়েছে সূর্যের কাছ থেকে ছুটে পালাবার। ফলে সূর্যের উপর হুমড়ি খেয়েও পড়ছে না, আর সূর্যের কাছ থেকে একবারে পালিয়ে যেতেও পারছে না। তাই সূর্যের চারধারেই ঘুরছে ঠিক ঐ ঢিলটার মতো।

নিমাই। গ্রহের নিজস্ব গতি কেন রয়েছে বুঝতে পারছি না।

জ্যোতি। হ্যাঁ, সেইটে একটা কঠিন কথা বটে। গ্রহগণ সবাই এককালে সূর্যেরই অংশ ছিল। হঠাৎ এক সময় সূর্য থেকে ‘অংশবিশেষ’ ছুটে পালিয়ে যাবার কোনো কারণ ঘটে থাকবে

এবং কিছুটা দূর চলেও গিগেছিল, কিন্তু শক্তিটা তার মধ্যে এখনও রয়ে গেছে, আর এনিকে স্বর্ষেরও মহাকর্ষ টানটা রয়েছে, তাই স্বর্ষকে বেঠেন ক'রে গ্রহের নিরন্তর ঘূর্ণন।

তাপস। আজ্ঞা জ্যোতিষা, স্বর্ষ থেকে পৃথিবীর ছুটে চলে যাওয়াটা কি কারণে ঘটেছিল ?

জ্যোতি। অপর কোনো কিছুই মহাকর্ষের জোরে হয়ত ঘটে থাকবে। এই যে মহানুজ, এর মধ্যে কত শত নক্ষত্র অর্থাৎ স্বর্ষ যে অনবরত রয়েছে, হয়ত যোরাফেরাও করছে, তার ইয়ত্তা নেই। কোনোটা কখনো আমাদের স্বর্ষের কাছে এসে পড়ে তার আকর্ষণ নিয়ে গেছে হয়ত, যার ফলে আমাদের স্বর্ষের অংশবিশেষ ছিটকে পড়েছে এবং তার সেই দূরের আকর্ষণ এখনও রয়েছে। সেটা ই তার কেন্দ্রাভিগ গতি বা শক্তি আর স্বর্ষের যে আকর্ষণ রয়েছে সেটা তার কেন্দ্রাভিগ শক্তি। এ দুই শক্তির ফলে পৃথিবী ঘুরছে স্বর্ষকে বেঠেন করে।

জ্যোতিপ্রকাশ এই পর্যন্ত বলেছে, এমন সময় বাধা পড়লো; হঠাৎ এক কুলপীওয়াল এসে হাজির।

জ্যোতি। আরে! এ পাড়ারগায়েও কুলপী বরক দেখছি!

তাপস। হ্যা, এ বরফওলা প্রত্যেক শনিবার আসে এক বস্তা বরফ নিয়ে। তারপর এখানবার সন্ধ্যা দুখ ভরে কুলপী তৈরী করে।

তাপসের বলাও আর চললো না। কুলপীর সদ্যবহারে সবাই যেতে গেল কিছুক্ষণ। তারপর বরফ বাওয়া শেষ হলে জ্যোতিপ্রকাশ আবার বলতে লাগলো।

জ্যোতি। কুলপী তো খেলে। কি ক'রে কুলপী তৈরী হয় তা দেখেছ ?

তাপস। হ্যা, দেখেছি। টিনগুলোতে দুখ ভরে দেয়, তারপর ময়লা নিয়ে মুখ আটকে ছেড়ে দেয় বরক ভর্তি হাড়ির মধ্যে, তারপর খানিকটা ছুন ছড়িয়ে দেয়। ঠিক—

জ্যোতি। বাঃ! ঠিক বলেছ। আজ্ঞা, ঐ ছুনটা কেন দেয় জান ? সবাই চুপ যে, কেউ জান না! তার কারণ এই যে, ছুন মিলে হাড়ির ভিতরকার ভাগটা আরও খানিকটা কসে যায়। তাই কুলপীগুলো শুড়ুতাড়ি জমে যায়। তোমরা পাশাপাশি ছুটো গুলোলে জল রেখে, একটা গেলোসের জলে খানিকটা চিনি বা ছুন ছেড়ে বেগ, দেখবে সেই গেলোসের জলটা অস্তটার চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এই রকম কয়েকটা জিনিস জলে দিলে ঠাণ্ডা হয় আবার এমনও পদার্থ আছে যা জলে দিলে গরম হয়ে যায়। যেমন পাথরে ছুন বা সোডা। এর বিশেষ বিশেষ কারণ পরে বিজ্ঞানের বড় বই পড়লে বুঝতে পারবে।

আজ্ঞা, এখন টিনগুলোতে দুখ ভরে তখন নক্ষত্র ক'রে দেখো একেবারে তা ভর্তি ক'রে দেয় না, একটু কম দেয়। অথচ এখন কুলপীর মুখ খুললো এখন তো দেখলে একেবারে ভর্তি



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ঠাকুর বাড়ীর ভোগ হ'তে একটু দেরি হয়, বেলা প্রায় একটা। পোল্টুর খুব ক্ষিপে পেয়েছিল, কিন্তু উপায় নেই। তবুও সকালে অলযোগটা বেশ ভাল রকমই হয়েছিল। একবার সে বিশ্রীঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়ালো। মুখে কিছু বললো না, কিন্তু তার নীরব মুখের ভাব বেশ সবব ভাষা হয়ে বলতে লাগলো—“বড় বে বেলা হয়ে যাচ্ছে, কখন আমরা খাব ?” বিশ্রীঠাকুর যেন তার মনের কথাটা জানতে পারলেন, বললেন—“তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ? চল যাই। এতক্ষণে লক্ষী-নারাগের ভোগ হয়ে গেছে।”

এঁরা যেতেই, ঠাকুর ঘরের সামনেকার মাটমন্দিরের বেতপাথর-বসানো চাতালে দু'মনের গাবার জায়গা করে দেওয়া হ'ল। তারপর ঠাকুরের পেসাদ। বাস্ বে বাস্! কত রকমের ব্যঞ্জন, তরি-তরকারী! এঁরাহি ব্যাপার! পোল্টু দেখেই ত চমকে গেল। খালি খালি ভাত, ভাজা আর চচ্চড়ী। তারপর বাটিতে বাটিতে নানারকম তরকারি; শুভো থেকে হক করে ভালনা, কালিয়া, কোল, ঘণ্ট, বেশমের বেডনী, ছানার ভালনা, বাঁধাকপির তরকারী, ফুলকপির তরকারী, অমল, দই, পায়ের, মিষ্টি—কত, কত, কতকি! পোল্টু সে-সবের নামই জানে না। সে শুধু দেখলে, ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে মোট পনরটা বাটি খালার আশেপাশে তিড়িম্বিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে সে পড়েছিল—“এ দেখ, আকাশে খালার দড় কত বড় চাঁদ উঠিয়াছে।”

আজ এই সব দেখে তার মন হ'ল, তাদের ভাতের খালা যেন চাঁদ, আর তাকে ঘিরে পনরটা ছোট-বড়-মাকারি নক্ষত্র। মিস্রঠাকুর বললেন—“বসে আছ কেন? খাও।”

“এত রকম তরকারী, খাব কি করে?”

“যা পার, একটু একটু সব খাও।”

“রোজই এই রকম হয়?”

“প্রায়। তবে, পুণিমা বলে আয়োজনটা কিছু বেশী হয়েছে। রকমে হয়ত একটু বেশী হয়, তবে পরিমাণে কম-কম হয়।”

পোন্টু খেতে আরম্ভ করে দিলে।

আজ আর পোন্টুর পেট তিন ভাগ অংশে ভরলো না, আজ চার ভাগই ভরে গেল; বাবু বাতায়নের জন্তে আজ জায়গা রইলো না। কি করবে, উপায় নেই; সবগুলো একটু-একটু কোবে খেতেই পেট একেবারে ভরে গেল। মিস্রঠাকুরের কোন কথাই নেই; তিনি একবেলা বান। রাতে কিছুই খান না। তাও দিনের বেলা যদি কোন কারণে ঘেরি হোরে যায়, অর্থাৎ স্ব্য অস্ত হোরে যায়, তাহোলেও সেদিন আর তিনি খান না।

ওদের খাওয়া হয়ে বাবার পর, বাইরের বাতায় একটা গোলদাল শুনতে পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি ওরা বাইরে চলে এসে দেখেন—এক ভয়ানক কাণ্ড।

ঠাকুর বাড়ীর পাশেই সংস্কৃত টোল, তার পাশেই একখানা ময়রার দোকান। ময়রার দোকানের রোয়াকটায় আর বাতায় ওপর লোকের ভিড় জমে গেছে। কারো হাতে ইট, কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে বর্শা। ব্যাপার কি?

ময়রার দোকান-ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সাপ ঢুকেছে; কিছুতেই সে বেরাচ্ছে না। এককোণে যে মুড়ির জালাটা আছে, তারি পেছনে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, আর লোকজনের হৈ-হুল্লতে সে থেকে-থেকে ফেস্-ফোস্ কোরে মুখ বাড়িয়েছে। বিযাক্ত সাপ। বোধ হয় কেউট কি গোখরো। নারায়ণপুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম। গ্রামের কোথাও ভাঙ্গা ইট-পাটকলের গাদা, বুনো ঝোপঝাড় বা পোকো-মাকড়সী নেই; গ্রামের সর্বত্র সাক্-সোক্—এ সাপ কোথেকে এলো!

লাঠি-সোঁটা-বর্শা নিয়ে দূর থেকে সকলেই আক্ষালন করছে, কাছে যেতে কেউই সাহস পাচ্ছে না। যদিও-বা কেউ সাহস করে হাত-দুই এগুচ্ছে, কিন্তু যেমনি সে তার কাল কুঁকুচে মুখটা বাড়িয়ে হিস্-হিস্ কোরে গর্জে উঠেছে, অমনি মল হাত পেছিয়ে আসছে।

ঘরের ভেতর কারুরই তোকবার উপায় নেই, তেড়ে এসে যদি ছোবল দেয়! এদিকে এত গোলমালেও সে কিছুতেই জ্বালায় পেরন থেকে বেরিয়েও আসছে না। মহা মূলকিল! একজন

বললে—“মজুমদার বাড়ীতে খবর দাও, বন্ধু দিয়ে ওকে মারবার ব্যবস্থা করা যাক।” কেউ বললে—“নিবারণ মালকে খবর দাও, মস্তুর পোড়ে ধরে নিয়ে যাক।” কেউ বা বললে—“হলু পোড়ার খেঁয়া লাগিয়ে দাও।” আবার কেউ বললে—“কাবলিক হ্যাসিডি ছিটিয়ে দাও, বেরিয়ে আসতে বাছাধন পথ পাবে না!” বাছাধন কিন্তু—‘নট-নডন-চড়ন’—হিসি বাপটির মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, আর একটু গোলমাল শুনেই ফোস্-ফোস্ করে ইয়া চকোরওলা কালো মুখখানা বার কোরে মবার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানছে।

ঠিক এই সময় মিশ্রঠাকুর এগিয়ে এসে সবাইকে বললেন—“তোমরা এরকম করলে ত সাপ যাবে না, তাতে কল আরো ধারাপ হবে। তোমরা লাগি-পোঁটা নিয়ে সবাই চলে যাও, কেউ কোন কথা বোলো না, ইট-পাথর ছুঁড়ো না, ঐ দূরে গিয়ে সব পাড়াও—কোন্‌রকম গোলমাল কোরো না! আমি এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।” সকলে ঠাকুর বাড়ীর সামনেটার গিয়ে চূপ কোরে পাড়ালো। তখন মিশ্রঠাকুর একজনকে একটা নতুন বড় হাড়ি আর একখানা সরা আনতে বললেন। নতুন হাড়ি আর সরা ঠাকুর বাড়ীতেই পাওয়া গেল। মিশ্রঠাকুর সেই হাড়ি নিয়ে নির্ভয়ে ঘীরে ঘীরে ঘরের মধ্যে গিয়ে পাড়ালেন। পোন্ট ডয়ে-ডয়ে অনেকটা তফাতে পাড়িয়েছিল। মিশ্রঠাকুরের কাণ্ড দেখে সে অবাক। মিশ্রঠাকুরের কিন্তু কোনই ভয় নেই, খুব সহজ ভাবেই তিনি হাড়িটা হাতে নিয়ে একবারে ঘরের মধ্যস্থলে গিয়ে পাড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে হাড়িটা মেজের ওপর রেখে চূপ কোরে পাড়িয়ে রইলেন। মনে মনে কোন মস্তুর-টমুর বললেন কিনা, ওনা গেল না। তারপর এক মিনিটও নয়, কয়েক সেকেন্ড মাত্র—এর মধ্যে কি হোল কেউ বুঝলো না, সাপটা ‘গুডবয়’-এর মত হুড়হুড় করে জালায় আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাড়িটার মধ্যে চুইলো। মিশ্রশাই তখন সরাসরানী হাড়ির মুখে চাপা দিয়ে, ওদের মধ্যে একজনকে জেঁকে বললেন—“কোন ভয় নেই, হাড়িটা নিয়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে এস, কোন হৈ-চৈ কোরো না।” কিন্তু ঐ হাড়ি ধরা ত দূরের কথা, ওর কাছে যেতেই কেউ সাহস করলে না। তখন তিনি নিজেই হাড়িটা কাঁধে তুলে নিলেন এবং আস্তে আস্তে গাঁয়ের পশ্চিম সীমানার যে বিতীর্ণ বিল ছিল, তারি ধারে এসে হাড়িটা সেইখানে নামালেন। তারপর আস্তে আস্তে মুখের স্পষ্টা সরিয়ে নিজে সাপটাও হাড়ি থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে বিলের দিকে চলে গেল। একাত্ত গোখরো সাপ! কনার ওপর ইয়া চকোর। সবাই এই ব্যাপার দেখে একেবারে থ! মিশ্রশাই বললেন—“ও আর কখনো গ্রামের ভেতর আসবে না, তোমরা নির্ভয়ে যে ঘর ঘরে চলে যাও।”

মিশ্রঠাকুরের কথা বিশ্বাসের সঙ্গে ভাবতে ভাবতে সকলে যে-ঘর ঘরে কিয়ে গেল; কিন্তু সবার চেয়ে বিস্মিত হোল, বোধহয়—পোন্টু।

পথে আসতে-আসতে পোন্টু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—“আপনি সাপের মস্তর জানেন ?”

“মস্ত-তর আমি কিছুই জানি না, বাবা।”

“তবে অতবড় দুচ্ছন্ন গোথরো সাপ হুড়-হুড় কোরে হাড়ির মধ্যে এসে ঢুকলো কেন ? আর আপনাকে কিছুই করলে না।”

“তুমি ছেলেমানুষ, এ সব কথা এখন বুঝবে না, তবে এইটে জেনে রেখো যে হিংসায় হিংসা বাড়ি আর হিংসাসূত্র ভালো ব্যবহারে সবাই বশ মানে।” পোন্টু চুপ করে তাঁর হুমকি কথাগুলো শুনে যেতে লাগল।

স্বধীর এ বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। স্কুলবোর্ডিং-এর ওর চার-পাঁচজন সহপাঠী দেখিন সন্ধ্যার পর গুর কাছে এস। তাদের সঙ্গে পোন্টু'র খুব ভাব-সাব হোয়ে গেল। তারা পোন্টু'র চেয়ে বয়সে বড় হোলেনও, পোন্টু'কে সব্যর খুব ভালো লাগলো। ওরা সবাই মিলে ধরে বসলো, কাল রবিবার, স্কুলের ছুটি, পোন্টু'কে এখানে থাকতেই হবে। কাল ওরা ‘পেপার-চেজ’ (Paper-chase) খেলবে। Paper-chase খেলাটা কি, পোন্টু কিছুই বুঝতে পারলো না। ওকে ওরা সব বুঝিয়ে দিলো। খেলাটার বিষয় শুনে পোন্টু'রও ভারী পছন্দ হোল। ওদের পাঁচপুতুর কেউ এ খেলার কথা জানে না। ধরতে গেলে, এ একরকম লুকোচুরি খেলা। লুকোচুরি, বাস্ত-লুকোচুরি—এ ত সকলেই জানে, ওরা এ-সব কত খেলেছে। কিন্তু ‘পেপার-চেজ’...পোন্টু'র পেরে দিনটা নারায়ণপুরে থেকে যেতে রাজি হোল। ওরা তখন বললে, পোন্টু'কে কাল ওদের সঙ্গে স্কুলের বোর্ডিং-এ গেতে হবে পোন্টু'কে ওরা নেমস্তম্ভ করলে; একজন ত একখণ্ড কাগজ নিয়ে মহানন্দে invitation card লিখে ফেলেন—“We, the students of class X Luxmi-Naranpur High English School wish to dine with Sri Poltu on Sunday, the 21st, Agharan at 10 A. M. positively.” পোন্টু'র হাতে হাগতে ওটা পোড়ে বললেন—“Sri নয়, Master। আর ‘আত্মাণ’ ও আমরা বুঝে বলি, ওটা অগ্রহারণ।” ওদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—“হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে এই নামটাই বছরের প্রথম মাস ছিল, তাই ‘অগ্রহারণ’।”

ভূপেশ বোলে একটি ছেলে বলে উঠলো—“আচ্ছা, আমরা বাঙালী বাঙালীকে নেমস্তম্ভ করতে ইংরেজীতে কেন লিখব, বাংলাতে লেখা উচিত। এখানে বাংলা বুঝবে না, সেইখানেই কেবল ইংরেজীতে আমরা বলবো আর লিখবো।” স্বধীর বললেন—“you are right Bhupash.” কালিদাস বলে উঠলো—“আবার ইংরেজীতে—বলচ ?” স্বধীর চুপ কোরে গেল।

যাই হোক, স্থির হয়ে গেল যে পোন্টু কাল স্কুল বোর্ডিং-এ ওদের সঙ্গেই থাকবে আর ওদের সঙ্গে ‘পেপার-চেজ’ খেলবে। স্বধীরও থাকবে।

হুতরাং পনের দিন বেলা দশটার মধ্যে স্থান কোরে নিয়ে স্থবীর আর পোন্টু দুল বোড়িং-এ চলে গেল। ওখানে বাঁওয়াদাওয়া করে, সকলে খেলবার তড়াঁড়োড় করতে লাগলো। বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত খেলার সময়। খেলাটা বেশ মজার, একটু বিবরণ দেওয়া দরকার।

‘পশার-চেজ’ খেলায় লাল-নীল-হলদে-মাদা প্রভৃতি নানা রংয়ের বেলু কিছু কুঁচো কাগজ দরকার। খুব পাতলা কাগজ। যেমন কাগজের মালা কোরে পুজোর প্যাণ্ডেল, বাথ, তোরণ, বারান্দা প্রভৃতি সাজানো হয়, সেই কাগজ। দপ্তরীদের যেমন ছাঁট, তেমন। গ্রামে আর দপ্তরীদের গুরুত্ব ছাঁট কোথায় পাওয়া যাবে, তাই কাঁচি দিয়ে সর্ক-সর্ক কোরে ছাঁটের মত কেটে নিতে হয়। এই কুঁচো কাগজই এ খেলার প্রধান উপকরণ। কাগজ কিন্তু পরিমাণে বেশ-কিছু চাই। দুটো দল হয়—অগ্রগামী দল আর অহুদরণকারী দল। প্রত্যেক দলে পাঁচ-সাত জন কোরে থাকে। অগ্রগামী দলের প্রত্যেকের কাঁধে একটা কোরে কাপড়ের ব্যাগ থাকবে এবং ব্যাগগুলো ঐ কাগজে ভরা থাকবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন কোরে ‘গার্ড’ থাকবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে অগ্রগামী দল যাত্রা করবে এবং যে-পথেই তারা যাক, ঐ কাগজ কিছু কিছু ফেলতে ফেলতে যাবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অগ্রগামী দল এই ভাবে যাবে। গার্ড দেখবে যে তারা বেশী সময় না যায়। যরা যাক, বেলা একটায় অগ্রগামী দল যাত্রা করলো। উর্ধ্ব-সংখ্যা দু’টা পর্যন্ত তারা ইচ্ছামত যে-কোন পথে গিয়ে, তখন তাদের ঐখানে কোন জায়গায় লুকোতে হবে। এমিকে বেলা দেড়টার সময় অহুদরণকারী দল গুনের খুঁজে যাত্রা করবে। এদের সঙ্গেও একজন গার্ড থাকবে। এরা ঐ কাগজ দেখে দেখে গুনের অহুদরণ করবে। বেলা আড়াইটে পর্যন্ত এরা ঐভাবে গিয়ে, যদি গুনের খুঁজে বার করতে পারে, তা’হলে এদেরই জিতে, গুয়া যাবে হেরে। আর তা না পায়লে, এরা যাবে হেরে; প্রথম দল জিতে যাবে। খেলার মোটামুটি নিয়ম এই। প্রথম দল কাগজ ফেলতে ফেলতে যে জায়গায় গিয়ে লুকায়, দ্বিতীয় দল ঐ কাগজ-ফেলা পথ-ধরে অগ্রসর হোয়ে তাদের খুঁজে বার করবে। খুব আনন্দের খেলা।

টিক হোল, প্রত্যেক দলে পাঁচজন কোরে থাকবে, আর একজন কোরে গার্ড। পোন্টুর বয়স ওদের চেয়ে কম ব’লে, ওকে দ্বিতীয় দলে নেওয়া টিক হোল। পোন্টুর খুব উৎসাহ, কারণ এ-খেলাটার বিঘ্ন সে এর আগে কিছুই জানতো না।

যাই হোক, বেলা একটার সময় কাঁধে কাগজ-ভরা ব্যাগ খুলিয়ে প্রথম দল যাত্রা করলো এবং তার আধঘন্টা পরে ওদের ফেলা কাগজ অহুদরণ কোরে দ্বিতীয় দল ওদের অহুদরণ করলো। দু’দলেরই মনে খুব আনন্দ আর উৎসাহ।

অগ্রগামী দল দুইটী কোরে অহুদরণকারী দলকে দু’এক জায়গায় বেশ কিছু হরহানিতে

ফেলছিল। 'বিতীয় দল' কাগজ ধোরে যেতে যেতে এক জায়গায় এসে দেখলে যে, একটা যিমুখী পথের দুটো পথেই কাগজ ফেলা। কোনটা তারা অহুসরণ করবে? প্রথম দল এদের ঘোঁকার কলে হরহানি করবার হচ্ছে, একটা পথের ধানিকন্ড পর্বত গিয়ে আবার কিরে এসে অস্ত্র পথটার অগ্রসর হয়েছে! বাইহোক, শেষ পর্বত 'বিতীয় দলেরই' জয়লাভ হোল। বেলা আড়াইটার মধ্যেই, গ্রাম আড়াই মাইল দূরে একটা আম বাগানের মধ্যে তারা প্রথম দলকে খুঁজে বার কোরে ফেললে। তখন সকলের মধ্যে কী হৈ-চৈ আর আনন্দ কোলাহল!

তারী ক্ষুতিতেই পোন্টু'র সে দিনটা কেটে গেল। বাড়ী কিরে তার খুঁই ক্ষিপে পেয়েছিল। সন্ধ্যার পর সকাল-সকাল খেয়ে নিরে যে গুরে পড়লো।

আবার চলার পথে। পোন্টু চলছে।

আজ ন'দিন হোল পোন্টু পাঁচপুহুর থেকে বেরিয়েছে। এই ন'দিন তার খুব আমোদ-আনন্দেই কেটে গেছে। এত দিন সে জানতোই না যে, পৃথিবীটা এত বড়, তাতে এত আলো, এত তার মধুর বাতাস। তার পাঁচপুহুরের মামার বাড়ী কি এই পৃথিবীরই মধ্যে? কখনই না, সে এ-পৃথিবীর বাইরে। সেখানকার আকাশ অত্যাশ্চর্য আচ্ছন্ন, বাতাস সেখানকার বেহকে জালিয়ে দেয়, মনকে ঝাঁপিয়ে তোলে। তার চোদ কাঠার মামার বাড়ীটা যেন কোন-এক পুরা-যুগের গ্রন্থের ভূমিকম্পের কলে নরক থেকে পাঁচপুহুরের ঐ চোদ কাঠা জায়গায় ওপর উঠে পড়েছে। ওর মামা-মামী সেই আদি নরকের স্থপিত জীব ছিল; পৃথিবীর আবহাওয়ার পড়ে তাদের আকৃতি মাহুকের মত হয়েছে গেলেও, রুচি আর স্বভাবটা নারকীয়ই আছে! সে চলতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো। তার চিরন্তনের এই হৃদয় অগতঃ থেকে এতদিন সে বঞ্চিত ছিল, আজ তার ভাগ্যবিধাতা হাতে ধরে তাকে মৃত্যু থেকে জীবনের পথে টেনে এনেছেন। পোন্টু! আজ তোমার ভাগ্যবিধাতার পায়ে তোমার ভক্তি-প্রণাম নির্বাক কব।

ও-সোমবারটা পোন্টু'র গোপাল-গায়েব যিতির মশাইয়ের বাড়ীতে কেটেছিল, আজকের সোমবারটা কোথায় কাটবে কে জানে! পোন্টু চলতে লাগলো।

চলতে চলতে সে তার হাত-বড়ীটা একবার দেখে নিলে। বেলা ন'টা। নারায়ণপুর থেকে তার বেরুতেই বেলা প্রায় আটটা হয়েছিল। তাকে ভালো কোরে একটু জলখাবার না খাইয়ে হুধীররা ছাড়েনি। দু'খানা ছোট ছোট গ্রাম সে গেরিয়ে এসেছে—'নারকোলগাঁড়া' আর 'গুডুই'। দূরে, খুব বড় আরতন একটা গ্রামের গাছশালাঘেরা গভী ধোঁয়ার মত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা পশ্চিম দিকে। পোন্টু রাস্তা ধরে লোজা পূব-দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলো। গোকুর পিঠের দু'পালে

মাল-ভরা ছালা ঝুলিয়ে চার-পাঁচটা লোক চার-পাঁচটা নরকে ভাঙিয়ে নিয়ে বিপন্নিত দিকে চলে গেল। পোন্টু ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল, কিন্তু দেখলে, কোন-একটা ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে খুব একটা কথা-কাটাকাটি চলেছে। তাই আর ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

আরো খানিকটা আসবার পথ, এক জায়গায় রাস্তার বাঁ-ধারে একটা খুব বড় ঝাঁসফল গাছ আর বকুল গাছ। পাশে একটা ফল্গা গাছও যেন তাদের আশ্রয়ে বেশ ঢাড়া দিয়ে উঠেছে। এদেরই পাশ দিয়ে পূর্বের দিকে একটা গ্রাম্যপথ চলে গেছে। গ্রামটার এটাই বোধ হয় প্রবেশ পথ। দুটো পথের কোণায় ছোট একটা পুষ্কর। একটু দূর থেকে পোন্টু দেখলে—পুষ্করের পাড়ে গোটাকতক ছেলে জমে গিয়েছে এবং সকলে মিলে কি একটা হজা জুড়ে দিয়েছে। কাছে এসে দেখলে, একটা পাঁকা-চুলো বুড়ী পাড়ের ওপর বসে জলের দিকে চেয়ে কপাল আর বুক চাপড়াচ্ছে আর কাঠার হুয়ে বলছে—“ওগো, আমার ছেলেমেয়েরা সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল!” সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলো হো হো করে হেসে উঠে একটা হজার হুষ্টি করছে।

পোন্টু ওদের জিজ্ঞাসা করলে—“বুড়ীটার কি হয়েছে, এরকম করছে কেন?” একজন ছেলে হাসতে হাসতে বললে—“ঐ যে ইড়িটা ভেসে যাচ্ছে ওর মধ্যে ওর ছেলেমেয়ে আছে, তাই বুড়ী কপাল বুক চাপড়ে কাদছে।”

ব্যাপারটা পোন্টু সহজেই বুঝে নিলে। বুড়ীটা পাগল। ঐ ইড়িটা কোথাও থেকে যোগাড় কোবে এনে, ওর স্তন্যের রাস্তায় ঢিলিঢালা পুরে নিজেই জলে ভাসিয়ে দিয়ে এখন বসে বসে কাদছে। পোন্টুকে দেখে তার শোক যেন আরও বেড়ে গেল। কাঠার হুয়ে বলতে লাগলো—“জাখোনা গা, আমার গুটিহুত সবাইকে এরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।”

ঠিক এই সময়ে একটা ত্রিশ-পঁয়ত্ৰিশ বছর বয়সের লোককে এই দিকে আসতে দেখে, ছেলের বল বলে উঠলো—“ঐ রে! পাগলটাও আসছে!” লোকটার ছেড়া-খোঁড়া ময়লা কাপড় মালাকোটা বীধা, এক মাথা কল উত্তোখুটো চুল, সব গাটাই ধুলো-মাখা। সে মন্থর গতিতে বুড়ীর পেছনে এসে দাঁড়ালো; বুড়ীর উদ্দেশে গম্ভীর গলায় বললে—“এই বুড়ী! পাগলামী করছিস কেন?” ছেলেরা সব হো হো কোরে হেসে উঠে হাততালি দিতে লাগলো। এক পাগল আর এক পাগলকে বলছে, পাগলামি করছিস কেন? হুম্বর। পাগলটা একটু এগিয়ে বুড়ীর পাশে গিয়ে বসলো। পাগলী বুড়ী সেই বকমই কীমতে কীমতে বলতে লাগলো—“ওগো! আমার ছেলেমেয়েরা সব ভেসে গেল গো!” পাগলা তাকে সাহসনার হুয়ে বললো—“কাদিস কেন? গান গা—গান গা।” বলে নিজে গেয়ে উঠল—“ওরে ও গোপাল, লয়ে ধেহুপাল, গোঠে কি ঘাবি না ভাই।” ছেলেদের হাসির আর হাততালির চোটে আকাশ বৃষ্টি ফেটে পড়লো। ব্যাপার দেখে পোন্টুও হাসি চেপে রাখতে

পারলো না। একবার হাত-ঘড়ীটা দেখে আর সে গুণানে দাঁড়ালো না। একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে—“এটা কোন্ গ্রাম ভাই?”

“এটা ‘মানুই পাড়া’, তুমি কোথা যাবে ভাই?”

“সামনের গাঁয়ের নাম কি?”

“বিশখালি। ঐ ত, বাঁকটা ঘুরলেই বিশখালি পড়বে; সামনেই বিশালস্বীতলা। আজ সন্ধ্যার পর গুণানে বাত্মা হবে, আমরা সব বাব।”

পোন্টু আর কোন কথা না বলে, হাতা দিয়ে এগিয়ে চললো। তার মন আশা, আনন্দ, উদ্দীপনার ভরপুর। নাতিশীতোষ্ণ প্রভাতের স্বিকৃতিতে মধুর বাতাস সে উদ্দীপনাকে সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিলে। পাগলের গানখানা কেবলই তার মনের মধ্যে ঘুরতে-ফিরতে লাগলো। চলতে চলতে সে গুনগুন করে গাইতে লাগলো—“ওরে ও গোপাল, লয়ে খেতপাল, গোষ্ঠে কি যাবি না ভাই।” পাশ দিয়ে একজন ভেলে, কাঁধের ওপর একটা ব্যাপ্পা জাল দিয়ে, ডান দিকের বনশখ দিয়ে চলে গেল। বাঁ দিকে ঝোপ-জঙ্গলগুলোর আড়ালে, খানিকটা দূর থেকে একটা নারী-কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল—“অ সৌকতী! ছাদে বাঁহুয়টা ওদের খামারে ঢুকেছে তাইড়ে নে-আয় লো!”

ছেলেটি যা বলেছিল, তাই। কিছুটা গিয়ে বাঁক ঘুরতেই বিশখালি গ্রামের আরম্ভ এবং দু’পাশে দু’দশখানা বাড়ীর পরেই বিশালস্বীতলা। অনেকটা খোলা মাঠগা। তার পূর্ব দিক ঘেঁষে বিশালস্বীতেশ্বরী মন্দির। মন্দির কিন্তু ঠিক মন্দিরাকৃতি নয়। সাধারণ চার-দেওয়ালের একখানা চতুষ্কোণ পাকা ঘর। পূর্ব ছাড়া ঘরের তিন দিকে বেশ চওড়া বারান্দা। পশ্চিম দিকে ঐ বারান্দায় ওঠবার পৈঠে। ঘরখানার পশ্চিম-উত্তর কোণে বহকালের একটা প্রাচীন অশ্বখ গাছ। মন্দিরের সামনেকার প্রশস্ত মাঠগাটার গ্রামের বারোয়ারী পূজো প্রভৃতি সব কিছু উৎসব আনন্দ হয়। আজ রাত্রে এইখানেই ‘বাত্মা’ হবে।

(ক্রমশঃ)

মানুষ কি না খায়!

ফরাসীরা এককালে সিংহের মাংস খেতো। প্রাচীন রোমানরা খেতো স্বর্ভিঃ আর পশুপালের চাটনি। সেগুলো ছিল তাদের কাছে জোরদার হস্তো উপভোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার কাক্সীরা এখনো সিংহের মাংস খায় তবে শুধু কলিঙ্গার মাংস খায়। অস্ট্রেলিয়ানরা কাঙারুর মাংস খায় সবচেয়ে আবিসিনিয়া আর আরবে উটের মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত। জার্মানিতে এবং রাশিয়ার ভাস্কুরের মাংসের খুব আদর। ঐতিহাসিক ব্রেলি লিখে গেছেন—ভাস্কুরের গর্দান খেতে চমৎকার! ফরাসী সৌখীন সমাজে কাঠবিড়ালীর মাংসের খুব আদর—কাঠবিড়ালীর মাংস খেলে আরকের কাঠ নাকি সেয়া মিষ্ট হয়। স্প্যানিশরা সজারুর মাংস খায়। ফরাসী কৃষকদের মধ্যে প্যাঁচার মাংস পরম সুখান্বিত বলে সমাদৃত। দক্ষিণ আমেরিকার সৌখীন সমাজে কচি কাকাজুয়ার মাংস পরম উপভোগ্য খাদ্য।

বিনিকে নিজে বিনামে

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

পাটনার থেকে মামাত ভায়েক চিঠি এস সকালে—মীছর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ কাল তো এই চিঠি পাবে, কাল সন্ধ্যাতেই বিয়ে। অতএব আর সময় বেশি নেই। টেনে এনে দেব দেবি হবে, বিয়ে দেখতে পাবে না। বিনিকে নিয়ে গেনে চলে এসো সটান। কলকাতা থেকে পাটনা—গেনে ঘণ্টা তিনেকের মামলা।

মীছ আমার মামাত বোন। আর, বিনি হচ্ছে আমার বোন।

বিনিকে খবরটা দিলাম। বিনি তো লাফাতে লাগল, বিয়ের জন্ত ততটা না, ঘতটা ঘেতে উঠতে পারে বলে।

চলে এসো বলে দিলেই হোলো। বলে দেওয়া সোজা, কিন্তু গেনের কথায় বুক কাঁপে আমার। রোজ সকালের খবরের কাগজে কোথাও-না-কোথাও একটা-না-একটা গেন দুখটনার খবর লেগেই আছে। আর গেনবাত্রী হতাহত হবার খবর তো গেনটি।

বিনামে চড়ার অভিজ্ঞতা অবশি আছে আমার। এর আগে একবার চড়েছি। সেবারে যে প্রাণে প্রাণে ফিরতে পেরেছি সেই তের। সেই থেকে শপথ করেছি ওপরে আমি আর নেই।

জীবন মৃত্যু পারের ভৃত্য বাসের তাবাই শুধু গেনে স্টুটনিকে চলাফেরা করবে। আমি নই আমি হচ্ছে নিছক পারের ভৃত্য। আমার নিজের পারের। পারচাষি করে বাতারাতে করতেই আমি ভালোবাসি।

হ্যাঁ, যেতে যেতে যাও—যেতে যেতে জাখো। বিনামের খুপিতে চূপ করে আকাশে মধ্যে কোণঠাসা হয়ে ফাঁকা নীলিমায় শূণ্যদৃষ্টি মেলে আমার মতে কোনোই লাভ নেই। কিছু দেখবার নেই আকাশে।

যা কিছু দর্শনীয় তা এই দুনিয়ায়। এমন কি টেনে যেতেও বেশ মজা আছে—দুধারে দেখবার হৃদহৃৎ করে চলে বাছে গাছপালা—জমি, জলা—পালাতে পালাতেই অশরুণ। কিন্তু আকাশে প্রতি মুহূর্তেই পড়বার পালা। মরবার পালা।

বুক আমার ছুবছুব করে। কিন্তু করলেও সাহসে বাধি বুক। বিনিকে তো সাহস দিয়ে হবে। এই তার প্রথম বিনাম বাজা। দাঁটার কর্তব্য তো করতেই হবে আমার। ভয় পেতে চলে না।

‘দাবড়াস নে তুই।’ বিনিকে আমি অস্তর দিই : ‘উড়তে ভারী মজা বে! কথায় বলে না, লোকটা খুব উড়ছে? তার মানে, বেশ ক্ষুভিতে রয়েছে লোকটা। ক্ষুভি মানেই উড়তি। ওড়ার মতন ক্ষুভি আর নেই। তোর ভয় করছে নাকি?’

‘কেন, ভয় করবে কেন? কখন চাপব আমি সেই কথাই ভাবছি খালি।’

‘আমিও তাই ভাবছি।’ বুক কাপলেও আমার মূখ্য চলে : ‘তিন ঘণ্টার তো মাঝরা। উঠলি আর দেখতে না দেখতে পটনি। তারপর বিয়ের ভোজে বসে পড়ে লুচি গোলাও মণ্ডা মেঠাই সাঁট না।’

কিন্তু মেঠাই মণ্ডার লোভ দেখাবার দরকার ছিল না, এমনিতেই সে লাকাচ্ছিল। বিমানে চড়বার লোভেই। তাই ওকে সেই লাকানিধ মুখেই বিমানঘাটিতে নিয়ে ফেলা সমীচীন বোধ করলাম।

ওকে নিয়ে কম্পিত পদে উঠলাম বিমানে গিয়ে।

উঠলাম ত বটে। কিন্তু ছোট্ট ডাকোটা বিমানটিকে যেখেই আমার উৎসাহ উপে গেছিল। এই লজ্জাড়ে প্লেম কি শেষ পর্যন্ত পটনির পৌছবে? গয়াপ্রাপ্তি হয়ে যাবে না ত মাঝপথেই?

প্লেমে চাপতে পেরেই বিনি মশগুল। প্লেমের চেহারা নিয়ে তার কোনো কমপ্লেম নেই। প্লেমে চেপে আমার কেবলই বনে হতে থাকে ট্রেনে গেলেই ভালো করতুম। বিয়ে দেখাটা ফস্কে যেত হয়ত, কিন্তু নিজেই ফিরে যেতে পেতুম আমার। এখন...ভগবান না করুন...ভালোয় ভালোয় কোন রকমে পৌছতে পারলে হয়।

ট্রেনে কি দুর্ঘটনা হয় না? হয়। কিন্তু তাতে শতকরা শকাংশ ভাগের বাঁচবার ভাগ্য থাকে। কিন্তু প্লেম ক্রাশ হলে...একেবারে নিল!

‘কিছু ভাবিস নে।’ বললাম আমি বিনিকে, ‘মন ধারাপ কীরিসনে যা ভা ভেবে। আরাম করে এলিয়ে বস। এই নে পড়, আমকের খবর কাগজ...’

বলে কাগজটা তুলতেই বড় বড় হরকে চোখে পড়ে—‘নিউইয়র্কে বিমান দুর্ঘটনায় ৩৬ জন নিহত।’ সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা মুড়ে ফেলে নিজেকে সামলে নিয়ে কাগজটার ওপর আমি চেপে বসি—‘বাজে কাগজ পড়ে কী হবে? ওড়বার আনন্দ উপভোগ কর বরং।’

বিনি আমার কথায় সায় দেয়। কাগজ দেখতে চায় না।

বাঁচা গেল। খবরটা দেখলে ঘাবড়ে যেত বোনটা। ওকে সামলানো মুশ্কিল হত তখন। হয়ত বা বায়না ধরত, এন্নি আমার নামিয়ে দাও। আর, বললেই ওরা নামিয়ে দেবে কিনা।

আমিই যদি বলি, আমার কি মাথায় ঘেবে এখন ? যা দুর্গা, এ যাত্রাটা বাঁচিয়ে দাও। নাকে খৎ, জীবনে আর চাপছি না প্রেনে !

নিহত হস্তিগণ জন আমার তলার চাপা পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে মাথা চাড়া দিতে থাকে। এদিকে বিনি তার ব্যাগের থেকে একটা বই বার করে আরাম করে পড়তে শুরু করেছে। তাকিয়ে দেখি বইটার নাম—আকাশের আতঙ্ক।

সেখাই আমি ঝাঁকে উঠি। ওই বই কি পড়ে এখন ? এই শুভবার সময় ? বলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি যাচ্ছে এখন ! ওতো নিজের বাড়িতে বিছানার আশ্রয়ে নিরাপদে শুয়ে শুয়ে পড়বার। একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে বিনিটার !

‘চিত্তা কববার কিছু নেই। বুলি বিনি ?’ তবুও আমি প্রচুরবার বলি : ‘কেমনা পরিসংখ্যান নিয়ে সেটা গেছে পৃথিবীতে পথের দুর্ঘটনায় যত লোক মারা পড়ে বিমান দুর্ঘটনায় তার চেয়ে কম। কলকাতার থেকে পাটনা প্রেনে আবার চেয়েও আগিল টাইমে ভালহৌসি কোয়ার পেকনো চেয়ে বেশি মারাত্মক।’

‘আঃ !’ বলে বিনি বইয়ের পাতা ওলটালো।

‘আজকের কাগজেই হয়ত একটা বিমান দুর্ঘটনায় খবর আছে। কিন্তু ভেবে ভাব, আকাশে গত কাল কত লক্ষ বিমান ত উড়েছিল ? সেই তুলনায় ভেবে দেখলে...ভেবে ভাব তুই, ভাবনার কিছু নেই।’

বিনি ভাবছিল না আমো।

তাকে ‘আকাশের আতঙ্ক’র মধ্যে আমি আতঙ্কের আকাশের দিকে তাকালাম। ঘুলঘুলির কাক দিয়ে।

অনেক নীচের দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। লম্বা পাকা লড়ক চলে গেছে এঁকে বঁকে—গ্র্যাণ্ড ট্রাক রোড হবে হয়ত। দেখতে দেখতে গ্রাম, বেশ, গাছপালা, অল্প অবশ্য এসে পড়ল ছোটখাট পাহাড়ের উঁচু উঁচু মাথা দেখা দিতে লাগল একে একে। বাংলা ছাড়িয়েছি তাহলে।

হঠাৎ আমার মনে হল প্লেনটা বেন একটা ঢাল সামলালো। কোণাভূনি নামতে লাগল তরতর করে। বাঁ ধার বেবে। তাহলে...তাহলে কি...আমার কপালে ঘাম দেখা দেয়, পেটের তলার কেমন বেন করে...বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে...

একজন বৈমানিক পাশ দিয়ে ছাঙ্ছিল, তার হাত পাকড়ে ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। ‘একটা ইরিন অচল হয়েছে বোধ হচ্ছে।’ সে জানায়।

‘খ্যা ?’ আমার আতঙ্কিত বোধ।

‘ঘাবড়াবেন না। আরেকটা ইঞ্জিন ত চালু আছে।’

খবরটা দেবার স্তম্ভ বিনির দিকে ফিরে দেখি সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তাকে ঝাঁকি দিয়ে তুলতেই সে চোখ মুছে বলে—‘কী, এসে গেলাম নাকি?’

‘ভাবনা কিছু নেই, আরেকটা ইঞ্জিন রয়েছে আমাদের।’ আমি জানাই। বিনি আবার ঘুমিয়ে পড়ে—খবরটায় কোন গুরুত্ব না দিয়েই। তার আরেকটু বামেই আমরা পাটনার বিমানঘাটিতে পা নামাই।

বিনি যেমন লাফাতে লাফাতে উঠেছিল, তেমনি লাফাতে লাফাতেই নেমে আসে। ঘাঁটির থেকে বেরতে বেরতে বলি :

‘কিছু ভাবিসনে। আর দুয়েকবার এমনি এলে-গেলেই পেনে চড়া তোর রপ্ত হয়ে যাবে। তখন একটা ইঞ্জিনও চালু না থাকলেও একটুও ঘাবড়াবিনে। প্যাঠাচুট তো থাকবেই। চুটিয়ে মজা! যেখানে খুশি উড়তে উড়তে নাম্মা গিয়ে। তবে সব সময় যে ভোজের আগবেই গিয়ে মাঝা বাবে তার অবস্তি কোনো ঠিক নেই।’

‘এব পর কোথাও যেতে আসতে, বুঝলে দাদা, পেনে ছাড়া আমি এক পা নড়ছিনে। আমার পেনে কথা।’ বিনি আশায় সেইখানেই জানিয়ে দেয় তবুনি।



বিনির দিকে ফিরে দেখি সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

পশুপুত্র কে ?

শ্রীকেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২য়)

১৮৫৪ সালে যখন ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেললাইন এলাহাবাদের কাছে নৈনী অঞ্চলে পৌঁছায়, তখন কয়েকটা সিংহের মাছুষ মারার উৎপাতে রেললাইন বনামোর কাছ বন্ধ হয়ে যায়। একথা ইংরাজী Royal Natural History নামে প্রাণী-জগতের বিবরণে দেওয়া আছে। অন্তরিক্তে তখনকার দিনের ভ্রমণ-কাহিনী স্বামীর গ্রাম ইত্যাদির চলিত গল্প, এইসবের স্পষ্ট বৃত্তা যায় যে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বিজ্ঞানচলের আশেপাশে, বর্তমান উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর, চুনার ইত্যাদি অঞ্চলে এবং ওপারে বুন্দেলখণ্ডের জঙ্গলে সিংহ খুব সাধারণতাবেই ঘুরত। নৈনীতে সিংহের উৎপাতে রেললাইন ও যত্না ব্রীজ নির্মাণের ষ্টিকাধার নীলকমল মিত্র, নিজে বন্দুক নিয়ে ঘুরে হরণান হয়ে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে বলেন দৈন্ত বিভাগের অফিসারদের ঐ সিংহ মারার জন্ত পুরস্কার দিতে। সেই ব্যবস্থায় ৩১ টা সিংহ মারার পর লাইনের কাজ চলে। আজ ঐ অঞ্চলে বনজঙ্গল আছে কিন্তু সিংহ নাই।

পিয়ের লোটির (Pierre Loti) লেখা প্রসিদ্ধ “ইংরাজ বসন্ত ভারত” (L'Inde sans l'Anglais) পুস্তকে লেখা আছে যে, তখন মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতানার নানা জায়গায় এত সিংহ ছিল যে তাঁহার সফরের সময় রাত্রি তীব্র ছাউনীর চতুর্দিকে আগুন জ্বলে ও শশস্ত্র পাহারা রেখে চৌকী দিতে হ'ত। তা সত্ত্বেও সিংহের দল পাশে ঘুরে গর্জন করে, ছাউনীর মধ্যে বাঁধা বলদ মহিষ ঘোড়া ইত্যাদিকে ভড়কাবার চেষ্টা করত, বাতে তারা বাঁধন ছিঁড়ে, ভয়ে ছুটে, আগুনের দর ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে। আজ সে সব বনে-প্রান্তরে, সিংহের চিকুরাজ নেই।

পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির কাহিনীতেও সিংহেরই উল্লেখ পাওয়া যায় বেশী। শকুন্তলার উপাখ্যানে যে ক্ষত্রিয় শিকার সাহস ধর্ম ও শক্তি দেখে রাজা দুঃস্বপ্ন মোহিত এবং বাৎসল্যভাবে আগ্রহ হয়েছিলেন সেই শিক্ত ভরত সিংহশাবকেরই দাঁত গোঁনার জন্তে জোর জবরদস্তি দেখাচ্ছিল। যে অঞ্চলের বনে, “হালিনী” নদীর তীরে শকুন্তলার পালক শিতা কথ কথির আলম ছিল, সেখানে আজও অনেক জায়গায় ঘোর জঙ্গল আছে। কিন্তু সেই জঙ্গলে সিংহ নাই— আছে বাঘ।

একমাত্র শ্রমন্তক মণির উপাখ্যানে ভারতের যে অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, সেখানে রাজভ্রাতা প্রসেনজিথকে মেয়ে এক সিংহ শ্রমন্তক মণি নিয়ে যায়, সেই বারকার কিছু দূরে, সৌর্যাস্তের গির্জার

অকলের পাহাড়ী-জঙ্গল এলাকার এখনও সিংহের দ্বন্দ্ব আছে। ভারতের অন্তর সব জায়গায় সিংহ আছে শুধু চিড়িয়াখানার খাচার কিংবা সার্কাদের পিঠারায় !

এ সব সিংহ তবে গেল কোথায় ? অবশ্য মানুষ আর সিংহের মধ্যে চিরদিনের বিরোধ আছে এবং সিংহ শিকার, রাজাবাদশাহ্দেরই উপযুক্ত শিকার বলে ধরা হতো বহুদিন থেকে। কিন্তু রাজাবাদশাহ বা বড় বোকা সেনাপতি ছাড়া সিংহের সঙ্গে সখ করে লড়াইতে কেউ চাইত না। এবং আগেকার দিনে এখনকার মত দূর পাল্লার ও প্রচণ্ড জোরের বন্দুক রাইফলও ছিল না। তখন তীর ধুক বর্শা বল্লম বা তলোয়ারই ছিল অস্ত্র। তাতে কয়জনে ক'টা সিংহই বা মারতে পারতো ? তবে এই সব অকলের সিংহ নিশ্চিহ্ন হ'ল কি করে ?

আরো দেখা যায় যে, ওই সব বন-জঙ্গলে, ঘাসে-ভরা প্রান্তরে, যেখানে হরিণ, শুয়োর, কুকুড়ার মুগ চরে বেড়ায় এবং ধানের গ্রাম থেকে গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া চরাতে বাখালের দল আসে, সেখানে সিংহের জায়গায় রয়েছে বাঘ, এবং মানুষের শত্রু হিসাবে সে সিংহের চাইতে কিছু কম দুর্দান্ত নয়, বরঞ্চ অনেক বেশী।

অন্যদিকে মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া ও উত্তর চীন প্রভৃতি শীত প্রধান অকলের জঙ্গলে ও প্রান্তরে বাঘ এখনও সমানে, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রচণ্ড শীতে, তুষারপাতের ঝড়-ঝড়ায়, তাকে হটতে তো পারবেই নি, বরং সেই অবস্থায় তাবা চলাফেরা, শিকার খোঁজা ও ধরা দেবেতে বুঝা যায় যে, সে ওখানেরই আদিম অধিবাসী। এসব অকলে সিংহ নেই এবং সিংহের গায়ে লোমের অভাব ও দেহের গঠনে অনেক কিছুই প্রভেদ দেখলে মনে হয় যে, সিংহের পক্ষে ওসব অকলে বাস করা অসাধ্য।

এই সকল কথাই নানান বিচার করে প্রাগৈতিহাসিকেরা স্থির করেছেন যে, **ক্রীতবর্ষ** অকলে আগে সিংহই ছিল সাধারণ বাঘ। বাঘ, উত্তর অকলে শিকারের অভাব-হুজুর, ক্রমে এই সব অকলে এসেছে এবং নিজের বিক্রমে সিংহকে হটিয়ে তার বাল্যস্থল দখল করেছে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই সিংহ এভাবে এ সকল অকলে নিঃশেষ হ'ল কি করে এবং তার আসনে বাঘ এসে দখল নিল কি করে, সে কথাই বধ্যবধ উত্তর পাওয়া যায় না।

বাঘ ও সিংহের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য কে বড়, এই প্রশ্নের উত্তরে নানা লোক নানা কথা বলেছেন ও লিখেছেন। ক্রমে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে কয় ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়সের বাঘের সঙ্গে পূর্ণ বয়সের সিংহের লড়াই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, তার সব কয়টিই খাচার ভিতরে অথবা লোহার গারবে ঘেরা ছোট প্রান্তরে হয়েছিল, হুজুর সে লড়াইকে ঠিক স্বাভাবিক পরিবেশের শক্তি-পরীক্ষা বলা যায় না। 'এবং প্রত্যেক লড়াইতেই শেষ নিশ্বাসের আগে—অর্থাৎ দুই লড়িয়ে

একজনের মারা পড়ার আগেই—প্রবল জ্বলের ধারা বা ভূবড়ী বাজীর মত আগুনের ফোয়ারা দিয়ে, তাদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

তবুও বলা যায় যে, যে করটির সঠিক বিবরণ পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশেই সিংহ প্রচণ্ড মার খেয়ে, বিবম ঘায়েল হয়ে হটে যেতে আরম্ভ করে; শুধু এক ক্ষেত্রে বাঘ হটে গিয়ে কোণ নিয়েছিল। মোটামুটি বলা যায় যে, বাঘ তার বিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে ঢের বেশী দ্রুত নড়ে এবং তার গায়ের শক্তি বা মারের অস্ত্র সিংহের চাইতে কোন অংশে কম নয়, বরঞ্চ একটু বেশীই।*

শিকারের কাহিনী বা ভ্রমণ-কাহিনীতে বন-জঙ্গলে বাঘ বা সিংহের সঙ্গে মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা বা দেখতে পাওয়া যায়, তাতে একথা স্পষ্ট যে জঙ্গলের বাঘ, জঙ্গলের সিংহ থেকে ঢের বেশী চতুর, সাহসী ও দুর্দান্ত এবং বিপদের সম্ভাবনা বাঘের কাছেই বেশী। কাজেই বন-জঙ্গলের পরিবেশে বাঘেরই প্রাধান্য বেশী মনে হয়।

এইভাবে সকল দিক বিচার করে দেখেই প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেছেন যে—এদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়—বাঘ সিংহের রাজত্ব জয় করে নিজের অধিকারে নিয়েছে। মৌর্যাদির গিরনার জঙ্গলের পরিবেশে বাঘ দখল নিতে পারেনি কেন সে বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞ শিকারী বা প্রাণীতত্ত্ববিদ মবিশেষ কিছু বলেন নি। তবে মনে হয়, বোলা প্রান্তর বা মরুজঙ্গল, যেখানে ঝোপঝাড়ের অভাবে লুকিয়ে শিকারের কাছে গিয়ে কাঁপিয়ে পড়া সম্ভব নয়, সে সব এলাকা বাঘের পছন্দ নয়। হাওয়ায় শিকারের গন্ধ পেয়ে দূর থেকে সেই গন্ধ ধরে গাছের গুড়ি বা সামান্ত শুকনো কাটা ঝোপ কিংবা পাথর বালিমাটির টিপি, এ সবের আড়াল নিয়ে শিকারের কাছে এগিয়ে তারপর প্রচণ্ডবেগে ছুটে তাকে ধরা সিংহের পক্ষে সম্ভব; কেন না তার ত্রাণশক্তি প্রবল, কানও বেশ চোখা, তবে দৃষ্টিশক্তি কিছু কম।

অন্তর্দিকে বাঘের ত্রাণশক্তি বিশেষ ক্ষোত্রালো নয়, দৃষ্টি খুব বেশীদূর দ্রুতবেগে ছুটতেও পারে না। কাজেই শুকনো এলাকার প্রান্তরে বা যে জঙ্গলে লুকিয়ে শিকারের কাছে আসা যায় না সেখানে বাঘের পক্ষে ধাকা সম্ভব নয়। হয়তো এই কারণেই গিরনারের সিংহ তার রাজত্বের ওইটুকু রাখতে পেরেছে।

বাই হোক, উত্তর এশিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিরাট এলাকায় ও দীপময় ভারতে বাঘই রাজত্ব করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অন্ততপক্ষে ভারতে সে সিংহের হারিয়ে রাজত্ব দখল করেছে। তবে কি বাঘই এই বিশাল অঞ্চলের পত্তরাজ ? (ক্রমশঃ)



উপহাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জীবন চৌধুরীর কী সর্বনাশ হবে তা মুখে না-বললেও ক'দিন পরেই বোঝা গেল। কে জানে কোথা থেকে একদল লাঠিয়াল জীবন চৌধুরীর বাড়ী ঘেরাও করলে। গরানহাটার কেউ জানলে না, কোথায় কী কল্কাট্টি টেপা হলো। হঠাৎ খবর এল জীবন চৌধুরীকে মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে গেছে কোতোয়ালের পেরাদারা। লাঠিয়াল নয় আসলে তারা নবাব-সরকারের কোতোয়ালের পেদারা। নবাব-সরকার থেকে জীবন চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেল।

বাড়ীতে মশাই বেন কিছুই জানেন না। রোজ সন্ধ্যাবেলা আবার আসর বসে বৈঠকখানার। রোজই বুড়ো চক্রবর্তী আসে। খাওয়াপাওয়া চলে। জীবন চৌধুরীর খবরটা আসতেই তিনি একটু মূচকে হাসলেন। মুখে কিছু বললেন না।

শুধু মুকুন্দকে বললেন—বা তো, নিবারণকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো—

মুকুন্দ তখনই চলে গেল। কিন্তু ফিরে এল বানিক পরেই। ক'দিন থেকেই নিবারণ আসছিল না। বলছিল—এখন কাছে ব্যস্ত, আসতে পারবে না। নিবারণের আবার এখন কী কাজ যে একবার আসতেও পারবে না? নিবারণের খাওয়া-পাওয়ার সমস্তা মিটিয়েছেন বাড়ীতে মশাই। নিবারণের ঘরের চাল সরিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ জীবন চৌধুরীর ব্যাপারটার পরেই নিবারণের আরো বেশি করে দরকার পড়লো। শেষকালে মুর্শিদাবাদে যদি নবাব-সরকারে যুঁষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করে আসে জীবন চৌধুরী? শুধু ততো আবার নতুন উৎপাত শুরু হবে। জীবন চৌধুরীর জালায় গরানহাটাতে টেকাই যাবে না।

বাড়ীতে মশাই মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—নিবারণ কী করছে, দেখলি?

মুন্স বললে—আজ্ঞে, নিবারণবাবু বাড়ি নেই—

—বাড়ি নেই তো কোথায় গেছে কিছু শুনলি ?

—আজ্ঞে তা জানি না।

—তা নিবারণের পরিবারকে জিজ্ঞেস করলি না কেন ?

মুন্স বললে—গয়লা-বউকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, গয়লা-বউ বললে নিবারণের একটা ছেলে হয়েছে।

কিন্তু দু'দিন পরেই নিবারণ এসে হাজির হলো। বাঁড়ুজো মশাই বললেন—কোথায় ছিলে নিবারণ ব্যাচিন ?

নিবারণ বললে—সাধনার একটু ব্যাঘাত হচ্ছিল, তাই একটু বাইরে গিয়েছিলুম—

সত্যিই নিবারণের আর এ-সব ভালো লাগছিল না। বেশ ছিল সে বনে-জঙ্গলে। সেখানে খাওয়াপাওয়ার ঠিক ছিল না বটে, কিন্তু নিরিবিঘ্নে সাধনা করা চলতো। শগবানের নাম করা চলতো। এখানে এসে বাঁড়ুজো মশাই-এর দয়্যার সিঁধে আসে, চাল-ডাল-তেল-খুন সবই আসে সত্যি, কিন্তু ক্রমেই বেন জড়িয়ে পড়ছিল নিবারণ। কোথাকার কোন্ জীবন চৌধুরী! তার সঙ্গে কোনও ক্ষমতা নেই নিবারণের। অথচ সেই জীবন চৌধুরীর সঙ্গে তুক-তাক করতে হলো, সিরাজউদ্দৌলার ভরতে কতরকম মন কাজ করতে হলো। সংসার-আশ্রমে আসার পর থেকেই এই রকম শুরু হয়েছে। সবাই ভেঙে দেখতে চায়। কেউ আকাশে ওড়া দেখতে চায়, কেউ জলে ডোবা দেখতে চায়, কেউ আবার বাণ-মারা দেখতে চায়। তাদের হাত থেকে বাঁচবার ক্ষমতা নেই নিবারণ মাঝে-মাঝে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মনে হয় আবার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সে বনে চলে যাবে। হিমালয়ে চলে যাবে। ইতিমধ্যে একদিন অনেক দূর চলে গিয়েছিল। রাত থাকতেই উঠে চলে গিয়েছিল। পরামণি জানতে পারেনি।

পরামণির একটু একটু সন্দেহ হতো। বলতো—তুমি আর পালিয়ে যাবে না তো ?

নিবারণ বলতো—কিন্তু আর আমার ভালো লাগে না গো—

—কী করলে ভালো লাগবে তোমার বলতো ? তাই না-হয় করি !

নিবারণ বলতো—নাহয়কেই আমার আর ভালো লাগে না। দেখছি না সবাই কেবল টাকা টাকা করে পাগল হচ্ছে। সবাই রাজা হতে চায়। মূর্খদ্বায়ে সবাই ইঁ করে বসে আছে কখন নবাব মারা যাবে। কখন নবাবের শাস উঠবে। বেন জীবনটা কিছু নয়, টাকাটাই বড়। বেন টাকাটা চাড়া চনিয়ার আর কিছু নেই। জঙ্গলে পত্তরা থাকে, সেখানে ক্ষিধে পেলে তারা শিকার করে খায়।

কিন্তু কিধে পাক আর না-পাক, সব সময়ে কার কতি করবো, কাকে ঠিকাবো, এই ভাবনাই সবাই করছে—

গঙ্গামণি এ-সব কথা বুঝতে পারতো না।

নিবারণ বলতো—এই দেখ না, বাঁড়ুন্ডো মশাই খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে তাই তার কথার জীবন চৌধুরীর সব নান্দাটা করলুম। এতে বাঁড়ুন্ডো মশাই-এর লাভ হলো বটে, কিন্তু আমার কী লাভ? জীবন চৌধুরী মশাই আমার কী কতি করেছে শুনি যে আমি তার এই সর্বনাশ করতে গেলাম?

গঙ্গামণি বললে—আমি মেরেমাছর তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি, কিন্তু তুমি কেন চলে যেও না আবার ঘর ছেড়ে—

নিবারণ বললে—আমি তো থাকবো বলেই এসেছিলাম। ডেবেছিলাম আবার সংসার-ধর্ম করবো, কিন্তু দেশের লোক আমাকে আর দেখছি দেশে থাকতে দেবে না।

—তা'হলে চলে গেলে আমাকেও নিয়ে যেও। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাবো।

—তুমি কি আর বনে গিয়ে থাকতে পারবে? সেখানে বাঘ ডালুক মেখে তোমার ডর করবে।

—বনে-জঙ্গলে কেন, অস্ত্র কোনও গাঁয়ে চলো না। যেখানে ভালো লোকরা থাকে, সেখানেই চলো।

নিবারণ বললে—সে রকম গাঁ কোথায় পাবো?

গঙ্গামণি বললে—কেন, স্ত্রীতোহুটিতে চলো না। শুনেছি নাকি কিরিন্দীরা সেখানে এসে কেল্লা বানিয়েছে। গঙ্গার ধারে থাকবো। নবাবের হুকুম পালন করতে হবে না।

নিবারণ বললে—সেখানেও হুকুম ডাঙিল করতে হবে কারো-না-কারো। আর সে কিরিন্দীর শহর, সেখানে কি ধর্ম-কর্ম কিছু করতে দেবে ডেবেছ? তাই রেছ। আমাদের কাছে ও মুন্সিফাবাদের নবাবও যা, ওই কিরিন্দীরাও তাই। সবাই নিজের নিজের কাজ-কারবারের মতলব দেখছে চৌপর দিন। আমরা গরীব লোকেরা খেতে পেলুম কি পেলুম না, সে দিকে কারো মাথা-ব্যথা নেই।

কথাগুলো শুত শুনতো গঙ্গামণি ততই মনে মনে ভয় পেত। একদিন গয়লা-বউকে চুপি-চুপি বললে সব কথা।

গয়লা-বউ সোজা গিয়ে বাঁড়ুন্ডো মশাই-এর কাছে সব বললে। বাঁড়ুন্ডো মশাই সেইদিনই ডেকে পাঠালেন নিবারণকে। নিবারণ আসতেই বললেন—তুমি নাকি আবার পালিয়ে যাবার কথা ভাবছো নিবারণ?

নিবারণ বললে—আর পালাবার পথ নেই কর্তাবাবু, সে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বাড়ুজ্জে মশাই বললেন—গুনছি তোমার ছেলে হয়েছে একটা। খবরদার বলছি, এখন আর কোথাও বেও না। তোমার তো কোনও দুঃখ বাধিনি আমি। তোমার খাওয়া-পরাহ দুঃখও বাধিনি-কিছু। তবে কেন তুমি পালিয়ে যাবে?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, আমার আর ভালো লাগে না এসব। মাহুকের সঙ্গে থাকতে আর ভালো লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না তোমার?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে মাহুকের বড় লোভ, মাহুকের বড় ধারণা মন। মাহুকের কেবল কেনন করে পরের কতি করবে সেই কথাই ভাবছে দিনরাত। এখানে থাকতে থাকতে আমার মনটাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের নাম করত্রেও কুলে যাচ্ছি!

—কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমার ছেলে বউ-এর কী হবে?

নিবারণ বললে—তাই তো আমিও ভাবছি!

—তুমি চলে গেলে আর কিন্তু আমি তোমার ছেলে-বউকে দেখতে পারবো না। তা বলে রাখছি।

নিবারণ কিছু বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আন্তে আন্তে মাথা নীচু করে বললে—আজ্ঞে কর্তাবাবু, আপনার অন্তেই আজ আমার এই হাল হলো। আপনি কোর করে ধরে আমার সংসারী করালেন। ইহকাল তো দেখেছেন, কিন্তু পরকাল? পরকালের কী হবে?

বাড়ুজ্জে মশাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন—পরকালের ভাবনা দেখছি তোমারই বড় হলো নিবারণ। নবাব আলীবর্দী রয়েছে, ইংরেজ ফিরঙ্গীরা রয়েছে। তাদের তো পরকালের চিন্তা নেই তোমার মত। তারা কি কষ্টে আছে বলতে চাও?

নিবারণ এ-কথার কিছু জবাব দিলে না। বাড়ুজ্জে মশাই বললেন—জীবন চৌধুরীও জন্ম হয়েছে। বাতে মুনিবাবারে নবাব-সরকারে ঘুব দিয়ে ছাড়া না পার, তার ব্যবস্থা তোমার করতে হবে—এখন যাও!

নিবারণ আন্তে আন্তে বাড়ির দিকে চলে এল। কিন্তু স্থপার ভারী হবে এল মনটা। গুরু কাছে এই অন্তেই কি দীক্ষা নিয়েছিল নিবারণ? এই জীবন চৌধুরীকে মারবার অন্তে আর সিরাজ-উদৌল্লাকে রাজা করবার অন্তে! রাজারও তো রাজা আছে। সেই রাজাকেই যে নিবারণ মনে-প্রাণে পূজা করে। সেই রাজার রাজত্বে বাস করবার অন্তেই এতদিন এত তপস্বী করে এসেছে।

নিবারণ ঠিক করলে—এবার আর কারো কথা শুনবে না সে, এবার আবার সে হিমালয়ে চলে যাবে। জীবন চৌধুরী বাই হোক, আর সিরাজউদৌল্লাহ বাই হোক, তাতে তার কিছু এসে যায় না।

(ক্রমশঃ)

লা গলো কোন জন্তু এই মানুষের ছেলে মানুষকে প্রতিপালিত করেছে। বেবুন, ভালুক বা নেকড়ে নাম নিশ্চয় এর পালক-পিতা। এই রকম ধরনের ঘটনা বিরল নয়; পূর্বেও এই ধরনের wolf-boy দেখা গিয়েছিল। বেবুন ভারতবর্ষের কোন জঙ্গলে দেখা যায় না। রামুর কাঁচা মাংস খাওয়ার অভ্যাস ও আগ্রহ দেখে সবাই ঠিক করলেন যে, নেকড়ে বাঘ দ্বারা নিশ্চয় এক সময় ও পালিত হয়েছিল। খুব ছেলেবেলার নেকড়ে বাঘ হয়তো ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সম্ভাব্য মত প্রতিপালন করেছিল। ১২৬২ সালে হাসপাতালে পুরেনি (pleurisy) রোগে সে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসকরা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, জন্তুদের যে এক বিভিন্ন ধরনের pleurisy হয়, রামুরও তাই হয়েছিল। এই থেকে ডাক্তাররা সিদ্ধান্তে এলেন যে, অন্ততঃ ছ'সাত বৎসর রামু অন্তরঙ্গভাবে বালাজীবন জন্তুদের সঙ্গে কাটিয়েছে। ডাক্তাররা সকলে অবাক হয়েছেন, এত বৎসর পর্যন্ত 'রামু' কেমন করে বেঁচে আছে। সাধারণতঃ এই ধরনের মানুষ-জন্তুরা বেশী দিন বাঁচে না।

ডাক্তাররা এখন বলছেন যে, রামু কখনও তার জন্তু-বৃত্তি ত্যাগ করতে পারবে না। সব সময়ে সে বিছানায় শুয়ে থাকে, অস্ত্রের সাহায্যে একটু-আধটু হাঁটতে পারে, তাকে বাইয়ে দিতে হয়, খেলাধুলা সে কিছুই জানে না। সব সময় মনমুগ্ন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। এত বৎসর পরেও সে কোন রকম কথা বলতেও শেখেনি। 'রামু' বলে ডাকলে সে ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তোমাদের পৃথিবীতে

ঐশ্রভাকর মারি

তোমাদের পৃথিবীতে নেই, ভাই দুঃখ,
তোমাদের পায়ে-চলা পথ নয় কষ্ট।
সর্বদা হাসি-খুশি, প্রাণে চাঞ্চল্য,
ধরবে বা করবে তা, আশ—নয় কল্যা।
আত্মিক প্রত্যয়ে, হে নিকষিগ্র,
দূর করো সমস্ত বাধা আর বিষ।
আমরা কালের আগে ক'বি কত অঙ্ক,
তোমরা এগিয়ে যাও চির-নিঃশঙ্ক।
হে কিশোর, দুঃস্থ দুঃষ্ট,—
স্বাস্থ্য যে, উৎসাহে করো তাকে পুষ্ট।

তোমাদের পৃথিবীতে নেই এক বিন্দু
কে ধনী কে নির্ধন, মুসলিম-হিন্দু।
সংখ্যার সূতো দিয়ে টানবে হৃদয়কে
তোমাদের অবহেলা করে কোন মূর্খের ?
এশ্বের ক্রীট নও, কত কিছু জানতে
বার্লিনে, ডাবলিনে যাবে নানা প্রান্তে।
চকচকে বুদ্ধি ও ঝকঝকে স্বাস্থ্য,
যও না—হওরা চাই মানুষটা আশ্রয়।
হে কিশোর, দুঃস্থ দুঃষ্ট—
তোমরা জানিয়ে দাও, জীবন অনন্ত।

বেল খাও

ডাঃ শতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ডাক্তার হুত্রস্ত পেনকে ছেলের দল খিরে ধরলো। বাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, দেহ রোগশূন্য হয়—এমন একটা ব্যবস্থাপত্র করে দিতে হবে। ছেলের দল নাছোড়বান্দা। ডাঃ সেনের নিকট হতে ব্যবস্থাপত্র না নিয়ে তারা ঘাবে না।

ডাঃ সেনের বখেটে কান্ন ছিল, অথচ ছেলেদের আবদার না রেখেও উপায় নেই। বললেন, নিয়মিত বেল খাও; স্বাস্থ্যও ভাল হবে, দেহে রোগও থাকবে না। শরীরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে।

কথা শুনে ছেলের দল হেসে উঠল। বলল, আপনি ফাঁকি দিয়ে এড়াতে চান। বেল একটা ফল ও আবার কেউ বায় নাকি! কি যে বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাঃ সেন মুহূ হাসলেন, বললেন, ঐ তো তোমাদের দোষ; বেলকে তোমরা কলের মধ্যেই গণ্য করো না। লাভ নেই বলে বেলের গুণ সম্বন্ধে কোন খোঁজই নাও না, কিন্তু বেলের অনেক গুণ মনে রেখো। বেল শুধু ফল নয়, বেল ওষুধও বটে।

ছেলের দল শুনে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বলল, কি রকম?

ডাক্তারবাবু বললেন, আগেকার দিনে, যখন ডাক্তার ছিল না, বৈজ্ঞানিক সব সময় পাওয়া যেতো না, তখন অনেকে এই বেল দিয়ে নানা রকম রোগ ভাল করে দিতেন।

ছেলের দল মুখ কাচুমাচু করে বলল, কি রকম আমাদের বুঝিয়ে দিন না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন। তোমরা ত বেল দেখেছ। এই বেল ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। অনেকেই বেলের গুণ জানেন না বলেই আজ বেলের আমর খুব কম। কিন্তু মহাদেবের নিকট বেল খুব প্রিয়। বেল ও বেলপাতা পেলে মহাদেব যেমন সন্তুষ্ট হন, অন্ন কিছুতে ভেমন হন না। মহাদেব হসেন আবুর্বেদের ঝট্টা। কাজেই অন্ন কেউ বেলের গুণ না জানুক, মহাদেবের কিন্তু বেল সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচুর। বোধ হয় এই কারণেই তিনি বেলকে এত ভালবাসেন।

বেলের গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। বেল শুধু ফল নয়—এক রকম ওষুধও বটে। বেল নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করলে ক্ষুধা হয়, পেট পরিষ্কার থাকে, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি

করে। কলেরা মহামারির সময় বেল নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করলে—কলেরা হয় না। তাই বেল কলেরার প্রতিষেধকও বটে।

বেল পাকা কাঁচা দুইই খাওয়া যায়। বেলের গুণ দুই রকম। কাঁচা বেলের গুণ এক রকম, পাকা বেলের গুণ আরেক রকম। কাঁচা বেল ধারক, পাকা বেল সারক। খাদ্যের প্রতিদিন পেট পরিষ্কার হয় না, ক্ষুধা থাকে না, তাঁরা যদি প্রতিদিন পাকা বেল খান, তাঁদের পেট পরিষ্কার হবে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাও হবে। অনেকের পাকা বেল খেলে অম্বল হয়, তাঁরা বেলের ব্যবহার করেও খেতে পারেন।

পাকা বেল অল্প ভাবে খাবার উপায় নেই। কিন্তু কাঁচা বেলকে অনেক রকম করে খাওয়া যায়।

কাঁচা বেলকে আগুনে পুড়িয়ে, আখের গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে বেল আমাশয় ভাল হয়। অনেকে আবার কাঁচা বেলকে ছোট ছোট করে কেটে রোদে শুকিয়ে নেন, তারপর হাড়িতে রেখে দেয়, এর নাম বেলন্তটো। যদি কেহ আমাশয়, উদরাময়, গ্রহণী বা অতিশার রোগে ভোগে, তাদের বেলন্তটো নিয়মিত ভাবে দিনে দু'বার করে নিলে অমৃতের মত কাজ করে থাকে।

কাঁচা বেলকে আর এক রকম করে খাওয়া যায়। এটা ব্যবহারীরা ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছে। এর নাম হ'ল বেলের 'মোরক্স'।

বেলের 'মোরক্স' জলখাবার হিসাবে ব্যবহার হয়। ইহা খুব লঘু ও উপাদেয় খাদ্য। ইহা ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, আমাশয় থাকলে তা ভাল হয়। অল্পতে পেট বেশ ভরে। ক্ষুধাও হয়।

কাজেই বেলকে অনাদর করা উচিত নয়। তোমরা যদি নিয়মিত ভাবে বেল খাও, যেখানে এক মাসের মধ্যে তোমাদের দেহের উন্নতি হবে। পরস্পর খরচও খুব কম হবে।

বেলের আর এক নাম শ্রীকল।

দোষ-দুর্বলতা জ্ঞানী ও মূর্খসকলেরই কিছু-না-কিছু থাকে, পার্থক্য এই যে মূর্খের দোষ দুর্বলতা দুনিয়ার সকলেই দেখিত পায়, দেখিত পায় না কেবল সে নিজ। আর জ্ঞানীর দ্বিত কিছু দোষ-দুর্বলতা, তা কেবল তিনি নিজেই সব দেখিত পান,—অপর তা দেখিত পায় না।

ছেড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের স্পিন বোলার লাল গিবস। গিবস মাত্র ৬ রান দিয়ে একাই ভারতবর্ষের বাকি ৮টা উইকেট পান; বল করেন ১৫০৩ গুভার এবং মেডেন পান ১৪টা। গিবসের অপ্রত্যাশিত বোলিং সাফল্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের গুণ হয়।

চতুর্থ টেস্ট খেলা পলি উমরীগড়ের খেলা হিসাবে দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অরণীয় হয়ে থাকবে। তৃতীয় টেস্ট খেলার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের লাল গিবস শুধু বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু পলি উমরীগড়ের অসাধারণ কৃতিত্ব বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে।

উমরীগড় তাঁর এই ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুৰ্যে দলকে শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য দিতে পারেন নি; কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের গোরব যথেষ্ট নিশ্চয় করেছেন এবং শোচনীয় ব্যর্থতার লজ্জা থেকে দলকে বাঁচিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে উমরীগড় ১০৭ রানে ৪টা উইকেট পান এবং দলের প্রথম ইনিংসে ৫৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রান করে নট-আউট থাকেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে এই ধরনের সাফল্য খুব কম খেলোয়াড়েরই ডাগো ঘটেছে। চতুর্থ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের চতুর্থ উইকেট পড়ে যায় দলের ১২২ রানের মাধ্যম। দ্বিপ্রাণীর সঙ্গে ৫ম উইকেটের জুটিতে উমরীগড় খেলতে আসেন। ভারতবর্ষ এই সময়েও ৫৫ রানের পিছনে ছিল। লাক্ষের সময় ভারতবর্ষের স্কোর পাঁড়ায় ২৮৫, ৮ উইকেট পড়ে, তখন উইকেটে খেলছিলেন উমরীগড় এবং নাদকার্নী। উমরীগড়ের রান ৬৩ এবং নাদকার্নীর ২ রান। ভারতবর্ষের বাকি ২টা উইকেট পড়ে ১৩৭ রান উঠে এবং এই ১৩৭ রানের মধ্যে উমরীগড়ের একাধি রানই ছিল ১০২। ২ উইকেটে নাদকার্নী এবং উমরীগড়ের জুটিতে ২৩ রান ওঠে, দলের ৩৭১ রানের মাধ্যম ২ম উইকেট পড়ে। শেষ উইকেটে খেলতে নামেন কুম্ভরাম। কুম্ভরামকে নিয়েই উমরীগড় খেললেন এক ঘণ্টা, এবং ১০ম উইকেটের জুটিতে দলের আরও ৫১ রান ওঠে। কুম্ভরামের রান সংখ্যা ৪। চতুর্থ দিনের লাক্ষের পরবর্তী খেলা উমরীগড়েরই খেলা, সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বোলাররা দাঁত বসাতে পারেনি। উমরীগড়, দীর্ঘ সময় উইকেটে থেকে শেষ পর্যন্ত ১৭২ রান করে নট-আউট থাকেন।

পঞ্চম টেস্ট খেলার ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে শেষ হয়। এত কম রানে ভারতবর্ষকে আউট করার কৃতিত্ব ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় লেটোর কিংয়ের। কিং মাত্র ২০ রান দিয়ে ভারতবর্ষের ৪টা উইকেট ফেলে দেন। প্রথম দিনে ভারতবর্ষ শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে মাত্র ২৫০ রানে আউট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মাধ্যম উপর যেমন চড়ে বসেছিলেন, তেমনি প্রথম দিনেই কিংয়ের মারাত্মক বোলিংয়ে যা যেয়ে হুড় হুড় করে নেমে আসতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চম টেস্ট খেলার পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই জয়লাভের ফলে ওয়েস্ট

ইণ্ডিজ একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে। ইতিপূর্বে এই রকম সম্মান মাত্র দুটি দেশ পেয়েছে—অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩১-৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্বদেশে মাত্রিতে টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই জয়লাভ করে। ইংল্যান্ড এই সম্মান লাভ করে ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ড-সফরকারী ভারতবর্ষের বিপক্ষে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এ পর্যন্ত চারটে টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রত্যেকটি সিরিজেই 'রাবার' সম্মান এইভাবে পেয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ১—০ খেলায়, ১৯৫২-৫৩ সালে ১—০ খেলায়, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩—০ খেলায়, এবং ১৯৬২ সালে ৫—০ খেলায়। উভয় দলের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে ২৫টি। এই খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১০, ভারতবর্ষের জয় ০ এবং খেলা ড্র ১০।

এবারে টেস্ট সিরিজের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়পড়তা-তালিকার ভারতবর্ষের পক্ষে পলি উমরোগড় শিবস্থান লাভ করেছেন। ব্যাটিংয়ে তাঁর হিসাব এই রকম : খেলা ৫, ইনিংস ১০, নট-আউট ১, এক ইনিংসের খেলার সর্বোচ্চ রান ১৭২ নট-আউট, মোট রান ৪৫৫ (গড় ৪২.৪৪)। বোলিংয়ের হিসাব : ১৫৬ ওভার, ৬৭ মেডেন, ২৪৯ রান এবং ৯ উইকেট (গড় ২৭.৬৬)। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (১৭ টা) পেয়েছেন সেলিম দুরানী। দুরানী বোলিংয়ের তালিকায় পেয়েছেন তৃতীয় স্থান এবং ৯টা উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন বাপু নাথকারী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন ফ্রাঙ্ক ওয়েল (মোট রান ৩৩২, গড় ৮৩.০০) এবং বোলিংয়ে ওয়েসলে হল (৪২৫ রানে ২৭ উইকেট ; গড় ১৫.৭৪)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের যোহন কানহাই মোট ৫৯৫ রান করে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করার গৌরব লাভ করেছেন। নিজ দলের তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট খেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৪৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯

ভারতবর্ষ : ৪৫৪, দিল্লী, ১৯৪৮-৪৯

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান :

ভারতবর্ষ : ৯৮, পোর্ট-অব-স্পেন, (১ম টেস্ট, ২য় ইনিংস), ১৯৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২২২, কানপুর ১৯৫৮-৫৯

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান :

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ২৫৬ রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১৭৩ (নট-আউট) পলি উয়গ্রীগড, পোর্ট-অব-স্পেন (৪র্থ টেস্ট, ২য় ইনিংস)। ১৯৬২

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী :

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১৬২ ও ১০১ এভার্টন উইল, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ভারতবর্ষের পক্ষে : শূন্য

সেঞ্চুরী : ওয়েস্ট ইন্ডিজ—৩৩, ভারতবর্ষ ১৩

—

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

মধুদি'র উদ্দেশে

মৌমাছির গুহনেতে ভরল আমার মন ।
বিহার দেশের একটি কোণে থাকে তোমার
বোন ॥

মোচাক তো নম্রকো শুধু মৌমাছির বান্দা ।
অমবে মধু, নেবো মোরা, এইতো প্রাণে
আশা ॥

তোমার দিবি মধুর চাকে মিষ্টি মধু ভরা ।
মধুদি'গো লাগনা ঢেলে একটু ক'রে ঘরা ॥
তোমার সাথে পাতাই মিতা এই মধুরই
আশে ।

আনি মোরা মধুদি'থে কতই ভালবাসে ॥
কিন্তু হঠাৎ আজ কিছুদিন নীরব কেন তুমি ।
লক্ষ্মী দিদি কি দোষ আমার ; তোমার পায়ে
চুমি ॥

দুটো চিঠি ব্যর্থ হ'ল, ব্যর্থ হ'ল আশা ।
ব্যর্থ আশায় দুঃখ যে কি, বুঝে না পাই ভাষা ॥
নেইকো মনে, গেছই ফুলে, রাগ করছ কি ?
কমা মাগি, রাখো না হর তোমার করে শ্রি ॥
বিহার দেশের বোনটি বলেই করছ অবহেলা ।
কাব্য করে, চোখের জলে, ভাসাই চিঠির
ডেলা ॥

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্তী

সে কি কাণ্ড !

পুলিঘায় আমাদের বাড়ী থেকে বেশ
কিছুটা দূরে আমাদের একটা বাগানবাড়ী
আছে। সেই বাগানবাড়ীতে আমার দাদু
থাকেন। আমরা দেখানে মধ্যে মধ্যে বেড়াতে
যাই। এবারও, একদিন আমরা ঠিক করলাম
যে, দাদুর কাছে বাগানে বেড়াতে যাব।
আমার বাবার মামার বাড়ীটাও আমাদের
বাড়ীর সামনে। বাবার মামার মেয়ে জয়ন্তী
আমার বন্ধু। আর সেই বাড়ীরই আর
একজন মহিলা হলেন আমার মার বন্ধু।
আমি তাঁকে মীরা পীসি বলে ডাকি।

মা মীরা পীসিকে ও আমি জয়ন্তীকে
আমাদের সঙ্গে বাগানে বাবার সঙ্গে বললুম।
তারা রাজী হয়ে গেলেন। বাবা নিজে
গাড়ী চালিয়ে আমাদের নিয়ে যাবেন বলে
দ্বিধ ছিল। বাবার দিন জয়ন্তী ও মীরা পীসি
এসে হাজির হলেন। তারপর আমরা পাঁচজনে
ও আমার ছোট ভাই সৌম্যকে নিয়ে ছ'জনে
যাত্রা করলুম এবং যথা সময়ে এসে বাগান-
বাড়ীতে পৌঁছলুম। বাগানে এসে মনের
আনন্দে খুব ঘোরাঘুরি করলুম, নানা রকমের
ফুল তুললুম, পুকুরের পাড়ে পাড়ে ছুটোছুটি
করলুম। বেশ কাটলো দিনটা। ফেরবার
সময় হয়ে এলে সৌম্য বাবাকে বললে,
ফেরবার সময় কিন্তু বাবা অনেক ঘুরে-ফিরে
বেতে হবে। বাবা রাজী হয়ে গেলেন।

সত্যিই ফেরবার পথে শহর ছাড়িয়ে
আমরা অনেক দূর চলে গেলুম। এখন

রামকৃষ্ণ মিশনের 'বিজ্ঞাপীঠ' যা আগে কেবল মাত্র দেওঘরে ছিল, তার একটা অংশ এখানেও স্থাপিত হয়েছে। আমরা সেই বিকেই চলতে লাগলুম। হঠাৎ কিছু দূর বাবার পর একটা জনমানবহীন জায়গায় আমাদের গাড়ীটা গেল বিগড়ে! বাবা তড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে, কলকল সব দেখে-তনে বললেন যে, এখন সবাইকেই হাঁটতে হবে,—হাঁটা ছাড়া উপায় নেই, কারণ তেল ফুরিয়েছে।

আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। সূর্য তখন ডুবে গেছে, অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। মশার সমবেত সংগীত, শিয়ালের হুঙ্কার আমাদের সার সজ্জাঘণ জানাতে লাগল। কিন্তু জনমানবহীন জায়গায় অন্ধকারের মধ্যে এই সজ্জাঘণে আমরা সকলেই ভয়ে কাট হয়ে যেতে লাগলুম। বাবা হনহন করে এগিয়ে চলেছিলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে বীতিমত প্রায় ছুটেছি। কিন্তু খানিকটা পরে দেখি বাবাকে আর দেখাই যাচ্ছে না। আমরা চোঙাতে লাগলুম, 'বাবা একটু গাড়িও।' বাবা চেষ্টা করেই বললেন, 'ভয় নেই, আর একটু পরেই রামকৃষ্ণ মিশন বিজ্ঞাপীঠে এসে পড়বে।'

জাগিয়াস সেদিন একটু জ্যোত্তা ছিল তাই রকে! পথটা কোন রকমে আমরা বেধতে

পাচ্ছিলুম। এমনি করে হেটে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের চোখের সামনে আলো-কলমলানো বিজ্ঞাপীঠের ছবি ভেসে উঠল এবং আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে গেলুম। বাবা গিয়ে স্বামীজীদের সব কথা শুলে বলতেই তাঁরা তখনই তাঁদের জীপ গাড়ীতে করে তেল আনার ব্যবস্থা করে দিলেন, নিজেরা গাড়ীতে গিয়ে সেই তেল ভরে দিলেন। বাবাও অবশ্য তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তারপর আমরা ওখানে খেরেদের বিশ্রাম করে গাড়ী এলে তাতে চড়ে বাড়ী ফিরলুম।

সর্বস্বত্যাগী পরোপকারী স্বামীজীদের এই আন্তরিক আতিথেয়তার কথাও যেমন মনে থাকবে, তেমনি আবছা-অন্ধকার রাতে জনমানবহীন অপরিচিত জায়গায় শেরালের ডাকের মধ্যে দিয়ে ভয়ে ভয়ে পথচলার কথাও অনেকদিন ভুলবো না!

বাড়ী ফিরে মা বাবাকে বললেন, 'পথে আমাদের অন্ধকারের মধ্যে কেলে তুমি হনহন করে এমন এগিয়ে যাচ্ছিলে কেন?'

বাবা হেসে বললেন, 'তুমি-কেমন সাহসী তাই পরীক্ষা করার জন্যে।'

কুমারী রুমেল্লা মিত্র
(বয়স ১০)

নতুন বই

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

আবির্ভাব—ইন্দিরা দেবী। প্রথম
সাহা কর্তৃক ১০ বি মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা ২
হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—৭২২
পুস্তকালয়, ৩ কলেজ রোড, কলিকাতা ১২।
মূল্য ৩'০০

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত
অনেক বইয়ের মধ্যে, ছোটদের প্রিয়
লেখিকা ইন্দিরা দেবীর (তোমাদের মধুদি')
এই বইখানিও অন্ততম। তিনি তাঁর সহজ
স্বন্দর ভাষার কবিতার রবীন্দ্রনাথের জীবন-
কথায় এই বইখানি লিখেছেন। প্রধানতঃ
ছোটদের জন্য লেখা হলেও, বড়রাও বইখানি
পড়ে আনন্দ পাবেন এবং কবির আবির্ভাব
থেকে শেষ তিরোধানের কাহিনী পর্যন্ত বিশেষ
বিশেষ ঘটনাবলীর কথা জানতে পারবেন।

বইখানিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ
করেছেন ইন্দিরা দেবী। প্রথম আবির্ভাব,
দ্বিতীয় জোড়াসাঁকোর কথা, তৃতীয় ২৫শে
বৈশাখ, পঞ্চম শৈশব, চতুর্থ কৈশোর। তারপর
একটানা কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে জীবনের
শেষ দিন পর্যন্ত।

বইখানির ছাপা, বাধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট
এবং তিন রঙে আঁকা প্রচ্ছদপটটি দেখলে
সকলেরই ভাল লাগবে। আমরা বইখানি
তোমাদের সকলকেই—পড়ে দেখতে বলি।

ঘুম-ভাঙানী ছড়া—শ্রীশুকমল
দাশগুপ্ত। শ্রীরমেশ সোম কর্তৃক ১০এ,
হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা ১৪
হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১'২৫

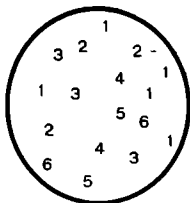
অমদিনের মধ্যে শুকমল দাশগুপ্ত ছোটদের
এক ছোট ছোট ছড়া ও কবিতার বই লিখে
শিশু-সাহিত্যে বেশ নাম করেছেন। তাছাড়া
তাঁর বইগুলিও ছবি, ছাপা ও কাগজ প্রকৃতির
দিক থেকেও খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

'ঘুম-ভাঙানী ছড়া' খুব ছোটদের জন্যে
লেখা, আগাগোড়া বড় (এট) টাইপে ছাপা
এবং বড় বড় ছবির ছবিতে ভরা। তিন
রঙের প্রচ্ছদপত্রসহ শিল্পী ধীরেন বলের
আঁকা বইয়ের এই ছবিগুলি দেখলেই ছোট
ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট হবে।

আর এই ছড়ার বইটির আর একটি
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলি সবই বর্তমান যুগোপ-
যোগী—ড্যাম, কল-কারখানা, পথ-ঘাট, বান-
বাহন, লোহালম্বড়, রেল-ইঞ্জিন, ঘরবাড়ী
ভৈরী, চাষবাস, লেখাপড়া, জাহাজ, এয়ারপ্লেন
প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা। আসলে ভারতের
বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে যে সকল বিষয়ের
উন্নতি হচ্ছে, সেই সকল বিষয়ে। ছোটদের
ওগাফিঁদালা করার জন্যেই বোধহয় লেখক
ছড়াগুলি লিখেছেন।



বাজিকর



$$\square + \square + \square =$$

$$\square \times \square \times \square$$



(১) নীচে বৃত্তের প্রথম ছবিটির মধ্যে কতগুলি সংখ্যা আছে। বৃত্তটির মধ্যে একটা দেখা টেনে এমন ভাবেই ঐ সংখ্যাগুলিকে ভাগ করতে পার কিনা দেখ, যাতে উভয় অংশেই যোগফল পঁচিশ হয়?

(২) মথুর ছবিতে ছয়খানি স্নেট দেখতে পাচ্ছ। ঐ স্নেটে তোমার ইচ্ছামত এমন সব সংখ্যা বসাতে হবে, যাতে উপরের তিনটি সংখ্যার যোগফল নীচের তিনটি সংখ্যার গুণফলের সমান হয়।

(৩) নীচে সরলরেখা দিয়ে আলাদা আলাদা ছয়টি ছবি করা হয়েছে। ওর একটিতে একটা ভুল আছে। কি ভুল বলতে পার?

(উত্তর বেরবে আগামীবার)

পাত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ক্ষেত্রগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ধরা যেতে পারে—কর্ণ ও লম্ব। কর্ণের দিক দিয়ে ১ম চিত্র ও ৪র্থ চিত্র পরপর রাখা যেতে পারে।

লম্বের দিক দিয়ে ২য় চিত্র, তারপর হবে নতুন চিত্র একটা—যার উপরের দিকেও উঠবে একটা লম্ব এবং ক্ষেত্রটি সমান চারটি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হবে। তারপর বসবে ৩য় চিত্রটি এবং সর্বশেষে শেষ চিত্রটি। তা'হলেই পরপর সামঞ্জস্য রেখে সাজানো হবে।

২।



ছবি দেখ। ফোটা দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন পথে কম সময়ে প্রহরী সবগুলি কুঠরীর চারিদিকে ঘুরে আসতে পারবে। এতে মাঝখানের কুঠরী দু'টির দু'দিকে মাত্র দু'বার বেশী ঘোরা হয়েছে।

৩। ডেরোপি'পড়ে। ৪। কান, চোখ, হাত, মুখ।

৫। পাল্লার একদিকে A. B. C এবং অপর দিকে D. E. F চাপাও। যদি দু'দিকের ওজন সমান হয় তা'হলে বুঝতে হবে G. H. I বাটখারার কোন একটির ওজন কম-বেশী আছে। ২য় বার পাল্লার একদিকে G এবং অপর দিকে H চাপাও। যদি এরা সমান হয় তা'হলে I বাটখারার ওজন অল্প রকম আছে বুঝতে হবে।

কিন্তু ১ম বারে যদি A. B. C এবং D. E. F সমান না হয়, তা'হলে বুঝতে হবে G. H. I-এর ওজন সমান আছে। তখন ২য় বারে একদিকে A B এবং অপর দিকে D E দিয়ে দেখতে হবে যদি ওজন সমান হয়, তা'হলে C বা F-এর মধ্যে কোন একটির ওজন কম-বেশী আছে বুঝতে হবে। তখন ৩য় বার ঐ দুটি দু'দিকে চাপালেই বুঝা যাবে কোনটির ওজন কম-বেশী।

৬।

১৪
৪৭
৩৬
৯৮
২
১০০

এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলি এইভাবে যোগ করলে ১০০ সংখ্যা পাওয়া যাবে।



মূল-কাইনাল, খ্রি-ইউনিভারসিটি

পরীক্ষা সব কিছু শেষ হয়েছে। এবার পরম নিশ্চিত আর সামনে বিরাট অবসর। যতদিন না পরীক্ষার খবর প্রকাশিত হয়,—তা ধরো পুরো আড়াই তিনমাস। এ সময়টা তোমরা কি করবে? শুধে-বসে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে? অনেক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম অবিশ্তি দরকার

—বিন্দু সে তো দীর্ঘদিন ভালো লাগে না। আমার মনে হয় এই সময়টা তোমরা সমাজসেবার কাজে নিজেদের ব্যবহার করতে পারো। যারা একটু বড় এবং গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করো বা সেখানেই বাজীঘর—তার। এসময় গ্রানোহতির কাছে আত্মনিয়োগ করতে পারো। গ্রামের বেশ সব পথঘাট আসন্ন বর্ষায় ডুবে যাবে, পথ চলা বিপদজনক হয়ে পড়বে, সেই সব ঝাটকাকে। এবং তার আশপাশের জমিকে উঁচু করে দিতে হবে, পথ কেটে দিতে হবে। জল সরে যাবার সহজ উপায়টির কথা ভাবতে হবে। যারা শহরে থাকে তারা বর্ষায় গ্রামের অবস্থার কথা ভাবতেই পারবে না হয়তো। কাজেই এ সময় গ্রানোহতির যে কত কাজ থাকতে পারে তা তারাই জানে, বাদেই গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তোমরা যারা ছোট, তারা বড়দের সাহায্যে এসব কাজ করবে, যতটুকু ক্ষমতা সেইটুকুই করতে চেষ্টা করবে। তোমরা কাজে এগিয়ে এশেচ্ দেখলে বড়দের সাহায্য পাবেই।

আর বাদেই মৈত্রিক পরিচয় করা সম্ভব নয়, তারা কি করবে? কি কাজ হবে তারের? ধরো গ্রামে শিশু-কিশোরদের জন্য একটিও ভালো পাঠাগার নেই। এ সময়ে তোমরা এ-কাজটির জন্য এগিয়ে আসতে পারো। একটি পাঠাগার স্থাপনের কত প্রয়োজন তা সকলেই বুঝতে পারবেন। ভালো ভালো গল্পের বই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, ইতিহাসের গল্পের বই—এছাড়া চড়া কবিতা, নানা গল্প, বাহাদুর, মহাভারত ইত্যাদি বই সব ধীরে ধীরে যোগাড় করে একটি সুন্দর ছোটখাটো পাঠাগার করে কেলো। তোমাদের এই শুভ-প্রচেষ্টা দেখবে ক্রমশঃ বড়দের সাহায্যে কতখানি সার্থক হয়ে উঠবে। একদিন দেখা অসম্ভব নয়—যে তোমাদের ক্ষুদ্র হাত ও মন দিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলো তা আর ক্ষুদ্র নেই। বিরাট এক পাঠাগার সেই জায়গার স্থান পেয়েছে। দেখো, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তোমরা সর্বদা মনে রেখো যে তোমরা স্বাধীন ভাবভঙ্গির স্বাধীন নাগরিক—নাগরিকের পূর্ণ প্রকাশ হয় নিজের দেশকে গড়ে তোলার মধ্যে। আর দেশকে গড়ে তুলতে হলে চাই স্বাধীনতা, চাই বিজ্ঞা, বুদ্ধি এবং সর্বোপরি জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের মাধ্যম কেবল মূল-কলেজের নিদিষ্ট কয়েকটি বই নয়, এই সবের জন্য দরকার একটি ভালোমত পাঠাগার। পাঠাগারই হলো জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম।

প্রতিদিন সংবাদপত্রে যে খবরটি সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়ে—সেটি হলো দুর্ঘটনা। হয় গাড়ীর তলার,—অর্থাৎ বাস, লরী, মোটর ইত্যাদি, নহতো জলে ডুবে—কিনা অল্প কোনও অনাবধানতার দুর্ঘটনা ঘটেছে, আহত হয়েছে, মারা গেছে—এই কেবল চোখে পড়ে। অবশ্য দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। কেউ তা ইচ্ছা করে গাড়ীর তলার চাপা পড়ে না কিংবা জলে ডুবে যায় না। তবে নিতানৈমিত্তিক যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার লজ্জা আমরা কিছুটা দারী। না, ঠিক আমরাও দারী নয়, দারী আমাদের বন্ধু অভ্যাস। শহরে বড় বড় রাস্তায় যেখানে বৈজ্ঞানিক আলোর সাহায্যে বানবাহনের চল-কোলা নিয়ন্ত্রণ করা হয়—সেক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দেশ ও নিয়ম আছে যা পথ-চারীদের বিশেষভাবে মনে চলা উচিত। তা অনেকক্ষেত্রেই আমরা মানি না। এতে আমরা দুর্ঘটনার সংখ্যাকে ক্রমশই বাড়িয়ে তুলি। তাছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চলন্ত ট্রাম বাস থেকে নামবার বা উঠবার অভ্যাস আমাদের মধ্যে খুব প্রবল। ট্রাম বা বাস থামার পর উঠলে বা নামলে কোন কতিই হয় না, কিন্তু বোধহয় বয়োচিত্ত বাহাদুরী দেখানোর অনাবশ্যক উদ্ধাসে আমরা চলন্ত বাস বা ট্রাম থেকে ওঠা-নামা পছন্দ করি। তাছাড়া হুলগামী ছোটরাও ফুটপাথ ছেড়ে বেন পথে নামতেই বেশী ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেদিন বেখলাম রাষ্ট্রীয় পুরিবহনের একটি ছ'তলা বাস বেন ক্রতগতিতেই আসছে আর একজন পূর্ববঙ্গ ভ্রমলোক তা বেধেও তাড়াতাড়ি দাড়া পার হবার চেষ্টা করছেন—স্থলের বিষয় কর্তব্যরত ঝটিক পুলিশ তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়ে একটি মূল্যবান জীবনের সম্ভাব্য সমাপ্তি বোধ করেছিলেন—কথার বলে ‘সাবধানের মার নেই।’ প্রবাস বলে উড়িয়ে না দিয়ে রাস্তার চলাকেরার সময় মনে রাখলে দুর্ঘটনার হাত থেকে হরতো বাঁচা যাবে।

চিঠির উত্তর—মালবিকা ও মাধবিকা বন্ধ, রাণীগঞ্জ—চীনের প্রাচীর সম্পর্কে যে হিসাব করা হয়েছে, সেই হিসেব অনুযায়ী প্রাচীরটি লম্বায় ২৫৪০ মাইল, প্রাচীরের চওড়া ২৫ ফুট, ওপরটা ১৫ ফুট চওড়া আর খাড়াই ১৫-৩০ ফুট পর্যন্ত। শ্রাবণী, মোহুরী, কোলকাতা; সূতপা পাল, কোলকাতা; রণেন্দ্র লাহিড়ী, হাওড়া; রাধা দত্ত, বাবু ঘোষ, বউবাজার, কোলকাতা—রেভিওর আবির্ভাব কে তা একটু দেখে নিলেই জানতে পারতে। যাই হোক সাধারণভাবে বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক মার্কনীকেই রেভিওর আবির্ভাব বলা যেতে পারে। সব চেয়ে আগে হার্টজ নামে এক বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। রেভিওর আবিষ্কারে অচার্য জগদীশচন্দ্রের দানও কম নয়। কিন্তু মার্কনীই সব চেয়ে আগে বেতাবের মারকৎ ধবর পাঠাতে সক্ষম হন, ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে। উমা, পলি, মিক্টু, নিউ ব্যারাকপুর। কুন্ডল হাট, হায়াং ঝাঁলেন; বারু, অবু, অগ্নি কোলকাতা; পুতুল মৈত্র, বাঘে; চিত্রা চক্রবর্তী, আদানসোল; চিহ্ন ও মুকুল, কোলকাতা—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের ইন্দিরা দিদি

ঐহধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বক্সি চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রকৃত প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬, হইতে মুদ্রিত।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র



৪৩শ বর্ষ]

আবাত—১৩৬৯

[৩য় সংখ্যা

তোমরা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

একালের ছেলেমেয়ে—সব খাশা আছো—

খাও-দাও, হাসো-খ্যালো, গান গাও, নাচো !

ভেরোশো মালে, কি, তার আগে জন্ম নিলে—

হাসিখুশী পুঁছে যেতো—চমকাতো পিলে !

সেকালেতে ছোটদের বিধি ছিল কড়া—

উঠিতে বসিতে ছিল শত দড়ি-দড়া !



যেমনি সকাল হলো, বই নিয়ে বসো—

আকাশে রঙীন আলো, পাখী গায় গান—

মুগ্ধ করে মানো, নয় অন্ধ কবো !

সেদিকে যেমন চাওয়া, মলো দুই কান !

মাড়ে ন'টা যেই বাজা, মাথা পাতো কলে—

নাকে-মুখে ভাত গুঁজে ছোটো ইস্কুলে !

টীচার গম্ভীর মূর্তি—হাসি নাই মুখে—

পড়া ভুল হলে মারে ঘুঁষি-চড় রুখে !





খেলার নাহিকে। পাট, ব্যায়াম অজানা—
ইস্কুল পাথরে গড়া—যেন জেলখানা !
খেয়ে দেয়ে মুখ নেই, ভয়ে এতটুকু—
মন ম'রে ভূত যেন—আশান এ বুক !
সেকালের বাবা—উঃ, ছিলেন গম্ভীর—
চোখে-চোখে দেখা হলে গায়ে বেঁধে তীর !



ছটোপাটি করেছে। কি অমনি হুংকার—
“লেখা নেই পড়া নেই—ছুঁচো কোথাকার !”
ছিল নাকো কুটবল, লুডো, ব্যাগাটেল—
পিংপং, রেশ-গেম, মোটর বা রেল !
চকোলেট কিবা বস্ত্র, জ্ঞানতো না ছেলে—
স্বর্গ যেন হাতে পেতো লজ্জাশ পেলে !
জলছবি, ছড়ি, লাট্টু, হাড়ডুডু খেলা —
তাই নিয়ে কোনো মতে কাটিতো যে বেলা !



রবিবারে আরো কষ্ট—বাবা আছে ঘরে—
মা বলেন, “পড়ো লেখো বসে চুপ করে !
ছুটোছুটি দাপাদাপি চোঁচামেচি নয়—
পিঠে ছাল রবে নাকো।” ছিল কত ভয় !
একালে জুজুর ভয় ঘরে ইস্কুলে—
একেবারে নেই,—তাই ক্ষোভ নেই মূলে ।



আকাশে বাতাসে আলো, হাসি চাঁদমুখে—
মা-বাবা দরদী বন্ধু, আছো সব মুখে ।
ইস্কুলে পড়া হয় আর হয় বেলা—
মিটিং, ক্রিকেট, স্পোর্টস—প্রমোদের মেলা ।
টীচার করেন গল্প, বাবা খেলা-সাথী—
ছবি গল্প কিনে দ্যান—বেড়ে ওঠে ছাতি !
হাসিখুশী হয় ঘরে ; পাথরেরতে প্রাণ—
একালে জেগেছে দেখি, আশানে বাগান ।



বকামি হবে না আজ যদি গান গাও—
সেরা গানে জয়মাল্য, মেডেল,—তা পাও ।
খেলাতে যে কষ্ট হয়, কত তার মান—
পড়ার বেলার দাম একালে সমান ।
একালে জন্মেচো তাই বাঁচো সত্যি করে—
সেকালের ছেলেরা তো ছিল বেঁচে মরে !



পাঁচটি বালি হাঁস

শিলাদিত্য

(১)



চিহ্না হুব। শীতকাল।

সকাল বেলা রোদ ঝলমল করছে। বীল জলে
কয়েক ঝাঁক হাঁস খেলা করছে। রঙ-বেরঙের হাঁস।
নানা, ছেয়ে, লালমুণ্ডি, স্নাওলা রং—আবও কতো কি!
সেই জলে খেলা করবার জন্তে বালি হাঁস তার
বান্ধাদের নিয়ে চলেছে। যা চলেছে আগে আগে—
একটু দুলতে-দুলতে—তাকে ঘিরে চলেছে তার বান্ধারা।
পাঁচটা বান্ধা। ছোট ছোট—যেন তুলো দিয়ে তৈরি
গা। হৃন্দর দেখতে।

বজ্রাতের খাড়ী শিকরে বাজ খুব উচুতে উড়-
ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল বালি হাঁসটাকে। সোঁ-সোঁ
করে খুব নিচুতে নেমে এল। তারপর জানা মুড়ে,
মাথাটা নিচের দিকে করে, এক টুকরো পাখরের মত
পড়ল বালি হাঁসটার ওপর। প্যাক-প্যাক ঝটপট
আওয়াজ হ'ল। তার পরই দেখা গেল হাঁসটাকে

নোখে গিঁথে, খাবার মধ্যে ধরে, বাজপাখীটা ওপরের দিকে উড়ে চলেছে। হাঁসের গলাটা লম্বা হয়ে
ঝুলছে নিচের দিকে। উচুতে আবও উচুতে উড়তে লাগল বাজপাখী। কোথায় দূরে কোন
গাছের ডালে বসে হাঁসটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে কে জানে!

রাহুলে পাখী, পেটুকের শেষ !!

(২)

মা-হারা ছোট বান্ধাগুলো মরেই যেত। চোখে পড়ে গেল জেলের সর্দার গুণাকর মাকির।
নৌকায় বসে দূর থেকে গুণাকর শিকরে বাজের কাণ্ডটা দেখছিল। বৈঠার হুঁচাবটে যা মেঝে
নৌকাটা ডাঙার কাছে নিয়ে এল। বান্ধাগুলো জলের ধারে দাঁড়িয়ে, ঘাড় কিরিয়ে তাকাচ্ছিল আর
খুঁজছিল তাদের মাকে। আলতো হাতে গুণাকর বান্ধাগুলোকে একটা চুপড়ির মধ্যে তুলে নিল।



বাড়ী নিয়ে গিয়ে দাঁওঘার ওপর রেখে দিল। ক্যানের সঙ্গে কিছুটা ভাত মিশিয়ে একটা কাঁসি খাল্য করে দিল খেতে। কি ভীতু বাচ্চাগুলো! কেউ কাছে এলেই দাঁওঘার কোণে গিয়ে লুকবে—আর একটা বাচ্চা আর একটার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ডাকবে পিঁক্-পিঁক্-কিঁক্। লোকজন চেষ্টার আড়াল হলেই দাঁওঘার এমিক-ওমিক ঘুরঘুর করবে—কাঁসি খাল্য মুখ ডুবিয়ে ক্যান ভাত গলার মধ্যে টেনে নেবে—আর মাথাটা উত্থর ফিকে করে ক্যানস্থ ভাত গিলবে আর মাথা গলা নাড়বে।

বাড়ীতে ছিল কুলো কুকুর। সে একবার দাঁওঘার ওপর এসে বাচ্চাগুলোকে দেখে নিল। মুখ দিয়ে আওগান বের করল গব্ব-রব্ব, বেউউ। বাচ্চাগুলো ভয়ে পিঁক্ পিঁক্ করে উঠল। ওণাকর এসে কুকুরটার ঘাড়ে এক চড় বসিয়ে দিল। কুকুরটা নেমে গড়ল দাঁওঘা থেকে। বুঝে নিল বাচ্চাগুলোকে জ্বালাতন করলে মার খেতে হবে।

(৩)

বাচ্চাগুলো বড় হ'তে লাগল। বাড়তে লাগল তাড়াতাড়ি। দিন রাত খাই খাই প্রবৃত্তি। ভাত খায়, ভিজে ছোলা খায়, কুচো চিংড়ী খায়, গেড়ি গুলি খায়, কৈচো কৈচো খায়, ব্যাং ব্যাঙচি খায়, কলমী শাক খায়। শেলে ভাল তরকারিও খায়। খায় আর বাড়তে থাকে। পিঁক্ পিঁক্ ডাক ঘুচে গেল। মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে প্যাক্-প্যাক্-কৌয়াক্।

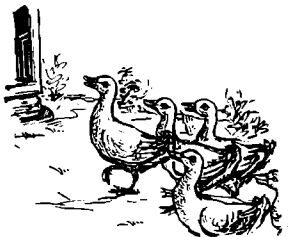
দাঁওঘা থেকে উঠান, উঠান থেকে বাগান, সেবান থেকে বাড়ীর পেছনের ডোবা—সব জায়গার ঘুরছে। ডোবাটা সীতরে তোলপাড় করে তুলল।

একটা হাঁস ছিল খোঁড়া। যেদিন তাষের মাকে বাজখাবী মারলো, সেই সময় বাচ্চাটার

পায়ে বাজপাখীর ডানার ঘা লেগে-ছিল। তাইতে গিয়েছিল ওর পা মচকে। সেই পা আর সবটা খারলো না। বাচ্চাটা বড় হ'ল কিন্তু হাঁটতে একটু খুঁড়িয়ে। খোঁড়া ছিল পালের গোদা।

গুণাকরের ভারী পোষ মানলো তারা। ডোবার সীতার দিচ্ছে হাঁসগুলো—এমন সময় উঠোন থেকে গুণাকর ডাক দিল চই-চই, চই-চই, আ—র। হাঁস-গুলো তখন উঠে পড়ল ডোবার।

গদর-গদর করে চলো উঠোনের দিকে। খোঁড়া চলো লবার আগে। গুণাকর ভাত আর কুটো চিংড়ী সেধ মাথছে গামলায়। হাঁসগুলো গুণাকরের পায়ের ঠাক দিয়ে ঘুরছে। পায়ে পালক ঘবছে। গুণাকর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে মাথাটা পায়ের ওপর ঘবতে থাকে। তারপর গামলা থেকে খায়। সব ক'টা এক সঙ্গেই খায়।

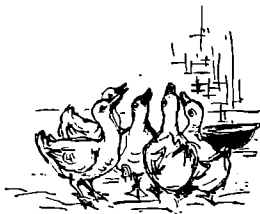


(৪)

শীত কুরিয়ে গরম পড়ল। দলে দলে হাঁসের দল চিন্তা থেকে উড়ে চললো—নিজের দেশে। কোন দল বাবে উত্তর আসামে—সেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলে খেলে বেড়াবে। কোন দল বা বাবে শিকিমে—তিতাব চরে বেড়াবে। কোন দল চলো আরও উত্তরে ডিব্রুতে মানসরোবরে।

দকাল থেকে আকাশে দেখা যায় উড়ন্ত হাঁসের দল—ডাকছে আর উড়ছে, ইক-ইক-হোয়াক্। একটা কি কুটো উড়ে চলে আগে—পথ দেখিয়ে—পেছনে ওড়ে দল। একটা দলে পকাশ, বাট, একশো।





গুণাকরের হাঁসগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে আর নিষেদের মধ্যে প্যাক প্যাক করে কি কথাবার্তা বলে। খোঁড়াই বেশী কথা বলে আর বেশী বেশী তাকার আকাশের দিকে। একদিন সকালে খোঁড়া হাঁস উড়লো আকাশের দিকে। সঙ্গে উড়লো তার আর সব ভাই বোনরা। ইক-ইক-ইক প্যাঁক। নীল আকাশে সাগা মেঘের তলা দিয়ে উড়ে চলে—গেল দিগন্তে মিলিয়ে।

গুণাকর তো অবাক।

(৫)

মাসের পর মাস যায়। আবার এল শীত। হাঁসের পাল, ঘারা গরম পড়তেই ঘেঁষে গিয়েছিল ঠাণ্ডার ফিরে এল চিম্বার বলে। তাদের সঙ্গে ফিরে এল গুণাকরের পাঁচটি হাঁস।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা বেলায় এক-ছড়া হালায় মত উড়তে উড়তে আকাশ থেকে নামল হাঁসেরা। যেন কিছুই হয় নি। প্যাক প্যাক আওয়াজ করে উঠোনে এসে চুকল। সেই পুরোনো গামলাটার কিছু ছোলা ভিজে পড়েছিল। মুখ বাড়িয়ে খেতে লাগল আর হারে হারে ডাকতে লাগল কৌরাক-স-কৌরাক—হানে, কোথায়—সব কোথায়।

গুণাকর ছিল বাগানে। হাঁসগুলোর ডাক শুনে ছুটে এল। বললে—“আরে, তোরা ফিরে এসেছিস্—বেশ বেশ।”

খোঁড়া হাঁস বলে—কৌরাক, অর্থাৎ হ্যা।

গুণাকর তাড়াহাড়াই বাগানের থেকে নিয়ে এল ভাত আর ছ্যান। আর নিয়ে এল কুচো চিড়ী সেদ্ধ। হাঁসেরা পেট ভরে খেল।

তারপর সারারাত তাদের কি বকবকানি। কি যেন তর্ক চলছে তাদের মধ্যে। খোঁড়া হাঁস বলছে ইক, হানে এইখানেই থাক। অন্তগুলো মাথা নাড়ে, আর বলে কঁ—কঁকন। কখনও না।

তারি আর ঘরে থাকবে না। সন্ধান পেয়েছে নীল আকাশের, খোলা মাঠের। খোঁজ

পেয়েছে নদী খাল, বিল,
জলার। নদী পেয়েছে হাঁকার
হাঁকার হাঁসের মধ্যে।

ছোট্ট ঘর জোবা তাদের
আটকে রাখতে পারবে না।

কি মনে করে চেনা
জায়গায় নেবে পড়েছিল।
এখন প্রাণ চাইছে তাদের চলে
যেতে। দূরে, আরও দূরে, বহু
দূরে।

শেষে খোঁড়া হেরে গিয়ে
চূপ করল। ভোর হ'তে না
হ'তে হাঁসগুলো উঠোন থেকে
গেল বাগানে।

গুণাকর বরষায় ঝড়িয়ে
দেখতে লাগল হাঁসগুলো কি
করে।

ধানিকণ প্যাক প্যাক
করে ডেকে পাঁচটি হাঁসই
আকাশে উড়ল।

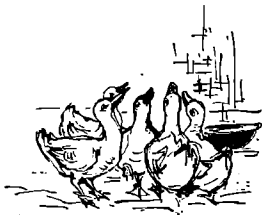
তার। বাবে আরও
দক্ষিণে—বেথানে আর সব
বালি হাঁসেরা গিয়েছে।

আকাশ থেকে খোঁড়া ডাকল—হং হো—ইক্। বিদায়।

গুণাকর আশা করে রইল হাঁসেরা আবার আসবে।

উন্মুক্ত ধরিত্রীর আর মুক্ত জীবনের দ্বারা সম্মান পেয়েছে তারা কি আর ফেরে ?





গুণাকরের হাঁসগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে আর নিজেদের মধ্যে প্যাক প্যাক ক'রে কি কথাবার্তা বলে। খোঁড়াই বেশী কথা বলে আর বেশী বেশী তাকায় আকাশের দিকে। একদিন সকালে খোঁড়া হাঁস উড়লো আকাশের দিকে। সঙ্গে উড়লো তার আর সব ভাই বোনেরা। ইক-ইক-ইক প্যোয়াক। নীল আকাশে দাদা মেঘের তলা দিয়ে উড়ে চলো—গেল নিগঞ্জে মিলিয়ে।

গুণাকর তো অবাক।

(৫)

মাসের পর মাস যায়। আবার এল শীত। হাঁসের পাল, বাঁরা গরম পড়তেই দেশে গিয়েছিল ঠাণ্ডার কিরে এস চিকার জলে। তাদের সঙ্গে ফিরে এল গুণাকরের পাঁচটি হাঁস।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা বেলায় এক-ছড়া মালায় মত উড়তে উড়তে আকাশ থেকে নামল হাঁসেরা। যেন কিছুই হয় নি। প্যাক প্যাক আওয়াজ করে উঠোনে এসে ঢুকল। সেই পুরোনো গায়লাটায় কিছু ছোলা ভিজে পড়েছিল। মুখ বাড়িয়ে খেতে লাগল আর মাঝে মাঝে ডাকতে লাগল কৌয়াক-সু-কৌয়াক—হানে, কোথায়—সব কোথায়।

গুণাকর ছিল বাগানে। হাঁসগুলোর ডাক শুনে ছুটে এল। বললে—“আরে, তোরা কিরে এসেছিস—বেশ বেশ।”

খোঁড়া হাঁস বললে—হৌয়াক, অর্বাং ইয়া।

গুণাকর তাদাতাড়ি রাষ্ট্রাঘর থেকে নিয়ে এল ভাত আর ফ্যান। আর নিয়ে এল বুচো চিড়ী সেদ্ধ। হাঁসেরা পেট ভরে খেল।

তারপর সারাবাত তাদের কি বকবকানি। কি যেন তর্ক চলছে তাদের মধ্যে। খোঁড়া হাঁস বলছে ইক, হানে এইখানেই থাক। অন্তগুলো মাথা নাড়ে, আর বলে কঁ—ওঁকুন। কখনও না।

তারা আর ঘরে থাকবে না। সন্ধান পেয়েছে নীল আকাশের, বোলা মাঠের। খোঁজ

পেয়েছে নদী খাল, বিল,
জলার। সসী পেয়েছে হাজার
হাজার হাঁসের মধ্যে।

ছোট্ট ঘর জোবা তাদের
আটকে রাখতে পারবে না।

কি মনে করে চেনা
আয়গায় নেমে পড়েছিল।
এখন প্রাণ চাইছে তাদের চলে
যেতে। দূরে, আরও দূরে, বহু
দূরে।

শেষে খোঁড়া হেরে গিয়ে
চূপ করল। ভোর হ'তে না
হ'তে হাঁসগুলো উঠোন থেকে
গেল বাগানে।

গুণাকর দরজায় দাঁড়িয়ে
সেখতে লাগল হাঁসগুলো কি
করে।

খানিকখণ্ড প্যাক প্যাক
করে ডেকে পাঁচটি হাঁসই
আকাশে উড়ল।

তার। যাবে আরও
দক্ষিণে—বেখানে আর সব
বালি হাঁসের। গিয়েছে।

আকাশ থেকে খোঁড়া ডাকল—হং হো—ইক্। বিদায়।

গুণাকর আশা করে রইল হাঁসের। আবার আসবে।

উন্মুক্ত ধবিত্রীর আর মুক্ত জীবনের যারা সন্ধান পেয়েছে তারা কি আর ফেরে ?



কিটু মি'য়া

শ্রীশ্রীবিজ্ঞান

কিটু মি'য়ার টাট্টু ঘোড়া ঘররিয়া রোগে,
প্রতি মাসের সর্বভিখি পেটের ব্যথায় ভোগে।
দিনরাত্তির দাঁত খিচিয়ে চি'হির মিহি সুরে
মরলো আহা শ্যাওড়াতলার চারপাশটা ঘুরে।

কিটু মি'য়ার অ্যাঙ্ক সেসিঅন ইঠাং কাবু অরে
খরখরিয়ে কাপলো শুধু পাঁচটি বছর ধরে।
শেষকালেতে নাসিক থেকে নাকুরাকোদয় গিয়ে,
পাখি করে লাউডগা আর পটোল পাতা দিয়ে।

কিটু মি'য়ার পটুহাতি ইঠাং রেগেমেগে
পিলখানারই দরজা ভেঙ্গে সেদিন গেল ভেগে।
ভক্তদাসের শক্ত মেসো লেজে মোচড় দিয়ে
আসাম থেকে হাজির হোল কালিম্পং-এ নিয়ে।

কিটু মি'য়ার স্বয়ং সেদিন 'বুঝার' হোল ভারী
জল ভেবে সে করলো সাবাড় বিশটি রসের হাঁড়ি।
সেই থেকে হায় কট্‌মটিয়া ছট্‌কটিয়া রোগে
অঙ্ক কমে দম দমা দম বিয়োগ এবং যোগে।

—

বিড়ালের প্রাণ !

কথায় বলে বিড়ালের শক্ত প্রাণ—হয়তো তাই। একটি ঘটনার কথা বলি—আমেরিকার
ওহায়ো শহরে এক ইটের পাকার গুড়ে একটা বিড়াল বেরুতে পারে না—পাকাতখন আছে—
আঙনের তাপ ২০০ ডিগ্রী ! সেদিন পরে বিড়ালটার উদ্ধার হ'ল। সকলে দেখে—অমন আঙনের
তাপেও সে বেঁচে আছে ; তবে গায়ের ছ'চার জায়গা ঝুলে গেছে মাজ !

দাড়িম্বের দারুলিপি

ঐপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বোকা গেল মৈত্যাটা নিতান্ত মূৰ্খ, লেখাপড়ার ধার ধারে না। মূৰ্খদের ওপর এরওর বড়ো অবজ্ঞা, সে প্রাণের ভয় ভুলে বুক ফুলিয়ে বললে, “মৈত্যারাজ দাড়িম্ব আপনাদের কাছে রাজকর চেয়েছেন। দশটা বাঘ আর পঞ্চাশটা হরিণ রূপোচৌকন নিয়ে আপনি এখনি চলো আমাদের সঙ্গে। নইলে মহারাজের রোষিত হতে আপনার চওমুণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে।”

তিমিঝিল ভো অবাক। বললে, “রাজকর কাকে বলে? রূপোচৌকনই বা কি ব্যাপার? এমন কি পাগলের মতো বকছিল তোরা?”

এরও বললে, “ও, আপনি দৃতীয় ভাগ পড়েনি বুঝি? তাই রূপোচৌকনের মানেটা অহুমোহন করতে পারছেন না। মাহুঘেরা রাজাকে খাজনা দেয়, রূপোর টাকা পাঠায় কোটোরে মধ্যে ঢাকনা ঢাকা দিয়ে, তাকে বলে রূপোচৌকন। তা আমাদের রাজা রূপো চায় না, বাঘ আর হরিণ চায় কেবল। আপনি তার প্রজ্ঞা হাছ কিনা, এটা হ'ল তারই মৈনিক বিকৃতি।”

তিমিঝিল কি ব্রহ্মে সেই জানে, রেগে আগুন হয়ে গেল। বললে, “হুস্তোর রাজার নিকৃতি করেছে! রাজাফাজা আমি মানি না। সবচি পেটের জ্বালায়, আর তোসের দুটোকে বাই আগে।”

ঘেরও এরওর গা-টিপে কানে কানে বললে, “ব্যাপার হবিধে লয় তায়, ফুডুং।” এরওর তখনও মেজাজ গরম। মাথা নেড়ে তিমিঝিল বললে, “উহু, সেটি হবার জো নেই। স্বামীমা বলে দিয়েছেন, দৃত অমেধ্য।” “তার মানে?” “তার মানে সকলকলাপারহৃত, মানে সকলকে কলা দেবিয়ে পারে গমন করতে পারি আমরা।” ঘেরও বললে, “তায়, ফুডুং।”

তিমিঝিল বললে, “সে আবার কি? ঘাড়টি মটকে এখনি তোদের রক্ত চুষে খেলে ঠেকায় কে?”

এরও বললে, “আমরা রাজার দৃত, শশানচতীর বরে রক্ত আমাদের খাজা বিধ হয়ে আছে, খেলেই উদ্ভতে হত্যা হবেন। সন্ধ করতে বাধা নেই, অজীর্ণ করতে পারবে না আপনি।”

অজীর্ণতে অনেকদিন ভুগেছে তিমিঝিল, চিন্তায় শড়ল। একটু ভেবে বললে, “তবে চল, তোদের রাজাকেই খেয়ে আসি।” ঘেরও হাঁক ছেড়ে বাঁচল, বললে, “সেই ভালো, আজ্ঞে।

রাজ্যমশায়ের লগ্নর শরীলটি খেলে তবু স্বখ হবে কিছু, কিন্তু, আমাদের চিন্তা হাড়ে আছে কি ? তাহলে এখন বিদায় বিন, মোষণাট লিখো না।” সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

তিমিরিল বললে, “আরে পাড়া, পাড়া, সঙ্গে নিয়ে চল। তোদের রাজ্য থাকে কোথা ?” এরও বললে, “আপনার তো শিয়ালদ পর্বত ঘাতায়াত আছেন, সেখানে পৌঁছে সোজা উত্তর-পূবে লিরাঙ্গন করলেই আমাদের রাজবাড়ী চোখে পড়বেন, আজ্ঞে।”

তিমিরিল বললে, “তোদের রাণী আছে বলছিলি না ? তার গতির কেমন ? কত মাংস হবে ?” এরও বললে, “উহঁ, সেখানে চালাকি চলবেন না। তিনি মহাবিশেষী, অঘটনঘটন-পটীয়াসী।” তিমিরিল কিছুই বুঝলে না, বললে, “তার পারে খুব জোর বৃষ্টি ? তোদের চেয়ে বেশী ?” এরও বললে, “তার ব্রহ্মরাজ আছেন শরীরে। হাঁ করলেই বৃষ্টিতে পারবে আপনি।”

তিমিরিল আগেই হাঁ করে ফেলল। তার মামা বজ্রহস্তকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ, একটু ভয় পেয়ে বললে, “কি বুঝব রে ব্যাটা, বড়ো বড়ো গীত আছে ? চিবিয়ে খাবে আমাকে !” এরও বললে, “উহঁ। বহ্নাডবর বানান জানো আপনি ? পর্যবেক্ষণ ? রৌকুম্যান ? নিমিখ্যাসন কাকে বলে জানো ? প্রকচন্দন ? ব্যুৎপন্ন ? কহুৎ ? ব্যবকলন কথতে পারো ?”

তিমিরিল খালি বোকার মতো বাঁড় নাড়ে, শেষে এরও হতাশ হয়ে বললে, “তবে আপনার তাঁর কাছে না বাওয়াই মঙ্গল। সুবিধে হবেন না।” তিমিরিল হঠাৎ চটে উঠল, বললে, “ওদব আগড়ম্ব বাগড়ম্ব জেনে কি মরকার আমার ? এক ভাণ্ডার ঠাণ্ডা করে খেয়ে ফেলব।” এরও বললে, “তবে তাই করবেন চলে। কিন্তু বড়েশ্বরী যদি নিমিখ্যাসনে বসে পিঙ্গলা কি সূর্য্য বানিয়ে গঠরজ্জ্বরের মধ্যে প্রেরণ করেন তোমাকে—আমাদের তখন বোব দেবেন না যেন।”

বলতে বলতে দুই ভাই চড়াই পাখীর রূপ ধরে ছুড়ুং। বৈভ্যরাজ দাড়িয় ঘেখানে ছায়ের উপর দোনার কলমে বসে জগৎস্বপ্ন বাজাজেন, সেইখানে এসে প্রণাম করে পাঁড়াল দুজনে। বাজনা ধামিয়ে দৈত্যরাজ বললেন, “কি সংবাদ ?” এরও বললে, “মহারাজ, সংবাদ বড়োই বিপর্দিত, তিনি আসছে।” দাড়িয় বললেন, “আসছে সে তো ভালো কথাই, আসতেই তো ভাকি হয়েছে। বাজনা আনছে কিনা বল ?”

• এরও বললে, “আজ্ঞে না, মহারাজ। লোকটা নিভাত্ত সুৰ্ব্ব, লিখন পড়তে পারে না, বহ্নাডবর বানান জানে না। রাজা বলে মানলেই না আপনাকে। ক’দিন শিকার পায়নি নাকি, আপনাকে স্বাক্ষণ করবার কত্র সূত্রীব হয়েছেন। আপনি পালাও।”

দাড়িয় গর্জন করে উঠলেন, “বত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। কাপুরুষ তোরা, নিজেদের

মতো ভীকু মনে করিস নাকি আমাকে? আজ লড়াই করব আমি, তার উদ্গ্রীব হওয়া বার করছি। বাটার হাড় খাব, মাংস খাব, চামড়া দিয়ে ভুগুগি বানাব, তবে আমার নাম দাড়িঘ।”

যেরও বললে, “তাই করুন, মহাবীর, আমরা শুভক্ষণ একটু জিরিয়ে লিই। মুখ হাতটা ধুয়ে আনি। ঐ যে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হচ্ছেন বেন, এসে পড়ল বলে। বোধকরি এতক্ষণে তাড়নহ পার হয়েছে।”

এরও বললে, “মহাবীর, স্রমসংবরণ করবার এখনও সময় আছে।”

যেরও এরও সরে পড়ল, দৈত্যবাজ ভাড়াতাড়ি ময়দানবের উপহার দেওয়া দূরবীক্ষণ বস্ত্রটা চেখে লাগালেন।

চোখ লাগাতেই চক্ষুধির। মেঝেন, মহেব জল ঘোলা করে, দিনের আকাশ কালো করে, পল ভরে মাটি কাঁপিয়ে তিমিঝিল আসছে। কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, মাথায় হাঁজার অন্নগরের মতো লটপট করছে তামাটে বংএর ভটা। একশ’ হাত লম্বা খাড়া জোয়ান, কাঁধে তার পঁচিশ হাত লম্বা এক লোহার মুহল; ‘আকাশে সেউটি বেন দুই চক্ষু জলে!’ দূর থেকে দূরবীনে সেই মূর্তি দেখেই দাড়িঘের মাথা ঘুরে গেল, সাত লাফে ছাদ থেকে নেমে বড়দার ঘরে হাজির। বললেন, “বাবী, তিমিঝিল আসছে।”

এরও যেরও তখন রাণীর পিছনে দাড়িয়ে কাঁপছে।



‘দৈত্যবাজ ভাড়াতাড়ি ময়দানবের উপহার দেওয়া দূরবীক্ষণ বস্ত্রটা
চেখে লাগালেন।’

খড়খা বললেন, “আহুক না, বেশ তো।”

দাড়িখ বললেন, “তুমি বুঝছ না! আমার দু'গুণ লম্বা, চারগুণ জোয়ান, চিবিয়ে খাবে আমাকে! কি করি এখন?”

ঘেরও বললে, “মহারাজ, ফুডুং।”

এরও বললে, “বাণীমাই তরমা।”

খড়খা এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর স্বামীকে আর চাকর দু'জনকে নিয়ে সোজা গেলেন বিবাম-মহলে। সেখানে দোলার ওপর ভোষক কাঁথা পেতে দাড়িখকে দিলেন উপর দিকে শুইয়ে, আর একখানা বিরাট কাঁথা এনে তাঁর সাত হাত দাড়িখকে খুঁটা তাকে দিলেন, একটু কেবল চুল আর কপাল বেরিয়ে রইল। এইবার দাড়িখের পায়ের দিকে এরও আর ঘেরওকে শুইয়ে দবার ওপর টান করে একখানি প্রকাণ্ড লেপ চাপা দিলেন খড়খা, হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন একজন লোকই সেই একশ' হাত দোলার এমুড়ো ওমুড়ো জুড়ে শুয়ে আছে। সব ঠিকঠাক করে খড়খা সেই দোলার পাশে দাড়িয়ে দোলা দিতে লাগলেন।

এদিকে তিমিসিল তো শিয়ালদহ পেরিয়েই খড়খার রাজপুরী দেখতে পেয়েছে, সেই মনে কানে গেছে তার জগদম্পের আওয়াজ। তখন কে মানে ডাঙ্গা আর কে মানে জল, এক এক লাকে একশ' হাত পার হয়ে ছুটে চলল নৈন্ত্য। ছলাং, ঝপাং, ধূশপা। কোথাও হাঁটুজলে ভেটকী কাংলা লাকায়, কোথাও শুকনো মাঠে মোঘ ছুটে পালায়। চক্কর নিয়ে ধাপা পেরিয়ে মহিবাবান, যেখানে দুটো মোঘ মুখে পুরে তাড়ন' ধর্মতলা পচুড়ে কাঁটাতলা পেরিয়ে কড়াইডাঙ্গা কুড়ুলবেড়ের মাঠ। সেখানে দাড়িয়ে এতক্ষণে নিরীক্ষণ করে দেখলে খড়খার রাজবাড়ীখানা, মেখে মেখে ভক্তি হ'ল মনে। সাতশ' হাত উঁচু বাড়ী সে জীবনে দেখেনি, তার ওপর অমন সাজনজ্ঞা। বাই হোক আর দু'পা এগিয়ে বাড়ীর সমর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সাহসে ভর করে, হাঁক দিলে, “দাড়িখ আছ। বলি ও দাড়িখবাবাজী, খাজনা নেবে তো বাইরে এস না, লুকোলে কেন?” সাড়াও নেই শব্দও নেই। অগত্যা তিমিসিল ঘাড় নিচু করে কোনো রকমে আশি হাত উঁচু দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রথমেই চিঁড়িয়াখানা, ধোপে ধোপে বাঘ, হরিণ, মহিব ময়ূর গোঁবা আছে। সেখান থেকেই জিত লকলক, নোলা লকলক! তখন কিছু কিছুই খেলে না সে, ভাবলে, ফেরার পথে ছালা বেঁধে নেব'খন।—কই হে, দাড়িখ আছ নাকি?” বলে আর এক হাঁক দিয়ে নব্বই হাত উঁচু দরজা ঠেলে, দু'শ হাত উঁচু ঘরটাতে ঢুকে ঘাড় সোজা করে বীচল। সে ঘরে চারদিকে লোহার বারবেল, লোহার ভাঁটা, লোহার মুগুর থরে থরে সাজানো, সেখানেও দাড়িখের দেখা নেই। তবে পাশের ঘরে লোকের সাদা পাওয়া গেল। খড়খা তখন দোলার দোলা দিয়ে গান ধরেছে,—

“খোকা হাসে খিলখিল, পেতে দেব তিমিলিল।

একটা মাথা, চারটে পা, যা খোকা, ঘুম যা!”

তিমিলিল উকি মেয়ে দখেল, এক বিরাট ঘোলায় এক বিরাট দৈত্য আগা-পাশতলা লেপ কাঁধা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে আর এক দৈত্য-বউ তাকে মৌল মিছে হর ক’রে গান গেয়ে গেয়ে। তিমিলিল গান শুনে হীতিমতো তড়কে গেছিল, তবু সাহসে ভর করে হাঁক দিলে, “ওহে দাড়িস্থ উঠে পড়ো। আমি তিমিলিল এগেছি, আমাকে ধাও, দেখি কত বড়ো মরম তুমি।”

খড়খা শিহন করে দেখলেন তিমিলিল দৈত্য কাঁধে লোহার মূল নিয়ে দাড়িয়ে আছে। চেহারা দেখে বুঝতে বাকী রইল না যে দাড়িস্থকে এক ঘায়ে ছাতু করে কেলতে পারে সে। খড়খা কিন্তু মোটেই ভয়ের ভাব দেখালেন না, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, “চূপ চূপ, খোকা ঘুমোচ্ছে। তুমি কে হে বাপু, ততলোকের বাড়ীর অন্তরমহলে না ব’লে ক’রে ঢুকে পড়ো,—কি বকম অসভ্য তুমি?”

তিমিলিল খণ্ডমত খেয়ে বললে, “আমি দাড়িস্থ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগেছি। দেখি ঘুমোচ্ছে? ডেকে ধাও তো ওকে।”

খড়খা বিষয়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, “তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ? এইটুকু ছেলে, মোটে ছিয়ানরুই হাত লম্বা যেটের বাচ্চা, একে তুমি দৈত্যরাজ বলে ভুল করলে কি বলে? সে কি তোমার মতো বামন? ধাও ধাও, খোকার ঘুম ভেঙে গেলে কুক্কেশ্বর কাণ্ড করবে এখনি। দৈত্যরাজ বাড়ী নেই, ভালো চাও তো এখনও সরে পড়ো।”

তিমিলিল ভো অবাঁক। ছিয়ানরুই হাত ধার খোকা ঘোলায় শুয়ে ঘুমোয়, সে নিজে না জানি কেমন? তা ছাড়া নিজে লম্বা বলে তার গর্ব ছিল, তাকে কিনা তার অর্ধেক মাপের বউটা বেঁটে বলে গালাগালি দেয়! সে খোঁচা দিয়ে বললে, “খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ, নিজে তো আমার কোমরের নীচে। তোমাদের দূত না ভূত কারা গেছিল তারাও তো তোমারই মতন বেঁটে। ছড়ায় বলে, ‘বেঁটে দৈত্য দৈত্য নয়, মূখ দেখলে নাইতে হয়’।”

খড়খা বললেন, “তা যে বা বলে বলুক। ওটা হ’ল আমাদের দৈত্যরাজের সখ। বেঁটে বামন পুষতে ভারী ভালবাসেন তিনি। আমাকে বেঁটে বলেই বিয়ে করেছেন। তা ব’লে ছেলে আমার বাপের দাত পাবে, এ ঘরে আর বেশীদিন ধরবে না একে। ওর ধাইকেও তো এঘরে ধরে না, ছেলে কোলে করলে ছাদে মাথা ঠেকে বলে, পারতপক্ষে এই তিনশ’ হাত ঘরে আসেই না সে। “ওরে গৌরাধা জানলা দিয়ে খোকার কিছুকটা দেতো না।” গৌরাধাকে শেখানো ছিল, সে ততক্ষণ শিহন দিকের চারশ’ হাত উচু ঘরটার একটা মই-এ উঠে বসেছিল। এ ঘরের ছাদের কাছাকাছি, মানে

হুশ' নকই হাত উঠতে যে ঘুলঘুলিটা ছিল, সেইটে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দৈত্যরাজের শিব পূজো করবার চোখ হাত কপোর কেশাখানা এগিয়ে দিলে, বললে, “এই যে বাগী মা, ফেলছি।” কোশ। পড়তেই খড়খ লুকে নিলেন। তারপর বললেন, “শিহন দিকে যে সাতশ' হাত উঠু ঘরটা ঐ ঘরে থাকেন রাজারশাই। তা তুমি কে বাছা।”

তিমিরিলের তখন বুক টিপটিপ করতে আরম্ভ করেছে। সে চৌক গিলে বললে, “আমি তিমিরিল মৈত্য়। হাল সাক্ষিয় সাগরবীপ।”

খড়খ তারি খুশি হয়ে উঠলেন, “ওমা, কোথায় বাব? ওরে গোহাখা স্তাখাখা, ঐগুগির জগদহাকে উঠুন আশ্রম দিতে বল। তিমিরিলবাবু এসেছেন।”

তিমিরিল বিনয় করে বললে, “থাক থাক, আগনি ব্যস্ত হবেন না।”

খড়খ বললেন, “ব্যস্ত হ'ব না মানে? থোকা আমার আজ সাত দিন ধরে বয়না ধরেছে তিমিরিল বাবে বা'লে। কর্তা সেদিন গল্প করছিলেন কিনা, তিনি মাছের তেল খেয়ে খেয়ে তিমিরিলের শরীরটি বাসা হয়েছে। তা আরি আশ্রই ভাবছিলুম কোথায় পাই তোমার, কাকে পাঠাই। মাহুখরা বলে কাকের মাংস নাকি কাকে খায় না, কে দেখতে গেছে বলো? তুমি বললে হয়তো ভাববে মিথ্যা কথা বলছি, কিন্তু আমরা মৈত্য়রা মৈত্য়োর মাংস খুব খাই। কালে খোলে অহলে, বড়া ক'রে, পিঠে ক'রে। আহা, আমার রাঁধুনি অগদখা তোমার ঐ তেল চুকচুকে দেহটি পেলে কি কাবাবই বানাবে! দে যে খাবে সে আর অয়ে ভুলবে না। তা তুমি তো আর খাবার জন্মে বেঁচে থাকবে না, থাকলে বলতে, “হ্যা, বেঁধেছে বটে, পার্থক্য রাশা শিখিয়েছিল বাপ-মায়ে। আমার ছেলেই তো সাত হাঁড়ি শেষ করবে। তবে ততক্ষণ ওর ওর সইলে হয়, ঘুম ভেঙে যদি দেখে বসে আছ তবে কাঁচাই খাবে হয়তো।”

তিমিরিলের বিশ্বয় বেড়ে চলেছে, বললে, “ঐটুকু ছেলে আমাকে বাবে?”

খড়খ বললেন, “তা বাছা বলা যায় না। বাপের ব্যাটা তো? ও ঘরে যে চুবিকাটি আর গুলি-ভাঙাগুলো দেখলে ওর, ঐ ছুঁড়েই তোমার মতো সাতটা মৈত্য়কে খুন করেছে ও। বাইরের ঘরে যে বাঘ আর মোষগুলো দেখলে ওগুলো ওরই অস্ত্রে রাখা আছে। ভালো করে চলতে শেখেনি তো এখনও, হাভাগড়ি দিয়ে বাঘ আর মুঠো মুঠো ধ'বে খায়।” তিমিরিল শিছু হটে হটে দরজার দিকে যাচ্ছে তখন, খড়খ বেন দেখেও দেখলেন না। বলে চললেন, “তোমার মতো চারটে জোয়ানকেও ঘাবেল করতে পারে এখনি। তা বেশ তো, বিশ্বাস না হয় একটু বসেই দেখ না কেন। ওরে গোহাখা, হাঁড়িটাতে জল চড়া, শিকার এসেছে।”

(ক্রমশঃ)

আমরা চা খাই কি বিষ খাই

ত্রিযামিনীকান্ত সোম

চা আঙ্গকাল আমাদের একটি প্রয়োজনীয় আহাৰ্য হয়ে ধাড়িয়েছে। কিছুকাল পূর্বেও এসেছে অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে চায়ের প্রচলন ছিল না। এখন ধনীর প্রাসাদ আর দরিদ্রের কুটীর, সর্বত্রই এর অখ্যাত প্রভাব। শহরের তো কথাই নেই, পল্লীগ্রামের গরীব, নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাড়ীতে ভত্সলোক এলে বা অভ্যাগত এলে আগে তাকে চা দিতেই হবে। চায়ের এখন কত আদর; এ যেন এক অতি অপরিহার্য বস্তু। সকালে উঠেই এক পেয়ালা চা আগে চাই-ই। চায়ের বিলম্ব হলে সর্বাঙ্গ বিকল হয়ে পড়ে। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ বুদ্ধে-
হুকেই বলেছিলেন—

“বিপদ সম্পদ ধন নাহি চাই,
বশ মান চাহি না;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই,
ভাল এক পেয়ালা চা।”

কিন্তু এই চা যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থে পূর্ণ এবং আমরা তা প্রত্যহ উদরস্থ করে শরীরের অপকার সাধন করি, একথা অতি অল্প লোকেই জানে। নিউইয়র্কের এক খ্যাতনামা ডাক্তার জন ব্রিডল্ (John Bridle) চা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গবেষণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, এক পাউণ্ড পরিমিত চা দ্বারা সত্তেরো হাজার খরগোসের প্রাণ বিনষ্ট হতে পারে। এক পাউণ্ড গুজনের চা এক কোয়ার্ট মলে ভাল রকম স্বেদ করে তার দশ ভাঁটা মাত্র একটি বলবান খরগোসকে খাইয়ে দেওয়াতে সে পঞ্চদশ পেয়েছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি এক পাউণ্ড চা তিন মাসে ব্যবহার করে থাকে। এই হিসাবে এত চা প্রত্যহ তাকে ব্যবহার করতে হয় যে, তা দ্বারা ১৭৫টি খরগোসের জীবন নষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যহ এতখানি করে বিষ পান করে থাকি, এ কথা বিশ্বাস করতে আমাদের ইচ্ছা হয় কি?

ভারতের নানান্থানে এখন চা উৎপন্ন হয়, কিন্তু এর আদি উৎপত্তি স্থান চীনদেশ এবং জাপান। বহুকাল ধাবৎ এর অতিথ অল্প দেশবাসীদের অজ্ঞাত ছিল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ইংলণ্ডে এর প্রথম আমদানী হয়। তখন ২ পাউণ্ড ২ আউন্স চা ইংলণ্ডেরকে উপচৌকন স্বল্প দেওয়া হয়, আর সেই সময় হতেই জনগণে চা ব্যবহারের স্বত্বপাত। এখন এক ইংলণ্ডেই প্রতি বৎসর দ্বোল-সত্তেরো কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়। ১৮৭৫ সালে বিলাতে ১২৮২৭২৭২ পাউণ্ড চা খরচ হয়েছিল, যার মূল্য ১,৪০,০০,০০০ টালিং অর্থাৎ ২১,০০,০০,০০০

টাকা। কিন্তু আমেরিকার হুঙ্কারো এবং সোভিয়েত রাশিয়ার চাষের ব্যবহার এর চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

চা পান করলে শরীরের অবসরতা দূর হয়ে সতেজ ভাব আসে বটে, কিন্তু তাতে অপকার তির উপকার নেই। এতে মাদকতা শক্তি থাকা হেতুই এর রকম হয়ে থাকে। মাদক দ্রব্য শরীরের রক্ত উৎপাদনে বা রক্তিকের পুষ্টিসাধনে কোন প্রকার সহায়তা করে না। চা'কে অনেকাংশে মাদক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যে যে উপাধানে চা পণ্ডিত, তার ভেতর মাদকদ্রব্য কি পরিমাণে আছে, বা কি প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে, তার পরীক্ষা কোন রসায়নবিৎ করেছেন কিনা জানা নেই; কিন্তু এর ব্যবহারে যে স্বাস্থ্যের কোন রকম উন্নতি হয় না, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। অধিকমাত্রায় চা ব্যবহার করলে আরবিক দৌর্বল্য, স্নানান্দা, মাথাধরা প্রকৃতি শারীরিক শ্রানি দেখা যায় এবং বেহের বর্ণ হলদে হয়ে চামড়া শিথিল হতে আরম্ভ হয়। চাষের সঙ্গে বিষাক্ত পদার্থ থাকা হেতু এরকম হওয়া সম্ভব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চতুর্থোধ্যায়

একি বোধ ভাই রে

• মাঠে ছায়া নাই রে, •

• • দেখ করে আনচান • •

বুঝি বা বেয়োয় প্রাণ,

তালপাছে চিল কাঁদে

কী খাই • কী খাই রে !

ভালো মতো বৃষ্টি

নাই নাই নাই রে,

হাওয়া কোথা মিষ্টি

বল ভাই পাই রে ?

জলে গেল—গেল বুঝি

পুকুরের সব পুঁজি,

কোপাইয়ের জ্বল

বেন পুড়ে ছাই রে !

পল্লনা আশা

শ্রীশিউলি শুক্ল

[আশা হাস। আকাশে নেই সজল মেঘের আড়ন, তাই করে না বৃষ্টিধারা করকর আবেগে। হৃৎকের আঙন-বরানো তাশে সব কিছু শুক, মরগ্রায়। অকস্ম গাছপালার সমারোহ নদীর তীরে। কিন্তু তারাও শূন্য, নেই কোন সমীচতার চিহ্ন তাদের পথে কিংবা পুষ্পে।]

নদী—কোথায়? কোথায় তুমি?

চম্পা—কাকে ডাকছ গো?

নদী—আর বল না। আমি তো সারাক্ষণ তাকে ডাকছি। কিন্তু সে শুনেছে কই? এই অবস্থিকর নিদারুণ গরম আমার কাছে অদৃশ হয়ে উঠেছে। আমার মনে নেই আনন্দ, কষ্টে নেই গান।

চম্পা—তোমার কষ্ট তো শুনলাম, এবার আমার দুঃখের কাহিনী শোন। আমার দিকে চেয়ে দেখ—দেখ, আমি আমার হৃৎকায় দৌলধ হারিয়ে কেলছি। হৃৎকের দৌলভ পান করেই তো আমার সর্বাঙ্গে জ্বালায় আলো খেলা করে। কিন্তু আচ্ছ! বুকে আমার আকর্ষণ তৃষ্ণা।

নদী—তাই বুঝি সন্ধ্যার দ্বিচ্ছ বাতাস তোমার দৌলভে হাতাল হয়ে ওঠে না? তাই তো গো আমার চরণেও নৃপুংস বাজে না মধুছন্দে। দেখ চম্পা—ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় যেন আগুন জলছে। আচ্ছা বলতে পার কৃষ্ণচূড়া ওই বাড়া রঙ পেল কোথা থেকে?

চম্পা—কি জানি? মনে হয় ও যেন দোল-পূর্ণিমার হোলি খেলার মত হয়ে উঠেছে—সহস্র ফাগের সমুদ্রে ডুব দিয়ে এসেছে এই মাত্র—কিবা দিগ্বরের লজ্জা-বাড়ানো বস্ত্রের হাসিটুকু চুরি করেছে গোপনে, মেখেছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু বাই বল গো নদী, ও বড় হিংস্রটে। আমাদের দিকে অবহেলায় চায় না। আকাশের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব—যেখ না সেখানেই কৃষ্ণচূড়া নিজের সলাজ হাসির মুঠো মুঠো আত্মবোধের কথা মিছে ছড়িয়ে...

নদী—দিক গে। কৃষ্ণচূড়ার হাসিতে তরা আকাশের ছায়া তো কাঁপছে আমায়ই বুকে—ওই আকাশের সঙ্গেই তো আমারও বিভালী। ওর ওই গুনোয়ের আমি ধার ধারি নে—কিন্তু উঃ আর তো পারি নে।

চম্পা—অমন অধীর হয়ে উঠ না। একটু—অপেক্ষা কর। আমি সমীচণকে জিজ্ঞেস করি—ওই তো সে আলছে উদ্ভাস হয়ে বেতের বন কাঁপিয়ে।

[সমীরণের প্রবেশ]

ও সমীরণ ওরকম চকল হ'ল না। তোমার স্পর্শে আমার সারা অঙ্গ জলে বাচ্ছে...তোমার জিহ্বা তো নয়, যেন বৃষ্টির তীব্র ধ্বংস—তোমার অন্তর অগ্নি-নিঃশ্বাসে পরিপূর্ণ। আচ্ছা, তুমি বলতে পার, মেঘের দল কোথায় আত্মপোষণ করেছে ?

সমীরণ—জানি নে, সে ধবর রাখি নে। আমার তাড়া আছে—বাধা দিও না—ঘাবার আগে স্থান করে বাব ওই নদীর বুকে—

নদী—না, সমীরণ না। আমার অন্তরের শেষ হৃদাটুকু উজাড় করে নিও না। না...না...

সমীরণ—অনেকটা পথ যেতে হবে গো। ঠাণ্ডা না হয়ে চলবে কেমন করে ? আত্ম হুঁশিয়ারি নাই আমার। আজ ঠিক স্থান সারবই, হা...হা...

[নদীর জল কাঁপিয়ে সমীরণের প্রস্থান]

নদী—চম্পা ভাই, বেথলে সমীরণের কাণ্ডখানা। পাঁড়াও জ্বালা বরং আকাশকে শুধাই মেঘের খবর...

চম্পা—না, না এখন নয়। রাত্তিরে কুঙ্কড়টা বখন ঘূমের সাগরে ডুব দেবে, তখন। এখন নয়—কুঙ্কড়টা বড় হিংস্টে। আমাদের ভালো ও সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, নদী তোমার তো আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি নে। আরে কালো অন্ধকারের বোঝায় যে এখনি চেক গেল চারশাশ—

নদী—ওই দেখ চম্পা, আকাশ পাবে চাঁদের রাগী ডাঙার হালা কণ্ঠে জড়িয়ে হাসছে। বেথেল, ওরা সবাই কেমন লুকোচুরি খেলছে আমার জলে। পাঁড়াও জিজ্ঞেস করি এইবার। চাঁদের রাগী বলতে পার মেঘের দল কোথায়—কোন হুঁসে ?

চাঁদের রাগী—ভেব না, ওরা আসছে। এখানে ওরা নেই। ওরা গেছে নীল পাহাড়ে—সেখানে ওরা ওদের নাচের মহড়ায় ব্যস্ত...

চম্পা—নাচের মহড়া ?

চাঁদের রাগী—হ্যাঁ, ভাই চম্পা। যে নাচ তোমাদের দেখাবে, সেই নাচের মহড়া দিচ্ছে ওরা। নাচ শেষ হলে নীল সমুদ্র থেকে তুফান মিটিয়ে ওরা আসবে ফিরে।

নদী—নীল সমুদ্র ?

চাঁদের রাগী—হ্যাঁ গো। সেই সমুদ্রের জলে নীল পবিত্র স্থান করে—ভাই তো ওর নাম নীল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের নীল জলে আছে স্বপ্ন—অবৃত্ত। সেই স্বপ্নে কবিরে যেবে বলেই তো

ওই দেখ মেঘের দল ছুটে আসছে। আশ্র তাদের আসতেই হবে—আজ বে পরলা আনাড়, আমি পালাই...ওরে আর তোরা...

[তারাদের ডেকে নিয়ে তাঁদের রাষ্ট্র প্রস্থান]

চম্পা—তাই তো। ও নদী দেখ গো—মেঘ, উত্তর-আকাশের মেঘেরা গান গাইতে গাইতে হহ করে ছুটে আসছে—পূব-আকাশে মেঘেরা দল অধীর আবেগে ডব্ব বাজাচ্ছে। পশ্চিম-আকাশের মেঘেরা কান্না কালো কেশ উড়িয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে আর দক্ষিণ-আকাশে বলকাচ্ছে বিদ্রোহের নীলাস্ত ছাতি—সমস্ত আকাশপটে ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো—

নদী—মেখেছি আমি মেখেছি। বর্ষা তাহলে সত্যি এলো?

চম্পা—হ্যাঁ, ওই তো ময়ূরী পেগম তুলে নাচছে—মেঘ গো কৃষ্ণচূড়ারও ঘুম ভেঙেছে।

[বারিধারার পতন]

আঃ এই তো বৃষ্টি পড়ছে। আমার সারা স্নেহে আবার মিঠে স্বাস বইছে।

নদী—আর আমার কণ্ঠেও জেগেছে আনন্দের উছল গান—

চম্পা—শুধু আমরা নয়, সবাই আজ আনন্দে মেতে উঠেছে। মেঘ বর্ষারাগী তার গলার মোতির সাত-নদী হার ছড়িয়ে দিচ্ছে—তেঁতুল, নিম, পাকুড়, বট, ঝাউ-এর ঝাড় হয়ে পড়ছে—কেয়া-ঝাড়ের মাথার ওধারে তাল আর নারকেলের সারিতে জেগেছে আন্দোলন—বাঁশের ঝাড় ভোলপাড় করছে—ওধারে শালবন মুখর হয়ে উঠেছে। মেঘ কদম-কেশর শিউরে উঠে ঝরে পড়ল—জলধারার আবেগে চকল হ'ল ধান ক্ষেত—আঃ, সবাই বাঁচল! বর্ষার শীতল বারিধারার আন করে সবাই শান্তি পেল—আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। আমরাও বাঁচলাম।

রাজ্য-বিক্রয়

আমাদের ভাবতবর্ষে পৌরাণিক যুগে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য দান করেছিলেন, বিক্রয় করেন নি। আমি বলছি রাজ্য-বিক্রয়ের কথা। ১২০ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজা পার্টিনাসের মৃত্যু হলো। প্রোটোরিয়ান গাভ্রল রোমরাজ্য নিলামে বিক্রয় হবে বলে ঘোষণা প্রচারিত করেন এবং এই ঘোষণামতে রোমরাজ্যকে নিলামে চড়াণো হলো। বহু ধরিদ্রদার এলো—নিসান-ডাকে দর চড়তে লাগলো—অবশেষে ধনী রোমান লগাপর ভিত্তিয়াস সামান্টিয়াস জুলিয়ান; মার্কাস কিনলেন রোমরাজ্য তখনকার হিসাবে নগদ পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডে, ১২০ খৃষ্টাব্দের ২৮ মার্চ তারিখে। এ খবর পৌছলো বৃটেনে রোমান-সেনা-সংগদে—খবর শুনে তখনি তারা সকলে যোমে এগে মার্কাসকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর প্রাণমত্ত বিধান করলো এবং ঐ সেনাদলের অধ্যক্ষ সেপটিমাস সেভেরাস বললেন রোমের সিংহাসনে অধীস্বর হয়ে ১২০ খৃষ্টাব্দে ২ জুন তারিখে।

রাত দুপুর

ত্রিবিকাশ বসু

ভাষা দব পারে। সবচেয়ে অসাধ্য যে কাজ, রাতকে দিন, দিনকে রাত, তাও। নইলে নিশীথ রাতে সূর্যের দেশ মরওয়েতে নয়, এই আমাদের বাংলা দেশে রাত আবার দুপুর হয় কী করে? চেষ্টা করলে রাত বয়েশ কমিয়ে সন্ধ্যা হতে পারে, ধবে নিলুম, বিকেল হতে পারে, কিন্তু তাই বলে একেবারে দুপুর! নৈব নৈব চ! অথচ দেখ, 'রাত দুপুর' কথাটার সঙ্গে আমরা এমনি অভ্যস্ত, লিখতে লিখতে আমাদের কলম একবার থমকে ভাবেও না কী লিখছি, বলতে গিয়ে একটু হাসিও আসে না আমাদের।

আনি তুমি বলবে, কথাটা তো আর 'রাত দুপুর' নয়, কথাটা হ'ল 'রাত্রি দ্বিগ্রহ'। মানলুম, দ্বিগ্রহর থেকে এসেছে দুপুর, তায়্যা দুই পহর। কিন্তু দুপুর বলতে কি আমরা ইদানীন্তন দ্বিতীয় প্রহর বুঝি? না। বুঝি, ঝাঁঝ! রোদ্দুর। রাতের বেলায় রোদ্দুর আসে কোথেকে? এ যে দেখছি মরওয়ের ওপর দিয়ে যায়।

মরওয়ে না হোক, অন্তত একটি ব্যাপারে বাংলাদেশে হুইডেনের সমকক্ষ। হুইডিশ ভাষায় বেমন (Red Black) 'রেড ব্ল্যাক', আমাদের তেমনি 'কাচের গ্লাস'।

হুইডেনে গিয়ে যদি তোমার লাল কালির দরকার হয়, তোমাকে বলতে হবে, একটু 'লাল কালো' দিন। কারণ হুইডিশ ভাষায় 'কালো' ও 'কালি' অভিন্ন। কালোও Black, কালিও Black। তুমি হাসছ, কীমাত্রার্থ! লাল কখনো কালো হয়! হয়! বলেছি তো, অষ্টমঘটনপটীদ্বন্দী ভাষার অসাধ্য কিছুই নেই। বাংলায় 'কাচের গ্লাসে' কী এমন কম হাসিটা ভর্তি হয়ে আছে, শুনি? কাচের গ্লাসের আক্ষরিক অর্থবাণ কবলে কী দাঁড়ায়? 'কাচের কাচ' glass of glass। ভেবে দেখছি কি, যখন বলো পেতলের গ্লাস, কাঁদার গ্লাস, মাটির গ্লাস, সেটা কতখানি হাস্যকর। কাচ আবার পেতল, কাঁদা, মাটি হয় কী করে? একি অনাচ্ছিন্ন ব্যাপার। ইংরেজদের গ্লাস আমাদের ঘরে ঢুকে এই অনাচ্ছিন্ন কাণ্ডটা বাধিয়েছে।

খোদ ইংরেজদের ঘরে কী কাণ্ডটা ঘটেছে একবার দেখ। ইদানীং অনেক বাড়ির জানলার খড়খড়ির (shutter) বদলে লাগানো হয় fixed shutter। জিনিদটা খড়খড় করে আঙুরাজ তোলা দূরে থাক, না যায় তোলা, না যায় খোলা। তথাপি খড়খড়ির বিকল্প বলেই বোধহয় অহরূপ নামকরণ। বা নট-নটনটন, বা fixed, তা আবার shutter হয় কী করে?

ভেবো না, এইবকম বিদগ্ধ ব্যাপার শুধু জানলার বড়গড়িতেই আবদ্ধ, তাহার খেয়ালীপনার হাত থেকে জানলা-দরজা কাহে। নিতুতি নেই।

‘দরজাটা হাট করিস নি’, মা প্রায়ই বলেন তোরাকেকে। কিন্তু এ কথা বলার কোন অর্থ হয়? তুমি কি শত চেষ্টা করেও দরজাকে ‘হাট’ করতে পারো? বড় ছোর তাকে কেটেহুটে ‘কাঠ’ করতে পারো, কিন্তু ‘হাট’? তুমি কেন, যে কোন ছুতোর মিস্ত্রির প্রতিভামহেরও অপাধ্য এ কর্ম। তথাপি ম বলেন, ‘দরজাটা হাট করিস নি,’ এবং তুমি গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দরজা হাট করা মানে দরজার ওপর ঝাড়িয়ে চেষ্টায়ে হাট বলানো নয়। দরজার ধারে সত্যি সত্যি হাট বলানোর কথাও ভাবা যায় না। তা’হলে? তা’হলে দরজার সঙ্গে হাটের কোন সম্পর্ক নেই? আছে। হাট বসে মাঠের মধ্যে, খোলাখেলা জায়গায়। তাই। তাই দরজা হাট করতে ছুতোর মিস্ত্রি ভাকতে হয় না, তুমি একাই সে কর্ম করতে পারো। কিন্তু এদব কি সত্যিই অনাছিটি কাণ্ড নয়? রাতকে দিন করা, লালকে কালো, কাচকে কাঁসা, দরজাকে হাট!

বর্ষায়

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কালো সমে দশ দিক ছেয়ে গেছে ত্রাখ ঐ।	রূপ ঝাপ রূপ ঝাপ নদী-পাড় ভাঙছে।
ঘরমুখো গরুগুলো ছুটে আসে হৈ-হৈ।	পশ্চিম দিগ্বধু কই আর রাঙছে?
বাবুয়ের বাসা দোলে ভাল গাছে দোল দোল।	চাতকের চাঁচানির আজি অবসান রে!
হিজলের বনে জাগে পুলকের হিম্মোল।	কোলাব্যাঙ ঘ্যাং ঘ্যাং শোন গায় গান রে!
জুঁই ও হাসনুহানা দেয় মিঠে গন্ধ।	বাতাসেতে ডুবে উঠে কলমীর লতাটি।
তুণে তুণে জাগে সে কি বিকাশের ছন্দ!	ঝোকাখুক্ চুপচাপ মুখে নেই কথাটি।

গুড়গুড় হুড়হুড় রব উঠে আকাশে।

শুনি তাহা, শিশুদের মুখ হয় ফ্যাকাশে ॥

পশুরাজ কে ?

শ্রীকেন্দারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শুধু যদি সংহারশক্তি এবং বিক্রম হিসাবে বিচার করা যায়, তবে বাঘকে নিশ্চয়ই পশুরাজ বলা চলে। কিন্তু সেই সঙ্গে বাঘের আকৃতি-প্রকৃতি তার ভাব-গতিক, এই সবের কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। চেহারা, চাল-চলনে, পরিবার-পরিজন নিয়ে রাজার মত জ্বলে আদিপতা করার সিংহের তুলনায় বাঘের মান-মর্যাদা পাবার মত কিছু নেই।

বাঘের চেহারা সৌন্দর্য বা আছে তা তার গায়ের রংয়ে ও শক্তিমত্তা গঠনে। তার মুখের চেহারা ভয়ংকর, কিন্তু তাতে সিংহের মত গাভীর্ষ কিংবা উচ্চ বংশের কৌলীন্তের ছাঁপ নেই। বাঘ ধূর্ত, মাহুঘের সঙ্গে তার শত্রুতার দেখা যায় অসম্ভব চাতুরী, বিপর এড়িয়ে চলায়, শিকারীকে বার্ষ করা়। বাঘ যদি টের পায় যে মাহুঘ দল বেঁধে তার পিছু নিয়েছে, কিংবা বনুক হাতে শিকারী তার সম্মানে কিরছে, তখন সে সেই তলাট ছেড়ে দূরের বন-জ্বলে লুকিয়ে থাকারই চেষ্টা করে। পালাবার উপায় নেই বুঝলে, বা বিষয় আহত হ'লে বাঘ মার-মুতি ধরে, দাঙ্গাং ঘরের মত পাণ্টা আক্রমণ করে শত্রু নিপাতের চেষ্টা নেবে। তখন তার কাছে হাতী বা বনুক রাইফেলধারি শিকারী কোন কিছুই গ্রাহ্য নয়, মরণ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ সে সমানে চলিয়া যায়।

মাহুঘ-থেকো বাঘের যে সব প্রামাণ্য বিবরণ আছে তাতে দেখা যায় যে, প্রায় সকল সময়ই অন্তর্ক বা অসহায় মাহুঘ বাঘের মুখে পড়ে, যখন সে একলা বা দল থেকে দূরে আগে বা পিছনে চলেছে কিংবা পথের পাশে বসতে গিয়েছে। মাহুঘ-থেকো সিংহের মত লোকজনের দলের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে বা কাটা-ঝোপের উঁচু বেড়া (zareba) ভিক্সিরে গ্রামের মধ্যে ঢুকে বা রেল কম্পার্টমেন্টের জানালার ভিতর দিয়ে ঢুকে, শশস্ত্র লোকের মধ্যে একজনকে নিয়ে বাগার কথা, যেমন তলাভোর মাহুঘ-থেকো সিংহের (Man-eaters of Tsavo) গল্পে আছে, যে বকস ঘটনা বাঘের বেলায় প্রায় শোনাই যায় না বলা চলে। আবার ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল ছেড়ে, ৫০৬০ গজ ষোলা জমি পার হয়ে, সঙ্গীহৃত শশস্ত্র শিকারীর উপর তীরবেগে হামলা করার কথা প্রায় সকল সিংহ শিকারীর বিবরণেই পাওয়া যায়, বাঘের সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্তে সেরকম কিছু পাওয়া যায় না। সেরকম হামলা সে করে, যখন চতুর্দিকে হাতীর বেড়া বা যখন সে আহত হয়ে মরণ-কাষড় দিতে শেষ চেষ্টা করছে—তাও যদি পালাবার কোনও পথ বা শক্তি তার না থাকে।

বাঘ সাধারণতঃ বনে-জ্বলে ঘোরে একলা। বছরের দুই-এক মাস হরত কোনও বাঘিনী

তার সঙ্গে থাকে এবং সে-সময় শিকার বা ঘোটে তা ছুঁতেনই থাকে। বাঘিনীরও বাচ্চা থাকলে তার শিকারের অংশ বাচ্চারা পায়, যেদিন তারা ছোট থাকে। নইলে নিজের শিকারের ভাগ সে কাউকেই দেয় না।

সিংহ থাকে বড় পরিবার নিয়ে। চার পাঁচ থেকে আঠার কুড়ি। সিংহ, সিংহী ও সিংহ-শাবক একসঙ্গে দেখা যায়। শিকারের ভাগ সবাই খায়, যদিও বগড়াকাঁটি হয় তা নিয়ে। সে হিসাবে সিংহ দলপতির ধরন বড় ঘরানারই উপযুক্ত।

শিকার হিসাবে বাঘ তার জ্ঞানের প্রায় সকল পক্ষকেই ধরে, যদিও বড় হাতী, গণ্ডার ইত্যাদিকে মারার চেষ্টা সে সহজে করে না, তবে ঘরের বাইরে গেলে হাতীর বাচ্চা বা গণ্ডারের বাচ্চাও সে নেবার চেষ্টা করে একথা শোনা যায়। বড় বুনো মহিষ বা গণ্ডার (Bison) একলা গেলে ক্ষুধার্ত বাঘ তাদের পেড়ে ফেলার চেষ্টা করে নিজেও বিষয় ঘারেল হয়েছে এরকম বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্তও হু'দশটা আছে। আহত বাঘ বড় দীতাল হাতীকেও আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করেছে এরকম কাহিনীও অনেক আছে।

সিংহের এরকম বিক্রম বা দুঃসাহসের কথা আমরা কোথায়ও পাইনি। বাঘ বেশী চতুর এবং সেইজন্তে বোধহয় বড় আনোয়ারকেও বেকায়দায় ফেলে মারবার মত ভরসা তার আছে। সিংহ সোম্বাহজি চড়াও হয়ে শিকার ধরে, এবং সেই কারণে বড় পশুকে আক্রমণ করা তার চলে না। এবং সেইজন্তেই আফ্রিকার জঙ্গলে হাতী, গণ্ডার এবং দলের মধ্যে বুনো মহিষ, এদের উপর রাজ-অধিকার ফলাতে সে যায় না।

কিন্তু বাঘের দাপট তাই বলে বনের সকল পশুর উপর সমানে চলে না। বুনো জায়গার বাঘের প্রধান শিকারের মধ্যে ঘরা হয়। কিন্তু বাঘ চেষ্টায় থাকে যাতে বুনো জায়গারের পালের মধ্যে সে দলের বড় দীতালদের এড়িয়ে, মাদী বা বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি ঘরার মুখে সে পূর্ণবয়স্ক দীতাল বরাহ-প্রবরের সামনে পড়ে, তবে বুদ্ধ অনিবার্য এবং তাতে হারজিতের পালার বাঘেরই বেশী হার হয়। আমরা একবার সন্ধ্যার মুখে ঘোড়ার চড়ে তিস্তা নদীর পাড়ের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাক্ছি, এমন সময় নীচের জঙ্গলে বাঘের ডাক ও সঙ্গে সঙ্গে বুনো জায়গারের ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনতে পেলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে এবং ঘোড়া ভয় পেয়ে চকল হয়ে উঠেছে দেখে আমাদের দলের বড়রা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বাইহোক সঙ্গে সহিসের দল ঘোড়ার মুখের বমা ধরে ছুটে চললো এবং সঙ্গে এক এগ্নিনীর ও একজন স্থানীয় ভেপুটি বন্ধু বাগিয়ে ধরলেন। জঙ্গলের "করেট" বা ডাকবাংলো কাছেই ছিল এবং সেখানে ঘর দেওয়াও ছিল, হতরাং অল্পক্ষণ পরেই আমরা নিরাপদে আশ্রয় পেলাম।

সবাই যখন খেতে বসেছি তখন আমাদের মলের এক প্রফেশ্যর হেঁসে বলেন, “কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সম্ভো হয়।”

এক্সিমীর মশায় ঐ অঞ্চলের পথ-ঘাট ও ব্রীজের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরই মার্চে ও ইন্সপেকশনের সত্বরে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম। তিনি অঞ্চলের বাঁপারে অভিজ্ঞ লোক, হুতরাং একটু চূপ করে, প্রকেশ্যরের দিকে চেয়ে পরে বলেন, “হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই; তবে কিনা এ-বাঁরা ভয় ছিল বরাহ মহাশয়ের কাছে। এতগুলো লোক-লশকর, বোড়া, এর মধ্যে বাঘ বড় সহজে হানা দিতো না, কিন্তু বুনো শুয়োরের পাল বেরকম ক্ষেপেছিল, তাতে দু’চারটে দাঁতাল বরা যদি ছিটকে আমাদের দিকে আসতো তবে কিছু মানুষ বোড়া লুপ্ত হতোই!”

কে যেন প্রশ্ন করলো, “ক্ষেপেছিল বললেন কেন, ওরা প্রাণের ভয়ে টেঁচাছিল নাকি?”

উত্তর হলো, “প্রাণের ভয়? চাঁৎকার শুনেই আমি বুঝেছি যে বাঘটা ছ’ তিনটে দাঁতালের পাল্লার পড়ে গেছে। সে যদি প্রাণে বেঁচে পালিয়ে থাকতে পারে তবে সে এতক্ষণে কোশ দেড়েক দূরে বসে হাঁপাচ্ছে আর গায়ের রক্ত চেটে সাফ করছে। বাঘ চেঁচায় থাকে ফাঁক বুঝে একটা ছোট শুয়োর খেয়ে ভুলে নিয়ে চম্পট দেবার অন্তে। কিন্তু কাছে যদি কোনও দাঁতাল বরা থাকে, তবে সে লক্ষ্যে সঙ্গে একেবারে তেড়ে বাঘের উপর পড়বে আর তার হাঁক-ডাকে অন্য বড় শুয়োর এনে সবাই একসঙ্গে লড়াইয়ে লেপ্টে যাবে।”

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে গিয়েছিলাম রাজপুতানার উদয়পুরের কাছে মহারাণার এক প্রসিদ্ধ শিকার-স্থলে। ঘন জঙ্গল-ভরা পাহাড়ী অঞ্চল, তারই মধ্যে পাথরে গাঁথা পাড়া দেওয়ালে ঘেরা এক বাড়ি। তার পাহাড়ের ঢালু গায়েব একমিকে উঁচু ছানের আলিয়ার বনুক রাবার ও চালাবার ফুকর কাটা আছে। বহু লোক মিলে, “হাঁকা” দিয়ে, বনের পশু তার সামনে দিয়ে ভাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং উপর থেকে গুলি চালিয়ে শিকার চলে। এই বকম শিকারের আড্ডার নাম “ওদি” এবং আমরা যেটা দেখতে গিয়েছিলাম তার নাম “খাস ওদি”, অর্থাৎ মহারাণার খাস শিকারের বাড়ি।

এই খাস ওদির ভিতরে বেশ চওড়া উঠান এবং উঠান ঘিরে ঐ বকম খাড়া উঁচু দেওয়াল ঘুরে গেছে। ভিতর ও বাইরের দেওয়াল দুইই মাটি ও উঠান থেকে ২৪০০ ফুট উপরে, যাতে বাঘ বা চিত্রা লাফিয়ে নাগাল না পায়। এই দুই দেওয়ালের মধ্যে ২০২২ ফুট প্রশস্ত ছাদ এবং তারও দুই দিকে তিন চার ফুট উঁচু আলিনা। এই বাড়ির একতলায়, অর্থাৎ ভিতরের উঠানের সমতলে, বড় বড় লোহার গরাদ দিয়ে মুখ-বন্দ খাঁচা। এবং ঐ গরাদ দেওয়া দরজা, কেল্লার ফাটকের মত (Portcullis) লোহা উপরে তোলা বা নামানো যায়। এই খাঁচার ভিতর বুনো জানোয়ার থাকে

এবং মহারাণা কতে সিং দরবারের লোকজন নিয়ে তাদের লড়াই দেখেন। শুনলাম মহারাণার খুব মধু বড় দাঁতাল বরা এবং পূর্বদিক বাঘের লড়াই দেখার।

লড়াইয়ের আগে দুই ঘোড়াকেই পুরো একদিন পেতে দেওয়া হয় না, তারা পায় শুধু জল। তারপর লড়াইয়ের মধ্যে উঠানে ফলফুল ছড়িয়ে বুনো শুয়োরের খাঁচা খুলে দেওয়া হয়। খাবার দেখে বরাহ মশার বেঘিয়ে যখন যেতে থাকেন, তখন ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাড়া হয় তার উপর এবং বেধে দায় ঘোর রণ।

আমরা দেখলাম, এক প্রকাণ্ড দাঁতাল খাঁচার আটকানো রয়েছে। বাঘ শুনলাম দূরের জঙ্গলে ধরা পড়েছে এবং মহারাণার মজি অহুসারে তাকে এনে বরাহ-প্রবরের সঙ্গে লড়ানো হবে। আমাদের কপালে সে লড়াই দেখা ছিল না, কেন না আমরা উদয়পুরে থাকতে মহারাণা বাইয়ের নদর থেকে ফিরলেন না। কিন্তু খাস গুহির প্রধান রক্ষী—এক ভীষণ আকৃতি, লম্বা-চওড়া রাজপুত বোদ্ধা—আমাদের বলে যে, তার চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঘের জিত সে কখনো মেনেনি।

প্রসিদ্ধ সেনাপতি ও শিকারী, জেনারেল বেডেন পাউয়েল—বয় ষাউট সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা—বলেছেন যে, সাহস এবং লড়াই স্বভাবের হিসাবে পৃথিবীর সকল বস্ত্র পশুর মধ্যে প্রথম স্থান তিনি মেনে উত্তর-ভারতের বস্ত্র বরাহকে। শত্রু দেখলেই সে অমম্য ভেজের সঙ্গে আক্রমণ করে এবং মরণকাল পর্যন্ত সমানে লড়ে যায়, সে শত্রু বস্ত্র বড়ই হোক বা সংখ্যায় বস্ত্র বেশীই হোক।

কাজেই একথা স্বীকার করতে হয় যে, ঐক্লশ বরাহপ্রবর ব্যায়রাজের অধিকার মানতে মোটেই বাম্বী নয়, এবং দেখা মাজেই বাঘের কাছে “বুদ্ধ” দেখি” বোলো তার এক কথা।

বুনো শুয়োর ছাড়াও আমাদের দেশের জঙ্গলে আছে তিনটি শক্তিশালী বড় জন্তু, এবং এক জাতীয় ছোট খাপদ, বাঘের উপর বাঘের বিরুদ্ধে বিশেষ খাটে না। বড় জন্তুগুলি হ'ল গউর বা বাইসন, গণ্ডার এবং হাতী এবং ছোট খাপদ হ'ল বুনো কুকুর। গউর গোম্বাভীর জন্তু পশু। এ-জাতের ঘাঁড়দের ঘাড়ের কাছে ছয় ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় এবং তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি থাকে। এদের শিংও মহিষের শিংয়ের মত চ্যাপ্টা ধরনের। ঐ রকম ক্ষমতা ও অস্ত্রের সঙ্গে আছে সাহস ও লড়াইয়ে প্রবৃত্তি, হস্তবাং বাঘ এদের কাছে সহজে এগোয় না। অন্য দুটি বিরাট শক্তিশালী পশু অর্থাৎ গণ্ডার ও হাতী আকারে আরও বড় এবং তাদের লড়ার ক্ষমতা আরও বেশী, কাজে কাজেই তাদের উপর বাঘের প্রতুষ বিশেষ চলেনা।

কিন্তু বাঘের মেহেও আছে অসীম ক্ষমতা এবং উপরন্তু আছে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অতি উদ্যানিক ইন্দ্রিয়ের মত কঠিন ও ধাবালো মন ও দাঁত। কাজেই হবিধা পেলে বাঘ ছোট গউর, গণ্ডার বা হাতীকে কিংবা তাদের বাচ্চাকে শিকার করার চেষ্টা করে। বাঘ কিন্তু এগোতেও ভয়সা

করে না বুনো কুকুরের কাছে, যদিও সে জানোয়ারটা দেখতে শেয়ালের চেয়ে সামান্যই বড় এবং তার অস্ত্রের মধ্যে আছে শুধু দাঁত। বাঘ এদের এড়িয়ে চলে তার কারণ এরা থাকে দলবদ্ধে এবং এদের সাহসের অন্ত নেই। শোণকূড়া—অর্থাৎ বনের কুকুর—২০।২৫ থেকে ১০০।১২৫ পর্যন্ত এক একটা দলে জোট বেঁধে থাকে এবং জোট বেঁধেই শিকার ধরে বা শত্রু মারে। শোণকূড়ার পাল পিছনে লাগলে বাঘকে জঙ্গল ছেড়ে পালাবার পথ দেখতে হয়। একবার এদের ঘেঁষার পড়লে বাঘের মরণ নিশ্চিত; কেন না এদের দু'দশটা মরলে বা ঘায়েল হলেও এরা ছাড়ে না, চতুর্দিক থেকে ক্রীপিয়ে পড়ে বাঘকে টুকরা-টুকরা করে ফেলে। সেই জন্তুই বাঘ এই দুর্দান্ত সীমকে সমীহ করে চলে।

হাতী বুদ্ধিমান জন্তু এবং বাঘের সঙ্গে লড়াইতে গেলে কি বিষম রকম ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা সে বোঝে। তা সত্ত্বেও বনের হাতী সাম্না-সাম্নি গেলে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধতে পেছনা হয় না। পোষা হাতী অবশ্য সহজে বাঘের কাছে এগোতে চায় না, এড়িয়ে পালাতে চায়; তবে তাদের মধ্যে যেগুলি তেজী এবং বাঘের বনের স্বভাব জেগে আছে বা কোন কারণে ভয় ভেঙ্গে গেছে, তারা বাঘের গর্জনে বা আক্রমণে ভড়কায় না। এ বিষয়ে ভারতীয় হাতীর খ্যাতি অন্ত দেশেও পৌঁছে গেছে।

এক প্রসিদ্ধ ইংরাজ শিকারীর বর্ণনা জঙ্গলে বাঘ মারার বৃত্তান্তে ঐ রকম কাহিনী আছে। তিনি একবার সেখানের এক টাক গাছের ঘন জঙ্গলে, ইজারাবার ইংরাজ কোম্পানীর অতিথি হিসাবে শিকারে গিয়ে শোনেন যে, সে অঞ্চলে কাঠ কাটা ও আনায়ে বিষম গোল বাধিয়েছে এক দুঃস্থ বাঘ। বাঘটা বেজায় ধূর্ত এবং তাকে "মচান" থেকে মারার স্ববোগ কিছুতেই শাওয়া যায়নি এবং সেটা থাকে ঘন ঘাস ও কোপে-ভরা এক নালার আশেপাশে, যেখানে ঢুকে অন্তর্ভুক্ত দুর্দান্ত বাঘকে বাগে এনে মারাও সম্ভব হয়নি।

ঐ রকম অবস্থায় বাঘ শিকারের একমাত্র উপায় হাতীর সাহায্য নেওয়া। কিন্তু যে হাতীর গিঠে শিকারী থাকে সেটা যদি বাঘের গন্ধ বা দেখা গেলে ভড়কায় তবে আরো বিপদ, কেন না শিকারী গুলি চালাবার স্ববোগ পাবে না, অন্ত দিকে বাঘ হাতীকে এবং তার সওয়ারিদের ঘায়েল করার ফাঁক পাবে। কাঠুরী কোম্পানির ইংরাজ ম্যানেজারের কাছে হাতী চাওয়ার তিনি বলেন, তাঁদের ২৫।৩০টা হাতী আছে, কিন্তু বাঘের ভীক শুনে বা গন্ধ গেলে তার একটাও ঠাড়াবে কিনা সম্ভব। ম্যানেজারের সহকারী তাতে বলেন যে, "হাতীর" হাতিত বলেছে যে, তার হাতী ভয় পাবে না। বর্ণনা জঙ্গলে বসে হাতীর হিন্দী নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে সে বিষয়ে জিজ্ঞাস করে শিকারী শাহেব জানলেন যে সেই হাতীটার বয়স কম এবং আকারেও খুব বড় নয়, তবে সে

খুব তেজী পাভাল, বড় হাতীকেও
গ্রাস্ত করে না, শুধু যা সে তার
মাহতের বাধ্য। সে অল্পদিন গ'ল
এ জঙ্গলে কাঠি ভোলায় কাছে
এসেছে। বম্বী মাহতেরা বলে যে,
সেটা ভারতীয় হাতী। সেই হাতীর
মাহতকে ভেঁকে আনতে সে খুব
জোরের সঙ্গে বললো যে, তার
“হাবী” ঘোরান মরহ, সে কোনও
জানোয়ারকে ভরায় না। কোম্পা-



“সেই কোম্পাড় লম্বা করে তিল পাথর ছোড়া হলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
এক প্রকাণ্ড বাঘ হাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো।”

নীচ বড় বড় পাভালও তাকে ঘাঁটোতে সাহস করে না, সে এমনই লড়াই। সেকথা শুনে সাহেব
স্বির করলেন যে, এই “হাবী”কে নিয়েই তিনি শিকারে যাবেন।

পরদিন সকালে শিকার-যাত্রার সময় সাহেব দেখলেন যে, “হাবী” খুব সবল ও সুস্থ এবং
পাভাল, কিন্তু আকারে খুব বড় নয় এবং তার পাঁত জোড়াও লম্বায় দেড় হাতও নয়, তবে সুগঠিত
দোঁড়া ছুঁচালো মুখের। সঙ্গে দুইজন পথ দেখাবার লোক ও মাহতকে নিয়ে সাহেব রওয়ানা হলেন
শিকারে। বাঘের আন্তার্য কান্ধাকাছি একটা ছোট গ্রামে গিয়ে, বাঘের উৎপাতের বিবরণ শুনে,
সাহেব সেখানে এক স্থানীয় লোককে নিয়ে চললেন যেখানে বাঘটা আশ্রয় নিয়েছে সিনের রোদ
থেকে। তবে সেই বাঘের বিক্রমের কথা শুনে সাহেবের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে অতবড় হিংস্র
বাঘের সামনে “হাবী” এগোবে কিনা।

বাঘটা ছিল একটা জলা জায়গায় ধারে, কিছু কোম্পাড়ের ঘেঁষা এক জায়গায় দু'তিনটে ছোট
গাছের নীচে। সেমিকে যেতে হলে অল্প একটু খোলা জমি পার হতে হয়। সেই জমি পার হবার
সময় “হাবী” হঠাৎ শুঁড় এগিয়ে কান বাড়ায় করে থেমে গেল। সাহেব বুঝলেন তার ভীক্ষু নাকে
বাঘের গন্ধ এসেছে। তারপরই সে শুঁড় গুটিয়ে নিয়ে পাঁত উঠিয়ে সেই গাছগুলোর দিকে ফিরে
লোকা এগিয়ে চললো তার জাতের বংশগত শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে।

সাহেব মনে মনে বাহবা দিয়ে ২-১২০ গুলু তকাত্তে থাকতে তাকে দাঁড় করাতে বহ্নেন।
মাহতের ইচ্ছিতে সে পাঁড়াতেই সেই কোম্পাড় লম্বা করে তিল পাথর ছোড়া হলো এবং প্রায়
সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকাণ্ড বাঘ হাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো। সাহেবের ভারী দোঁনলা রাইকলের প্রথম
গুলিতে বাঘ পড়ে গেল এবং তার পরই ভীষণ গর্জন করে তার বেগে ভেঙে এলো শিকারীদের
দিকে। আর এক গুলি খেয়ে বাঘ আবার পড়ে গেল এবং এবার উঠে সেই কোম্পাড়ের
ভিতরে চলে গেল। আহত বাঘের এই বিধম গর্জন ও তেড়ে আসা, ভারী রাইকলের
প্রচণ্ড আওয়াজ এই সবের মধ্যে হাবী পাথরের মত দাঁড়িয়ে বাঘের প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিল।



(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শেষ পর্যন্ত আর নিবারণকে ধরে রাখা গেল না। ছোট ছেলেটা হয়েছে। গঙ্গামণি ভেবেছিল নিবারণ বুঝি তাকে পেয়েই সংসারে ভুলে থাকবে। কিন্তু ছেলেটা হবার পর থেকেই নিবারণের ঘেন আগো উদ্ভূ-উদ্ভূ মন।

গঙ্গামণি বলে—গোঁকাকে তুমি একটুও আদর করো না—

ব'লে ছেলেকে নিবারণের দিকে এগিয়ে দেয়। নিবারণ একটুখানি আদর করেই বাইরে বেরিয়ে যায়। তার কিছুই ভাল লাগে না! বেশে এসে পর্যন্ত ঘেন কেবল একে-একে ঘড়িয়েই পড়ছে। ছেলে যত বড় হয় ততই ঘেন নিবারণ দূরে সরে যার বাড়ি থেকে।

বাঁজুজ্যোমশাই জিজ্ঞেস করেন—ছেলে কেমন আছে ?

নিবারণ বলে—ভালোই—

বাঁজুজ্যোমশাই—এর দায়-দায়িত্ব আছে। ছেলে হবার পর ছেলের মুখে-ভাত হবে। তার জন্মেও খরচ দিয়েছিলেন বাঁজুজ্যোমশাই। ছেলের খাওয়া-পাওয়ার জন্মেও সিধে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আগে দু'পালি চাল আসতো, পরে তিন পালি। তেল-ছন-ডাঙ্গ-মশলাপত্তি সবই বাড়তে লাগলো। বাঁজুজ্যোমশাই—এরও অবস্থা ভালো হতে লাগলো তখন। গরানহাটার মাহুঘরাও ঘন-ঘন বাঁজুজ্যোমশাই—এর বাড়ি পাত-পেড়ে খেতে আসতে লাগলো। দোল-দুগোংসব-রথ-চড়ক সব রকম উৎসবেই ঘটা হয় বাঁজুজ্যো বাড়িতে। কোথায় মূর্শিদাবাদে, কোলকাতায়, ফরাসডাঙ্গাতে কী ঘটছে তা আর কারো জানবার দরকারই হয় না।

চক্রবর্তী বলে—তাহলে পুঝো মংলারীই হয়ে গেলে তুমি নিবারণ ?

নিবারণ হাঙ্গো। বলে—আজ্ঞে সবই তাঁর ইচ্ছে, এই জগৎটাই তো তাঁর ইচ্ছের মস্তে চলছে—নিবারণের বড়-বড় কথা কেউ বুঝতে পারে না।

চক্রবর্তী বলে—কই, তোমার সিরাঙ্গউদ্বোলা তো নবাব হলো না হে, দিল্লীর খবর শুনেছো ?
নিবারণ বললে—শুনেছি—

—তাহলে ! তাহলে কী করে নবাব হবে ওই ছোকরা ! আর ওনাকে তো বৈকে বসেছে ফিরিশীরা, তা শুনেছ বোধহয় ?

নিবারণ বলে—তা হোক, আমি যা বলেছি তা হবেই ! সিরাঙ্গউদ্বোলাই নবাব হবে !

—কিন্তু সিরাঙ্গউদ্বোলা নবাব হলে কি ভাল হবে হে ? নিজের হাতে যে সকলের মাথা কাটবে তখন ? দেখে নিও, এই তোমার বলে রাখছি নিবারণ ! কান্ডটা তুমি ভাল করলে না। শেষে তোমাকেও ভুগতে হবে !

নিবারণ বললে—তাঁর আগে বাঘ তো মারুক !

—তা বাঘ মারা আর কী এমন শক্ত কথা হে ! এই তো উলোতে সব জঙ্গল হয়ে গেছে, হাঙ্গুলজনম মরে গিয়ে ছুতের বাসা হয়েছে, সেখানে তো এখন বাঘের রাঝিা হয়েছে, সেখানে গিয়ে ক'টা বাঘ মারবে মারুক, গুণ্ডা গুণ্ডা বাঘ মারবে, কে বাধা করছে ?

সত্যি কিন্তু নিবারণের ওপর সকলের ভক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। সবাই দেখছিল নিবারণ যা-যা বলেছিল সব কলে গেল। ভীবন চৌধুরীর কয়েদ হলো, বাঁড়ুজো মশাই-এর ভালো হলো। গরানহাটির লোকদেরও ভালো হতে লাগলো। ওলাউঠো সব জঙ্গলতেই হলো, কিন্তু গরানহাটিতে একজন লোকও মারা গেল না। সবাই বললে—এ নিবারণের কারখানা, নিবারণ গরানহাটিতে গতি কেটে দিয়েছে—

সেবার ক্ষেতে ভালো ফসল এলো। শশিদের বিলের দিকের নাথালু কষিতে কখনও চাষ হতো না। বহুদিন আগে ওখানে ইট-খোলা ছিল। মন-মন্ডলে ভরা ছিল জায়গাটা। সেখানে সেবার সর্বে লাগিয়েছিলেন বাঁড়ুজো মশাই। প্রচুর ফসল হলো। সর্বে এসে উঠলো বাঁড়ুজো মশাই-এর মরাইতে। ধান উঠলো, তিসি উঠলো, বেগুন পটল সব একেবারে ক্ষেতে বোঝাই হয়ে গেল। বিলের মধ্যে খাপলা-জাল কেলে মন-মন মাছ উঠতে লাগলো।

সবাই বললে—এ নিবারণের কারখানা, নিবারণ গতি দিয়ে দিয়েছে—

এ গা ও-গা থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে, গরুর গাড়িতে করে লোক আসতে লাগলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকের আর কামাই নেই। বাড়ি নেই বললেও শোনে না। বলে—একবার

বাবাকে দর্শন করবো—ভুখু কি দর্শন! কত রকমের ওষুধ-বিষুধের তাগান! দেয়। কত রকমের তাগা-মাদুলি বায়না করে। তারা বলে—আপনার ভাল হবে বাবা, একটু ক্রিয়ারে তাকান—

নিবারণ বলে—আমি কিছু জানিনে গো, আমার কিছু ক্ষমতা নেই—বা শুনেছ সব মিছে কথা—
তা বললেও কেউ শোনে না। মাথায় করে আম আনে, কাঁঠাল আনে, লাউ-কুমড়া আনে। সব কিছু এনে নিবারণের ঘরে তুলে দেয়। গঙ্গামণি এত জিনিষ কী করবে! কত খাবে? কত বিলোবে। গয়লা-বউকেও দেয়। গয়লা-বউও খায় সব। গঙ্গামণির আজকাল ঐশ্বর্য হয়েছে। সোনার গয়না হয়েছে গায়ে। মোটা শাড়ি পরে। মাথায় সিঁথিতে জব-জব করে সিঁদুর পরে। মা-বদলচৌতলায় গিয়ে পুজো দেয়। বলে—মা, তোমার দয়্যস আবার সব ক্রিয়ারে পেয়েছি, দেখো মা তুমি, খোকার বেন ভালো হয়, সে বেন মাছুষ হয়—

কিন্তু ভাগ্য তো কারো চিরকাল সমান চলে না। তারও আবার ওঠা-নামা আছে গঙ্গামণিরও আবার সব সুখ-সাধ উটে গেল।

সেদিন রাত্রে খোকা ঘুমিয়েছিল। গঙ্গামণিও ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ কীসের আওয়াজ হতেই গঙ্গামণির ঘুমটা ভেঙে গেছে। অন্ধকার ঘর। বাইরেও নিবিড় অন্ধকার। পাশের বাঁশবাগানে কিং-কিং-পোকার শব্দ আসছে, মনে হলো যেন দরজাটা কে খুলে।

গঙ্গামণি বললে—কে?

নিবারণের গলায় আওয়াজ এল—আমি! আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—

—বাইরে? এত রাত্তিরে বাইরে কোথায় যাচ্ছে?

—যেখানে রোজ যাই, অশানে? তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে আর ডাকিনি।

গঙ্গামণির অস্ত্র দিন তেমন ভয় করে না। কিন্তু আজ কেন জানি না বড় ভয় করতে লাগলো। বললে—এই অন্ধকারে না-ই বা বেয়ালে, সাপ-বাঘ কত কী আছে, কান্ন কী?

অন্ধকারের মধ্যেই নিবারণ হাসলো। বললে—সাপ-বাঘ আমার কী করবে? ও-সবে আমি শুয় করি নে—

গঙ্গামণি বললে—তা কি বলা যায়? কার কখন বিপদ হয় কে বলতে পারে?

নিবারণ বললে—না, না, ও ভয় কোর না, সাপ আমার কিছু করতে পারবে না, আর বাঘ এখানে কোথায়? আমি তো নিজেই বাঘ হতে পারি—

গঙ্গামণি অবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি তুমি বাঘ হতে পারো?

নিবারণ বললে—হ্যাঁ, বাঘও হতে পারি, সাপও হতে পারি; ঘা খুঁকি হতে পারি, ও-ভয় তুমি কোর না—

গঙ্গার্মাণের কী খেয়াল হলো। বললে—আচ্ছা, একবার বাব হও তো, দেখি—

—ছিঃ—বলে নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নিশুতি রাত। দাওয়ার বাইরেই ভবল। কিছু দেখা যায় না।

গঙ্গার্মাণি বললে—কখন আসবে ?

নিবারণ বললে—আজ বাঁড়ুজ্ঞে মশাই-এর একটা কাজ আছে তাই শশানে যাচ্ছি, শব তৈরি আছে, বেশি দেরি হবে না, তিন গ্রহর হলেই চলে আসবো, কিছু ভেবো না—

নিবারণ চলে গেল। শশান বেশি দূরে নয়। শশানে শব তৈরিই ছিল। শ্রীনাথপুর থেকে আগের রাত্রে মড়া এনে রেখে দিয়ে এসেছিল চণ্ডীতলার শশানে। শশান তখন ঝাঁক। ইছামতী পাশেই। তার ওপরে কয়েকটা শুকুনি কঁক কঁক করে চোঁচাচ্ছে। হ হ করে হাওয়া বইছে মড়ার দেহের উপর দিয়ে। শাঁ শাঁ হাওয়ার শব্দ মনে হয়, কেউ বেন শিব্, দিচ্ছে দূর থেকে। নিবারণ তেঁতুল গাছটার তলায় গিয়ে গাড়াল। একটা কঁাতলা ঢাকা ছিল মড়াটার গায়ের ওপর। সেটা টেনে ফেলে দিলে। ভাল করে চেয়ে দেখলে মড়াটার দিকে। বেশ ভাল মড়া। নিখুঁত। অনেক বেছে তবে এটাকে বোঁগাড় করেছে। আগের দিন হাটে গিয়েছিল সওয়া করতে। বড়-বুটি হয়েছিল। একটা গাছের ডাল মাথায় পড়ে লব্ধ হয়েছিল। তারপর আর ওঠেনি। মশাই যখন হাট থেকে গায়ে বাড়িতে ফিরে গেছে, তখন সেটাকে টানতে-টানতে এনে রেখেছিল নদীর ধারে। তারপরে যখন সঙ্গে হয়েছিল তখন আর একবার একে গাঁতের ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল নিবারণ। কেউ দেখতে পায়নি।

এমন সুযোগ কেউ পায় না কখনও। এবার নিবারণ বেন খানিকটা শান্তি পেলে মনে। চারদিকে কেবল সংসার আর সংসার। সংসারের বেড়াঝালে আটকে পড়ে সাধন-ভজন কিছুই হচ্ছিল না। আর সাধন-ভজন না করলে ক্ষমতা বেশিদিন থাকবে কেন ?

টানতে টানতে মড়াটাকে নদীর ঘাটে নিয়ে এসে। পাকে ভর্তি বাট। কয়েকটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লো জলের ওপর। একটা সাপ কিলবিল করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নিবারণ মড়াটাকে জলে ডোবালো। তারপর নিজেও জলে নামলো। একেবারে বুক-জল। বেশ ভালো করে স্নান করালো মড়াটাকে। করিয়ে নিজেও স্নান করলে। তারপর মড়াটাকে কাঁধে করে নিয়ে এলো আবার তেঁতুল গাছের তলায়। তেঁতুল-গাছের একটা ফোকরের ডেতর থেকে চকমকি-পাখর আর শোলা বার করলে। নিবারণ ওটা ওখানেই রেখে বের। তারপর পাখর ঠুকে-ঠুকে আগুন জ্বাললে। আগুনটা মড়ার মাথার কাছে রেখে, মড়াটা তখন চিং হয়ে শোয়া।

হঠাৎ নিবারণের মনে হলো দূরে বেন কাদের পায়ের আওয়াজ হচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাসাদ

হেমেন্দ্র কুমার রায়

এক

একেবারে বাঙালীর মত হয়ে গিয়েছিল।
মহেশ্বরী প্রসাদ সিংহ। বিহারের ছেলে সে,
কিন্তু শিশুবয়স থেকে মাতৃভাষা তরুণ, লেখা-
পড়া দেখেছে কলকাতার গুল-কলেজেই।
কথা কইত ঠিক বাঙালীদেরই মত।

কোন টান নেই। তার কটমট নামটাও আমরা বাংলার উপযোগী করে নিয়েছিলুম। তাকে
ডাকতুম শুধু মহেশ বলে।

বিহারে মহেশবের জমিদারী ছিল এবং তার কোথায় নাকি ছিল প্রায় একশো ছুট উচু
এক মন্দির—সাত আটশো বছরের পুরাতন এবং বিচিত্র কারুকার্য করা। সে মন্দির দেখে সবাই
হয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার প্রাচীন মন্দির দেখবার নেশা আছে বলে, প্রায়ই তার কথা
ব'লে মহেশ আমাকেও কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল।

তাই এবারেও পৃষ্ঠার ছুটির সময়ে সে যখন তার দেশে বেড়াতে ঘাবার ভ্রম্ভে আমন্ত্রণ
করলে, আমি প্রত্যাখ্যান করলুম না। কিন্তু তন্ত্রাও আমাদের সঙ্গে ঘাবার ভ্রম্ভে ছিনে জোঁকের
মত ধ'রে বদল। আমিও বাবী হব না, সেও ছাড়বে না। তন্ত্রা আমার বোন। কোথ
ইয়ারে পড়ে।

শেষটা মহেশও তার পক্ষ সমর্থন ক'রে বললে, “আহা, তন্ত্রাও আমাদের সঙ্গে চলুক না
কেন? সে কখনো পাহাড় দেখে নি, আমাদের জিমিদারী পাহাড় দিয়ে ঘেরা।”

তন্ত্রা বললে, “আমি যেতে চাচ্ছি তো সেইজগ্রেই। তোমাদের ঐ তাড়াচোরা হাড়গোড়
ভাঙা দ্বয়ের মত বুড়ো মন্দির কে দেখতে চায়? আমি দেখব খালি পাহাড় আর পাহাড়!”

আমি রেগে বললুম, “কী, ভারত-শিল্পের নিদর্শন পুরানো মন্দিরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা?
হা, তাকে নিয়ে হাস্য হবে না!”

তন্ত্রা সভ্যসভাই আমার পারের কাছে ধূপ ক'রে ব'সে প'ড়ে ব'লে উঠল, “ও বাবা,
তোমার পারে পড়ি। বুড়ো মন্দির খুব ভালো; তার ছায়ে তলার কেমন দলেদলে খোলে
বাহুলির পর বাহুলি—”

—“বাহুলি? বাহুলি আবার কি?”

তন্ত্রা হুই চক্ষু বিস্তারিত ও বিষয়ের ডান ক'রে বললে, “বাহুলি কি তাও জানো না?
ওহা, এই জ্ঞান নিয়ে তুমি বাংলায় এম-এ পড়ছ?”

—“আরে গেল. আসল কথার জবাব দেয় না। বাহুলি কি আগে তাই বল!”

—“বাহুলির সঙ্গে দাদা, বাহুলির কোন সম্পর্কই নেই, বাহুলির সম্পর্ক আছে মানসের সঙ্গে, সেটা জানো তো? বিশ্বাস না হয় অভিধান খুলে দেখো।”

—“তজ্ঞা, বুড়ো বয়সে কেন গাঁট্টা খেয়ে মরবি।”

—ইস, আমার বুড়ো বয়স? মোটেই নয় দাদা গো, মোটেই নয়! তবে তোমাদের ঐ দোকলে মন্দিরগুলো যে বুড়ো সে কথা আমি অস্বীকার করি না।”

আমি ভয়ানক গম্ভীর হবার চেষ্টা ক’রে বললুম, “বাহুলি কি?”

তজ্ঞা চট্ট ক’রে উঠে প’ড়ে মহেশের শিছনে গিয়ে ঠাড়িয়ে বললে, “তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।”

আমি নাচার হ’রে বললুম, “তুমি তো সোজা মেয়ে নও, আবদার যখন ধরেছ না গিয়ে কি ছাড়বে?”

—“দৃষ্টিতে বাহুড়কে বলে বাহুলি।” এই বলেই বিলম্বিত ক’রে হাসতে হাসতে তজ্ঞা সেখান থেকে পিটুটান দিলে।

দুই

মেঘবার মত মন্দির বটে। ঐশ্বরিক উত্তর-ভারতীয় ও ঐশ্বরিক উৎকল আদর্শে গড়া। প্রাচীন হ’লেও প্রায় অটুট। মৌচাক দিকটা সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা। শুনলুম এটি শৈব-মন্দির। কিন্তু ভিতর থেকে শিবলিঙ্গ অদৃশ্য হয়েছে। দেবতার জায়গা জুড়ে বসেছে খুলোজাল আর বুনো গাছশালা। আমরা দুজনে যখন মন্দির নিয়ে গবেষণা করতে ব্যস্ত, তারই মধ্যে তজ্ঞা কখন আমাদের সঙ্গ ছেড়ে স’রে পড়েছে কিছুই জানতে পারি নি।

হঠাৎ মহেশ শুধালে, “তজ্ঞা কোথায় গেল?”

আমি বললুম, “নগরের নাগশাশ থেকে মুক্তি পেয়ে নিষ্কর মনের আনন্দে চারিদিকে ছুটোছুটি ক’রে বেড়াচ্ছে।”

মহেশ বললে, “জায়গাটা ভালো নয়। দেখছ না আমি বন্দুক সঙ্গে এনেছি। এখানে ঝোপেঝাপে কতরকম বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে!”

আমি চীৎকার ক’রে ডাকলুম, “তজ্ঞা, তজ্ঞা!”

অনেকদূর থেকে সাজা এস, “উ, দাদা!”

তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেখি, একটা বিশ বাইশ ফুট উঁচু গওশৈলের ঢেঁড়ো মূর্তির মত স্থির হয়ে গাড়িয়ে তস্ত্রা। চতুর্দিকের দৃশ্য ধর্শন করছে নিম্পলক নেত্রে।

মহেশ বললে, “শ্রীগণির নেমে এসে তস্ত্রা! ঐ সমলে পাথরের গর্ভে গর্ভে ভাবুক বা বয়াল বা আর কোন বয়সের লোকী আমোদ্যার লুকিয়ে থাকতে পারে, তারা দেখতে গেলে তোমাকে আদর করবে না!”

বাসু, আর কিছু বলতে হ’ল না। বীরনারী একেবারে উঠি-কি-পড়ি এমনভাবে নেমে আমাদের পাশে এসে হাজির। ভীক খরে বললে, “সত্যি বলছেন মহেশবাবু?”

মহেশ বললে, “মইলে এই বন্ধুটা এনেছি কেন?”

তস্ত্রা অভিযোগ-ভরা গলায় বললে, “ভগবানের একি অবিচার দাঁনা? এমন হুম্মর দৃশ্য, অকবিকেও কবি ক’রে তোলে, এখানেও এত আতঙ্ক? মহেশবাবু, বাঘও আছে নাকি?”

—“নিশ্চয়! বড় বাঘ আর চিতাবাঘ যা চাও, তাই পাবে গড়া গড়া! সম্বা উৎসাহেই তারা চৌকিয়ে লামিয়ে বেগ—আমাদের ক্ষিমে পেয়েছে!”

তস্ত্রা আমার হাত ধ’রে টানাটানি করতে করতে বললে, “চল দাঁনা, আর নয়! এখনো সূর্য সূর্য ঢাকেনি বটে, কিন্তু আমাদের প্রায় ছয় মাইল পথ পার হ’তে হবে, হ’ল আছে তো?”

আমি তাকে ঠেস দিয়ে বললুম, “কেন, এমন হুম্মর দৃশ্য, অকবিকেও কবি ক’রে তোলে, আরো কিছুক্ষণ গাড়িয়ে গাড়িয়ে উপভোগ কর না!”

—“না মশাই, ‘বিউট’র সঙ্গে বেখানে থাকে ‘বিট’, উপভোগ সেখানে উপভবকে ডেকে আনে। চল, জলদি পা চালাও!”

মহেশ বললে, “ভর নেই দিদি, একটা ‘শর্ট-কাট’ আছে; বাবার সময় সেটা ধরলে মাইল-দেড়েক পথ ক’মে যাবে।”

—“ভালো, সেই পথেই চলুন।”

আমি বললুম, “শর্ট-কাট! তবে সেই পথ ধ’রেই আমরা এখানে আসি নি কেন?”

মহেশ একটু ইতস্ততঃ ক’রে বললে, “সঙ্গে তস্ত্রা আছে ব’লে।”

—“তস্ত্রা আছে ব’লে? তোমার কথাই মানে হয় না!”

মহেশ গভীর হয়ে বললে, “লোকের মুখে শুনি এ পথে কিসের একটা ভয় আছে। কিসের

ভর তা জানি না, আমি নিজে তিন-চারবার এই পথ দিয়ে আনাগোনা করেছি, কিন্তু ভয়ের কিছু চোখে পড়ে নি। চারিদিক খালি খা-খা বিঘ্ননতা আর সমাধিক্ষেত্রের নিস্তরতা।”

—“তবু ভয়টা কিসের কিছু শুনা নি?”

—“স্পষ্ট ক’রে কেউ কিছু বলে না। তবে গরুটা যে হিংস্র জীবজন্তুর বা চোরজাকাতের নয় এটুকু জানতে পেরেছি।”

—“তাহলে কি অপদেবতারা এই পথ দিয়ে চলাফেরা করে?”

—“সেইরকমই তো গল্প।”

কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বলিত হয়ে তত্ক্ষা বললে, “ও মহেশদা, অতি-আধুনিক মহিলারা যে কলেজে ঢুকে অপদেবতাদের আমল দেন না, এ কথা কি আপনি জানেন না? তার উপরে এখনো সূর্য অস্ত যায় নি। অপদেবতাদের আবির্ভাব কাল তো রাত্রিকাল, একথা অতি-ভীতুয়াও জানে! পথনির্দেশ করুন মহেশদা, অগ্রবর্তী হব আমিই।”

বীবাঙ্কনার পিছনে পিছনে চললুম আমরা দুজনে। এ যুগ তো নারীদেরই যুগ। সব কাজেই তারা চলতে চায় পুরুষের আগে আগে।

খানিকটা এগিয়েই পড়লুম যেন স্বর্গীয় দৃত্তের মাঝখানে। তখনও বিকিরিকি বেলা, শক্তির নীলিমার উপরে একটু একটু ক’রে ছুটে উঠছে লালিমার ছোপ, সূর্যেরও সুব ক্রমেই স্তান হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে দিকচক্রবাল বেথাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে ভরাট মেঘের মত শাহাডের পর শাহাড, মাঝে মাঝে অরণ্যের পর অরণ্য এবং তারই কোলে শস্তে সবুজ গ্রান্ডার এবং তারই বন্ধ তেল ক’রে ও বিদ্যুৎ-নাচানো খেলা খেলতে খেলতে ছুটে চলেছে একটি নদী কৌতুকময়ী বালিকার মত।

তত্ক্ষা বললে, “ও মহেশদা, এত দূর থেকে নদীর গান শোনা যাচ্ছে না, ওদিকে একটু এগিয়ে চলুন না?”

মহেশ বললে, “নদীর গান শোনবার ব্যয়না এখন ভুল যাও তত্ক্ষা। আকাশের ঐ কোণে তাকিয়ে দেখো।”

—“কি দেখব?”

—“কালো মেঘ। অর্ধাং কোড়ো মেঘ। হ-হ ক’রে ছুটে এসে এখনি গোটা আকাশ আচ্ছন্ন ক’রে ফেলবে। বড়ের দাপট থেকে মাথা বাঁচাতে চাও তো তাড়াতাড়ি পা চাଲিয়ে দাও।”

পায়ে-চলা পথের বেগা ধূঁরে আমরা দ্রুতপদে অগ্রসর হলাম এবং খানিক পরেই আর একটা দৃষ্ট আকৃষ্ট করলে আমাদের দৃষ্টি।

একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। চতুর্দিকের নিঃশব্দ নির্জনতার মাঝখানে সেই বিরাট অট্টালিকার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বাভাবিক।

বিম্বিত হলে বললাম, “এমন গোড়ো জায়গায় অত বড় বাড়ী!”

রহেশ বললে, “কিছু-বেশী একশো বছর আগে এ জায়গাটা এমন পেড়ে ছিল না— এখানে ছিল প্রকাণ্ড জনপদ আর সর্বদাই শোনা যেত হাসি, গান, জনতার কোলাহল। এখানে রাজত্ব করতেন রাজা কিরণসিংহ আর ঐ বিরাট প্রাসাদ হচ্ছে তাঁরই।”

—“তারপর?”

—“সে এক বিয়োগান্ত নাটকের কাহিনী। মিউজিনিয় সময়ে কিরণসিংহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। সেই অপরাধে পরে বিজয়ী ইংরেজরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেছিল—বাংশে বাতি দিতে কারুক বাকী রাখেনি। শুভতে পাট ঐ প্রাসাদের ঘরে ঘরে নাকি সস্তর-আঁশিটা কয়াল প’ড়ে আছে—প্রাণভয়ে বাকী সবাই পালিয়েছিল, কেউ আর তাদের সংকার করতে পারে নি। আজও কেউ ঐ প্রাসাদের ভিতরে পদার্পণ করতে সাহস পায় না। লোকের ধারণা আজও ঐ প্রাসাদের ঘরে ঘরে অশান্ত আত্মার বাস করে।”

বীরবালা তত্ক্ষা পায়ে পায়ে পিছিয়ে প’ড়ে বললে, “দিনে-রাত্রে সব সময়েই?”

রহেশ বললে, “রাত্রে কথ্য জানি না, কারণ রাত্রে এ অঞ্চলে আমি কখনো আসি নি। দিনের বেলাতেও যেবেছি, গাড়ীবাগান্নার তলায় মত্ত মদর দরজায় প্রকাণ্ড কুলুপ আঁটা আর জনমানবশূন্য বাড়ীখানা সমাধির মত স্তব্ধ। তবে অশান্ত আত্মাদের কোন অস্তিত্বই জানতে পারি নি। লোকে বত বাজে কথা নিয়ে কানাকানি করে।”

তিন -

স্বর্ধ ভুবে গেল—যদিও চারিদিক তখনও আলোকের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হ’ল না।

রহেশ বললে, “এ আলোও মুছে দেবার ক্ষম্তে আকাশে কি ঘোর-ঘটা দেখ!”

কালবৈশাখীর মত কালো কালো মেঘের পর মেঘে আকাশের আধখানা একেবারে ঢেকে গিয়েছে এবং থেকে থেকে তাদের নিবিড় কালিয়া হুড়ে হুটে উঠছে বিজলীর অগ্নিচমক।

আমি সচকিত হয়ে বললাম, “রহেশ, এ ঝড়কে কাঁকি দেওয়া অসম্ভব।”

আচখিতে তহ্মা বেন
আংকে উঠেই বলে উঠল,
“ওটা কি দায়া, ওটা কি?”

খানিক তফাতে আমাদের
আগে আগে তিমিয়ে তিমিয়ে
পথ চলছে একটা অদ্বুত মূর্তি।
সে বেন চলতে পারছে না,
তবু চলছে।

তহ্মা বললে, “ওটা কি
মাগুহ, না ওরাং-উটান, না
ভানুক?”

মহেশ হেসে বললে,
“ওরাং-উটান এদেশে নেই।
ভানুক মাঝে মাঝে লা বাবহার
করে বটে, কিন্তু অমন ক’রে
পায়ে হেঁটে পথ চলে না।”

—“তবে ওটা কি মাগুহ?
অত-বড় দেহ!”

আমি ভীক দৃষ্টিতে তাকিয়েও কিছু বুঝতে পারলুম না। এখনো চারিদিক আলোর
আলোর ঝলমল করছে, মূর্তিটাও বেশী দূরে ছিল না, তবু কিন্তু তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—মনে
হচ্ছে বেন আলোকবাহ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে খানিকটা দম্ভার ঘনীভূত আবছায়া।”

মহেশ বললে, “হুজুন, আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছে?”

—“কি?”

—“ও কি-রকম ভাবে হাঁটছে দেখ। মনে হচ্ছে ওর দুটো হাঁটুই ভাঙা!”

তহ্মা দম্ভাকে বললে, “ও দায়া, ওবে ঐ পোড়ো রাশবাড়ীর হাতার গিরে পাড়াল। এবারে
কিরে বেন আমাদের দেখছে। আবার এগিয়ে চলল, এবারে গাড়ীবাগান্দার তলায়। তারপর আর
তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটা আবছায়া বেন গাড়ীবাগান্দার তলাকার বেশী লম্বাট আবছায়া
দাম তিমিয়ে গেল। / হাতের গেল দাম তিমিয়ে গেল”



“আচখিতে তহ্মা বেন আংকে উঠেই বলে উঠল,
ওটা কি দায়া, ওটা কি?”

মহেশ বললে, “নিশ্চয় রাজবাড়ীর আশপাশে কোথাও কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করে। পরীষ লোক, ভাড়া মিটে হয় না।”

তজ্জা বললে, “এই যে বললেন এখানে লোকের বসবাস নেই?”

—“আমি শুনেছি ভ্রমবশত। তা প্রায়ই ভিত্তিহীন হয়।”

পরমুহূর্তেই দূর থেকে ভেসে এল বিপুল অরণ্যের একটানা ক্রন্দন এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়-গড়, শব্দে মিগমিগন্ত কাঁপিয়ে একটা গাছের উপরে হ'ল বজ্রপাত—আমরা আড়ট হয়ে তাকিয়ে রইলুম সেই বজ্রাঘ্নিত গাছটার দিকে।

তারপরেই ধূলোর মেঘ উড়িয়ে এবং বড় বড় গাছগুলোকে নীচের দিকে লটপটিয়ে বেগে ছুটে এল তীব্র ঝড়ের ঝাপটা।

মহেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, “চল, চল! এই গোলা মাঠে ঝড়-তুফানের মুখে পড়লে প্রাণ বাঁচানো যায় হয়ে উঠবে!”

আমি অসহায়ের মত বললুম, “কিন্তু কোথায় যাব?”

—“রাজবাড়ীর ঐ গাড়ীবারান্দার তলায়।” তজ্জা তখন কর্তে বললে, “মহেশদা, কি বলছেন?”

মহেশ অধীর কর্তে বললে, “এখনো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে যায় নি, “এখনো আলো আছে, বাতাস গুল্মব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নয়। এর পরে ঝড়ের বেগ বাড়বে, চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে যাবে, শিলাগুটি হওয়াও অসম্ভব নয়, তখন কি করবে? শীগ্গির ছুটে চল কোন সুর নেই। কুলে বেগুনা আমি সশস্ত্র!”

আমার আর তজ্জার হাত চেপে ধরে মহেশ বেগে অগ্রসর হ'ল প্রাসাদের দিকে।

চার

গাড়ীবারান্দার তলায় ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল হারেনার মত কি একটা কানোয়ার, আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সবেগে তার পলায়ন।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে তজ্জা বললে, “এর পর বাঘও আসতে পারে।”

মহেশ বললে, “তা পারে। কিন্তু বাঘ এলে কি আমার বন্দুকও নিঃশব্দ হয়ে থাকবে?”

নিঃশব্দ টেনে টেনে তজ্জা অহুচ্চ স্বরে বললে, “আর যদি সে আসে?”

—“আবার কে আসবে?”

—“সে, সে, সে! থাকে দেখা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না, যে কায় কি ছায়া তাও জানি না, এখানে এসেই কোথায় মিলিয়ে গেল।”

উঠকঃহরে হাত্ত ক'রে মহেশ বললে, “খামো তস্ত্রাদিদি, পাগলামি কোরো না ?”

ততক্ষণে দুর্ধোগের আসর জমে উঠেছে বীতিমত । দলে দলে বাজ হাঁকছে, দলে দলে গাছ কাঁদছে, দলে দলে অগ্নিসর্প আকাশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ঝোড়ো হাওয়ার দম্কার পর দম্কা এসে তুবারের শিহরণ তুলছে আমাদের সর্বাঙ্গে ।

উচ্চকিত কাঠে তস্ত্রা বললে, “উঃ, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, আলো কৈ, আলো ।”

—“এই যে তস্ত্রাদিদি, আমার সঙ্গে টর্চ আছে !” মহেশ টর্চ বার ক'রে আললে, তার আলোকশিখা প্রথমেই গিয়ে পড়ল মত্ত ক্লুপ দেওয়া প্রকাণ্ড সমর দরজার উপরে ।

হঠাৎ কি শুনে দরজার উপরে কান পেতে তস্ত্রা মচমকে বললে, “বাড়ীর ভিতরে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি !”

~~ক্লুপ~~ দম্কাভুক্ত বললে, “তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তস্ত্রা ! বচকে দেখছ দরজা বাহির থেকে বন্ধ, ভিতরে কে আবার থাকবে ?”

—“শুধু শুনতে পাচ্ছি কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে জিমে তালে ভারি ভারি পা কেলেকে নীচে নেমে আসছে । এইবারে পায়ের শব্দ হচ্ছে মাটির উপরে । ধুপ্, ধুপ্, ধুপ্ ! সে আসছে, আসছে, আসছে এই সমর দরজার দিকেই—ওগো !”

মহেশের টর্চের শিখা স্থির হয়ে রইল বন্ধ সমর দরজার উপরেই ।

তারপর আমাদের চক্ষুগুলোকে দারুণ আড়কে বিক্ষাণিত ক'রে তুলে দরজার ক্লুপটা জ্বালাত হয়ে তুলে উঠল আচম্বিতে !

অত্যন্ত তীব্র, আর্দ্রবরে কঁদে উঠে তস্ত্রা বললে, “বাজই পড্ডুক আর ঝড়ই উঠুক, আমি আর এক লহরাত্ত এখানে থাকব না । তোমরা মা আসো, আমি একাই চললুম !” সে গ্রাণপনে ঘোড়ে গাড়ীবারান্নার বাইরে গিয়ে পড়ল এবং বলা বাহুল্য তার শব্দ মিলুয় আমাদের কাছে দেই মুহূর্তেই !

ছুটতে ছুটতে আমার দৃষ্টি হঠাৎ উপর দিকে আকৃষ্ট হ'ল ।

শবিস্বরে এবং সময়ে চাঁৎকার ক'রে বললুম, “যেব মহেশ, দেখ ! কি তস্ত্রানক !”

সেই গোড়ো প্রাদাসের ঘিটলে জানুয়ার পর জানুয়ার ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে আলোকের আভা ! রাজশ্রাসাদ আবার আলোর মালা শ'রে অতীত গৌরবকে স্মরণ করছে !

মৃত্যুপুরীর মধ্যে এই অভাবিত আলোকোৎসব ঘেবে আমরা সেই দারুণ ঝড়বৃষ্টির কথা ভুলে পায়ের গতি আরো—আরো বাড়িয়ে দিলুম ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বিশালস্বী তলার একাংশে একখানা মুদিখানার দোকান। দোকানে জামা-কাপড়ও বিক্রি হয়; তার ভেত্রে একধাবের একটা বড় পাঁচ দেওয়া আলমারির মধ্যে নতুন ধুতী-শাড়ী-জামা প্রভৃতি সাজানো আছে। এটা ও-গাঁয়ের রসিকদের দোকান। দোকানটা থেকে ওদের বেশ ছ'পয়সা আর হয়। এছাড়া ওদের চাষ-আবাদও আছে। রসিকদের দোকানের পাশেই শশী ময়রার দোকান।

শশীর দোকানের বারান্দাটায় রোজই সকাল-সন্ধ্যায় গাঁয়ের লোকদের আড্ডা বসে। মুহূর্ত্তঃ ভাস্কর চলে আর নানাবকম গল্প-গাছা আলাপ-আলোচনা হয়। আজ ত এখানে 'বাত্রা' হবে, জুতরাং সকাল থেকেই এখানে গাঁয়ের লোকদের কন্ঠি বসেছে। সামনে বিশালস্বীর উন্মুক্ত অন্তরের ওপর পাল গটানো হয়েছে; বাঁশের খুঁটিগুলার গায়ে দেবদারু পাতা বেধে তাদের বাঁহার বাড়ানো হয়েছে, রসীন কাগজের মালা, ছুল আর নিশান দিয়ে চারিধিকে সাজানো হয়েছে। পোল্টু ওদের সামনে আসতেই ওদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে—
“খোকা! কাদের বাড়ী যাবে?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, এই গাঁয়েরই কারো কাছাকাছি কুটুম-বাড়ীর ছেলে, 'বাত্রা' হবে বধর পেয়ে তাদের বাড়ী যাচ্ছে। কিন্তু পোল্টু বন বললো, “আমি চহনপুর যাবো”。 তা শুনে ওদের সবাইই মনে পোল্টুর দিকে আকৃষ্ট হোল।”

“বাগাটি চন্দ্রনপুর ? সে ত এখান থেকে বারো-চৌদ্দ মাইল পথ হবে ; তুমি এতটা পথ বাবে কি কোরে ?”

“একদিনে বাব না, আজ এই গায়ে কারো বাড়ীতে থাকবো।” পোন্টুর কথা শুনে ওরা ওকে দোকানের মধ্যে ডেকে বললে। তারপর মিজানাবাদ কোরে পোন্টুর ব্যাপার ঘোঁটামুটি সবই জেনে নিলে। বাঃ ! ছেলেটির ত খুব সাহস, আর খুবই বুদ্ধি-ভক্তি। দেখতেও অতি চমৎকার !—“তোমার নাম কি থোকা ?”

“আমার নাম—পল্লবকুমার ; পোন্টু বলেই সকলে ডাকে।”

পোন্টুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা সবাই মনকে সন্ধান ও মনবেদনার আকৃষ্টে কোরেছিল, কিন্তু বেশী কোরে কোরেছিল—শশী মরণকে। হাত দুটো খন্দের-বিধেরে ব্যস্ত থাকলেও, কানটা তার এইদিকেই ছিল। খন্দেরমা চলে গেলে, শশী এসে এঁদের পাশে উবু হোয়ে বসলো এবং পোন্টুর দিকে চেয়ে বললে—“আর কারো বাড়ীতে যাবার দরকার নেই, তুমি বাবা আজ আমার বাড়ীতেই থাক, তোমার কোন কষ্ট হবে না।”

ওঁদের মধ্যে একজন বললে—“হ্যাঁ হ্যাঁ, শশীর এখানে তুমি মজার থাকতে পারবে। ওর ছেলে বেই, পুত্র নেই, ওর বউ তোমাকে ছেলের মত আগরে রাখবে। শশীর বাড়ীতেই আজ তুমি থেকো বাও।”

আর একজন বললে—“হ্যাঁ থোকা, তাই থাকো। আজ এখানে বাড়ী হবে, রাত্তা কোরে শুবে। শশী, ছেলেটিকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও।” শশী বললে—“চল বাবা, তাই চলো। তোমার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। নারায়ণপুর থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছ, একটু শ্রম হবে চল।” বলে শশী উঠে পাড়ালো। পোন্টু ভাবলে, কারো-না-কারো বাড়ীতে ত থাকতেই হবে, এইখানেই থাকা থাক, বাড়ীটা পোনবারও বেশ সুবিধা হবে। পোন্টু বাড়ী শুনেই ভীষণ ভালবাসে।

দোকানেরই লাগোয়া শশীর বাড়ীটা। সামনের দিকে রাস্তার ওপরই একখানা ঘর। বাড়ির দেয়ালী ঘর হলেও দেওয়ালগুলো খুব চওড়া আর মেঝেটা সিনেট বাঁধানো। বাড়ীর ভেতরে বেশ বড় একখানা শোবার ঘর, উঠোন, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ধানের মরাই, গোয়াল, পুক, দুটো-কলডাল, একটা ময়না পাখী আর একটা বামনি রংয়ের কুকুর। ছেলেপুত্র কেউ নেই বলে, বাড়ীটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অক্লবকে তৃপ্তকর। বাড়ীর পাঁচিলের পাশে একটা কলমের আমগাছ, একটা বাতাবী লেবুর গাছ আর এখারটার একটা পেয়ারা গাছ।

ময়রার বাড়ী। মুড়কী, বাতাসা, ছোলা-চাকতি, সমেশ-রসগোল্লার অভাব নেই। ময়রা-গিন্নী

একটা বেকাবী কোরে পোন্টুকে গলখাবার বেতে দিয়ে বল্লে—“আহা, বাবা! তোমার মা-বাবা নেই, আহাদেরও কোন ছেলেপুলে নেই। একটা ছেলেপুলে মা থাকলে কি ঘর-দেয়ার মানায়! তুমি বাবা, আর কোথায়ও যেয়ো না, আহাদের এবানাই থাকো, তোমার কোন কষ্ট হতে আমরা দেবো না। বাপ-মা-মরা ছেলে, কোথায় গিয়ে থাকবে মণিক।”

যে-কটা মিষ্টি পোন্টুকে দেওয়া হয়েছিল, সবগুলোই সে খেয়ে ফেললে, তারপর বাইরে এসে হোকানের বারান্দায় গিয়ে বসলো।

বিকেলের নিকে পোন্টু গা-খানা একটু ঘুরে দেখতে চললো। ইতিমধ্যেই পাড়ার কতকগুলি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গেই পোন্টু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। গ্রামের বাইরে পশ্চিম মাঠটার সেদিন ‘ঘুড়ির-বাধান’ হচ্ছিলো। অর্থাৎ মাচ। সকলেই সেইখানে এলো।

ঘুড়ির মাচ দেখতে মাঠে অনেক লোক জমে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যুবকদের সংখ্যাই বেশী। অনেকে প্যাচ লাগিয়ে অপরের ঘুড়ি যেমন ‘ভোঁ-কাটা’ করতে লাগলো, তেমনি তাদের ঘুড়িও আবার ‘ভোঁ-কাটা’ হতে লাগলো। কোন ঘুড়ি কেটে বাবার সময়, ছেলেদের মধ্যে হাততালির ধুম পড়ে যায়, তার সঙ্গে ‘ভোঁ-কাটা’ বোলে সকলে চীৎকার কোরে ওঠে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুড়ি ওড়ানো দেখে ছেলের দল ফিরে এলো। আসতে আসতে দেখলো ওই মাঠেরই অগ্ন এক প্রান্তে এক যুবক আকাশে ‘চাউন্স-ঘুড়ি’ উড়িয়ে বসে আছে। পোন্টু কখনো ‘চাউন্স-ঘুড়ি’ দেখেনি। এ ঘুড়ি পাতলা কাগজের নয়, খুব মোটা কাগজে তৈরী। আকারে প্রকাণ্ড। ঘুড়ির মত মোটা টোন্স হুতো বেধে ওড়াতে হয়। এর লাটাই থাকে না; একটা খোঁটা পুঁতে, তাতে হুতো বেধে রাখতে হয়। এরোমেনের মত ঐ ঘুড়ির শব্দ হয়। এ ঘুড়ির প্যাচ-খেলা চলে না। পোন্টু ও ছেলেরা খানিকক্ষণ ধরে ওখানে বসে, ‘চাউন্স-ঘুড়ি’ ওড়ানো দেখে, সন্ধ্যার আগেই ঘে-বার বাড়ী ফিরে এল।

সন্ধ্যার পরই বাত্মার আসর বসলো। বালক-বাত্মা। অর্থাৎ এ বাত্মার অভিনয়কারীরা সকলেই বালক। দেখতে দেখতে আসর ভর্তি হয়ে গেল। আসরের তেতরে বসে লোক, বাইরে তারও বেশী। সীওতাল, কোড়া, বাউরি-বনো এরাও দলে দলে বাত্মা শুনতে এসেছে। আসরের বাইরে চারিদিকে এসে ভিড় জমিয়েছে। আশে-পাশের দলখানা গা থেকে লোক যাত্রা শুনতে এসেছে। যে-কটা ‘ছালাক’ আলো ঘোগাড় করা হয়েছিল, সব কটাই জালিয়ে দেওয়া হোল। চারিদিকে খুব আলো হোল। বিজ্ঞা-বিজ্ঞি বিজ্ঞা-বিজ্ঞি সব

যাত্রা হুকম বাজনা বেজে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গেই সর্দকদের গোলমাল, ঠেং-ঠেং অনেকটাই কমে গেল।

কেউ আর রাধাই যাত্রার প্রধান চরিত্র। পালায় নাম—‘মৌকা-বিলাস’। খালি গান আর গান। কথায় কথায় কেউর গান, কথায় কথায় রাধা আর তার সখীদের গান। ছোট ছোট ছেলে, ডারি মিষ্টি গলা সবার। যে কেউ দেখেছিল, সে সকলের চেয়ে ভালো। তার গলা যেমন মিষ্টি, তেমন চড়া। আর এত চালাক-চতুর সেই ছেলেটি যে বলবার নয়। তার বয়স পোন্টুরই সমান। সে যা অভিনয় করতে লাগলো, সকলেই মুগ্ধ হোল তাতে। রাধাও ভালো, তবে কেউর মত নয়। ঐ টুকু ছেলে তার চোখে-মুখে কথা। সমস্ত অগ-প্রত্যঙ্গ প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। সেই দৃশ্যটা সকলকে মুগ্ধ করে দিলে যাতে কৃষ্ণের নৌকোতে উঠে রাধা বসনা পার হবে। কৃষ্ণ পারানি চাইবে। রাধার সখীদের সঙ্গে তারই দরাদরি হচ্ছে। কৃষ্ণ চাইছে ১৬ আনা পারানি, কিন্তু ওরা তা দিতে চাইছে না। ওরা এক আনা থেকে হুক কোরে ধাপে ধাপে উঠছে। কৃষ্ণ কিন্তু—সেই ষোল আনাই ধরে আছে—“এক আনাতে পার করি না। ষোল আনা দিতে হবে।” রাধার সখীরা বলছে—“আমাদের সখী দু’ আনা দেবে, সখীকে পার কর।” সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষ্ণ—“দু’ আনাতে পার করি না, ষোল আনা দিতে হবে।” এ সব কথা কিন্তু হচ্ছে—গানে আর হয়ে। কী চমৎকার সেই স্বর! এ গানের কাছে, এ স্বরের কাছে অস্ত গান, অস্ত স্বর লাগে না, এ গানের ডুলনা নেই। যে প্রকৃত বাংলার বাঙ্গালী, এ গানে সে মুগ্ধ হবেই। রাধার সখীদের যমুনা পারে যে বেতেই হবে। সেখানে যে আজ হাট। রাধা সখীদের বলে দিলে—“আচ্ছা বল ন’ আনা দেবো।” তাই শুনে কৃষ্ণ গাইলো—

“আরি মাঝি পুরানা,
ন’আনাতে পার করি না।
—ষোল আনা দিতে হবে।”

এই ভাবে দর কবাকবি চলে, রাধার ভরফ থেকে সখীরা বখন গাইলো—

“ষোল আনা দিব কড়ি
পার কর ভাড়াতাড়ি।”

তখন কৃষ্ণ পার করতে রাজী হোল। বহিও মাঝ-নদীতে গিয়ে মাঝি আবার একটা নতুন গোলমাল বাধিয়েছিল। সে অনেক কথা। পোন্টুর খুঁই ভালো লাগলো। শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে উঠল না। যাত্রা ভাঙতে রাত ১২টা হোল। শেষ পর্যন্ত পোন্টু বসে বসে যাত্রা শুনলে।

হুতরাং পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে তার অনেকটা বেলা হয়ে গেল। সেদিন বাধা হয়েই তাকে বাঁশখালি থাকতে হোল।

দুপুরে ময়রা-গিন্নী পোন্টুকে সামনে বসিয়ে খুব আদর করে খাওয়ালে। দু'তিনটে তরকারী, শুকভোতা, মাছভাজা, মাছের কোল—আরও কত কি। শেষ পাতে ঘরের গাইয়ের দুধ, সন্দেশ। ময়রা-গিন্নী বললে—“বাবা, তুমি আমাদের এখানে থাক, চলে যেয়ো না। তোমার কোনও কষ্ট হবে না। আমাদের ছেলেপুলে নেই, আমাদের যা কিছু আছে, সবই তোমার নামে লিখে দিয়ে যাব। তোমার এখানকার স্থলে ভক্তি কোরে যেবো, বাড়ীতে মাঠার রাখবো। তুমি মানিক, আমাদের ছেলে হোয়ে আমাদের এইখানেই থাক, আর যেয়ো না।” পোন্টু বললে—“এখন সেখানে যাব বলে বেরিয়েছি, বাই মালীয়া; আমি আবার আসবো।” ‘পোন্টুর মিটিগলার ‘মালীয়া’ ডাক শুনে ময়রা-গিন্নীর মন মমতার ভরে উঠল, বললে—“ঠিক বাবা আসবে ত বাবা?”

“হ্যাঁ, আসবো।”

খাওয়া-দাওয়ার পর পোন্টু একবার এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে আসতে গেল। নীতটাও বেশ একটু পড়েছে। শরীর একখানা পশমী আলোয়ান কেনা ছিল। গেল বছর ওখানা বারো টাকাত্তে কিনেছিল। এ বছর এখনো সে ওটা ব্যবহার করেনি। ময়রা-গিন্নী সেখানা পোন্টুকে দিয়ে দিলে—“আহা, ছেলেমাছ! পশমী চাপর না হোলে কি ঐ হুতির চাপরে নীত ভাঙ্গে গা?” সেই আলোয়ানখানা গায়ে ভড়িয়ে পোন্টু পাড়া ঘুরে আসতে গেল।

মালীপাড়ার ভেতর দিয়ে বেতে বেতে পোন্টু দেখলো, একটা বাড়ীর চতৌমুপে পাড়ার ছোট ছোট ক'জন ছেলেতে মিলে কালকের দেখাদেখি ডাবাও ‘বাতা’ লাগিয়ে দিয়েছে। একখানা কাপড়কে গোলভাবে টাঙ্গিয়ে, সেইটে হোয়েছে নৌকা। তার মধ্যে কেটে একগাছা ককি হাতে দাঁড়িয়ে আছে; ককি গাছটা নৌকার দাল, নৌকার বাইরে রাখা আর গোপীনীয়া। কালকের বাজার মত, এদের এই কেটে ককিগাছটা নাড়তে নাড়তে গান করছে—“এক আনাতে পার করি না, বোল আনা দিতে হবে!”

কিছু ওদের মধ্যে একটা গোলমাল বেধে গেল। যে ছেলেটি রাখা হোয়েছিল, সে বলে উঠলো—“আমি তাই রাখা হব না, কেটে হব।” কেটে বললে—“তুই কেটে হতে পারবি নাকি?” বললেই সে আবার গাইতে লাগলো—“এক আনাতে পার করি না, বোল আনা দিতে হবে!”—ঐ রাখা থোকাটি তখন কান-কান মুখে বললো—“তবে আমি বাত্ৰা করবো না,” বলে মুখ কিরিয়ে দাঁড়িয়ে বইলো। এদের বাপার মধ্যে পোন্টু মনে মনে খুব খানিকটা হাসলো, তারপর ওখান থেকে চলে গেল।

মালীপাড়ার ভেতর দিয়ে কুলীনপাড়ার যেতেই কয়েকজন সমবয়সী ছেলের সঙ্গে তার দেখা হোল। এদের সঙ্গে গতকালই তার ভাবসাব হয়েছিল। ওরা বললে—“তোমার কাছেই আমরা বাচ্ছিলাম ভাই।” ছেলেরা পোন্টুকে নিয়ে, কাছেই একজনদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওরা বললে—“ভাই আমাদের একখানা হাতে লেখা পত্রিকা আছে। ফি বছর বোশেখ মাসে আমরা ঐ কাগজখানা বার করি। ওতে তোমার একটা লেখা দিতে হবে ভাই। পোন্টু জিজ্ঞাসা করলে—“পত্রিকাটার নাম কি?”

“বৈশাখী চাঁপা। গেল বছরেরটা তোমার দেখাচ্ছি—” বলে একজন ছেলে পোন্টুর হাতে হুম্বর একখানা বাঁধানো খাতার আঁকাবে ওদের পত্রিকাখানা দিলে। পোন্টু প্রথম থেকে দশ ক’টা পাতা তার উন্টে দেখলে। তারি হুম্বর লাগলো। মাঝে মাঝে ছেলেদেরই আঁকা এক-একখানা ছবি আছে। দেঙলি আরও চমৎকার। পোন্টু পত্রিকাখানা উন্টে পাঁটে ঘেঁষে ভারি খুশী হোল। মনে মনে ভাবলে, চন্নপূর গিয়ে নারায়ণ আর শে এইরকমই একখানা পত্রিকা বার করবে। ছেলেরা বললে—“দক্ষ্যার সময় তোমার কাছে আমরা বাব। তোমার একটা ছোট্ট লেখা—গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক, কবিতা হোক—আমাদের দিয়ে যেতেই হবে, ভাই। সেইটেই থাকবে তোমার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের দৃষ্টি। আমাদের ‘বৈশাখী চাঁপা’র তা রাখা থাকবে।”

ধানিক পরেই পোন্টু চলে এল এবং যে কাজ সে করনো করেনি, সেই কাজে কাগজ-কলম নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলো। অর্থাৎ একটা কবিতা লিখতে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে কি যে সে লিখবে কিছুই খুঁজে পায় না। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে ভেবে, অনেক কাটাকুটি, অনেক অসল-বদল করবার পর, পোন্টু একটা দশ লাইনের কবিতা লিখলে। সেটা এই :—

বীণখালি

আহা কি হুম্বর এই বীণখালি গ্রাম।
বীণবন নাই কিন্তু, বালি আম-জাম।
বালক যাত্রা হোল—মৌকা-বিলাস।
খুবই ভালো যাত্রা হোল, মিটলো সব্বার আশ।
ঘুড়ির বাগান হোল কিবা চমৎকার।
চাউন্-ঘুড়ি তার মাঝে যেবিহু আবার।
‘বৈশাখী চাঁপা’ ফুল হুবাসেতে ভরা—
গুণেতে অতুল আর রূপে আলো করা।
বীণখালির বন্ধুগণ! তোমাদের ভাই।
ভালবাসা দিয়ে আজি নমস্কার জানাই।

—গল্পবন্ধুমাণ।

(ক্রমঃ)

গ্রাহক গ্রাহিকাদের (লেখা)

শ্রমের মূল্য

[চিত্রের সাহায্যে গল্প রচনা প্রতিযোগিতায়
পুরস্কারপ্রাপ্ত]

এক গ্রহস্থের একটি গরু ছিল। গ্রহস্থ বড় দরিদ্র বলিয়া গরুটিকে ভাল খাইতে দিতে পারিত না। ফলে সে যোগা হইয়া পড়িল। গ্রহস্থেরও কোনও রকমে ঘর-সংসার চলিত। শেষ পর্যন্ত তাহার গরুটিকে ঠিকমত খাইতে দিতে না পারায় তাড়াইয়া দিল। গরুটি কিন্তু বুঝিতে পারিল যে, অভাবের অন্তই সে ঘর হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। সে ঠিক করিল, যে করিয়াই হউক সে গ্রহস্থের অভাব-মোচন করিবে। এই ভাবিয়া সে পথ চলিতে লাগিল। অবশেষে এক স্থানে আসিয়া এক হাঁটু জল-কাণার মধ্যে অনাহারে পড়িয়া রহিল। একটি গরুরগাভী সেই দিকে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে দুর্ভাগ্য-বশতঃ গাভীটি হঠাৎ কাণার মধ্যে ডুবিয়া গেল। ঐ গাভীতে নিকটবর্তী গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। (পূর্বকালে ধনী ব্যক্তিগণ গরুর গাভীতে ঘাতোয়াত করিতেন)। গাভীটি ডুবিয়া যাওয়ায় তিনি মুস্থলে পড়িলেন। সেই গাভীটিকে একটমাত্র গরুই টানিয়া উইয়া বাইত।

গরুটি গাভীটিকে কোন মতেই কাণা হইতে উঠাইতে পারিল না। এই দেখিয়া গ্রহস্থের গরুটি ভাবিল যে, সে যদি গাভীটি উঠাইয়া দেয় তবে গাভোয়ান নিশ্চয় তাহাকে কিছু পুরস্কার দিবে। পুরস্কারের আশায় সে গাভোয়ানের নিকটে গিয়া বলিল যে, সে নিজেই গাভীটি উঠাইয়া দিলে পারে। তাহার কথায় গাভোয়ান দম্ভে হইয়া রাজী হইল এবং গরুটির মুখে দড়ি লাগাইল। গরুটি অতি সহজেই গাভীটিকে টানিয়া উঠাইয়া দিল। গাভোয়ান ভাবিল, এ নিশ্চয়ই কোন গ্রহস্থের গরু হইবে। এই ভাবিয়া গ্রহস্থের মঙ্গল কামনা করিয়া গাভোয়ান গরুটির গলায় একটি টাকার বলি মূল্যদায় দিল। টাকার বলিটা শাইয়া গরুটি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহার প্রভুর গ্রহে পুনরায় ফিরিয়া গেল এবং টাকার বলিটি গ্রহিণীর নিকটে গিয়া দিল। গ্রহিণী অতিশয় আনন্দিত ও আহলাদিত হইয়া স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, তাহারের গরুটি সংসারের অভাব মোচন করিবার জন্য কোথা হইতে একটি টাকার বলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এই বলিয়া সে গরুটিকে আদর করিতে লাগিল। অতঃপর গ্রামবাসী-গণের মুখে তাহার শুনিল যে, অমুক গ্রামের ধনী ব্যক্তির গরুর গাভী কাণায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই গাভী কাণা হইতে তুলিয়া দিয়া গরুটি এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। গ্রহিণী একবারে আহলাদে আটখানা। তাহারের গরু পরের উপকার করিয়া ঘরে টাকা আনিয়াছে। তাহার পর হইতে গরুটিও গ্রহস্থের বাড়ীতে বেশ আদর-বস্তুে পালিত হইতে লাগিল এবং গ্রহস্থেরও অন্তর ঘুচিল।

—শ্রীমলীশঙ্কর দেব

না-দেখা পদ্মার চরে

আকাশের ধূসরিয়া তখন সন্ধ্যার সোনার

আলোর

মুঠো মুঠো সোনা হয়ে করছে ।

নদীর বৃকে পালতোলা নৌকা

আর

আকাশের বৃকে পালতোলা মেঘ ।

জেলেনের জলের খেঁটার বসে থাকে—

হাছবাড়া—

নদীর কিনারায় একপায়ে ধ্যানস্থ বক
থেকে থেকে ছৌ মেঘের জল থেকে তুলে আনে

ছোট্ট রূপালী মাছ ।

দূরপাল্লার নৌকা বেয়ে চলে মাঝ নদী দিয়ে
কানে আসে বাঁকা উচ্চারণের ভাটিয়ালী গান
বৃকের জমাট বাধা ঘেন হ্র হয়ে ঝরে পড়ে ।

আকাশে ওঠে একাদশীর চাঁদ

কাপলা আলোর পদ্মার চড়া আর জল

এক হয়ে যায় ।

চাঁদ আরও ওপরে ওঠে

পদ্মার চরে কিকিরিকি লাগে সোনাকপোয় ।

খুচরো ঢেউ তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ;

দূরে কোথাও হ্রয়ত রূপকাপ করে ভেঙ্গে পড়ে

পাড়ের বালি ।

নিশ্চিন্তিরাতের বৃকচিরে—

ধমকে ধমকে জেকে ওঠে সাতচরা পাখী

আর শিয়ালের দল ।

গ্রামের কুহুরঙালায় ঐক্যতান তোলে

অনেক দূর থেকে ।

পাড়ের ছপছপ দল ওঠে

হীরকচূর্ণ ছড়তে ছড়তে আর
একছোড়া কামলকালো চোখেয় দৃষ্টি নিয়ে
একটা ভাটিয়ালীর হ্র কমে কমে

হারিয়ে যায় ।

উদাম বাতাস ওঠে ।

মাতাল হয়ে ওঠে দিগন্ত ।

এশারের ছোট ছোট আলোর বলতির নির্দেশ
ওশারের গায় অন্ধকারের প্রলেপ ।

• • •

পদ্মা কোনদিন সেখিনি

তার সোনা-ছড়ানো চরে শুনি নি সাতচরা
পাখীর ডাক

কোনদিন শুনবোও না ।

তবু স্বনের কানে শুনি সেই

ভাটিয়ালীর হ্র

আহার মন উড়ে বেড়ায়

সেই না-দেখা পদ্মার চরে ।

আর সেই অতি পরিচিত অঞ্চল অনেখা

নদীটির বাঁকে—

বেথানে কুপলি গাছের ছায়ায় বাঁধা থাকে
মহাশয়ী নৌকা

আর দার পাশ দিয়ে গেয়ে যায় বাউল

ককির ।

•

শ্রীমহায়া বিনী



খেঁচড়ে

বাইটন কাপ ফাইনাল

মে মাসের ছ' তারিখে রবিবার ক্যালকাটা মাঠে ভারতের অন্ততম শিরোনায় হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপের ফাইনাল পেলা অচলিত হয়। এবারের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল স্থানীয় দিনিয়ার ভিভিসন হকি লীগ ব্রান্স আপ ইস্টবেঙ্গল ও গতবারের বাইটন কাপ বিজয়ী

বোম্বাইয়ের সেন্টাল রেল দল। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে স্ট কন্নার থেকে কুশলকুমার স্নায়চক গোলটি মিলে ইস্টবেঙ্গল দল এবারের বাইটন কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করে। গতবারের যুগ্ম এবং ১৯৬০ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৬৭ সালে সর্বপ্রথম ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই কাপ জয়ের শোভাগ্যা অর্জন করেছিল। এই দিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অলিম্পিকখ্যাত ফরওয়ার্ড শোগিন্দর সিং বাইটন কাপ ফাইনাল উপলক্ষে মাঠের দেয়া খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রত্যাপ স্তুতি ট্রফি লাভ করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের দেশে প্রত্যাবর্তন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এগারোজন খেলোয়াড় এবং দলের ম্যানেজার সম্প্রতি লণ্ডন থেকে বিমানে বোম্বাই এসে পৌঁছান। ভারতীয় দলের অধিনায়ক মহী কপ্টাইর এর আগেই ২৮ এপ্রিল দেশে ফিরে আসেন। ভারতীয় দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান অমরসিং এবং উইকেট কাপার ইন্ডিনীয়ার বথাক্রমে নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনে থেকে গেছেন। ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগে খেলবার স্তরে বিজয় মরুরেকার এবং চান্দ বোরদে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে লণ্ডনে গিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর সম্পর্কে দলের ম্যানেজার গোলাম আমের বলেছেন, 'ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতার অভাবই ভারতীয় দলের ব্যর্থতার মূল কারণ। আমাদের ওপনিং ও মধ্যভাগের ব্যাটসম্যানরা আশাহতরূপে খেলতে পারেন নি। শেষের দিকের ব্যাটসম্যানরা দু'একটা ম্যাচ ছাড়া ভালো খেলে আমাদের মুখ রক্ষা করেছেন। দল নির্বাচনের সময় আমরা স্পিন বোলিংয়ের ওপরিই গুরুত্ব দিয়েছিলুম। কিন্তু যে-সব উইকেট কেবলমাত্র ফাস্টবোলারদের সহায়ক ছিল, সেই সব উইকেটে আমাদের স্পিন বোলাররা কিছুই করতে পারেন নি। তবুও ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দলের রান-সংখ্যা। সীমাবদ্ধ বাঁধার জন্তে আমাদের বোলাররা প্রশংসার দাবী রাখেন।' গোলাম আরো আরো বলেছেন, 'বিশ্বের সবসেরা শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে আমাদের এই কার্যতায় হতাশ হবার কিছু নেই।'

১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালের চারটি পর্যায়ের টেস্ট খেলার ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কুড়িটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। বৈদেশিক দলগুলোর তেজস্বী ভারত একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকেই কোনো টেস্টে হারাতে পারে নি। এ ছাড়া ভারত এ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোনো খেলাতেই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকতে পারে নি। একমাত্র কামগুরে ১৯৫৮ সালের টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে দু-দলের রান-সংখ্যা সমান সমান (২২২ রান) ছিল।

প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ

কয়েকদিন আগে পশ্চিম জার্মানীর ডি, এফ, বি, স্টুটগার্ট দল কলকাতার এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আই, এফ, এ, দলকে ৩—১ গোলে হারিয়ে দেয়। সত্তর মিনিটব্যাপী এই খেলার সতেরো মিনিটে গোল করে আই, এফ, এ, এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের ব্যায়ে মিনিট পর্যন্ত বিপক্ষ দলকে ব্যবধানে কলে রাখে। খেলার শুরু থেকে দ্বিতীয়ার্ধের ব্যায়ে মিনিট পর্যন্ত আই, এফ, এ, দল গোল করার আরো চারটে সুযোগ পায় ও নষ্ট করে এবং শেষে পেনাল্টি কিক মাত্রক্ গোলটি শোধ হওয়ায় আই, এফ, এ, দলের মানের জোর ভেঙে যায় এবং খেলার গতি সম্পূর্ণ স্টুটগার্ট দলের পক্ষে চলে যাওয়ার আশঙ্কক দল এই ফাঁকে আরো দুটো গোল ঘেঁন। স্টুটগার্ট দলের এই খেলা দেখে একালের ফুটবলের উচ্চমানের বৈশিষ্ট্য ও তার সজীব ও রাজ্জিত রূপের সম্ভান পাওয়া গেছে।

কলকাতার স্টেডিয়াম

তোমরা জেনে থুই হবে ইতালীয় স্থপতি ভিট্টোরজি রচিত কলকাতার পরিকল্পিত স্টেডিয়ামের নকশা ও সেই সংক্রান্ত ব্যবতীয় খুঁটিনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবিল করা হয়েছে এবং তা এখন রাজ্যসরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ভিট্টোরজি স্টেডিয়াম নির্মাণে যে কার্যবিধি পেল করেছেন, তা কলকাতা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ট্রাস্টের অহুযোজন পেয়েছে।

নতুন বই

(সমালোচনার ক্ষেত্রে হ'খানি বই পাঠাবেন)

বীরপুরুষ—ঐন্দ্রবীজনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-ভারতী, ৫ হারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১'০০

বিষকবি বীরব্রজনাথ ছোটগের জন্মে যে অজস্র হৃদয় হৃদয় কবিতা রচনা করেছেন, 'বীরপুরুষ' তাদের মধ্যে একটি সম্ভার বোমাকর কবিতা। কবির নিজের গলায় এই কবিতাটি বেরকর্ড করে গেছেন গ্রামোফোন কোম্পানীর বেকর্ডে। এটি প্রথম তিনি লেখেন আলমোদায় ১৯০৩ সালে। 'শিশু' নামে বইয়ের মধ্যে এই কবিতাটি আছে।

বীরব্রজনাথবর্ষপুর্তি উপলক্ষে এই কবিতাটি বড় টাইপে আলাদা একখানি বই করে, অনেক রত্নিন ছবি দিয়ে ছোটগের জন্মে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানির মলাট থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পাতা ছবি, কাগজ আর ছাপায় এমন চিত্তাকর্ষক হয়েছে যে, তোমাদের মত ছোটরা এটি হাতে পেয়ে কিছুতেই আর ছাড়তে চাইবে না।

কমাকরম—ঐন্দ্রবীজনাথ মুখোপাধ্যায়। আন্তঃভাষ সাহিত্য ভবন, গ্রাম জগদল; পোঃ দক্ষিণ জগদল, ২৪ পরগণা। মূল্য ১'০০।

হৃদয় সহজ ভাষায় ছবি দিয়ে যিটি কতকগুলি ছড়া লেখক খুব ছোটগের জন্মে এই বইখানির মধ্যে ধরে দিয়েছেন। বার। প্রথম ভাগ শেষ করেছে তাদের মত ছেলে-মেয়েরা 'কমাকরম' হাতে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়বে।

রক্তগিরির রহস্য—হনীলকুমার গুপ্ত। শতর সাহিত্য সংসদ, ১৩ বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫। মূল্য ২'০০

সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারের বই খুব কমই লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু এই কাহিনীটি প্রায় সত্য ঘটনামূলকই বলা যায়। নানা দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাহিনী অবলম্বন করে, অ্যাদনাই ম্যাচান পর্যট-মালা, পোলক জাতি, পর্যটগুহার মধ্যে তাদের মেবতা ও ধনরত্ন প্রভৃতির বিষয় নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প এই উপন্যাসটির মধ্যে কৌশলে লিখেছেন গ্রন্থকার। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিচিত হলেও, লেখার অনবদ্য কৌশল দেখে তাঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। বইখানি একবার আরম্ভ করলে তোমরা শেষ না করে উঠতে পারবে না। ভিতরে অনেকগুলি ছবি আছে এবং প্রচ্ছদপটটিও হৃদয়।

সৃষ্টিঠাকুর—ঐন্দ্রজল চক্রবর্তী। নিউ-বুক সাম্রাই, ১০ বন্ধিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১'২৫

বর্তমান সময়ে ছোটগের জন্মে বই লেখার ধরনই বদলে গেছে। আকাশে রোজ সূর্য ওঠে আবার ডুবে যায়; দিন হয় রাত্রি আসে। কিন্তু ঐ যে মহান সৃষ্টি, তেজপুত্র, আকাশে তার প্রথম প্রভা নিয়ে নিত্য উঠে চলেছে, তার মধ্যে কি আছে, তাতে গ্রহণ হয় কেন, সূর্য কি কঠিন শব্দার্থ, সূর্য কত বড়, তার উত্তাপের পরিমাণ কি?—এই সব বিষয় ছবি দিয়ে গল্পের মত ব্যাখ্যা বলা হয়েছে এই বইখানির মধ্যে। বিজ্ঞানের বিষয় এমন সহজ করে বলার মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমরা এই বইখানি তোমাদের সকলকেই পড়ে দেখতে বলি।



সাম্প্রতিক কালে আমাদের প্রাত্যহিক
জীবনে ভয়ানক একটা অশান্তি দেখা দিয়েছে।
জীবনধারণের মানবিক সম্ভার মধ্যে মূক্ত
হয়েছে ছাত্র সমাজের মধ্যে ক্রম বর্ধমান
অসহিষ্ণুতা, বিশৃঙ্খলতা ইত্যাদি। ছাত্র-
সমাজের দৈনন্দিন কার্যকলাপে যে সব
অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে তাকে যদি আশ্রয়

কথা সম্ভব না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ ভারতের অবস্থা কি যে হবে তা সহজেই অনুমেয়। যে সব ছাত্র
আজ নিয়মাহুযর্তিতা মূক্ত হয়ে উজ্জ্বল আচরণে নিজের উৎসর্গ করছে তাগাই আগামী দিনের
রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থার কোথাও না কোথাও কর্ণধার হয়ে বসবে। এইসব ছাত্র সমাজের হাতে
যদি রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব আগামী দিনে বর্তায় তাহলে অনেকক্ষেত্রে এই অশোভনচিত্ত আচরণ
প্রতিকূলিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

ছাত্রসমাজের এই বিপদশ্রুত আচরণ বাংলাদেশে এর প্রকাশ ইমানীকালে অত্যন্ত বিরাটকারে
দেখা দিয়েছে। অথচ হুতাশ, অরবিন্দ চিত্তরবনের এই রক্তগর্ভা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ
ভারতের গৌরবের বিষয় ছিল। এই বাংলাদেশেরই নিয়মাহুযর্তী ছাত্রসমাজ ভারতের স্বাধীনতা
মুক্তির প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেদিনের প্রহেল ও ঘোণা নেতাদের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল
বাংলার তরুণ সমাজ। কীপিয়ে পড়েছিল অনাবাদিত স্বাধীনতার আশার গ্রহণ করবার অন্ত—কিন্তু
আজ রাজ চৌদ্দ পনেরো বছরের মধ্যে বাংলার ছাত্রসমাজের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। মানসিক
ক্লীবতা যেন ছাত্রের মত ঘিরে ধরেছে। এর থেকে মুক্তি এখন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বসলেই আমি এসব কথা বলে থাকি। স্মৃতি, হৃদয়, হৃদয়
ও নিয়মাহুযর্তীতা জীবনে আয়ত্ত করতে হয়। এর ব্যতিক্রমে শুধু নিজের জীবন অহসার হয়ে
ওঠে তাই নয়—বেশ ও নশের প্রকৃত ক্ষতি সাধন করে। তোমাদের কাছে বারে বারেই আমি
একথা বলি। এসব সব্বোৎসাহ কাগজে পড়ি, চোখে দেখি তখন সত্যিই খুব দুঃখিত হই এবং
মনোকেটের কারণ হয়।

চিঠির উত্তর : সত্যি ও মুক্ত মৈত্র,—হাওড়া—কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডাইস
চামেলার ছিলেন সার জেমস উইলিয়াম কলভিল। অরুণ চক্রবর্তী, বোম্বে—তোমার প্রেরণা বেশ
ভালো—ওয়ার্ল্ডবিংয়ের পর থেকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নির্বাচন পর্যন্ত ৭৬ বার

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। একই লোক দুবার নির্বাচিত হতেও দেখা গিয়েছে।
 নির্বাচনের সংখ্যা শুন্দে আইমেন হাওয়ারের সংখ্যা পাঁচাবে ৩৭। অল্পা পত্রনিশ, পুণঃ—
 পুণিবীতে যে পাছ সবচেয়ে ধীবে ধীবে বাড়ে তাহোলো লিচেন নামে একরকম গাছ যা নাকি
 পঞ্চাশ বছরেও যাত্র এক হাতের বেশী বাড়ে না। মনু.—মেন্টাল এভেনিউ—হৃদযুখী ফুল সব
 সময় হৃদয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কেন?—দতি এ প্রশ্ন প্রত্যেক কিণোর-মাথায় আলোড়ন
 তোলে। পোনো গাছ পালা আর ফুল—এদের মধ্যে কাকর কাকর হৃদয়ের দিকে আকর্ষণটা বেশী
 থাকে। ফুলের মধ্যে হৃদযুখীর হৃদয়ের প্রতি এই আকর্ষণটা খুব বেশী। অর্থাৎ এই ধরণের
 ফুলের সব চেয়ে বেশী দরকার হৃদয়ের আলোর। তাই প্রকৃতির নিয়ম মাকিক হৃদযুখী ফুল হৃদয়ের
 সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। হৃদয়ের আলো হৃদযুখীর পক্ষে খুব দরকারী তাই তাকে হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ
 ফেরাতে হয়। খুকু ও হৃদযুখী—বাহা; পলু, নিউলি, বাধা, বাবলু—বউবাঁচার; রহু—
 বাবরাভাতলা হাওড়া—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি। সকলে আমার ভালোবাসা নিও।

তোমাদের মধুদি

শ্রীহৃদীরচয় সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
 ও তৎকর্তৃক প্রত্ন প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৪৫ নয়া পয়সা।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

শ্রাবণ - ১৩৬৯

[৪র্থ সংখ্যা

বর্ষা

শ্রীশুশীল রায়

নামলে যখন, নামলে যখন,
নামলে যখন, নামলে—
একটু সময় দিলেই হত
একটু নিতেম সামলে ।
চারদিকে মাঠ, ভাবছি কখন
পাব মাঠের প্রান্ত,
এমন সময় নামবে হঠাৎ
কেউ কি তেমন জানত ?
দেখতে পেয়ে আকাশভরা
তোমার কুটিল চাউনি
মাথাগোঁজার জন্তে যখন
খুঁজছি কোথায় ছাউনি

হঠাৎ তখন নামলে তুমি
নিয়ে ঝড়ের কাপটা,
পাইনে খুঁজে তোমার বিবে-
চনার পরিমাপটা ।
রাখব না আর কোনো কালে
তোমার উপর আস্থা,
ওই-তো দূরে গায়েব কুঁড়ে
তিন মিনিটের রাস্তা ;
পৌছে যেতাম এফুনি, আর
একটু নিতেম সামলে,
সইল না তর, লড়মুড়িয়ে
হঠাৎ তুমি নামলে ?

পালিশ-করা জুতো-জোড়া
 পরব বুঝি আর না,
 পাট ভাঙা এই শাস্তিপুরের
 দশায় আসে কান্না,
 এঁটে গেছে পাঞ্জাবিটা
 গায়ের যেন চামড়া—
 তোমার উপর আস্তা রাখি
 এমনি বেকুব আমরা ।
 সেজে-গুজে একটু না হয়
 যাজ্জি নেমস্তুয়ে
 সছ বুঝি হল না তা
 নামলে কি সেই জন্তে ?
 আরও কি সব ছুঁর্বটনায়
 হল কে অতিষ্ঠ
 আর-যে কাদের কতখানি
 হয়েছে অনিষ্ট—
 সে সব খবর একটু যদি
 সময় করে রাখতে
 জলের ধারায় নামার আগে
 একটু থেমেই থাকতে ।
 কাদের চালে শুকায় বড়ি,
 কাদের শুকায় আমতা
 সে সব খেয়াল করার আগেই
 আউড়ে নতুন নামতা

নবধারাপাতের, তুমি
 হঠাৎ এমন নামলে ?
 কাউকে সময় দিলেই না তো
 একটু নেবে সামলে ।
 পরকীকাতরতাতে
 কারও ভালোই হয় না ।
 এ কথাটা জানো, তবু
 কারও ভালোই হয় না ?
 আমায় তুমি ভিজিয়ে বন্ধ
 করলে নেমস্তুয়,
 ভিজিয়ে দিলে গৃহস্থদের
 শত সাধের পণ্য ।
 চরিত্রটা শুধরে নিয়ে
 এই অহুরোধ একটি—
 পারবে হতে তবেই সবার
 পূজনীয় ব্যক্তি ।
 আমরা কড়া রোদের তাপে
 আপাদ-মাথা বামলে
 শাস্তি পাব ভাবি এবার
 বৃষ্টিধারা নামলে ।
 কিন্তু তোমার আচরণে
 শোনো, নবীন বর্ষা,—
 ভীষণ পরিতাপ এসেছে
 নেই কোনো আর ভরসা ।

কান্দ দেখোনি ?

বীরভদ্র

বাঘ—হালুম, হালুম, হুম,
পায় বে আমার ঘুম।
ছড়িয়ে পড়া পাতার বিছানায়,
ঘুমোই হুখে, কে আমাকে পায় ?

শেয়াল—হুকা, হুয়া, হুক।
কাপছে ভয়ে বুক।
কোথায় যেন শুনছি বাঘের ডাক।
শত্রু আমার, বিকট বে গুর হাঁক।
সেদিন আমার করলো অপমান,
বিনা দোষে, গরম হলো কান।
বুঝি করে তুলবো প্রতিশোধ,
তবেই বাবে, অপমান আর কোধ।

বাঘ—হালুম, হালুম, হাম।
আঃ, কি আরাম !

শেয়াল—হুকা হুয়া হাক,
ঐ তো বাঘের ডাক।
আরাম করে পাতার বিছানায়,
পাজী বেটা, সুপেতে ঘুম যায়।
মাছুষেরা পাতলো হোথায় ফাঁদ।
বাঘকে ফেলি এই তো আমার দাঁধ।
হুকা, হুয়া হাম,
বাঘ নানা, পেমান।

বাঘ—হালুম, হালুম, হুম,
ভাঙলি আমার ঘুম।
এক খাবাতেই দেখি অন্ধকার।
বাচতে হলে পালা পগার পার।

শেয়াল—হুকা, হুয়া হাই,
শোনোনা বাঘ ভাই,
নোংরা, পচা পাতার বিছানায়,
ঘুম বাওয়া কি, তোমার শোভা পায় ?

বাঘ—হালুম, হালুম, হাই,
বিছানা কোথায় পাই ?

শেয়াল—হুকা, হুয়া হুক,
এদোনা, এইটুক।
ঐ ওখানে দড়ি দিয়ে আজ,
বিছানা পাতি। পাছো কেন লাভ ?
এসো না ভাই ঘুমোও না, ঐখান,
তবেই তোমার হবে তো, সম্মান।

বাঘ—হালুম, হালুম, হাই,
লক্ষী, শেয়াল ভুই।

শেয়াল—হুকা, হুয়া, হাও
ঐখানে ঘুমোও।

বাঘ—হালুম, হালুম, হা।
আটকেছে, হাত পা।
শেয়াল ভায়া, যতই টানি হায়,
সারা দেহ অড়িয়ে ততই যায়।

শেয়াল—হুকা, হুয়া, হাম।
কান হলো এর নাম।
বা খুশি ভাই করবি গায়ের ঘোর ?
মর বেটা, ভুই, শিকার হবে তোয়।
পিটিয়ে মাছুষ তুলবে গায়ের ছাল।
পালাই বাবা, দেখবো কি হয়, কাল।

বাঘ—হালুম, হালুম, হাই,
খুলে দেবা, ডাই।

শেয়াল—হুকা, হুয়া, হায়
ভীষণ হাসি পায়।
ঘুঘুই শুধু দেখলি ব্যাটা,
দেখ রে এবার কান।
খুলে ডোকে দেবে না কেউ,
বতই না ভুই কান।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আবার পথ।

গতকাল তার শাশুখালির বন্ধুদের উদ্দেশ্যে, কবিতার মাধ্যমে 'ভালোবাসা দিয়ে নমস্তার জানিয়ে' আজ উৎসাহে আবার পোল্ট, তার চলার পথে নেমেছে। চন্দনপুরের পথ। চন্দনপুরে নারায়ণের বাড়ী তাকে যেতেই হবে। চন্দনপুরের পল্লী-দেবতা আদরের সঙ্গে হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকেছে, সে কি না-গিয়ে থাকতে পারে? তাই অসীম উৎসাহে ও পরিপূর্ণ আনন্দে সে দিনের পর দিন পথ বেয়ে চলেছে। চন্দনপুর! আর কত দূর তুমি?

পোল্ট প্রায় হাইল-হুই পথ অতিক্রম করে এসেছে। সামনে 'কৈ-ভাঙ্গা' নামে একটা ছোট গ্রাম। কয়েক ঘর সদগোপের বাস। ছ'-চার ঘর ব্রাহ্মণ ও ছ'-চার ঘর মুসলমানও আছে। সকলেরই চাষ-আবাস আছে। খেতের ধান, বাগানের তরিতরকারী আর ঘরের গাইয়ের দুধ—এ তিন জিনিসের অভাব কারোই হয় না। এদের আবশ্যকও কম, অভাবও কম। এরা ছ'বেলা পেট ভরে খায়, আর প্রাণ ভরে স্মৃতি করে। বাংলার সব গ্রামই এই রকম।

পোল্ট গ্রামের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলো। ঐ ত সামনেই গ্রাম। মনে মনে বলতে লাগলো, গায়ের নাম—'কৈ-ভাঙ্গা'। এখানে কি তাহলে খুব কৈ মাছ পাওয়া যায়? কিন্তু ভাঙ্গায় কৈ মাছ? গ্রামের দিক থেকে একজন লোক সাইকেল চুটিয়ে আসছে। পোল্টর শাশু দিয়ে যাবার সময় সে বললে—“খোকা, গায়ের দিকে যেয়ো না। একটা ক্ষেপা কুকুর এই দিকে

ছুটে আসছে, সামনে পেলোই কামড়ে দেবে; সাবধান!” পোন্টু খুব ভয় খেয়ে গেল। মহা বিপদ! কি করে এখন সে? আশেপাশে কারো বাড়ী-ঘর নেই যে ছুটে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেয়। রাজার ধারেই একটা আশকল গাছ ছিল, খুব নীচে থেকেই তার মোটা মোটা ছোটো ডাল ওপরের দিকে উঠেছিল। পোন্টু সেই গাছে উঠে পড়লো। ভাড়াভাড়ি উঠতে গিয়ে তার বৃক্ক একটু ঘ্যান্‌ড্যানি লাগে, কিন্তু জামা আর মোচেরটার গায়ে থাকায় তেমন কিছু মারাত্মক হয় না। ওপরে উঠে গিয়ে, ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে ও দেখলো, পাগলা কুকুরটা জিত বার কোরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলে গেল। এই সময় লাঠি-গোটা হাতে চার-পাঁচজন লোককে গ্রামের দিক থেকে ছুটে এসে তার পশ্চাত্তাপন করতেও দেখা গেল। যতদূর নজর যায়, পোন্টু সেইদিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে সে গ্রামের মধ্যে ঢুকলো।

কেপা কুকুরের পারায় পড়ে, পোন্টুর আঙ্গ পথে অনেকটা মেরি হোয়ে গেল, তাই সে কোন জায়গায় আর না গাড়িয়ে ক্রতপদে কৈ-ভাঙ্গা পেরিয়ে, আবার মাঠের পথে পড়লো। মাইল-টাক দাবার পর, আর একটা গাঁয়ে ঢুকলো। এ গাঁয়ের নাম ‘কেশব-বাটা’। এটাও খুব ছোট গ্রাম। চাটুজ্যোপাড়া ছাড়িয়ে, মাকের পাড়ার মধ্য দিয়ে, কুমোরঘরের শাল পেরিয়ে, নুনোঘের ঘর ক’খানা পাশে রেখে, পোন্টু ও গ্রামের বাইরে এসে পড়লো।

আবার দু-ধায়ে ধান ক্ষেত। দিগদোড় ধান ক্ষেতের মাঝে মাঝে খানিকটা করে উঁচু জমি, নানারকম গাছপালা নিয়ে গাড়িয়ে আছে। এরা যেন মাঠের প্রহরী। কোথাও কোথাও তার মধ্যে োটি একটা পুস্কুর বা ভোবা আছে। আবার কোন কোন ধান ক্ষেতের মাঝে, খানিকটা সমতল উঁচু জমিতে খুব বড় একটা বট বা একটা অশ্ব গাছ আছে। মনে হয়, ও-গুলো পার্শ্ববর্তী গ্রামের ‘গো-চারণ’। ছপুরবেলায় রাখাল ছেলেরা ওখানে গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে, গাছের ছায়ায় বসে, ঘেঠো হুবে গান গায়, কিংবা সবাই মিলে ‘গানি’ খেলে।

যেতে যেতে পোন্টু দেখলো, কিছু দূরে এক বুড়ী একটা পৌটীলা বগলে কোরে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। পোন্টু একটু ভাড়াভাড়ি হেঁটে গিয়ে তার নাগাল ধরলে, জিজ্ঞাসা করলে—“বুড়ী-মা, কোথায় যাবে গো?” বুড়ী পেছন ফিরে চেয়ে দেখে বললো—“কে বাবা তুমি? আখি এই সামনের গাঁ—হাড়োলে ঘাব। তুমি কোথা যাবে, খন?”

“আমিও যাব। তোমার পৌটীলাতে সব কি?”

“দু’চারটে চালতে, আর একখানা কঁাথা আছে। যেয়েটা চালতে বড় ভালবাসে, বলে পাঠিয়েছিল কি না, তাই”...

“ওখানে তোমার মেয়ে থাকে বুঝি?”

“হ্যাঁ যে বাবা, ঐ যে রাস্তা হলে—তুমি চেন কি? সেই ত আমার জামাই। তিনটে বাচ্চা হয়েছে। বড়টা বা ছোট্ট সে আর তোমায় কি বলবো, বাবা!”

গল্প করতে করতে পোন্টু যেতে লাগলো।

“তা বুড়ীমা, তোমায় জামাই আস্ত কি করে?”

“রাস্তা? তিন বিঘে আমি যে তার নিজের চাষের! তারপর, ঘোষাঘরের আড়াই বিঘে দুই ভাগে করে। ভাতের ভাবনা নেই বাবা, আমার খুব স্বপ্নে আছে। এই এখন ত ক্ষেত-খামারের কাজ উঠে গেছে, তা রাস্তা বোদে থাকবার পাক্তর নয়, পাড়ায় জন-বছরের কাজ করে।”

“বটে!”

“হ্যাঁ, ধন। বাড়ীতে গাই আছে। পূজোর পর বক্সা-বাছুর বিইয়েছে। তা তোমায় রান্নাবান্নে আমার কোন দুশ্ নেই। অনেক কোরে একবার যেতে বলে পাঠিয়েছিল, তাই বাচ্চি, বাবা।”

কথা কইতে কইতে দু’ঘনাই চললো।

ধানিক পরে গ্রামের মধ্যে ঢুকে, একটা জায়গায় এসে বুড়ী বললে—“এই ডান দিকে হলে-পাড়ার পথে আমি যাব বাবা। তুমি কাদের বাড়ী যাবে? চৌধুরীবাড়ীর বৃষ্টি? তা যাক। একটা চালুদে নিয়ে যাবে নাকি বাবা, খেতে পারবে এখন।”

“না বুড়ী মা, তুমি নিয়ে যাও, চালুতা আমি খাই না।”

বুড়ী ডানদিকের সড় বন-পথ ধরে হলেপাড়ার দিকে চলে গেল।

পোন্টু আর ধানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলো, জন-হুন্টার লোক বাঁদিকের একটা পথ ধরে ছুটছে। সকলেরই মুখে আনন্দ আর উৎসাহ। পোন্টু তাদের জিজ্ঞাসা করলে—“কি হোয়েছে ওদিকে?” তাদের বেশ কথা কইবারও অবসর নেই; ছুটতে ছুটতে ওদের একজন বললে—“হু...।” পুরো কথাটা আর তার মুখ দিয়ে বেরবার সময় পেল না। তারা ছুটতে লাগলো। পোন্টু টেচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—“হু...কি?” তারা আর কোন উত্তরই দিলে না। পোন্টু দেখলো, আবো দু’তিনজন ছুটতে ছুটতে আসছে। তারা কাছে এলে, পোন্টু তাদেরও জিজ্ঞাসা করলো—“কি হোয়েছে ওদিকে?” “হুমীর! হুমীর!” বোলে তারাও বাঁদিককার ঐ পথটা দিয়ে ছুটতে লাগলো। হুমীর! হুমীরের কথা শুনে পোন্টুর একটু ভয়ও হোল, কিন্তু দেখবার ইচ্ছেটা হোল তার চেয়ে বেশী। স্বতরাং সেও ঐ বাঁদিকের পথটা ধরে চললো। পেছনে আর চার-পাঁচজন কিশোর বয়স ছেলে আসছিলো। পোন্টু তাদের সব মিলে। “হুমীর দেখতে বাচ্চ বোধ হয়?” পোন্টু বললে—“হ্যাঁ।”

“চল, আমরাও বাছি।”

“কত দূর?”

“ওই ত, দেখতে পাচ্ছ না, পুকুর পাড়ে কতলোক জড়ো হোয়েছে।”

সেই চার-পাঁচজন কিশোরের পিছন-পিছন পোল্ট পুকুরটার পাড়ে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালো। সমস্ত গাঁ-ভেঙ্গে সেখানে লোক জড়ো হোয়েছিল। কুমীরটা তখন ভাঙায়। প্রকাণ্ড মেছো-কুমীর। রায়-বাবুদের এই বড় পুকুরটার অনেক মাহ সে উদ্বাস্ব কোরেছে। অনেকদিন থেকে অনেকই এই কুমীরটাকে মারবার অনেক চেষ্টা কোরেছিলো, কিন্তু কেউ-ই সক্ষম হয়নি; শেষকালে এবার কারিগর পাড়ার ফজল আলি একে আঙ্গ পাকড়াও কোরে, সাধা গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে বাহবা নিতে পেরেছে।

রায়ুদের বড়ো কর্তাবাবুও ঐ সময় পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ফজল আলির বুদ্ধি ও হুকুমতার প্রশংসা কোরে,—তাকে খুব ধন্যবাদ দিলেন। বড়ো-কর্তাকে সেলাম কোরে ফজল আলি-মায়ের বললো—“বাটা বড়ো শেয়ানা কুমীর, তাই কিছুতেই কেউ ওকে এতদিন কারখা করতে পারেনি; এবার ওর মসৌব খারাপ, তাই ওর মরণ-ফাদে ও পা দিয়ে বললো।” ফজল আলি তার এখারের ফকী-ফিকিরের কথা কর্তাবাবুকে বলতে লাগলো। পাঠার মাড়ী-তুড়ির মধ্যে আট-দশটা মজবুত বড় সাইজের বঁড়শী পুরে দিয়ে, সেটা কাল রাতে জলের মধ্যে ফেলে রাখা হোয়েছিলো। সেইটে গিলে খাওয়ার কলেই বাটা ধরা পড়েছে। এর আগেও দু’একবার এইরকম পথা কেউ-কেউ অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তাতে ও ধরা পড়েনি। অতান্ত বারে একটা খুব বড় সাইজের বঁড়শী (কুমীরে বঁড়শী) মাড়ী-তুড়ির মধ্যে রাখা হোয়েছিল। তাতে সেই হকের মতো বড়ো বঁড়শীটা ওর চোয়ালের গায়ে লাগায়, ও চারপাশ থেকে সেগুলো খাবলে খাবলে খেয়ে পালায়, বঁড়শীটা পোড়ে থাকে। এবার অতবড় একটা বঁড়শী না দিয়ে, অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দু’তিন ইঞ্চি মাপের—কিন্তু খুব মজবুত—আট-দশটা বঁড়শী, সুরু সুরু তারের সঙ্গে বেঁধে, ঐ মাড়ী-তুড়িটার ভিত্তি ভিত্তি অংশে ঢুকিয়ে রাখা হোয়েছিল। এবার বঁড়শীগুলো ওর চোয়ালে লাগেনি, মাড়ী-তুড়ির সঙ্গে সবগুলো একেবারে পেটে গিয়ে হাজির! আর বায় কোথা? বাছাধন একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার!

পুকুর-পাড়ের ভিড় আর কমে না; একদল যায় ত নতুন একদল আবার আসে। পোল্ট নিজের চোখে এই প্রথম কুমীর দেখলো। সে বইয়েতে কুমীরের ছবি দেখেছিলো, কিন্তু তার মুখটা ত অস্তরকম, এ রকম লম্বা আর সরু নয়। পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করাতো, সে বললে—

“এ হোল মেছো-কুমার, এদের মুখ এই রকম হয়।” দৃষ্টান্ত কর্তাবাবুর দৃষ্টি পোন্টুর ওপর পড়লো। তিনি সামনের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—“এ ছেলটি কাদের বাড়ীর? একে ত কখনো দেখিনি।” তিনি পোন্টুকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি এখানে কাদের বাড়ী এসেছ?” পোন্টু বললে—“আমি কাকর বাড়ী আসিনি, রাস্তা দিয়ে বাড়িলুম, কুমার ধরেছে শুনে দেখতে এলুম।”

“কোন গায়ে বাড়ী তোমার? কোথায় বাড়িলে?”

তারপর পোন্টুর কাছ থেকে সংক্ষেপে সব শুনে, কর্তাবাবু তার হাতটা ধরে বললেন—“পাঁচপুকুর থেকে হাড়োল—এই ৩৪ মাইল পথ তুমি হেঁটে এসেছ! তোমার বাহাদুরী আছে, বাবা! এখান থেকে চরনপুর মোটে পাঁচ-ছ’মাইল পথ; তুমি ত একরকম এসেই গেছ”—বিশ্বর-প্রভুজ দৃষ্টিতে তিনি পোন্টুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

“ওখানে তুমি কাকর বাড়ীতে যাবে? তোমার সেই বন্ধুর বাবার নাম কি?”

“তিনি আমাদের পাঁচপুকুরের পোন্টুমাস্টার ছিলেন, তাঁর নাম নীলাধর মুখোপাধ্যায়।”

“নীলাধর মুকুঞ্জ! তুমি তাঁর বাড়ী যাবে? আরে, তিনি যে আমাদের জানা লোক! ‘পলাশনে’র বনমালী বাড়ুকোঁর বেয়াই তিনি। শুনিছি, ভারি ভালো লোক। কিন্তু, আজ এই এত বেলায় তোমাকে ত আমবা যেতে দোবো না। আজ তোমাকে আমাদের বাড়ী থাকতে হবে।”—পোন্টু নীরবে মাথা নীচু কোরে দাঁড়িয়ে রইলো। কর্তাবাবু বললেন—“চলো বাবা, এতটা পথ হেঁটে এসেছ, ছেলেরা হুধ তুমি, খুব হয়ত ক্ষিপে পেয়েছে। চলো, আগে কিছু খল-টল খেয়ে নেবে চল; তারপর চান কোরে ভাত খাবে”—কর্তাবাবু আগবের সঙ্গে পোন্টুর হাত ধরে টানলেন। এই অনাড়ম্বর সহজ স্নেহাকর্ষণ পোন্টুর চোখে-মুখে সুগভীর আনন্দের ভাব ফুটিয়ে তুললো।

কর্তাবাবুর সঙ্গে পোন্টু তাঁর বাড়ীতে আসবারাত্র বাড়ীর ছেলেরা তাকে সমাদরে গ্রেপ্তার কোরে ফেললে। তাদের মধ্যে টিহু আর ভায় তাকে একেবারে পেয়ে বসলো, কারণ তারা চক্ষুমেই পোন্টুর সমবয়সী। পোন্টুকে নিয়ে সারামিনিই সকলে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে গল্প-গাছি কোরে কাটালে। সন্ধ্যার পর সবাই মিলে পোন্টুকে ধরে বসলো—“কাল তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না। কাল আমাদের এখানে স্পোর্ট (Sport)। কাল তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না।” স্পোর্টের কথা শুনে পোন্টু হুও থাকতে ইচ্ছে হোল; জিজ্ঞাসা করলে—“কোথায় স্পোর্ট হবে?” ভায় বললে—“এই ত আমাদের স্থল-বাড়ীর মাঠে। বড়দা তো স্পোর্টের সেক্রেটারী।” বড়দা দিলীপ পোন্টুর দিকে চেয়ে বললে—“হ্যাঁ ভাই, কালকের দিনটা তুমি থেকে যাও; কাল স্পোর্টটা দেখে পরও যেরো।”

পোন্টু জিজ্ঞাসা করলো—“কখন হবে দিলীপদা ?”

“বেলা একটায় স্নান হবে। সাইকেল-রেস, ক্র্যাট-বেস, হাই-জাম্প, লং-জাম্প, Arithmetic-রেস, Spoon and Egg-রেস, Shirt-রেস—অনেক কিছু হবে।”

“সবাই কি হাড়োলের ছেলে, দিলীপদা ?”

“বেশীর ভাগই হাড়োলের, পাঁচের গা ‘পলাশনে’র শুধু দু’একজন আছে।”

এই সময় পাড়ার একজন এদে দিলীপকে ধবধব দিলে, কালিদাস স্পোর্টে নামতে পারবে না, হঠাৎ তার পায় খুব চোট লেগেছে। দিলীপ বললে—“তা’হলে ত ওর জায়গায় আর কারকে নিতে হয়।” দিলীপের ছোট ভাই সাহ খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো—“কালিদাসের জায়গায় পোন্টুকে নিলে হয় না, দাদা ?” তখন ভাহু, শচীন, বোঁতন প্রভৃতি সকলেই লাফিয়ে উঠে বললে—“ঠিক বলেছে সাহু, পোন্টুকে নাও, দিলীপদা, বেশ হবে তা’হলে।”

দিলীপ পোন্টুর দিকে চেয়ে বললে—“পোন্টু। রাজী ত ? তোমার নামেই সকলে ভোট দিচ্ছে, তা’হলে কালিদাসের জায়গায় তোমার নামটাই লিখে নিচ্ছি,—কেমন ?” ভেতর-ভেতর পোন্টুর খুব উৎসাহ আর আনন্দ হোল ; তবুও যে একটু না-হোল, তা নয় ; জিজ্ঞাসা করলো—“আমায় কিসে বেবেন দিলীপদা ?”

“কালিদাসের বাতে বাতে ছিল, Egg and Spoon Race, Arithmetic Race, Shirt Race—এই তিনটেতে। খুব পারবে তুমি, তা’হলে তোমার নামটাই কালিদাসের জায়গায় লিখে নি ; কি বল ?”

পোন্টুর মৌববতা, সম্মতি দান মনে করে দিলীপ কালিদাসের নামটা কেটে দিয়ে, পোন্টুর নাম লিখে নিল। পোন্টুর ভালো নাম পলাশরঞ্জন।

‘Egg and Spoon Race’ পোন্টু জানতো। একটা চামচের মধ্যে একটা হাঁসের ডিম রেখে, চামচের হাতলটা একহাতে ধরে ছুটে যেতে হয়। ছুটে যেতে যেতে ডিমটা যদি পড়ে যায়, তা’হলে সে হেরে গেল। ডিমটাও পড়বে না, অথচ ঘোড়ে পারা দিয়ে ওদিকবার সীমানার পোন্টের কাছে পৌঁছতে হবে।

Arithmetic Race টাও পোন্টু জানতো। বছর দুই আগে, পাঁচগুরুদের পাঁচের গাঁ—‘মউখালি’তে Arithmetic Race-এ সে ফাট’ হয়েছিল। এতে খেলোয়াড় ক’জন একসঙ্গে ঘোড়ে ও-দিককার সীমানা-পোন্টের কাছে যাবে ; সেখানে কাগজে একটা করে অঙ্ক টোকা থাকবে। কাগজখানা ভাঁজ কোরে একখানা বই চাপা দিয়ে রাখা হয়। পাশে একটা পেনসিল। এদিক থেকে ঘোড়ে গিয়ে ও-দিকের সেই অঙ্কটা কবে, কাগজখানা হাতে করে নিয়ে, আবার

এ দিকে ফিরে আসতে হবে। অঙ্ক ঠিক না হোলে, সে খেলোয়াড় বাতিল বলে গণ্য হয়। আগে চাই অঙ্ক বাইট হওয়া, তারপর ঘোড়ের প্রতিযোগিতা। এ-রেলের নিয়মটা কালকের স্পোর্টে দিলীপ একটু পরিবর্তন করেছে। রেস নামেই খেলোয়াড়রা প্রাণপণে ছুটে যায়। এই-ভাবে ছুটে ওদিককার সীমানার গিয়ে, অঙ্ক কববার অন্তে টপ্ কোরে একেবারে বসে পড়া ও অঙ্ক কথা একেবারেই ভালো নয়। এতে হঠাৎ হাটের স্পন্দন বন্ধ হোয়ে যেতে পারে। তাই দিলীপ ঠিক করেছে, Starting place-এই ঐ ভাবে অঙ্ক-লেখা কাগজ থাকবে। চারজনকে অন্তে চারখানা। ওপ অঙ্ক। ওপরের লাইনে চারটি সংখ্যা, নীচে তিনটি। প্রত্যেকের অঙ্কই পৃথক। ভাল লেঙ্-পেন্সিল থাকবে, শক্ত নীল। তবু, অঙ্ক কবতে গিয়ে কেউ যদি অশাবধানে নীল ভেঙ্গে ফেলে, তা'হলে সে disqualified হোয়ে যাবে, সেবার তার খেলা বন্ধ।

বাই গোক, এ ছুটো 'বেল' পোন্টুর জানা ছিল, কিন্তু Shirt Race জিনিষটা কি, তা সে জানতো না। সে Orange Race-এর কথা শুনেছিল, কিন্তু 'শার্ট রেস'টা কি ব্যাপার! দিলীপ তাকে বুঝিয়ে দিলে। মাঠের ঠিক মাঝখান-বরাবর, কাগজের প্যাকেটের মধ্যে একটা করে নতুন শার্ট থাকবে। ছুটতে-ছুটতে গিয়ে, মাটির ওপর থেকে এক একজন এক একটা প্যাকেট তুলে নেবে, তারপর প্যাকেটটা ছিঁড়ে, শার্টটা বার কোরে গায়ে পরতে হবে। উটো-পান্টা কোরে পরলে চলবে না। ছুটতে ছুটতেই সেটা গায়ে পোরে ফেলতে হবে।

ভাঙ্ক বললে—“খুব ভালো ছিটের চারটে শার্ট এর অন্তে কেনা হয়েছে।”

টিঙ্ক বললে—“প্রত্যেকেই কিন্তু শার্টটা এহুনিই পরে যাবে, বার্মা ফান্ট সেকেন্ড হবে, তাদের আবার আলাদা প্রাইজ ত আছেই।”

দিলীপ টিঙ্কর দিকে চেয়ে বললে—“শার্টের অন্তে ভোর খুব সোস্ত হচ্ছে, না? তা ভোর নামটা লিখে নোঙ্কোনাঙ্কি—বল্?”

মুখখানা একটু কাঁচু-ঝাঁচু কোরে, অঞ্চল হাসি মিশিয়ে টিঙ্ক বললে—“আমি যে ছুটতে পারি না, নইলে নাম দিতুম।”

মোটের ওপর, পরের দিন পোন্টুর হাড়োল থেকে আর যাওয়া হোল না। স্পোর্টে নামতেই হবে তাকে। খুব আনন্দ আর উৎসাহে সকলের সঙ্গে সেমিনতা তার কাটলো। পরের দিন সকালে—সকলের সঙ্গে স্কুলবাড়ীর মাঠটা বেখে গেল। স্কুলবাড়ী একেবারে গ্রামের প্রান্ত-ভাগে। এখান থেকে পশ্চিম দিকে একটা গ্রাম-পথ সোজা 'পলাশনে' গেছে। ছুটো গ্রাম একেবারে পায়ে-পায়ে। ও-পাড়ের মাথা-টুছু কাউ-দেবদাকর কাক গিয়ে, সারখেল-বাড়ীর চিলে-

কোঠা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝের-পাড়ার বুড়ো-বটের মাথায়, বিগত বারোয়ারী পুণ্যের নিশেনটা এখনো মুহুম্মদ বাতাসে অনিচ্ছায় ঘন এক-একবার নাচছে, ঢুলছে।

স্পোর্টের জন্তে স্থলবাড়ীর হিগ-দৌড় মাঠটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। যেখানে একটু-আধটু খোঁয়ল-খাঁয়ল ছিল, তা মাটি কৈলে ভরাট করা হয়েছে। মাঠের দু'প্রান্তে গোল-পোষ্টের মত দুটো কোরে চারটে বাঁশ পোতা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকটার মাথায় একটা কোরে স্ফাগ বেঁধে দেওয়ায়, মেগুলো মুহুম্মদ বাতাসে অল্প-অল্প ঢুলছে। চার পাশে দর্শকদের দেখবার ভায়গা ঘেঁষে ঘন ঘন বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বরাবর দড়ির টানা বাঁধা। পোষ্ট সকলের সঙ্গে সমস্ত মাঠটা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলো। তার মনে আজ ভারি আনন্দ। সে স্পোর্টে ছুটবে। কাল সে চরমপুর যাবে। কতদিনের পরে আবার নারায়ণের সঙ্গে তার দেখা হবে। কি মজা! আজ তার মায়ার কথা মনে হোল—তার কংস মামা! একদিকে তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা মনে পড়ে, মনটাকে যেমন হুংখে তার কোরে তুললে, অত্নদিকে তেমনি সেই অমাহুষের কবল থেকে মুক্তির আশ্রয় তার অন্তরকে ভরিয়ে তুললে।

[ক্রমঃ]

শান্ত ছেলে

শ্রীঅরুণেন্দু নন্দী

টং টং টং চং ঘণ্টা যে বাজারে
ইস্কুলে ছেলেরা ছোটো নানা সাজে
স্টেশনেতে শোনা যায় টিং টিং টিন্ টিন্
একুপি ছুটে যে আসবেই ইঞ্জিন।
চারিদিকে ছোটোছুটি খোকা শুধু শান্ত
কেটেছে সে মার শাড়ী, এ কথা কে জানত !

সিঁটু

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ছুটির সেবা, গ্রীষ্মের ছুটি। শিহনে তাকাও পরীক্ষা কোথায় পড়ে আছে, সামনে তাকাও দেখাই যায় না। বছরটা ঘুরতে ঘুরতে যেন মত্ত একখানা খেলার মাঠে এনে ফেলেছে। বালি খেল, ফুটবল আর হকি, গল্প কর খেলার আর খেলোয়াড়ের, খাও আম-জাম-লিচু। পড়ার তালিদ নেই, না পড়ার বহুনি নেই, বিছানায় যতক্ষণ বৃশি গড়াও। তবে গরমে কতক্ষণই বা শোয়া যায়? বাতাসে একদিক ঠাণ্ডা হয় তো আর একদিক ঘাসে। এই এক জলুনি। গায়ে-গলে আপন জন যদি কেউ থাকে তাহলে সেখানে আম বাবার নিমন্ত্রণ। দু-চারদিন সেখানে কাটিয়ে এস। গাছে চড়ে, নদী থাকলে সীতের পার হয়ে যাও, চর থাকলে ছুটি-কাঁকড়-তরমুজের ক্ষেতে ঢুকে পড়। কিন্তু সাবধান, চাবী যেন না দেখে। দেখলেই ভাড়া খেতে হবে, ধরা পড়লে ঠাণ্ডানিও কপালে জুটেবে। গায়ের লোকে বলে, 'চাবার মার বেশের বার।' ক্ষেতের মাঝে টঙ্ক। টঙ্ক বসে দিন-রাত ক্ষেত-খামার পাহারা দিচ্ছে। শিয়াল তাড়াচ্ছে, গরু তাড়াচ্ছে, আর তাড়াচ্ছে চোর। বৈশাখের আগুনে বাতাসে হঠাৎ উড়ছে চরের তপ্ত বালির বৃশি যেন গরম পোলা থেকে উঠছে। সে বালিতে ধান কেলেলে চটপট শব্দে থেঁ হয়ে যায়; পায়ে লাগলে পা পোড়ে, গায়ে লাগলে গা জ্বালা করে, চোখ ফেরালে চোখ ঝলসে যায়।

"ঐ চরের ওপর দিয়ে এই ভর-দুপুরে বালি পায়, বালি মাথায় কে হেঁটে যেতে পারে?" কেউ না।

সবাই চূপ করে সেনিকে তাকিয়ে থাকে। মাথার ওপর ছাতার মতো কাঁকড়া আমগাছ, মাটিতে ছায়া। তারি গুড়িতে হেলান দিয়ে তিনটি, গাছের ডালে দুটি ছেলে বসেছে। ওরা সব গ্রীষ্মের ছুটির তেপান্তরের মাঠের খেলুড়ে। ওদের মধ্যে আছে সিঁটু। ওদের বোস পাড়ায় ওকে চেনে না কে? যে ওকে দেখে নি, তাকেও ওর নাম শুনেতে হয়েছে। ওর গল্প সব ছেলের মুখে। বোসপাড়াটা হলো মানিকতলার উত্তরে। ও এসেছে এই গাঁবে মাসীর বাড়ি আম খেতে। কিন্তু আম এখনও ভাল করে পাকে নি। তাতে কী? লংকারগুড়ো আর ছন্ন দিয়ে কাঁচা আম পাকা বোখাই-ল্যাংড়ার চেয়েও চমৎকার। ঝালে-হুনে-টকে সে আমের যা তার! বাবা খায় তারা জানে।

সিঁটু এইবার নিয়ে দু'বার এসেছে মাসীর বাড়ি। এবার মাসী নিজের থেকে ওকে এনেছে,

সেবারও নিজের থেকে এসেছিল। সেবার ছিল পল্টু, ওর মাসভুতো ভাই, ঐ একটাই। সে গেছে আনামের ঐ দিকে হাফ লং না ফুল লং কোথায় কোন চা-বাগানে খুঁড়োর কাছে। সেবারে পল্টু ছিল দঙ্গী, এবারেও দঙ্গীর অভাব হয় নি। এ সব ছেলে যেন চুষক, সঙ্গীরা আপনিই এসে চারধারে বেঁটে।

সিটু বলে ওঠে, “ঐ আর একটা বুঁবি উঠেছে। ঠিক একটা নৈতা। সমুদ্রের ধারে দিকুবাদ নাবিকের সঙ্গে যে নৈতাটার দেখা হয়েছিল সে কী এত লম্বা, এমন ভীষণ ছিল? ভাখ, ভাখ ওর মাথাটা আকাশ ছোঁয় ছোঁয়, চরের ওপর দিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটছে, হেলছে, হুলছে। ঐ—ঐ—যা মিলিয়ে গেল।”

ভেলু আবার বলে, “ঐ চরে এই ডর-দুপুঁরে যে খালি মাখায়, খালি পায়ে যেতে পারবে সে—”

“ভেলু ছাড়া আর কেউ নয়।” বলে বিপ্ত তাকে কচুইয়ের চৌলা দেয়, হাসে।

“তোমার বা সাহস তা সবাই জানে। সেদিন সন্ধ্যার পরে বাসন্তলা দিয়ে আনতে আনতে তাকে টেঁচিয়ে পাড়া মাং করেছিল।” বলে ভেলু। “যা যা মেলা বকিস্ নি!”

“আর তুই? বলবো সে কথা? এই সিটু—”

“শাট, আপ!”

“ভারি ইংরিজি শিখেছে। তবু যদি না ফেল করতিস!”

“কী! আর তুই—?”

হরি আর মননা পাকা কাঁঠালের মতো ঝুলতে ঝুলতে ধপধপ করে পড়ে। বলে, “হাত থাকতে মুখে মুখে—”

শুক হয় ধস্তাধস্তি।

হঠাৎ মননা বলে, “আরে! সিটু কৈ? ঐ গাঁতের নদী পার হুচ্ছে। ফাস্ট, ক্রাস গাঁতের কাঁটে।”

“ও কলকাতার হৈদোর কেদো—” বলতে বলতে বিপ্ত ধপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে গাঁতের চলে। তার পিছু নেয় বাকি চারজন।

বর্ষার বিশাল হলো গ্রীষ্মে ধাবাটি শীর্ণ, নীল, ধীর।

পারে উঠে পাঁচজন ছোটো চরের দিকে। সামনে কুটি-কাঁকড়-তরমুজের ক্ষেত। ওটা পার হয়ে খোলা চরে যেতে হয়। ক্ষেতের ধারে পৌঁছতেই টঙ থেকে চাষী তাড়া দেয়, “হেই।”

সিটু টেঁচিয়ে বলে, “আমরা চুরি করতে আসি নি। চরে যাবো।”

চাষী লাঠি হাতে নেমে আসে, বলে, “ওখার ঘুরে যাও।”

মদনা বলে, “অনেকটা পথ দূরতে হবে।”

“তা আমি কি করবো?” বলতে বলতে চাঁদী মামনে এমে দাঁড়ায়। “আমার ক্ষেত মাড়াতে দেবো না।”



‘চাঁদী লাঠি হাতে কেনে আসে, বলে, ও ধারে দূরে যাও।’

“মাড়ালে কী হয়? তুমি মাড়াও না?” বলে হরি। “আমরা যাবোই।”

“যাও তো দেখি।”

হরি বলে, “যাবো না কি? আমরা তোমার কী করেছি?”

“তোমাদের মতলবখানা আমি বুঝেছি।”

“কী বুঝেছো?”

“এই খণ্ডায় চরে যাবে কী করতে শুনি? কী আছে ওখানে? একটা পাখিও ওদিকে উড়ছে না, আর তোমরা যাবে মরতে?”

বিশ্ব বলে, “আমাদের ইচ্ছে।”

“আমাদের চাষার ছেলেরা তো তোমাদের মতো বেয়াদ্ব। নয়। ভদ্রলোকের ছেলেরের বীতর্ক এই—”

“ধবধবদার! গাল দিও না বলছি।” বলে ভেলু বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়।

চাষী হঠাৎ হাঁক ছাড়ে—একবার, দু’বার, তিনবার। “হে—উই, হে—উই, হে—উই—।”

চরের শেষে গাঁ। আকাশ-চাঁদোয়ার তলায় বেন কালচে কানায়। তার কোলে গরুর পাল চরছে সাদার ছোপ।

হরি বলে, “আমরাই করতে চাও নাকি? আমরাও ওনার থেকে লোকজন আনছি। এই—চল—চল—”

চাষী বলে, “তোমরা আমাদের ক্ষেত লুণ্ঠনে এসেছো।”

“ঘেমন নিজে তেমনি পরকে ভাবে।”

“কী বলি? আমি লুণ্ঠরা?”

“ভূমি খুনে।” বলে মহনা।

“এই খরার চরে বেতে মানা করলাম বলে, আমি হলাম খুনে? তোকে খুন করতে কটক লাগে? এই জাখ বেটে।”

“তার আগে আমরা পাঁচজন তোমার পেড়ে কেল মুখে বালি গুঁজে দেবো।”

চাষী ভবু সংঘত থাকে আর মাঝে মাঝে গাঁয়ের দিকে তাকায়।

বিশ্ব বলে, “ওদিকে তাকাও কী? বাঘের হাঁকাহাঁকি করলে তারা এবার চর দিয়ে হেঁটে না আকাশে উড়ে আসবে? তারা মরবে না?”

“তারা আসবে একটা দরকারে। আর তোমরা বাবে কি করতে ভনি?”

“দরকারে এলে মরে না আর শব্দ করে গেলে মরে যায়? চাষার বুদ্ধি আর কত ভাল হবে?”

মহনা বলে, “ক্ষেতের ওধার দিয়ে একটা ছেলে ছুটছে। জাখ—জাখ—”

“সিন্টু—সিন্টু—” বলতে বলতে চারজন ক্লেতের ওপর দিয়ে ছোট্টে সেদিকে। চাষীও “ধবধবদার-ধবধবদার” বলতে বলতে তাদের পিছু নেয়। হাতের খেটে ছুড়ে মারে। খেটেখানা গিয়ে পড়ে একটা আধপাকা তরমুজের গায়ে। অমনি ফলটা ফেটে গল্গল্ করে রস বেরিয়ে পড়ে। চারজনে স্তম্ভকণে ক্ষেত পার হয়ে গেছে।

“এ পথে আবার আসিস।” বলতে বলতে চাষী ঘাটা তরমুজটা সম্বলি সবুজ দু’হাতে তুলে

নেয়। ওজন কয়পক্ষে হবে বল দেব। কতগুলো পরমা লোকশান! ঐ বেয়াড়া ছোড়াগুলোর ক্ষেত্রে?

গী থেকে গাবছা মাথায়, লাঠি হাতে ছুটে আসে চার-পাঁচটি চাষী।

ভাষা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "কী ব্যাপার?"

চাষী বলে, "ঐ শয়তানের দল এসেছে!"

যগোগোছের একজন বলে, "লুঠ করতে চায় নাকি?"

পাহারাদার চাষীটা বলে, "ভেলবখানা বোধকরি তাই ছিল। না হলে এই খবর চরে আসে।"

"চল তো দেখি। এই—" বলে যগা চাষীটা হাঁক দেয়। "ওটা কী? কাটা তরমুজ? কাটলো কি করে?"

পাহারাদার বলে, "তরমুজটির অমন দশা করলে কে?" এদিকে দু'দলই পরস্পরের দিকে এগোয়। মুখোমুখি হয় ক্ষেতের ধারে।

যগা চাষীটা চোখ পাকিয়ে বলে, "তোরা দব—আরে, এ যে দেখি গোয়দামশায়ের ছেলে।"

চাষীদ্বয়ের চোণের আগুন হঠাৎ নিবে আসে। যে জমিতে ফলের কল উঠছে বিত্ত তারই জমিদারের গোয়দাম ছেলে। চাষীরা চব্বের ভেঁটে এই অংশ জমিদারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে।

পাহারাদার বলে, "আমি চিনি নে কিনা। আগে বললেই তো দু'একটা ফল খাবার ক্ষেত্রে দিতাম। এত হাণ্ডার-হুজুতের প্রয়োজন কি ছিল?"

বিত্ত বলে, "আমরা লেজন্তে আসি নি। এই-চল-চল—"

মদন বলে, "সিটু তপ্ত চরে গিয়ে পথ দেখিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সাহস থাকলে কোন কাজই কঠিন নয়। আগেই মিথো ভয়।"

হরি চাষীকে বলে, "এবার ক্ষেতের ওপর দিয়ে বেতে লেবে তো?"

ভেলু বলে, "আমরা খুব দাবদানে বাবো। ফলগুলোর দিকে ফিরেও তাকাবো না।" বলেই হাসে।

চাবধারে ফুটি, কীহুড় ও তরমুজ। ফুটিগুলো পাতার ঢাকা। সাদা বালির ওপর তরমুজ-গুলোকে মনে হচ্ছে, কালো পাথরের গোলা।

চাষী বলে, "চাইলে একটা ফল খেতে দিতে 'আপত্ত' নেই, কিন্তু বাবু চুরি-চামারি—"

সিটু কথো দাঁড়ায়, বলে, "কে চুরি করতে এসেছে?"

চাষীদের মধ্যে বয়স্ক যে সে বলে, "চুরি করতে চায় তার 'প্রেমার' কী ? ছাড়ান দাও বাবু। এসব কথা গোমস্তামশায়ের কানে তুলো না। তোমাদের বয়সে আমরাও কত নটামি করেছি। এই ক্ষেত্রে বয়স আমারও। তোমরা এই কাটা তরমুজটা নিয়ে যাও।"

বিশ্ব বলে, "চাই নে।"

"দিচ্ছে যখন তখন নিতে কী ? "কি বলিস্ রে ভেলু ?" বলে হরি। "ওপারে নিয়ে গিয়ে খাওয়া যাবে।"

বিশ্বর আপত্তি টেকে না। কিন্তু তরমুজ তো বল নয় যে জলে ভাসবে। গামছা থাকলে পিঠে বাঁধা যেত ! খেয়াঘাটও দেখান থেকে আধ কোশ। খেয়ারও পারানি চাই। পাটনী লোকটা ভাবি কড়া। পারানি না নিয়ে কাউকে খেয়ার তোলে না। কাজেই খেয়ারও যাওয়া যাবে না। আবার, সেখানেও তরমুজটা খেতে ইচ্ছে হয় না।

সিটু বলে, "আমি নিয়ে যাবে। দেখিগ তোরা। চল-চল।" সে তরমুজটা হাতে তুলে নেয়।

চাষীদেরও কৌতুক বোধ হয়। তারা মজা দেখতে নদীর কূলে গিয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ বছর কষ্টকর করে জলে নামে।

"তোরা দু'জন করে আমার দু'পাশে সীতরে চল।" বলেই সিটু চিং হয়ে তরমুজটা পেটের ওপর রেখে সীতরে চলে। আর তার দু'পাশে চারজনে চলতে থাকে যেন একখানা মাল বোঝাই সওয়াগরী জাহাজকে পাওয়া দিয়ে নিয়ে চলেছে চারখানা যুদ্ধ-জাহাজ।

সিটুর সীতারের কদরং দেখে চাষী ও নদীরা অবাক ! কূলে পৌছে তারা উল্লাসে হাততালি দেয়।

মদনা বলে, "এ সবাই পারে।"

"তা বটে। কিন্তু আগে কারো মাথার আসেনি।" বলে হরি কাপড় নিংড়ানো জলের ছিটে মদনার গায়ে ছুঁড়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মদনা চার পাঁচ হাত লম্বা একখানা শাল তক্তা বুক নিয়ে চিং সীতার দিয়ে ওপারে যায় এবং তাতেই চড়ে ফিরে আসে। কত লোক দাঁড়িয়ে দেখে আর বাহবা দেয়। সিটু তখন কলকাতায়।

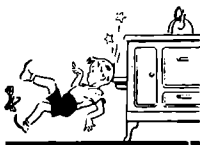
খবরটা শুনে লজ্জায় সিটুর মাথা হেঁট।

এরা ভুল করে

শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্তী

[ভুল থেকেই বিপদ আসে। সাবধানীরা ভুল করে না। চলছে এমন গাড়ীতে তারা উঠা-
নামা করে না। যে পথে গাড়ী-ঘোড়া চলে, সে পথে কখনও তারা ছুটে যায় না।]

১। এই ছেলটি বড়ই ছটকটে। আছাড় ৩। মই থেকে পড়ে গেছেন ইনি। আছাড়
খেয়ে লেগেছে তার মাথায়। ফুলে উঠেছে বেয়ে পা মচকে গিয়েছে। এখন লাগাও মলপটি,
সেখানটা। তখন বরফ খুঁজতে ছুটল আর আনো বরফ!
সবাই।



২। খুঁকীটাও তেমনি বোকা। তাকের
উপর রয়েছে গরম দুধ। সে ভেবেছে, ওতে বৃষ্টি
রয়েছে আচার। বাটিটা ধরে টান দিতেই ঐ

৪। এ ছেলটিও ভুল কয় করেনি।
তাকের উপর রয়েছে বাতের গুঁড়। সে
ভেবেছে সিরাপ, কি মধু! এক ঢোক খেয়েই



গরম দুধটা ছিটকে এসে পড়ল তার গায়ে-মুখে।
তারপর কোথায় কি গুঁড়, তার খোঁজ পড়ে গেল!

বৃষ্টি, তার ভুল হয়েছে। তারপর? তারপর
সবাই লেগে গেল তাকে বমি করাতে।

৫। কুকুরের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করতে যাওয়া ঠিক নয়—ভেড়ে এসে কামড়ে দিলে তখন?



তখন, তোমার দেখতে হবে কুকুরটা বাড়ির হুহু-সবল কুকুর, না বাস্তার ঘেয়ে-কুকুর। বাস্তার ঘেয়ে-কুকুর কামড়ালে আর রক্ষে নেই! তুমি ক্ষতস্থানে গুরুত্বপূর্ণ তৈরি দিতেই হবে, আর তার সঙ্গে দিতে হবে ইন্জেকশন। ঘেয়ে-কুকুর কামড়াবার ইন্জেকশন একটা নয়, বহু। এই ইন্জেকশন না দিলে 'জলাতন' রোগ হয়, মাছের কুকুরের মত খেউ খেউ করে কামড়াতে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে!

৬। কচি ছেলেমেয়ের সামনে ছোট ছোট জিনিস রাখতে নেই। ওরা ত' বোঝে না কিছু!—বা পায় তাই-ই মুখের ভেতর পুরে দেয়। তারপর বিপদ হয় আর পাচজন্মের।



পাচজন্মের মানে, বাড়ির আত্মীয়জন আর অভিভাবকদের। কাজেই ওদের হাতের কাছ থেকে, অর্থাৎ ওদের নাগালের মধ্যে যে-সব জিনিস ওরা গালে পুরতে পারে তা সরিয়ে রাখতে হবে। উপরের ছবিতে যে-সব জিনিস দেখতে পাচ্ছ, ঐরকম একটি জিনিস গালে পোরা মানেই অন্ধা পাওয়া। কাজেই ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করো।

উপলব্ধি : এমনি ভুল করার ব্যাপার অনেক আছে। ছোটরা সাধারণতঃ যে সব ভুল করে বিপদে পড়তে পারে, তার অন্ত্রে ছোটদেরও যেমন সাবধান হওয়া প্রয়োজন, তেমনি বাড়ির বড়দেরও প্রয়োজন তাদের সতর্ক করে দেওয়া এবং সেইসব বিষয় সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া, সাবধান করা। আমরা 'এরা ভুল করে' এই বিভাগে ছবি দিয়ে নানা রকম বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করব মধ্য মধ্য। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে যারা ছবি আঁকতে পারে, তারা ইচ্ছা করলে এই বিভাগের অন্তর্লিখে ও ছবি আঁকে পাঠাতে পারো।—মো. স.

বিধানচন্দ্র

‘সত্যবান’

তুমি তো কেবলি নেতা ছিলেনাকো
ছিলে যে চিকিৎসক ॥

সবার হৃদয়ে তোমার রাজ্য
তাই নিষ্কণ্টক ॥

রুগ্ন এ দেশে তুমি মহাত্মা
জাগায়ে সেবার পরম আরতি
মানুষের মাঝে নিতি দেবতারে
দেখিলে নিষ্পলক ॥

হে চির চিকিৎসক ॥

রোগী জেনে তুমি সব্বারে টেনেছ
অন্তরে হৃদিশাল ॥

নাড়ীজ্ঞানের বলে চিনেছিলে
পাত্রে স্থান কাল ॥

তোমারে হারায়ে তাই সব্বে কাঁদে
প’ড়ে আঁধারের ছরস্তু কাঁদে
আশিব-নাশন শিবরূপে তুমি
ছিলে হে মহা দীপক ॥

হে চির চিকিৎসক ॥



(উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হু-হু করে হাওয়ার মাগটে প্রথমে বোঝা যায় নি। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কাউকে দেখা গেল না। তখন লাউ-এর খোলাটা বার করলে। অনেকটা ছোট ইাড়ির মতন। সেটা চুম্ব দিয়ে সবটা খেয়ে ফেললে। বুকটা বেন জলে গেল। তারপর আবার চিংকার করে উঠলো—বোম্ কালী...

আর বেশি দেরি নয়।

আকাশের তাহায দিকে চেয়ে নিবারণ তখন রাতটা ঠাহর করে মেবার চেঁচা করলে। লগটা ঠিক শুভ। বাঁদুজ্জ মশাই-এর মস্ত্রে এইবার মপ্ করতে বসতে হবে। ভূত-প্রেত-শিশাচ নিদ্র হতে হবে। তারপর হুক হবে আসন পরীক্ষা। তখন ভূত-প্রেতেরা ভয় দেখাতে আসবে নিবারণকে। ও-সব সহ্য করা আছে নিবারণের। নিবারণ ওতে ভয় পায় না। ভয় পেলে আর এত শেখা হতো না। শিশাচ-নিদ্রও হওয়া হতো না।

তারপর আর দেরি না করে মড়াটার ওপর নিবারণ চড়ে বসলো। মাথার দিকে মুখ করে বসলো। তারপর চোখ বুজলো। নিদ্রের মনেই কী বেন সব ময় বলতে লাগলো। চারিদিক নিস্তর। পোড়ো অশ্বিনী কোথাও জন-মানবের পাড়া শব্দ নেই। নিবারণও বেন মড়ার ওপরে বসে কাঁঠ হয়ে আছে।

হঠাৎ চারদিকে বেন খিলখিল হাসির শব্দ হলো।

—কে ?

নিবারণ চোখ খুলে দেখলে মড়াটা হাঁ করে হাসছে। খিলখিল করে হাসছে। দাঁতগুলো

বেহিয়ে গেছে হানতে গিয়ে। অমন হয়। অমন হওয়াই নিয়ম। বে-টুকু মদ ছিল লাউ-এর খোলাতে সেটুকু লব মড়ার মুখের হাঁ-এর মধ্যে ঢেলে দিলে।

বলে—খা খা, পেট ভরে খা, শেষ বারের মত খেয়ে নে—

আর হাসলো না মড়াটা। খেয়ে যেন পেটটা ভরলো। ঢুক ঢুক করে সবটুকু খেয়ে আবার স্থির নিশ্চল প্রাণহীন হয়ে পড়ে বইল। নিবারণ আবার জপ করতে বললো—ও ত্রাধকে জামা, ভীমা, ভগ্নকরা, কদাল-বদনা কালী :...

গরানহাটি গ্রামে তখন রাত নিশ্চুতি। বাইরে দু'একটা প্যাচা ডেকে উঠলো। তারপরেই মনে হলো কে যেন দরজায় ঘা দিলে। ওই বোধহয় ফিরে এল মাছুষটা।

গন্ধামণি উঠে দরজা খুলে দেখে কেউ নেই। বাইরে অন্ধকার ভাঁ ভাঁ করছে। তবে কিসের শব্দ হলো? তবে কি তুল শুনলো নাকি সে! এ-রকম মাঝে মাঝে মনে হয় গন্ধামণির। যে দিনই নিবারণ রাতে বাইরে যায়, সেই দিনই এই রকম মনে হয়। একলা ঘরে শুতে ভয় করে গন্ধামণির। অথচ আগে কত রাত একলা-একলা শুয়ে কাটিয়েছে। তখন এমন ভয় করতো না। কিন্তু থোকা হবার পর থেকেই ভয়টা হয়েছে। গন্ধামণি থোকার মুখের কাছে মুখ নাখিয়ে দেখলে। চাঁদের মতন মুখখানা। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। তবু থোকার মুখে একটা চুমু খেয়ে গন্ধামণি আবার শুয়ে পড়লো।

গন্ধামণি একদিন মিজেন্স করেছিল—থোকার কী নাম রাখবে?

নিবারণ বলেছিল—ওর নাম রাখবে জামাপদ—

বেশ নাম। জামাপদ। ছোট করে ডাকতে গেলে 'জাম' বললেই চলে, নিবারণ বলতো—
আমি জামামার পূজো করি, জামাপদ নামটাই ভালো।

বাহুজ্ঞে মশাই বলেছিলেন—ভালো করেছ নিবারণ, আজকাল কত রকম নতুন নতুন নাম রাখছে লোকে, ওই পুরোন নামই ভালো—বেশ ভালো নাম হয়েছে—

কালো কুচকুচে চেহারা জামাপদর। তেল মাখিয়ে মাখিয়ে গন্ধামণি বেশ শক্ত করে তুলেছিল জামাপদকে।

লোকে বলতো—যেমন বাঁপ তার তেমনি ব্যাটা, ব্যাটাও বাঁপের মতন কালী-ভক্ত হবে।

গয়লা-বউ বলতো—না বাপু, তোমরা অমন আশীর্বাদ কোর না, বলো গংসার-ধন্য করবে, গায়ে-ঘরে থাকবে, গভরে খেটে থাকবে, সেই তো ভালো—

নিবারণের ছেলে হয়েছে, যেন গায়ে লোকেবই আনন্দ। লোকে বলতো—হ্যাঁ পা, আনন্দ

হবে না ? কোথায় শ্রমানে-শশানে ঘুরে বেড়াতে। মাহুখটা, সে যে আবার সংসারী হবে, তা কি কেউ ভেবেছিল।

লোকে আরো বলতো—তুমি কিছু ভেবো না বউ, জামাই কালীপূজা করে-করেই অমন শিবের মত ছেলে পেয়েছে !

নিবারণ কিন্তু বলতো—ও তোমার ছেলে নয় গো, মা-কালীর ছেলে—

গঙ্গামণি বলতো—অমন কথা বোল না, ও আমার ছেলে, আমি কত তপস্বী করে ওকে কোলে পেয়েছি, তা জানো—

যেদিন শ্রমান থেকে মাক-রাত্রে ফিরে আসতো নিবারণ, সেদিন গঙ্গামণি সোজা ঘরে ঢুকতে বিত না। বলতো—তুমি কী-সব মড়া-টুড়া ছুঁয়ে এসেছো আগে গঙ্গামণি ছিটিয়ে দিই তোমার গায়ে—

ঘরের ভেতরে মাটির জালায় গঙ্গামণি তোলা থাকতো। সেই জল ছিটিয়ে দিলে তবে শুদ্ধ হতো নিবারণ। তবে নিবারণ বিছানায় উঠতে পারতো। তারপর গঙ্গামণি ব্রিজেন করতো—হ্যা গো, এই যে মড়া ছুঁয়ে এলে, তাতে তোমার ভয় করে না ?

নিবারণ বলতো—মরণকে ভয় করলে আর ভয়-ভয় থাকে না—

এ-সব কথা বুঝতে পারতো না গঙ্গামণি। কিন্তু ভুলতে ভাল লাগতো। কত ভালো ভালো কথা বলতো নিবারণ। কত সব জ্ঞানের কথা। স্বামীর জ্ঞান-ভক্তি দেখে অবাক হয়ে যেত গঙ্গামণি।

তবু বলতো—কিন্তু এ-সব তুমি খোকাকে শিখিও না—

নিবারণ বলতো—কেন ? এ কি খারাপ জিনিস ? কত লোকের বিপদে-আপদে উপকার করা যায়। যখন হাকিম-কবিরাঞ্জেও হার মানবে, তখন আমি মন্ত্র দিয়ে সব রোগ সারিয়ে দেব—

—কিন্তু তুমি ওই যে ভূত-প্রেত নামাও, ওতে যে অকল্যাণ হয় !

নিবারণ বলতো—আমার অকল্যাণ হবে না। তোমারও হবে না, খোকারও অকল্যাণ হবে না।

নিবারণ মুখে বললেও গঙ্গামণির মন বেন ভুলতো না। গঙ্গামণির মন বলতো, নিবারণ সাধারণ মাহুদ হলেই বেন ভালো হতো। যেমন গাঁয়ের আর পাঁচ জন লোক। হাট-বাজার-মোকান-পাট-চাষ-বাস করে আর অন্য সহয়ে সংসার করে, কিংবা তাস-পান। খেলে।

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে গঙ্গামণির বুদ্ধি একটু উজ্জ্বল হতেন এসেছিল। হঠাৎ আবার কে বেন দরজায় বা মারলে। ধড়মড় করে গঙ্গামণি উঠলো। তারপর দরজা খুলে দিতেই দেখলেন—নিবারণ !

গঙ্গামণি বললে—দাঁড়াও, আগে গায়ে তোমার গঙ্গাচল ছিটিয়ে দিই—

তখনও রাত শেষ হতে অনেকক্ষণ বাকি। পাশেই খোকা ঘুমোচ্ছে। গঙ্গামণি বললে—
কাজ হলো আজ ?

নিবারণ বললে—হলো। আরও একটু বাকি আছে—

—কেমন ? বাকি কেন ?

নিবারণ বললে—সে তুমি বুঝবে না। বড় শক্ত কাজ হাতে নিয়েছি, একেবারে মরণ-বাঁচন
ব্যাপার—

—মরণ-বাঁচন কার গো ?

নিবারণ বললে—বাঁড়ুচ্ছে মশাই-এর আর জীবন চৌধুরীর—

—আর তুমি যে বলেছিলে মুর্শিদাবাদের নবাবের ?

নিবারণ বললে—সে-কাজ তো আছেই। ভাই-এর সঙ্গে লড়াই চলেছে ছোকরার, এদিকে
বুড়ো নবাবের তো কড়া অহুহ। বুড়ো চোখ বুজলে ছোকরাকে কে পাক্তা দেবে ? ওদিকে
স্বতোহুটতে কিরিনীরা আবার কেলা বানিয়েছে—ভবনা কি একটা ! তোমরা মেয়েমানুষ সে-দব
বুঝবে না—

—কিন্তু তুমি একলা মাহুদ, এত ভাবনা মাথায় নিলে কেন ? তোমার নিজের ভাবনা কে
ভাববে ?

নিবারণ বললে—আমার ভাবনা ভগবান ভাববেন, মা-কালী ভাববেন !

—কিন্তু শেষে যদি তোমার একটা বিপদ-আপদ কিছু হয় ?

নিবারণ অন্ধকারের মধ্যেই হেসে উঠলো। বললে—দূর, আমার আবার কী বিপদ হবে ?
জানো আমি পিশাচ-দিক্ মাহুদ।

—পিশাচ-দিক্ মাহুদ মানে ?

নিবারণ বুঝিয়ে দিলে। বললে—পিশাচ-দিক্ মানে আমি ময়ের চোটে ভূত-প্রেত-দৈত্য-দান্য
সবাইকে বাগ মানাতে পারি ! আমি যদি এই বিছানাতে শুয়ে-শুয়েই ব্রহ্মদৈত্যকে ডাকি তো
এখুনি হুড়-হুড় করে এখানে চলে আসবে ?

—ও মা, কী সরোশ !

নিবারণ বললে—এই দেখ না, আজ মশানে মড়ার ওপর বসে মশ্ করতে করতে কতোবার
ভূত-প্রেতরা আমার ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করলে—পেয়েছে ? আমার কিছু করতে পারবে না
ওরা। আমি এতদিন ধরে বনে-জঙ্গলে বসে কি তবে ঘোড়ার বাঁশ কেটেছি ?

গঙ্গামণির কেমন শরীরটা শির-শির করে উঠছিল কণাগুলো শুনে শুনে। বললে আর কী কী শিখেছো ?

নিবারণ বললে—আজ ঘুমোবে না নাকি তুমি ?

গঙ্গামণি বললে—বলো না, তোমার এসব করতে ভয় করে না ?

—ভয় করবে কেন ? ভয় করলেই তো সব ভেঙে যাবে ?

গঙ্গামণি বললে—আমাকে তোমার মস্তুরগুলো শিখিয়ে দাও না গো। তোমার মত আকাশে উড়তে পারবো, জলের ওপর ভাসতে পারবো।

নিবারণ সাবধান করে দিলে। বললে—না না ও-সব পাগলামী করতে নেই। ও-বড় কঠিন সাধনা, সবাই পারে না ও-সব—

গঙ্গামণি বললে—তাহলে তুমি একবার আমাকে করে দেখাও—

—কী দেখাবো ? ঘরের মধ্যে আকাশে উড়বো কী করে ? এখানে জলই বা কোথায় যে তার ওপর ভাসবো !

গঙ্গামণি বললে—তা'হলে একবার তুমি বাঘ হয়ে দেখাও, কেমন দেখায় তোমাকে। ঠিক সত্যিকারের বাঘের মতন দেখাবে ?

নিবারণ বললে—তা সত্যিকারের বাঘ না তো কি মিথ্যে-মিথ্যে বাঘ ?

—গায়ে সেই ডোরা-ডোরা লাগ হবে ? বড় বড় দাঁত হবে ?

নিবারণ বললে—হ্যাঁ—হালুদ করে ঠিক বাঘের মত ভাকবো—

গঙ্গামণি পেড়াপিড়ী করতে লাগলো। বললে—একবার বাঘ হও না গো, আমি কখ-বনো অয়ে বাঘ দেখিনি !

—কিন্তু তুমি আমাকে আজ ঘুমতে ধেবে না ?

গঙ্গামণি বললে—এখন তো তোর হতে দেরি আছে, একবার শুধু বাঘ হচ্ছে আবার তখন মাছ হয়ে যাবে। আমি শুধু একবার বাঘ দেখবো, কখনও দেখিনি বাঘ।

নিবারণ বললে—তুমি দেখছি আচ্ছা বাঘনা ধরলে—দাঁড়াও—

বলে নিবারণ উঠলো, চক্ৰমকি জেলে আলো জ্বালালে। বললে—খুব সাবধান কিন্তু, আমি একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে ময় পড়ে দেব, তুমি সেই জলটা আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেই আমি শুধু বাঘ হয়ে যাবো—

—তারপর ? তারপর কী করে আবার মাছ হয়ে ?

নিবারণ বললে—আর একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে ময় পড়ে দেব, সেই জলটা আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেই আবার মাছ হয়ে যাবে। তুলে যেও না যেন ? দাঁও, ছ'ঘটি জল দাঁও আগে—

লেট গাড়ির ছড়া

(রেলগাড়ি চলার ছন্দে লিখিত)

শ্রীশ্রীধীরচন্দ্র বাগচী

কোন দূর নাগপুর ছেড়ে গাড়ি আটটায় একদিন গেল এক রাত্রি
বাঙ্গালা মাত্রাজী মাড়োয়ারী সিন্ধী ওঠে-নাবে কত শত যাত্রী ।
চাকুলিয়া নাবিয়াই গাড়ি চাই গাড়ি নাই মোট ঘাড়ে এমু তাই শেষটা
লেট তিন ঘণ্টা চঞ্চল মনটা পেটে ক্ষুধা কণ্ঠেতে তেষ্টা ।
পরে দিন দুই যায় ছপুরেতে দুইটায় এমু পুনঃ অমুদের সঙ্গে—
বারোটোর ট্রেন নাকি যেতে বাকি গেহু থাকি দেখিবারে কেবা যায় বঙ্গে ।
ট্রেন এসে যেই থামা অমনি কে ডাকে মামা—জানালায় কেলে দেখি দৃষ্টি
হাসিমুখে মায়া আর সঙ্গেতে বর তার—অমুদের খেতে দেয় মিষ্টি ।
লেট গাড়ি লাট ভারি—কেন বাপু তাড়াতাড়ি,—গল্প না জমাতেই ভাগ্যী
ছাড়বার দরকার—কৈ হল হুঁস তার, হুসু ক'রে ছেড়ে দিল ঝাঁকনি ।
কাজ ছিল ট্রেনটার লেন-দেন এস্তার নাগপুর বাঙলার সঙ্গে
দেখে তাই নিত্য চঞ্চল চিত্ত ট্রেনে উঠে যাবো ছুটে বঙ্গে ।
ট্রেন ফেল হয়ে দেখি আক্কেল নেই একি—ঠিক ঠিক এলো আজ মরতে
খেয়েদেয়ে অল্প করেছিহু গল্প—ট্রেন তাই পারিনি কো ধরতে ।
দুই তিন ঘণ্টার লেট আসা রেট যার, কৌতুক এটা আজ তার কি—
লেট বার ডাল-ভাত—একদিন দৈবাৎ ঠিক এলে ঝড়ট আর কি !

অঙ্ক করো

দুইটি সংখ্যার গুণফল ও ভাগফল জানা আছে । এখন সংখ্যা দুইটি কিরূপে বার করা যায়,
তাই দেখো । উত্তর আছে এই সংখ্যার মধ্যেই খুঁজে বার করো :

কালপেঁচা

শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য

শীতকালের সন্ধ্যা।

কোথাও কোন লাড়া নেই। ত্রি'কি পোকাকুলো কেবল একটানা ডেকে চলেছে তো ডেকেই চলেছে।

ইতুর বুড়ী ঠাকুরমা একটা কাঁধায় দুল তুলছে। বুড়ী হ'লে হবে কি, ইতুর ঠাকুরমা নৃত্যে দিয়ে হুন্দর ক'রে দুল লতা-পাতা তুলতে পারে। ইতুর অর হয়েছে। তাই সে আম আর গড়তে বসে নি। ঠাকুরমার কাছে বসে কাঁধা দেলাই দেখছে। ইচ্ছা আছে—শিববে।

দেলাই করতে করতে ঠাকুরমা মুখ তুলল। কি যেন শুনল। জ্বরশর বলল—বা বা বা, যমের বাড়ী বা। দূর হ, দূর হ, আপন বিদেয় হ' এখন থেকে।

ইতু তো অবাক! কাকে বলছ ঠাকুরা?

ঐ যে শোন না তাই। ঐ মুখপোড়া কালপেঁচাটা।

কালপেঁচা? ইতু কান পেতে শুনল। তাইত বটে, কি যেন একটা ডাকছে—কু: কু: কু:... সে বলল কালপেঁচা ডাকলে কি হয় ঠাকুরা?

বুড়ী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—কালপেঁচা বড় অনুগ্রহে তাই। ওর ডাক শুনে অমরুল হয়। বাড়ীর কারুর না কারুর অস্থ কবে। অনেক সময় আবার মরেও যায়। তাই তাড়াছিনু ওটাকে। তা' হতভাগা কি যাবে?

সত্যিই, বুড়ীর কথা অগ্রাহ্য ক'রেই পাশের বড় গাবগাছটা থেকে ডেকে চলল—কু: কু: কু:...

বুড়ী বলল—ডাকুক গে ও হতচ্ছাড়া। তা' হায়ে ইতু, তোর ছোট কাকা কবে আসবে বলেছে?

ছোটকা? ইতু তড়বড়িয়ে বলে—পরশু রবিবারে ছোটকা আসবে ঠাকুরা। হুগু বনু আর টুলুকেও আনবে বলেছে।

যাক, কত দিন যে ওদের দেখি নি। আর ক'টা দিনই বা থাকব। বাবার আগে দেখে যাব। বলতে বলতেই ইতুর ঠাকুরমা দুল তোলো কাঁধায়।

শুধু ইতুর ছোটকাকাই নয়। মেজকাকা, সেজকাকা আর ছোট পিনীয়া ও বড় পিনীয়া সবাই এসে হাজির হ'ল। ইতুর ঠাকুরমার অস্থ। ইতুর ছোটকাকা আসার ক'দিন পরেই বুড়ীর হ'ল নিউমোনিয়া।

বুড়ী বলত—আমার বয়স পেঁচায় চার কুড়ি হ'তে চলল।

তা' অত বয়সে নিউমোনিয়া হ'লে কি আর বাঁচে কেউ ?

কিন্তু আশ্চর্য! বুড়ী বেঁচে গেল। কিন্তু বিপদ এল অল্প দিক দিয়ে।

বুড়ীর কটনি অস্থখে ইতুর সামান্য জরের কথা সবাই ভুলে গেল। বুড়ী ভাল হ'ল। কিন্তু ইতুর হ'ল প্রবল জ্বর।

জরের ঘোরে কেবলই বলে—যা যা যা। দূর হ', দূর হ'।

ইতুর বাবা অবাক হন। বলেন—এই ইতু, কি তাড়াছিন? কে দূর হবে? ইতু চুপ ক'রে যায়। কিছু বলে না।

একটু পরেই আবাব বলে—যা' যা' হতছাড়া, কি অলুঙ্গুণে কাওরে বাবা। ও ঠাক্মা, কালপেঁচাটা তাড়িয়ে দাও না।

ঠাকুরমার দেহ এখনও সারে মি ভাল ক'রে। তবুও বুড়ী ওঠে। আন্তে আন্তে গিয়ে ইতুর মাথার কাছে বলে। ওর ঝাঁকড়া কনু চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে—এই যে দিদি, দিচ্ছি উড়িয়ে। ওরে রামা, পেঁচাটা উড়িয়ে দেও।

একটু পরে চলে—এ তো এ যে পেঁচাটা উড়ে গেছে। তুমি চুপটি ক'রে শুয়ে থাক লম্বীটি।

লম্বী কিন্তু শোয় না। কেবল উঠতে চায়। আর বলে—এ যে ঠাক্মা, দাওনা উড়িয়ে। ও ঠাক্মা...

বাস্তব হয়ে ওঠে বাড়ীর লোক। কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনতে লোক যায়। কিন্তু ডাক্তার বাড়ী পৌঁছবার আগেই ইতু সকলকে ছেড়ে চলে যায়। মৃত্যুর আগেও এ এক কথা—ও ঠাক্মা, তাড়িয়ে দাও এ অলুঙ্গুণে পেঁচাকে। ও ঠাক্মা...

সবাই চলে গেছে। কাকারা বাইরে চাকরী করেন। শিশীমারাও গেছেন। বাড়ী এখন খালি। ইতুর মা কেবল ইতুর ওস্ত মাঝে মাঝে কাঁদেন। বুড়ীর কিন্তু কান্না নেই।

আবার সে সেই কাঁথাটা নিয়ে বসে। মন দিয়ে সেলাই ক'রে। ওকি! বুড়ীর কানে আসে একটানা শব্দ কু: কু: কু:...

এবার কিন্তু বুড়ী আর তাড়ায় না তাকে। বলে—আঃ, প্রাণ ভ'রে ডাক রে পেঁচা। ডাক কুই, কেবল ডাক। এবার যদি আমি বাই তোর ডাক শুনে। সেই ছোট্ট মেয়েটাকে নিতে তোর প্রাণে বাঞ্চল না? ডাক রে ভুই ডাক। আমায় ডেকে নে...

বুড়ীর পিছনে এসে গাড়ায় ইতুর মা। তার ছ'চোখ জলে টলটল ক'রে।

দাড়িয়ে দারুলিপি

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তিমিরিল তো হতভম্ব ! পানের ঘরে যে মুগুর বারবেলগুলি দেখে এসেছে সেগুলি তা'হলে খোকার বেলনা ! গলার স্বর আর এক ধাপ নামিয়ে বললে, “রাজারশাই সেলেন কোথায় ?”

খড়খা বললেন, “তিনি শিকারে বেরিয়েছেন সাতশ' সাতশ' পাইক নিয়ে। তিনি বাড়ী নেই, তাই তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছ। অন্যরমহলে উটকো পুরুষ ঢুকেছে দেখলে এক ঝাঞ্জড়ে তোমাকে এতক্ষণ সত্তর হাত মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন।” তিমিরিল বললে, “কর্তা বাড়ী নেই তো জগকম্প রাজাছিন্ন কে ?” খড়খা বললেন, “ও হরি, তুমি বুঝি ওটা জগকম্প মনে করছ ? ওটা তো নৌকার স্ক্রুস্ক্রু, এখনি খেলা করতে করতে ছুঁড়ে ফেলেছে দরজার বাইরে।

সর্বনাশ ! এ কোথায় এসেছে তিমিরিল ! তবু সন্দেহ যায় না, আঁতে আঁতে খাটের পাশে এসে কন করে টান দিয়েছে পায়ের দিকে লেপটাকে, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা সবে গিয়ে এরও ঝড়ের হুঁজোড়া পা পাশাপাশি বেরিয়ে পড়েছে। এরও শুয়েছিল চিং হ'য়ে আর ঘেরও শুয়েছিল উপুড় হয়ে। উন্টোপান্টা চারখানা পা দেখে তিমিরিল বললে, “আমার সঙ্গে জোচ্ছুরি ?” হুঁজোড়া পা কেন ?”

খড়খা বললেন, “তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি ! এইটুকু ছেলের কি বাপের মত চার-জোড়া পা, চারজোড়া হাত, আর হুঁজোড়া মাথা হবে নাকি ? এখন তো আর ওর স্বর্গে কি পাতালে বাবার দরকার হয় না, কেবল সামনে ইটবার জন্তে হুঁখানা আর পিছনে ইটবার জন্তে হুঁখানা পা গজিয়েছে সবে। বয়স হোক, আরও গজাবে !”

তিমিরিলের ভক্তি বাড়ছে। বিনীত ভাবে প্রশ্ন করলে, “রাজারশাই কিরকম লগা ? দেড়শ' হাত হবেন বোধ হয় !”

খড়খা মুখ কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগলেন, হাসি বামলে বললেন, “তুমি হাসালে, বাছা !”

তিমিরিল অধৈর্য হয়ে বললেন, “বলুন না তবু, কত লগা হবেন আন্ডাজ ?”

খড়খা এবার ঝাঁজিয়ে উঠলেন, “আমি কি মাগতে গেছি ? মরবার সাধ থাকে তো আর একটু অপেক্ষা করো না, দেখতেই পাবে। পিছন দিকের মহলের ছাদটা মাথায় ঠেকে বলে সম্ভ্রান্তি সম্ভ্রান্তবতে খবর দিয়েছেন। আর একশ' হাত উচু কথাবেন সন্দেহি। তা'হলেট বস্ত্র নাও।”

তিমিঙ্গিলের তখন সন্নিহিত অবস্থা। সাতশ' হাত উঁচু ছাশ ঘাং মাথায় ঠেকে, ছিছানলই হাত লম্বা খোকা ঘাং চুমিকাটি ব'লে লেহার বারবেল ছুড়ে তার মতো দৈত্যকে মেয়ে ফেলতে পারে, ঘাং খোকার কুমুমির চগকম্পের মত আওয়াজ পাঁচ ফোঁপ দূর থেকে কানে তালি ধরিয়ে দেয়, সে বে কত বড়ো জোহান তা আর বুঝতে বাঁকী রইল না তার। খড়খাততকবে আবার খাটে গোলা দিতে আরম্ভ করেছেন আর হর করে গান ধরেছেন—

“ঘুমো, খোকা, ঘুমো রে। বোকার মরণ শুমো রে;
আপনি বেছে ধরা সে, এখন মরে তরাসে।
এবার ঘরে দেব খিল। ভেগে খাবি তিমিঙ্গিল।”

তিমিঙ্গিল কাদো কাদো হ'য়ে বললে, “রাণী মা।”

খড়খার সে দিকে যেন কানই নেই। তিনি দোলা ছলিয়ে গান গেয়ে চলেছেন—

“মা, খোকা, ঘুম যা। তিমিঙ্গিলের ডেলা গা।
চবি নেব গালিয়া; মাংসে হবে কালিয়া;
মুড়োর হবে ঘট খামা, খেয়ে খোকার মিটবে আশা।”

গান শুনে তিমিঙ্গিলের হৃদকম্প আরম্ভ হয়েছে। আঙে আঙে আবার ডাক দিলে, “রাণী মা, শুনেছেন?” “শুনাচ্ছি পাঁজাও। কই রে ন্যাদাশা, তোর জল ছুটল?” দৈত্যের হর বললেছে সেখে বুড়ুমা মনে মনে হেসে বললেন, “কিছু বলছিলে?”

তিমিঙ্গিল হাত জোড় করে বললে, “আমাকে এবারটি মাক করতে হবে। আপনাদের বাড়ীতে না ব'লে ঢোকা আমার বুই অন্যায় হয়ে গেছে। আর দৈত্যরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে চেয়ে বড়ই বেয়াসবী করে ফেলেছি আমি। আপনি না বাঁচালে আমার আর রক্ষা নেই। আপনি আমার ধর্মের মা, আমায় প্রাণভিক্ষা দিন।”

দু'গুণ উঁচু দৈত্যটা হাঁটু গেড়ে ব'সে পায়ে ধরতে যায় দেখে খড়খার দম্মা হ'ল, হাসি চেপে বললেন, “আহা কয়ো কি, কয়ো কি? তুমি ছেলেমানুষ, না বুকে দোষ করে ফেলেছ। আমি বুঝিয়ে ব'লব এখন, দৈত্যরাজ কমা করবেন। তবে ছেলেটা মনে বড় কষ্ট পাবে। তা হোক, তুমি এখন মা বলেছ তখন তোমাকে বাঁচাতে হবেই। তা যাও এখন, রোজকার খামনাটা পাঠিয়ে দিও মনে করে। আহা, খোকার মুখের গ্রামটি কষ্টে গেল।

তিমিঙ্গিলের বুকের গড়কডানিটা কমল খড়খার কথায়। কিন্তু খামনার কথায় আবার ছুঁশ্বাস পড়ল সে। মাথা চুলকে বললে, “খামনাটা যে বড় বেণী ধরেছেন। রোজ অতগুলো জন্ত আমি নিজেই পাই না, রাজার খামনা দেব কোথা থেকে?”

খড়কা বললেন, “তা আমি জানি না বাছা। পুরুষদের ধেনা-পাওয়ার কথাই আমি নেই। সে তা’হলে তুমি রাজারশাইয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ো।”

তিমিহিল পায়ে ধরে বললে, “আমি আপনার দস্তান, আপনি না রাখলে এই শোহার মুণ্ডর নিয়েই মাথার ঘেরে আপনার সামনেই আমি আগুত্বন্ত্য হ’ব।”

খড়কা বললেন, “আহা কবো কি, ধামো ধামো। তুমি আমার বড় ভাবনার ফেললে দেখছি।” তারপর ধানিক্ষণ ভেবে বললেন, “তবে একটা বৃদ্ধি দিই শোনো। তুমি এ বেশ ছেড়ে পালাও। তুমি যে এ বাড়ীতে এসেছিলে সে কথা আমি কাউকে বলব না। শিকারী হয়ে বখন শিকারই পাছ না ভালোরকর, তখন কি করতে লাখি-খাঁটা খেয়ে প’ড়ে থাকবে এখানে? যেমন তিমি মাছের পিঠে চড়ে ভেসে এসেছে, তেমনি তিমি মাছের পিঠে চড়ে রাত না শোহাতে রওনা দাও। সমুদ্রের ধারে ধারে কত বীণ কত নেশ পড়ে আছে। বউ নেই, ছেলে নেই, কিসের হুখে রাজার খাজনা গুণবে তুমি?” তারপর চারদিক চেয়ে চুপি চুপি বললেন, “কিন্তু খবরদার আমি তোমাকে এ পরামর্শ দিয়েছি, তা যেন আমার বামীর কানে না যায়। রাত শোহালে তিনি পাইক পাঠাবেন তোমাকে ধরে আনতে, তাহা যেন তোমার সেবা না পায়।”

তিমিহিল যেন অন্ধকারে পথ দেখতে গেল। সন্ধ্যাে প্রশংস করে সে খড়কার পায়ে ধুলো মিলে মাথার ঠেকিয়ে বললে, “আগনি আমার বাঁচালেন, মা। বা বলছেন ঠিক, এ বেশ ছেড়ে যাওয়াই ভালো আমার পক্ষে। কোন দিন কি দোব-ঘাট হবে, খাজনা বাকী পড়বে, তখন রাজার কোপে জীবন বাবে। তার চেয়ে এই বেলা সরে পড়ি। আজ রাতেই রওনা দেব আমি। একটা বড়ো তিমি মাছকে ক’দিন হ’ল জলের ধারে দড়ি বেঁধে জ্বিয়ে রেখেছি অকালে খাব ব’লে, সেইটেকেই কাজে লাগাব। আচ্ছা মা, আজ্ঞা করুন এখন বিদায় হই।”

আর একবার খড়কার পায়ে ধুলো মাথার নিয়ে তিমিহিল চোবের মতো ভয়ে ভয়ে এমিক ওমিক চাইতে চাইতে বেরিয়ে পড়ল। খড়কা আশীর্বাদ করে বললেন, “এস বাবা, এস। তা সুভালাভালে পৌছে একখানা পত্র দিয়ো। আর দেশডাই কারো সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলে ব’লে দিয়ো, এ রাজ্যে যেন শিকার খুজতে না আসে। রাজারশাই তুমি পালিয়েছ শুনে কেপে ধাক্কা একেবারে, হয়তো দাতন’দেপাই মাত দিকে পাঠাবেন তোমাকে ধরতে। ছেলেটাও বড় কাঁপবে তোমার মাংসের বড়া খেতে পেল না ব’লে। তা কি আর করা বাবে বলো, মা ব’লে ফেলেছ বখন, তখন মায়ের কাজ তো করতে হবে? ছেলের মাংস কি ছেলেকে খাওয়ানো যায়? —আচ্ছা বাবা, বেরিয়ে পড়ো। দুর্গা, দুর্গা।”

দৈত্য যে কত পত্র দেবে তা খড়কা জানতেন, আর দেশডাইদের বিপদের জ্ঞত তার কত

মথাবাধা তা তোমরা বুঝতেই পারছ। তাদের না হোক, নিজেদের বিপদ এড়াবার ব্যবস্থা তো হ'ল।

ডিমিসিল পা টিপে টিপে অর্থাৎ ধূপ-ধাপ শব্দে বাড়ী না কাঁপিয়ে হাতীটির মত ধূপ ধূপ করে বেরিয়ে গেল। তার শাব্যের শব্দ শব্দ দরজার বাইরে যেতেই সোনার দোলার লেপ কাঁথা ঠলে তিন মূর্তি উঠে বদল হাঁক ছেড়ে। দাড়িষ বললেন, “তোমার আর কি বলব, রাণী, আজ তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। ধন্য তোমার বুদ্ধি।”

এরও বললে, “যেই আমার চরণে হস্তান্তর করেছেন, আমি আমার আত্মারাম শিওরাবদ্ধ হয়েছেন। তাবলুম, বিলে বৃষ্টি দুই আছাড়ে ভবলীলা অদমাগু করে। বুদ্ধি বটে আপনার রাণী মা, বলিহারি বাই। শার্খক ব্রহ্মরত্ন শিক্ষা আপনার।” খড়কা হেসে বললেন, “তুই থাম তো বাছা।”

দাড়িষ বললেন, “শব চেষ্টে বুদ্ধির কাজ করেছ বাটাকে দেশ ছাড়া করে দিহে। এখানে থাকলে একদিন-না-একদিন এই চালাকি ধরা পড়ত, তখন আর রক্ষা থাকত না। যাক বাবা, খাজনার আর কাজ নেই, বিসর্জনের বাসনা বাজিয়েছিল আর একটু হলোই। বৃকের কাপুনি থামেনি এখনও। গুরে ঘেরও, এরও, দু'খানা গামছা নিয়ে এসে একটু মুছিয়ে দেনা বাবা রা, ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি। —গিটী, আজ আর বাইরে বেরোচ্ছি না, তুমি শনরে খিল দিহে ফলারের ব্যবস্থা করো।”*

* আইরিশ উপকথার ছাত্র অবলম্বনে।

একটি আজগুবি কবিতা

শ্রীবরুণ বিশ্বাস

হল্লে সবুজ ওরাংওটাং।
গড়ের মাঠে চি-চিংপটাং ॥
মাঠের ধারে সবুজ ঘাসে।
বসছে মাছি তাদের পাশে ॥
রঙীন আলো সারি সারি।
হরেক মানুষ; হাজার গাড়ি ॥
ডাবডুডে তার চোখটা মেলে।
তাকিয়ে থাকে ল্যাংটা ছেলে ॥

ছুটেছে যত ধোপার গাধা।
পিঠে তাদের কাপড় বাঁধা ॥
ভিড় যে কিসের; কেই-বা জানে।
ট্রাক্সিক পুলিশ কেই-বা মানে ॥
পথটা বেকে এখার-ওখার।
ভূগোলটাকে করছে কাবার ॥
ওরাংওটাং শুয়েই থাকে।
স্ট্যাচু'র ওপর পাটা রাখে ॥

জাহ্নবী

শ্রীবন্দনা চট্টোপাধ্যায়

আজ একটা ভারী চমৎকার গল্প বলব। গল্পটা হ'ল পৌরাণিক যুগের। এখন যিনি আমাদের কাছে 'মা গঙ্গা' নামে পরিচিত, এ গল্পটা হ'ল তাঁরই সখা।

সকলেরই হয়তো জানা আছে, গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী। এই জাহ্নবীকেই আবার বলা হয় ভাগীরথী। কিন্তু গঙ্গার এই নামগুলি যে কেমন করে হ'ল তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। সাধারণতঃ সকলেরই ভাল নামের সঙ্গে একটা করে ডাকনাম থাকে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভাল নাম রাখার চাইতে ডাকনাম রাখার পিছনে একটা কারণ থাকে। ঠিক তেমনিই গঙ্গার জাহ্নবী ও ভাগীরথী নামের একটা কারণ ছিল। মেইটাই আজ বলব।

৫

বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে বাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই রাণী। দুই রাণীর মধ্যে এক রাণীর নাম যাদবী। একবার একটি যুদ্ধে বাহু শত্রুর হস্তে পরাজিত হন। শত্রু কর্তৃক রাজ্য হারিয়ে তিনি তাঁর দুই মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয় পর্বতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময় রাজার এক মহিষী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। অতঃপরে দুঃখকষ্টের মধ্যেও রাজার মন তাই ছিল প্রেমময়। কিন্তু রাজার কপালে বোধহয় স্বখ লেখা ছিল না। তাই সন্তানজন্মিষ্ট হবার কিছুদিন পূর্বেই রাজা পরলোক গমন করলেন। রাজার বিতীয়া মহিষী কিন্তু যাদবীর এই সৌভাগ্যকে অত্যন্ত হিংসা করতেন। কিন্তু রাজা বেঁচে থাকতে তিনি যাদবীর কিছুই অনিষ্ট করতে সাহস করেন নি। মনে মনে তাই তিনি যাদবীর প্রতি হিংসার জলে-পুড়ে মরতেন। কিন্তু রাজার অকালমৃত্যু তাঁকে সুযোগ এনে দিল। রাজার মৃত্যুর পর একদিন তিনি সুযোগ বুঝে যাদবীর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলেন। ভগবানের রূপায় ও যাদবীর ভাগ্যের জোরে কোন অনিষ্টই তার হয়নি। এই ব্যাপারের পর যাদবী ঔর্বশূন্যের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেই বধাদময়ে তিনি একটি শিশুসন্তান প্রসব করেন। এই বালকটিই পরবর্তীতে ক্ষুদ্র হস্তার নগর নামে খ্যাত হন।

সেই ঔর্বশূন্যের আশ্রমেই নগর লালিত-পালিত হন। বড় হয়ে নগর শত্রুর কবল থেকে তাঁর শিশুরাজ্য উদ্ধার করে অত্যন্ত সুমিষ্টে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে থাকেন। নগরের দুই মহিষী ছিলেন; একজনের নাম শৈব্যা ও অপরজনের নাম বৈদভী। শৈব্যার গর্ভে

এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং বৈদ্যটী একটি মাংসপিণ্ড প্রদান করেন। সেই মাংসপিণ্ড থেকেই বাটী সহস্র পুত্রের জন্ম হয়।

মহারাজ নগর নিরানন্সইটি অশমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। তাই তিনি একবার শতসংখ্য পুত্র করবার অভিপ্রায়ে আরও একটি অশমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

নগরকে এইরূপ যজ্ঞ করতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হ'ল। তিনি মনে করলেন, নগর যদি একশ'বার অশমেধ যজ্ঞ করেন তা'হলে তিনি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠবেন যে, তাঁর কবল থেকে স্বর্গরাজ্য রক্ষা করা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠবে। অতএব নগর যাতে আর অশমেধ যজ্ঞ করতে না পারেন, ইন্দ্র মনে মনে তারই একটা উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অনেক চিন্তার পর ইন্দ্র যজ্ঞের অর্থ অশংস্রণ করাই স্থির করলেন। একদিন তাই সকলের অজ্ঞাতদ্বারে ইন্দ্র এসে অশকে নিয়ে উদ্ভাও হলেন। অশটিকে কোথায় লুকাবেন ভেবে না পেয়ে পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে ইন্দ্র তাকে রেখে দিলেন। কপিলমুনি সেই সময় কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন; তাই তিনি এই ব্যাপারের বিদ্বুবিদগ্ধও জানতে পারলেন না।

এনিকে রাজ্যময় হনুতুল কাণ্ড। সকলেরই মুখে এক কথা 'যজ্ঞের অশকে পাওয়া যাচ্ছে না।' চতুর্দিকে খোঁজ খোঁজ বস পড়ে গেল। পাইক পেয়াদা লোকলম্বর রাজার হুকুম পেয়ে চারিদিকে অশ অন্বেষণ বেরিয়ে পড়ল। রাজার বাটী সহস্র পুত্রও অশ অন্বেষণে বাহির হলেন। নানাদেশে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তাঁরা পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। কপিলমুনির আশ্রমে অশকে বন্ধ থাকতে দেখে মুনিকে চোর বিবেচনা করে তাঁরা মূনির উদ্দেশে অস্ত্র কট্টবাক্য প্রয়োগ করলেন এবং মুনিকে দণ্ডমান করতে উত্তত হলেন। একেই তাঁদের চীৎকারে মূনির ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল তাঁর উপর তাঁদের দণ্ডাধানে উদ্ভ্যত হতে দেখে ক্রোধে মূনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। অত্যধিক ক্রোধের বশে অভিশাপ দিয়ে মূনি সেই বাটী সহস্র পুত্রকে ভস্মীভূত করে ফেললেন। বহাদিন পরে নগরের গোত্র অংশুমান পাতালে গিয়ে মুনিকে তুষ্ট করে অশ কিরিয়ে আনলে নগরের অশমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

নগরের গোত্র এই যে অংশুমান এ'রই বিখ্যাত বংশধরের নাম ছিল তাগীরথ। ইনি তাঁর পিতা ও পিতামহের কাছে সমস্ত কথা শুনে তাঁর পূর্বপুরুষ সেই বাটী সহস্র নগরপুত্রের উদ্ধারসাধন করবেন বলে স্থির করলেন। কপিলমুনি অংশুমানকে বলেছিলেন যে, স্বর্গ থেকে যদি কেউ গন্ধার জল এনে ভস্মীভূত এই বাটীসহস্র নগরপুত্রের উপর ছড়িয়ে দিতে পারে, তবেই এদের পুনর্জন্ম সম্ভব হবে, নতুবা নয়। অংশুমান এ কথা তাঁর বংশধরকে বলে দান, তিনি আবার তাঁর পুত্রকে বলেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে কথাটা সকলেরই কর্ণগোচর হয়। কিন্তু উপায় জানা থাকলেও

তখনও পৰ্বত কেউ তাঁকে কার্বে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি। তাই ভগীরথ স্থির করলেন যে, স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে তিনিই তাঁর পূর্বপুরুষদের শাপমুক্ত করবেন। এই স্থির করে ভগীরথ স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

তখন পৃথিবীতে গঙ্গা ছিলেন না। স্বর্গেই ছিল তাঁর স্থান। স্বর্গে তাঁর নাম ছিল সন্ধ্যাকিনী। এখনও রাত্রিবেলা, তারাগুলো এক একে জলে উঠলে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলেই নানা ধোঁয়ার মত একটা নানা রেখা দেখতে পাওয়া যায়। তাকেই সকলে বলে আকাশগঙ্গা।

স্বর্গে নিয়ে ভগীরথ গঙ্গার স্তবগান করতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে বহু স্তবস্তুতি করবার পর গঙ্গা ভগীরথের উপর সন্তুষ্ট হয়ে মর্ত্যে আসতে সম্মত হলেন। মর্ত্যে যাবার পূর্বে একদিন গঙ্গা ভগীরথকে ডেকে বললেন, “বৎস, মর্ত্যে আমি যেতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর বেঝানে গিয়ে আমি প্রথমে পড়ব দেখানকার মাটি ধাবে রসাতলে। ফলে, বহু লোকের গ্রাণহানি হবে, বহু নগরী ধ্বংস হবে। বাটসমস্ত নগরপুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে শেষে আরও বেশী লোকের ক্ষতি হবে। তাই আমাকে নিয়ে যাবার পূর্বে ভাল করে একবার ভেবে দেখ।” গঙ্গার কথা শুনে ভগীরথ বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে বহুচিন্তার পর তিনি মহাসেবের শরণাপন্ন হলেন। সকলেরই হয়ত জানা আছে যে, দেবতাদের মধ্যে শিব হলেন সবচেয়ে ভালমাস্ত্র দেবতা। শিবকে তাই সহজেই সন্তুষ্ট করতে পারা যায়। ভগীরথও ভাবের দ্বারা ভুট করে শিবকে গঙ্গার কথা জ্ঞানালেন। সমস্ত কথা শুনে শিব বললেন, “বেশ, গঙ্গাকে আমি আমার জটীর মধ্যে ধারণ করব। শিবের কথা শুনে অতিশয় আনন্দিত মনে গঙ্গাকে গিয়ে সকল কথা জ্ঞানালেন ভগীরথ। তখন গঙ্গা তাঁর একধারা সন্ধ্যাকিনীকে স্বর্গে রেখে সবেগে কৈলাস পর্বতে উপবিষ্ট শিবের জটীর মধ্যে এসে পড়লেন। শিবের জটা থেকে গঙ্গার ফেনা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিছুদিন গত হবার পর ভগীরথের কথায় শিব দত্তপর্ণে গঙ্গাকে নিজের জটা থেকে মুক্তি দিলেন। গঙ্গা ছলছল, কলকল শব্দ করতে করতে পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাপের মত এঁকোঁকো চলতে লাগলেন, ভগীরথও তাঁর আগে আগে শঙ্খধ্বনি করে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

কৈলাস পর্বতের পরেই হ'ল হিমালয়। ঐ হিমালয় পর্বতের গা ঘেঁষে গঙ্গা যখন ভগীরথের অহুসরণ করে চলেছিলেন, সেই সময়ে ঘটল একটা মজার ঘটনা। হিমালয়ের পাশদেশেই ছিল জহ্মুনির আশ্রম। এই জহ্মু এক সময়ে বড়ই তপঃপরায়ণ রাজা ছিলেন, কিন্তু পরে কোনও কারণবশতঃ তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বনে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। বনে বাসকালে ইনি সবসময় বাগ-বজ্র প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। গঙ্গা যখন হিমালয়ের পাশ ঘেঁষে ভগীরথের সঙ্গে

সঙ্গে চলছিলেন তখনও তিনি একটি খজের আয়োজনে বাস্তব ছিলেন। এমন সময় গঙ্গা এসে তাঁর সমস্ত খজের জিনিসপত্রর ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। গঙ্গার এইরূপ কাজে অহু উঠলেন ভীষণ চটে। রাগে তখন তাঁর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তিনি তখনই তপোবলের দ্বারা এক গজুবে সমস্ত গঙ্গাকে পান্ন করে ফেললেন। ভগীরথ দেখলেন, সমুদ্রে মহাবিশপ উপস্থিত; তখন তিনি ভরু স্বপ্নান করতে আরম্ভ করলেন। ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে অহু গঙ্গাকে ছেড়ে দিতে সন্মত হলেন। কিন্তু গঙ্গার মত পবিত্র দেবীকে কোন্ পথে বাহির করা যায়, এই নিয়ে মহাসমস্যা উপস্থিত হ'ল। অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর, অহু নিজের স্নান বিদীর্ণ করে, সেই পথ দিয়ে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। ভগীরথ তখন পুনরায় তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবশেষে গঙ্গাবাহানে পৌছে ভগীরথ গঙ্গার পবিত্র জল ছড়িয়ে কশিগমুনির শাপে ভস্মীভূত তাঁর বাটসহস্র পূর্বপুরুষের উদ্ধারসাধন করেন।

অহু মুনির আহুসেপ থেকে বাহির হয়েছিলেন বলে গঙ্গার এক নাম হয় জাহ্নবী এবং ভগীরথ এনেছিলেন বলে গঙ্গার আরও এক নাম হয় ভাগীরথী।

তিনটি ছবি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিনটি বেড়াল ছানার ছবি
ক্যালেন্ডারের পাতায়,
তাই-না দেখে খুকুমণি
আঁকছে ছবি খাতায়।

বলছে খুকু, “বেড়াল ছানা
যতই নিখুঁত হও,
কিন্তু তবু তোমরা আমার
পুষ্টির মতো নও।”

এমনি সময় খুকুর কাছে
দৌড়ে এল ‘পুষ্টি’,
‘ম্যাও’ ডাকটি শুনে খুকু
বড্ড হ’ল খুশী ॥

বিবেকানন্দ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

আপনি ঈশ্বর দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখেছি—তোমাকেও দেখতে পারি—যেমন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ—ঠিক এমনভাবে।

বিশ্বের অতিক্রান্ত হয়ে পড়ল যুবক। এতদিন পরে সন্ধ্যার অবসান হোল। তা'হলে ঈশ্বরকে দেখতে পাব। এমন একজন আছেন—বিনি ঈশ্বরকে দেখতে পারেন। আমার একদিন দক্ষিণেবরে এসেছে সেই তরুণ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে—বলছে—মনাই, আমাদের বড় অভাব—বড় কষ্ট! আপনার সঙ্গে তঁরা ভবভাবিত্রী কথা বলেন—বলুন না আপনার হাতে—হাতে আমাদের দুঃখ কষ্ট বার! মা-ভাই-বোন—হাতে একটু সুখে-খুসুখী থাকতে পার।

তুই বা মায়ের কাছে—তুই গিয়ে বললেই হবে—বললেন ঠাকুর।

আমি গেলেই হবে ?

হ্যাঁ!

আমার কথা মা শুনবেন ?

হ্যাঁ!

গেল যুবক ভবভাবিত্রীর হস্তি—করদোড়ে—মাথা নত করে চাইল—মা আমার শুদ্ধা ভক্তি হাও—আমার জ্ঞান হাও—আমার বিবেক-বৈরাগ্য হাও।

ফিরে আসতে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে বললি মাকে ? হ্যাঁ! কিন্তু বলতে পারলুম না—আমাদের সন্ধ্যার দুঃখ কষ্টের কথা। আমি শুদ্ধা-ভক্তি চাইলুম—জ্ঞান চাইলুম—বিবেক-বৈরাগ্য চাইলুম।

তুই আমার বা—বললেন ঠাকুর।

যুবক আমার গিয়ে দেই এক প্রার্থনাই করল। ফিরে এসে ঠাকুরের কাছে—বললে—চাইতে পারলুম না মায়ের কাছে অস্ত্র কিছু।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বললেন—আজ্ঞা বা, তুই এখন এতই আমার ওপর নির্ভর করছিল—শোন, তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না। আমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবই—তার জীবনের অস্তিম সময়ে তাঁকে বললেন—শোন, আজ তোকে সর্বদা দিয়ে ফড়র হয়ে গেলুম—আজ থেকে তুই

আমি এক—কোন ভেদ নেই—অভেদ। তুইও যা—আমিও তা। কেঁদে ফেললেন ঠাকুর—সর্বস্ব দিয়ে কতক হয়ে। মনের ক্ষুদ্র নয়—আনন্দে। দেওয়ার আনন্দে। উপযুক্ত আধারে সর্বস্ব দিয়ে—পরম নিশ্চিত হওয়ার আনন্দে। পরম পরিতৃপ্তি ঠাকুরের—তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা আশ্রয়। কে এই যুবক? কে এই ভাগ্যবান? ইনি—বিশ্বজয়ী-সম্যাদী স্বামী বিবেকানন্দ। সংসারপ্রবেশের নাম—বীরেশ্বর, নরেন্দ্রনাথ। কলিকাতা সিমুলিয়া দত্ত পরিবারে তাঁর পুত্র। আবির্ভাব—১৮৬৩ সালের ১২ই জাহ্নবী।

মা ভুবনেশ্বরীর পরম আরাধনার সন্ধান—বীরেশ্বরের নিকট প্রার্থনালব্ধ এই পুত্র। শিশু আশে জন্ম—তাই ত নাম বীরেশ্বর। বাপ মা আদর করে ডাকতেন—‘বিলে’ বলে। শৈশবে দুঃস্বপ্ন—চঞ্চল। কৈশোরে—দুর্দান্ত—কিন্তু সরল—মায়ের বড় আদরের। ছাত্র জীবনে—আরো নিতীক আরো তেজোরীশ। ছাত্রনিষ্ঠ—ভক্তিক। বিচার না করে—বাচাই না করে—কোন কিছুকে মেনে নেননি। তাই ত—সর্বত্রই নেতা—নরেন্দ্রনাথ। মানবশ্রেষ্ঠ—নরেন্দ্রনাথ।

পিতা বিশ্বনাথ দত্তের প্রণের জবাব দিয়েছিলেন শৈশবে—‘আমি বড় হয়ে কোচোয়ান হব।’ উত্তর অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল—তার জীবনে। অঙ্ককাতারাজ্যে মাহুবেশ পথ-নির্দেশক হয়ে, তারের সওয়ারী করে—জ্ঞানের পথে—আলোর পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। চেতনার চাবুক ঘেয়ে অনগ্রসরতার—কর্তব্য বিমুগ্ধতার—বার্ষপরতার—ঘোড়াগুলোকে সচেতন করে তুলেছিলেন—অভয়, স্রীষ্য নাশ করেছিলেন।

ধাকতে পারেন নি সংসারে। ত্যাগ করলেন—সংসার। বেরিয়ে পড়লেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে—এক মহান আত্মার আকর্ষণে। চিরদিনের জন্য মুক্ত হলেন—বন্ধন থেকে। চরম আত্মসমর্পণ করলেন—পরমহংসদেহের সীচরণকমলে। পরম তৃপ্তি পেলেন—গুরুপাদ-পদ্মে—এই আত্মনিবেশনে।

শুক করলেন কঠিন সাধনা। গুরুভায়েরের দিয়ে গড়ে তুললেন—ঐরায়কৃষ্ণ সংঘ। আরম্ভ করলেন—কঠোর তপস্বী। উপবাসে—অর্ধাচারে—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—শুধু তপস্বী। যোগীষ—যোগ সাধনা—কষ্টদহিকৃতার—কৃষ্ণ সাধনার—এক অপূর্ব আদর্শ। জীবনের—আলম লক্ষ্য—ত্যাগে আর মানব সেবার আত্মনিবেশনে।

দেখ-বিশেষে,—পর্বতে-প্রস্তরে—নদী-অরণ্যে ঘুরে বেড়ালেন জ্ঞান আহরণ করলেন, ভারতবাসীকে চিনলেন, তাদের অভাব-অভিযোগ চুঃখ কষ্ট নিঃসর অন্তর দিয়ে অশ্রুভব করলেন। এই নিঃস্রবীত মানবের মুক্তি চাই—চাই শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অস্পৃহ বলে কেউ নেই—মাহুবেশ হাতেই নারায়ণ। ব্রত হোল নরকণী নারায়ণের সেবা। জীবনের শেব নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছিল এই—

একমাত্র চিন্তা—ভারতের উন্নতি ভারতবাসীর উন্নতি। নির্ধাতা নারোগণের মুক্তি। ভারতবর্ষ আদর্শ মন্ডির দেশ; হোক ভারতের জয়গান সর্বত্র এই হ'ল কামনা। নারীজাতি মহামায়ার অংশ—নারী স্বাভেই মা—এই অমূল্যত্ব হোক সকলের। তাই ত ঠাকুরের তিরোত্তাবের পর মাঠা সারস্বতীকে দাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে দেখেছিলেন—পূজা করেছিলেন—প্রচার করেছিলেন সর্বত্র—সারস্বতী দাক্ষাৎ জগজ্জাতা জগদমা।

ভারতের নারোগণের জন্য বিদেশিনী মহীয়সী মহিলা—ভগিনী নিবেদিতাকে মন্ত্রশিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন—শ্রীশঙ্কর প্রচারে ভারতের সেবায়—তাকে উদ্ধার করেছিলেন—নিরোদ্ধিত করেছিলেন। সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতনারী নবজাগরণের উন্মেষলাভ করেছিল—এই মহান প্রচেষ্টায়।

বলহীন কাপুরুষকে করতেন ঘৃণা। চাই সাহস—চাই শক্তি। সবলতা চাই—দুর্বলতা মহাপাপ। এই দুর্বলতাকে কোনদিন অস্তরে স্থান দেননি। তাই ত কণ্ঠকহীন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ধর্মসত্য বাবার জন্য আত্মবিকার। বিতহীন নিঃস্ব সন্ন্যাসীর পাথের অতাব হয়নি। চিত্ত ব্যাধ সবল, বিত্ত তার কবায়ত্ত। শক্তির পূজারী—শক্তি-স্বরূপিনী মা সারস্বত আশীর্বাদ লাভ করলেন বাবার পূর্বে। হস্ত একটু সংকুচিত ছিল মনে তাই বারবার ঠাকুরের মূর্তি দেখেছিলেন—ইংগিত পেয়েছিলেন আমেরিকায় ধর্মসত্য বাবার। স্থির বিশ্বাসে চলে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করে এলেন—শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শে সনাতন হিন্দুধর্মের। বাজিয়ে এলেন বিজয়ভেরী। ভারতের মস্তকে পরালেন স্বর্ণমুকুট। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম বিশ্ববাসীর মাঝে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—বিশ্বজনগণও স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি—যেনে নিয়েছিলেন শাস্ত সত্য।

ফিরে এলেন স্বদেশে। গড়ে তুললেন—স্বাধীনতা মিশন মানবসেবার—আদর্শ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠা করে গেলেন—বেলুড মঠের—ধর্মের স্থান—শান্তির স্থান। গোড়ামী নেই এ মন্দিরে। সব জাতির—সব মানবের—সব ধর্মের।

সর্বধর্মসম্বন্ধের—এক মূর্তি ও পবিত্র নিদর্শন। স্বাধীনতার শ্রীমন্তকক্ষেত্রের মহান মন্দির—সার্বিক উপায়।

প্রারম্ভ কাজ হোলনা সমাপ্ত। অকালে চলে গেলেন—শ্রীমন্তকক্ষেত্র সকাশে—ফিরে গেলেন—মিষ্ট স্থান সপ্তবিম্বওলে। পূণ্য জাহ্নবীর পশ্চিম তুল—বারাণসী-সমতুল স্থানে—স্বামীজির অক্ষর অক্ষর কীর্তি রইল—বেলুড মঠ—স্বাধীনতা মিশন।

মহানির্বাণ হোল—সেই অসাধারণ কর্তব্যোপায়—৩১ জুলাই—তার পরম শ্রিয়-দিনটিতে

মই প্রাণের দক্ষিণ প্রজ্জ্বলিত হোল সেই—বৃগ প্রবর্তকের—পূত-চিতাঙ্গি। ভারতের বৃকে
আধার নেয়ে এস—১২০২ সালে—বিনা যেখে হোল আশ্বিনিসম্পাত।

দ্বিধিহীন বীর—জ্ঞাননিষ্ঠ—মত্যাগ্রহী—কর্মবীর—মানবদহনী—দুগাচার্ঘ—বীরেশ্বর বিবেকা-
নন্দের—অবিনবর কীতিই হোক—আজ ভারতবাণীর—ধান—তোষ—তপস্যা। উষ্ম হোক—
মানবতা বোধের চেতনা। সেই মহান লোকের পথে—অহমরণই হোক জাতির একমাত্র সাধনা
সর্বত্র বামী বিবেকানন্দের তেজোবীণা যুঁজি পুঁজিত হোক। তাঁর অসম্পূর্ণ কর্মের—পূর্ণ রূপায়ণে
ঐক্যবদ্ধ—আন্তরিক প্রচেষ্টা। অক্ষয় হোক আজ সর্বত্র—মানব-মৈত্রীর অটুট বন্ধন।

কয়লার আগুন

প্রতিপত্তিপাবন বন্দোপাধ্যায়

এক সময়ে জলার বন মাঝে
এরা সবাই ছিল তরুর সাজে।
বনে তখন নাই শৃগালের সাড়া,
এই যে মৃত কৃষ্ণ খণ্ড যারা
ছিল যেন হরিৎ জাল ফেলা
সূর্য-কিরণ ধরতে দিনের বেলা।
পাতারা সব শিখতো পরে পরে
আলোক পান করবে কেমন ক'রে।
জ্ঞানতো সবাই কচি পাতার মলে
ধরতে আগুন নিজে না তায় জ্বলে।
ছোটো বড়ো শাখা পল্লব যত
উদ্ভাপ আহার করতো রীতি মত।

লক্ষ লক্ষ বছর এমনি করে
আগুন এরা রাখলো বৃকে ধরে।
সেই আগুনের ফুলকি পথে আজ
মুক্ত আবার বন্দী অগ্নিরাজ।
দেখছো কি? তার বাড়িয়ে শত-বাহ
দিগ্বিদিকে স্পর্শ করে বায়ু।
ধীরে ধীরে পাক খুলে যায় যত
অগ্নিশিখার তেজ বেড়ে যায় তত।
বৃক্ষ দেহের আজ যা আছে বাকি
জড়িয়ে ধরে দেয় শিখাতে ঢাকি
একে একে ক্ষয় ক'রে নিঃশেষে
আবার ফিরে যায় সূর্যের দেশে।*

* ইংরেজী কবিতার ভাব অঙ্কনমাত্র।

সাত ভাই

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

আমার জীবনের একটা ঘটনা আজ তোমাদের বলবো। ঘটনাটা যখন ঘটেছিলো তখন আমিও ছিলাম তোমাদেরই মতো ছোট।

দে দিনটা ছিলো সপ্তমী। বাহুভাই আমাদের সঙ্গে করে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চারিদিকে ছুটাছুটি করছে, যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আমাদেরও ইচ্ছে হচ্ছিলো ওদের সঙ্গে মিশে যেতে। কিন্তু বাহুভাইয়ের ভয়ে আমরা চুপ করে ছিলাম। বাড়ী কেয়ার পথে বাহুভাই সাত রংয়ের সাতটি বেলুন কিনলেন। বাড়ীতে এসে আমাদের মধ্যে লাগলো ঝগড়া। কে কোন রংয়ের বেলুন নেবে এই নিয়ে লাগলো মারামারি। আমাদের কাণ্ড দেখে বাহুভাই ধমক দিয়ে বললেন, “আজ কেউ বেলুন পাবে না। কাল তোমাদের আমি পরীক্ষা নেবো। পরীক্ষার ফলাফলমুখে কে কোন রংয়ের বেলুন পাবে তারও মীমাংসা করে দেব আমি।”

পরের দিন মহাষ্টমী। তোমরা বুঝতেই পারছো যে সেদিন সকালের খাওয়াটা খুব জোরদার হয়েছিলো। আমরা খাওয়া সেরে শুয়ে আছি, পেট ফুলে ভরজাক হয়ে উঠেছে। এমন সময় বাহুভাই আমাদের সকলকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমরা বাহুভাইয়ের ঘরে গেলাম। বাহুভাই আমাদের পর পর দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকের হাতে সাত রংয়ের সাতটি ছোট ছোট গুলি সন্দেশ দিয়ে বললেন, “সব সন্দেশগুলো তোমাদের খেতে হবে।”

তখন আমাদের মনের অবস্থা কণা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। পেটে একভিলাও জ্বরগা নেই, অথচ হাতে একটা দু’টো নয় সাত-সাতটা সন্দেশ। লোভও ছাড়তে পারছি না।

যা হোক আমরা খেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু প্রত্যেকেই ছ’টার বেশী খেতে পারলো না, হাতে একটা করে সন্দেশ রয়ে গেল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার প্রত্যেকের হাতে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সন্দেশ রয়েছে। বাহুভাই আমাদের হাতের সন্দেশের সঙ্গে রং মিলিয়ে সাতজনকে সাতটি বেলুন ভাগ করে দিলেন। আমাদের সমস্তার সমাধান করলেন ঐ ভাবে।

ঠিক ঐ ধরনের গুণগোল লেগেছিলো প্রকৃতির মধ্যে। প্রথম যখন সূর্যের আলো এসে পড়েছিলো পৃথিবীর বৃক, তখন হুড়োহুড়ি লেগেছিলো প্রকৃতির রাস্তা—কে কোন রং নেবে।

তোমরা জানো সূর্যের আলোর রং সাদা। আসলে কিন্তু এ সাদা আলোর মধ্যে নুকিয়ে আছে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রং।

তোমরা আকাশে “রামধনু” নিষ্কর দেখেছো। সাধারণতঃ “রামধনু” দেখা যায় বৃষ্টি হবার পর বোন উঠলে। তোমরা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে এই “রামধনু”র মধ্যে সাতটি রং রয়েছে। ঐ রংগুলোই হ’ল সূর্যের আলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতটি রং।

যা বলছিলাম—সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়া মাত্র প্রকৃতির রাজ্যে লেগে গেল হড়োহড়ি—যেমন মারামারি লেগেছিলো আমাদের মধ্যে। কিন্তু মিথো মারামারি করে কোন লাভ নেই। তাই নিজের দাঙ্গাপালোর মধ্যে ঝগড়া দেখে প্রকৃতিরাক্তি নিজেই সে ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন, যেমন করে আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছিলেন দাদুভাই।

তোমরা ফুলের বাগানে ঢুকলে দেখতে পাবে যে, কোন কোন গাছের পাতা সবুজ, কোন কোন গাছের পাতা হলদে, কোনটার রং লাল। লাল, হলদে, বেগুনী নানা রংয়ের ফুলও দেখতে পাবে গাছে গাছে। কেন এমন হলো?

তোমাদের মনে হয়তো একটা প্রশ্ন জাগতে পারে—সব গাছের পাতা সবুজ হলো না কেন? কেনই বা হ’ল না হলদে? সব ফুলগুলো বেগুনী রংয়েরই হলো না কেন? কেনই বা হলো না সবকটা লাল?

কেন হলো না তাই এবার বলছি। ধরাই বাক পাতাটার রং সবুজ; কিন্তু আসলে পাতাটার নিজস্ব কোন রং নেই। সূর্যের আলো পাতাটার উপর এসে পড়ছে। সূর্যের আলোর মধ্যে লুকানো যে সাতটি রং আছে, ঐ পাতাটা সবুজ রং ছাড়া বাকি ছ’টা রংকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছে, ধরে রাখতে পারেনি কেবল ঐ সবুজ রংটাকে। অর্থাৎ ছ’টা রংকে পাতাটা ধরে হজম করে ফেলেছে, খেতে পারলো না ঐ সবুজ রংটাকে—যেমন আমিও ছ’টা সন্দেশ খেয়ে সবুজ রংয়ের সন্দেশটা আর খেতে পারলাম না।

ঐ না-খেতে পারা রংটা আমাদের চোখে এসে লাগে, আমরা পাতাটাকে সবুজ দেখি। তেমনি গাঁদা ফুল সব রংগুলোকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছে, পারেনি কেবল হলদে রংটাকে। তাই গাঁদা ফুলকে আমরা হলদে দেখি।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, সব গাছের পাতা সবুজ হ’ল না কেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রং দেখি (অবশ্য বাইরে থেকে আমরা যদি কোন রং না লাগাই)। এবং দেখি সেই রংটা, যে-রংটা ঐ জিনিসটা হজম করতে পারেনি। আর ঐ রংটা হজম করতে পারিনি বলেই ঐ বিশেষ রংটা আমাদের চোখে এসে লাগে, আর আমরা বলি ফুলটার রং লাল।

চিন্তাপাঠের ম্যাজিক

যাঙ্গরত্নাকর এ. সি. সরকার

লোকের মনে মর্শ্চকেরা কী ভাবছেন তা বলে দেয়া কি খুব কঠিন? আমাদের যদি নিজস্ব করে তা'হলে আমি ভাবাব যে—না, এ মোটেই কঠিন নয়। কারণ, মর্শ্চোহন প্রয়োগ করে খুব সহজেই আমি ঘেনে নিতে পারি লোকের মনের কথা। এইভাবে লোকের মনের কথা বলে দেবার নাম হচ্ছে চিন্তাপাঠ বা 'থট্-রিডিং'। যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই চিন্তাপাঠের ক্রিয়া আমি ক'রে থাকি তা অস্তান করা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'বে না। প্রচুর অশুশীলন ও কষ্টসাধন করেই নিখিলান্ত করা যায় এই আধ্যাত্ম-সাধনায়।

এখন তোমাদের কাছে আমি এমন একটি খেলার কথা বলতে যাচ্ছি বা দেখলে মনে হবে বুরি বা এ মত্ভিকারের চিন্তাপাঠ করারই খেলা। খুব বুদ্ধিমান মর্শ্চক ও ব্যত্রে পারবেন না যে এ মত্ভিকারের চিন্তাপাঠের খেলা নয়। ফরাসী দেশের ব্লোইন শহরে এক গুলদাজ বাত্ভকরকে বেদিন প্রথম এই খেলাটা সেখানে দেখেছিলাম, সেদিন আমিও ভেবেছিলাম যে, এ বুরি মত্ভিকারের চিন্তাপাঠ করারই খেলা। কিন্তু পরে একটু ভেবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটা মকল চিন্তাপাঠ করার ব্যাপার।

গুলদাজ বাত্ভকর ভত্ভলোকের মেথা পেয়েছিলাম ব্লোইনের নাবিক'ক্লাবে। কয়েকটি ছোট ছোট খেলা দেখানোর পরে তিনি দেখালেন এই খেলা। মর্শ্চকের সামনে টেবিলের উপরে একটি কাগজের প্যাড আর তিনটি বল (লাল, সাদা, আর নীল রঙের) রেখে তিনি বললেন, “বত্ভগণ, এখন আমি চলে যাচ্ছি শাশের ঘরে। আমি ওঘরে বাবার পরে আপনাদের ইচ্ছে মতন এই তিনটি বলের যে কোনও একটি পছন্দ করে আমার কাছে এই প্যাডটি পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের নিজেরের কোনও লোক দিয়ে—আর আমার এই সহকারিণীটি রইলেন আপনাদের সাহায্য করার জন্য।” বাত্ভকর চলে বাবার পরে মর্শ্চকেরা সাধা বলটিকে পছন্দ করলেন। বাত্ভকরের সহকারিণী পকেট থেকে একটি পেন্সিল বের করে মর্শ্চকের একজনের হাতে দিলেন। সহকারিণীর অহবোধে সেই ভত্ভলোক প্যাড আর পেন্সিলটি নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন শাশের ঘরে বাত্ভকরের কাছে। বাত্ভকর ঐ পেন্সিল দিয়ে প্যাডের উপরে লিখে দিলেন—সাদা বল পছন্দ করা হয়েছে। ব্যাপার দেখে তো সবাই অবাক।

বলতে পার কোন কোনলে এই অত্ভুত ব্যাপারটি দেখিয়েছিলেন বাত্ভকর মশাই? শোন আমিই বলে দিচ্ছি। যে পেন্সিলটা বাত্ভকরের সহকারিণী পাঠিয়ে ছিলেন প্যাডের সঙ্গে, তা থেকেই বাত্ভকর পেয়েছিলেন পছন্দ করা বলের হমিদ। সহকারিণীর কাছে ছিল তিন রঙের তিনটি পেন্সিল—একটি কালো, একটি হলুদ আর একটি সবুজ। বাত্ভকর তাঁর সহকারিণীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সাদা বল পছন্দ করা হলে সে ঘেন হলুদ পেন্সিল, লাল বল পছন্দ করা হলে কালো, আর নীল বল পছন্দ করা হলে সবুজ পেন্সিল পাঠায় বাত্ভকরের কাছে প্যাডের সঙ্গে। সহকারিণীর পকেটেই মখে লুচানে! প্যাকতে মর্শ্চকেরা বাকী পেন্সিলগুলোর কথা জানতে পারেন নি। বাত্ভকর পেন্সিলের রঙ বেবে সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়েছিলেন পছন্দ করা বলের রঙ।

গ্রাহক গ্রাহিকাদের (লেখা)

পৃথিবী পবিত্র হবে

বাবুল একদিন বেড়াতে গিয়েছিল প্রজ্ঞাপতির দেশে। প্রজ্ঞাপতির দেশ হ'ল বিরাট এক তুল বাগান। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী আরও কত রঙের তুল ফোটে সেখানে। কত রকম তাদের নাম, কত তাদের গন্ধ, কত তাদের ছন্দ, কত তাদের মধু। অপূরণ দেশ। বাবুলের মনে হয়েছিল এটা দেবরাজ-ইশ্বের বাগান—যে বাগানের গুল্ল তার ঠাকুরা তাকে বলেন। স্বর্গের বাগান না হলে এমন বাগান কি পৃথিবীতে থাকতে পারে! কোলকাতার 'ইডেন-গার্ডেন'-ও এত সুন্দর নয়। এ হচ্ছে একেবারে সত্যিকারের 'ইডেন-গার্ডেন'।

প্রজ্ঞাপতির দেশে যেমন রঙ-বেরঙের বিভিন্ন ফুল আছে, তেমনি বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ফুলের মতো প্রজ্ঞাপতি আছে। তাদের ডানা বিচিত্র কারুকার্যে ভরা। কোন শিল্পী যেমন রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে মন্থরে আলপনা একেঁচে।

ঝাঁক ঝাঁক প্রজ্ঞাপতি ফুলে ফুলে বনে মধু খাচ্ছিল আর ডানা নাড়ছিল। কেউ কেউ

এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাবুল একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে তাদের কার্ণ-কলাপ দেখছিল। দেখছিল দুই বড় বড় ভাঁড় ফুলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে কি করে এরা মধু খাচ্ছিল। কত রেণু ফুলে ফুলে! প্রজ্ঞাপতি-দের পায়ে ওই সব রেণু মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল। বাবুলের মনে পড়ল সে পড়েছে তার বিজ্ঞান বইয়ে—প্রজ্ঞাপতি এক ফুলের রেণু অন্ন ফুলে নিয়ে যায়; ফলে বীজের সৃষ্টি হয়।

প্রজ্ঞাপতিরাত্ত বাবুলকে দেখতে পেয়ে গেছল। তারা মলে মলে তার কাছে ছুটে এল। একে একে নানা রঙের নানা প্রজ্ঞাপতি তার চার পাশে হাজির হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বলল—

মোদের দেশে এলেই যদি
ঘুরছ কেন পথে?
রাজ-প্রাণাদে চল না ভাই
চড়ে ফুলের মধ্যে।
বেধ সেধাও রাজা ও রাণী
করে কত আদর
ভাববে তুমি সেটাই বুঝি
তোমারই না'র ঘর।

প্রজ্ঞাপতিরা বাবুলকে নিয়ে গেল তাদের রাজারাজীর কাছে।

বাবুলের ভারী ভালো লাগল রাজা-রাণীকে দেখে। কি সুন্দর তাদের দেখতে! একেই বলে চোখ-ছুড়ান রূপ। তাদের দু'জনেরই বেশমী কাপড়ের মতো ঝকঝকে

মত্ত মত্ত বড় বড় ডানা। রাজার গায়ের রঙ
ফিকে সবুজ, রাণীর গায়ের রঙ চাঁপা ফুলের
মতো হলুদ। আবার দেই সব উজ্জল মনন
জানায় অপূর্ণ ছবি আঁকা।

রাজা-রাণী বাবুনকে আদর করলেন।
তাদের ফুলের সিংহাসনের এক পাশে তাকে
বসতে দিলেন। বাবুন ভারী আনন্দ হল
রাজা-রাণীর মধুর ব্যবহারে। সে জানত
রাজা-রাণীর তার মতো সাধারণ লোকের
সঙ্গে কথাই বলেনা। কিন্তু এই রাজা-রাণী তো
বেশ গল্প করছে তার সঙ্গে। রাজা-রাণী হলেও
তাদের সঙ্গে লম্বান-হুচক নৃত্য রেখে বসতে
হয়নি। এমনি কি বাবুনকে মিছেদের
সিংহাসনে বসতে দিয়েছে।

রাজা-রাণীর কাছ থেকে বাবুন যখন
বিদায় মিল তখন তাঁরা বললেন :

আবার এলে মোদের দেশে

আমরা হব খুশী,

তোমার মতো ছোট্ট খোকন

আমরা ভালবাসি।

আবার এস বাবুন দোন।

মোদের এই দেশে,

গল্প আবার করবখন

অনেক ভালোবেসে।

প্রজাপতিরা দেখাল তাকে ঘুরিয়ে তাদের
সেই রঙীন রাজ্য। সেখানে ফুলই সর্ব্বশ্রী।
কোন ফুলের কি গুণ, কোন ফুল কেমন, তা
তাঁরা বুঝিয়ে দিল বাবুনকে।

তাঁরা মিষ্টি মধুও খেতে দিল তাকে।
বলল :

খেয়ে দেখ মধু তাই অমৃতের -তুল্য।

পাবে না কোথাও তুমি বস পাও মূল্য।

প্রজাপতিরা তাদের ভিন্নও দেখাল।

ভারী ভালো দেখতে ভিন্নগুলো। চক্চকে
ঝক্‌ঝকে রূপালী গায়ের উপর সোনালী
আঁতা। ছোট ছোট ভিন্ন গুলো সব করবী
গাছের ডালে ডালে ঝুলছিল। মনে হচ্ছিল
সবুজ পাতার আড়ালে ছোট ছোট রূপালী
ফল ঝুলছে।

প্রজাপতির দেশ দেখে বাবুন খুব মুগ্ধ হয়ে
গেছিল। এদেশের সবই ভালো সবই সুন্দর।
সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুন্দর এখানেও
অধিবাসী প্রজাপতিদের রূপ আর স্বভাব।
কোথাও একটু ঝগড়াঝাঁটি দেখেনি বাবুন।
এখানে কারুর কোন অহংকার বা রাগ বলে
কিছু নেই। হাসি খুশী হয়ে বলে বলে ফুলে
ফুলে খেলে বেড়ায় সকলে। সবাইকার সঙ্গে
সবাইকার ভাব, সবাই সবায়ের বন্ধু।

বাবুন প্রজাপতিদের বলল, “এত সুন্দর
কেন তোমাদের দেশ?”

একজন খুব জানী প্রজাপতি উত্তর দিল।

সে বলল, “সুন্দর ভগবান তাঁর মনের সুন্দর
ভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আমাদের দেশ।
তাই এদেশের সব কিছুই সুন্দর।”

বাবুন বলল, “আমাদের দেশও তো
ভগবান সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশ

তাহলে কেন এত হৃদয় নয় ? ভগবান মুক্তি
আমাদের ভালবাসেন না ?”

জানী প্রজ্ঞাপতি বলল, “না না, ভগবান
সবাইকে ভালবাসেন, সমস্ত প্রাণী ভগবানের
সম্মান। তিনি তোমাদের দেশকেও হৃদয়
করে গড়েছেন। তোমাদের দেশের একমল
মাত্র বড়রিপুতে আক্রান্ত হয়ে তোমাদের
হৃদয় দেশকে দিনে দিনে নষ্ট করে ফেলছে।
বড়রিপু হাত থেকে তারা মুক্তি পেলে
তোমাদের দেশ কত হৃদয় হবে। আসলে
ভগবান বড় কিছু স্মৃতি করেছেন তার মধ্যে
মাত্রের রাজাই সবচেয়ে হৃদয়। মাত্র
ভগবানের স্রেষ্ঠ স্মৃতি।”

বাবু বলল, বড়রিপু আবার কি ?”

জানী প্রজ্ঞাপতি বলল :

কায় কোথ লোভ মোহ মদ্ব রাগসর্ঘ্য
এই হল বড়রিপু, বলেন আচার্য্য।

কতদিন হয়ে গেছে, বাবু প্রজ্ঞাপতির
সাহায্যে গেছিল। তবু সেখানকার কোন কিছু
তুলতে পারেনি, তুলতে পারেনি জানী
প্রজ্ঞাপতির একটি কথাও।

বাবু জানে না বড়রিপু হাত থেকে
কেমন করে লোকদের মুক্ত করা যায়। সে
ভাবে বড় হয়ে অনেক বই পড়ে যখন সে সব
জানতে পারবে তখন মাত্রের এই দেশ থেকে
বড়রিপু একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে।
তাহলে তাদের দেশ সব দেশের চেয়ে হৃদয়
হবে, পবিত্র হবে।

মধুমিতা রায়

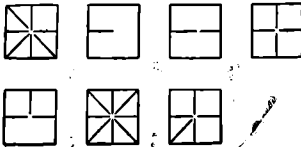
বর্ষা

কমলম বারি করে
অপকণ ছন্দে,
খোকা খুঁজ রাঁপ দেয়
অতিব আনন্দে।
বাল-বিল সব কিছু
জলে হলো পূর্ণ,
নদী-জল ছুটে যায়
বাধা ক'রে চূর্ণ।
কড়কড় বাজ ডাকে
চক্ৰক অস্থখণ,
গাছ-শালা দোল খায়
হেসে উঠে জলধন।

বন হ'তে ভেসে আসে
কেতকীর গন্ধ,
তেকদল করে শেব
কর্ণের রন্ধ।
চারিদিকে স্তম্ভ শোভা
অপকণ দৃশ্য
ফুলে-ফুলে নদীজলে
দাঞ্জিরাছে বিব।
পড়াশুনা নাই আজ
পাঠশালা বন্ধ,
যদে বসে শুন সব
বর্ষার ছন্দ।

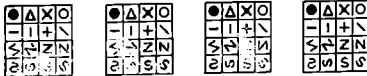
• শ্রীমোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

(গ) ছবিতে দাতটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে সরল রেখা টেনে দেখানো হয়েছে। ঐ ক্ষেত্রগুলি



কিন্তু পর পর সামান্য নেই। কিভাবে রাখলে ঐ ক্ষেত্রগুলি পর পর রাখা হবে বলতে পার? ক্রম অনুসারে পর পর দাতাটে গিয়ে দেখবে একখানি ছবি কম আছে। সে ছবিখানি কিন্তুপ হবে এবং কোথায় ওটা বলবে দেখাও।

(ঘ) ছবি চারখানির প্রত্যেকটিই একই রকম; কিন্তু একখানি ছবিতে একটু অল্প রকম আছে। কোন্ ছবিখানি বলত?



॥ পাত মাসের প্রাঙ্গণের উত্তর ॥

(১) একখানি লোহার হাতার একটা দিক উঠুনের আগুনের মধ্যে রাখলে খানিকক্ষণ পরে ঐ হাতার অপর দিকটা হাত দিয়ে টেনে আনতে গেলে উত্তাপে হাতটার ফোঁস পড়তে পারে; কিন্তু উঠুনে চেলা কাঠের একটা দিক ঢুকিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ-বাড়ি বা বন-ভোজনে রাখা করা হয়। যিনি রাখা করেন, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত দিয়ে ঐ কাঠের বাইরের দিকটা ধরে উঠুনে ঠেলে দেন। তাতে তাঁর হাত পোড়ে না বা ফোঁস পড়ে না। এ থেকে বোঝা যায়, কাঠের চেয়ে লোহার উত্তাপ টেনে নেওয়ার শক্তি অনেক বেশী।

(২) লাইট পোষ্টটির বাঁদিকে বাধ নেই,—আছে আঁতুরের খোঁকার মত একটা কিছু। রাজার গোল গোল চিহ্নগুলি ছুটপাথ পর্যন্ত উঠেছে। ঘোড়াটির লেজ ঠিক হয়নি—ওটা হয়েছে কুকুরের লেজ। ঘড়ির নখর বেওয়া হয়েছে উন্টো করে। টামের সম্মুখে Volta কথাটি উন্টো হয়েছে।

(৩) উপরে 'A' এবং নীচে পর পর বাঁদিক থেকে B, C, D, E সাজিয়ে নিয়ে, মোট ছ'টি ত্রিভুজ এইভাবে হবে : ABC, ABD, ACD, ACE, ADE, ABE.

(৪) উপর-নীচে সোলাহজি ভাবে যে মোটা লাইনটি আছে, তার মাথা থেকে এড়াঁড়ি ভাবে যে মোটা লাইনটি আছে, তার বা-প্রান্তের মাথার সঙ্গে যোগ করবে এবং সোলাহজিভাবের লাইনটির তলার প্রান্ত থেকে এড়াঁড়ি লাইনটির ডান প্রান্তের সঙ্গে যোগ করবে—তাহলেই



সিনিয়র ডিভিসন
ফুটবল লীগ

(১)

মোহনবাগান বনাম মহামেডান
স্পোর্টিং : মোহনবাগান বনাম
মহামেডান স্পোর্টিং—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী
দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে কলকাতা

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলাটি এ বছরে প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ হিসেবে অর্জিত হয়। কালকাতা ফুটবল ক্লাবের মাঠে খেলাটি বিকেল পাঁচটার শুরু হয়। খেলাটিতে মোহনবাগান ক্লাব চির প্রতিদ্বন্দ্বী মহামেডান স্পোর্টিংকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে দুটো মূল্যবান পয়েন্ট পায়। মাত্র একগোলে জয়লাভ করলেও বর্ষা স্তম্ভা মাঠে মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো খেলে। মোহনবাগান এই দিনের জয়যুটক গোলেট করে প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটে। মদল পুরকায়াহ চুনী গোখার্মীকে বল ঠেলে দিলে গোখার্মী বলটি অক্ষমরকে পাস করেন। বল পেয়ে মোহনবাগানের চতুর বাম প্রান্তিক খেলোয়াড় অক্ষমমৈনখম আর এক পাও না এগিয়ে ঐ পায়ের উঁচু স্ট কয়েল বলটি খজরাজকে পরাজিত করে মাঝে প্রবেশ করে (১-০)।

(২)

ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং : কালকাতা মাঠে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচরূপে আয়োজিত হয়। লীগ দ্বিত্ব চ্যারিটি ম্যাচ হিসেবে এই খেলাটি ছিল দ্বিতীয়। গুরুত্বপূর্ণ এই খেলাটি শেষ পর্যন্ত অসীমাসিতভাবে শেষ হয়। ইস্টবেঙ্গল দল স্থির চিত্তে খেলতে পারলে এই খেলাটিতে অনান্যদে একের বেশি গোলে জয়লাভ করতে পারত।

(৩)

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান : এবারের লীগ ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান এই দুই জনপ্রিয় খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে অর্জিত হয়। স্বন্দর আবাহাওয়া ও মনোহর পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এবছরের ফুটবলের প্রথম দীর্ঘ সম্মেলন তেমন চমকে নি। উভয় দলের ডেভার ইস্টবেঙ্গল দল অপেক্ষাকৃত স্থপতিকল্পিত কৌশাধারা উপস্থাপিত করে জয়লাভের স্বীকৃতি অর্জন করে। ইস্টবেঙ্গল দল বারবার বেতাবে প্রতিপক্ষ ব্যাধ ভেদ করেছে তাতে তার আরো বেশি গোলের ব্যবধানে ভরী হওয়া উচিত ছিল। খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে নীলেশ সরকার হামিরকে এবং সেটার ফরোয়ার্ড বল এগিয়ে দিলে ব্রুনীল নন্দী গোলরক্ষক সমন্ব শেঠকে পরাজিত করে দলের জয়নির্দেশক গোলেট করেন (১-০)।

ইংলণ্ড বনাম স্পার্কিস্তান : প্রথম টেট ম্যাচ—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেট ম্যাচের প্রথম দিনে ইংলণ্ড টেসে অসী হবার পর ব্যাট করতে নামে এবং ত্রিভিটে একতরফি ভিতরান স্তম্ভ

মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ১ উইকেটে ১১২ রান, চা-পানের আগে ২ উইকেটে ২৮৬ রান এবং দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৩৬৮ রান করে। অধিনায়ক ডেব্রটার আকর্ষণীয়ভাবে ৭২ রান করে আউট হয়ে বান। কলিন কাউড্রে ১৫২ রান করেন। দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় ইংলও ৫ উইকেটে ২৫৪ রানে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। গ্রেভানি (২৭) তিন রানের জন্ম সেকুরী করতে পারেন নি। পারফিট ১০১ রানে ৬ আলেন ৭২ রানে অপরাধিত থাকেন।

পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৫২ রান তোলে। তৃতীয় দিনে পাকিস্তান দল মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির কিছু আগে মোট ২৪৬ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে এবং ২২৮ রানের পিছনে থেকে ফলে অনেক বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে পাকিস্তান দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে। চতুর্থ দিনে আর মাত্র ১২০ রান উঠিয়ে পাকিস্তানের সমগ্র খেলোয়াড়ই আউট হয়ে যায়। ইংলও এক ইনিংস ও ২৫ রানে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে প্রথম টেস্টে পরাজিত করে।

ইংলও বনাম পাকিস্তান : দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ—লর্ডস মাঠে ইংলও বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে টমে বিজয়ী পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ফাস্ট বোলিংয়ে পূর্ণরক্ত হয় এবং মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির কিছুকণ পরে মোট ১০০ রানে দলকে আউট হয়ে বান। ইংলওর ফাস্ট বোলার ফ্রেড টুম্যান পাকিস্তান দলের প্রথম ইনিংসে ছ-টি উইকেট দখল করেন এবং সেই সঙ্গে টেস্ট ম্যাচে দু'পন উইকেট লাভের সৌরভ অর্জন করেন।

চা-পানের বিরতির ৭০ মিনিট আগে ইংলও প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে প্রথম দিনের খেলার শেষে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৬ রান করে ৭৬ রানে এগিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ইংলও দল অবকাশের কিছু আগে মোট ৩৭০ রানে দলকে আউট হয়ে যায়। টম গ্রেভানি ১৭৫ মিনিটে ১৬টি বাউন্ডারি দিয়ে মরশুমের বর্ষ সেকুরী করেন এবং ব্যক্তিগত ১৫৩ রানে সবার শেষে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান করে।

তৃতীয় দিন পাকিস্তান দল মোট ৩৫০ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করলে ইংলও দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে হারিয়ে অলআউটের জন্ম প্রয়োজনীয় ৮৬ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাকি (১০১) ও নাসির (১০১) পঞ্চম উইকেটে রেকর্ড সংখ্যক ১২৭ রান যোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বিজ্ঞ তাঁদের পর অজ্ঞাত ব্যাটসম্যানরা আর তেমন হাধিধে করতে পারেন না। ইংলও দল ২ উইকেটে পাকিস্তান দলকে হারিয়ে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় ২-০ ম্যাচে এগিয়ে থাকলো।

বিশ্ব কুটবল কাপ - নতুনগাঁও ব্রেভিল কুটবল দল নাটকীয়গোয় জ্ঞানানাল স্টেডিয়ামে অত্রিষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় চেকোব্রোভাকিয়াকে ৩.১ গোলে হারিয়ে দিয়ে পরপর দু'বার 'কুলে রিমেট কাপ' বিজয়ী সন্মান লাভ করেছে।



পাঠাইলে আশ্রয় দ্বন্দ্ব
আহার ঘরের ঘরে
তব আশ্রয় করি সে বহন
পার হয়ে এলো পারে ।

ভোমরা শুনেছ বাংলা দেশের কর্ণধার,
মিকপাল চিকিৎসক, বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদ
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় আর ইহলোকে
নেই। ঘটনাটি এত আকস্মিক এবং বেদনাবহ যে সংবাদটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দমত শহর ও
শহরতলী শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হলে হলে লোক কোলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডক্টর
রায়ের বাসভবন অভিমুখে বণ্ডনা হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর বাড়ী ও রাস্তার এক বিরাট
জন-সমুদ্র সৃষ্টি হয়।

কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ২০শে জুন তারিখে তিনি সামান্য অসুস্থ বোধ করেন এবং
ডাক্তারদের পরামর্শে নিজগৃহে বিশ্রাম করছিলেন। ১লা জুলাই রবিবার তাঁর জন্মদিন ছিল, এই
উপলক্ষে তাঁর অহুতাগী সকলেই তাঁর কাছে শুভকামনা জানাতে এসে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত
হবে মনে করে, তিনি সেবা করবেন না বলে সবিনয়ে একটি অশ্রুপাথ লিখে রেখেছিলেন। তবুও
তাঁর প্রতি প্রত্যাশীল, বন্ধু-বান্ধব, পরিজন ও অগণিত দেশবাসী ছল ও মিষ্টার সহ তাঁরা দয়বশত
হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা না হলেও নীরবে প্রত্যা জানিয়ে এসেছিলেন।

জন্মদিনের উৎসবের মধ্যে অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সব ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও
অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জন্মদিনের শুভ-উৎসবে মৃত্যুর কালোছায়া নামলো। এই আকস্মিক বিরাট দুর্ঘটনার
সামান্যতম সম্ভবনাও দেশবাসী বা তাঁর অন্তরঙ্গসহল প্রত্যাশা করেননি। এ ঘেন এক মহাবিপ্লব
বেশের কাছে মনের কাছে উপস্থিত হলো। দেশের প্রতিটি প্রাণী সে তাঁর স্বলীল বা বিশরীত স্বলীল
বাই হোক না কেন, তাঁকে যে কী গভীরভাবে ভালবাসতো, প্রত্যা করতো তা বোঝা গেল সেই
মিন—মহাপ্রাণের দিনটিতে। অশ্রুশিক চোখে নয় পথে তাঁর শব্দভাগমনে সে কি বিরাট জনতার
ভিড়। প্রত্যেক না করলে ঠিক বোঝানো যাবে না বা এ কণ দৃষ্ট না দেখলে অস্বীকৃত হবে না।

তাঁকে শেষবারের মত দেখবার জন্য মহাপ্রাণের দিন থেকে পরদিন ভোর বেলা পর্যন্ত দূর
দূরান্তর থেকে সকলে এসেছিলেন। এসেছিল হাউস বা বিধান সভা ভবনের উত্তর দিকে বরফের
পথ্যর উপরে তাঁর দেহটি রাখা হয়েছিল। গৌরবর্ণ স্থানিশাল দেহটি শুদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু মুখে এক
প্রসন্ন প্রকাশিত ছায়া। পুষ্পস্বক ও ধূপের গন্ধে স্থানটিকে কোনো দেবগৃহ বলে মনে হচ্ছিল।
নিঃশব্দে সকলে আসছেন, নিঃশব্দে সকলে অশ্রু বেদনার বিমূঢ় হয়ে চলে যাচ্ছেন। পরের দিন
সকাল ৬-১৫ মিনিটে তাঁর দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেবোলো। উরুপদম ব্যক্তিবৃন্দ থেকে সামান্যতম
লোকটিও এই বিরাট যৌন মিছিলে যান যায়নি। শেষবারের মত সৈন্তগল অস্ত্র নিক্ষেপ করে
অভিবাদন জানালো তাঁর উদ্দেশে। মনে হলো এই বিধান সভার তিনি কতবার এসেছেন, তাঁর
ওক গভীর কর্তব্য বিধান সভার রক্তে রক্তে ধনিত হয়েছে। কতবার এসেছেন কতবার গেছেন

কিন্তু আভকের মত এই শোভাযাত্রা করে তিনি ঘেঁষার হলেন আর কোনদিন তিনি এখানে ফিরে আসবেন না।

গভীর বেদনার ভরু দেশবাসীরা এই কথা মনে করতে অঙ্গ সঘরণ করতে পারেন নি। তাঁর বীর্ষকাল যুগাময়ী হিন্দাবে দেশসেবা অনলস কর্মপ্রেরণা এই পরিনত বয়সে মর্যাদার মত শক্তি, কর্মে অবিচল, স্থির বৃদ্ধি—এরকমটি আর দেখা গেছে বলে অনেকেই মনে করতে পারেন না। তোমরা যারা তাঁকে দেখেছ তাদের ভীষন ধন্য হয়েছ। যারা দেখতে পেলেনা, তাদের গুণকে এটি সত্যই চূর্তাগের পরিচায়ক। যারা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা জানেন, তাঁর বাইরের দিকটা ছিল কঠিন আবরণে ঢাকা, ভিতরটি সেই পরিমানে কোমল। এই কোমল কঠোর, অমিতভেদ ও দেশের উন্নতির পথে অবিচল কর্মনিষ্ঠা—এসব ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু অত্যন্ত শোকপ্রকাশ করেছেন কিন্তু বলেছেন, “তিনি যে সব কাজ অদম্যপু বেখে গেছেন—সেই সমস্ত কাজকে এখন সমাপ্তির পথে নিয়ে যেতে হবে।” একথা আমাদের সকলেরই মনে রাখতে হবে। আজ এত বড় দুঃখের দিনে আমিও তোমাদের কাছে সেই কথাটিই তুলে ধরছি। তোমরা তাঁর উত্তর সাধক হবার চেষ্টা করার শক্তি অর্জন করো।

জন্মদিন, আর মৃত্যুদিন একই দিনে হওয়া দেখাই যায় না। ভগবান বুকের জন্ম মহাপরিনির্বাণ একই দিনে ঘটেছিল। এলা ভুগাই তাঁর মৃত মেহের দিকে চেয়ে এই কথাই মনে হয়েছে তাঁর বিগট ব্যক্তিত্বে তিনি নিজেই মহাপুরুষ বা পুরুষ সিংহ হয়েছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাছে কাছে কর্মে বহবার কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেই সমস্ত দিনগুলির সমস্ত ঘটনা যেন এখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে মনকে অসহ বেদনার পীড়িত করে তুলেছে। দেশের কত লোকই তো তাঁকে দেখেছে, বহু নিকটে এগেছে, কিন্তু আমার সেই সব দিনকটির ক্ষুদ্র ঘটনা, ছোট ছোট কথাগুলি যেন আজ যথি-যুক্তার রূপ নিয়ে মনের মণিকোঠার ভাঙা হয়েছ।

অগমিত দেশবাসী তাঁর আত্মীয় বন্ধু পরিজন সকলেই তাঁর জন্ত বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছে, পৃথিবীর সর্বত্র থেকে শোকবাণী বহন করে আনছে চিঠিপত্র। বাংলাদেশের একটি গৃহকোনের এই একটি মেয়ের প্রার্থনাবাণী হয়তো এর মধ্যে নুপু হয়ে যাচ্ছে তবুও বেদনা-ব্যাকুল অন্তরে তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমি তাঁকে জানাচ্ছি স্পর্শহীন প্রাণের প্রণাম আর প্রার্থনা করছি তিনি যেন আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসেন। বাবে বারই আসেন।

আভকের পরিবেশ ঠিক তোমাদের সঙ্গে গল্প করা বা চিঠির উত্তর দেওয়ার উপযোগী নয়, তাই তোমরা আগামী বারের জন্য অপেক্ষা করো। শুভেচ্ছা সহ।

তোমাদের মধুদি

শ্রীধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বকিম চাট্টিজো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রকৃ প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ৪.৪৫ নয়া পয়সা।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

ভাদ্র—১৩৬৯

[৫ম সংখ্যা]

কিশোরের পণ

শ্রীকৃষ্ণদরশন মল্লিক



সহজ, সরল, সবল হ'ব নির্মোভ নির্ভিক,
জুফে নেব জ্ঞানের আলো হতে দিক্‌বিদিক্ ।
সৈন্ত সম রইব খাড়া, সতর্ক, প্রস্তুত—
প্রত্যেকে অশণিভরা—জীবন্ত বিদ্যায় ।
করবো নাক পূজা-পূজার বিন্দু ব্যতিক্রম,—
বেশে বচন ব্যবহারে,—সৌজন্য সংঘম ।

ক্রুরের মত ভক্ত হব—পার্থ সম বীর,
সবেই হব জয়ী এবং সবেই র'ব ধীর ।
ভগবানের উপর রবে অমন্তু নির্ভর—
কর্মী হব মহৎ ও সং—কর্তব্যে তৎপর ।
বাড়াইব সকল দেশে মোদের দেশের দর ।
যাহা আছে তাহার চেয়ে করবো মহত্তর ।

আমরা হব দেশের সেবক—মূর্ত অমুরাগ—

অপাপবিদ্ধ—রইবেনাকো মলিনতার দাগ ।

মনে রেখো

শ্রীআনন্দোদয় সাহা



১

একটি কথা দিবসরাতি
ভুলবে নাকো—রেখো মনে,
মন্দ-ভালো শাদা-কালো
জুড়িয়ে আছে এই জীবনে ।
এটা নেহাৎ খাঁটি কথা
সবার বুকেই বাজে ব্যথা ;
ছঃখ-শুখের নেইকো তফাৎ
রামা এবং শ্যামার সনে,—
রেখো মনে ॥

২

নানা লোকের নানা কথা
কান পেতে ভাই, শুন্তে থাকো ;
বলার মানুষ অনেক পাবে,—
শোনার মানুষ মিলবে নাকো ।
মানিয়ে নিয়ে সবার সনে
রইবে তুমি আপন মনে ;
বৃথা দেমাঙ্ক কোটে নাকো
যেন তোমার আচরণে,—
রেখো মনে ॥

৩

কেউবা ধনী—কেউবা গরীব,—
তোমার তাহে কি যায় এসে ?
ধন্য হবে নিজেই তুমি
জগৎটাকে ভালোবেসে !
বিদ্যাবুদ্ধি রূপের বড়াই
বেবাক্ বৃথা !—ভুলো না ভাই !
এই ছনিয়ায় জীবন বৃথা—জীবো দয়া
তার বিহনে,—
রেখো মনে ॥

৪

কয়লা সে তো ময়লা হবেই—
হীরার স্বভাব—তাই সে শাদা,
চন্দনেরি গন্ধ কোথায়—
নোংরা যেখা ড়েনের কাদা ।
আজব ব্যাপার,—এই যে ধরা
হরেক চিজে বোঝাই করা ;—
সেটা যদি ভুলে থাকো—
উচিত তোমার যাওয়া বনে,—
মনে রেখো ॥

বন্ধুত্ব-রক্ষা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মাহু একা থাকতে পারে না—বন্ধু চায়। ছোট বয়স থেকে বুড়ো বয়স পর্যন্ত—সব বয়সেই বন্ধু চায়। বন্ধু মেলে, কিন্তু এ বন্ধুত্ব কি চিরদিন বজায় রাখা যায়? যায় না। না-বাণ্ডার অনেক কারণ আছে। একটি কারণ—পরস্পরের বিচ্ছেদ বা দূরে চলে যাওয়া—out of sight, out of mind. দূরে গেলেও কিছুকাল নিয়মিত চিঠিপত্র চলে উভয়পক্ষে—কিন্তু পরে নানা কারণে চিঠিপত্র কমে বন্ধ হয়। উভয়পক্ষই তখন নব-নব বন্ধু সংসর্গে আসায়—পুরানো বন্ধুরা মনের পট থেকে সরে যায়।

বন্ধুত্ব বজায় রাখতে না পারার আরো নানা কারণ আছে। যদি আমরা হ'নিয়ার হয়ে চলি, কতকগুলি বিধি-নিষেধ মেনে চলি, তাহলে বন্ধুত্ব বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হয়।

কটি বিধি-নিষেধের কথা তোমাদের বলি—

১। বন্ধু যখন কোনো কথা বলছেন, তখন তাঁর সে কথার স্বাক্ষরানে তাঁর কথা কেটে দিয়ে নিজের কথা শুধে দিয়ে না। তাঁর কথা শেষ হোক, তারপর তোমার কথা বলে।

২। বন্ধু যে-কথাই বলুন না কেন, তাঁর সে কথা মন দিয়ে শুনবে—তাঁর কোনো কথায় তুচ্ছ-তাচ্ছল্য, অমনোযোগী বা নিলিপ্ত ভাব প্রকাশ করবে না।

৩। বন্ধুর কথা শেষ হলে তাঁর সে-কথা নিয়ে তর্ক করবে না বা সে-কথা কেটে দেবার অস্ত্র প্রতিবাদ জানাবে না। বন্ধুর সব কথা যদি মানতে না পারো, ধীরভাবে তোমার মতামত জানাবে—অগহিকতা বা ক্রটিতা যেন তোমার দিক থেকে প্রকাশ না পায়।

৪। নিজের দুঃখ-কষ্ট, অভিযোগের কথা বন্ধুদের কাছে সব-সময় বলে বেড়িয়ে না। অপরের দুঃখ-কষ্টের কথা বেশীরভাগ মাহুই শুনতে চায় না—তাতে শ্রোতা দুঃখ পায়। তাছাড়া নিত্য অভিযোগের কথা বললে, বন্ধু তাঁর প্রতিকারের উপায় করতে না পারলে তোমাকে ধ্যাসম্ভব এড়িয়ে চলবে এ কথা মনে রেখো।

৫। বন্ধু-বান্ধবের কথা বা কাজের স্তূত ঘরে তা প্রকাশ করো না।

৬। বন্ধুদের দোষ-ত্রুটির কথা সত্যবাদীর মতো বলে না—অপ্রিয় সত্য-কথনে বন্ধু বেগড়ায়।

৭। বন্ধুদের শিঠি চাপড়ে বা চড়-চাপড় মেরে অস্তরকতা প্রকাশ করো না—অনেকে শিঠি-চাপড়ানো পছন্দ করে না।

৮। বন্ধুদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে কৃপণ হয়ো না—বন্ধুদের খুশী করতে মাঝে মাঝে কিছু পরমা খরচ করো।

২। বন্ধুর কাছ থেকে জিনিষপত্র বা টাকা-পয়সা কখনো ধার নেবে না।

১০। নিজেকে বড় আর বন্ধুকে ছোট প্রতিপন্ন করবার মন্ত কখনো বাক্য বা আচরণে নিজেকে জাহির করবে না।

এই দশটি বিধি-নিষেধ যদি মেনে চলো, তাহলে বন্ধু-বিচ্ছেদর আশঙ্কা থাকবে না। আমরা সকলেই চাই বন্ধুর সঙ্গে শ্রীতি লগ্ন্য সাহচর্য বরদ-রমতা। তোমার বড় টাকাই থাকুক, বন্ধু বিহনে টাকার সুখভোগ কেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কাছে ব্যর্থতা ঘটছে, নৈরাস্ত ঘটছে,—এমন অবস্থায় বন্ধু-সাহচর্যে সাহায্য একেবারে মুখড়ে পড়ে না—মনে বল পায়—কাছে আবার উৎসাহ জাগে। যে-সাহায্য বল, হিংসাপরায়ণ, আর্থগর বা পরজীভাতর, তার পক্ষে বন্ধুত্ব-রক্ষা অসম্ভব। দে-সাহায্যের জীবন হয় সুখহীন একান্ত নিঃশব্দ।

এমন সাহায্য অনেক আছে, নিজেদের দ্বারা সব বিষয়ে সকলের সেরা ভেবে আশ্র-প্রচারে সহজমুখ হয়, তাদের বন্ধু মেলে না—তার দয় হাতাশ্মব। He uses "I" too frequently and never gives any one else a chance to talk. এ সব সাহায্যকে কেউ পছন্দ করে না।

আমরা সকলেই চাই খ্যাতি-প্রতিপত্তি—চাই সকলে আমাদের মানবে। এ মনের ভাব যদি কারো বাক্য বা আচরণে আঘাত পায়, তাহলে সে-আঘাত যে দেবে, তার সঙ্গে সন্তাব থাকতে পারে না। কাছেই সমাজে বাস করতে হলে, পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইলে, আমাদের অসহিষ্ণু হলে চলবে না,—অপরের মত সহ্য করতে হবে। আমি যেমন চাই, সকলে আমাদের মানবে—সকলেই তেমনি চাইবে। এ সব ভেবে যদি সকলকে সহ্য করে, সকলের সঙ্গে আপোষ করে আমরা চলতে পারি, তাহলে সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব-রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং জীবনে বহু অশান্তির হাত থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবো।

উড়ো সাপ

মালয়-এশিয়া এবং সবদীপে এক জাতের সাপ আছে, সে সাপ ওড়ে। অথচ এ সাপের ডানা নেই! এ সাপ গিরিগুহার বা মাটির নীচে গহ্বরে থাকে না—এরা বাস করে গাছে। এ-পাছ থেকে ও-গাছে দাবার সময় দেহ দু'লিখে দু'লিখে সরু কিতাব মত করে, তারপর বাতাসে গা ভাসিয়ে দেয়। গাছ থেকে সোজা নীচে নামতে পারে না—গাছেব গা জড়িয়ে জড়িয়ে এঁকে-বঁেকে নামে। ব্রুটেন এবং আমেরিকায় এ সাপ নিয়ে দাবার মন্ত অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। তার কারণ, আহাকে এ সাপকে দু'তিন দিনের বেশী বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

ভয় নাই !

ঐশ্বরকল্পচন্দ্র বসু

১

ছোট নৌকাটা তিড়িং তিড়িং করে গাড়ের জলে নাচছিল,—তোলকের তালে নাচ-পাশল মাগুতালী ঘেঁষে নাকের নোলকের মত দুলে দুলে।

পিচকালো আঁধার রাত। ঘোর অমাবস্যা—ভায় আকাশে গাড় মেঘ। বিছাতের চমক, ঝড়ের পমক ও বজ্রের ধমকে মনে চমক লাগে !

বর্ষার জল-জমা মজা নদীটা মলে থৈ থৈ ! ঝড়ের দাপটে ওলট-পালট ঢেউ ওঠায়, নৌকার আরোহী কেন, বুড়ো মাস্তিও ভয়ে কাঠ হয়েছিল। দাঁতকপাটি লাগা বাকি। সে কুতে-ধরা মাল্লবের মত ভীত ধরে বলল, “বীউ-উ !” আতঙ্কে একটা ব ল্প হয়ে দুটো উঁতে দাঁড়াল !

ভয় পাবার কথা বটে। অন্ধকার লেগা আকাশ থেকে সবগুলো তারা লোপ পেয়েছে। মিটমিট চোখে তাকাবার সাহস না থাকায়, তারা কপাট বন্ধ করে আছে !

পারে বাঁশের ঝোড়, তেঁতুল, গাছ ও তালগাছের হয়ে-গড়া মাথার পাখীর কান্নার শব্দ,—আর পাতার ফাঁকে আতঙ্কর দীর্ঘশ্বাস !

কুনো মাঝি নৌকা নাম্বাতে পারছিল না। আকাশের কুনো ঝপ বেধে ভয়ে চূপ ঘেঁষেছিল।

নৌকার ছইয়ের মধ্যে দুটি বাত্মী। তাদের তরঙ্গা টিমটিমে একটা ছারিকেনের বাতি। ঝড়ের দাপটে টিকে থাকার জন্য তা আতিপাতি আঁড়াল ধোঁষে।

একটি বাত্মী ভীতধরে বলে, “বাতি নেভার আগে ডাকায় তিড়িও মাস্তি।”

মাস্তি তাক্সা গলায় বলে, “ডাকায় ! বলেন কি বীউ ?”

“ভূবে মরব নাকি ?”

“আর ঘাড় মটকাতো ওরা যে ডাকায় ওতপেতে আছেন ! চিতে নেবেনি, নাক পেতে শোকেন। গুণিটে কুতুড়ে মাস্তি। হুঁথানে ওঁদের আত্মনা। চড়কের গাজন। গাঁজা টেনে আসব জমান। ভয়ে কেউ এদিক মড়ান না। খালি আত্মারে পথকান্না হয়ে এগেছি। বাব, বাব !”

“কিন্তু অদেখা কুতের হাতে মরার চেয়ে, দেখা কুতের সঙ্গে লড়ে মরা ভাল ! ডাকায় তিড়িও। ঝড়ো কুতের দাপট বেধেছ ?”

পারে শেয়াল, ফেউ, কুতুর ও অচেনা পশু-পাখীর বিন্দুতে ডাক শোনা গেল। বাগের ঘাড়ের-ঘাড়, আর কিঁকির কিঁ-কি ধরানো শব্দ।

মাকি বোজা-গলায় বলল, “ওনেছেন বাউ ? ঐধের গলা !”

“ওনেছি। কিন্তু জলে ডোবার চেয়ে ওদের গলাধরে ডাকার ওঠা ভাল।”

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোর একটা পোড়োমন্দির বেধা গেল।—“ঐখানে ভিড়াও মাকি।”

“কি বে বলেন বাউ ! ওটা ডাকাতের কালীমন্দির। অসাবিত্রী বাতে হাঙীকাঠে মাহুঘ বলি দিবে, ওরা বক্তের টিপ পাবে। তারপর ডাকাতিতে বেবোয়। আর মরাগুলো স্বত্বকাটা কৃত হয়ে গাছে থাকেন। শোনেন গাছে গাছে ঐধের নিঃবাসের আওয়াজ। ওরা বাড়ি মটকান !”

“মরা-মাহুঘ আত্মর বাড়ি মটকায় ! কিন্তু আগে কড়ের হাত থেকে বাড়ি বাঁচাই ত ! নৌকা ভিড়াও।”

তবু মাকি ইতস্ততঃ করে। কিন্তু সাঁই সাঁই দীর্ঘবাসের মত একটা জোর ঝপটা হঠাৎ নৌকাটা ডাকায় ঠেলে দেয়। কড়কড় শব্দে কোথাও বাজ পড়ে। মাকি আত্মনাক করে ওঠে, “ওরা বাউ !” সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে, ল্যাম্প হাতে ওরা পোড়োমন্দিরে ছুটে যায়। অগত্যা মাকিও ‘রাম, রাম’ করে শব্দ ছোট্টে।

২

বিদ্যুজ্বলকে বেধা বায়, ঘন বনজঙ্গলের আড়ালে পোড়ো মন্দিরটা ধ্বংসের অপেক্ষায় আছে।

বালি চূনের আন্তর খসে ইউ বেরিয়ে পড়েছে। স্থানে স্থানে মত্ত ফটল। সেখানে বট অশ্বের শেকড়। ছাগে ও কামিশে বাহুড়, চামচিকে, পৈতা,—মেঝের কোণায় সাপ-খোপ, শেয়াল।

বিনা-আত্মসে ভবিদ্যারী পেয়ে তারা আত্মবীরের মত তা ব্যবহার করছে। দুর্গন্ধে ভিড়ান তারা।

মাহুঘের শব্দ পেয়ে, ভয় ও বিরক্তির চাপাশব্দ করে, তাদের কতক বেহিয়ে যায়। মাকি কিস্কিসিয়ে বলে, “ঐধের গন্ধ আর শব্দ পেলেন বাউ ?”

“ছুনি বলায় শেলায়। ওরা চলে গেল, ভাল হল। আরও নিশ্চিন্তে থাকব।”

মাকি মাথা নেড়ে বলল, “উহঁ বাউ। ওরা বাবার অন্ত বান নি,—কোয় অন্ত গেলেন। শ্রুণান থেকে সাকপাখ নিয়ে আগবেন। রাম, রাম—”

“তা বতকণ না কেরে থাকি। তারপর ভিঠতে না পারলে চলে যাব।”

“কিন্তু পারতেন না বাউ। একবার এলে এখান থেকে বেরনো যায় না। সুমীরের কামড়—”

“জাও জান !” ঠাট্টা করে খালি বলা, আর অগ্নি ক ন-কাটানো শব্দ হ’ল,—হা হা হা হা—হো হো হো হো—হি হি হি হি !

অট্টহাসিতে পোড়োহন্দিরের ভিত অবধি কেঁপে উঠল। ভীত মাঝির মুখে ‘রাম, রাম’ শোনা গেল, ‘আম, আম !’

যাক্সিরাও হকচকিয়ে উঠল। অতক্ষণ মুখে মুখে ঘটই বীরপনা করুক, এবার ভেবে পায় না এই দুর্গোৎ-ভরা গভীর অন্ধকার রাতে, নির্জন পোড়োহন্দিরে, যাহুঘের কাঠের এই বিকট হাসি কুতূহে ছাড়া কি হতে পারে ?

মাঝির দাঁতকপাটি লাগল। যাক্সিও ভয় পায়নি, তা নয়। তবু সহযাত্রীকে ভরসা দিয়ে বলল, “ভয় নাই রামচন্দ্র ? তোমার নামেই কৃত ভয়ে পালায়।”

কিন্তু কৃত পালাল না। দুম্বাম্, বুইখাই শব্দ করে ঘোর জানালা ধুলে গেল, এবং ল্যাম্পের গায়ে এনে পড়ল গুচ্ছের ঢিল-পাটেকল ও হাড়গোড়। সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখানো ধোনাশ্বর শোনা গেল,—

“হাউ মাউ কাউ, মানুষের গন্ধ পাউ,—

তিনটে বুকি আউ ? হাড় মট্কে খাউ।—”

হঠাৎ একটা হাড়ের ঢিল লেগে ল্যাম্পটা ছিটকে পড়ল। তারপর দপদপ করে জ্বলে নিবে গেল। অন্ধকার গিলে ধরল,—আর ঘরের আনাচে-কানাচে শুক হল কটা কঙ্কালের বুসু-বুসু নাচ,—চটাপট্ হাতভালি ও কেনেস্তার পেটানো কান-কাটানো বুনুনি !

মাঝি “আম, আম” বগ ছেড়ে নিবুস হল। রামচন্দ্র হুত নিজের নাম বগ্ছিল। তার সবী আগ্রাণ নাহলে চেতনা বজায় রেখে, টর্ট জ্বালাল। জোরাল টর্টের আলোয় দেখা গেল, বীভৎস চেহারার কটা কালো কঙ্কাল ঘরের মধ্যে ঘূবুঘু করেছে। চোখের খোঁড়লে মনি নেই, লেগা পৌছা নাক, কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, আঙ্গুলে হুঁচাল নখ। কোনওটার বিকৃত মুখ, কোনওটা নককাটা ! ..

টর্টের আলো জ্বালতে ওরা মিলিয়ে গেল। কিন্তু বাইরে শুক করল অট্টহাসি, নৃত্য ও ধোনাঘরে কান-কাটান চীৎকার।...

অন্ধকারে উপহ্রব বাড়ে,—টর্চের আলোর কমে,—এ যেন হাওয়া-আফিসের তাপ-মাণার যন্ত্র! ঘাঘুয়ে ওঠা-নামা করে। কিন্তু টর্চ জ্বলে যেখে তার পরমাণু নেবান চলে না। ভূতের তোলায় আরও কি উপহ্রব আছে কে জানে?

তা চলছে চলছেই। মন্দিরের ছাদে গড়গড় শব্দ, দেয়ালে ছুম্‌ছুম আওয়াজ,—মড়ার খুলি ও হাড় বৃষ্টি,—আর সৃষ্টি ছাড়া কারা ও জানোয়ারের ডাক!

হয়ত তারপর মুখোমুখি এসে ঘাড় মটকালো।

ভূতের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ের কার্যনা মাছুষের রণ-শাস্ত্রে লেখা নেই। কিন্তু টর্চ জ্বালাতে পালিয়ে যায় এমন লক্ষ্যবর্তী ভূত বলে রক্ষা। ওরা মুখোমুখি লড়াই না সে অসুমান করে, বাত্মী তার সহবাত্মীকে বলল, “রামচন্দ্র, রাত কি শেষ হল? পাখীর শিশু শোনা গেল।”

রামচন্দ্র কান খাড়া করে শুনে বলল, “শিশু নয়, সিটি। দেখব?”

“দেখ।”

“আপনি একা থাকবেন?”

“একা কোথায়? দোসর ত আছে।”

“মাকি বেহঁস হয়ে আছে।”

“হঁস থাকলে ও দোসর হত না।”

তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতে, রামচন্দ্র কোমরে হাত দিবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

তখন ঝড় খেমে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি ধামেমি। ধামেমি ভূতের অনাসৃষ্টি উপহ্রব। সেই কিস্ত ভূতদের উদ্দেশ্যে বাত্মী বলল, “রাত্তা ভুলে নাড়ানাবুন হয়ে, তোমাদের আড়ানার মাথা গুঁজেছি। ঝড়-বৃষ্টি ধাম্‌লে চলে যাব। কাম্‌জেই—”

কিন্তু এই অসুযোগে ভূতের মহয়ত্নে ধাক্কা দিল না। হয়ত দিল মাছুষের ভূতত্ব,—এবং ভূতুড়ে আওয়াজ চাপিয়ে, হঠাৎ মাছুষের ভয়াক্ত শব্দ শোনা গেল,—“পুলিশ, পুলিশ,—পালা, পালা!”

বৃষ্টির খুমঝুমি ভেদ করে পুলিশের তীব্র হুইশিল শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভারী জুতোর ও ‘ধর ধর’ শব্দ। বাত্মী টর্চ জ্বলে বাইরে এসে দেখল, সত্যি—পুলিশ পোড়ো মন্দির ঘেঁষাও করেছে। আর বিদ্যুটে চেহারার ভূতগুলো জ্বলে আটক-পড়া মাছের মত পালাবার জন্য দাশাদাশি করেছে। কিন্তু শব্দ জ্বল ও পোড়ো জ্বলে। তাদের কাঁচিয়ে ধরা হচ্ছে।

বাত্মী এগিয়ে গেল। শোষাক-পর্য পুলিশের দারোগা দীনেশ হত তাকে সালাট করে বলল, “ঝড়ের রাপটে আমাদের দু নৌকা ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সত্য। তারপর অন্ধকারে পথ ভুল করে এ বিপত্তি।”

বাঁত্রীটি আসলে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টার বিদ্যুৎ বর্মণ।

স্পাই (শুশ্রূচর)-এর মুখে নোটবালের আসামীর সংবাদ পেয়ে, থানা-পুলিশের সাহায্যে তিনি থানাত্তরামী ও আসামী ধরার বস্ত্র বেয়িয়েছিলেন। কথা ছিল তিনি আঙ বেড়ে, আরও কিছু গোপন তথ্য লেবে নেবেন। কিন্তু পথে ঝড় উঠে প্রান ভেঙে যায়।

দীনেশ বস্ত্র বললেন, “আপনি এথিকে কোথাও আছেন অজ্ঞান করেই হইশিল দিয়েছিলেন। আপনি তা শুনে বায়চক্রকে পাঠান। তার কাছে সব শুনি।”

বিদ্যুৎ বর্মণ বললেন, “ওদের ছেকে ধরে ভাল করেছ,—নৈলে পালাত। ভূত সেজে পোড়ো মন্দির ভুতুড়ে করার পেছনে নিশ্চয় রহস্ত আছে। মনে হয়, এ স্থান ওদের আত্মনা থানাত্তরামী করা দরকার। সঙ্গে সাক্ষী আছে ?”

“আছে স্তব্ধ।”

ভূতগুলোকে সেপাইর জিয়ার দিয়ে তাঁরা সার্চ শুরু করলেন।

৪

পোড়ো মন্দির সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না। দেখা গেল, ওরা কিছু ইট-পাটকেল, মড়ার খুলি ও হাড় জড় করে বেখেছিল। তা দিয়ে ওরা নিবীহ বাঁত্রীদের ভয় দেখায়। কিন্তু পুলিশকে নিজেরা ভয় পায়। ‘শ্রুতোর চোটে বাবা বলার’ কবিতাটি ওরা মনেপ্রাণে জানে।

পোড়ো মন্দিরের পেছনে গাছ-গাছড়ার আবডালে, মাটির নীচে একটা খুপ রী ছিল। বাইয়ে থেকে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু পুলিশের চাপে পড়ে ওরা দেখিয়ে দিল। দেখামে পাওয়া গেল ভাল নোট তৈরী করার বস্ত্রপাতি ও উপকরণ। ছাঁচ, কেরিকেল লোশন, ঠোড, স্পিরিট, কাগজ, কাঁচি,—আর সযাপ্ত ও অর্ধসযাপ্ত কিছু ভাল নোট।

সাক্ষীর হোকাবিলার সার্চ করে সে সব হেপাঙতে নেওয়া হল।

জিহাসাবাদের সময় ওদের ভূতের পোষাক ছাড়তে দেখা গেল, তাদের মধ্যে বাঁত্রী করেদী ভূতনাথ কর্মকার আছে। নোট জালের অপরাধে জেল খেটে, সে কিছুকাল হল রেয়িয়ে এসেছে।

বিদ্যুৎ বর্মণ তাকে চিনতে পেরে বললেন, “কি গো ভূতনাথ, এবার সত্যিকার ভূত সেজেছ ! তুমি খালস পাবার আগে জেলখানায় দেখা করেছিলেন। কিরা কেটে বলেছিলে নোট ভাল করার করার অর্থ্য ছেড়ে এবার সংভাবে জাত-ব্যবসা করবে। কিন্তু সে কথা ভাঙলে ! ভাল কাবিরগর তুমি, অনায়াসে সংদার চালাতে পারতে। অথচ ভূতগ্রন্থ হয়ে ভূতের ব্যবসা ধরলে !”

হাতেনাতে ধরা পড়ে ভূতনাথ মাথা হেঁট করে বলল, “ছেলেবেলা হুশিকা পাই নি, লেখাপড়া

করিনি স্ত্রী। কুদশে মিশে কাঁধে বন্ধেরালের কৃত চেপে আছে। নাবাতে পারি না। তাই সম্ভাবে রোজগারের চেয়ে, ঝাঁকি দিয়ে জোচ্ছুরি করে, কামাই করার ঝোঁক। ভেবেছিলেম, কৃত ভেবে পুলিশ এখানে হান্না দেবে না। কিন্তু—

বিদ্যুৎ বর্ষণ বললেন, “চোর, জোচ্ছোর, হারমান (জলদস্যু) যেখানেই থাক, পুলিশের হান্না দিতে মানা নেই,—সে কথা জানা ছিল না? পুলিশ যে কৃতের ওয়া।”

কৃতনাথ মাথা চুলকাই। বিদ্যুৎ বর্ষণ বললেন, “এখনো কাঁধ থেকে কৃত নাবাও। পরিবার আছে,—তাদের কাছে, পড়শীর কাছে সম্মান ভাল, না অসম্মান ভাল?” সে চুপ করে থাকে।

বিদ্যুৎ বর্ষণ রয়াকর দস্যু, জগাই-মাধাই ও এরি সব লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, “ভাল হবার চেষ্টা কর, তা’হলেই কৃত নাববে। তুমি ত বাংলা লেখাপড়া জান। জেলখানার লাইব্রেরী থেকে ভাল বই পড়, ভাল দৃষ্টান্ত নাব,—দেখবে ভাল হওয়া শুরু নয়।”

হারধর নয়, গালমন্দ নয়, মিষ্টিমাখা মুখভরা ইষ্ট কথা!

কৃতনাথ রাগি হয়।

৫

পোড়ো মন্দিরে কৃত ধরার সংবাদ ‘গুজব-মহারাজ’ ইতিমধ্যে আশপাশে ঢাক-ঢোল শিটিয়ে প্রচার করেছিল। তাতে রং চং মেখে ছড়াল,—মাশুণো, স্বস্তিকাটা, শাকচুরি, ব্রহ্মপতি প্রভৃতি নানা-জাতের কৃত সত্যি সত্যি ধরা পড়েছে! তদ্রম্য, কৃতকৃতকের গোবে নয়,—পুলিশ দক্ষরমত লড়ে ধরেছে।

পুলিশের হেঁকাবতে কৃত ধাধা তরলার কথা। তাই গাঁয়ের মোড়ল নির্ভর ভড় সবাইকে জাঁক করে বলে, “কৃতের ভয়ে কুপোকাত হ’তে নেই। চল দেখে আসি। ভয় নেই,—আসি আছি।”

ভরসা পেয়ে, তার সঙ্গে সবাই পায়দলে হেলেছুলে চলে। হাতে লাঠি,—তবু কাছে এসে নির্ভয়ের বুক টিপ্‌টিপ্‌ করে। তবু গল্লীদের তরলার দিয়ে বলে, “ভয় নেই।”

কিন্তু কৃত দেখে ওরা নিরাশ হয়। অগেখা কৃতের উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে মিল নেই,—নেই চেহারা, চালচলনে। কাঠালের আমসম নর,—এ বেন আমের আমসম।—

নির্ভর ভড় মুখভরা হাতবন্দী করে, “দূর দূর—এগুলো কৃতের মুখে চুনকালি দিয়েছে। ছাগলকে ঘোড়া, আর বেড়ালকে বাঘ বলে চালানোর মত এগুলোকে কৃত বলা! কৃত আসি অনেক দেখেছি। ভয় নাই,—দেখ।”

সবাই এগিয়ে দেখে। কুন্তের সাইনে কুতনাথ কর্মকার আর প্রেতনাথ চর্মকারকে দেখে নাক সিঁটকায়।—

নির্ভর ভাবে, ভবু মচকায় না। সে তাদের পিঠে করে এনেছে।

উণ্টো স্ববে বলে, “ভয় নেই, কুন্তেরা দিনে চেনালোকের ভেতর ধরে। রাতে অচেনা মূর্তি ধরে ভয় দেখায়। আমি আছি,—ভয় নেই।” কিন্তু নিজেকে পিড়িয়ে যায়। কারণ, নকলগুলো ধরা পড়েছে, আসল আছে লুকিয়ে।...

পুলিশ কুতল্লোকে নোকায় তুলে চলে যায়। আর “ভয় বলে নেই” নির্ভর ভদ্র কুতুড়ে মন্দিরের হাতার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আসল কুন্তের হাত পা কত বড় কে জানে?...

মত্তবড় ছুটো শকুন ভানার ঝাপট মেবে হঠাৎ মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে বলে। কি কারণে তাদের ঝগড়াঝাটি, ছোটোপুটি লাগে। আর এ সময়ে একটা হুমুকা হাওয়া বিস্ফোট করে। পোড়ো মন্দিরের মড়বড়ে প্রকাণ্ড চূড়োটা ভয়ংকর শব্দ করে ভেঙে পড়ে।

নির্ভর ভদ্র ভদ্রকে গিয়ে, “বাংবাবে” বলে, সবাইকে ফেলে বাইরে ছোটো!

সবাই প্রসন্ন করে, “কি হল?” কি না হল, মনের এই প্রশ্ন নির্ভর নির্ভুল ভাবে গোপন করে। ছুটতে ছুটতে বলে, “ভয় নেই,—আমি আছি। দৌড়ে শরীর ভাল করছি। ইচ্ছা আছে যেসে নাম শোব।”

হয়ত অপরোক্ষ সে ইচ্ছা হয়। তাবাণ্ড শিছু ছোটো। কিন্তু নির্ভরের মরণ-দৌড়ের সঙ্গে সমান ভাল বাধতে পারে না। তার মনে ‘সামান, সামান’ ভাব।—মুখ তিরিয়ে বলে, “ভয় নেই।”—কাছের একটা গাং গাছের পাতার ফাঁকে ক্যাপা হাওয়ার শব্দ হয়, “ভয় নেই” তাতে নির্ভর ভদ্র ভয় পেয়ে আরও ছোটো। এই আশ্বাসে তার মোটেই বিশ্বাস নেই! ভয় নেই মানে ভয়সা নেই!—

ধর্মগুরুর প্রাসাদভবন

যোবে পোপের বাসভবনের নাম ভেটিকান। পোপ হলেন পৃথিবীর বড় ক্যাথলিক মতাবলম্বী ঐষ্টান আছেন, তাঁদের ধর্মগুরু। ভেটিকান প্রকাণ্ড প্রাসাদ। পৃথিবীতে এত বড় ভবন কোন সম্রাটেরই নেই। ভেটিকানে ছোট-বড়-মাঝারি ধরনের ঘরের সংখ্যা হলো এগারো হাজার। সিঁড়ি আছে ২০৮ প্রস্থ—বড় বড় উঠানের সংখ্যা ২০টি। ভেটিকানের লাইব্রেরীতে শিল্পকর্ম আর বড় বড় বিখ্যাত বইয়ের পাণ্ডুলিপি বস আছে—পৃথিবীর কোন লাইব্রেরীতে তার মিকিও নেই।

— কেটে সর্দার

শ্রীমুদ্রিত ত্রিপাঠী

কেটে সর্দারের নাম শুনেলে পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই একটু হুঁচকিয়ে যায়। তোমরা হয়তো ভাবছো না জানি কেটে সর্দার কি ভীষণাকার। ইয়া বড় এক জোড়া গৌড়, লম্বা-চওড়া দু'দিকেই বেশ তাগড়াই, বংটা কালো কুচকুচে। আর ঐ অবয়বের ভেতর লাল লাল ভাঁটার মত দুটো চোখ। পাকা সর্দারদের দেহের রূপটা অনেকটা এরকম হ'লেও আমাদের কেটে সর্দারের ঠিক ও ধরনের মূর্তি নয়। তার গৌড়ও নেই, পেন্থাও নেইও নেই। চোখ দুটো ছোট ছোট দুই মিতে ভরা। রোগা লিকলিকে। বংটা আধ-ময়লা। আর বরগটা ভোমাধেবই মত।

এ ছেন কেটে সর্দারের একটা ছোটখাটো দল ছিল। গোর, হাঙ্গা, বাবু, খোকন এরা তো সর্দারকে রীতিমত ভজা করতো। কেটেসার অহমতি ছাড়া তারা কোনও কাজেই হাত দিত না। তারা জানে কেটেসার চেহারা না থাকলে কি হবে, মাথা আছে। বিপদে উদ্ধার করতে কেটেসার জোড়া মেলা তার। কেটেসার কথা না শুনে একবার তারা কি বিপদেই না পড়েছিল। বাবু, মনে হলে গাটা শিউরে উঠে! রাগেদের পালোয়ান দারোয়ানের হাতে সেদিন প্রাণটা সবার বেতে বসেছিলো আর কি! ভাগ্যিস কেটে এসে হাজির; নতুবা মরে ছুত হয়ে যেত। সেদিন থেকে ওরা কেটেসার কথা ছাড়া এক পাও নড়ে না। সর্দার কেটেও দলের মত না নিয়ে কোন কাজেই হাত দেয় না।

সেদিন দুপুর বেলা গোরা আর হাঙ্গা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির। কেটেসার পায়ের তলার লুটিয়ে বললে—কেটেসার বন্ধা কর। এ অপমান আমরা সহ্য করবো না—কিছুতেই না। কেটেসার আসল ঘটনাটা জানতে চাইলে হাঙ্গা ব্যাপারটা বলতে বাচ্ছিল, গোরা তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বললে—থাম্ থাম্ আমিই বলছি। আসল ব্যাপারটা কি জানো কেটেসার—দুপুর বেলা ওরা সবাই ককীরবাবুর বাগানে ঢুকেছিল—পাকা পেয়াবার লোভ সামলাতে না পেয়ে। নির্জন দুপুরে ওরা আপন মনে একটার পর একটা পেয়াবার ধ্বন কাষড় দিচ্ছে, সেই সময় শুনেলো একটা ভীষণ হুসার—কোন ছার। তাকিয়ে দেখে, ককীরবাবুর রামলোচন পাড়ে বইনি হাতের নিয়ে তাকিয়ে আছে। কাঁধে তার ইয়া মোটা একটা ভড়ি বাঁশের লাঠি। বুঝতেই পারছো, ওদের তখন মনের অবস্থা! তারপরের ঘটনাটা বলতে গিয়ে গোরা তো প্রায় কেঁদেই ফেললো। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বললো—জানো কেটেসার, পাছের উপর থেকে সবাইকে নামিয়ে এনে রামলোচন কি অপমানটাই না করল। নিজেকে দুটো কান ধরে রামলোচনের পায়ের কাছে সবাইকে ওঠাবোস করতে হয়েছে। তারপর ব্যাটা বলে কি জান—কিন্তু কতি অ্যাঁরা তো টাং

চাড়া ছিল একটা করে কাগজের ঠোঁট। তাবছা কি মজা—নিশ্চয়ই গুগুলোর ভেতর খাবার কিছু আছে। কিন্তু যা তাবছা তা নয়। ওর ভেতর রয়েছে বিছুটি। বিছুটি কখনও গায়ে লেগেছে তোমাদের? তা'হলে বুঝতে এর কি জালা। সবাই ধখন প্রস্তুত, তখন কেউ রঙনা হওয়ার হুকুম দিল। সংকেত-বৃচ্চক আওয়াজ হল পকেটের 'টব' বিভলভারটা দিয়ে—হানা যেটা গত পূজোতে একে উপহার দিয়েছিল। পোরা একটু হেসে ভিজেন করেছিল, কেউনা তোমার এ বিভলভারটা আবার কি কাজে লাগবে? গভীর সর্দার কেউলালের মুখ দিয়ে শোনা গেল—চলনা যেখানে পাবি।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঠিক ঘনিষে আসেনি। কেউ সর্দারের দলবল পাঁচিল টপকিয়ে হাজির হল বাগানে। পাকা পাকা পেয়ারা চোখে পড়তেই সবাই গিয়ে উঠল গাছটাতে। গাছের উপর বসে কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে কেউ। দলের সর্দার সে—হার-জিত নির্ভর করছে যে তারই উপর।

এদিকে ওদের হাণ্ডাপিতে ওদিকে রামলোচন টের পেয়েছে। বেচারার রামলোচন! চাপরা জেলার অজ গায়ে জ্বল। বুদ্ধিতে সে ভতখানি ধড় নয়, বতখানি লাঠি ঘুরোনোতে। রামলোচন পাকা ঘোচে তা-মিতে মিতে হাজির হল দোআ ওদের সামনে শিয়ারা গাছটার তলায়। অন্ধকারে কাউকে সে সঠিক চিনতে পারল না; তার উপর সবার মুখে মূর্খোণ লাগানো।

পালোয়ারী কারলায় রামলোচন লাঠিটা ঘুরিয়ে হকার ছাড়ল—কোন হার? আর ওদিকে পটলা, সেই পাকা ওটার পটলা, খুব টেনে টেনে বল—তুহুকে। বম হার। এই না বলে সবাই হো হো করে সে কি হাসি! রামলোচন বেগে লাল। লাঠিটা কেল সে গাছের ভালটা ধরে উঠতে যাবে এমন সময় সর্দার কেউ বীশিতে ছু দিল। আর বার কোথা! দশ বায়োটা কাগজের ঠোঁট উপুড় হয়ে তার উপর পড়ল। বেচারার রামলোচনের তখন সে কি অবস্থা! গাছের তলায় তখন রীতিমত তাণ্ডব নৃত্য। এই কাকে সবাই গাছ থেকে নেবে ঘিরে দাঁড়াল রামলোচনকে। বেচারার রামলোচন সাবাদিয়ে মাছুব। গায়ের জলুনিতে তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। সর্দার কেউ পকেটের বিভলভারটা হাতে নিয়ে ধমক দিয়ে বলল—তুই সেদিন এদের অপমান করেছিলি তাই না? রামলোচন আনজা-আনজা করে বলল—হী, বাবুজী।

তারপর কি হ'ল জান? রামলোচন হাত ঝোড় করে সবার কাছে ক্ষমা চাইল। কেউ বিভলভারটা যেখে তার চোখ তো ছানাবড়া। কেউর গায়ের তলায় লুটিয়ে বলে—হাক, কিজিয়ে বাবুজী। হার আইসা কতি নাহি করুণা।

তারপর দলবল নিয়ে বিজয়ী সর্দার একেবারে আমার কাছে হাজির। কোচড় থেকে পাকা পেয়ারা হাতে দিয়ে বলে—জান সতুয়া, রামলোচনটাকে আজ ভারী অব করেছি। বেচারার একেবারে ভালমাছুব। আমারে গোবর্ধনটার মত সহজ, সরল। একেবারে খাটি—ভেজালের বাইরে।

* রিপ ভ্যান উইঙ্কল *

‘সন্ধানী’

[উয়াশিটন আর্ডি আমেরিকার একজন বিখ্যাত গল্প লেখক। যেটির মত লিখিত ‘Rip Van Winkle’ গল্পটি বিখ্যাত হয়ে আছে। যেলেবুডা সবাই এই অদ্ভুত ঘূনের গল্প শাড়ে মুগ্ধ হয়। এখানে এই বিখ্যাত গল্পটির খগানস্বয় সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হোল]

আমেরিকা তখন ইংল্যান্ডের অধীন। রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে একজন সাধাসিদে বোকা কুড়ে চাবী আমেরিকার একটি গ্রামে বাস করতো। রিপ তার বাবার সব বকম অভ্যাসই পেয়েছিল—বিশেষতঃ কুড়েরি আর ময়লা কাপড় পরে থাকা। রিপের একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি কুড়ে কুকুর; কুকুরটি সব সময়ে তার পিছনে পিছনে ঘুরতো। রিপের স্ত্রী দুজনকেই তাদের কুড়েরির মত ঘৃণা করতো এবং একেবারে দেখতে পারতো না।

শরৎকালের একটি সুন্দর দিনে স্ত্রীর বহুনির জালায় অস্থির হয়ে রিপ তার সঙ্গী কুকুরকে নিয়ে সেই অঞ্চলের ক্যাটসকিল নামের এক পাহাড়ে বেড়াতে চলে গেল। দূর থেকে হঠাৎ দেখতে পেল, একটা অদ্ভুত চেহারার লোক শক্ত একটা পিপে ঘাড়ে করে, ভারে মত্ত হয়ে, কোন বকমে পাহাড়ের উপরে উঠছে। অদ্ভুত লোকটি রিপকে ইঙ্গিত করে এই ভারী স্কিনিসটা নিয়ে উঠবার মত সাহায্য করতে বললে। রিপ তৎক্ষণাৎ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে নীরবে তাকে সাহায্য করলে। তারপর রিপ পাহাড়ের চূড়ার উঠে বাজ-পড়া আওয়াজের মত একটা গুরুগম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। তারপর একটা গুহার ভিতর দিয়ে গিয়ে তারা দুজনে একটা গোলাকার স্থানে এসে উপস্থিত হোল।

আবও আশ্চর্য ব্যাপার! এই খোলা গোলাকার জায়গায় একদল অদ্ভুত চেহারার লোক Nine Pins খেলছে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হোল সে মলের কর্তা। তাদের লম্বা কাপড় বেশ বাহারী—মাথায় মন্ত টুপি ও তার উপরে পালক দেওয়া। কিন্তু সকলেই নির্বাক ও গুপ্তচর! Nine Pins বল খেলার আওয়াজ ছাড়া সেখানে কোন শব্দই নাই। সেই শব্দ আবার পাহাড়ের গায়ে থাকা লেগে চারিদিকে বাজপড়ার মত একটা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছিল। এবারে রিপের সঙ্গী পিপে থেকে বড় বড় পাত্রে জলীয় পদার্থ ঢেলে সবাইকে খেতে দিল—কিন্তু সবুই নীরবে এবং পান করা শেষ হয়ে গেলে তারা আবার খেলতে আরম্ভ করলে। সকলেই খেলায় ব্যস্ত, তার দিকে তখন কেউই দেখছে না। এই হযোগে রিপ পিপে থেকে ঢালা ঐ পানীয় বেশ ভাল করে খেয়ে নিল।

সবাইকেই তো সে আগে চিনতো। এই সব অশরিত্ত লোকদের পোশাক-পরিচ্ছন্ন অদ্ভুত রকমের। অবাক হয়ে সে নিজের দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। আরও আশ্চর্য ব্যাপার! দাড়িটা তার এক ছুট লম্বা হয়ে গিয়েছে।

এখন সে নিজের গায়ের মধ্যে ঢুকলো। চারদিকে অশরিত্ত ছেলেমেয়ে, নতুন নতুন বাড়ী, আর নতুন মানারকম কুকুর। এটা কি তারই পুরোনো গাঁ?—এই কথাই সে বার বার ভাবতে লাগলো। কিন্তু সেই পুরোনো পাহাড় আর নদী তো ঠিকই আছে।

নিজের বাড়ীর কাছে এসে সে দেখে, বাড়ীটা ভরাবহাণ পড়পড় হয়ে আছে। ছান্দটা তো একেবারেই পড়ে গিয়েছে। ছান্দা নাই, দরজাও নাই। খুলে খুলে। পাশের একটা সরাইখানাতে সে ঢুকে পড়লো। পূর্বে এই সরাইখানার প্রবেশ ঘরে ইংলণ্ডের রাজা জর্জের ছবি টাঙ্গানো ছিল—তার স্থানে এখন আমেরিকার প্রথম সভাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি! রাজস্বও তাহলে বরলে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

এদিকে তার পিছনে অনেক লোকজন জুটে গিয়েছে। এ লোকটা কে?—তার। সবাই পরস্পর জিজ্ঞাসা করছে। ঠাণ্ডা যেহাঙ্গে রিপ লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলে, তার পাড়াপড়শীদের সঙ্গে দেখা করতে সে এসেছে। তাদের সঙ্গে তো এই সরাইখানার বসে বরাবর গল্প কোরতো! তার বন্ধুদের নাম সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো। বুড়ো লোকেরা তখন উত্তর দিলে, তারা তো সবাই কবে মরে গিয়েছে; সে কি আজকের কথা?

শেষে হতাশ হয়ে থাকতে না পেরে রিপ চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদের মধ্যে কেউ কি 'রিপ ভ্যান উইঙ্কলের' নাম শুনেছ?

হুইল্ডন বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলো, হাঁ, হাঁ শুনেছি বইকি! ঐ দেখ, আর এক রিপ ঐ গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিকই তো। লোকটা অবিকল তারই মত দেখতে; তারই ছেলে, আর তারই মত অদ্ভুত পোশাকপরা! বুড়ো রিপ কিন্তু নিজের ছেলেকে চিনতে পারলো না, অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো।

ঠিক এই সময়ে একটা মেয়ে বৃদ্ধ রিপকে দেখবার অন্তে লোকজনকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট বাচ্চাকে বললে—কেনো না, রিপ চূপ কর, বুড়োকে দেখে তুমি পাবার কিছু নেই। বুড়ো রিপ তখন মেয়েটিকে তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে। মেয়েটি হুঃখিত হয়ে বললে, তার বাবার নাম ছিল রিপ ভ্যান উইঙ্কল; কুড়ি বছর হোল বাবা কোথায় অনুজ হয়ে গেলেন, আর ফিরে আসেন নি; তার কুকুরটাই কেবল ফিরে এগেছিল। আমি তখন খুবই ছোট।

“তোমার মা কোথায় ?”

“ভিনি তো কিছুদিন আগেই মাঝা গিয়েছেন”—মেয়ে বললে।

“আমিই তোমার বাবা—আমার নাম রিপ ত্যান উইকল।”

রিপ ত্যান উইকলের অদ্ভুত ঘুম—কুড়ি বছর পরে আর এই নিদ্রা! ভব! সহস্র জিনিষটা গুদাট-পালট হয়ে গিয়েছে। দেশে স্বাধীনতা এসেছে; ইংরেজ আমল এখন আর নাই।

লোকোত্তর বিধানচন্দ্র

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অতিথ্য কি করলো গ্রহণ

মৃত্যু তোমার ঘারে ?

প্রাণ দিলে কি ভাই তুমি সেই

অতিথি-সংকারে !

সকিত বা হ্রদয়মাঝে

সর্বকালের ধন—

মুহূর্তে ভাই করলে কি গো

তারেই সমর্পণ !

জন্মদিনের মাঙ্গলিক আর

গুণভোজ্যময় বাণী ;

শক্তিলীমার বন্দীদশায়

সইলো মনের গ্রানি ।

এখন শুধু সত্য তোমার

কর্মযোগের পথ ;

যে পথ দিয়ে ছুটলো কালের

বিশ্ববিজয় রথ ।

আবদ্ধ যঃ পুণ্য তোমার

স্মৃতির সূত্র মাঝে

ব্যাগু তা হোক চিন্তে মোদের

নানান কর্ম-কাজে ।

সত্য-সেবা-কর্ম-ত্যাগের

মূর্ত প্রতীক তুমি ;

ধন্য করে অক্ষিদানে

এ দীন চিন্তভূমি ।

আদর্শে আজ পূর্ণ তুমি

দাঁড়াও পুরোভাগে ;

শিখাও যাতে দেশের প্রতি

মমত্ববোধ জাগে ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বেলা ১২টার মতোই খুল বাড়ীর প্রকাণ্ড মাঠটা দর্শকদের ঘারা ছেয়ে গেছে। চারপাশের আট-দশখানা গা থেকে স্পোর্টস্ দেখতে এসেছে। এদের অধিকাংশই বালক, কিশোর আর যুবক। আর আধ ঘণ্টা পরেই স্পোর্টস্ শুরু হবে।

চারদিকে হৈ চৈ শুরু হোল। বেলা দেখবার ক্ষেত্রে সকলেই অধীর।

কিছু পরেই পেটা-ঘড়ির কয়েকটা ঘণ্টাধরনির সঙ্গে স্পোর্টস্ শুরু হোল।

শুরুতে স্পোর্টস্-মেক্রেটারী—মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলে গেলেন। তার পরই বেলা আরম্ভ হোল। প্রথমে হাই-জাম্প, লং-জাম্প প্রভৃতি অনেক কিছুই হোল। তারপর সাইকেল-রেসও হোল। তারপর শোটুর্নের দলের চারজনকে দৌড়। প্রথমেই ওদের Arithmetic Race। চারজনকে জিতে তিন তিন চারটে গুণ অঙ্ক কাগজে লিখে, ভাঁজ করে রাখা হোল। এই ভাঁজ-করা কাগজ চারখানা ও তার সঙ্গে চারটে পেনসিল,—এ-দিককার প্রান্তস্থিত পোষ্টের কাছে পাশাপাশি রাখা হোল। ওরা চারজনও পাশাপাশি এক লাইনে দাঁড়ালো। তারপর ওয়ান-টু-থ্রী বলতেই, ওরা প্রত্যেকেই এক-একখানা কাগজের ভাঁজ খুলে, সেই কাগজে লেখা অঙ্ক কষতে শুরু করলে এবং কখনো হোয়ে গেলে, কাগজখানা হাতে নিয়ে, ও-প্রান্তের পোষ্টের দিকে ছুটেতে লাগলো। অঙ্ক

যাও যেটিক হবে, তার তার। ঠিক উত্তর লিখে যে আগে পৌঁছবে, সেই ফার্ট, তারপর যে পৌঁছবে, সে সেকেন্ড। পোন্টু প্রথমেই পৌঁছে গেল এবং তার অঞ্চল হাইট। হুত্তরাং এ-বেসে পোন্টুই ফার্ট প্রাইজ পাবার অধিকারী হোল। ফার্ট প্রাইজ ছিল—গৌরীশঙ্কর দে'র একখানা এরিথমেটিক। সেকেন্ড প্রাইজও ছিল ঐক্লপ অঙ্কেই একখানা বই। তবে অল্প লেখকেরও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে।

এর পর গনৈরো মিনিট বিজ্ঞামাঙ্কে আবার গুণের দৌড়। এবার Egg and Spoon Race। মানে একটা মাকারি আকারের Desert চামচের মধ্যে একটা হাঁপের ভিন্ন বাধা হবে। এক হাতে সেই চামচের কাণ্ডল বসে ছুটতে হবে, অঞ্চ চামচ থেকে ভিন্নটা পড়বে না। অন্য হাত বা অন্য হাতের কোন আঙ্গুল ডিমের গুণ রাখা চলবে না। এ বেলে খুব মতর্ক হোয়ে ছুটতে হয়, একটু অস্বমনয় বা অন্তর্ক হোলেই ভিন্ন চামচ থেকে গড়ে বাবার গুণ। বাই হোক, ঠিক সময় হোলে, চামচের মধ্যে ভিন্ন বেধে চারজন ছুটলো। কিন্তু একটুখানি যেতে না যেতেই, গুণের মধ্যে একজনের ভিন্ন চামচ থেকে মাটিতে পোড়ে ভেঙ্গে গেল। ডিমের ভেতরের অংশটা সেখানে পোড়ে ছত্রাকার হোয়ে গেল। কিশোর-বর্শকদের তেতর থেকে কে-একজন বলে উঠলো—“ভেঙ্গে গেছে ক্যাল।” মাক-বরাবর বাবার পর, আরো একজনের ঐ অবস্থা হোল। হুত্তরাং গুণ দু'জনেই হেরে গেল। বাকী দু'জনের মধ্যে পোন্টু একজন। ব্যাপার দেখে এরা দু'জন খুব সাংখ্যানে ছুটতে লাগলো। মন—চোটার দিকে ততটা নয়, বতটা ডিমের দিকে। ছোটার বেগে ভিন্নটা না পোড়ে যায়। এবার নরেশ নামে ছেলটি ফার্ট হোল। পোন্টু হোল—সেকেন্ড। সেকেন্ড ত সে হবেই, তাড়াতাড়ি কোরে ভিন্ন ভাঙবার দরকারই বা কি। সেকেন্ড প্রাইজ ছিল—একটা কাউন্টেন পেন। ও দেটা পেন।

এইবার Shirt Race। এটা বর্শকদের কাছে আরো মজার লাগবে।

গনৈরো মিনিট পরে পেটা-ঘড়ির ঘন্টা পড়তেই, গুণ চারজন লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। মাঠের মাঝ-বরাবর একই দায়িত পানাপানি পর পর চাঁটে কাগজের প্যাকেট রাখা হোল। প্যাকেট-গুলোর মুখ আঠা দিয়ে ঝাঁটা। প্রত্যেক প্যাকেটের মধ্যে একইরকম ছিটের এবং মাপের একটা কোরে শার্ট আছে। দৌড়ে গিরে, ঐ প্যাকেট ছিঁড়ে শার্টটা বাব করে পায়ে পরতে হবে; তারপর আবার ছুটতে হবে সেই শার্ট পোরে।

গয়ান—টু—খী! ছুটলো চারজন। বর্শকদের মনের মধ্যে একটা আনন্দ-উত্তেজনা আর ঢাকল। ওরা ছুটছে—ছুটছে। ছুটতে-ছুটতে চারজনে প্রায় একসঙ্গেই মধ্যস্থলে এসে পড়লো। তারপর প্রত্যেকেই তার সারমেকার প্যাকেটটা তুলে নিয়ে, খুব তাড়াতাড়ি প্যাকেটের কাগজটা

হিঁড়ে কেসে লাগলো। একজন ভাড়াভাড়ি করতে গিয়ে, কাগজের সঙ্গে আমাটাওই খানিকটা হিঁড়ে কেসে। সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের মধ্যে একটা হাসির বোল পড়ে গেল। সে সেই ছেঁড়া আমাটাই কোন রকমে গায়ে পরে ছুটলো। ছুটলো বটে, কিন্তু তার উৎসাহটা খেন অনেকটা কমে গেল। তবে ছুটছে সকলেই। শোরে কাছে পৌঁছতে আর বেশী দেরি নেই, প্রায় এসে পড়েছে। একটি ছেলে এবার এখনো ফাট' আছে, পোন্টু শেকেও। কিন্তু পোন্টুর একবারের কাছাকাছি এসে, পোন্টু হঠাৎ খেন তার 'মোশন' বিগুন বাড়িয়ে দিয়ে, চক্কর নিয়ে তাকে পেছনে কেসে ফাট' হোয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই চারদিক থেকে হাততালি বেজে উঠলো। এ রেসটার ফাট' গ্রাইজ ছিল—পাঁচ টাকা দামের একখানা Anglo-Bengali Dictionary। সেটা পোন্টুই পেলো। তার চোখে-মুখে আনন্দের ঢোয়ার বইতে লাগলো। অপরিচিত হোলেও, দর্শকদের ভেতর থেকে অনেকেই তার কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। সকলেরই মুখে পলাশরঞ্জন—পলাশরঞ্জন!

একটি ছেলে সেই ভিড় ঠেলে এসে, পেছন থেকে ছ'হাত দিয়ে পোন্টুর চোখ দুটো চেপে ধরল। পোন্টু বললে—“ভাছ!”

কিন্তু ভাছ নয়। সকলে তাকে ঘিরে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার পোন্টু বললে—“সাছ”।

কিন্তু তা'ও নয়।

“পটীন!”—না।

“বোন্ডু!”—না। তখন চোখ ছেঁড়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে যে তার দামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে পোন্টু অবীর আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—“নারাণ! তুই? আমি যে তোরা কাছেই বাচ্ছি। তুই এখানে কি কোরে?”

বিষয়ের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়ে নারাণ বললে—“তুই এখানে কি কোরে এলি, আগে তাই বল”—বলতে-বলতে নারাণ আনন্দের আতিশয্যে পোন্টুকে জড়িয়ে ধরলো। পোন্টু তখন সংক্ষেপে সমস্ত কথা প্রাণের বন্ধুকে বললে। শেষে বললে—“এঁদের বর্তাবাবু কাল বলছিলেন, ‘পলাশনে’ তোদের কে-বেন কুটুপ আছেন।”

“আমার দিদির ত বগুর বাড়ী এখানে। এখান থেকে চরনপুর মোটে কোশ ছুই-আড়াই পথ। বাবাও মাঝে-মাঝেই এখানে দিদির বাড়ী আসেন। এবার বাবার সঙ্গে আমিও এলুম। চ' এখন আমার সঙ্গে; তোকে হঠাৎ দেখে বাবা চমকে বাবে।”

পোন্টুর মন অত্যন্ত লাফিয়ে উঠলো। তার ইচ্ছে হোতে লাগলো, এই ঘণ্টাই সে ছুটে গিয়ে নারাণের বাবাকে চমকে দেয়। কিন্তু তার মনের ইচ্ছে পূর্ণ হোল না। সমস্ত শুনে, দিলীপ বললো—

"আজ কি তোমার আমরা ছেড়ে দিতে পারি তাই? বাবেই ত, দুটো দিন আমাদের বাড়ী থাকো।" কিন্তু নারায়ণের আর দেরি হয় না, সে পোন্টুকে নিয়ে বাবার জন্তে অত্যন্ত ছিদ্র করতে লাগলো। তার আগ্রহ দেখে দিলীপ বললে—"আজ ত ওর যাওয়া হোতেই পারে না। আমরকের দিনটা ও আমাদের এবানো থাক, কাল সকালেই তোমাদের বাড়ী একে একজন লোক দিয়ে পৌঁছে দেব।"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করলে—"সকালে কখন?"

"বেলা ন'টার মধ্যেই।"

পোন্টু, কোন কথা না বোলে চূপ করে রইলো। নারায়ণও আর বেশী পেড়াপিড়ী করতে পারলে না; একটু অগ্রসরচিহ্নে সে চলে গেল। বাবার সময় পোন্টুকে বার বার ক'রে বোলে গেল—"কাল ন'টার নব্র, আটটার মধ্যেই চলে বাবি, বুঝলি? আমি বাবাকে গিয়ে সব কথা বলিগে। কখন? আটটার বেশী দেরি করিস নি যেন।"

নারায়ণ কি আর হির হোয়ে থাকতে পারে? হাত্রে তার ভালো ঘুমই হোল না। ভোরে উঠেই সে কেবলি ঘড়ি দেখতে লাগলো, কখন আটটা বাজে। শেষকালে সে আর আটটার অপেক্ষায় হির থাকতে পারলো না; তাবলো, ওরা আজ যদি ওকে আনতে না দেয়, কিংবা যদি বাওয়া-দাওয়ার পর দেই লক্ষ্যাবেলা ছাড়ে! না, তা কিছুতেই হবে না; আমি এখন গিয়ে ওকে নিয়ে আসবো। ওরা আসতে না দিলে আমি জোর করে আনিবো। শ্রুতযাং দাতটা বাজতে না-বাজতেই সে বায়-বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। এবং সেখানে গিয়ে, ওদের তাড়া দিয়ে, সে আটটার সময়ই পোন্টুকে নিয়ে ফিরলো।

নারায়ণের বাবা পোন্টুকে দেখে আনন্দে বিড়োর। নারায়ণের দিদি পোন্টুকে নিজের ছোট ভাই বোলে আমারে বৃকে জড়িয়ে ধরলেন। নারায়ণের দাদাবাবু, তাঁর বাবা, সকলেই পোন্টুকে গেরে মহা বন্দী! বাওয়া-দাওয়ার পর সকলের কাছে পোন্টু, তাঁর এই ক'দিনের পথ-চলার বিবরণ দিতে লাগলো। গোপাল-গীর মিস্ত্রির মশাই, সোনাতলীর ঘোষাল মশাই। কাইপাড়ার নন্দীবাড়ী—সকলের কথাই বললে। লক্ষ্মীনারায়ণপুরের মিল্লটাকুর, বাশখালির শমীরহা—কারো কবাই বলতে বাকী রাখলো না। পথে বে-সব জিনিস সে উপহার পেয়েছে, সেগুলোও সকলকে দেখালো।

পরের দিনই নারায়ণের বাবার চরনপুর চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তা' হোল না। নারায়ণের দিদি কিছুতেই সেদিন তাঁদের যেতে দিলেন না। পোন্টুকে হাত্রে একদিন কাছে রেখে তাঁর তৃপ্তি হবে না; আরো দুটো দিন থাকতে হবে। তাই হোল। হির হোল, বুধবার খেয়ে-

দেয়ে একটার সময় তাঁরা এখান থেকে রওনা হবেন। মহেশ বাগ্‌দীর গরুর গাড়ীপানা আগের দিন ঠিক কোরে রাখা হোল। ছইওলা গাড়ী।

বৃথবার।

মাঠের ওপর দিয়ে মহেশ বাগ্‌দীর গাড়ী, ছইয়ের মধ্যে ভিন্নটি আরোহীকে নিয়ে মন্থরগতিতে চলেছে। ধান উঠে গেছে, ফাঁকা মাঠ; মাঠের 'মিক্‌'য়ে পোড়ে গরু দুটো আপনিই চলেছে, তাড়াতে হচ্ছে না। বেলা অপরাহ্ন। শীতের দ্বান তখন তখন তার অতি-প্রিয় বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট, খেত-খামার, পথ-প্রান্তরকে, গাছ-পালা-বনানীকে রোজ-দ্বান করিয়ে, পশ্চিমের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো। মহেশ তার গরু দুটোকে উদ্দেশ্য কোরে বললে—“চল্ বাপধনবা—চল্, আর ত এনে পড়েছিন্; ঐ দামনেই ভো চন্নপুত্রের হাটভলা!” বলেই গলা ছেড়ে গান ধরলো—

ঐ যে ঐ মাঠের পারে,

জেওল গাছের বেড়ার ধারে,

ছোট্ট ঝুঁড়েখানি—

ও যে সাত-পুরুষের ভিটে আমার

দেয় গো হাতছানি।

ওরি ধুলোর বসি, দাঁড়াই, দিই গড়া-গড়ি,

ওরি কোলে ভর, যেন ওরি কোলেই মরি

ওই তো আমার কানী-গয়া,

দগ্‌গো বোলে ওকেই জানি।

সমাপ্ত

এমন কথা কখনো শুনেছ?

বিখ্যাত ফরাসী লেখক পীরের লোটিকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেন্স আর্কাডেমি অভিনন্দন দান করেছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—জীওনে আমি কখনো অপরের বই পড়িনি,—তার কারণ, আলস্ত আর ভয়। ভয়—পাছে অপরের লেখা পড়লে লিখতে সংকোচ বোধ করি।

জ্ঞানানুশীলন পথে

(অমৃতসর)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূবাণের সেই গল্পটি তোমরা নিশ্চয় পড়েছ—কিংবা মাঠাকুমানের মুখে শুনেছ। সেই গল্প—
তাতে একবার পীঠস্থান স্থপতির কথা আছে—যে কাহিনী কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ
অন্নদাহবলে আরও চমৎকার করে গুছিয়ে বলেছেন। আর একবার সংক্ষেপে সেটা বলছি।

একবার প্রজাপতি নক্ষ একটি বড় মত বজ্রের আয়োজন করে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই তিন
লোকের সম্মানীয় ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করলেন, শুধু নিমন্ত্রণ করলেন না তাঁর নিজের জায়গাই শিবকে।
প্রজাপতি নক্ষ ছিলেন খাটি আর্থ। শিব অনাধারদের সঙ্গে হেলামেশা করতেন বলে—শিবকে উনি
দেখতে পারতেন না। ভারতকৃষ্ণিতে অনাধার প্রাধান্য বিস্তৃত হোক এটা নক্ষের মত গোড়া
আর্থরা চাইতেন না। সুতরাং এই বজ্রকে উপলক্ষ্য করে শিবকে উনি বর্জন করলেন। কিন্তু নক্ষকল্পা
সতী—শিবের স্ত্রী—জিদ ধরলেন এই বজ্রে তিনি বাবেনই—নাই হোক নিমন্ত্রণ।...শিব প্রথমটা
দম্বতি দিলেন না। অবশেষে সতী জিদ ধরে দম্বতি আদায় করে পিত্রালয় গেলেন। ফল তার
ভাল হলো না। মেয়েকে পেখে নক্ষ তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। শক্ত শক্ত কথা বলে শিবকে
নিদা করতে লাগলেন। সতী পতিমিন্দা সহিতে না পেরে বজ্রহলে মুছিত হয়ে পড়লেন এবং
তাতেই ঠর মেহত্যাগ হ'ল। এই খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ শিব ছুটে এলেন তাঁর মাঝোপাধারদের নিয়ে।
শিবের অত্যাচারে বজ্রের জিনিষপত্র নষ্ট করে বজ্রকুণ্ড তেবেচুঁয়ে মুনি-ঋষিদের অপমান করে নক্ষকে
মেয়ে ফেললে। বজ্র পণ্ড হল। অতঃপর শোকরক্ত শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে ভুলে নিয়ে দেশে
দেশে ঘুরতে লাগলেন। এই বীভৎস দৃশ্য সহিতে পারল না ত্রিভুবনের লোক। তারা বিক্ষুব্ধ প্রতিকার
করতে বলল। বিষ্ণু তাঁর হৃদস্পন্দ চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে
ছড়িয়ে দিলেন। যে যে জায়গায় সতীর এই ছিন্ন দেহের অংশ পড়ল—সেই সেই জায়গা তীর্থভূমি
হয়ে উঠল। এই তীর্থস্থানগুলিকে বলা হয় পীঠস্থান। একাধিক জায়গায় সতী-অঙ্গ পড়েছিল বলে
একাধিক পীঠস্থান তৈরী হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যা অন্ধ আন্দাম পাঞ্জাব
মধ্য ও দক্ষিণপ্রদেশ, শুদ্ধরাট, হিমাচল প্রদেশ...কোথায় না রয়েছে এই পীঠস্থানগুলি! ভারতের
বাইরেও তিস্তেতে নেপালে বেলুচিস্থানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে বেবী-অঙ্গ পড়ে এক-একটি
পীঠস্থান গড়ে উঠেছে। সেই পৌরাণিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী এই

তীর্থস্থানগুলি দর্শন করে বেড়াচ্ছেন। ভক্তি ছাড়াও যারা এই স্থানগুলি দেখতে আসেন— ভারতবর্ষের বিচিত্র প্রকৃতি-রূপকে দেখার আনন্দেই হয়তো তাঁরা আসেন। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

এমন পীঠস্থান বাংলাতেও কয়েকটি আছে। ঘরের কাছে রয়েছে কাগীবাট। এখানে দেবীর ডান পায়ে চারটি আঙুল পড়েছিল। কিন্তু কাঁচের জিনিষ মাহুযকে সব সময়ে টেনে রাখে না বলে—মাহুয দূরে ছোটে। সেই আকর্ষণে আমরা সম্প্রতি গিড়েছিলাম পাঁজাবে, জালামুখীতে। এখানে দেবীর জিন্সা পড়েছিল। দেবীর নাম অম্বিকা-ভৈরব বটুকেশ্বর।

তীর্থ করার যত্ন বা স্মৃতি বাদে হয়নি, তারও এই জন্মব জায়গাটিতে এলে খুশি হবে।... পাহাড়-ঘেরা এই উপত্যকা-ভূমির নাম কাংড়া, এবং এই কাংড়া উপত্যকার একটি শহর হ'ল জালামুখী।

কলকাতা থেকে পাঠানকোট হয়ে এখানে আগতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ট্রেনে বাদে মিলিয়ে পুরোপুরি দু'টি দিন—দু'টি রাত। হাজার মাইলের উপর দূরত্ব। বড় রেলগাড়ী যার পাঠানকোট পর্যন্ত—তারপর ছোট লাইন। বাসও চলাচল করে। পাঠানকোট থেকে বাস যার—কান্দোরে, ভাগহোসীতে, চান্দার, কাংড়া ও কুলু উপত্যকার।

জুন মাস। পশ্চিম অকলে গ্রীষ্মের প্রভাপ বেটী। সারা দুপুর বেলা—এমন কি রাত্রি পর্যন্ত গরম হাওয়া অর্থাৎ 'দু' বয়। আমাদের গাড়ী যখন মোগলসরাইয়ে—বেলা ন'টা—সেই সময় থেকেই গরম হাওয়া বইতে শুরু করল। আর বেলা আড়াইটার যখন লক্ষ্যে পৌঁছলাম তখনকার অবস্থাটা অস্বাভাবিক হয়ে মাও। রোডের দাপটে তখন জাহি-জাহি ডাক ছাড়াই সবাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়—'জল হল শূন্য ও বিহীন জর্জর'। রাত দশটা পর্যন্ত ট্রেনের গরম কাঁচের আমরা ছটফট করেছি—তারপর কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

সকাল বেলায় গাড়ী এসে খামল জলদ্রব মিটিতে। এখানে... কান্দোর ও কাংড়া কুলুর বাজীর গাড়ী বদল করে। আমরা অমৃতদগের ঘাট বলে নামলাম না। বেলা ন'টার সময়ে আমরা পৌঁছলাম অমৃতদগের।

অমৃতদগের কথা তোমরা বইতে পড়েছ। এটা পাঁজাবের একটি বড় শহর এবং শিখদের বর্গ-মন্দিরের অত্যন্ত বিখ্যাত। সম্প্রতি আর একটি জিনিসের জন্য বিখ্যাত হয়েছে অমৃতদগ। সেটি হ'ল জালিনওয়ারাবাগ। এদর কথা পরে বলছি।

এখানে থাকবার জায়গার অভাব নেই। হোটেল আছে—ধর্মশালা আছে—ঘর ভাড়াও পাওয়া যায়। স্টেশনের সামনেই এক ফাল্ডের মধ্যে আছে তিনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধর্মশালা।

মন্দিৰেৰ কটো ভোলাৰ ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু চাৰিদিনক অঙ্ককাৰ কৰে তখন দুলাৰ বড় উঠেছে। এদেশে বলে আধি। হঠাৎ গৌত্ৰেৰ ডাণ্টা মেমে বাওয়াৰ আধিৰ দৃষ্ট ভালাই লাগছিল। এৰই মধ্যে ফোটা কতক বৃষ্টি পড়ে আবহাওয়া আৰও কিছু শিথল হ'ল। আমৰা অপেক্ষা কৰলাম—কড়টাকে এড়িয়ে বাবাৰ সন্ত।

বানিক পৰে ঝড়ৰ বেগ কমল এবং আকাশও কিছু পরিষ্কাৰ হ'ল—কটোও নেয়া গেল দু' একখানা। দুৰ্গা-মন্দিৰ থেকে বা'ৰ হয়ে আমাদের গাড়ী চলল জালিনওয়ালাবাগেৰ দিকে। জালিনওয়ালাবাগ ইংৰেজৰ একটি অখ্যাত কীৰ্ত্তিৰ সন্ত ইতিহাসে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰেছে। ইতিহাসে সে কাহিনী অবস্তাই তোমৰা অনেক পড়ে থাকবে।

১৯১৯ সালেৰ ঘটনা। তখন শৰাধীন ভাৰতবৰ্ষে ইংৰেজ শাসন চলছে পূৰ্ণ তেজ। সেই শাসনেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবাসীয়া জোৰ আন্দোলন কৰেছে। চাৰিদিনকে সভাসমিতি হচ্ছে—গৰম গৰম বক্তৃতা হচ্ছে—কাগজে কাগজে ইংৰেজ শাসনেৰ নিন্দা বা'ৰ হচ্ছে। ইংৰেজ তো ক্ষেপে আঙন। স্বৰোগ স্ববিধা মত এক একটি আইন বা'ৰ কৰেছে—বাতে ভাৰতবাসীয়া আন্দোলন কৰতে না পাৰে। এমনি একটি কুখ্যাত আইন হ'ল রাউলট আইন। সামান্য কিছু বিপ্লবীকে দমন কৰাৰ অছিলায় সমস্ত ভাৰতবাসীৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাভাৱিক আন্দোলনকে বৰ্ষ কৰাৰ ব্যবস্থা ৰইল এতে। সম্ভেহ মাত্ৰই সেই মাত্ৰকে গ্ৰেপ্তাৰ ও নিৰ্দামন, বিশেষ কোন অকলকে আইন ভেঙেৰ দায়ে শাস্তিদান কৰাৰ ব্যবস্থা—এই সব ছিল সেই আইনে। সারা ভাৰতবৰ্ষে প্ৰতিবাদেৰ বড় উঠল। কিন্তু সে সব গ্ৰাছ না কৰে কর্তৃপক্ষ আইন পাশ কৰিয়ে নিলেন ভোটৰ জোৰে।

এই আইনেৰ বিৰুদ্ধে চাৰিদিনকে হৰতাল ঘোষণা কৰা হ'ল। অমৃতসরেও হৰতাল হ'ল। হৰতালেৰ দিন জনতাৰ মিছিল যখন টেপনেৰ দিকে আগছিল—সেই সময় পুলিচ তাপেৰ উপৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে। জনতাও ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি সরকারী আগিৰ ও ব্যাক পুড়িয়ে দেয়। ফলে, সারা শহৰে সৈন্তদল যোতায়েন কৰল সরকার। সব বক্তব্য সভাসমিতি বন্ধ কৰে দিল। সভাসমিতি বন্ধ কৰাৰ হুকুমনাৰা জনসাধাৰণ জানিতে পাৰেনি। তাৰ পৰেৰ দিন ১০ই এপ্ৰিল দশহাজাৰ হিন্দু-মুসলমান ও শিখ মিলে জালিনওয়ালাবাগে এক সভা কৰল। এই প্ৰকাণ্ড উজানটি শহৰেৰ মাঝখানে। এব প্ৰাৰ চাৰিদিনে বাড়ী-ঘৰ—ঘেৰিকে দোকান-পসার, ঘন বসতি মাহুবেৰ—সেই দিকে মাত্ৰ একটি প্ৰবেশ-পথ ছিল। আৰু আৰও দু'টি প্ৰবেশ-পথ তৈৰী হৰেছে—তখনকাৰ দিনে এই একটি মাত্ৰ পথই ছিল আগা-বাওয়াৰ সন্ত। দশ হাজাৰ মাত্ৰেৰে বিয়াট সভা আৰম্ভ হচ্ছে খবৰ পেয়ে ইংৰেজ সেনাপতি ভাৱাৰ সাহেব তাঁৰ সৈন্তদাৰস্ত কামান বন্দুক নিয়ে সেই আগম-নিৰ্গমেৰ পথটি অবরোধ কৰে নিরস্ত জনতাৰ উপৰ গুলি ছোড়াৰ আদেশ দিল। রক্তগৰা বয়ে গেল উজানেৰ

আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম মন্দির-প্রাঙ্গণে।

প্রায় সন্ধ্যাবেলায় আমরা মন্দির থেকে বার হলাম। গাড়োরান আমাদের আর একটি ভায়গার নিয়ে চলল। বলল—কোম্পানীর বাগান। নাম শুনে মনে হয়নি—দেটা দেখবার মত কিছু হবে। কিন্তু গাড়ী যখন বাগানের মধ্যে ঢুকল—বিশাল আকৃতির কতকগুলি বনস্পতিকে ঘেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। গাছগুলির নাম বলতে পারব না—কিন্তু তাদের শৃঙ্খলি এমন মোটা যে তিন চারজন মানুষ হাত ধরাধরি করে আঁকড়ে ধরতে পারবে না। আবার উচ্চতায় সেগুলি এক-একটি মহামেটের মত। আর বাগানটিও অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। আধে মাইল তো বটেই। মাঝখানে গাড়ী চলাচলের জন্য পীচ-বীধানো রাস্তা। এক-একটা সুবিশিষ্ট অংশকে ঘিরে অনেকগুলি গাড়ী চলা পথ। ঘলে গাড়ী থেকে না নেমেও সারা-বাগান দেখার অসুবিধা হয় না। আবার নামা জাতের ফুলগাছের কেয়ারি—ঐ লন যদি না থাকতো—যদি মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য আসন কিংবা ছেলেরের জন্য দোলনা প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে এটিকে অন্যায়সে অরণ্য বলা চলত। দূর থেকে বড় বড় গাছগুলোর ঘন মাথা দেখলে এদিকটা অরণ্য বলেই ভ্রম হবে। এই বাগানের মাঝখানে বেশ বড় ইমারত রয়েছে—কোন সবদারী দপ্তরই হবে হয়তো।

সব মিলিয়ে অমৃতসর বেশ বড় শহরই! কলকাতার সঙ্গে একে তুলনা করলে ভুল হবে—কলকাতার মত শহর ক'টিই বা আছে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের এক-একটি প্রান্তের এক-একটি রাজ্যের রূপ নিয়ে এক-একটি শহর। সেখানকার বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, ঘান-বাহন, হোকান-পদার, মানুষ-জন সব মিলিয়ে চেহারাটাই আলাদা। আলাদা চেহারার বলেই সব শহরই নতুন। দূর-দূরান্তের এই সব শহর দেখে মনে হয় ভারতবর্ষ কি বিশাল আর কত বৈচিত্র্যে ভরা এর মাটি, প্রকৃতি আর মানুষ। এই সব দেখার কৌতূহল কার মনেই বা জাগে না, এবং এই সব দেখে আনন্দ পায় না এমন মানুষই বা ক'জন আছে!

ভারতে প্রথম রেলওয়ে

ইংরেজরা বাংলাদেশে যখন প্রথম রেল চলাচলের ব্যবস্থা করেছিল, তখন রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড টিফেনসন বাংলাদেশে রেলের প্রথম এজেন্ট বা বড়কর্তা নিযুক্ত হন। প্রথম যখন হাওড়া থেকে পাণ্ডুরা পর্যন্ত রেল চলাচল আরম্ভ হয়, তখন দু'খানি মাত্র ট্রেন ছিল। একখানি সকালে ও আর একখানি বিকালের দিকে ছাড়ত। কখন যে ট্রেন পাণ্ডুরায় পৌঁছবে তার নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। মাত্র আটখানি বগি থাকত ঐ ট্রেনে। রাত্রে ট্রেন চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

শরীরের জন্যে জল

ডাক্তার

শরীর ধারণের ক্ষেত্রে যেমন খাদ্যের আবশ্যক হয়, তেমনি কিছু পরিমাণ জলেবও প্রয়োজন হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে গড়ে শতকরা ৭০ ভাগ জল আছে।

রক্ত, রস প্রভৃতি শরীরের তরল পদার্থের মধ্যে জলের ভাগই বেশী। শরীরের পেশী, চর্ম, তন্তু, মেরু এবং মস্তিষ্ক, বন্ধু, প্রীতি প্রভৃতিগুলির মধ্যে, এমন কি অত্যন্ত কঠিন হাড়ের মধ্যেও জল পরিমাণ জল থাকে। এই জল আমাদের প্রধান, ঘাম, মলমূত্রের সঙ্গে অনবরত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

শরীরের মধ্যে জলের অভাব আমরা টের পাই তেঁটা গেলে, এবং তা আমরা পূরণ করে থাকি, ঠাণ্ডা জল, দুধ, চা, কফি প্রভৃতি জলীয় পদার্থ পান করে। মাছ, মাংস, রুটি, ভাত-ডাল প্রভৃতি যে সব কঠিন খাদ্য আমরা খেয়ে থাকি, তাদের মধ্যেও সামান্য পরিমাণে জল থাকে। এই ভাবে নানা উপায়ে প্রয়োজন মত শরীর রক্ষার জন্য আমরা জল সংগ্রহ করে থাকি।

আমাদের শরীরের মধ্যে যে রক্ত আছে তাকে তরল করার ক্ষেত্রে জলের বিশেষ প্রয়োজন হয়। রক্ত গাঢ় হয়ে থাকলে তা শিয়ার ভেতর দিয়ে অবাধে বাতায়িত করতে পারে না, এবং তা না পারার জন্য শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে পড়ে এবং তাতে নানারকম রোগ দেখা দেয়।

খাদ্যকে পরিপাক করার জন্যও জলের বিশেষ প্রয়োজন।

খাদ্য নরম না হলে তার উপর বিভিন্ন পাচক-রসের ক্রিয়া ঠিকমত প্রকাশ পায় না এবং জীর্ণ খাদ্য ঠিকমত তরল না হলে তা থেকে রক্ত লহুজে তৈরি হয়ে শরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না।

জল কঠিন খাদ্যকে কোমল ও তরল করে পরিপাকের ব্যাপারেও সাহায্য করে এবং রক্তের সঙ্গে মেশবারও উপযোগী করে।

নিজা যে সব খাদ্য আমরা খাই, তার মধ্যে যে সব অংশ জীর্ণ হয় না, সেই সব অংশ এবং শরীর থেকে উৎপন্ন অন্ত্রীয় দূষিত পদার্থ শরীর থেকে ঘাম বা মলমূত্রের সঙ্গে বের করে দেবার ব্যাপারেও জলের বিশেষ প্রয়োজন।

অতএব তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যাহ জল বেশী করে খাবে, তবে এটাও দেখবে যে, সে জল যেন স্বচ্ছ, নির্মল ও পানের উপযুক্ত হয়।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর গুণ

এক যে ছিল বুড়ো—

খেতো সে রোজ তিমির চাইনি দিয়ে পাঠার মুড়ো ।

পাটের মত চুলের ঝোপে রাজহংসের বাসা,—

পেতো সে ডিম. দুধের মত বাচ্চা খাসা খাসা ।

দাড়ির ডালে মৌমাছির গড়তো মধুর চাক.

ঝরতো মধু গলায়-বাঁধা পাত্রে পেলেই ঝাঁক ।

নাকে লোটন পায়রা হুঁটো ডাকতো সারাক্ষণ,

কানে ফুটতো গোলাপটাঁপা মাতিয়ে সবার মন ।

চষা গায়ে হতো মিহিজেয়াৎস্নাতুলোর চাব,

গল্প বলতো ছেলের দলে, খেলতো দাবা তাস ।

সবাই তাকে ডাকতো, ‘আদিবুড়ো’,—

হাসলে ঝরতো মুখ থেকে তার মিছরি-চিনির গুঁড়ো ।

এক যে ছিল বুড়ি—

রোদের কাঁথায় নকশা কাটায় ছিল না তার জুড়ি ।

মাথায় কাশের বনে লোনা হাওয়ার চুলোচুলি,

ঘুমের ঘোরে ডাকতো নাকে খেয়ালী বুলবুলি ।

পুষতো ঘরে খরগোশ মেঘ, কাঠবেরালি নদী,—

তারার বড়ি দিতো রাত্রে ঘুম পালাতো যদি ।

নখের আয়েনা থেকে ঠিকরে পড়তো টাঁদের হাসি,

আঙুলগুলো হঠাৎ বেজে উঠতো হ’য়ে বাঁশি ।

সারা শরীর ভ’রে ফুটতো জ্যোৎস্নাফেনাকুল,

ছড়া কেটে করতো ফেরি পুতুল পুঁতি তুল ।

সবাই তাকে ডাকতো, ‘আদিবুড়ি’,—



কোথা থেকে যে কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এ-সংসারে সব ঘটনার কারণ খুঁজতে গেলে আজ ঘেন অবাঁক হয়ে যেতে হয়, সেদিনও তেমনি হতো। আর সে তো তন্ত্র-মহের যুগ। সব ইংরেজরা আদা হুক করেছে। বাণ ঘেরে গাছ পুড়িয়ে বেওয়া, মাছের নেরে ফেলা থেকে হুক করে জড়ি-বুটি দিয়ে অহুস সারানো পর্যন্ত সবই পুরোদমে চলছে। এক-একটা দেশ ঘেন এক-একটা বীপ। বীপের চারদিকে সংস্কার আর অভ্যাসের বেড়া, সেই বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে মাছঘের সমাজে ঢোকাও কারো সাধ্য ছিল না। নবাবীপের একটা নিজস্ব সংস্কার ছিল, তেমনি ছিল বর্ধমানের, তেমনি ছিল বীরভূমের। কোথায় কত দূরে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে নতুন বিজ্ঞানের আলো আগছে, তা এ-দেশের মাছ সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথমে বড় ভয় করতো। ভাবতো কবিবাহী আর হাকমী দাঁওয়াই খেয়েই অহুস সারিয়ে ফেলবে। তারপর আছে মা-মঙ্গলচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, শেতলা, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর। জলপড়া, চালপড়ার যুগ তখন। পরমা ছিল না মাছঘের হাতে কিন্তু বাঁবার ছিল, চাল ভাল মাছ মাংস ছিল অতেন। বাবার ভাবনা যখন নেই তখন বৈঠকখানায় বসে আরাম করে তামাক খেয়ে দিন কাটিয়ে দাও। সারাদিন পুহুরের ধারে বসে মাছ ধরো, ভগ্ন-ময় নিয়ে মাথা ঘামাও, ভূত-পেড়া নিয়ে আড্ডা লম্বাও।

এ শুধু গরানহাটি নয়, তারতবার্ণের সমস্ত গ্রামেই এই রকম। হঠাৎ কোথাও শোনা যায় একটা বাঘের উপহাস হুক হয়েছে, কেউ তাকে হারতে পারে না, ধরতে পারে না। তারপর কাঁদ পাতা হয়, তাতেও ধরা পড়ে না। শেষে তন্ত্র-মহের জোরে কেমন করে কোথায় বাঘ নিকড়েশ হয়ে যায়। এই রকম কত বহু আছে বাঘ-ধরার। বন্দুকের গুলিতে যে-বাঘকে মারা যায় না, সেই বাঘ ধরা পড়ে মহুর টান। হুন্দর বন অকলে আজও ধারা শিকার করতে যায় তারা বাবা দক্ষিণ-রায়ের পুছো দিয়ে প্রদাস খায়। বাঘ-মারী ময় পড়ে। বাঘের দেবতাই হলো বাবা-দক্ষিণ-রায়ে।

দুর্নিবারণে যখন বড়ঘরের জাল পাতা হচ্ছে মিরাভউল্লোলার চারিদিকে কিরীসীরা যখন নবাবের অগ্রমতি না নিয়ে কলকাতায় কেলা বানাতে হুক কবে দিয়েছে, নবাবীপে যখন বেড়া-বেড়ীরা মহানন্দে কণ্ঠবদল করতে ব্যস্ত, সারা বাংলা দেশ যখন বর্গীর উৎপাত থেকে রেহাই পেয়ে শাস্তির চেষ্টায় আকাশের গ্রন্থ-মক্ষত্রের দিকে চেয়ে আছে, তখন গরাণহাটিতে আর এক উৎপাত হুক হলো। বাঘ! গরাণহাটিতে বাঘের উদয় হলো হঠাৎ!

বুড়োরা বলে—এতদিন এখানে আছি, বাঘের উৎপাত তো কোথাও হয়নি গা—

বাঁড়জে মশাই—এর বৈঠকখানায় চক্রবর্তী কথটা তুললে।

বললে—জনেছেন কর্তামশাই, গরাণহাটিতে বাঘ এসেছে?

বাঁড়জে মশাই বললে—পাঁচুর কাছে শুনেছিলাম—

পাঁচু হলো ভীক-হরকরা। কাঠির মাথায় ঘুড়ুর বেঁধে লখা-লখা পাড়ি দেয়। সে দেখেছে। জঙ্গলের মধ্যে ডোরা-কাটা গা, চূপ করে বসেছিল। দেখেই পাঁচু একশো হাত ছিটকে পালিয়েছে।

এই রকম আরো অনেক ঘটনা শোনা যেতে লাগলো দিনের পর দিন।

বাঁড়জে মশাই বললেন—নিবারণকে একবার ডাকতে পাঠাও তো, অনেকদিন আসেনি, সে এর একটা বিহিত করুক।

মুকুন্দ লাঠি নিয়ে দৌড়লো। নিবারণের বাড়ি গিয়ে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে গয়লা-বউ বেরিয়ে এল।

বললে—কাকে খুঁজচো গা?

—আরে সাধুবাবা, কর্তাবাবু জেকেছেন সাধুবাবাকে—

গয়লা বউ বললে—নিবারণ নেই বাছা, বেরিয়েছে—

—বেরিয়েছে তো কোথায় বেরিয়েছে? কখন ফিরবে?

গয়লা বউ বললে—কখন ফিরবে, তবে ফিরবে, তা কিছু বলে যায়নি বাপু—কোথায় বেরিয়েছে তাও জানি নে সোজা-সাক জবাব। মুকুন্দ ফিরে গেল।

বাবার সম্মুখ বলে গেল—এলে হুড়ুর কাছে বেতে বলে দিও—

—তা বলবো।

সত্যিই গয়লা বউও জানে না কোথায় গেছে নিবারণ। এই কদিন আগে বেশ সংসারী হয়ে উঠেছিল। সংসার ধর্ম করতো। জরীদার বাড়ি থেকে সিঁথে এলেছে ভাবে ভাবে। সে তো এখনও আসছে। তবে রাস্তিবে মশানে-মশানে ঘুরতো। তা সে ফোঁ কাঁজই ছিল তার।

তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার পর থেকেই সবাই বেন ভাবনার পড়েছে। নিবারণ থাকলে এই বাঘ এমনি করে গরগহাটিতে ঢুকতে পারে।

বেলা চার প্রহরের সময় আবার মুসুম এল। জিজ্ঞেস করলে—কই গো, সাধুবা! এয়েছে ?
গয়লা বউ রাগা করতে করতেই জবাব দিলে—না গো না—

সারা দিনই এমনি। কতবার বে জমিদার-বাড়ি থেকে লোক ডাকতে এল তার ঠিক নেই, এতোক বারই ফিরে গেল মুসুম। কাছারিতে গিয়ে বললে—দজুর কেরেনি সাধুবা—

বাঁড়ুজে মশাই বললেন—কী ব্যাপার হলো বলো তো চক্রবর্তী, এমন তো হয় না, কোথায় গেছে বলেও বায়নি, তাহলে কি আবার সারিসী হয়ে গেল নাকি ? আবার হিমালয়-পাহাড়ে চলে গেল ?

গয়লা-বউও বার বার জিজ্ঞেস করে গঙ্গামণিকে—হ্যাঁ রে, ছেলে কোথায় গেল ? আসে না কেন ?

গঙ্গামণি উত্তর দেয়—আমি জানি নে—

—তা শেষ কখন ছিল বাড়িতে ?

—রাত্তিরে সাহুবাটা শ্রমানে গিয়েছিল পুজো করতে, তারপর আর কেরেনি—

—তা একটু খোঁজ-খবর কর ! আমিই না-হয় জিজ্ঞেস করি সবাইকে, আমাদেরও তো বলবি ? আমি ভাবছি মশিরাবাঘে না কোথায় জমিদারবাবু কাষে গেছে—

তারপর থেকেই বলতে গেলে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো সত্যিকারের। বাঁড়ুজে মশাইও তাঁর এলাকায় খবর পাঠালেন। কোথাও নেই, মশিরাবাঘেই যদি বা গিয়ে থাকে, তাই সেখানকার সুহরিকেও লিখে পাঠালেন। সেখানেও নেই উত্তর এল। কোথাও নেই নিবারণ।

চক্রবর্তী বললে—এ তাহলে আর দেখতে হবে না, নির্ধাত হিমালয়ে চলে গেছে বাবাকী—
একে একে সবাই ধরে নিলে নিবারণ সংসার করতে শুরু করেছিল বটে, কিন্তু ঠাক পেয়েই আবার হিমালয়ে চলে গিয়েছে, আর কিরবে না সে ! এখন কত লোক আছে, সংসার করতে তাদের ভাল লাগে না। জোর করে তারা সংসারে থাকে। কিন্তু সবাই কি নিবারণের মত মারার বাঁধন কাটতে পারে। সবাই কি এমন করে নিবারণের মত পরকালের কথা ভাবে। নিবারণ খাটি সাধু। খাটি সাধু বলেই সংসারে তাপ টিকলো না। বাঁড়ুজে মশাই-এর এত আবেগেও তার মনের ক্ষিধে মিটলো না। সে ছেলে-বউ-এর মাথায় আটকে রইল না। মহাপুঙ্খ বটে !

বাঁড়ুজে মশাই মক্শিন-পাড় একটা পুকুর কেটে দিচ্ছিলেন, সেই পুকুরের ঘল সবাই দরবে। তিনি সেই পুকুরের নাম দিয়েছিলেন—নিবারণ দিঘী।

নিবারণ-দিবীতে জল তুলতে এসে পাড়ার বৌঝিরা নিবারণের কথা বলে। গঙ্গামণির কথা বলে। নিবারণের ছেলে ভ্রামাণ্যর কথা বলে। আঁহা গো, এমন লক্ষী বৌ, এমন মুল্লর ফুটফুটে কোলের ছেলেটাকে ফেলে কেউ বনে চলে যেতে পারে? বুক কেটে দায় না গো!

পাড়ার লোক গঙ্গামণিকে দেখে চোখের জল ক্লে।

বলে—তুমি দিখির দিধুর মুছো না বাছা, তোমার মোহাঙ্গী বেঁচে আছে, কেন মুছতে বাবে? তুমি বাছ বাবে, মুহুর ভাল বাবে, পেঁছাঙ্গ বাবে, হাতে শাখা-নেয়ো পরবে—

গঙ্গামণির মুখখানা তার-তার। কারোর দলে আর তেমন করে কথা বলে না আগের মত। আগের বেশ হাসি-খুসী ছিল। নিবারণ ফিরে আসার পর যখন ছেলে হলো জমিদারবাণী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন। নিবারণকে কিছু ভাবতে হয়নি একদিনের অন্ত্রেও সংসারের চাল-ডাল-ডেল-চুন নিয়ে মাথা-ঘামাতে হয়নি। কত লোকের যোগ-শোক দূর করেছে, কত লোককে টোটকা ওষুধ দিয়ে ভাল করে দিয়েছে, গ্রামের লোক তার বমলে ক্ষেতের বেগুন, মুলো, গাইয়ের দুধ নিবারণের বউকে গিয়ে দিয়ে এসেছে। বাঁড়ুক্ষে-মশাই নিজের বেগার দিয়ে নিবারণের খড়ের চাল ছাইয়ে দিয়েছেন। বলতে গেলে কোনও অভাবই ছিল না নিবারণের। কিন্তু তবু নিবারণ চলে গেল।

গঙ্গামণি নিজের ছেলেটিকে খাইয়ে দাইয়ে কোলে বসিয়ে হাঁ করে কী যেন ভাবো!

পরলা-বউ বলে—আর ভেবে কী করবি মেয়ে, যখন বেঁধে রাখতে পারলি না ছেলেকে তখন ডেবে কী-টা হবে? গঙ্গামণি তবু উত্তর দেয় না।

ভ্রামাণ্য তখন একটু-একটু হাঁটতে শিখেই, তার মুখ চোখের জল মুছে দেয় গঙ্গামণি। মাহুখটা থাক, তবু তো ভ্রামাণ্য আছে। ভ্রামাণ্যর মুখ চেয়েই বেন গঙ্গামণি একটা বাঁচবার আশ্রয় পেয়েছে। লোকে বলে—ভা হ্যাঁ পা, বলি বাবার সময় তোমার কিছু বলেও যায়নি?

কেউ কেউ বলে—কিছু ভেবো না, দে-মাসুখ আবার ফিরে আসবে—

তা সেবার পরানহাটির গায়ে বাঘের উৎপাত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্ন দিকে মন চলে গেল সকলের। কে কোথায় বাঘ মেখেছে বাঘটার কী রকম চেহারা, বাঘটা কাকে কামড়াত এসেছিল, গাঁয়ের লোক জন মরে-হেঁজে থাকে, বাঘ তো আসবেই!

বাঁড়ুক্ষে মশাই বললেন—আর তো চূপ করে থাক। চলবে না—

বাঁড়ুক্ষে মশাই সবরের কোতোয়ালীতে খবর দিলেন। বলে পাঠালেন—পরানহাটিতে বাঘ এসেছে, এর একটা বিহিত করুন—

আসলে নিবারণ নিরুদ্দেশও হয়নি, হিমালয়েও চলে যায়নি। নিবারণই নিজে বাঘ হয়ে গিয়েছিল। নিবারণ বাঘ হয়ে পরানহাটির কোণে-কাণ্ডে ঘোরা করা করছিল।

ব্রাসেলসে বিধান রায়

বিক্রমাদিত্য

বিধানবাবুর সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় দীর্ঘ চোদ্দ বছর আগে। আমি তখন কলকাতার রয়টার গ্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টার। আমার আশ্রয় স্পষ্ট মনে আছে ১৯৪৮ সালে সেদিনই তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এগেছেন—এমন সময় তাঁর বাড়িতে তলব পড়লো। বললেন : আমি একটা বিবৃতি দেবো। এইটে তোমাদের প্রচার করতে হবে। ভারত-সরকার সন্ত তাঁকে দৃঢ় প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। এই শব্দ গ্রহণ করতে তিনি নাবাজ। আমার সামনেই তিনি বিবৃতিটা লিখলেন এবং আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন : কেমন চলবে ?

বললাম : চলবে না কেন ? নিশ্চয় চলবে। তখনও বিধানবাবু বনামখাত মুখ্যমন্ত্রী ন'ন—একজন গণ্যমান্ত ডাক্তার। অতএব পুরো বিবৃতি সাক্ষরিত করা হবে কিনা, এই নিয়ে আমার মনেও একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু বিবৃতির পুরোটাই প্রচার করতে হলো। তারপর দীর্ঘ এগারো বছর বাধে হঠাৎ একদিন আকস্মিক আমার সঙ্গে বিধানবাবুর দেখা ভারতবর্ষে নয়, বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। আমি তখন সেখানকার ভারতীয় সূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একদিন নগ্নের প্রধানমন্ত্রী ব্রিনেহেকের এক পক্ষে জানা গেল যে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ব্রিবিধানচন্দ্র রায় ব্রাসেলসে আসবেন। চোখ দেখানোই তাঁর প্রধান সংকল্প। পৃথিবীর একজন বিখ্যাত চক্চিকিৎসক তখন ব্রাসেলসে। আমরা সবাই তাঁকে চিনতাম। তাঁর সঙ্গে বোগাযোগ স্থাপন করা হলো। তিনি দিন ঠিক করলেন ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯। সেদিনই ব্রাসেলসে বিখ্যাত প্রদর্শনীয় শেষ দিন। অতএব ঠিক হলো চোখ দেখানোর পর বিধানবাবু প্রদর্শনী দেখতে যাবেন। এইলব আরোজন বন্ধোবস্ত করতে একটু সময় নিলো। ইতিমধ্যে এমাসাভারের কাছে প্রায়ই বিধানবাবুর চিঠি আসছে। প্রথমে সাধারণ চিঠি, তারপর এক্সপ্রেস চিঠি এবং সর্বশেষে টেলিগ্রাম। আরোজন বন্ধোবস্তের সব খবরই তাঁকে জানানো হলো। মেলসক্ক বিধানবন্ধুর আমরা সবাই বিধানবাবুকে অভ্যর্থনা করতে গেলাম। মিনটা ছিল ভারী হৃদয়—সাধারণতঃ বেলজিয়ামে এতো ভালো দিন পাওয়া ভাগ্যের কথা। পেন থেকে নেমেই বিধানবাবু জিজ্ঞাস করলেন : ডাক্তারের কী হলো ?

এমাসাভার জবাব দিলেন : সব আরোজনই করেছি। আপনার ঠাই হয়েছে ব্রাসেলসের বিখ্যাত হোটেল 'মে টিপল'-এ। সেই হোটেলের তখন বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পপতি বনজামদাস বিড়লাও ছিলেন।

আমি বাঙালী। অতএব এখানাতার বললেন : বিধানবাবু দেখাশোনার ভার আমার নিতে হবে। তাই পরদিন ভোরবেলায় আখার গাড়ি নিয়ে হোটেল গেলাম। গিয়ে দেখলাম বিধানবাবুর ব্রেকফাস্ট শেষ। ডাক্তারের কাছে বাবার জন্তে প্রস্তুত।

বললাম : স্তর টাক্সি ডেকে লাভ নেই। আমার গাড়িটা ছোট কিন্তু এতে আপনাদের হয়ে যাবে।

—বেশ চলো কোথায় যেতে হবে। আসল কথা কী জানো, অস্ত্রীয়ার ডাক্তার বলছেন চোখ কাটাও, লগ্নের ডাক্তার বলছেন—না, দরকার নেই। তাই ভাবছি তোমাদের বেলজিয়ান ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবো। এ লোকটা শুনেছি মহাপণ্ডিত। গাড়ীতে বসে নানা আলোচনা হুক হলো। হঠাৎ বিধানবাবু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় কোথায় দেখেছি বলো তো।

আমি একটু ইতস্ততঃ বোধ করে জবাব দিলাম : আমার আপনি দেখেন নি। কারণ, ১৯৪২ সাল থেকে আমি বাংলাদেশের বাইরে, আর ১৯৪৫ থেকে ভারতের বাইরে আছি। ১৯৪৮ সালে তাঁর বাড়ীতে বিবৃতির ক্ষেত্রে যে প্রথম দেখা হয়েছিল সে কথাটা আর উল্লেখ করলাম না।

—উহঁ, কোথায় আমি তোমায় দেখেছি। বলো তো কোথায়? তিনি আবার বললেন। বুকেছি তুমি অমূকের ভাই। তোমার সঙ্গে তার এত সাদৃশ্য যে আমার অহমান একটুও কুল নয়।

ভুল করেন নি বিধানবাবু। আমার ভাইয়ের নাম করলেন। আমি শুনে অবাক হ'লাম। বললাম : কী করে বুঝলেন আমি অমূকের ভাই?

—তোমার কণ্ঠস্বর শুনে—

গাড়ীতে বসে বিধানবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হলো। বললেন : দেখবে এরপর বাংলাদেশে গেলে আর বেশকি চিনতে পারবে না। বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

এবার আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম : তার একটা কথা বলবো।

—কী—

—এখানে বহু ভালো বাঙালী ছাত্র আছে যাদের বেশে কিরিয়ে নিয়ে গেলে মরল হবে। আমার পরিচিত এক বাঙালী আছেন, তিনি পিয়ের কুরীর অধীনে কাজ করেছেন। তত্ত্বলোক ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার এনার্জির প্রধান অধ্যাপক। একজন বিদেশীর পক্ষে এ চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। ওর একটা ভালো চাকুরির ক্ষেত্রে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পাইনি। কিন্তু ওর প্রতিভা দেখে ওকে আমেরিকার এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের লোকেরা খুব মোটা মাইনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জানেন তো এখানে বিদেশীদের একদম নেয়া হয় না।

বিধানবাবু হেসে জবাব দিলেন : ভূমি কি ভাবো আমি এদব জানিমে। সব জানি। এই তো ব্রাসেলস থেকে আমেরিকায় যাচ্ছি। ফ্রান্স ব্রাউন দেখানো বিদ্যাত বৈজ্ঞানিক, তাঁর দক্ষিণ হস্ত হলো একজন বাঙালী। জানো তো এইদব রকেট ইত্যাদি সবই ফ্রান্স ব্রাউনেরই তৈরী। এবং ওই কাজে এই বাঙালী ছেলেটি বিশেষ সাহায্য করেছে।

বিধানবাবু আরও বললেন : ভালো বাঙালী ছেলে শেলেই আমি বাংলার কিরিয়ে নিতে প্রস্তুত।

একটু বাধে ডাক্তারের কাছে এলাম। বিধানবাবু ডাক্তারের কমপান্টিং রুম চুকলেন। আমি বাইরে প্রতীক্ষা করছি। আধঘণ্টা বাধে তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন : এ ডাক্তারও কিন্তু অস্ত্রিয়ান ডাক্তারদের সঙ্গে একমত। বগেন, আরো কিছুটা বিন দেখুন, তারপর হয়তো চোখ কাটাতে হতে পারে। তারপর বেধে বললেন : লোকটা আমার নাম শুনেছে। একটা পরশাও কি বাবদ নিলে না।

ডাক্তারের ওখান থেকে আমরা গেলাম ব্রাসেলস প্রদর্শনী দেখতে। প্রদর্শনী হচ্ছিল 'লাকেন' বলে একটা আরগায়। আমার অনেক অস্থানর ও মাধ্যমাধনা সবেও তিনি প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে ভি, আই, পি, ট্রিটমেন্ট নিতে রাজী হলেন না।

তারপর প্রদর্শনী ঘুরে দেখা আরম্ভ হলো। প্রদর্শনী বৈধিগো প্রায় চার মাইল। সাধারণতঃ গাড়ি করে ঘুরে দেখতে হয়। কিন্তু বিধানবাবু বললেন, তিনি হেঁটেই যাবেন। গেলেনও তাই। এ চার মাইল তিনি হেঁটেই প্রদর্শনী দেখলেন। আমি ক্লান্ত, কিন্তু বিধানচন্দ্র সজীব।

হঠাৎ বিধানচন্দ্র বললেন : ওহে কয়েকটা আইনজীবী কিনে আনো তো।

বহুবান্ধব সবারই ভুলে আইনজীবী কিনে আনা হলো। কিন্তু এ লিষ্ট থেকে বিধানবাবুকে বাদ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ৭২ বছরের বৃদ্ধ আইনজীবী যাবেন কী! আইনজীবী না গেলে তিনি বললেন : সে কী হে, আমার আইনজীবী কোথায়?

আমি একটু হতভম্ব। বুঝলাম আইনজীবীর লিষ্ট থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া সংগত হয়নি। আমার নোড়ে গিয়ে তাঁর ভ্রাতৃ আইনজীবী কিনে আনলাম। এবার তিনি বললেন : ঠিক জমলো না। চলো একটু কফি খেয়ে আশা থাক। সবাই গেলাম একটা এক্সপ্রেসো কফি হাউসে। বিধানচন্দ্র টেবিলে বসবেন না। কাউন্টারের সামনে চেয়ারে বসে কফি খাওয়া হলো।

প্রদর্শনী দেখে বাড়ী ফিরে যখন এলাম তখন প্রায় দুপুর একটা। আমি নিম্নের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। বললাম, বিকেলে এসে আবার দেখা করবো। তিনি ধমক দিয়ে বললেন : না, না ভূমি আমার সঙ্গে যাবে। কোথায় ভালো বেস্তোরা'র পাওয়া যায় বলো। বুলাভার এডলফ

মাকদেব ওপর একটা ছোট রেস্তোরাঁর গেলাম। বিধানচন্দ্র নিজেই মেজু পেখে খাবার পছন্দ করে দিলেন।

বিকলে আবার শহর ঘোরা হলো। সন্ধ্যার সময় বিধানচন্দ্র আকস্মিকভাবে গেলেন।

হল্যাণ্ডের দূতাবাসে আমার এক বাঙালী বন্ধু ছিল। তিনি দুটো দিন বিধানবাবুর দেখা-সুখা করেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বিধানবাবু জানতে পারলেন যে, ডব্রলোক ফরেইন সার্ভিস ছেড়ে দিয়ে হোম সার্ভিসে চলে আসছেন। বিধানচন্দ্র বললেন : না ত্যা হয় না। তুমি ফরেইন সার্ভিসে থাও। কাগজ কলম নিয়ে তুমি একধালা চিঠি লিখিলেন...

...My Dear Jawahar...

ভারতের প্রায় একবছর বাসে আমি বেশে কিরে আসি। মনে দ্বিধা ছিলো কলকাতায় এসে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবো কিনা। ভেবেছিলাম তিনি হয়তো দেখাই করবেন না। বন্ধুদের তাগিদে একটা ইন্টারভিউ চাইলাম। দর্শনের অসুস্থতি মিলে গেলো।

চিনতে তাঁর একটুও কষ্ট হলো না। দেখেই বললেন : কী খবর। বেশে যে হঠাৎ।

—তারা, আফ্রিকার বদলী হয়েছি।

—আফ্রিকায়! কোথায়? তাঁর কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের স্বর।

—কোম্বোয়ে এনক্রুমার বেশে। গাজায়।

ভালো লাগবে তো? যদি না যেতে চাও তবে বলবো নাকি বীরেনকে। (ব্রীকীরেন চক্রবর্তী তখন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন সেক্রেটারী ছিলেন)।

জবাব দিলাম : নতুন বেশ দেখবার লোভ আছে।

—বললেন : বেশ, দেখে এসো।

মাত্র কয়েকমাস আগে হঠাৎ আবার তাঁর সঙ্গে দমদম এয়ারপোর্ট দেখা। এবারও তিনি আমার চিনতে কুল করেন নি। রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সঙ্গে আমি এসেছিলাম। যাবার দিন ব্রেজনেভকে প্রেনে তুলে দেবার অন্তে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এসেছেন। ব্রেজনেভের সঙ্গে কথাবার্তার পর তিনি লোকারণ্যের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর দাননে দাঁড়ালাম।

—কী হে তুমি এখানে কেন? তিনি বললেন।

—এঁদের সঙ্গে ঘুরছি—আমি সন্ধ্যা দিই।

—রাশিয়ান জানো যে এঁদের সঙ্গে ঘুরছ।

—না তারা। তবে এরা সবাই ইংরেজী বলে।

—তবে আর তুমি কিরকম 'লিঙ্গ' অফিসার। আচ্ছা বাও বাও, প্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। ধেরি করো না।

বিধানচন্দ্রের সঙ্গে এই আখ্যার শেষ দেখা।

— হাড়িচাঁচার কথা

শ্রীমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

এক গেরতের সাত ভাই। তাদের ছিল সাত বউ। এই বউগুলো ছিল উন্নয়ন কুঁড়ে ও ঝগড়াটে। দিনরাত কেবল বেড়িয়ে বেড়াত আর পরচর্চা করত।

এদের মধ্যে ছোট বউটি ছিল খুব ভালো। তাকে দেখতে-শুনতেও যেমন, তার আচার-ব্যবহারও তেমন। সে-ই সংসারে সকলকার অন্ত রামাবাদ্য করত। কারণ, তার স্বামী লেখাপড়াও জানত না এবং পরদাকড়িও রোজগার করতে পারত না। সুতরাং সে জায়েদের কাজকর্ম করে দিয়েই নিজেদের পেট চালাত।

ছোট বউয়ের স্বামী নিকর্ম বলে অপর বউরা দিনরাত ছোটবউকে গরম। দিত, অপমান করত, দুঃখ দিত। ছোটবউ সেসব গায়েও মাখত না। পরের আয়ে থাকতে গেলে এমন অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। মনের কষ্ট মনেই চাপা থাকত তার।

একদিন সে সাতের চাল একটু বেশী নিয়ে ফেলেছে। কাছেই ভাত দুটি বেশী হয়েছে। আর বায় কোথা। ছ'বউ ছোট বউকে বলে উঠল—মাগো, আমরা কি রান্ধম নাকি যে এত ভাত খাওয়া হয়েছে আমাদের অন্তে? পরের বলে কি এমনি করেই নষ্ট করতে হয় গা? যদি রোজগার করবার ঘুরোখ থাকত তাহলে বুঝতে বাছা—অশচয় হলে কেমন লাগে!

ছোটবউ মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

আর একদিন। সাতের চাল ঠিক করতে না পেরে সেদিন দুটি কম ভাত রেখেছিল ছোটবউ। পাছে সকলে মুখ করে এই ভয়ে সে নিজে ভাত না খেয়ে সকলকে পেট ভরে খাইয়ে মিল। কিন্তু ভাতের বেড়াই হ'ল না তার। ছ'বউ গালে হাত দিয়ে বলল—ওমা, কোথা যাওয়া গো? শেষকালে ভাত কম খাইয়ে আমাদের উপোস করিয়ে মারবার চেষ্টা!

ছোটবউ এবারেও কাঁদতে লাগল মনের দুঃখে। এই ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন বাসন মেজে আনবার সময় হঠাৎ তার বাসনের গোছা থেকে অতর্কিতে একটা বাটি পড়ে ভেঙে গেল।

সলে সলে ছুটে এল ছয় বাড়িনী। এসেই কিল, চড়, ঘুবি এলোপাতাড়ি মাঝতে লাগল ছোটবউকে।

ছোটবউয়ের মনে এবার ভয় চ'ল খব। সে ঠিক করলে আর এ সংসারের থাকার না

সে। পালিয়ে বাবে বাড়ী থেকে। এই ভেবে যাতে কেউ না চিনতে পারে সেজন্য ডাক্তার হাডিটা টেচে. দার। গায়ে কালি মেখে, খিড়কি দিয়ে বনের দিকে বেরিয়ে পড়ল ছোটবউ।

বনে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ভগবানকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—ঠাকুর, অনেক কষ্ট তো দিয়েছ আমার, আর আমার যত কষ্ট পাওনা আছে সব এক সঙ্গে দিয়ে মুক্তি দাও এবার। আর যে সঙ্ক করতে পারছি না প্রভু।

তার সেই কারা মেখে ভগবানের করুণা হ'ল খুব। ভগবান বললেন—ছোটবউ, আমি তোমাকে বর দিচ্ছি। যাও তুমি এখনি পাখি হয়ে উড়ে যাও। বনের আনন্দে পাকা পাকা মিষ্টি ফল খেয়ে দিন কাটাও। শান্তি পাবে তা'হলে।

ভগবানের বরে সেই দিন থেকে ছোটবউ পাখি হয়েই উড়ে বেড়াতে লাগল বনে-সবলে। হাডি টেচে গায়ে মেখেছিল বলে তার নাশও হয়ে গেল 'হাডিচাকা'।

কয়েকটি ছড়া

ঐদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ শট্কা ॥

কাটছে দেবার পটকা।

যেদিক পারিস সটকা।

ধরবে যখন কানে তাল।

বাধবে মনে ধটকা।

তাই তো বলি হবি কাল।

লাফিয়ে পাল। ঝটকা।

॥ কটকে ॥

চাটুজ্ঞোদের কটকে

(সেদিন) ভুল করেছে ষটকে।

কানটি নেড়ে তাই তো দাদ।

গালে দিলেন ঠুপিড হানাঃ

পিঠের ওপর লিখে পাধা

নোটশ্ দিলেন লটকে।

॥ ক্যান্সাস্পিনীর রাঁধুনি ॥

ক্যান্সাপিসৌর রাঁধুনি

কাজের কি তার বাঁধুনি।

গুজোনিতে ঝাল দিয়ে সে

গাইতে বসে কাঁধুনি।

॥ রানধুন খোঁট্টা ॥

রানধুন খোঁট্টা

যায় কচি ভোঁট্টা

রাত হলে ওঁত পেতে

ধরে শুধু চোঁট্টা।

॥ ভোসল ॥

বোসেদের ভোসল

শুধু করে সফল

ঘটি-লোটা-কফল।



মেঠুড়ে

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান ৩য় টেস্ট ম্যাচ

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম দিনে টসে জয়ী হয়ে পাকিস্তান ইংলণ্ড দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠালে, প্রথম ইনিংসের হুচেনায় ইংলণ্ড বিপর্যয়ের

সম্মুখীন হয়, কিন্তু ওপনিং ব্যাটসম্যান মাইক স্টুয়ার্ট ও টম গ্রেন্ডজির দৃঢ়তায় ইংলণ্ড আংশিক-ভাবে বিশদ কাটিয়ে ওঠে এবং দিনের শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান করে। মাইক স্টুয়ার্ট ব্যক্তিগতভাবে ৮৬ রান করে দুনিবের এল. বি. ডব্লিউ আউট হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড দল চা-পানের বিরতির কিছুক্ষণ আগে মোট ৪২৮ রানে প্রথম ইনিংসের পেলা শেষ করে। পিটার পারকিট মোট ২২৬ মিনিট ব্যাট করে ১৭টি বাউন্সারী মেয়ে ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেন এবং কিছু পরেই ১১২ রানে (১৮টি বাউন্সারী) আউট হয়ে যান। দিনের শেষে পাকিস্তান দল প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট হারিয়ে ৭০ রান তোলে। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই পাক দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩১ রানে শেষ হলে ২২৭ রান পেছনে থেকে পাকিস্তান দলকে 'ফলো আন' নামতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও পাকিস্তান দল বিশেষ হুবিধে করতে পারে না। চা-পানের পর ১৮০ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড পাকিস্তান দলকে এক ইনিংস ও ১১৭ রানে পরাজিত করে। সোম্বানের হয়তো মনে আছে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ইনিংস জয়ী এবং দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ৭ উইকেটে জয়লাভ করেছিল। এইভাবে পরপর তিনটে টেস্ট ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড দল 'স্ববীর'-এর সম্মান লাভ করেছে।

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান—৪র্থ টেস্ট ম্যাচ

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে পাকিস্তান টসে জিতে ইংলণ্ড দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায়, কিন্তু এবল বর্ণণের ক্ষেত্রে প্রথম দিনের খেলা বন্ধ রাখতে হয়। দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড ৩ উইকেট হারিয়ে ৩১০ রান করে। ডেনসটার ৮৪ রানে আউট হলেও গ্রেডন ৮২ রানে এবং পারকিট ৩৮ রানে অপরাধিত থেকে যান। তৃতীয় দিন ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৪২৮ রান করে দান ছেড়ে দেয়। ঐ রানের ডেভর গ্রেডন ১১৪, পারকিটের ১০১ ও

সেশার্ভের ৮০ রান উল্লেখযোগ্য। ফলস্র ১৩০ রানে ৩ টি উইকেট পান। চতুর্থ দিনে ব্যাটস্মানদের সাবধানতা সত্ত্বেও পাকিস্তান দলকে চতুর্থ টেস্টে 'ফলো অন' করতে হয়। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২১২ রানে শেষ হয়। দ্বিতীয় দফায় হানিফের উইকেট হারিয়ে দলের ১১ রান সংগৃহীত হয়। খেলার শেষ দিনে তরুণ পাকিস্তানী ব্যাটস্মান মুতাক রহমত দূর্ততার সঙ্গে খেলে সেফুরী (১০০ অপরাজিত) করেন। সঈদ আমেরও এই ইনিংসে ভালো খেলে ৬৪ রান করেন। পাকিস্তানের ৬ উইকেটে ২১৬ রান উঠলে খেলার নির্দিষ্ট সময় পায় হয়ে যায় এবং মুতাক রহমত ও সঈদ আমের এই দুই খেলোয়াড়ের দূর্ততার জন্তে পাকিস্তান ও ইংলণ্ড ৩র্থ টেস্ট ম্যাচ অসীমান্তিতভাবে শেষ হয়।

পলি উম্রিগড়ের অবসর গ্রহণ

ভারতের স্বর্ণহানীয চৌকশ খেলোয়াড় পলি উম্রিগড় শারীরিক অসুস্থতার জন্তে টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেবেন বলে জানিয়েছেন। উম্রিগড় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতিতে জানিয়েছেন যে, তাঁর চিকিৎসকরা তাঁকে কিছুকাল প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা থেকে বিশ্রাম নেবার জন্তে পরামর্শ দেওয়াতে তিনি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তিনি রংজি ট্রফি এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, দেশে বা বিদেশে অত্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় যথারীতি অংশ গ্রহণ করবেন। উম্রিগড়ের এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় ক্রিকেটের যে ক্ষতি হ'ল তা ক্রীড়ারসিক মাত্রই বোধ করবেন। উম্রিগড়ের স্থান পূরণ করা খুব সহজ হবে না।

তরুণ-ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর

জানা গেছে যে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের একটি দল ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে তিন মাসের জন্তে ইংলণ্ড সফরে যাবে। দলটি ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় ক্রিয়াকলা ইত্যাদির সঙ্গে বোলো-সতেষোটি ম্যাচ খেলবে। ভারতের বাইরে অবস্থা সম্পর্কে তরুণ খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্তেই এই সফরের আয়োজন এবং তরুণ ভারতীয় দলের এটাই হবে সরকারীভাবে প্রথম ব্রিটেন সফর।

সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগ

মোহনবাগান বনাম মহম্মেডান স্পোর্টিং—সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলার মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে এক গোলে হারিয়ে মোহনবাগান বিশেষ নৌভাগ্যের অধিকারী হয়। মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব শেষ দিকে কয়েকটা ম্যাচে ভালো খেলার এবং তাদের সঙ্গে মোহনবাগান কেমন খেলে তা দেখার জন্তে ঐ দিনের খেলার মাঠে প্রচুর দর্শক সমাবেশ হয়েছিল। খেলায় মোহনবাগান হল প্রাধান্য বজায় রেখে খেলবার চেষ্টা করে এবং গোল দেবার যে-সব সুযোগ পায় তা বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই খেলার তাহের জয়লাভ ঠিকই হয়েছে। মোহনবাগান দলের পক্ষে এই দিন জয়হৃদক গোলটি দেন শেখ আলী। এবারের লীগের প্রথম পর্বের খেলাতেও মোহনবাগান হল অহরুণ ফল দেখিয়েছিল।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল—বাঙালার পরলোকগত মধ্যমস্রী ভক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতি তহবিলে অর্থ সাহায্যে আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষ মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল-এর ফিরতি খেলাটি দু'পক্ষের এজমালী মাঠে চারিটি-রূপে আয়োজন করেছিলেন। এই দিন টিকেট বিক্রি থেকে একঘণ্টা হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে দু' হাজার এবং ঐ ক্লাবের কয়েকজন সমস্ত সমবেতভাবে ৭৫১১ টাকা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মানমোহা পদ্মজা নাইডুর হাতে তুলে দেন।

খাতনামা খেলোয়াড়দের অসুপস্থিতিতে খেলাটি যে তেমন আকর্ষণীয় হবে না অনেকের এইরকম ধারণা ছিল কিন্তু সুখের বিষয় বল্লখ্যাত খেলোয়াড়দের আন্তরিক ও নিরলস প্রদর্শনে এই দিনের কৌড়াছুটানটি যে মোটামুটিভাবে উপভোগ্য হয়েছে এ কথা কুঠাছানভাবে বলা যায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে খেলায় মোহনবাগানের দাপটই ছিল বেশি। তবে মাঝে মাঝে ইস্টবেঙ্গলও ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালায়। খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

কেটিং

কিছুদিন আগে সিমলায় কিশোর-কিশোরীদের এক স্কটিং প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এদেশে কেটিং-এর ভেদন চলন নেই, কিন্তু স্কটিং পাশ্চাত্যে খুব জনপ্রিয় খেলা। সিমলায় যে নির্বিল ভারত স্কটিং উৎসব হয়, তাতে বাঙালার বাগো বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বোত্রা ২৭ ঘণ্টা একটানা স্কটিং করে ভুয়ার-কৌড়ার নতুন ভারতীয় রেকর্ড করে। এর আগে স্কটিং-এ সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ২৫ ঘণ্টা ১০ মিনিট। বালকদের একটানা স্কটিং বিভাগে অনেকেই ত্রিশ ঘণ্টার ওপর স্কটিং করে। ছেলের প্রত্যাশিতার বাঙালার দশ বছরের ছেলে সুবোধচাঁদ কুড়ি ঘণ্টা স্কটিং করে। এই প্রতিযোগিতায় মোট তেত্রিশজন প্রতিযোগী নাম দিয়েছিল।

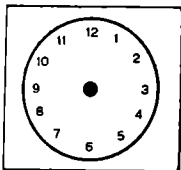


'বাজির'

কোন দাতু ভাড়াভাড়ি ভাতে ?

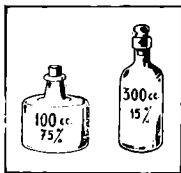
(১) বলতে পার—লোহা, তামা, মত্তা ও শিতল এই চার রকম দাতুর মধ্যে কোনটা আগে ভাতে, অর্থাৎ উত্তাপ সবচেয়ে ভাড়াভাড়ি টেনে নেয় কোনটা ?

কিভাবে নহজে তা প্রমাণ করতে পার ভেবে বাব করার চেষ্টা করো।



ঘড়ির সংখ্যা ভাগ

২। ঘড়ির কাঁটার সংখ্যাগুলিকে এমন তিনভাগে ভাগ কর যাতে প্রত্যেকভাগেই সংখ্যাগুলির যোগকল ২৬ হয়। পালের ছবিতেই কাঁটা-বিহীন একটি ঘড়ির মধ্যে এই সংখ্যা-গুলিকে তোমরা দেখতে পাবে।



জোলো দুধের বোতল

৩। ছোট বোতলটিতে আছে ১০০ ছটাক জল মিশ্রিত দুধ—বার শতকরা ৭৫ ভাগ দুধ এবং বাকী জল। এর থেকে কতখানি মিশ্রিত দুধ নিয়ে লম্বা বড় বোতলে ঢেলে এবং ওর সঙ্গে আর কতখানি জল মেশালে মিশ্রিতের পরিমাণ হবে ৩০০ ছটাক এবং দুধের পরিমাণ হবে শতকরা পনেরো ভাগ ?

(উক্তর আগামীবার বেধবে)

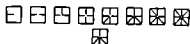
পদ্মাবতীর ধাঁধার উত্তর

(ক) ১ম বার : একদিকের পালায় A, B এবং অপর পালায় C, D তুললে যদিও ওজন সমান হয় তা'হলে বুঝতে হবে E, F বাটখারার কোনওটির ওজন কম-বেশী আছে। ২য় বার : একদিকে A এবং অপরদিকে E রাখলে যদি সমান ওজন হয়, তা'হলেই ধরা পড়বে F বাটখারার কম-বেশী বা অস্তরকম।

কিন্তু, ১ম বারে যদি A, B এবং C, D বাটখারার সমান না হয়, তা'হলে বুঝতে হবে E, F বাটখারার ওজন সমান আছে। ২য় বারে A, E একদিকে B, F অপর দিকে রাখলে যদি সমান ওজন না হয়, তা'হলে বুঝতে হবে A বা B-র মধ্যে কোনওটির ওজন অস্তরকম। ৩য় বারে A একদিকে এবং অপর দিকে E রাখলে যদি সমান ওজন না হয়, তা'হলে বুঝতে হবে A-র ওজন অস্তরকম—আর সমান ওজন হলে বুঝতে হবে B-র ওজন অস্তরকম।

(খ) একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে টাকার ছাঁটির মধ্যে ছ'নম্বর ও ছ'নম্বর ঠিক একই রকম, হুতরাং ঐ দুটিই আসল। আভনী কাচের সাহায্যে ভাল করে দেখলে সহজেই ধরা পড়বে।

(গ) সন্দের ছবিটি দেখ। কেন্দ্রগুলি—২য়, ৩য়, ৪ম, ৪র্থ, ১০ম, এবং তারপর হবে মতুন একখানি ছবি বা কম আছে। (এখানে তলার দিকে যে ছবিখানি দেওয়া হয়েছে)। তারপর বলবে ১ম এবং সর্বশেষে ৬ষ্ঠ চিত্র।



(ঘ) ৩য় চিত্রটি অস্তরকম; কারণ ওর (উপর থেকে নীচে ৩য় ঘরে) শেষের 'এন' (N) অক্ষরটির অপর ছবির সঙ্গে মিল নেই।

অঙ্ক করো।

গত সংখ্যার তোমাদের 'অঙ্ক করো' বলে একটি গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তর সেই সংখ্যার মধ্যেই আছে বলা হয়েছিল—কিন্তু তা ছিল না। এবার সেই অঙ্কর উত্তরটি দেওয়া হ'ল।

গুণকল ও ভাগকল—দুটি সংখ্যার গুণকল বের কর। তারপর ঐ গুণকলের বর্গমূল বের করলে একটা সংখ্যা পাওয়া যাবে, এবং সংখ্যা দুটির যে গুণকল দেওয়া আছে সেটাকে ঐ বর্গমূল দিয়ে ভাগ করলে অপর সংখ্যাটি বের হবে।

নতুন বই

ছোটদের বৌদ্ধ গল্প—গ্রীহলতা কর।
শিশু-সাহিত্য। সংস্কৃত প্রাইমারি সিরিঃ. ৩২ এ
আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা ১ হইতে
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য
১-৪-০।

বুদ্ধদেবের সময়ে তাঁকে নিয়ে, সে
সময়কার মাহুধরন, সমাজ ও ধর্মের বিভিন্ন
ঘটনা নিয়ে নানা কাহিনী গড়ে ওঠে।
'ভাতকের গল্প' নামে এরা পরিচিত। এই
কাহিনীগুলির অধিকাংশই শিক্ষামূলক
হলেও, এর মধ্যে এমন সব গল্প আছে যা
পড়তে পড়তে অভিভূত হতে হয়।
রোমঞ্চকর, চিত্তাকর্ষক এমন গল্পেরাটি গল্প
এই বইখানির মধ্যে শ্রীমতী হুলতা কর তাঁর
সহজ হৃদয় ভাষায় এই বইখানির মধ্যে ধরে
দিয়েছেন। গল্পগুলির নির্বাচনও হয়েছে
হৃদয় এবং প্রতিটি গল্পের সঙ্গে হৃদয় হৃদয়
পাতা-ডরা ছবিগুলি গল্পগুলিকে আরও স্পষ্ট
ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রত্যেক
ছেলেমেয়েরাই এই গল্পগুলি পড়ে আনন্দ
পাবে এবং তাঁর সঙ্গে জীবনে নৈতিক
উন্নতিরও সুযোগ পাবে।

রবার্ট কুলটন—রাসিক স্রাভি ছিল।
শ্রীপ্রবোধোত্তি সেন কর্তৃক অনূদিত। শ্রীকৃষ্ণ
-পাবলিশিং কোম্পানী, ৭১ মহাত্মা গান্ধী
বোড, কলিকাতা ১ হইতে শ্রীঅক্ষয়
পবতার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১-১-০।

রবার্ট কুলটন হলেন বাম্পীর গোত্রের
আবিষ্কর্তা। কেবল মাত্র বাম্পীর গোত্রের
আবিষ্কর্তা বললেই যেন কুলটন সম্পর্কে
সব বলা হয় না। একটি অসাধারণ চরিত্রের
মাহুধ ছিলেন এই আমেরিকার মাহুধটি।
ছোটবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রের নানা
ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। পেনসিল-
ভ্যানিয়ার সাধারণ একজন কৃষিজীবীর ছেলে
হয়ে তিনি ছবি আঁকা দেখার লগ্ন ইংলও
যান এবং সেখান থেকে দীর্ঘদীর্ঘ সাধনার
পর, বালাকালে যে ব্রহ্মলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ
ছিল, সেই দিকেই দৃষ্টান্তিভক্ত হয়ে অগ্রসর
হন এবং ১৮০৭ সালে বাম্পীর গোত্র
আবিষ্কার করেন।

রোমঞ্চকর উপজাতির মত বৈচিত্র্যপূর্ণ
এই জীবন কাহিনী পড়ে প্রত্যেকেই অভিভূত
হবে। অসুখারকের প্রাণল ভাবাও এই
ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

জাঁহার শেষে আলোর দৃশ্যে—
স্বপ্নেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। গ্রন্থসংখ্যা ৬ বহিঃ
চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১-৪-০।

তপসুধার মত করে লেখা হৃদয়
আদর্শমূলক একটি কাহিনী বইখানির মধ্যে
দিয়েছেন লেখক। লেখার ধরণটিও ভারী
হৃদয়। একবার পড়তে আরম্ভ করলে
ছাড়া যায় না। প্রচুর ছবি আছে এবং ছবি-
গুলিও খুব হৃদয়। তোমার হাতে গেলে
সেইখানি পড়ে যেয়ো।



প্রত্যেক মানুষ চায় নিজেকে ও
নিজের আশপাশকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন
রাখতে। এটা প্রতি মানুষের একটা
বাস্তবিক ইচ্ছা। আমরা আমাদের
আশপাশে যে সমস্ত মলিন অপরিচ্ছন্ন লোক
দেখতে পাই—তাদের সংখ্যা বার্ষিক পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় তাদের তুলনায় অনেক

কম। আমাদের এর আগে আমি অনেকবার বলেছি নিজেকে সুন্দর করতে। ছোট বয়স থেকে
যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর জীবন বাপন করতে অভ্যস্ত না হই—তাহলে পরবর্তীকালে
আমরা যখন দেশের মর্মান্বনস্পর্শ নাগরিক হবো তখন আমরা অনেকের সমালোচনার পাত্রে হবো।
এটা মোটেই শ্রেয় নয়।

তবে কথা হচ্ছে শুধু নিজেকে সুন্দর আর পরিষ্কার রাখলে চলবে না, তার সঙ্গে যে পথে—
তা কোলকাতার মত বৃহৎ নগরটাই হোক বা হাওড়ার মত শিল্পকলার শহরই হোক কিংবা
কোনো জেলা শহর বা মহকুমা শহর হোক, বাই হোক না কেন—তাকেও সুন্দর রাখার, পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। সম্প্রতি তোমরা খবরের কাগজে পড়েছ এবং কেউ
কেউ হয়তো বড়দের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে শুনেছ—যে আবর্জনা আর ময়লা জমে জমে
কোলকাতার বিভিন্ন রাস্তাঘাট কি এক ভয়াবহ অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। এ অবস্থার চাঞ্চল্যের
কারণ। আমরা কেবলমাত্র শৌর্য প্রদর্শনকে অভিব্যক্ত করে চুপ করে বসে থাকছি,—থাকলে
আমাদের চলবে না। পাড়ায় পাড়ায় আবর্জনার দূশ জমে যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল
দেই ভয়াবহ রূপ নিরসন করার দায়িত্ব কি আমাদের উপর বর্তায়নি? আমরা যদি এ বিষয় একটু
সচেতন হয়ে, সহযোগিতার ভাব নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আবর্জনা-দূষণের ভার লাঘব করার জন্য
অগ্রণী হতাম তাতে দেশের কিছুই ছিল না—বরং আমাদের বাছুরের দিক থেকে তা উপকারেই
আসতো। পশ্চিমবংলা সরকার এট মক্কাগী অবস্থায় যোগাভার সঙ্গে কাজ এগিয়ে এসেছেন এবং
জাতীয় রক্ষা বাহিনীদের সহযোগিতায় আবর্জনা-দূষণ পরিষ্কারের যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন—
তা মস্তাই প্রশংসনীয়। এখন আমাদের মত সাধারণ নাগরিকের অবস্থা কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের এই
কাজে যেমন ভাবে পাঠা যায় সাহায্য করা। সরকার কোলকাতার আবর্জনা পরিষ্কারের দায়িত্ব
গ্রহণ করে আমাদের সামনে যে সুমহান উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দেই দৃষ্টান্তকে অমূল্যরূপে করে
আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য শহরকে আবর্জনাশূন্য করতে সমবেতভাবে যেন এগিয়ে বাই। স্বাধীন
দেশের স্বাধীন নাগরিকের এর চেয়ে পবিত্রতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য আর কি হতে পারে?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যেন কোন অন্তঃকল্লির হাতছানি পড়েছে। এলা জুলাই
ভারত-গৌরব ভট্টর বিধানচন্দ্র রায়কে আমরা হারালাম—ভারতীয় তিনসপাহ শেখ হতে না হতে
আমরা আবার হারালাম স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়কে। পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রজীবনে
কালীপদবাহুব স্থান হ্রস্বিত ছিল।

বাই হোক আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

অশোক কুমার মিত্র—জলপাইগুড়ি : অশোক, তোমার প্রশ্ন দ্বারা আমি বিম্বিত হয়েছি।
উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এমন কিছু আছে বলেও জানি না। তাহলে মাঠঘের অনেক দমকাই থাকতো না। চৈতন্য সেনগুপ্ত—কাঁচড়া পাড়া : হুম্মর জীবন লাভ করতে গেলে কি করতে হয়? মনের
সমীক্ষাতেই সব হয়—নিজের পরিবেশ হুম্মর ও হুম্মর রাখতে পারলেই অনেক কাজ হয়।
ধারণা কথা বলবো না, মন কাজ করবে না, যা মন ও হুম্মর সেইমিকে আগ্রহ থাকলে বা মনের
বলিষ্ঠতা থাকলেই হুম্মরতর হবে জীবন। গৌর ঘোষ—বেলেঘাটা : মেন রোড, নবকুমার
শালমল—গ্রাম পরগা : তোমাদের প্রশংসা আমার লিখো উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।
নবকুমার। রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিকের পদাবলী লিখেছেন ঐ নামে। বনফুল হচ্ছেন ডাঃ বলাইচাঁদ
মুখোপাধ্যায়। তুমি তিনখানি চিঠি একসাথে দিয়েছ? কেন? যে যে থবর অন্যায়সে
সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা যায়—তা তুমি আমার লিখবে কেন তাই আমার? পলা পদ্মবীণ—
পুনা : পুনা শহর তো খুবই ভালো তাই তোমাদের ভাল লাগবেই। মোহম্মী চক্রবর্তী—
হাওড়া : তোমার মা ডাঃ জ্যোৎস্না চক্রবর্তী উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকা গেছেন শুনে
হুখী হলাম, তুমিও তাঁর সঙ্গে গেলে না কেন? কত বেশ ঘুরে কত কি শিখতে জানতে পারতে।
গৌরী বাগচি—নববীণ : সঙ্গীতে তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে পরম আনন্দলাভ করলাম।
অবিগৃহে আবেগ অংশীদার করে মাঝে বড় হবে আশা করি। রণেন্দ্রমোহন লাহিড়ী—
তেজপুর আসাম : পড়াশুনায় তোমার মনোযোগ খুব আনন্দের কথা মনে নেই।
বিগঞ্জি ঘোষ—কুব্জেশ্বর : হাতের লেখা খুব হুম্মর তোমার, মন দিলে আরো ভালো হবে।
ইস্রানী ও দীপ্তী মিত্র—দাটশীলা : বতস্বর জ্ঞানাবায় জাপানে প্রথম বিজ্ঞা পাড়ির চলন হয় ১৮৬৯
সালে। পুতুল বৈদ্য—বোম্বাই, অশ্রুলেখা : রাঘ—পার্বতীপুর : প্রথম বালাসী মহিলা কবি হিসাবে
নামকরা যেতে পারে চন্দ্রাবতীর। ইনি বাংলাভাষার বামায়ণের কথা লিখেছিলেন। এর বাবা
হিম্ব বাঈদামণ্ড বোড়ন মঙ্গলম পত্রিকার বিখ্যাত কবিদের অন্ততম ছিলেন। চন্দ্রাবতীর জীবনী
সংক্ষেপে খুব একটা কিছু জানা যায়। পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে এর জন্মস্থান ছিল।

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিও।

তোমাদের—মধুদিত্ত

শ্রীহরীচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বহিঃ চাটুঃ স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও
সংকর্তৃক প্রত্ন প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০.৪৫ নয়া পরগা।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

আশ্বিন—১৩৬৯

[৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৈঁচি গাছ

শ্রীকুম্ভদরজন মল্লিক

মিঠা মেঠো ফল—রাখালের প্রিয়—

বসতি কাঁটার মাঝ,

দেখা হ'ল ভাল—বেড়াতে এসেছি

ছিলনা কোনই কাজ ।

সে বালক দলে মনে কিহে আছে ?

আসিত বিকালে ঘারা তব কাছে,

চেন না ? তাদেরি একজন আমি

বুড়া হয়ে গেছি আজ ।

২

বড় আনন্দ, দেখা হ'ল ফের—

বহুদিন পরে দেখা,

সেইখানে আজও, কয় ঘরই আছে,
 নহতো নেহাৎ একা ।
 স্বদেশে বিদেশে বহু ঘুরিয়াছি ভাই,
 নাহি হোক দেখা — তোমাদিকে ভুলি নাই,
 জীবনের সাজে পুনর্মিলন—
 ছিল কি ভাগ্যে স্থিতি ।

৩

বেশ তো এখনো তেমনি করিছ
 বিতরণ মধু ফল,
 তপ্ত মাঠেতে তুষিতকে দাও
 যাহা তব সম্বল ।
 ছিন্ন ছায়া ও দিবার শক্তি নাই
 অন্ন মধুর আতিথ্য তবু পাই,
 তবু সেই দূর শৈশব স্মৃতি
 হয়ে আছে উজ্জল ।

৪

কান্দারি গেছি—গুচ্ছ গুচ্ছ—
 পাক-ধরা আঙ্গুর—
 পেয়েছি খেয়েছি—খুব ভাল হোক,
 খুব বটে সুমধুর ।
 তুমিই পড়িতে বারবার তবু মনে,
 দেখা হয়েছিল সত্য শুভক্ষণে ।
 তব কাঁটাবনই মন মধুপের
 গুঞ্জে তরপুর ।

দুই ভাই

মনোজ বসু

দুই ভাই—শুভকর আর দীপকর। বড় ভাব দু'জনে। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। বেড়াই একসঙ্গে, খায় পাশাপাশি বসে, ঘুমায় এক খাটে। শিঠিপাঠি ভাই, কিন্তু কগড়াঝাটি কোনদিন ভিলেকের তরে হয় নি।

দু-ভাই একই সঙ্গে ইন্সুল-কাইন্সাল পরীক্ষা দিয়েছে, সেই সময় চঠাৎ বাপ মারা গেলেন। রোজগারের মাগুয় রইল না। মা চোখে অন্ধকার দেখল। ছেলে দু'টিকে নিয়ে তিনি ভাইয়ের বাড়ি গেলেন।

ভাই বিশ্বস্তর। তাঁরও অবস্থা খারাপ। ঠিকাদারি অফিসে সামান্য চাকরি করেন। ভাগনেদের দেখে তবু খুশিই হলেন তিনি। সমাদরে সকলকে আহ্বান দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মতলব টের পাওয়া গেল। বিশ্বস্তর খুলেই বললেন সমস্ত কথা। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, খাটবার ক্ষমতা সেই। মনিব তাই অবসর নেবার জন্য বলছেন। খেচ্ছার না নিলে জোর করে সরিয়ে দেবেন অফিস থেকে। শুধন একেবারে নিরুপায়।

তবে মনিব একটা কথা বলেছেন। বিশ্বস্তরের আপন-কেউ যদি থাকে, তাকে চাকরিটা দিয়ে দেবেন। বিল-সরকারের কাজ। মাইনেও নিতান্ত অল্প। কিন্তু সেই টাকা করেকটি চলে গেলে এই বয়সে না খেয়ে মরবার অবস্থা। ভাগনেদের পেয়ে অত খুশি হবার কারণটা তাই।

বিশ্বস্তর বলেন, তোমাদের মধ্যে যে হোক কাজটা নিধে নাও।

দীপকর এক বছরের ছোট শুভকরের চেয়ে। বিষয় মেদী। বলে, কী বলছেন মামা! বিল-সরকার হতে বাব আমরা? অনেক উঁচু আশা। পাশ যদি করি—সে আমরা করবই—কলেজে ভর্তি হবে, পড়াশুনো করবে। বড় হবে জীবনে।

মামা ভেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : পথ দেখ তা হলে। মাকে নিধে বেরিয়ে পড়। আমার শপট কথা। তালুক-মুলুক নেই যে এই বাজারে তিন তিনটে মানুষকে বসে থাকায়। ভাগনেদেরই কর্তব্য বুড়ো মামাকে প্রতিপালন করা। তা যখন করবে না, বিধায় হও।

দীপকর উত্তেজিত হয়ে আবার কি-একটা জবাব দিতে বাজিল, শুভকর ছুটে এসে পড়ে তাঁর মুখে হাত চাপা দিল। বয়সে তো মাত্র এক বছরের বড় দীপকরের চেয়ে, কিন্তু বিচার-বিবেচনা ও কথাবার্তার সে প্রবীণ মানুষের মতো। বলে, দীপকরের কথা কানে নেবেন না মামা। পৌরায় একটা। ওর বড় হবার ইচ্ছা—পাশ করে ও কলেজে ভর্তি হোক। আপনার চাকরিটা আমার ব্যবস্থা করে দিন, আমি করব। সত্যিই তো, একজনে চাকরি না করলে সংসার চলবে কিসে?

মামা খুশি হয়ে মনিবকে জানিয়ে দিলেন। মনিব বললেন, রথযাত্রার দিন নতুন খাতা আম'বের। শুভকর তখন থেকে কাজে লাগবে। এই কয়েকটা মাস যেমন চলছে চালিয়ে যান আপনি।



শুভকর ছুটে এসে পড়ে তার মুখে হাত চাপা দিল।

তাই ঠিক হয়ে রইল। জুলাই মাসের পোড়া থেকে নতুন বিল-সরকার শুভকর চৌধুরী।

দীপকরও ইতিমধ্যে নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ওদের এক মালভূতো ভাই কলকাতার বড় কলেজের প্রফেসর। কাকুতিমিনতি করে দীপকর তাঁকে চিঠি দিয়েছিল। একজনের পড়াশুনোর ভার নিয়ে নেবেন, তিনি লিখেছেন।

এই সময় পরীক্ষার খবর বেরল। ভাই হৃ-মেনেই ভাল করেছে। শুভকর বেশি ভাল, স্বলারশিপ পেয়েছে সে একটা।

দীপকর চুপিচুপি বলে, তুইও চল দাদা কলকাতায়। ভবিষ্যৎ কেন নষ্ট করবি? চাকরিটা নিলে সারা জীবন উন্নতি করতে হবে। তোরাও একটা ব্যবস্থা হয়ে বাবে। পরীক্ষার কল দেখে লুকে নেবে তোকে কলেজে।

অনেক টানাটানি করল দীপকর। কিন্তু শুভকর রাজি নয়। বলে, হৃ-ভাই বেরিয়ে পড়লে মায়ের উপায় কি হবে? যা মায়া মুখে বলেছেন, কাজেও ঠিক ভাই করবেন। তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না, চালাবেন তিনি কেমন করে? যেমন কথাবার্তা হয়ে আছে, তাই হোক। তুই পড়াশুনো করতে যা, আমি কাজে ঢুকি। হৃ-ভাইয়ের একজন মানুষ হলোই হ'ল। তুই কি আমার ফেলে দিবি মানুষ হয়ে?

এমনি সব কথাবার্তা। হঠাৎ বিনামধ্যে বজ্রাঘাত। ওলাওটা হয়ে শুভকর মারা গেল।

স্বামী পেছেন, বড় ছেলেটিও গেল—মা তো মাথা ভাঙাভাঙি করছেন। দীপকরও দাদা-দাদা করে আকুল।

মাসখানেক পরে খানিকটা শান্ত হয়েছেন সকলে। মালিকের তাগিদ পেয়ে বিশ্বস্তর আবার কথা তুললেন : শুভকর গেল, কিন্তু পেট তো মানবে না। আমাদের সকলের কথা ভেবে তুই তবে চাকরিটা নে দীপকর। নম্র তো অস্ত্র লোক নিয়ে নেবে।

দীপকর উদাসীন ভাবে বলে, নেয় নিক। আমি চাকরি করব না, পড়ব।

তাই তো ঠিক ছিল রে বাবা। কিন্তু শুভকর চলে গিয়েই সব উন্টোপান্টা হয়ে গেল।

দীপকর বলে, দাদার বড় ইচ্ছা ছিল পড়েওনে আমি মানুষ হই। সেই জন্তেই সে চাকরিটা নিয়ে নিচ্ছিল। সে নেই বলেই আরও আমি তার ইচ্ছা পূরণ করব। কলেজে ভর্তি হওয়ার শেষ-তারিখ পরন্ত—

বিশ্বস্তর বলেন, কাজে বোগ দেওয়ার তারিখ কাল। হোক সকাল। আমার সঙ্গে হয় আগিলে বাবি, নয় তো মায়ের-ছেলের দূর হয়ে বাবি আমার বাড়ি থেকে।

দীপকর বলে, ভোর-রাত্রেই আমি বেরিয়ে পড়ব। কলকাতায় কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমার হাজির হওয়া চাই।

বিশ্বস্তর শাসানি মিলেন : তা যদি করিস তোর মাকেও সকালবেলা ঠিক পথে ঠাঁড়াতে হবে। বাজে কথা আমি বলি না। ছেলে হয়ে তুই যদি মায়ের কথা না ভাবিস, আমার কী এমন দায় পড়েছে?

বিষয় কলহ। না খেয়ে দীপঙ্কর মড়াম করে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অগ্রপট্যং ডেবে বেখেঁচে নিশ্চয়। সকালবেলা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। মামার পরম বশবৎ। কলকাতার ঘাবে না সে, চাকরি নেবে। বিশ্বস্তর আকিসে নিরে গিয়ে বহাল করে দিয়ে এলেন। কোম্পানির নতুন বিল-সরকার দীপঙ্কর চৌধুরী।

মাস তিনেক পরে দুর্গাপুত্র। দীপঙ্করের সেই মাসভূতো ভাই অধ্যাপক বঞ্জীর বিন হঠাৎ বিশ্বস্তরের বাড়ি এসে হাজির। বিশ্বস্তর তাঁরও মামা।

অধ্যাপক বলেন, দীপঙ্করকে নিয়ে কমা চাইতে এসেছি মামা।

বিশ্বস্তর তাকিয়ে দেখলেন, অধ্যাপকের পিছনে দীপঙ্করই বটে। গুটিহুটি হয়ে ঝাঁড়িয়ে। বিরক্ত হয়ে বললেন, এখনো বাড়িতে—আপিসে বাসনি আজ তুই?

দীপঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বলে, আপিস—কোন আপিস?

অধ্যাপকও বলেন, আসছে তো আমারই সঙ্গে কলকাতা থেকে। আমি সাহস দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আমাঘের কলেজে পড়ে। আশ্চর্য মেধা—ক্লাসের পরীক্ষায় ফাস্ট হয়েছে অতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে। দীপঙ্কর সমস্ত আমার বলেছে। আপনার কথা মতো লেখাপড়ার ইত্রক। ধেরনি—আমি বলি, ভালই করেছে মামা। দেশের মুখোজ্জল করবে এই দীপঙ্কর একদিন, আপনার কাছে আম বলে বাড়ি।

বিশ্বস্তর ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বললেন, পাগলের মতো কি বলছ? দীপঙ্কর তো আমার এবানই থাকে, আমি যে কাজ করতাম সে তাই করে এখন। বেয়েয়েয়ে একটু আপসেই সে আপিসে চলে গেছে।

রহস্তম্বর ব্যাপার!

আপিসে চললেন তখনই সকলে মিলে। দীপঙ্করকে ঘেঁষে মনিবমশায় বললেন, বিলের হিসাব দেখতে দেখতে হঠাৎ তুমি কোথায় উধাও হলে দীপঙ্কর? ডেকে ডেকে আর পাওয়া যায় না।

বে শোনে দে-ই অবাক হয়ে যায়। ভয় পায়। বিল-সরকার সেই দীপঙ্কর চৌধুরীর আর খোঁম হয় নি। ব্যাপারটা রহস্যবৃত্ত হয়ে গেল।

আসল দীপঙ্কর চৌধুরী আসামে থাকে। অধ্যাপকের ভবিষ্যদ্বাণী সকল করে মস্তবড় ভূতাত্ত্বিক সে এখন। নাহারকাটির পেট্রোলের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম থারা সন্ধান পায়, তার মধ্যে দীপঙ্কর চৌধুরী প্রাধান্য একজন। সরকারি রেকর্ডে নাম দেখতে পাবেন।



শ্রীবোণেশচন্দ্র বাগল

কারো সঙ্গে কতকটা মিলে যাবে, আবার নাও মিলতে পারে হয়ত। বাংলা বই পড়ার কথাই তোমাদের আগে বলছি।

ছেলেবেলায় আমাদের বড় হুল্লর একখানি বাল্যশিক্ষা ছিল অ, আ, ক, খ—আম্র অক্ষর নিয়ে, এক একটি লক্ষ বা বস্তুর ছবি আঁকা। এর তলার এক এক লাইনে পরিচয় দেওয়া। যেমন, অ—অঙ্গুরটি আসছে তেড়ে; আ—আমটি আমি বাব পেড়ে। আবার দের প্রথম পাঠের লাইনগুলি কত অর্থ পূর্ণ:

“কর পণ নর গণ দশ জন এক মন।

বড় বয় ডর হয় বড় ভয় তত নর।”

সেই বিখ্যাত কবিতাটি তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে—“শান্তি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কহুমকলি...”। পাঠশালায় ক্রমে উঁচু ক্রাসে উঠি এবং নতুন বই পড়ি। তবে আমাদের সময়ে বই-এর এত রকমারি ছিল না। মনে পড়ে, কাজী এমদাউল হকের ‘নিম্ন প্রাথমিক পাঠ’ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠশালায় উঁচু ক্রাসে আমাদের পড়তে হ’ত। এই বইয়েই প্রথম রাজা রামমোহন রায়ের কথা পড়ি। তিনি কত বড়, বয়সেও প্রবীণ, কিন্তু ছেলেরের সঙ্গে মিশে প্রতিদিনই বৈকালে দোলনায় দোল খেতে ছাড়তেন না।

‘পড়া’ কথাটি আমরা কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি। যেমন, গাছ থেকে পড়া, আকাশ থেকে পড়া, বৃষ্টি পড়া ইত্যাদি। আমি কিন্তু এখানে তোমাদের অত্র অর্থে এ কথাটি বলছি। তোমরা বই পড়, বয়সের কাগজ পড়, ছোট-বের বড়দের মাসিক পত্রিকা পড়। এখানে ‘পড়া’ মানে এই ধরনের পড়া। তোমরা বড় হয়ে, এখন বা পড় তার চেয়ে কত বেশী বই পুঁথি, পত্র-পত্রিকা পড়বে। আমাদের ছেলেবেলাকার পড়ার কথা কিছু বলি। হয়ত তোমাদের কারো

আরও কিছু পরের কথা। উচ্চ ইংরেজী কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছি। তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের বাংলা বই ছিল সরস্বালা মন্তের 'প্রিয় পাঠ'। বইখানি এত সহজ ও হৃদয় করে লেখা যে আমাদের বড়ই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ বই-এ প্রথম পাই—গাছেও মাহুঘ খায়। কি তাজব ব্যাপার! ছবিতে দেওয়া ছিল, একজন মাহুঘকে লতানে গাছ চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে এর বর্ণনাও বই-এ পড়লাম। বালা ও কৈশোরের মাক পথে পাওয়া ও দেখা (অবশ্য ছবিতে) দৃশ্যটির অহুভূতি এখনও যেন মনে জুড়ে রয়েছে।

এই ক্লাসে কি পরের ক্লাসে ঠিক মনে করতে পারছি না, 'কবিতা পাঠ' নামে একখানি কবিতার বই পড়েছিলাম। তোমাদের মতই আমরাও ও সময়ে সমস্ত কবিতা মুখস্থ করতাম। 'মাতৃস্নেহ' নামে একটি কবিতা ছিল, এর একটি শক্তি এখনও মনে আছে—"গোপনে বিদিত বথা অনন্ত আকাশ।" মাতৃস্নেহ কিরূপ তা বোঝাতে গিয়ে কবি এই উপমাটি দিয়েছেন। তখন তোমাদের মতই ছোট ছিলাম, অত শত বৃত্তাম না। এখন দেখি কত অর্থ-পূর্ণ। তোমরাও বড় হলে উপমাটির মানে ঠিক ঠিক বৃত্তে পারবে।

এ বই-এ কি অন্য বইয়ে ঠিক মনে নেই, আরও কোন কোন কবিতার অংশ বা লাইন এখনও কিছু কিছু মনে পড়ে। যেমন :

"এক পা, দুই পা, তিন পা করি
বেতে হুঁ বেতে পার সহস্র বোজন।"

* * *

"জলে না নামিলে কেহ নেখে না সীতার
হাটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়
সীতার শিবিতে হলে
আগে তবে নাম জলে।
একবার না পারিলে বেশ শতবার।"

তোমরা কি এখন 'চাপকা শ্লোক' পড়? আমরা কিন্তু শৈশবে পড়েছি। যেমন হৃদয় হৃদয় শ্লোক তেমনি তার হৃদয় হৃদয় বাংলা অহুবাধ। এবারিও তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে আমাদের সকলের পড়তে হ'ত। শ্লোক ও বাংলা অহুবাদ আমরা মুখস্থ করতাম। শ্লোকগুলি খুব সোজা, তবু সংস্কৃত বাক্যের মত বয়স তো তখন আমাদের নয়। শ্লোকের সঙ্গে বেওয়া বাংলা কবিতা দেখে এর মানে আমরা কতকটা বুঝে নিতাম। তোমাদের বলব কি, বইখানি আমাদের বড় ভাল লাগত। এখনও কোন কোন শ্লোক মনে আছে। এখানে দুটি মাত্র তোমাদের শোনাই :

“বিদ্বৎক নৃপতক নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।”

এবং

“দূরতঃ শোভতে মূর্খো লঘুনাটঃ পটাবৃতঃ।

তাবচ্চ শোভতে মূর্খ বাবৎ কিঞ্চিন্নভাবতে।”

এই রকম আরও কত স্লোক তখন মুখস্থ করি। এই দুই স্লাগে পড়ার সময় আর একটি অভিজ্ঞতা যা লাভ করি তা এখন তোমাদের বলছি। এতদিন পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই পড়িনি। এর কারণ বাইরের বই পড়ে তা বুঝবার মত জ্ঞান হওয়াও তো চাই। পিতৃদেবকে দেখতাম, সমস্ত বৈশাখ মাসটা রামায়ণ মহাভারত পড়ে বৃদ্ধাদের শোনাতেন। কি চমৎকার স্বর দিয়ে পড়া। তাঁর পড়া দেখেই আমারও মনে এ বই দু’খানি পড়ার আগ্রহ জাগে। তখন কিছু কিছু বুঝি, তবে এখন মনে হয় অনেকটাই অ-বোঝা থেকে বেত। তবু পড়তাম, এবং পড়ে বৃদ্ধাদের শোনাতাম। এই রকম করে কৈশোরে পা দিয়েই কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত অনেকটা পড়ে কেললাম। এ যেন এক নূতন জগৎ!

পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে দেবি, উপেন্দ্রকিশোর ঝারচৌধুরীর ছোটদের রামায়ণ আমাদের পাঠ্য। তোমরা আজকালকার ভাষায় বিকল্পও বলতে পার, কেন না এ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকত না। বড় স্বন্দর বই। তবে কাহিনীগুলি আগেই আমার জানা। এখানি ডেমন করে পড়া আর দরকার বোধ করিনি।

এ ধরনের বই বতই ভাল হোক না কেন, আগে পড়লে মূল বই পড়ার কৌতূহল কমে আসে। এর ফলে যেখি ছেলেদের কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়ার আর মন বসে না। এতে ভাষা শেবার দিক দিয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতের কথা মনে হলে সে-সময়কার আরও কত কথা মনে পড়ে। আমরা ছেলেবেলায় বটতলায় ছাপা রামায়ণ মহাভারত পড়েছি। এতে কাঠ-বোদাই ছবিও থাকত বিষয়। আমাদের দেশে রবি বর্ষাই বোধহয় রামায়ণ মহাভারতের নায়ক-নায়িকা নিয়ে ছবি আঁকার দুগ্গান্ডর এনেছেন। পরে তাঁর ছবিগুলি এই দু’খানি মহাকাব্যে দেওয়া শুরু হয়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্র-শিষ্যরাও ক্রমে এই দু’খানি বই-এর বিষয়বস্তু নিয়ে নূতন ধরনের বিষয় ভাল ভাল ছবি আঁকেছেন। আজকালকার কোন কোন সংস্করণের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে এই সব ছবি। এক হিসাবে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের ভাগ্যবান, কারণ এসব বই এখন তোমরা অনায়াসে পেতে পার।

আরও কোন কোন বই-এর কথা এখন বলি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছি। কি জানি কেন, পড়ার

নেশা আমাকে পেয়ে বসল। হাইস্কুলে লাইব্রেরী তো থাকে চাই। তবে খুব বেশী বই যে স্কুলের গ্রন্থাগারে ছিল তা মনে হয় না। বেশী না হলেও কতকগুলি বই ছিল বাছা বাছা। আবার বলি, তোমরা এখন খুবই ভাগ্যবান—ছেলেদের পড়ার মত বই আজ কত। আমাদের সময়ে বা বই ছিল তা প্রায় আঙ্গুলে গোনো যেত। স্কুলের লাইব্রেরীতে পেলাম দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা', 'ভীষ্ম', 'জড়ভরত' এরকম কয়েকখানি বই। এসব নিয়ে একে একে পড়ে ফেলি। এ সময় এ ধরনের ছোট ছোট আরও কোন কোন বই পড়ি, কিন্তু সব নাম এখন আর স্মরণ করতে পারি না। আমার পড়ার বছর দেখে পিতৃদেব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। প্রতিবেশী এক যুবক আমার নাম দিলেন ঐষকীট। বইগুলি পড়তে তখন বড় ভাল লাগত। ছেলেদের মত করে লেখা বটে, তবে চলিত ভাষায় লেখা নয় কিন্তু। তখন এ ভাষার বেগম্বাজ হয়নি।

আর একখানি বই—এর কথা তোমাদের এতক্ষণ বলতে চলে গেছি। সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলি। 'বঙ্গের রত্নমালা' নামে একখানি বই আমি এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাই। তাতে এক একটি কাহিনীর সঙ্গে এক একজন প্রসিদ্ধ বাঙালীর ছবি ছিল। এক একজনের জীবনের কোন বিশেষ দিক, চরিত্র, কোন বিশেষ ঘটনা বা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বেশ ছুটিয়ে তোলা হয়েছিল। অনেক লোকের নানা কাহিনী এ বই পড়ে জানতে পারি। একবার স্কটিশ চার্চ কলেজের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়। স্কটিশ কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত ঐ কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক হুনিথ্যাত গৌরীশঙ্কর দে'র নিকটে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, তিনি তাঁর কলেজে আসতে পারেন কিনা, বেতন বেশি দেবেন। গৌরীশঙ্কর প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি হুদিনে যেখানে কর্মরত, হুদিনে কেমন করে তাকে ছেড়ে আসবেন? আর একটি কাহিনী। তার শিরোনামায় ছিল, 'বাকে রাখ সেই রাখে' ঘটনটি তোমাদের নিকট হয়ত খুবই তুচ্ছ বোধ হবে। তবে তুচ্ছ বোধ হলেও সামান্য নয়। কোলকাতারই এক গ্রামে জনৈক গরীব গৃহস্থ বধু ছাই কেলে কেলে টিবি করে রেখেছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁদের অবস্থা ঝিরে যায়। ভাল বাড়ি হয়। এই ছাইয়ের টিবি নুতন বাড়ি ভৈরবী সমরও ঘাঘ বড় কাজে লেগে। এই রকম আরও অনেক ছোট ছোট কাহিনী। কত স্মরণ করে প্রাণল ভাষায় লেখা। এখনও মনে আছে—একটানা পড়ে ফেলেছিলাম। বইখানি কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখা, সাধুভাষায় কিন্তু।

এই রূপে উঠে সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা পড়ারও সুযোগ পাই। আমার এক সহপাঠী 'হিতবাদী' রাখত। তখনকার দিনের সাপ্তাহিক কাগজ ছিল কত বড়—খাড়া করে ধরলে পা থেকে আমাদের প্রায় ঘাড় পর্যন্ত উঁচু, চওড়াও কম নয়। এখন আর এ ধরনের কাগজ চোখে পড়বে না। 'হিতবাদী'র 'বুদ্ধের বচন' বড়ই কৌতুককর ঠেকত। ছোট ছোট প্যারায় সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে

বস-বচনা। এত ভাল লাগত যে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতাম। বহু বৎসর পরে 'বৃক্ষের বচনে'র লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, ওসব লেখার সময় আমিও বৃক্ষ ছিলেন না, তাঁর বয়স তখন তিরিশের কোঠায়।

মাসিক পত্রিকা পড়াও শুরু করি এই সময়। খুলে গ্রন্থাগারটি ছোট ছিল বটে, কিন্তু তখনকার দিনের ভাল ভাল মাসিক পত্র এখানে রাখা হ'ত। আমি প্রথমে 'ভারতবর্ষ' পড়তে আরম্ভ করি। রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদীর 'প্রজ্ঞার জয়' পড়ি। বতস্বর মনে হয় খুব কমই তখন বৃষতে পেরেছি—বৃষবার বয়স তো নয়ই। তবে এই নামটি আমার বরাবর মনে আছে। বর্ধমানের মহারাজার লেখা 'ইউরোপে ন মাস'ও প্রতিমাসে পড়তাম। কত বড় বড় শব্দ, কঠিন সমাসবন্ধ—যেন দাঁত ভাঙা কাব্য। খুব কমই বুঝতাম, তবুও পড়তাম।

আগমনী

শ্রীগোপাল ভৌমিক

শরভের আগমনে মেঘে ঢাকা দিন
কেটে গেলে খোকাথুর্নু চোখে দূরবীন
দিয়ে দেখে ওই কাছে আসে মহাপূজা
নানা সাজে সজ্জিতা মাতা দশভূজা।

নতুন পোশাক পরে সেকি মহাধুম
রাস্তিরে হুই চোখে আসে নাকো ঘুম।
ঢাকঢোল সোরগোল যা খুসি তা কর,
বলবে না কেউ কিছু হও ছোট বড়।

বরবার মুখ ভার আকাশটা ভুলে
নীল রঙ মেখে খুসি ওঠে হলে হলে।
মিঠে রবিকর-মাখা বাসা দিনগুলি
গান গায় মিঠে সুরে যেন বুলবুলি।

ঈষৎ শিশির-ভেজা তোর বেলা উঠে
খোকা দেখে কুঁড়েমির ভূত গেছে ছুটে।
প্রজ্ঞাপতি মন তার উড়ে যেতে চায়
শহরের সীমা ছেড়ে কোন দূর গাঁয়।

মা বাবার গম্ভীর মুখে কোটে হাসি—
খোঁজ নিতে আসে যত আছে পিসী মাসী।
নতুন পোশাক জামা ছাড়াও যা জোটে
ভাবলে আগেই জল আসে হুই ঠোটে।

শরভের কথা ভেবে খোকাথুর্নু তাই
উল্লাসে মেতে ওঠে, করে হাইফাই
বহুদিন আগে থেকে ঘুম-হীন চোখে—
ছুটির সানাই বাজে সারা মনোলোকে।

গল্প হলেনও সত্যি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে কবি দাশরথি দাস পাঁচালি গানের জন্ম বাংলাদেশে বিখ্যাত ছিলেন। জ্ঞানী, গুপ্তী ও রসিক জনের কাছ থেকে দাস দাস শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন যথেষ্ট।

একবার এক গরীব লোক দাস দাসকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। গৃহস্থারী দাসদাসের একজন ভক্ত, নিজে পরিবেষণ করে, অতি বস্ত্রে তিনি দাসদাসকে আহ্বান করলেন। আহ্বানের মধ্যে আড়ম্বর কিছু ছিল না। কিন্তু আহ্বার শেষে দাসদাস পরম ভূষিতে বললেন—এমন স্বাস্থ্য কখনও খাইনি, সবই অমৃতময়।

গৃহস্থারীর এক বন্ধু সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন। দাসদাসের টাকার-পরসার আছে। ব্যাপার মেখে তিনি তো অবাক। ভোজ্য বস্ত্র অতি সাধারণ, তবু তাই আহ্বার করে দাসদাসের এতো ভূষি? দাসদাস তাহলে ভাল জিনিস কখনও খেতে পাননি। ভাল খেতে গেলে না জানি তিনি আরও কত প্রশংসা করবেন। বন্ধুটি তখনই দাসদাসকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বললেন।

পরদিনই দাসদাস গেলেন তাঁর গৃহে। বড়লোকের বাড়ী, সম্মানী অতিথি এসেছেন, চাকর ও পাচকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। চাকর আসন পেতে দিল, পাচক আহ্বার এনে দিল, কর্তা সামনে বসে আলবোলায় তামাক খেতে লাগলেন। একটির পর একটি নানা স্বাস্থ্য আসতে লাগলো। দধি ও মিষ্টানের প্রাচুর্য দাসদাসকে অবাক করে দিল।

আহার শেষে দাসদাস উঠলেন। আচমন করে পান চিবুতে শুরু করলেন, কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। কর্তা বিস্মিত হলেন, শেষে নিজেই প্রশ্ন করলেন—কেমন আহ্বার হলো? ভূষি হয়েছে তো?

দাসদাস সংক্ষেপে বললেন—বেশ।

কর্তা বললেন—কাল আমার বন্ধুর বাড়ী খেয়েছিলেন, আজ এখানে খেলেন, বন্ধু খাইয়েছিল আড়াই টাকা মনের চাল, আর আমার এখানে যে চাল খেলেন এর মন দশ টাকা। পাচকটিও কলকাতার একজন সেরা পাচক, বাম্বাবারা কেমন লাগলো?

দাসদাস এবারও সংক্ষেপে বললেন—বেশ।

কর্তা এবার ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—কাল অতো সাধারণ আহ্বার করে কতো প্রশংসা করলেন, আর আজ আমার এখানে আহ্বার করে তো একটা কথাও বলছেন না?

—কী বলবো?

—কালকের চেয়ে ভালো
খাওয়া হলো, এটা বলবেন তো?

—তা কি করে বলি?

আপনি অনেক পরচণ্ড্র করেছেন
সে কথা সত্যি, কিন্তু লুচিতে যেমন
ময়ান না দিলে বত ভাল ছি-ই
হোক, লুচি ভাল হয় না, তেমনি
আহার্যেও ময়ান দেওয়া দরকার।
আপনার আহার্যে ময়ান নেই।

—ঠিক তো বুঝলাম না?

—কাল আপনার গরীব বন্ধু
আমাকে বা খাইয়েছিল তাতে
শ্রদ্ধা ও প্রেমের ময়ান ছিল।
আজকে আপনার এই আহার্যে সেই
ময়ান নেই। আজ এই আহার্যে
পেলায় বড়লোকের অর্থের অহংকার
আর ধরচের জলুস। সেইজন্য এই
আহার্য আমার কাছে কালকের
মত স্বচ্ছ লাগেনি।



‘কাল অতো সাধারণ আহার করে কতো প্রশংসা করলেন. আর
আজ আমার এখানে আহার করে তো একটা
কথাও বলছেন না।’

দাণ্ডবাবুর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার কণ্ঠা সজ্জিত হলেন, পরক্ষণেই লজ্জার মাথা নত করলেন।
বুঝলেন কোথায় তিনি ভুল করেছেন।

আজকের দিনে কবি ও লেখকদের মধ্যে এই গুণ লুপ্ত হয়ে আসছে।

পূজার দিনে

শ্রীশ্রদ্ধাকর মাঝি

পূজা। পূজা। পূজা।

বহর পরে আশ্বিনে ফের আসছে দশভূজা।

হাফা নীলের আড়বরে

আকাশ তাকে বরণ করে—

শিউলি কুলের গন্ধে হোল বাতাস উত্তরোল।

কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে খুশির দোল।



আয় রে ছয়ার খুলে।

ছুটির দিনের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে ইন্দুলে।

ঐ যে বোধন বাঁশীর সুরে

মায়ের শুভ-আশিস ঝরে—

আজ কে তুমি, মলিন মুখে নয়ন ছলোছলো?

গোমড়া মুখে আজ থাকে না, কি হয়েছে বলো?



শানাই মিঠে বাজে।

কানায় কানায় চলকে ওঠে খুশির পেয়ালা যে!

আনন্দের এই উৎসবেতে

সকলকে চাই কাছে পেতে—

মেঘলা মনে আজ পুলকের আলোক দিলে পর

দশভূজার পূজা হবে সার্থক ও সুন্দর।

পূজার উপহার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূজার ছুটির আর সপ্তাহ খানেক বাকী।

শহরতলীর একটি স্থলে নিম্ন শ্রেণীর প্রথম-পাঠ পড়ুয়াদের মনে আনন্দ আর ধরে না। মহা হৈ চৈ। ওরা দ্বির কয়েছে এবার পূজা উপলক্ষে শিক্ষয়িত্রী দিদিমণিকে কিছু উপহার দেবে।

কেউ না বললেও কথাটা কানে গেছে শিক্ষয়িত্রীর। কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। পড়ুয়াদের ত জানাই আছে। সে-ই ইলা, কৃষ্ণা, স্বরনা, ডাক্তর বই তো নয়? গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে সবাই। কিসের পূজা, আর কী-ই বা আনন্দ ওদের!

কিন্তু ছোটদের যে কথা সেই কাজ। শিক্ষয়িত্রী দিদিমণিকে তারা উপহার না দিয়ে ছাড়বে না। অর্থাৎ করে দেবে তাকে। যে যে-রকম পারছে উপহারের জিনিস সংগ্রহ করেছে। অতটুকু ক্ষুদ্র মেয়ে কাজল, সেও কিনা এক বাস লেঙ্গেন কিনে ফেলল।

সকলেই ত উপহার দেবে, কিন্তু বেচারী প্রসাদ এখনো কিছু যোগাড় করতে পারেনি। ওর মনে বড় দুঃখ। সে-ই আবার বেশি ভালবাসে দিদিমণিকে; ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সে-ও দিদিমণির সব চেয়ে বেশি প্রিয়।

কয়েক মাস আগেকার কথা। সেদিন প্রথম স্থলে এল প্রসাদ। তার মা তাকে দিয়ে গেল স্থলে। এই বড় লাল বাড়িটা আগেও সে দেবেছে বাইরে থেকে, ভালই লেগেছে; কিন্তু বাড়ির ভেতরটা ছিল অজানা আতঙ্কে ভরা। বা হোক, ওকে নিবে বসিয়ে যেওরা হ'ল প্রথম পাঠ পড়ুয়াদের শ্রেণীতে। অসংখ্য ছেলেমেয়ে কিলবিল করছিল। প্রসাদ ভর পেরে একেবারে কঁদে ফেলল। অমনি কে-একজন এসে তাকে কোলে তুলে নিল, আদর করে বলতে লাগল, কঁদছ কেন খোকন, কি হয়েছে তোমার? প্রসাদ সমস্ত চোখে মিটমিট করে তাকাল। মা নয় তো? কান্না তুলে ছেলে মুখ গুঁজল ওর বুকে। হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে বলল, এখনো ত বড় হইনি, ইথলে পড়ব না আমি। মা কোথায়? শেব পর্বত শিক্ষয়িত্রীর কোল থেকে নামল না। ভালই কেটেছিল প্রথম দিনটা। তারপর ক্রমে ভর চলে গেল। এখন বোঝ সে স্থলে আসে সকলের আগে, বাড়ি বার সকলের শেষে। দিদিমণির কাছে ঘুর ঘুর করে। কত রেহ, আদর।

কিন্তু এখন মনে বড় দুর্ভাবনা। দিদিমণিকে সে কী উপহার দেবে? কিছুই যোগাড় করতে পারে নি; পরশাও নেই যে বোকান থেকে কিনে নেবে। কী করা যায়? হাত খালি, কিন্তু মনে আগ্রহ।

অবশেষে মুখ ফুটে বলল মাকে । মা তো চটে গেল, উহু, ওসব হবে-টবে না ।

ও বলল, দিদিমণি আমাকে খুব ভালবাসে, কিছু একটা না দিলে কি ভাল দেগাবে ? আর সকলেই উপহার দেবে, আমি না দিলে আমাকে ত ক্যাঁপাবে সবাই ।

মা বলল, আমাদের ত দেবার ক্ষমতা নেই প্রসাদ । পঞ্চসাকড়ি কোথার পাব ? আমরা যে গরিব । জল এসে পড়ল মা'র চোখে । তারপর বিনিয়ে বিনিয়ে কত অন্ডার অনটন দুঃখ দুর্দশার কথা বলল ওকে ; প্রসাদ কতক বুঝল, কতক বা বুঝল না ।

মা বাপ গরিব, তাই প্রসাদ অসহায় । কিন্তু দিদিমণি কি তা বুঝবে ?

* * * *

আজ স্কুল হয়েছে ছুটি । পুজার ছুটি । খুব ফুটি ছাত্রছাত্রীদের মনে । ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং । কিন্তু হটগোল আর খামে না, প্রথম পাঠ পড়ুয়াদের শ্রেণীতে আবার হৈ চৈ-টা ঘেন একটু বেশি । ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কিলবিল করছে । হাসাহাসি, কানাকানি । সকলের হাতেই কিছু না কিছু ভিনিস । এক-একজন ঘরে ঢুকছে আর সবাই ঘিরে ঠাড়াচ্ছে তাকে,—কি এনেছিস ভাই, কি এনেছিস ?

ব্যাপারখানা কি ?—দিদিমণি ভাবছে । ওদের হাবভাব ঘেন আজ কি রকম ঠেকছে ।

ঐ কোণে হঠাৎ কে ঘেন কেঁদে উঠল । দুটো বেঞ্চের ফাঁকে কার পা দেখা যাচ্ছে ? ছুটে গেল দিদিমণি । আরে, এ যে উমা ! বেচারিকে কে ধাক্কা রেখেছে, আর একেবারে চিৎপটাং !

কাজলই প্রথম এগিরে এল দিদিমণির টেবিলের সামনে । মুখে হাসি, এক কোঁটা পাউভার দিল দিদিমণির হাতে । এক বাস্স চকোলেটও কিনেছিল, কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে নিজেই সব সাঁবাড় করেছে ।

দিদিমণি কোঁটা হাতে নিয়ে ওর দিকে তাকাল । কাজল বলল, পুজার উপহার । আপনি আমাকে ভালবাসেন কিনা ভাই । এটার দাম এক টাকা ।

পেছন থেকে কে বলে উঠল, এক টাকা না হাতি । ওরকম তিনটে পাওরা বার এক টাকার ।

দিদিমণি বলল, কেন, এর দাম দু'টাকাও হতে পারে । বেশ ত স্বন্দর ভিনিস, খুব পছন্দ হয়েছে আমার ।

পরক্ষণেই বাচ্চার দল এক সঙ্গে হুড়মুড় করে ছুটে এক টেবিলের কাছে । পড়ে গেল কাড়াকাড়ি, কে কার আগে উপহার দেবে ।

রঞ্জন দিল একখানি বই ; গৌতম দিল দু' বছরের পুরনো একখানা ক্যালেন্ডার । স্বপ্না এনেছে এক শিশি হুগুড়ি, লতিকা একটা পেন্সিল ।

আবার কান্না শোনা গেল। গোপা ক্রাসে ঢুকছে কান্ডতে কান্ডতে। হাতে একপানি চায়ে পিরিচ।

কি হয়েছে গোপা, কান্ড কেন?—দিদিমনি উঠে দাঁড়াল।

গোপার শোক বেন উৎলে উঠল। কান্ডতে কান্ডতে বা বলল তাতে বোকা গেল, দিদিমনির সঙ্গে সোনালী বর্ডার বেওয়া চায়ের কাপ ও পিরিচ সে নিয়ে আসছিল, পথে উপরের ক্রাসের একটি ছাত্র কাপট। ছিনিধে নিয়ে গেছে।

দিদিমনি গুকে সাহসনা দিলে, এমন সময় কমলা এগিয়ে এল একপানি চিকনি হাতে। ওটা সে দিদিমনির চুলে পরিষে বেবেই। গুকে মাথা একটু নোয়াতে হ'ল, কমলা বেনতেনপ্রকারে গুকে দিল চিকনিটা, এটার দাম আট আনা, পরবেন দিদিমনি, বলতে বলতে সে চলে গেল।

এমন সময়ে একটি বয়স্ক ছেলে এসে ক্রাসে ঢুকল। ও কিন্তু এই ক্রাসের ছাত্র নয়, উপরের শ্রেণীতে পড়ে। টেবিলের সামনে এসে পকেট থেকে একটি চায়ের কাপ বের করে শিক্ষয়িত্রীর সামনে রেখে বললে, এটা আপনাকে দিলাম। আমি গোপা টেচিয়ে উঠল, এই কাপটাই তো আমি এনেছিলুম, এই ছেলেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। বাস্তবিক কাপ আর পিরিচে বেশ খাপ খেয়ে গেল। শিক্ষয়িত্রী একটু বিব্রত বোধ করল। ছেলেটা কিন্তু কিছুমাত্র ঘাবড়াল না, গম্ভীরভাবে অভিযোগ অধীকার করে চলে গেল।

স্বপ্নকাপ করে যে বার উপহার এনে রাখল টেবিলে। রুমমারি ভিনিস। সাবান, স্নগতি, চিকনি, কাচের চুড়ি, ফুলের মালা, কাপ-প্রেট আরো কত কী। হাঁ, পড়ুয়ারা ভালবাসে বটে তাদের দিদিমণিকে।

উপহার বেওয়া শেব হ'ল, হৈ হৈ খামল।

এইবারে একটি ছোট ছেলে শিক্ষয়িত্রীর কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। অতি সম্ভরণে গর গায়ে হাত দিয়ে চুপি চুপি বলল, আপনার সঙ্গে একটা উপহার এনেছি দিদিমনি।

শিক্ষয়িত্রী চেয়ে বেখে প্রসাদ দাঁড়িয়ে, গায়ে একটা ছোঁড়া জামা। বলল, তুমি আবার কেন উপহার এনেছ, তোমাকে ত এমনিতেই আমি কত ভালবাসি।

প্রসাদ বলল, জানি দিদিমনি। আমিও কত ভালবাসি আপনাকে; তাই একটা উপহার দিতে চাই। সাবান, এসেল নয়; ওগব কেনবার পয়সা নেই মার কাছে। তবে বা এনেছি, সেটাও ভাল। অবশ্য আমি জানি যে ওটা কি ভিনিস, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার কাজে লাগবে। কাল বাবা ওটা মার হাতে দিতেই যা হেসেছিল। আমি সাবান আনতে পারি নি দিদিমনি, এটা নিন আপনি।

শিক্ষয়িত্রী বলল, হাঁ নেব, কিন্তু তোমার মা কিছু বলেছেন?

প্রসাদ উত্তর করল, না দিদিমণি, কিছু বলে নি। যা চানেনও না। আমিই এটা নিয়ে এসেছি, সাবান পেলাম না কিনা? তা দোষ কি? এ ত মেয়েদেরই জিনিস, একবার দেখুন না আপনি, এই বলে সে ছোট হাতের মুঠো খুলে ধরল সামনে। এক টুকরা লাল কাগজ, ভাঁজ করা।

শিক্ষয়িত্রী ওটা হাতে নিয়ে পড়ছে। উৎসুক হয়ে প্রসাদ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কাদ কাদ হয়ে বলল, ওটা নিন দিদিমণি; আমি তো সাবান আনতে পারি নি?

দিদিমণি হেসে বলল, তাতে কি? এটা ত হৃদয় জিনিস।

এ উপহার খুব পছন্দ হয়েছে আমার। সাবান, এসেঙ্গের চেয়ে ঢের ভাল। আর সত্যি এটা মেয়েদের কাছে লাগে। এমন উপহার আমি জীবনে আর পাই নি।

প্রসাদ খুশি হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

ছুটি হয়-হয় এমন সময় প্রসাদ আবার শিক্ষয়িত্রীর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, দিদিমণি আপনি উমাকে তবন চুমু দিলেন, আমাকে ত একটা চুমু দিলেন না? শিক্ষয়িত্রী হ'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে।



‘আপনার ক্ষেত্রে একটা উপহার এনেছি দিদিমণি’

সে রাতে শিক্ষয়িত্রী তার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। সামনে টেবিলে ছেলে-মেয়েদের দেওয়া উপহারগুলো ছড়িয়ে আছে। হরেক রকমের উপহার,—কোনোটা দামী, কোনোটা খেলো কোনোটা বা নেহাত অকেজো। কিন্তু এ সবার মধ্যে ঐ ভাঁজ-করা লালচে কাগজের টুকরাটাই

বেশি পছন্দ ঐর। ওতে একটি শিশু-মনের সারল্য ও যমতা প্রকাশ পেয়েছে ; আর, একটি দরিদ্র পরিবারের সন্ত তার নিষেধ মনও করুণায় ভরে উঠেছে।

প্রশ্নাবলীর দেওয়া উপহার একখানি 'ক্যাস মিহো' মাত্র—মুদ্রিত দোকানে কেনা চাল ডাল হুনের 'ক্যাস মিহো'।

ও আমার শরৎ মেয়ে

খ্রীমৎসুদন চট্টোপাধ্যায়

ও আমার শরৎ মেয়ে—রূপের ডালি,

রূপের ডালি, রূপের ডালি,

মিছরি হাসি মেঘের বৃক

ছড়িয়ে কী তুই মন ভরালি ?

ও তুই, মন ভরালি !

কত তুই ফুল ঝরালি।

ফুল ঝরালি, ফুল ঝরালি—

শিউলি-মাতাল ভোরের ঘাসে

শিশির শাদা হার পরালি !

ও আমার রূপের ডালি,

গিনি-গলা রোদ্দুরেতে

নদীর ঘাটে স্রোত বহালি।

উঠল নেচে কাঠ-বিড়ালী।

ধানের ঈষে রূপের ডালি—

শিশির-হীরের হার পরালি !

পদ্মকেশর লুটিয়ে দিয়ে

মাঠে-মাঠে কাশ ঝরালি।

ও আমার শরৎ মেয়ে—রূপের ডালি !

মিষ্টি হাওয়ায় উঠল নেচে

গাছগাছালি গাছগাছালি !

হাসল মুখে বনের মালি !

কত, হাল্কা তুলোর মেঘ দেখালি :

অপ্রজ্ঞিতা ফুল ছড়ালি।

ও আমার শরৎ মেয়ে—রূপের ডালি !

ভোর না হতেই হাত পাকালি,

হাত পাকালি—হাত পাকালি :

আগমনীর গান বানালি।

বাঁচি ঢাকের বেশ শোনালি।

শিউলি গাছের ডাল ঝাঁকালি।

ও আমার রূপের ডালি, রূপের ডালি,

মৌমাছিরে ছুটিয়ে নিয়ে

মৌচাকেতে মৌ ভরালি।

শঙ্খরামের সংগঠন

অপনবুড়ো

স্ব ছেলেবেলা থেকেই সংগঠনের দিকে শঙ্খরামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

যা কিছু করবে—দল বেঁধে নিয়ে করা চাই তার। এ ব্যাপারে শঙ্খরামের হাতেখড়ি হয় ইম্বুল পালিয়ে কড়াইগুটি সংগ্রহের কাজে।

বেশ দলটি বাগিয়ে নিয়ে ক্ষেতের এক পাশে ঘাপটি মেরে বসে পড়া। দেখতে দেখতে সকলের হাতের তড়িং-পতিতে পকেট আর কোচড-ডতি কড়াইগুটি যোগাড় হয়ে গেল। তখন প্রথম মুক্তি দিয়ে তার সদগতি করতে যে কী আরাম—সেটা শঙ্খরামের দল ছাড়া কে আর বুঝে বলো?

শঙ্খরাম এখন হাতে-পায়ে বেশ বড় হয়েছে; কাজেই কড়াইগুটি লুঠ কিংবা নষ্টচন্দের দিনে কলের বাপান সাক করা আর ভালো লাগে না।

এখন নতুন দলবল নিয়ে সে সংগঠনের কাজে যেতে উঠেছে।

পাড়াতেই একটা গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে শঙ্খরামের দল।

এ বাড়ীর বৌদি, সে বাড়ীর মাসীমা, ও-বাড়ীর পিসীমা, অপর বাড়ীর দিদিমাদের কাছ থেকে চোরচিহ্নে এই গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা নেহাত কম হয়নি।

তা ছাড়া প্রত্যেক বাড়ী থেকে সাময়িক পত্রিকাও পাওয়া যায়।

দেইগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে চমৎকার গ্রন্থাগার ও পাঠাগার তৈরী হয়ে গেল।

এর পর শঙ্খরামের দৃষ্টি গেল একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করার দিকে।

কারো কাছ থেকে গল্প, কারো কাছ থেকে প্রবন্ধ, আবার বিভিন্ন ব্যক্তির হাত থেকে কবিতা, লমণ-কাহিনী, ধাঁধা, ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হ'ল।

এ ছাড়া আর একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হ'ল—তার নাম হচ্ছে প্রচার বিভাগ।

শঙ্খরামের এক বড়লোক বন্ধু আছে। তার নাম হচ্ছে নিধিরাম।

সেই নিধিরামকে ডাকিয়ে তার ঠাকুমার মালা-জপের বলে থেকে শ'খানেক টাকা বাগিয়ে, নিয়ে—এক ক্যামেরা কিনে বসল।

নিধিরামকে বললে, দেখ ভাই নিধি, এটা হচ্ছে সিনেমার যুগ। তোকে একদিন সিনেমার প্রভিউনার হতে হবে। সব-কিছু তোর জানা দরকার। এই ক্যামেরা দিয়ে তোর হাতেখড়ি হোক। আমাদের বিভিন্ন অস্থানের ফটো তুলবি তুই। আর সেইগুলো আমাদের হাতে-লেখা কাগজে সাজিয়ে দেয়া হবে। দেখবি, কেমন বাহার খুলে গেছে কাগজের। আর শুধু কি তাই?

চোব দুটো বড়-বড় করে ধরে নিধিরাম জিন্সেস করলে, আর কি রে শম্ভুরাম ?

শম্ভুরাম জবাব দিলে, ক্যামেরাম্যান হিসেবে তোরা নাম সারা পাড়ার ছড়িয়ে পড়বে। সেই নাম সারা বাংলা দেশে,—তারপর ধীরে ধীরে তোরা সেই নাম গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে।

তখন বেগবি,—তোরা নামের নাবাবলী টাঙিয়ে দেবে দশদিকে।

বন্ধুর এই উচ্চাশুর্ন কথায় শুনে নিধিরাম ক্যামেরা নিয়ে খুব মেতে উঠল।

আর শম্ভুরাম এই সুযোগ নিয়ে নিজের সংগঠনের কাজ ক্রতবেগে এগিয়ে নিয়ে চললো।

পাড়ার গলির মুখে দাক্ষিণ জহাল জমে গেছে। শম্ভুরামের আহ্বান-নিত্রা বহু। সে দলবল জুটিয়ে বড়-বড় ঝাঁটা হাতে সেই গলির ঘোড়ে গিয়ে লাইন দিয়ে কাঁড়ালো। নিধিরামকে আগে থেকেই সে শিবিরে-পড়িয়ে রেখেছিল।

সেই শম্ভুরাম দলের মোড়ল হিসেবে এগিয়ে গিয়ে জহালের মধ্যে ঝাঁটা ঠেকিয়েছে—অমনি নিধিরাম ক্লিক-ক্লিক করে কটো তুলে নিলে।

পাড়ার পার্কে বৃক্ষরোপণ উৎসব হবে। শম্ভুরাম দলবল নিয়ে আগে থাকতেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। এমন কি বট পাকুড়ের চারা পর্যন্ত বোগাড় করে এনেছে বৈঠকখানা বাজার থেকে।

প্রথমে পল্লীর ব্রতী বালকদল ব্যাও বাজিয়ে লোক জড়ো করবে। পাড়ার পণ্ডিতমশাইকে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে পার্কের মাঝখানে। সেখানে আগে থেকেই আলপনা দেয়া ছিল। পাড়ার পিদীয়া দ্বিদিমাদের খোশামোদ করে শম্ভুরাম সকাল থেকেই আলপনা পর্বটি সেরে রেখেছে।

পণ্ডিতমশাই স্বস্তি-বচন উচ্চারণ করলেন। তারপর শম্ভুরাম বটের চারা নিয়ে এগিয়ে এলো। ছেলেরা গর্ত খুঁড়েই রেখেছিল। একটি ছেলে ছুটে এসে ছত্র-ধারণ করলে শম্ভুরামের শিরে। চারিদিকে হুগুধুনি হুক হয়ে গেল।

বেঘন বেঘন আরোহণ করা হয়েছিল—তার কোনো ক্রটিই হ'ল না।

নিধিরাম ভিড় ঠেলে বখানময়ে এগিয়ে এলো। বললে, সামনে থেকে সরে যাও সব। আমাদের পল্লীর বৃক্ষরোপণ উৎসবের কটো তুলে রাখবো।

জনতা সচকিত হয়ে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিলে। বিপুল গর্বে নিধিরাম ক্যামেরাতে ছবি তুলে ফেললে—ক্লিক—ক্লিক—

এর পর শারদীয়া পূজা এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুরামের কাজও বেড়ে গেল।

পাড়ার বে সার্বজনীন পূজা হবে ছেলেরা তার সমস্ত দায়িত্ব শম্ভুরামের ঘোড়ে চাপিয়ে দিয়ে ওকে সরাসরি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে ফেললে।

এর পর যদি শম্ভুরামের নাওয়া-বাওয়ার সময় না থাকে—তাহলে তাকে আদৌ ঘোষ দেয়া যায় না!

আর বিদ্রোহের সময় নষ্ট না করে শম্ভুরাম এক কার্যকরী সমিতি গড়ে তুললে।

কাজের কি আর সীমা সংখ্যা আছে? ঘরে ঘরে গিয়ে চালা তুলতে হবে। বিরাট পুঁজা-প্যাণ্ডেল তৈরি করতে হবে। সেই প্যাণ্ডেলের পাশেই ঘেঁষাও করা আর একটি অঞ্চল রাখতে হবে। সেখানে একটি শিল্প-প্রদর্শনী খুলতে হবে। এ ছাড়া মাঠটির বাড়তি অংশে স্টল খুলে সেগুলি ডাড়া দিতে হবে।

বেমর চায়ের স্টল, পান-বিড়ি-সিপারেটের স্টল, বইয়ের স্টল, নানাজাতীয় মনোহারী মিনিসের স্টল, পাপরের স্টল, ছিট কাপড়ের স্টল, চায়ের বাসনের স্টল, তেল-ডালার স্টল—এ ছাড়া পাড়ার মেয়েরা ডালের বড়ি আর আমসব্বের একটি স্টল খুলতেও রাজী হয়েছে।

ওদিকে প্রদর্শনীতে হাতে-আঁকা ছবি থাকবে, নানাজাতীয় মাটির মূর্তি, স্ট্রুচিনিয়ের কাজ, আলপনা, কাঠের আর পিসবোর্ডের কাজ, পুরোনো মুদ্রা, ডাকটিকিট সংগ্রহ...সব-কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রদর্শনীর এক কোণে থাকবে হাতের লেখা পত্রিকা আর প্রচার-বিভাগ। সেখানে শম্ভুরামের “সংগঠন” চিত্রে দেখানো হবে। কি ভাবে শম্ভুরাম জন্মাল সাক্ষ্য করছে, কি অভিনব ডকীতে শম্ভুরাম বৃক্ষরোপণ-উৎসব সমাপন করছে, নৃত্যের ভঙ্গীতে স্ত্রীমান্ন কিরুণে সরস্বতীপুন্ডর অঞ্জলি প্রদান করছে; কি অনবস্ত্র আয়োজনে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে শম্ভুরাম দোল উৎসব সম্পন্ন করছে—সব-কিছু কটোর মাধ্যমে এখানে সাজানো থাকবে। পাড়ার লোকে এসে দেখবে, আর তাদের নরনয়ন চরিতার্থ করবে।

আয়োজনের ঘটা বেধে তার চালারা অবধি একেবারে হক্চকিয়ে গেছে। হ্যাঁ, একেই বলে সার্থক শারদীয়া পুঁজা।

ওদিকে আর এক গোলঘোণের সৃষ্টি হয়েছে। পাড়ার ভেতর অনেকে চালা দিতে রাজী হচ্ছে না। তারা বলছে, কঠোর উপার্জনের অর্থকে তারা এমন করে নষ্ট-ছয় করতে হবে না।

এই সমস্তার কিতাবে সমাধান করা যায় তার অন্তে শম্ভুরামের দলবলের এক গোপন পরামর্শ-সভা বলেছে।

দলের চালারা বললে, পাড়ার লোকেরা যদি এইভাবে চালা বেওয়া বন্ধ করে, তবে তাদের সংগঠন একেবারে পটল তুলবে।

শম্ভুরাম কৌশল করে উঠে উত্তর দিলে, হাঁ। চালা অমনি বন্ধ করে দিলেই হ'ল আর কি।

তোরা সবাই দল বেধে বাজারে
বাবার পথে ঘাঁটি আগলে
দাঁড়াবি। যে টাঁদ; দেখনি
বৃষ্টি—ভালো ভাবে প্রথমে
বৃষ্টিয়ে বলবি। যদি সহজে
কাজ উদ্ধার হয় ত' ভালোই।
নইলে বাজারের পলি কেড়ে
নিবি। দেখি, বাছাধনরা কেমন
জুর্গাপুঙ্কার টাঁদা না দিয়ে
পারে!

পত্রিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে
মেটাকে কার্যকরী করার জন্য
ছেলেরা উঠে-পড়ে লাগলো।
কারো আনাঙ্গ-তরকারি ছিনিয়ে
নেওয়া হ'ল, কারো হাত থেকে
ইলিশ মাছ আত্মসাৎ করা হ'ল
—বাজারের পথে রীতিমত
চলুচলু পড়ে গেল।



‘আমি নিজেই-আজ বাজারের পথে দাঁড়িয়ে থাকবো’।

পাড়ার লোকেরা শম্ভরামের ওপর একেবারে খড়াহুত হয়ে উঠল। এ যে একেবারে বর্গীদের
বাঞ্ছনা আদায় হুহু হয়ে গেল। এরকম করলে পাড়া থেকে বাস একেবারে তুলে নিতে হবে।

অনেক চালাক লোক আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্ত বাজারে বেতে হুহু করল। কেউ কেউ
অফিসের পর ব্যাগের মধ্যে করে বাজার নিয়ে আসতে লাগলো।

শম্ভরাম সব শুনে একেবারে শম্ভনাদ করে উঠল। সবাইকে ডেকে বললে, দেখ ভাই, আমাদের
হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। যেমন বুনো ওল—ঠিক তেমনি বাঘা তেঁতুলের প্রয়োজন। আমি
নিজেই আজ বাজারের পথে দাঁড়িয়ে থাকবো।

পাড়ার এক ভল্ললোক পুলিশে কাজ করেন। আগের দিন বাজারের পথে তার ছোট
ভাইয়ের হাত থেকে একটা বড় কই মাছ ছেলেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! এই খবর পেয়ে পুলিশ
অফিসার রোগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন।

তিনি আগে থেকেই সাদা পোশাকে পুলিশ এনে বাজারের পথে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আর নিজে গেছেন বাজার করতে।

ইচ্ছে করেই খুব বড় একটা ইলিশ মাছ কিনে—হাতে জুলিয়ে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বাড়ীতে ফিরে আসছেন।

একটু বাদেই শম্ভরাম এসে পথ আগলে দাঁড়ালো।

—দাদু, আপনার চাঁদাটা এখনো পাইনি। লুন্ডি আর গেজি-পর্য্য পুলিশ অফিসার গভীর ভাবে বললেন, এ বছর চাঁদা দিতে পারবো না। বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ চলছে।

শম্ভরাম হেঁ-হো করে হেসে উঠে জবাব দিলে, সে কি দাদু, বাড়ীতে এত অসুখ আর আপনি এত বড় ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন? ওটা আমার হাতে দিয়ে বান—

এই বলে যেমন শম্ভরাম ডব্রলোকের হাত থেকে মাছটা কেড়ে নিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাশী বাজিয়ে দিয়েছেন।

হু'দিক থেকে হু'জন হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালা ছুটে এসে শম্ভরামকে পাকড়াও করলে।

এইবার পুলিশ অফিসারের হাসবার পালা। তিনি হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটলেন, এইবার শ্রীমান শম্ভরাম,—বাও হাজতে গিয়ে সংগঠন করোগে। আর হু'দিনের মধ্যে পাড়াটার গায়েও একটু বাতাস লাগুক—

আশ্বিনে

ত্রিবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

চোখ খোলে কিঙে ফুল। দোপাটির চারা

আশ্বিনে পেলো আজ কিসের ইশারা!

আকাশে কে ছড়ায়েছে রাশি রাশি তুলো?

টুপটাপ শিশিরেতে ভিজে ভোর গুলো।

টেঁয়ে টেঁয়ে শব্দটা সকালেই শোনো।

শব্দটির ডাক। শিশু নয় কোনো।

সারি সারি সুপুরি গাছের শিরে শিরে

সেনা-মাথা রাঙা রোদ নেচে নেচে ফিরে।

টিয়ে-রঙ মাঠে গিয়ে বায়ু করে খেলা।

নদী চরে এক-ঠেঙে বক করে মেলা।

ঝোকাখুঁদের মুখে হাসিখুঁশী ফুটে

পূজা, পূজা, ছুটি, ছুটি, রব যেন উঠে।

তিন পরী ও পৃথিবী

শ্রীচুর্গাদাস সরকার

(নৃত্যনাট্য)

প্রথম পর্যায়

শিশুদের অগৎ আনন্দময়। সেই অগতে বাস করে জলপরী, নীলপরী ও সবুজপরী। নৃত্যগীত-মুখর পরীদের আনন্দই শিশুদের জীবনকে করে তোলে ছন্দাযিত, সুন্দর ও চক্ল। ঐ পরীরা তো বেশ আনন্দেই ছিল। ওদের আবার দুঃখ কিসের।

দ্বিতীয় পর্যায়

পৃথিবী—কে কাদের কে? জলপরী কি? এতই বা তার কারা কি?

[জলপরীর প্রবেশ]

জলপরী—ভয়, বড়ো ভয়। জলের ভেতর যায় রাখা এই প্রাণ নাকি? সিন্দূঘোটক নেয় না শিঠে।

অষ্টোপাশের পরোয়ানা—‘জলপরীকে বন্দী ক’রে করতে হবে অরিমানা।’ ক্যাবলা শামুক,

শম্ভু, কানা শুগলি—ভাড়াও

পাকায় চোখ, জলের ভেতর

দায় বে থাকাই, বুঝবে কে আর

আমার শোক।

পৃথিবী—কি চার তারা? দিক পাহারা

জলেও কড়া মাহুয জন।

জলপরী—ভাঙার মাহুয জলে আসে

বলেই তাদের রাগ এমন।

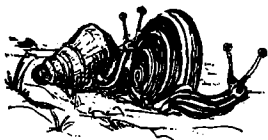
ভূবো আহাজ ঐ বে আসে, বিষ ঢালে কে সাগর-তলে। তারা বলে : ‘দাও তুমি সব

বিনাশ করে মাহুয বলে।’

পৃথিবী—সব আলো বে নীল হয়ে যায়, আকাশ থেকে কে নামে ঐ।

[নীলপরীর প্রবেশ]

নীলপরী—নীলপরী, নীলপরী আমি আকাশে আর কি ভাবে রই? ডানার পালক শুকায় বে হাঁয়, যায়



না পাখি আকাশ-কোণে, খাবার কিছুই পাইনি তাইতো, ঐ আকাশে কে জাল বোনে ?
হে পৃথিবী, চাই না কিছুই, থাকবো তোমার কাছাকাছি। অমর হোতে চাই না আমি,
মরে গেলেই মস্ত বাঁচি।

জলপরী—থাকতে পারো কাছাকাছি, আমার ব্যথা আরো বড়ো, তোমার আছে অসীম আকাশ,
আমার দশা চিন্তা করো। অজানা দু' গাঁয়ের মাঝে থাকে ছোট্ট পুকুর ঘনি—সেখানেতেই
থাকতে পারি, চাইনা সাগর কিংবা নদী।

পৃথিবী—কোনোমতেই যার না দেখা তোদের দশা আমার চোখে; জলের তলায় ঝগড়া করে,
আকাশ ভাঙে তবু লোকে। হঠাৎ আবার চারদিকই হয় বদলে এমন রঙিন কেন ?
কে আসে কে ?

সবুজপরী—আমার ভ্রম্ভে নেইক তোমার ভাবনা বেন। জলপরী বাক্ জলের ভেতর। ডাঙার
আমিই দুঃখে থাকি। আন্তিকালের বস্ত্র শুভক আছে যে তার, ভাবনাটা কি। তিমিই
অনেন খাবার তার, হয় তিমিই তেলেই খাবার ভাঙ্গা। জলপরী তুই জলের রাণী,
দুঃখ কেবল নেইক রাজা। সাগর-তলে আমিই যেতাম, ভয় হয় পাছে ঠাণ্ডা ধরে,
ডাঙায় থেকে উপোদ করি, ফল-মূল সব গেছে ক'রে। মাটির তলার বিষের বাশ্পে
শুকিয়ে যায় কাণ্ড-শাখা। হে পৃথিবী রক্ষা করো, এখানে আর যার না থাকা।

পৃথিবী—আচ্ছা, তবে নীলপরী বাক ঐ সাগরে এক নিশ্বাসে। সবুজপরী আকাশে থাক, আকাশকে
সেও ভালবাসে। জলপরী বাও হিমালয়ে,
চূড়ার ব'সে দেখো কী স্বপ্ন, হিম-পাথরের
তলার যে জল, তারি ধারায় ঝগৎ ভানুক।



নীলপরী—আমো আছে উপায়, বেন একথা আর কেউ
না শোনে, আমার জানা একটি মাত্র পথ
আছে ঐ আকাশ-কোণে। হে পৃথিবী বিদায়
দিলে ভিন পরীতেই যেতে পারি, চাই না
আমরা পুষ্পক রথ, পক্ষিবাহুর ঘোড়ার গাড়ি।

জলপরী—তোমরা যাবে বাও, দেখনা কেমন আমার
ডাঙা ডানা।

নীলপরী—আমার পিঠে চড়বে তুমি, দেখবে কেমন আকাশখানা।

জলপরী—বেশ, তবে বেশ,

সবুজপল্লী—ওনবো নাক' কারো মানা।

পৃথিবী—না না না না। খেলার মাঠে আমরা
আছি, চারদিকে তার গন্ডিটানা, কারো
বাওরা আশ হবে না। শুধু একটু
ভাবতে বলি; হুঃ কতো বাড়বে
হেথায় তোমরা সবাই গেলে চলি'।
আমার কথা ভাবতে কাউকে বলবো
নাক' একটি বারও; আমি ছাড়াও



আছে হেথায় আমার আপন অনেক আরও; কচি-কাঁচা শিশুরা সব ডাকে শোনো,—
“সবুজপল্লী কোথায় গেল, নীলপল্লী আর, ললপল্লী আর খেলা করি।” আর তোরা আর
আমার বৃক্, ঐ শিশুরাই কী নির্মল; ওরাই রাখবে এই ধরণী, ওরাই গড়বে নোভুন দল।

তিন পল্লী—আমরা ব'বো যুগে যুগে শিশুর চোখে। শিশুর হাসি ফুটিবে তুলবো, হে পৃথিবী,
তোমায় যে কী ভালবাসি। [পৃথিবীকে ঘিরে তিন পল্লীর নৃত্য]

[বাইরে থেকে শিশুদের আনন্দধ্বনি ভেসে আসছে]

কবিতা নম্র—ঘোড়ার ডিম

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

আম যদি রে কাঁঠাল হোতো, কাঁঠাল হোতো পুঁই,
সেই সব পুঁই খেয়ে পুঁটি হোতো কাতল রুই।
রুই কাতলাগুলো তখন জ্বলে কি আর থাকতো,
মাঠে উঠে জ্বরে জ্বরে লাঙ্গল দিতে লাগতো।
লাঙ্গল দেয়া শেষটি করে বুনতো তুলোর বিচি,
সাতটি দিনেই শোনা যেতো বাচ্চা গাছের চিঁচি।
সেই গাছই যে হোতো পরে আড়িকালের বট।
ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা, ডালে ডালে ঝট।
সেই গাছেতে বাঁধতো বাসা হা-টিমা-টিম-টিম,
লিখতো তারা এই কবিতার মতোই ঘোড়ার ডিম।

খোকান সাধ

জসীম উদ্দীন

আমাদের এই ছোট্ট খোকন চান্দে যাবে বলে,
রোজই তাহার রঙিন ঘুড়ি আকাশ পানে তোলে।
লাল সাদা নীল নানান মেঘের উপর দিয়ে ঘুরি
যায় সে উড়ে নীল আকাশের তেপান্তরের পুরি,
সেখান দিয়ে বক'রা চলে পাখায় সাঁতার নিয়ে,
শব্দচিলের দল ছুটে যায় শূন্যে উড়াল দিয়ে।



খোকন তাহার ঘুড়ির উপর লেখে নানান ছড়া
লেখে কথা আঁকা-বাঁকা সোহাগ আদর ভরা।
লেখে কথা ফিসফিসানি মিশমিশানি করে
লেখে কথা ইনি-বিনি চিনির মিষ্টি ভরে।
লেখে কথা চোখটিপুনী মিটমিটানী আর
লেখে কথা ভেংচি দিয়ে থেমচি বারবার।
লেখে কথা বকম বকম রকম বেরকম
লেখে কথা ছড়ার পড়ায় গড়ায় যে হরদম।



খোকন ভাবে আকাশ পথে তারার নাড়া দিয়ে
ঝিকিমিকি খোকাখুকী হাসে ঝিকমিকিয়ে।
তার। যখন পড়বে আমার ঘুড়ির ছড়া লেখা
আকাশ হতে আমার সনে করবে এসে দেখা।

সান্ন নেহি দিঙ্গা

ইন্দ্রি দেবী

সেদিন শুক্রবার !

সাপ্তাহিক প্রার্থনাতে যমুনার ঘাটে ঘাটে সারিবন্দী নৌকা। প্রার্থনার শেষে অরোহীদের নিয়ে যাবে নদীর অপর পারে রাজপ্রাসাদে। প্রার্থনা করতে এসেছেন ভারত-সম্রাট আলমগীর বাদশা, তাঁর সঙ্গে সভাসদ আর রাজপরিবারের লোকজন। যথাসময়ে প্রার্থনা শেষ করে সম্রাট দলবল নিয়ে ফিরে আসছিলেন। অত বড় সিংবিজয়ী সম্রাট কিন্তু পোশাকে-পরিচ্ছদে ঐশ্বৰ্যের আড়ম্বরের চিহ্ন মাত্র নেই। মাথায় সাধা ফেজ, গায়ে সাধা আলখাল্লা—দেখলে মনে হয় যেন মক্কা ঘাটীদলের দরবেশ। সৰ্ব্বদেবও পোশাক সাধাসিধে। বাদশার বজরা বেখানটার ছিল, তারই কিছু দূরে ঝাঁড়িয়ে অপেক্ষামান জনতা। এরা দূর থেকে সম্রাটকে দেখে তাদের কুতূহল নিবৃত্ত করে। প্রতি জুম্বাবেই দেখতে পাওয়া যায় যমুনা তীরে এই ধরনের দর্শনার্থী জনতা। কিন্তু সেদিন ঘটলো অসাধারণ কাণ্ড—সম্রাট বজরায় পা রাখতে যাচ্ছেন, এমনি সময় এক পাথরের টুকরো সম্রাটের নিকশিত হলো তাঁর কপাল লক্ষ্য করে। ঈশ্বরানুগ্রহে সম্রাট আঘাত থেকে বেঁচে গেলেন—দেহরক্ষীরা চঞ্চল হয়ে জনতার দিকে ছুটে গেল—পরক্ষণেই তারা ধরে নিয়ে এলো এক অচঞ্চল নিভীক শিখ যুগলকে। সে নিরুপ-কণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করে তার শাস্তি মেনে নেবে জানালো, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলল যে-লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার তার দুঃখের পরিসীমা নেই।

সেদিন এই শিখ যুগলটির হাত থেকে নিকশিত হয়েছিল যে প্রস্তরখণ্ড—তার পিছনে ছিল পাথরের মত শক্ত শিখস্বাতির দ্বর্জ মনোবল। সেই মনোবল সফারিত করে গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে শিখগুরু তেগবাহাদুর। আওরজেব বাদশা শুধু রাজ্য জয় করেই কান্দ হননি—তিনি চেয়েছিলেন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মাহবুবের মনকে জয় করতে। কিছুদিন থেকে তাঁর আদেশে কান্দীর রাজ্যে অমূল্যদানদের উপর চলছিল নিষ্ঠুর অত্যাচার। পাঞ্জাবের শিখ নায়ক তেগবাহাদুর চাইলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার। সম্রাটের মনের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি—তাই লাহোর থেকে তিনি যাত্রা করলেন রাজধানীর উদ্দেশে। কিন্তু এই শাস্তিকামী নিরস্ত্র শিখ সম্রাটের আদেশে বন্দী হলেন। দীর্ঘকাল তাঁকে কাটাতে হলো কারাবাসে। তারপর একদিন তাঁর ডাক পড়লো সম্রাটের দরবারে। শৃঙ্খলবদ্ধ শিখগুরু ঝাঁড়ালেন এসে উত্তরপির নিয়ে সম্রাটের সিংহাসনের নীচে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সম্রাটের মুখে প্রতিহিংসার কোনো চিহ্নই নেই। দেখতে পেলেন শুধু কৌতূহলের আভাস। তাঁর কানে ডেসে এলো সম্রাটের কথা 'তুমি ধর্মগুরু, বাগবোণ

অভ্যাস করে নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হচ্ছে, আমরা সেই শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে চাই তোমার কাছ থেকে, এই প্রকাজ সভায় ।

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন তেগবাহাদুর—‘ভগবানের আশীর্বাদে যদি সামান্য শক্তিও অর্জন করে থাকি, অকারণে তার প্রকাশ ধর্মবিরুদ্ধ বলেই মনে করি, তবু সম্রাটের আদেশ পালন করতেই হবে ।’ তিনি চাইলেন একটুকরো কাগজ ও কলম । তাতে দু’এক ছত্র লিখে কাগজখানি ভাজ করে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘এই কাগজের টুকরোটি আমি যত্নপূত করে নিয়েছি—যে কেউ এটি দেখেই যে কোনো অংশে ধারণ করবে, সে অংশের উপর যত ধারালো অস্ত্র নিয়েই আঘাত করা হোক না কেন, বার্থ হবে ফিরে যাবে সে আঘাত ।’ সম্রাট বলেন, ‘তাহলে তোমার উপরেই পরীক্ষা হোক ।’

ঔর আদেশে সেই কাগজের টুকরোটি বেধে দেওয়া হলো তেগবাহাদুরের কণ্ঠে । এগিয়ে এলো খড়া হাতে ঘাতক । সভাকক্ষ নিঃশব্দ । সম্রাটের আদেশে ঘাতকের উন্নত হাত থেকে দবেগে নেমে এলো সেই ভীষণ খড়া । মুহূর্তে দ্বি-বিন্ত হরে লুটিয়ে পড়লো শিবনেতার ছিন্ন শির । সেই রক্তের সমুদ্রে তখনও ভাসছিল সাদা ছোট কাগজের টুকরোটি । সম্রাট আনতে চাইলেন কি লেখা আছে তাতে । শিবগুরুর শেষ কথা—সম্রাটকে পড়ে শোনানো হলো, ক্ষুণ্ণরী ছ’টি কথা : ‘শির দিলাম কিন্তু সার দিলাম না ।’ শিবগুরুর এই আত্মোৎসর্গ সমগ্র শিবস্ফাতির মনে সঞ্চারিত করেছিল এক দুর্জয় প্রেরণা আর যমুনাতীরের সেই পাথরের টুকরোটি বহন করে এনেছিল সেই প্রেরণার ইঙ্গিত ।

আকেল গুডুন

ত্রিপতিতপাবন বল্লোপাখ্যায়

ছুই ডানপিটে ছ’হাতে পাথর নিয়ে	চোখের বারোটা বেজে গেলো মা’র বেছে ।
হাজির সেদিন মুদির দোকানে গিয়ে ।	ভাত খেতে গিয়ে সকলের দাঁত গেছে ।
“এক মণ চাল”—বললে হাবুল ডেকে ।	বলি শোনো—মণে ঘ-সের কীকর দাও
মুদি ভয়ে হাঁকে—“দে রে, যা সরেস দেখে ।”	ত-সেরা পাথর একটা মিশিয়ে নাও ।
বললে বাবুল, “কীকর-ফ্রি চাল দেবে ।	তোমার না থাকে এনেছি তাই তো হাতে ।
খাঁটি শুধু চাল, যত দাম লাগে নেবে ।	মেশাতে বাছতে ঝামেলা নেইকো তাতে ।

মণের দাম যা যোলো আনা নাও গুণে ।”

মুদির আকেল গুডুন সে-কথা শুনে ।

শ্রীমতী পুষ্প বসু

ভয় আমাদের জন্মবার সঙ্গে সঙ্গেই। পড়ে বাবার ভয়, ভুবে বাবার ভয়, সাপের বাঘের ভয়, ঝড়-বাদল-বজ্রপাতের ভয়, দুর্গটনার ভয়, এসবই আমাদের জ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞান। ভয় ভয়ংকর। যেমন ভূত আমাদের অজ্ঞান—কাজেই, ভূতে বিশ্বাস নেই এখন লোকও ভূতের ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি। একদিন এইরকম একটা সাংঘাতিক ভয়ংকর ভয়ের সম্মুখীন হয়েছিল একটি ছেলে। তার মুখেই সে কাহিনী শোন :

পল্লীগ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ী, সেখানে থেকে পড়াশোনা করি গ্রামের স্কুলে। ভাল ছেলে বলে আমার হুন্সাম ছিল। আমার সহপাঠী আমার দু'ঘন মাসতুত ভাইও মামার বাড়িতে থাকত, এছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীর দু'চারজন ছেলেও ছিল আমার সঙ্গী। তবে আমি তাদের সঙ্গে খেলা-ধুলার বেশী যোগ দিতুম না। বেশীর ভাগ পড়াশোনা নিয়ে বাড়িতেই থাকতুম। একত্র অভিভাবকরা আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার সব সঙ্গীরাই গোপনে নানারকম চুটুমী করে বেড়াতে ; যেমন লোকের বাগান থেকে ফল-মূল চুরি করে খাওয়া, ফুল পালান, বাল-বিলে ঝাঁপাই ঝোড়া ইত্যাদি। বাক, এখন আসল ঘটনাটা আরম্ভ করি :

একদিন বহুদূর বাললে, 'এই বাবি আমাদের সঙ্গে মেলায় ? চমৎকার যাত্রা-পার্টী এসেছে—' আমি রাজী হয়ে গেলুম। তখন আমার বয়েস যাত্র দশ বছর। সন্ধ্যার পর বেঘে-দেঘে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। দলে দলে লোক আসছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে, এই দৈ চৈ-এর মধ্যে মেলায় যেতে বেশ ভালই লাগছিল। অনেক দূরের পথ পেরিয়ে আমরা তো মেলায় এসে পৌঁছলুম। চারিদিক আলো, বাণী আর বাজনার আওয়াজে সরগরম। কত রকম হাট-বাজার বসেছে, লোকে-লোকারণ্য। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলুম। বেশ একটু রাতে যাত্রা আরম্ভ হ'ল। অপূর্ব দে-সব দৃশ্য। সেই নাটকীয় পরিস্থিতির মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হয়ে, মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে যেতে লাগলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে—তারই মাঝে একসময় আমার সঙ্গীরা বললে, 'অমিয়, তুই বস, আমরা এখনি আসছি।' বলেই তারা সকলে উঠে গেল।

এক সময় যাত্রা শেষ হ'ল। কত রাত কে জানে, অর্ধেক লোক প্রায় চলে গেছে, কিন্তু আমার সঙ্গীরা কোথায় গেল ? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না। চারিদিকে তাদের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করলাম, কিন্তু কোথায় কে ? তাদের দেখা মিলল না। এদিকে যাত্রার আসর থেকে প্রায় সব দর্শক চলে গেছে। ভয়ানক ভাবনায় পড়লুম, তাই তো একা এখন বাড়ি কিরি কেমন করে ? রাতটা এখানেই শুয়ে থাকি ডাবলুম, কিন্তু তাও সম্ভব হ'ল না। যাত্রাদলের লোকেরা শতরশ্মি মাদুর সব গুটিয়ে তুলে ফেলতে লাগল। সেখানে রাত কাটানোও সম্ভব হ'ল না, তাই আর সাতপাচ না ভেবে বেরিয়ে পড়লুম।

আমাদের গ্রামের পথে একটি লোককেও দেখলুম না। কি করি পা চালিয়ে দিলুম।

ভোয়ানার আলোতে মাঠ-পথ-বনে আলোর বজা বইয়ে দিচ্ছে, পরিষ্কার স্পষ্ট সব যাচ্ছে। আমি বতস্বর শব্দ প্রায় ছুটতে-ছুটতেই চলেছি বাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে রাতের নিভক করে শেয়াল-কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। নারকোল গাছ, তাল গাছের উপর থেকে শকুনির ডাকে চমকে মিলেও কোন দিকে না চেয়েই চলেছি আমি। বাবার সময় এতটা পথ হয়নি, কিন্তু এখন বেন পথ আর জুরোর না।

বাক্. এবার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি—এই ঝাঁকটা কিরে ডান দিকে সোজা গেলেই বাড়ী। ঝাঁকের সামনে তিন-চারটে বড় তাল গাছে ঐ জারগাটা বেন সুগমী করে রেখেছে, আশেপাশেই একটা কবরখান। তালগাছের একহাত দূরেই মহম্মদ রহুলের কবর। তাকে বেন করেছেছিল। বড় বড় হরকে তার নাম লেখা কবরের উপর। চাঁদের আলোর সে লেখা স্পষ্ট দেখা য় ঝাঁকটার কাছে এসেই বুকটা কেমন ছাঁৎ করে উঠল! থমকে ঠাঁড়ালুম। চারিদিকে রিম রিম জ্বলজ্বল। মাঝে মাঝে গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় হা-হা করে উঠছে। পথটা পেরোতে বেন পা নি সরছে না। কাছেই একটা আখড়ার বেশ রাত পর্বন্ত কীর্তন হয়, তাও খেমে গেছে, কত রাত কে হ হয় তা? হুঁটো-আড়াইটে হবে—ভাবছি এক নৌড়ে পথটা পেয়েই যাই—এমন সময় চোখে কবরের ওপার থেকে একটা চাদের ঢাকা মূর্তি আমার দিকে এসিয়ে আগছে! সমস্ত শরীরে দিবে উঠল। ভয়ে বৃকের মধ্যে চিপচিপ করতে লাগল। মূর্তিটার মাথা থেকে পা পর্বন্ত সাদা! ঢাকা! ইয়া লখা চেগার নিরে সে রূপণ: আমার দিকে এসিয়ে আগছে! কি ভয়ংকর সে ভয় তা ও ভাবলে শিউরে উঠি। মূর্তিটা কাছে আসবার আগেই আমি তাড়াতাড়ি কতকগুলো খোয় কুড়িয়ে পকেটে পুরতে লাগলুম ওটাকে মারব বলে। কত উৎসাহিত হয়ে ভূত-প্রেতের গল্প শু কিন্তু এভাবে এমনভাবে সেই ভূতের সম্মুখীন হব তা স্বপ্নও ভাবিনি। যা থাকে কুল-ক' আমাকে মারবার আগে আমিও তৈরী হই ভেবে, ইট ভুলে মারতে যাব, এমন সময় খুব কাছ মূর্তিটা বলে উঠল, 'কে রে। আমিও নাকি? এত রাত্রে একা কোথায় গেছলি?'

আমার মূখ থেকে তখন কথা বেরচ্ছে না, জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম, 'মোলায়।' হঠাৎ সে থ পেল না। উত্তরে শুধু বললে, 'চল, ভয় পাচ্ছিস, আমি তোকে পৌছে দিই।' এবার ব পারলুম ভয়ের কিছু নেই, আমাদের পাড়ার উকিল অধিনী দত্ত, অনেক রাত পর্বন্ত রাে বাড়ী দাখা বলেন—তিনি ফিরছিলেন। নিম্নে ভয়ের অবসান ঘটে গেল। বেশ একটু জে তখন বললুম, 'না, আমি একাই যেতে পারব।'

তারপর আর কি, জীবনের সাংঘাতিক ভয়ংকর ভয় কেটে যাওয়ার সকল ভয়ের অবসান য —এক বারস পর্বন্ত ভয় আর কোন কিছুতেই পাইনি।

বলরী শ্রীপ্রেমাক্ষর আত্মা

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতি রজতবরণ রায় সবেমাত্র তাঁর সকাল বেলায় বদবার ঘরে এসে বসেছেন। এই ঘরে বসে তিনি খবরের কাগজ পড়েন। রজতবরণ অবশ্য নিজে খবরের কাগজ পড়েন না। অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত একজন লোককে তিনি মাইনে দিয়ে রেখেছেন, সেই ভ্রতলোক তাঁকে বিশেষ বিশেষ খবরগুলো পড়ে শোনান এবং পরে সেই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

রজতবরণের বয়স হয়েছে। সম্প্রতি তিনি সব কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে কর্মক্ৰান্ত জীবনের দিনগুলি শান্তিতে যাপন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বাড়ীর সকলেই তাঁকে সন্মুখ এবং সম্মান করে চলেন।

ঘরের মধ্য টুকুই রজতবরণ দেখলেন যিনি খবরের কাগজ পড়েন তিনি তখনও আগমননি। মুখ তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন তখনও তাঁদের পড়া আরম্ভ হতে যিনিট নশেক দেখি আছে। সামনের টেবিলে দেহিনকার সকালের কাগজগুলো পড়ে রয়েছে। তিনি তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে এসে বসলেন। সামনেই একটা সূক্ষ্ম সেলফের উপরে ঘড়ি চলতে লাগল টুক টুক।

ঘরে ঘরে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল, কিন্তু খবরের কাগজ যিনি পড়বেন তখনও তাঁর দেখা নেই। রজতবরণ মুখ তুলে একবার ঘড়ির দিকে চাইলেন। তাঁর মুখের উপর দিয়ে একটা বিরক্তির ঝিলক খেল গেল।

আরো কয়েক মিনিট চলে গেল, কিন্তু কেউ এস না দেখে রজতবরণ নিজেই একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ঘিষ্টি গলায় কে ডাকলে—নাহু!

রজতবরণ মুখ থেকে খবরের কাগজটা নাবিয়ে বললেন—কে? বাইরে এলো—নাহু আমি! আসবো? এবার তাঁর মুখে একটুখানি খুশীর ঝিলক বসলেন—কে রে মালতী! আয় আয়—

পূর্ণা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো একটি মেয়ে, তার কোলে একটি টি

দিয়ে চেপে ধরে দে আর এক হাত দিয়ে রক্তবরণের পায়ের ধুলো নিলে। রক্তবরণ দ্বিজাঙ্গি কবলেন—কখন এলে—?

—এই আসছি দাদু।

এসেই তোমার কাছে এসেছি।

কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে
মালতী বললে—তোমার পুতিকে
আশীর্বাদ করো দাদু।

পুতি না পুতিনি—

পুতিনি না প্রেতিনি—এই
বলে মালতী নিজের হসিকতার
নিজেকে হেসে উঠলো।

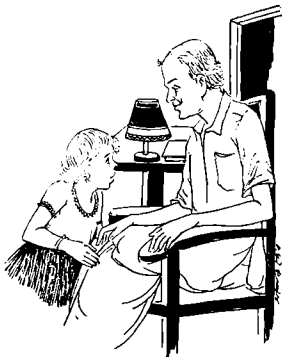
রক্তবরণ বললেন—কেন
তোর মেয়ে তো বেশ দেখতে
হয়েছে। কি নাম রাখি?

মালতী বললে—নাম রাখা
হয়েছে বল্লরী। তারপর একটু
থেনে দে দ্বিজাঙ্গি করলে—বেশ
নতুন নাম, না দাদু?

রক্তবরণ অশ্রুমনস্ক ভাবে
বললেন—নতুন! কিন্তু আমার ঘেন

এ নাম শোনা বলে মনে হচ্ছে। রক্তবরণের মুখের ভগ্নবের সেই অশ্রুমনস্কতার ভাবটা তখনও
গেল না দেখে মালতী বিদায় নিলে। ঘাবার সময় বললে—আবার তোমার খাবার সময়
সেবা হবে, এখন চলি দাদু।

মালতী চলে গেল। দেখতে দেখতে রক্তবরণের স্বভাব-গম্ভীর মুখমণ্ডল মেঘাবৃত
আকাশের মত ধুমুধমে হয়ে উঠল। ক্রমশঃ তাঁর দুই চোখের কোণে দুই বিন্দু অঙ্গ হুটে উঠল।
তারপর চোব উপছে গাল বেয়ে ববরের কাগজখানার উপরে পড়তে লাগল—টপ্ টপ্ টপ্।



‘মালতী বললে—নাম রাখা হয়েছে বল্লরী’

(২)

ছেলেবেলাটা রক্তবরণের খুব সুখে কাটেনি। তাঁর বাবার নাম ছিল বর্ণকমল রায়। কিন্তু নাম বাই খাঙ্ক না কেন, বর্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই কম। কলকাতার কোন একটা মণ্ডাগরী অফিসে তিনি চাকরি করতেন। বেতন বা পেতেন তা দিয়ে কাগজপত্র সংসার চলত। রক্তের আর ছুটি বড় ভাই ছিল। তারা তিন ভাগে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দু-পরদায় ঘুড়ি তিনজনে ভাগ করে খেয়ে পড়তে বসত। তাঁর অল্প ভাইরা পড়াশুনায় খুব ভাল ছেলে ছিল, কিন্তু রক্ত কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারত না। পড়তে বসলেই বত রান্নোর খেলা, ঘুড়ি, অল্প অল্প সব চিন্তা তাঁর মাথায় এনে ঢুকত। কলে সে অমনযোগী হয়ে পড়ত। তাঁর বাবা নিজে তাদের পড়াভেন। অমনযোগী হওয়ার জন্য এবং পড়া না পারার জন্য বাবা রক্তকে খুব মারধোর করতেন। এমনি করে প্রায় প্রত্যাহ সকাল থেকেই তাঁর দুঃখের জীবন আরম্ভ হোত। তারা তিন ভাই-এ এক একদিন এক একজন করে বাজার করতে যেত। সামান্য বাজার। কিছু তরকারি শাক এই মাত্র। বাজার করে এসে স্নান দেবে ভাল ভাত যা হোত তাই কোন রকমে খেয়ে রক্ত ইস্থলে বেরিয়ে পড়ত। সেখানে ছেলেরাও কিছু দূর অবধি পড়তে পারত। ইস্থলটা ছিল আবার তাদের বাড়ীর থেকে তিন মাইল দূরে।

ইস্থলের অবস্থা বাদ ছিল, কিন্তু রক্তের বাবা বাস ভাড়া রিতে পারতেন না বলে তাকে প্রতিদিন হেটেই বাওয়া-আগা করতে হোত। এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করে সে ইস্থলে পৌছতে না পৌছতে তাঁর ভাল ভাত যেত হজম হয়ে, তাঁর উপরে ইস্থল বসবার আগে আবার ছুটোছুটি খেলে যখন ক্লাসে গিয়ে বসত, তখন পেট করত চোঁ চোঁ।

ক্লাস বসার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে রক্তের উপর নিগ্রহ শুরু হোত। মেয়েদের ইস্থল হলেও সেখানে জনকরেক পুরুষ শিক্ষক শিক্ষকতা করতেন। মেয়েদের উপর বকাবকি, মারধোর করা সেখানে ব্যাপ ছিল। কিন্তু ছেলেরা উপর তাঁরা বেশ হাত চালাতেন। ইস্থলের শিক্ষিকাদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন কড়া মেজাজের লোক, তাঁরা ছেলেরাও উপরে ছিলেন খুবই ভয়। রক্ত ছিল মার্কাদারা ছেলে। সে কিছুই পারত না। এ কথা সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই জানতেন, এবং সেইজন্য ক্লাসের প্রথম ঘণ্টা থেকে শেষ অবধি তাকে নানা-রকম শাস্তি ভোগ করতে হোত। চাঁটি, গাট্টা, বোঁকর উপরে পাড়ানো ও নীলজাউন হওয়ায় সে গ্রাছের মধ্যেই আনত না। শাস্তি পেয়ে পেয়ে ও মার খেয়ে খেয়ে রক্ত সেই জীবনটাকেই ঘেন্নে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে তাঁর ভাবনা যে হ'ত তা নয়, সে পড়াশোনাতে মন বসাবার চেষ্টা করত, কিন্তু কিছুতেই মনটাকে বশে আনতে পারত না।

রক্ত তাড়ত আর কিছুদিন পরেই তাকে ছেলেদের ইতুলে বেতে হবে। দাঁধাদের মুখে শুনেছে যে সেখানে পড়াশোনা না পারলে বেত হারা হয়। নিরাশায় তার মনটা হয়ে বেত আর সে তাবতে থাকত তার আগেই যদি তার স্বরণ হয় তো রোজকার এই স্বপ্না থেকে অব্যাহতি পেরে যায়।

সেবারে বাৎসরিক পরীক্ষার রক্তের দাঁধারা প্রথম হয়ে রান প্রদোশন পেল আর রক্ত কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে ওণরের ক্রাসে উঠল। বাড়ীতে রক্তের দাঁধাদের নিয়ে সকলে আনন্দ করলে, কিন্তু তার দিকে কেউ কিরেও চাইলে না।

একদিন, তখনও শীতের আবেশ রয়েছে, রক্তদের নতুন ক্রাসে পড়ানো আরম্ভ হয়েছে। এই বছরেই রক্তকে মেয়েদের ইতুল ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের ইতুলে বেতে হবে, রক্ত ঠিক করেছে এখন থেকেই সে মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশোনা করবে, কিন্তু ঐ ঠিক করাই সার, পড়তে বললেই যত রাতের উলট ভাবনা তার মনকে অস্ত্র দিকে নিয়ে যায়।

সেদিন টিকিনের ছুটির আগের ঘণ্টার রক্তদের ক্রাসে ভূধরবাবু অফ কন্সাল্ডিয়েন। ভূধরবাবুর যেতান্ড সন্ধানিক কড়া, তাঁর গান্ধীর্ষ এবং ধমক-ধামকের ফলে, মেয়েরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত। মেয়েদের ধমক-ধামক দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন বটে, কিন্তু ছেলেদের বেলায় তিনি হারধোর পর্যন্ত করেন। ভূধরবাবু বোর্ডে অফ ক'লে বুকিয়ে দিচ্ছিলেন, সকলে চুপচাপ, সবারই নজর বোর্ডের দিকে, বিশেষ করে রক্ত স্থিরদৃষ্টিতে বোর্ডের দিকে চেয়ে আছে। কারণ চোখে চোখ পড়লেই ভূধরবাবু তাকে ডেকে অফ বুকিয়ে দিতে বলেন—এইরকম পরিস্থিতি, এমন সময় রক্তের পানের মেয়েটি কিসকিস করে তাকে বললে—আমার এ পেন্সিলটা কেটে দেতো ভাই। রক্ত বোর্ডে চোখ রেখেই পকেট থেকে ছুরিটা বার করে পানের মেয়েটিকে বললে—শোভা, তুই নিজে কেটে নে, আমাকে এখন পেন্সিল কাটতে দেখলেই—

যেখানে বাঘের স্তন সেখানেই শব্দো হয়! ভূধরবাবু কানে রক্তের কর্ণধর কি করে পৌছে গেল। তিনি বোর্ড থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—রক্তবরণ উঠে এসো—আজ তোমাকে কালোবরণ করে ছাড়ব।

রক্ত রহস্যালিতের মত উঠে গুটি গুটি ভূধরবাবুর কাছে গিয়া দাঁড়াল। তিনি একহাতে তার একটা কান ধরে বললেন—আমি টেচিয়ে মরছি আর তুমি গর করছ—কথা শেধ করে তিনি তার দুই গালে চড়াতে লাগলেন চড়াছড়া।

ভূধরবাবু একেই ছিলেন রাগী লোক, সেদিন রাগটা কি রকম মাথার চড়ে গিয়েছিল। তিনি চড়িয়েই বেতে লাগলেন—চড়ের পর চড়—এগালে এবং ওগালে—

ক্লাসের মেয়েরা দি'টিয়ে উঠল। কেউ কেউ রক্তের অবস্থা দেখে কঁদে ফেললে, অনেকেই চোখেই অশ্রু টলটল করতে লাগল। কিন্তু ভূধরবাবু তখনও ঘেরে চলেছেন। রক্ত ঠাণ্ডা পাড়িয়ে আছে তার হৃ'দিকে হৃ'দ্যানা হাত স্কলছে। সে একবারও হাত তুললে না, কিংবা বাধা দিলে না, কিংবা টেঁচিয়ে কঁদেলেও না। শেষকালে ওদের ক্লাসের একটি মেয়ে, বল্লরী তার নাম, সে পাড়িয়ে উঠে বললে—স্যার, এবার ছেড়ে দিন ওকে। বল্লরী খুব ভাল মেয়ে, প্রতিবৎসর প্রথম হয়ে ক্লাস প্রমোশন পায়, পোড়শোনাতে তাকে কেউ হারাতে পারে না। তাই সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই তাকে ভালবাসতেন। তার কথা শুনে ভূধরবাবু সখিত কিরে এলো। তিনি রক্তকে বললেন—বাও নিজের জায়গার গিরে বোল। রক্ত টলতে টলতে এনে নিজের জায়গার বসল। শোভা তখন টেবিলে মাথা রেখে কানতে আরম্ভ করেছে।

একটু পরে টিকিনের ছুটি বগটা পড়ল। সবাই উঠে বাইরে চলে গেল, কিন্তু রক্ত বসে রইল তখনও তার মাথা ঘুরছিল। একটু পরে সেও উঠে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তখন বাগানে ছুটোছুটি খেলছে, অজস্র পেটে কিংবা খাকলেও এই খেলাতে সে মত্ত হয়ে উঠত, কিন্তু আজ আর তার খেলার বোগ দেবার শক্তি ছিল না। সে একটা গাছের তলার চূপ করে বসে ভাবতে লাগল।

রক্ত কি যে ভাবছে তা সে নিজেই জানে না। এমন সময় কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। রক্ত দেখল একটা বাধান পাছের তলার বল্লরী পাড়িয়ে তাকে ডাকছে। রক্ত ধীরে ধীরে উঠে তার কাছে গেল। রক্ত দেখলে বল্লরীর সামনে তারের চাকর পাড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা বড় টিকিন-বাল্ল। বল্লরী রক্তের হাত ধরে তাকে বাধান জায়গাটার বসে বলতে লাগল—আজ ভূধরবাবু মিছিমিছি তোকে মারলে। চল হেডমাষ্টার মশাই-এর কাছে গিয়ে ভূধরবাবু নামে নালিশ করবি। আমরা ক্লাসবদ্ধ সবাই তোমার হয়ে শাকী দেব।

ব্যাপারটা মনে করতেই রক্ত শিউরে উঠল। সে বললে—দু'ব পাগল হয়েছিল। বল্লরী বলতে লাগল—আ হা হা, কি করে মেরেছে রে! এই বলে সে রক্তের গালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বেথতে বেথতে তার দু'চোখে দু'কোটা অশ্রু ফুটে উঠল। তাকে কানতে দেখে রক্তও কঁদে ফেললে। বল্লরী তাকে সাবনা দিয়ে বললে—কাঁদিস নি, কাঁদিস নি। ভূই ভূধরবাবু নামে তোমার বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আয়, তা'হলেই ও ঠিক জঙ্গ হয়ে যাবে।

বাবার নাম শুনেই রক্তের কান্না থেমে গেল। সে বললে—তা হবার জো নেই। বাড়ীর সবাই ঠিক মনে করবে আমিই দোষী এবং এই ক্ষেত্রে সেখানেও মার খেতে হবে।

বল্লরী বললে—আহা, তোমার বড় কষ্ট তো। সে চাকরের হাত থেকে টিকিন-বাল্লটা খুলে

কেললে। রক্ত আঁচিচোখে দেখলে, তার মধ্যেও ধরে ধরে লুচী তরকারী ও মিষ্টি সামান রয়েছে। বলরী তার থেকে লুচি তরকারি তুলে বললে—নে, ধর, খা। রক্ত সঙ্কচিত হয়ে বললে—তোমার

খাবার কম পড়ে থাকে যে। বলরী বললে—দুঃ, এত খাবার কি আমি খাব? মা তিন জনের খাবার পাঠান। তিনি বলেন—একলা খেতে নেই।

রক্ত বলরীর কথা শুনে খেতে আরম্ভ করলে। বেশ করে পেট ভরে লুচি ও রসগোল্লা ছু'জনে খাবার পরও অনেক খাবার পড়ে রইল। বলরী বলল—দেখলি।

বলরীরা ছিল বড়লোক। সে জমিদারের একমাত্র সন্তান। ইন্সুলের বাস থাকে। সেও বলরী বাড়ীর গাভীতে বাতায়ত করত।

‘বলরী তার থেকে লুচি তরকারি তুলে বললে—নে, ধর, খা।’

সেদিনে ইন্সুলের ছুটির পর সে রক্তের হাত ধরে টেনে নিয়ে গাভীতে উঠল। তারপর বাড়ীতে গিয়ে তার মাকে বললে—মা, এই দেখ আমার বন্ধু রক্ত। তারপর ভূধরবাবুর সমস্ত গল্প মার কাছে বললে।

বলরীর মা রক্তের খুব বড় করে খাওয়ালেন আর বললেন—রক্ত, তুমি যোজ্ঞ আসবে আমাদের বাড়ী। রক্ত খানিকক্ষণ সেখানে গল্পগল্প করার পর বলরীকে বললে—এবার ঘাই তাই, তা না'হলে বাড়ীতে গমিকে আবার—

খাবার সময় রক্তের একটি হাত ধরে বলরী বললে—একটা কথা বলব ভাই—কিছু যদি মনে না করিস, রক্ত বললে—না না, তুমি বলনা আমি কিছু মনে করব না। বলরী বললে—এবার থেকে তুমি ভাল করে লেখাপড়া কর তাহলে কেউ তোকে কিছু বলতে পারবে না। বলরীর কথা শুনে রক্ত একটু চুপ করে রইল। বলরী বললে—নিশ্চয় পারবি, তুমি চেষ্টা করে দেখ, আমি বলছি তুমি পারবি। রক্ত বললে—আচ্ছা, আমি তোকে কথা দিচ্ছি আজ থেকে গ্রাণপণ চেষ্টা করব।

সেদিন লক্ষ্য থেকে রক্তের নতুন জীবন আরম্ভ হলো। সে প্রাণপণে পড়ার মন বসাতে চেষ্টা করতে লাগল। ছু'চারদিন চেষ্টা করার পর তার মন বসে গেল। সে পড়তে বসলেই অল্প চিন্তা সব ভুলে যেত আর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার পড়া তৈরি হয়ে যেত।



বল্লরী রোষই তাকে উৎসাহ দেয়—কিছুতেই ছাড়বিনে। প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যা। রক্ত তার কথাবত চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই তার মনে হতে লাগল যে যেন এক নতুন রাজ্যে এনে পড়েছে। এখন তাকে পড়া শিখানো করলেই নে চটপট উত্তর দেয়। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা রক্তের এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়। বল্লরী রোষই তাকে বাড়ীতে নিয়ে যায়। তাদের কথাবার্তা হয়, সে রোষই তাকে উৎসাহ দেয়। বলে—তোকে আমাদের দেশের মধ্যে একজন সেরা লোক হতে হবে। শুধু আমাদের দেশের নয় জগতের মধ্যে একজন প্রধান লোক বলে নাম করতে হবে। উৎসাহে রক্তের বুক ফুলে ওঠে। সে বলে নিশ্চয়ই হবে! তুই দেখে নিস বল্লরী।

একদিন তাদের মধ্যে এই রকম কথা হচ্ছে এমন সময় রক্ত বললে—কিন্তু তাই একটা কথা মনে করে আমার রক্তটা বড় খারাপ হয়ে যায়। বল্লরী শিখানো করে, কি কথা রে? রক্ত

ছাঃখিত মনে বলে, এই বছরেই তো আমাকে এই স্থল ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের ইস্কুলে চলে যেতে হবে। উত্তর বল্লরী বললে—ইস্কুল ছেড়ে দিতে হবে তো কি হয়েছে? ইস্কুল ছাড়লে কি বন্ধুত্ব ছুটে যাবে? তুই যেমন আসছিল তেমনি আসবি যোজ। আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরদিন থাকবে। তুই বড়ো হয়ে যাবি, আমি বড়ী হয়ে যাব, তোর মাথাখ চুল পেকে যাবে আমার এই চুল শবের গড়ি হয়ে



‘আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরদিন থাকবে’—

যাবে—তখনও আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে। মাথাখ চুল পেকে যাবে ও টাক পড়ে যাবে ভেবে রক্ত হেসে উঠল। সে বললে—বল্লরী তোর মাথাখ তো খুব কলনা খেলে? বল্লরী গম্ভীর হয়ে বললে—হ্যাঁ, আমার মাথাখ আরো অনেক কলনা আসে অনেক—অনেক। রক্ত বললে—কি কলনা রে, আমার বলবি নে?

বল্লরী বললে—বলব, তোকে ছাড়া আর কাঁকে বলব; কিন্তু আমি নয়।

সেবার হাক-ইয়ালি পরীক্ষার সকলকে অবাক করে দিয়ে রক্ত ক্লাসের মধ্যে প্রথম হোল। সব বিষয়েই সে সবার চেয়ে বেশী নম্বর পেলে। বল্লরী হোল দ্বিতীয়। ইস্কুল ময় ছেলেমেয়ে

রক্তকে অতি গাঢ়া ছেলে বলে জানত, কিন্তু হঠাৎ তার পরিবর্তনে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাবতে লাগলেন রক্তকে কি নথর বেশী দেওয়া হয়েছে। রাসের অস্ত্র ভাল ছেলেমেয়েরা মনে মনে সঙ্কর করলে ভালো করে পড়তে হবে।

দিন যায়, রক্তের পড়াশোনার দিনে দিনে উন্নতি হতে লাগল। এমন দিন এল যে, সে একবার যা পড়ে তাই মুখস্থ হয়ে যায়। ভূধরবাবু বোর্ডে ভেঁকে বললেন—রক্ত, তুমি এই অঙ্কটা সকলকে বুঝিয়ে দাও তো।

দেবার বার্ষিক পরীক্ষার মাশখানেক আগে বল্লরী একদিন ইত্থলে এল না। বিকেল বেলা রক্ত তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখলে বল্লরীর সামান্ত জ্বর হয়েছে, কিন্তু সে খাটের উপর বসে পড়েছে।

বল্লরী বললে—সামান্ত জ্বর। বাড়ীতে বসে থেকে কি করব, তাই পড়া দেখে নিচ্ছি। তারপর তিন চারদিন বল্লরীর জ্বর ছাড়ল না। রক্ত যোজাই যায়, বল্লরীর খাটের পাশে বসে গল্পগল্প করে, বাড়ী চলে যায়। এমনি করে পনের-বিশ দিন কেটে গেল, কিন্তু বল্লরীর জ্বর ছাড়ে না—উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। রক্ত বল্লরীর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। ভাজারেরা কিছুতেই থরতে পারে না, বল্লরী অতি আত্তে আত্তে কথা বলে। কথার মধ্যে পরীক্ষা আর পড়াশোনা। বল্লরী বলে—এবার বোধ হয় আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। তুই ভালো করে পড়ছিস তো? ক্রমে পরীক্ষার দিন এসিয়ে এল, কিন্তু বল্লরীর অস্থব বেড়েই চলল, পরীক্ষার আগের দিন বিকেল-বেলা রক্ত গিয়ে দেখলে বল্লরী ভুল বকছে। রক্ত তার শামনে গিয়ে পাড়াল। বল্লরী তাকে চিনতে পারলে না। রক্তের মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। সে সেদিন কিছুই না খেয়ে দেখান থেকে বাড়ী চলে গেল। পরীক্ষার দিন সকালবেলা ইত্থল বাবার পথে রক্ত বল্লরীর বাড়ীতে গেল। দেখানে সব চূপচাপ, ঘেন কেমন কেমন ভাব। রক্ত ধীরে ধীরে বল্লরীর ঘরে গিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। যে খাটে বল্লরী শুয়েছিল সে খাটখানাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বল্লরীকে অস্ত্র কোন ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মনে করে রক্ত ফিরে বাজিল, এমন সময় বল্লরীর মার সঙ্গে তার দেখা। বল্লরীর মা রক্তকে দেখে চিংকার করে কঁদে উঠে বললেন—আর কাকে দেখতে এসেছিল বাবা। কাল রাতে বল্লরী আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেছে।

কথাটা শুনে রক্ত একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বল্লরী নেই! রক্তের মনে হলো আকাশের আলো ঘেন নিবে গেল। তার বৃকের মধ্যে ঐ কথাটাই গুমরে-গুমরে উঠতে লাগল। বল্লরী নেই। বল্লরীকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। যে আর পাড়িয়ে থাকতে পারলে না, মাটিতে বসে পড়ল। বল্লরীর মা তার পাশে বসে বললেন—আমাদের ভুলিগ নি বাবা, আমরা আতাই ছুপুর বেলা ঘেপে

চলে বাব। বল্লরী কলকাতায় পড়তে চেয়েছিল। তারই সন্ত এই বাড়ী কেনা হয়েছিল। সে চলে গেছে। আর এক দুর্ভাগ্য এখানে টেকতে পারছি না। রক্তের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল এমন সময় বল্লরীর মা বললেন, আজকে তোদের পরীক্ষা না? তাড়াতাড়ি ইত্থলে যা।

উদগত অশ্রুকে রক্ত করে রক্ত উঠে পড়ল।

সেবার বার্ষিক পরীক্ষার রক্ত প্রথম স্থান অধিকার করলে। সেবারই সে ছেলেদের ইত্থলে গিয়ে ভতি হোল। প্রথম প্রথম বল্লরীর কথা তার বিন-রাত্রি মনে হোত। কিন্তু তারপর নতুন ইত্থলে নতুন বই নতুন বন্ধু ও নতুন পরিবেশের মধ্যে বল্লরীর স্থিতি ধীরে ধীরে স্থান হয়ে এলো। বল্লরীর স্থিতি স্থান হয়ে এলেও তার অমুপ্রেয়ণা রক্তের মধ্যে কাজ করে চলেছিল। ছেলেদের ইত্থলেও সে প্রতি ক্রমে প্রথম হয়ে উঠতে লাগল। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষার সর্বপ্রথম হয়ে সে কলেজে ঢুকল। কলেজে রক্ত মেধাবী ছাত্র বলে নাম করে ফেললে। সেই বৎসরেই সে বিজ্ঞানের গবেষণার মন দিলে এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই বৃত্তি পেয়ে বিলেত চলে গেল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েই রক্ত নাম। কাগজে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে, নানা প্রকার গবেষণা করে, চতুর্মুখে নাম করে ফেলল। পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাকে চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে পরিগণিত হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেই সে দুটো তিনটে অদ্ভুত আবিষ্কার করে পৃথিবী-জোড়া নাম করে ফেললে এবং এই আবিষ্কার-লব্ধ বয় ব্যবসায় খাটিয়ে, সে অর্থ উপার্জনের পথ করে নিয়ে, দেশে ফিরে এল। দেশবাসীরা সকলে তাকে ধন ধন্য করতে লাগল ও নানা সভায় সে সম্মানিত হোতে লাগল।

ক্রমে তার বাবসা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল এবং সে বিপুল অর্থ উপার্জন করতে আরম্ভ করল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রক্তের কাজের বিবাহ নেই। এই কর্মস্রোতে ছোট্ট বল্লরী কোথায় ভেসে চলে গেল। রক্তের মনে হয় আর কোন চিন্তা নেই। কাজ আর কাজ, তার বাবা-মা মারা গেলেন, ভায়েরা চলে গেল, তার বিবাহ হোল, ছেলেপিলে হোল তার স্ত্রী মারা গেলেন—এসব দেখবার এবং এ-নির্থে শোক করবার সময় তার নেই। সে কর্মস্রোতে ভেসে চলেছে, কখন এ-দেশ, কখনও সে-দেশ, কখন হৃদয় আমেরিকা। ক্রমে তার বয়স হোল, মাথার চুল পাক ধরল, মাথার মধ্যে টাক পড়ল—রক্তের গ্রাফ নেই। এই রকম চলতে চলতে হঠাৎ একদিন তার মনে হোল সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যে রক্ত ঘোষণা করল, সে কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করবে। কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করে রক্ত একককম নির্জন বাস করতে লাগল। তার বন্ধু নেই, ছেলে ও নাতিরা কাজ দেখে। তারা কাছে এসে অত্যন্ত সন্মিহ করে দুটো-চারটে কথা বলে

সরে বাগ। নাতি-মাতনীর আসে। তারা নানান গল্প করে, কিন্তু সে বুঝতে পারে সবাই তাকে ভয় করে, সমীহ করে। এইরকম নির্বাসন অবস্থার তার দিন কাটছিল, এমন সময় নাতনীর মুখে বন্নরীর নাম শুনে ছেলেবেলাকার সেই বন্নরীর কথা তার মনে পড়ল। রক্ত ভাবতে লাগল এতদিন সে বন্নরীকে ভুলেছিল কি করে তার সমস্ত কাজের মধ্যে, সমস্ত উন্নতির মধ্যে, বন্নরীর অহুপ্রেরণাই তো কাজ করেছে। তার মনে পড়ল সেই দিনকার কথা, যেদিন ভূধরবাবু মিহিমিছি অসুস্থরূপ তাকে প্রহার করেছিলেন। বন্নরী সেদিন কত আশ্রয় করে তাকে ডেকে ধাইয়েছিল। তার গালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। রক্ত সেই স্পর্শ আবার নতুন করে অস্থব্র করতে লাগল। বন্নরীর কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল পৃথিবীর মধ্যে সে একজন শ্রেষ্ঠ লোক হবে। সে তো সে প্রতিজ্ঞা রেখেছে, কিন্তু আজ বন্নরী নেই। কথাটা মনে হতেই রক্তের দুই চোখে অশ্রু ফুটে উঠল। বন্নরীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে কান্না চেপে রেখেই সে দৌড়েছিল পরীক্ষা দিতে, তারপর জীবনের সব পরীক্ষাই সে সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ আর পরীক্ষার ভাড়া নেই। সেদিনকার সেই কষ্ট-অশ্রু বাধা না পেয়ে বিগলবেগে প্রবাহিত হতে লাগল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং অর্ধদপতি রক্তবরণ রায় ছেলেবেলায় সেই বন্ধুর মত অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তার অশ্রুজল গাল বেয়ে তার হাতের খবরের কাগজের ওপরে পড়তে লাগল টপ টপ টপ।

ওয়ার্টালুর যুদ্ধ

ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা পড়ি ওয়ার্টালুতে ভীষণ যুদ্ধ হয়—নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরেজের এবং সে যুদ্ধ হয় নেপোলিয়নের পতন। প্রাচীন আখ্যান পুরাবৃত্তে লেখা আছে—ওয়ার্টালুতে কোন যুদ্ধ হয় নি; নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরেজের যে যুদ্ধ হয়েছিল সীতেজ্যা শাহাড়ে—এই যুদ্ধই ওয়ার্টালুর যুদ্ধ বলে প্রখ্যাত হয়ে আছে। ভিক্টর হগো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘লে মিঁজারেস’ লিখেছেন—ওয়ার্টালু একখানি ছোট গ্রাম, সেখানে নেপোলিয়নের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ হয়নি—যুদ্ধ বা হয়েছিল তা সীতেজ্যা শাহাড়ের কোলে, এবং কান্নামের গোলা লেগে ও-অকলের ক’খানি গ্রাম তশীভূত হয়েছিল। কেন যে এ-যুদ্ধের নাম ওয়ার্টালুর যুদ্ধ বলে প্রখ্যাত হ’ল, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

হারকিউলিসের বারোটী কর্মভার

সন্ধানী

প্রাচীন গ্রীসের অসীম শক্তিশালী কৃতদাস হারকিউলিসের নাম তোমরা অনেকই শুনেছ। গ্রীক-পুঁথানে এই হারকিউলিসের বারোটী কর্মভারের কাহিনী একটি অদ্ভুত গল্প। গ্রীসের দেবী 'হেরা' এই কৃতদাসের অদ্ভুত শক্তির কথা শুনে খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। এর ফলে প্রাচীন গ্রীসদেশের অন্তর্গত আর্গাস নামে এক রাজ্যের রাজা ইউরিথিউসের কৃতদাস হয়ে হারকিউলিসকে থাকতে হোল।

একদিন এই কৃতদাস রাজ্যের কাছে এসে বললে, প্রভু, আমাকে যে বারোটী কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ১১টি কর্মভার আমি তো ভাল ভাবেই সম্পন্ন করেছি। পৃথিবীর কোন লোকের এই ভীষণ কাজগুলি সম্পন্ন করবার সাধ্য ছিল না। এবার আমার সম্বন্ধে একটা প্রতি-বিধান করুন। রাজার সামনে এই কথা বলার পর রাজা ভাবলেন, এইরকম একজন বলশালী দাসকে তিনি কিছুতেই মুক্তি দেবেন না। তিনি তখন বললেন, দেবী হেরার আদেশে তুমি আমার কৃতদাস। দেবীর আদেশে তুমি শেষ কর্মভার সম্পূর্ণ না করতে পারলে আমি তো মুক্তি দিতে পারি না। রাজা জানতেন এই শেষ কর্মভার এতই দুঃসহ ও কঠিন যে হারকিউলিস কিছুতেই তা সম্পন্ন করতে পারবে না। তাকে চিরকালই তাঁর কৃতদাস হয়ে থাকতে হবে।

কৃতদাস তখন রাজার সামনে তাঁর বড় বড় আঙ্গুলগুলি গুণে গুণে পূর্বকার কর্মভারের নাম করতে আরম্ভ করলো—নিমিয়ার সিংহকে বন্দী করা; লার্ণায় বিকটাকার বহুমস্তক-বিশিষ্ট জলচর মূর্খ-মানবকে ধ্বংস করা; আর্কেন্টির হরিণকে বন্দী করা; ইরিমানথাসের বৃহদাকার শুকরকে ধরা, গ্রীকরাজ অ্যাক্সিয়াসের আস্তাবলের পর্বতশ্রেণী আবর্জনা-স্বূপ পরিষ্কার করা; থিমফেলাসের ভীষণাকার পাখিগুলিকে গুলি করে মেরে ফেলা; ক্রিট দ্বীপের বিরাটাকার ঝাড়কে ধরা; ডিয়ো-মেডেসের দ্রুতগামী ঘোড়াকে ধরা; নারী সৈন্তদের রাণী হিপোলাইটের কোমরবন্ধ টেনে ধরা; গেরিয়নের ভীষণ গবাদী পশুদের ধরা; হেসপেরেডিসের সোনার ডিম রাজাকে দান করা। হারকিউলিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, এই তো আমার এগারোটি কর্মভার। পর পর প্রত্যেক কাজটি একটার চেয়ে অপরটি গুরুতর। সবই তো সম্পন্ন করেছি, এবারে আমাকে মুক্তি দিন।

রাজা ইউরিথিউস এইবারে হেসে বললেন, আর একটি অর্ধাং দ্বাদশ কর্মভার তো এখনও বাকি আছে, এই শেষ কাজটি সম্পন্ন করে মুক্তিতে করবার জন্য আমার কাছে এস—

আবার হারকিউলিস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। তার তবে এখনও মুক্তি নাই শেষ কাজ না হওয়া পর্যন্ত !

বেশ তাই হবে, শেষ কাণ্ডটা কি, তা এবারে আমাকে বলুন।

এবারে নরকে যাও, আর সেখান থেকে সিঁড়িটাগকে ধরে নিয়ে এসো। আমার সম্মুখে একে ধরে আনতে পারলেই চিরকালের মত তোমার মুক্তি।

কোন কথা না বলে প্রকাণ্ড একটা গদা ঘাড়ের উপর ফেলে হারকিউলিস এই অদ্ভুত জন্তুর সম্মুখে বেরিয়ে পড়লো।

নরকের প্রবেশ পথে একটা চিরায়তকার গুহা। এই গুহা হচ্ছে ভূত-প্রেতের আড্ডা। এখানে বাস করে বাঁড়ের চেয়ে ভীষণ সিঁড়িয়ারাস কুকুর। কুকুরের তিনটি মাথা এবং প্রকাণ্ড ল্যাংকি সাপের মত। দুটো মাথা ঘুমিয়ে পড়লে একটা মাথা সর্বদাই ভেগে সাহারা দেয়। এই গুহার চোকা-মাত্র কুকুরের গিঁড় গুলো অন্ধকারে লক লক করে জলে উঠলো, চোখগুলোও আগুনের ভাঁটার মত জ্বলতে লাগলো, আর তার কক্ষ ও কর্কশ শব্দে গুহা কাপতে লাগলো।

কুকুর চিংকার করে বললে—কে তুমি ?

পাথরের একটা চাপড়ার উপরে বসে হারকিউলিস বললে, আমি একজন দামাঙ্গ পথিক, বিশ্রাম করতে এখানে এসেছি। এই কথা বলে সে তার পিঠের ব্যাগ হতে বের করে কি যেন খাবার চিবোতে লাগল।

খাবারের গন্ধ পয়ে কুকুরের তিনটি নাক যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বললে, তোমার খাবারের গন্ধ তো বেশ।

এই কথা শোনা মাত্র হারকিউলিস কুকুরের তিনটি মুখের দিকে তার খাবারের একটা টুকরো ছুঁড়ে দিল। কুকুরের দুইটি মাথা তখন খাবার কাঁড়াকাড়ি করে নিয়ে চিবোতে শুরু করলে। খাবারের গায়ে বেশ কড়া মন ভেজানো ছিল। খাবার চিবানোর সঙ্গে সঙ্গেই দুটো মাথা গভীর ঘুমে একেবারে সেখানেই নেতিয়ে পড়ল। কেবল একটা মাথা বইল ভেগে।

এই সব দেখে তৃতীয় মাথা বেই বলেছে, আমার সঙ্গে ঢালাকী !...

এই বলার সঙ্গে কুকুর বেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, হারকিউলিস তখন তার মুণ্ডর দিয়ে হারসে তার মাথার একটা ভীষণ বাড়ি। এর একটা আঘাতেই কুকুর একেবারে হতভম্ব হয়ে ও মাথা ঘুরে সেখানে পড়ে গেল। তখন হারকিউলিস সমস্তটাকে এই অবস্থায় ঘাড় তুলে নিয়ে একেবারে আর্গাসে এসে উপস্থিত হোল।

রাত্রি তখন রাজ দরবারে বসে আমোদপ্রমোদে মত্ত ছিলেন। এমন সময় হারকিউলিস একেবারে এই জন্তুক ঘাড় নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত। সংজাহীন কুকুরের জান তখন কেবলমাত্র ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। মেশার ঘোর একটু একটু করে কেটে আসছে। হারকিউলিস চিংকার করে বলে উঠল, আমার বাসন কর্মভার শেষ হয়েছে মহারাজ। আমার এবারে মুক্তি দিন।

রাত্রি শুনে বললেন—আজ হতে তুমি সত্যই মুক্তি পেলে, কিন্তু এই জন্তুক এখন হতে অস্ত্র এখন নিয়ে যাও।

বর্ষা দিনের গল্প

শ্রীমূলভা কর

অনেক অনেক কাল আগে বাংলাদেশের এক ছোট্ট পাড়াগায়ে এক ঝগড়াটে বুড়ী ছিল। গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে বৃড়ি ঝগড়া করত, গালাগাল দিত। সেজন্য গাঁয়ের লোকেরা বৃড়ির সামনে আসত না, তার ঘৃণা দেখত না। এদিকে ঝগড়াটে বুড়ীর ঝগড়া না করলে দিন কাটে না। কাজেই কেউ না থাকলে বুড়ী ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে ঝগড়া করত, গালাগাল দিত।

বর্ষাকাল। খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে শারাদিন ধরে। আকাশ ঘোর অন্ধকার। বিদ্যুৎ হানছে, বাজ পড়ছে। গাছপালা মড়, মড়, শব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। এমন সময় একটা ঘটগাছের মোটা ডাল মড়, মড়, শব্দে ভেঙ্গে বুড়ীর কুঁড়ে ঘরের চালের উপর পড়ল। মড়ঝড়ে চালের অর্ধেকটা ভেঙ্গে হ হ শব্দে বৃষ্টির ঝল ঢুকতে লাগল। কুঁড়ে ঘরের মাটির বেখে ভেঙ্গে গেল। অল্প কেউ হলে ভয় পেয়ে পালানত, ভাবত, মাটির ঘর ভেঙ্গে যাড়ে পড়বে। কিন্তু ঝগড়াটে বুড়ী ভয় পাবার পাত্ৰী নয়। ভীষণ রেগে মোটা একটা বাঁটা হাতে নিয়ে মাথার চুল খুঁটি করে বেঁধে, ঘরের পাওয়ার দাঁড়িয়ে ঝগড়াটে বুড়ী আকাশের দিকে চেয়ে ঝড়ের দেবতাকে গালাগাল দিতে লাগল।

বাঁটা উচু করে ধরে চীৎকার করে বলল—‘আমি না দেখি ঝড়ের দেবতা। আমার সামনে দাঁড়া, দেখি কত সাহস। এই বাঁটা দিয়ে এমন মাঝব যে আমার ঘরের চাল ভাঙার স্বপ্ন বুঝিয়ে দেব।’

ঝড়ের দেবতা আকাশে বসে বসে বুড়ীর গালাগাল শুনতে গেলেন। তিনি খুব রেগে উঠলেন। তারপর ছোট্ট একটা ফুঁ দিলেন, আর অমনি ঝগড়াটে বুড়ী ঘর ছেড়ে উড়তে আরম্ভ করল। বুড়ী চীৎকার করতে লাগল—‘ও রে বাপ, রে, মরে গেলাম রে। নামিয়ে দে রে, ছেড়ে দে রে ও ঝড় দেবতা!’

ঝড় দেবতা ঝড়ের আডাল থেকে গর্জন করে বললেন—‘ছাড়ব না তোকে। আমার গালাগাল দেওয়া! দেখ, এখন কি শাস্তি হয়!’

বুড়ী উডছে ত উডছেই। কোথায় যে চলেছে কে জানে। উড়তে উড়তে চাঁদের কাছে এল। তারপর চাঁদের গায়ে আটকে গেল। কপালের ঘাম মুহূর্তে মুহূর্তে বুড়ী বলল—‘ভালই হ’ল। চাঁদের ভিতর এবার থাকব। পৃথিবীর লোকগুলো বা ঝগড়াটে।’ এই বলে বুড়ী চাঁদের

ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই চীৎকার করতে লাগল—‘কি অবস্থা আলো! হাওয়া নেই, নিঃশাল আটকে আসছে! এক ফোটা জল নেই তেঁটায় মরছি, খাবার নেই বিশেষ মরছি! হায় হায়, কি করি কোথায় ঘাই! ওগো কে আছে, বাঁচাও! চাঁদের ভিতর কোথাও স্নানপ্রাণী নেই, কেউ ঝগড়াতে বুড়ীর ডাকে সাড়া দিল না। এমন সময় ঝড় দেবতা মেঘের আড়াল থেকে বলে উঠলেন—‘বুড়ী, এই তোঁর উপদ্রুত শাস্তি। এই চাঁদের ভিতর হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকবি, খিদে-তেঁটা তোঁর থাকবে না। কিন্তু এই হাজার বছর ধরে কোথাও একটিও কথা বলবার লোক পাবি না, ঝগড়া করবার লোক পাবি না।’ হাউ হাউ করে কঁপে উঠল বুড়ী। হাত লোড় করে ঝড় দেবতাকে বারবার নমস্কার করে বলতে লাগল—‘বোঁহাই! ঠাহুর, আমার মাপ কর। আমার পৃথিবীতে কিরে যেতে দাও। তোমায় কথা দিচ্ছি, ঝড় দেবতা, আর কারও সঙ্গে ঝগড়া করব না। কোন দিন তোমার নিন্দে করব না।’ বুড়ীর কাঁদা বেখে ঝড় দেবতার দয়া হ’ল। বললেন—‘আচ্ছা, আমি তোকে মাপ করলাম।’

আবার পৃথিবীতে কিরে বাবি। তবে এখন নয়, হাজার বছর পরে। হাজার বছর রকেটে চড়ে মাহুঘেরা আসবে এই চাঁদে। সেই মাহুঘদের বালিস ঘে—আমি হাজার বছর চাঁদে থেকেছি, অনেক খবর জানি। তাহলেই সেই মাহুঘেরা তোকে রকেটে চাপিয়ে পৃথিবীতে কিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই থেকে চাঁদের ভিতর বসে, ঝড়ের রাতে উড়ে যাওয়া ঝগড়াতে বুড়ী একদুটে আকাশের নিকে চেয়ে রয়েছে। কবে পৃথিবী থেকে রকেটে চড়ে মাহুঘ আসবে আর তাকে চাঁদের দেশ থেকে নামিয়ে নেবে।

ঝড় বামলের রাতে বখন কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে, গুম্‌গুম্‌ শব্দে মেঘ ডাকে, তখন তোমরা কান পেতে শুনো। শুনতে পাবে বুড়ী বলছে—‘ওগো, রকেট-চড়া মাহুঘ, এস আমার পৃথিবীতে নামিয়ে দাও। আমি চাঁদের দেশের সব খবর তোমাদের বলব।’

নদীর বিশ্রাম

সিরিয়া প্রদেশের লেবাননে একটি নদী আছে, সেই নদীর নাম ‘লাহব-আল-আল্!’ সপ্তাহে ছ’দিন এই নদীতে একটানা যোত বর এবং বেশ খরস্রোতই। ছ’দিনের পর সাত দিনের নিন নদী থাকে যোতহীন বন্ধ স্রাশয়ের মতো! জার্মানীর প্রাচীন ইতিহাসে এই নদীর উল্লেখ আছে। তা থেকে জানা যায় যে, এ নদীর সপ্তাহে ঐ একটি দিন বিশ্রাম এবং এ রীতি চলে আগছে বহু প্রাচীন যুগ থেকে। কেন এমন হয়, বৈজ্ঞানিকরা আরও তা নির্ণয় করতে পারেন নি।

হিসাবের খেলা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শিবাজীর শুক সমর্থ স্বামী রামদাস শুধু যে বড় সাধক এবং উদাসীন পরিব্রাজক ছিলেন তাই নয়—পণ্ডিত এবং চিত্তাশীল ব্যক্তিও ছিলেন। মাত্র দাত বছর বয়সে নিম্নের বিবাহসভা থেকে বিয়ের স্তরে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তারপরও বছবার বহু চেষ্টা করা হয়েছে তাঁকে ঘরবানী করতে কিন্তু কিছুতেই পাগা যায়নি। সারা ভারতের সমস্ত ভীর্থ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি—রাজ্যেশ্বর শিক্ত হওয়া সবেও কখনও কোন ভাল বাড়িতে থাকেন নি বা রাজ্যার প্রেরিত আরে রাজভোগ খাননি। প্রতিদিন তিকা করে খেতেন, কখনও কোন সঞ্চয় করতেন না এবং যখন যেখানে আশ্রয় ছুঁত থাকতেন, বেশির ভাগ দিনই গাছতলায় কাটত তাঁর। একেবারে শেষ জীবনে—শিবাজী একটি রামচন্দ্রের মন্দির ক'রে দিয়েছিলেন—সেইখানে মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন। সেইখানেই তিনি দেহত্যাগও করেন।

এই কবির ভিখারী যে কত বড় রাজনীতিক ছিলেন তার প্রমাণ আজও আমরা পাই। রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ছাত্রপতি শিবাজীকে তিনি যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত চিঠিটি থেকে। তিনি নিম্নের গৈরিক উত্তরীয় দিয়েছিলেন শিবাজীকে রাজ্যের পতাকা করবার ক্ষেত্রে—সেও একটা মস্ত বড় ইঙ্গিত। অর্থাৎ রাজা যেন কর্মচারী হিসেবেই বেশ শাসন করেন, 'মালিক' সেজে না বসেন।

কিন্তু রাজনীতি ছাড়াও অসংখ্য অনেক বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এমনকি বৈষ্ণব বিশেষভাবে বিশ্বাসীদের মিজম্ব বিজ্ঞা—হিসাব পদ্ধতি—সেটাতেও তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। এত ভাল করে জানতেন ওটা যে একবার ঘারা এইভাবে কাজ করে খায়, তাদেরও হারিয়ে দিয়েছিলেন হিসাবের মারপ্যাচে।

সেই গল্পই বলছি।

একদিন তিনি ভিক্ষা করতে করতে সাহাপুরের 'হুলকর্ণী' বা তহশীলদারের বাড়ি গিয়ে পড়েছেন। অল্প দিন সে বাড়ির ঘেরেরা তাঁর সাড়া পেলেই বেরিয়ে এসে তাকে প্রণাম করে, সাহরে ভিক্ষা বেধে—কিন্তু সেদিন সে সব কিছুই হ'ল না, কেউই ছুটে বেরিয়ে এল না, কোন সম্ভাবণও জানাল না। উলটে কান পেতে শুনলেন বাড়ির মধ্যে খুব কাঁকারাটি চলছে। সাধারণতঃ গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকতেন না রামদাস, কিন্তু কোন বিপদআপদ ঘটেছে বন্ধে সেদিন ওদের বাড়ির মধ্যে গেলেন। তেতরে ঢুকে দেখলেন যে তাঁর আপনাই টিক, মেথেরা সকলে মিলে এক জায়গায় বসে

খুব কাঁদছে। বাড়িতে কোন পাকশাকেরও আয়োজন নেই। ছেলেষেরেগুলো পর্বস্ত মুখ শুকিয়ে বলে আছে।

রামদাস যেতে কুলকর্ণীর স্ত্রী তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে আরও কাঁদতে লাগল। উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে খুলে না বললে আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মা। খুলে বল যদি মাথা থাকে তো নিশ্চয়ই প্রতিকার করব।'

তখন সকলে মিলে কাটার ফাঁকে ফাঁকে যা বলল তা থেকে উনি বুঝলেন—একটু আগে বিজাপুর সরকারের লোক এসে কুলকর্ণীকে ধরে নিয়ে গেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি হিসেবে গোঁজামিল দিয়ে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

খবরটা শুনে এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না রামদাস স্বামী, হনহন করে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে হুলতানের লোকদের ধরে ফেললেন। কুলকর্ণীর মুখ শুকিয়ে গেছে, তাঁর চোখে জল। রামদাসকে দেখে তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। এমন অপমান তাঁর জীবনে আর কখনও হয়নি।

রামদাস তাঁকে একটু ধমক দিয়েই শাস্ত করলেন, 'এখনও তো মায়েল চুকে যাগনি, এখনই অত বিচলিত হচ্ছ কেন? বলুন তো আমাকে অভিযোগটা কি, তারপর আমি বুঝি।'

কুলকর্ণী যা জানতেন তাকে বললেন। হুলতানের কর্মচারীদের ধোয়া করেও কতকটা জানতে পারলেন উনি। সব শুনে বুঝতে পারলেন যে লোকটা আসলে নিরপরাধ, কিন্তু নিজের বোঝেই হিসাবটা এমনভাবে রাখিল করেছে যাতে শুকে চোরই মনে হয়। একটু হেসে কুলকর্ণীকে বললেন, 'বুঝছি ব্যাপারটা, কোন ভয় নেই, আমি আপনাদের সঙ্গেই বাছি, ওখানে যখন পৌঁছব আপনি আমাকে দেখিয়ে দেবেন, বলবেন এই আমার কেরানী, হিসাবপত্র এ-ই রাখে। যা বোঝাবার এই বোঝাবে। আপনি কিন্তু একটা কথাও বলবেন না। তারপর যা করবার আমিই করব।'

একটু আশু হলেম বটে কুলকর্ণী কিন্তু খুব একটা ভরসা পেলেন না। ওখানে বাঘা, বাঘা লোক আছে, এই কর্ম করে বাহু হয়ে গেছে তারা। আর এ তো সংসার ত্যাগী বৈরাগী, একি তাদের সঙ্গে পারবে?

বিজাপুরে পৌঁছে যিনি এই পণ্ডরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সত্যিই তিনি শাকা হিসাব-পরীক্ষক, ইংরেজীতে তাকে বলে অডিটর তাই, কিন্তু তিনি রামদাস স্বামীর কয়েকটি কূট ঘৃষ্টি এবং ক্ষেত্রান্তে বায়েল হয়ে গেলেন। তখন আরও উল্লসিত কর্মচারীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনিও হিসেবের গরমিল প্রমাণ করতে পারলেন না। শেষে স্বয়ং

স্বীর বন্ধী বা অভিটার ভেনারেল হিসেব নিয়ে পড়লেন—তার পরে অব্যবহেদ্যান স্বয়ং। কিন্তু রায়বাসের অর্থার্থ বৃদ্ধি ও কুটৌশলে সমস্ত অভিযোগ ঝড়ের মুখে কুটোর মতো তেলে গেল। পেছে বিজাপুর সরকার মনমানে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন কুলকণীকে।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কুলকণী রায়বাসের পায়ে পড়ে বললেন, 'প্রভু আমরা কেউ আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনি সম্রাটের বেগে সাক্ষাৎ ভগবান।'।

রায়বাস হেসে বললেন, 'দূর পাগল! আমি প্রভু রায়চন্দ্রের দীন সেবক একজন, এই আমার অর্থার্থ পরিচয়। রাহবকে ভগবান বলতে নেই। আর কখনও বলো না—এমন কথা।'।

বিহঙ্গ-কথা

শ্রীম্মীর চট্টোপাধ্যায়

ঐ পাখিটার নাম কি ফিঙে ?

ঐটা বৃদ্ধি লেজ খোলা ?

ঐখানেতে চোখ বৃদ্ধি ঐ

পায়রা, সাদা গাল ফোলা।

ঐ পাখিটা দেখতে ভালো।

নাচেছে কেমন লেজ তুলি।

কিচিরমিচির ডাকছে কারা ?

ওইগুলো কি বুলবুলি ?

টিয়ে পাখি ট্যা-ট্যা করে

ঠোট দেখো লাল ঠকটকে।

ময়নাপাখী সারাটি দিন

আপন মনে কি বকে ?

পাখির ভাষা বুঝতে পারো ?

শিথিয়ে দেবে আমায় ভাই ?

পাঁচরঙা ঐ পাখিকে

সত্যি কিন্তু আমার চাই।

হাত পেতেছি দাঁওনা হাতে,

ঠোটটা ভারী লম্বা ওর।

হঠাৎ যদি কামড়িয়ে দেয়,

ঠোটে আছে ভীষণ জোর।

কুচপয়রা ভয় করি না

দাঁও না হাতে একটিবার।

পাখি পাখি, হাতে নিলেই

পালিয়ে যাবে পগার পার ?

এই তো বসে চুপটি করে,

লক্ষ্মী-পাখি, নাম জানো ?

ঐ যা: উড়ে পালিয়ে গেলো

ছেড়ে দিলাম, তা' মানো ?

আকাশেতে করুক খেলা

বন্দী রেখে লাভটা কি ?

উড়ে বেড়াক মনের স্থখে

মুক্ত হোক, ঐ পাখি।



মেঠেডে

নাযতে হয়। পশ্চিম বাঙলার স্বর্গত রাষ্ট্রমন্ত্রী কালীন্দ্র মুখার্জির স্বত্বস্বার্থার্থে প্রদেয় কংগ্রেসের উত্তোগে বোলপুরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের অর্থসাহায্যকরে খেলাটি চারিটি হিসাবে আয়োজিত হয়। দু-দলের নামকরা খেলোয়াড়রা এলীয়া জীড়া উপলক্ষে জাকার্তা চলে যাওয়ায় উভয় দলের শক্তি এবং সাধারণ দর্শকের কাছে অহুষ্ঠানের আকর্ষণ কিছুটা কমে গেলেও, খেলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বহু জীড়ামোদী এদিন মাঠে হাজির ছিলেন। খেলাটিতে মোহনবাগান দল ২-০ গোলে জয়ী হয়।

প্রথমার্ধে পনেরো মিনিটের সময় মাঠের বা প্রান্তে দেবনাথ শেখ আলিকে ফাউল করলে মোহনবাগান ফ্রি কিক পায়, ফেনের ফ্রি কিকে হেড দিয়ে মঙ্গল পুরকায়স্থ মোহনবাগান দলের প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয় গোলটিও করেন মঙ্গল পুরকায়স্থ। এবার নিয়ে মোহনবাগান দশবার সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করল।

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান—৫ম টেস্ট ম্যাচ

ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে ইংলণ্ড টেস্টে জয়ী হয়ে প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে। কলিন কাউড্রে (১৮২) মধ্যাহ্নভোজের পর এবং অধিনায়ক ভেন্টার চা পানের পর ব্যক্তিগত সেকুরী করেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে ইংলণ্ডের রান ওঠে ৪ উইকেটে ৪০৬। দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ৪৮০ রানে প্রথম ইনিংসের শেষ ঘোষণা করলে, পাকিস্তান দিনের শেষে প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান করে। তৃতীয় দিনে পাকিস্তান অসমাপ্ত প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে আধ ঘণ্টার ভেতরে ১৮৩ রানে সকলে আউট হয়ে রান এবং ২৩৭ রানের ব্যবধানে থেকে ফলো অন করে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ইমতিয়াজ আহমেদ (৯৮) ও মস্তাক মচন্দর (৭২) দ্বিতীয় ইনিংসে

১০৭ রান যোগ করলে, পাকিস্তান দল দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২৮২ রান করে এবং প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮ রানের তফাতে থাকে। ইমতিয়াজ ২ রানের ক্ষেত্রে সেঞ্চুরী করতে পারেন না। ইমতিয়াজ এই ম্যাচে টেস্ট খেলার দু-হাজার রান ও শতকে এক হাজার রান পূর্ণ করেন। চতুর্থ দিনের খেলা শুষ্ক হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলার মীমাংসা হয়ে যায়। মাত্র ৪৫ মিনিটের ভেতর পাকিস্তানের বাকী ৪টি উইকেট পড়ে যায়। তরলাভের ক্ষেত্রে ২৭ রান সংগ্রহ করতে ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যানের মাত্র ২২ মিনিট লাগে। পঞ্চম ও শেষ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে ইংলও পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে। এবার টেস্ট পর্দায়ের খেলায় ইংলও চারটিতে জয়ী এবং একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

জাকর্তার ক্রীড়াগ্রামের উদ্বোধন

৬ই আগস্ট ইন্দোনেশিয়া এক অনাড়ম্বর অস্থানীয় মাধ্যমে সেনজানের সহরতলী অঞ্চলে চতুর্থ এশীয় ক্রীড়াঙ্গঠানের আবাসিক আন্তর্জাতিক গ্রামের উদ্বোধন হয়। ২৪শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত ক্রীড়াঙ্গঠানে যোগদানকারী ১৫টি রাষ্ট্রের ২৫০০ অ্যাথলিট এবং কর্মকর্তাদের থাকার মতন করে এই গ্রামটি তৈরি করা হয়। পূর্ব ক্রীড়াঙ্গঠানীদের থাকার ক্ষেত্রে এই গ্রামে ৩৫০টি নীচু ছাদের বাড়ি এবং মহিলাদের জন্য একটি আধুনিক আটতলা বাড়ির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামটিতে কয়েকটা ভোজনশালা, আন্তর্জাতিক রেস্তোরাঁ, একটি অতিথিশালা, কর্মসমিচালক গৃহ এবং উত্থান ছিল।

২০শে আগস্ট আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, সিংহল, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের ক্রীড়াঙ্গঠান ও প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণাও এশীয় ক্রীড়াঙ্গঠানের উদ্বোধন করেন। প্রত্যেক দেশের পতাকা ভোলার সময় ইন্দোনেশীয় সেনাদলের ব্যান্ডে সেই দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব পতাকা উত্তোলন অঙ্গঠান-মণ্ডলের কাছে অর্ধবৃত্তাকারে সূচকাঙগ্রাজ করে ছাড়ির হন এবং নিজ নিজ দেশের কাঠের উপর নাম-লেখা জায়গার গিয়ে দাঁড়ান।

সংক্ষেপে এশীয় ক্রীড়াঙ্গঠানের কলাকল

টাক ও ফিল্ড বিভাগের দশ হাজার মিটার দৌড়ে ভারতের ভারলোক সিং রেকর্ড লম্বয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে যথেষ্টের পক্ষে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতীয় কৃতিত্বের মালগুয়া গ্রীকো-রোমক মলক্রীড়ায় হাইওয়েট বিভাগে বিজয়ী হয়ে যথেষ্টের পক্ষে স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব

অর্জন করেন। ভারতের মিলপা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। তাঁর সমর লেগেছিল ৪৬'২ সেকেন্ড। তাঁর সহযোগী মাখন সিংও এই বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ভারতীয় সিং পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হাভুড়ি ছোড়া ও মহিলা উচ্চ-লম্ফন বিভাগে জাপানের দুই এথলীট নতুন রেকর্ড করেন। ইন্দোনেশিয়ার সারেনাং ১১০ মিটার হার্ডলে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐকো-রোমক হেভিওয়েট কুস্তিতে ভারতের গণপং আনালকর বিজয়ী বলে ঘোষিত হন। মহিন্দর সিং পনেরো শ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অমৃত পাল দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৫০০ শ মিটার মহিলাদের বর্ষা ছোড়া, পুরুষ এবং মহিলাদের দুশ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড। ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ভারতের স্বর্ণপদক। ফিলিপাইনের মোনা মলেইয়ান ফাইনালে ১১'২ সেকেন্ডে শত মিটার দৌড়ে নতুন এশীয় রেকর্ড করেন। মালয়েশের দৌড়বার এমজেনগালেখান দুশ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইনি ২১'০ সেকেন্ডে নতুন রেকর্ড করেন। জাপানের মাসাইমুগি নাগাটার মারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ। জাপানের মহিলা কিকো মুরাসো ৪৭'৭১ মিটার দূরত্বে ডিসকাস নিক্ষেপ করে স্বদেশের স্বর্ণপদকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ভারতের গুবচন সিংয়ের ডেকাথলনে স্বর্ণপদক। ৮০০ মিটার দৌড়ে জাপানের মোরিমোটোর শীর্ষস্থান। তিন হাজার মিটার স্টেপলচেজে পাক এথলীটের রেকর্ড। রাইকেল হাট্টিংয়ে সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি ফ্রেডারিক ভি হবার স্বর্ণপদক লাভ। জাপানী সাঁতারুদের সাঁতারে তেরোটি স্বর্ণপদক লাভ। লাইটওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে পদম বাহাদুর মলের স্বর্ণপদক লাভ। ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার কান জো হক মালয়েশ টে কিউ সামকে হারিয়ে দিয়ে স্বর্ণপদক পান।

চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ার হকি ফাইনালে গুজবাবের বিজয়ী পাকিস্তান ভারতকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয়। আহত অবস্থায় চিরঞ্জিত সিং বর্ষ মিনিটে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলে ভারতীয় হকি দলকে ফাইনাল ম্যাচের অধিকাংশ সময়েই দশমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে হয়। পাকিস্তান দল বিরতির আগে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একটা করে গোল করে।

ভারত এশীয় ক্রীড়াগুষ্ঠানের শেষ দিনে (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬২) ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে। প্রথমার্ধেই ভারতের আর্নাল সিং এবং প্রদীপ ব্যানার্জি গোল দুটো করেন। দক্ষিণ কোরিয়া খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে একটা গোল শোধ করে। এগারো বছর পর ভারত আবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে স্বর্ণপদক জয়লাভ করে।

ধাঁধার পাতা

বাচ্চিকর

কি ছবি বের হয় দেখ

(১) পানের ছবিটির মধ্যে একটি খড়ের গাদাকে নড়তে দেখে একটি বাঁড় ভেঙে যাচ্ছে। ঐ গাদার মধ্যে একটি প্রাণী সত্যিই লুকিয়ে আছে। একটি পেনসিলের সাহায্যে খড়ের গাদার উপরের ছুইকিগুলি একটি একটি অল্পসহন করে দেখ, কি ধরনের প্রাণীটি লুকিয়ে আছে এবং তাকে কি নামে অভিহিত করা যায়।



আসল ছবি কোনগুলি ?

(২) এখানে বাঁ দিকে বাঁদীর ছবি দেখতে পাচ্ছ ন'খানি। এমনি দেখতে সবগুলিকেই সমান মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে সবগুলি সমান নয়। এর মধ্যে ছ'খানি ছবি ঠিক একরকম এবং সেই ছ'খানিই বাঁদীর প্রকৃত ছবি। বাকী সাতটিই ভাল।

এখন তোমরা চেষ্টা করে বার করে কোন দুটি ছবি আসল, আর

ভাববার কথা।

(৩) পাণের ছবিটিতে বড়, মাঝারি এবং ছোট—তিনটি বাটিতে বানিকটা করে জল আছে। ছোট চুটোর ঘে জল আছে, তাতে বড়টা পূর্ণ হয়েও কিছু জল থাকে। ছবির দাড়িওয়ালা দাঁতু খোকনকে বললেন, 'এ তিনটিই জল জল না দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করতে হবে। খোকন বড় ভাবনার পড়েছে। কি ভাবে এই তিনটি বাটিই এই জল দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করা যায় বলতে পাতো?

(উত্তর আগামীবার বেরবে।)



॥ পত্নাবরের ধাঁধার উত্তর ॥

(১) দস্তা, পিত্তল, তামা এবং লোহা এই চারটি ধাতুর বিভিন্ন চারখানি সমান আকারের পাত দাও। তারপর এই পাত চারখানিকে ক্রস বা যোগ চিহ্নের আকারে বেবে, ওদের লম্বাংশগুলো একটা জুঁ এঁটে দাও। প্রত্যেকটি পাতের মাঝারি কিছুটা করে মোম রাখ। ক্রমটিকে একটা তারের সঙ্গে জুলিয়ে নিয়ে ওর নীচের একটা মোমবাতি জ্বালো। দেখবে, তামার পাতের মাঝারি যে মোমটা আছে, সেইটা গলতে আরম্ভ করবে সকলের আগে। তারপর পিত্তল, পরে দস্তা এবং সর্বশেষে গলবে লোহার পাতের মোম।

(২) ছবিটা দেখ।



(৩) ৬০ ছটাক মিশ্রিত দুধ তুলে নিয়ে এঁ বোতলে ২৪০ ছটাক জল যোগাতে হবে।

নতুন বই

সমালোচনার জন্য দু'খানি বই
পাঠাবেন

ছুটির ঘণ্টা—ব্রীদীরজলাল ধর ।
ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৫ হুমানাথ
মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা ২। মূল্য ২'৫০

দুটি উপন্যাস, বিবেকানন্দর একটি ছবি, দুটি ঐতিহাসিক গল্প আর একটি নাটকের সংকলন গ্রন্থ 'ছুটির ঘণ্টা'। প্রথম উপন্যাস 'গুপ্তধন' একবার পড়তে আরম্ভ করলে ঘণ্টাগুলো কোথা গিয়ে যে কেটে যাবে তা কেউই বুঝতে পারবে না। এর কাহিনীটি হচ্ছে : সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে পশুপতিবাবু তাঁর ঘরে চিত্রাঙ্ক নিয়ে তাঁদের গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে এসে বসবাস করেন। তাঁর বাবার লেখা একটা কবিতা পড়ে ইন্ডিয়ান পান গুপ্তধনের। সেই গুপ্তধনের সন্ধান করার সময় পিতাপুত্রী বন্দী হন দুই দুর্বৃত্তের হাতে। শেষ পর্যন্ত পশুপতিবাবুর ভায়ে বিষ্ণু কিভাবে তাদের মুক্ত করে গুপ্তধন উদ্ধার করল সেই কাহিনীই 'গুপ্তধন'-এর কাহিনী। বইখানি সচিত্র এবং প্রচ্ছদপটটি আকর্ষণীয়।

টুঙ্গু—নিউলি গুপ্ত । আনন্দধারা
প্রকাশন, ৮ স্ত্রীমাতারনগর স্ট্রিট, কলিকাতা ১২।
মূল্য ২'৫০

'টুঙ্গু' নামের ছোট্ট একটি স্রের জীবনের কাহিনী বিভিন্ন গল্পের মধ্যে ছবি দিয়ে সজ্জা করে বলা হয়েছে বইখানির মধ্যে। সবসময়ে চোখটি কাহিনী আছে এবং প্রত্যেকটিই

পড়ে তোমরা আনন্দ পাবে। লেখিকার ভাষা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক এবং গল্পবলার ভঙ্গীও সুন্দর। প্রথম বই হিন্দাবে স্থখ্যাতি পাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সাগর তরঙ্গ—প্রবোধচন্দ্র বসু। স্বপন-
কুমার বসু কর্তৃক ১৩, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২.২৫

সাত সমুদ্রের মত সাতটি বিভিন্ন তরঙ্গে বিভাগাগরের জীবনের বিশিষ্ট সাতটি ঘটনা অতি সুন্দরভাবে গল্পের মত করে লিখেছেন গ্রন্থকার। বীরসিংহ গ্রামের ও অস্ত্রা বহু মনোবীর ছবি আছে। বিভাগাগরের হাতের লেখার রকম করে দেখা হয়েছিল। তোমাদের সকলেরই বইখানি পড়া উচিত।

রতিন বেলুন—আশা দেবী। ইটলাইট
বুক হাউস, ২০ ট্রাও রোড, কলিকাতা ২।
মূল্য ১'৫০

হাসির গল্পের বই হিন্দাবে 'রতিন বেলুন' পড়ে যে-কোন ছেলেমেয়ে অট্টহাসি হাসবে। বাংলা সাহিত্যে ছোট্টদের জন্য যতদূর পর্যন্ত যে ক'জন লেখক-লেখিকা হাসির গল্প লিখে থাকেন, আশা দেবীর নাম তাদের তালিকার উপর দিকেই যে স্থান পাবে, সে সন্দেহ সন্দেহের কারণ নেই। এই বইয়ের চোদ্দটি গল্পের প্রত্যেকটিই উপভোগ্য এবং শিশুর ছবিগুলিও সুচিত্রিত। গল্প একটি চতুর্দশ জন্ত, কাঁঠালী মাথা, ক্রান্তবনের মাদীনা প্রভৃতিগুলি বড়দেরও হাসাবে।

ব্রীদীরজলাল সরকার কর্তৃক ১৫ বক্সি চাট্‌জো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও
তৎকর্তৃক প্রান্ত প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০'৪৫ মাত্র।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

কার্তিক—১৩৬৯

[৭ম সংখ্যা

ছড়া।

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস

ইকির মিকির চামচিকির

চামচিকের ছা।

কদমা খাবে খাজা খাবে

আজকে খোকার মা।

খোকার মা, খোকার মা,

খোকন সোনা কই ?

খোকন ব'সে গাছে চ'ড়ে,

কে কেড়েছে মই ?

আয় রে খোকন আয়,

পানতা ভাতে ঘি মেখেছি,

আমার—ভাত পুড়ে যায়।

বালুরঘাট, বসিরহাট
 ধানের গাছ, ভিনটে কাঠ ।
 করাত দিয়ে চিরে,
 আগড়পাড়ার সাগর রায়,
 টেবিল চেয়ার খাট বানায়
 আর বানায় নকশা-কাটা পিঁড়ে ।
 এক ছুই তিন চার পাঁচ—
 কেটে করো কুচিকুচি বড় রুই মাছ ।
 ছয় সাত আট নয় দশ—
 বেলুনটা কেটে গেল—ফুস ফাস ফস ।

•

বড়দার সাথে পড়ে নটবর সরদার ।
 সোজাশুজি চলে আসে রেল চড়ে খড়দার ।
 হাতে মুখে কালি মেখে ফিরে যায় বিকেলে,
 যদি কেউ বলে ডেকে, সারাদিন কী খেলে ?
 চটাংসে চটে গিয়ে চৈচায়—খবরদার
 ফিকফিক হাসে দিদি আড়ালেতে পরদার ।

•

পোঁচায় চৈচায় পাড়া কাঁপে ।
 বেচারামের বউটা
 উড়কি ধানের মুড়কি ভেজে
 ভরে ফেলে কৌটা ।

ইনস্পেক্টার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মিষ্ট্র বলে, এই কান্না, আমাদের ক্রাসের সেই চক্রকে মনে আছে ?

কান্না বলে, চক্র তো হুঁশন ছিল রে ! কোনটা ?

—সেই আমরা থাকে বলতুম ইনস্পেক্টার চক্র, বার মামা ছিল পুলিশের ইনস্পেক্টার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও মনে করতো ও নিজেও ইনস্পেক্টার হয়ে গেছে ! হা হা হা।

এই সময়ে কান্না এসে জোটে। সে বেজিতে কান্নার পাশে বসতে বসতে বলে, কি হয়েছে রে ? এত হাসছিল কেন ?

কান্না বলে, এক ইনস্পেক্টার আমাদের ক্রাসের দুটো ছেলের কাছে কি রকম জব্ব হয়েছিল তাই মনে করে হাসছি।

কান্না বড় বড় চোখ করে ওর মুখের দিকে তাকায় ; আন্তে আন্তে বলে, পুলিশের ইনস্পেক্টারকে জব্ব করেছিল। কেল হয় নি ?

মিষ্ট্র বলে, উন্টে তারা পুরস্কার পেয়েছিল।

কান্না হাসে ; কান্না মিষ্ট্রর মুখের দিকে বোঁবার মতো তাকিয়ে থাকে।

মিষ্ট্র বলে, শুনি ওর কথা ? ছেলেটার নাম ছিল চক্রভূষণ চক্র। ক্রাসের অনেকেই ওকে পছন্দ করতো না। ও কথায় কথায় বলতো, জানো, আমার মামা পুলিশ ইনস্পেক্টার ? আমি ইচ্ছে করলে, তোমাদের জেলে পুরতে পারি ? তোমরা পথে ধাঁড়িয়ে হটগোল করছো এতে শাস্তিভঙ্গ হচ্ছে। সাবধান। একদিন প্রদীপকে বললে, এই, তুমি রোজই সন্ধ্যার পর সাইকেল চড়ে গলি দিয়ে যাও। একদিনও আলো আলো না। তোমার নামে রিপোর্ট করবো ? তোমার সাইকেলের পিছনে লাল আলো থাকে না কেন ? সাবধান। প্রদীপ কাঁদকাঁদ করে বলে, কাঁদ কাঁদে রিপোর্ট করবেন, ইনস্পেক্টার সাহেব ? ও বলে, ওপরওয়ালাদের কাছে। জানো আমি মনিটার ? বিপ্লব বলে ওঠে, জানো আমি মনস্টার ? তাই শুনে ও ক্ষেপে যায়, বলে, কী। আমাকে গালাগাল ? জানো, এখানে তোমার কি করতে পারি ? বিপ্লব বলে, কি করতে পারেন, ইনস্পেক্টার সাহেব ? এমনি রোজই ক্রাসে তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগে। শান্ত নিরীহ ছেলেগুলো, যাদের আমরা বলতাম 'ভেড়া' তারা আমাদের বলতো, ওর মামা পুলিশের ইনস্পেক্টার। ও ইচ্ছে করলে সত্যি বিপদে জেলতে পারে। ওর কথা যেনে চললে ক্ষতি কি ? এর ফলে, তারা আমাদের কাছ থেকে পেতো টিটুকিরি। আর ইনস্পেক্টার চক্র তাদের বলতো, শান্তিপ্রিয় ছাত্র।

আমাদের মধ্যে স্ত্রীটি জিতেন খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারতো। সে এখন ক্রমশঃগত পড়ে। ওর বাবা রেলে চাকরি করেন। ওখানেই বসি হয়ে গেছেন। জিতেন ছিল, ইনস্পেক্টার চন্দ্রের মতো চাড়া, গায়েও বেশ জোর ছিল। এক এক হিটে বাড়ি গাড়ি করতো। সে বা দ্বাতে ব্যাট ধরতো। একদিন ইনস্পেক্টার ক্লাসে এসেই বলে, টিকিনের সময়ে তোমরা হটগোল, খাড়াখাড়া করতে করতে ক্লাস থেকে ছুটে বেরোও। ওতে শান্তিপ্রিয় ছাত্রদের অস্থবিধা হয়।

স্ত্রীটি জিতেন বলে, ইনস্পেক্টার সাহেব, ওরা বুক্‌শি নাশি করেছে আপনার কাছে? কার কার নাম বলেছে? আমিও তার মধ্যে আছি, আঁ? বলুন না। আমার বুক কাপছে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ছি। বলতে বলতে সে ইনস্পেক্টারের গায়ে এত জোরে চলে পড়ে যে, ইনস্পেক্টার টাল সামলাতে না পেরে মেরে পড়ে যায়। আর জিতেন পড়ে ওর ওপর। তাতে ক্লাসস্থ হৈ হৈ। এরই মধ্যে ক্লাস আরম্ভের ঘণ্টা পড়ে গেল। কেউ কেউ স্তনভেঙে গেল না। সেই হৈ-হটগোলের মধ্যে অধিকাংশ গভীর হয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। তিনি দেখেও দেখলেন না। ক্লাস আরম্ভ হলো। আমাদের মুখে চাপা হাসি, ইনস্পেক্টারের চোখে আঙন, কোটে ধুলো।

কালু বলে, তারপর? ইনস্পেক্টার নিশ্চয়ই ওপরওয়ালার কাছে নাশি করলো?

—মোটাই না। সেদিন ছিল শনিবার। সন্ধ্যার পর আরও মজার একটা ব্যাপার ঘটলো।

—কি রকম?

—জিতেন আর প্রদীপ দু'জনে দু'খানা সাইকেল নিয়ে কোচিংয়ে বাবার জন্তে বেরলো। ইনস্পেক্টারদের বাড়ির সামনে বড় রাস্তা। ওদের কোচিংয়ে বাওর-আসার পথ ঐ বড় রাস্তাটা। জিতেন আর প্রদীপের বাড়ি একটা সড় রাস্তায়। অকলস নতুন। লোকের বসতি একটু একটু করে গড়ে উঠছে। তাই নির্জন। কোন কোন বাড়ির চারধারে মেহেরি বা হেজহরনের বেড়া, কোন কোন বাড়ির চারধারে পাঁচিল। রাস্তা ঝাঁকা বলে মোটরগুলো জোরে ছোট্টে। ওরা দু'জনে দু'জনে গলি থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি গল্প করতে করতে চলেছে। ইনস্পেক্টারের মামার বাড়ি ছাড়িয়ে খানিক দূর গিয়ে জিতেন বলে, আরে! সামনে ঐ সাইকেলখানার ইনস্পেক্টার চন্দ্র নয়? হ্যাঁ, সে-ই তো। ওর পিছনে লাল রিস্পেক্টার কই? প্রদীপ বলে, ওর পিছু পিছু চলে। কি হয় দেখা যাক। সোমবারে ক্লাসে ওকে ধরবো। সকলের সামনে বলবো, ইনস্পেক্টার খয়র বে-আইনী কাজ করেছে। বলেই সে হা-হা করে হেসে ওঠে। স্ত্রীটি জিতেন বলে, এই, চুপ! স্তনভেঙে পাবে। ও যাচ্ছে কোচিং-এ।

—তারপর খানিক দূর এসে মোড়ের কাছাকাছি বায়ের গলিতে ঢুকতে বেড়েই ডান দিকের গলি থেকে একখানা মোটর বেরিয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে সেই গলিতে ঢুকবার মুখে ওকে মারলে

ধাৰা। আৰু ছিটকে পড়লো একটা বাড়িৰ মেহেৰি বেড়ান ওপৰ। ওৰ গাড়িখানা পড়লো গলিৰ মুখে বা ধাৰে। মোটৰখানা তৎক্ষণাত্ ব্ৰেক কৰিলো। ওয়া দু'জনেও সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। শীতকাল বলে আৰুগাটা ছিল একদম নিৰ্জন। ওয়া তাত্তাতাডি হেঁটে আসতে আসতে দেখলো, মোটৰ থেকে স্টপৰা বগাগোছের একটা লোক নেমে তাত্তাতাডি ইনস্পেকটৰের কাছে গিয়ে ফুঁকে ওকে দেখে নিজেই গাড়িতে উঠে গলিৰ মধ্যে অন্তৰ্ভূত হয়ে গেল।

তাই বেধে দু'জনেই অবাধ। একটা ছেলেকে ধাক্কা মেয়ে ফেলে দিয়ে সাহায্য না কৰেই লোকটা পালালো? ও কি মাহুৰ? একে তো অস্তায় কাজ করেছে, তারপর এই ক্ষমহীন ব্যবহার? ওয়া ওকে ইনস্পেকটৰের কাছে বেতে দেবে মনে করেছিল, লোকটা বুকি সাহায্য কৰবে। কিন্তু তার বললে ওকে ফেলে রেখে পালালো?

দু'জনে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ছুটতে ছুটতে ইনস্পেকটৰের কাছে গিয়ে দেখে, সে বেড়ান কোলে পড়ে আছে। নাকে হাত দিয়ে বেধে, নিঃশ্বাস পড়ছে, বুকে কান রেখে ক্ষুণ্ণিগের ধুকপুক ধুকপুক শব্দ শুনেতে পার। ইনস্পেকটৰ বেঁচে আছে। দু'জনে খুশি হয়। ঠিক তখনই ইনস্পেকটৰ নড়ে চড়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে। স্কাটা স্মিতে ওকে ধরে বসাতে বসাতে বলে, কোথায় লেগেছে? বসতে পারবি? ইনস্পেকটৰ বলে, পারবো। একটা জোর ঝাঁকানি লেগেছে। তোরা কোথা থেকে? প্রাণীপ বলে, আমরা তোয় পিছু পিছু আসছিলুম। অ্যাকসিডেণ্টটা হয়েছে গলিৰ মুখে। তোয় সাইকেলের পিছনে লাল বিক্ৰেকটৰ থাকলে বোধ হয় এটা হোত না। যে মোটৰখানা চালাচ্ছিল সে বোধহয় তোকে দেখতে পার নি। তোয় গায়ে কোট-প্যাণ্ট-জুতো-মোজা সবই কালো, গলিটার মুখেও শুভেন আলো নেই। কিন্তু ভাবছি, লোকটা তোকে সাহায্য না করে পালালো কেন? গাড়িতে বেন আৰু কেউ ছিল। ইনস্পেকটৰ বললে, আমার গাড়িখানার কি হয়েছে? প্রাণীপ বললে, দু'খানা চাকাই তেবড়ে গেছে। এখন ওসব কথা থাক। উঠে দাঁড়াতে পারবি? না পারলে আমরা তোকে বাদে—না, না, ঐ যে একখানা খালি বিক্সা যাচ্ছে। তারপর দু'জনে ভাঙা সাইকেলসহ ইনস্পেকটৰকে তাতে চাপিয়ে নিজেয়া নিজেদের সাইকেলে চেপে ইনস্পেকটৰের বাড়ি,—মানে, ওৰ মামার বাড়ি এল।

বাড়িৰ সামনে একখানা কালো বঙের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ইনস্পেকটৰ বললে, মামার গাড়ি। মামা এসেছেন।

দু'জনে বিক্সা থেকে ভাঙা গাড়িখানা নামিয়ে কটকের ডেতৰ রেখে, ইনস্পেকটৰকে ধৰাধরি করে বৈঠকখানার নিরে বেতেই ওৰ মামা বললেন, এ কি? কেমন করে হলো? ওকে শুইয়ে দাও ঐ কউচে। ডাক্তার, ওকে দেখুন। সেখানে গলার স্টেথস্কোপ ফুলিয়ে চশমা চোখে একজন বলে



‘ইনস্পেকটরের কাছে গিয়ে দেখে, সে বেড়ার কোলে পড়ে আছে। নাকে হাত দিয়ে
দেখে নিঃশ্বাস পড়ছে’...

প্রদীপ বলে, আমি দেখে রেখেছি।

—বটে! কি বল তো বাবা?

—জে পি সি—১৫০। ৪৫ কালো, কোর সিটার।

—কি নম্বর বললে? ভারি অদ্ভুত নম্বর তো। ধাঁড়াও। বলেই তিনি টেলিকোনের রিসিভার
তুলে থানায় ফোন করলেন।

ডাক্তারও তখনই পরীক্ষা শেষ করে বললেন, বিশেষ কিছু হয়নি। একটা ঘোর ঝাঁকুনি
লেগেছে। এক গেলান গরম দুধ খাক আর শুয়ে থাকুক।

ইনস্পেকটর মামা ওদের বললেন, তোমরা একটু বসো বাবা। এই তো চাই। বেশ—বেশ।
তোমরা একদমে পড়ো বুঝি?—ওরে। গরম দুধের সঙ্গে ‘অমনি হু’ পেয়াদা মিক-চকোলেট আর
দ’রানা সেকেন্ড অ্যানিস।

ছিলেন। ইনস্পেকটর
মামা তাঁকে উদ্দেশ্য
করে শেষের কথাগুলো
বলতেই তিনি উঠে
ইনস্পেকটর চক্রকে
পরীক্ষা করতে লাগ-
লেন। আর ওরা দু’-
জনে বা বা যেবেছিল
ইনস্পেকটর মামার
কাছে সব বলতেই
তিনি বললেন, আচ্ছা
বাখারা! সে গাড়ির
নম্বর দেখে দেখে-
ছিলে? অবশ্য তোমরা
ছোট, তোমাদের কাছ
থেকে এতটা আশা
করা যায় না, বড়রাই
তুলে যায়।

একটু পরেই যোগীর পথ্য ও অতিথিদের খাবার এল।

তারি বাড়ি এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলো ফ্রিং ফ্রিং। মামা রিসিডার তুলে বললেন, হালালো? খরী পড়েছে? ফলস্ নম্বার? চোরাই গাড়ি? কি বললেন? বে-আইনি মাল নিয়ে পালাচ্ছিল? ছ'জন ছিল? চমৎকার! আচ্ছা। মামা রিসিডার নামিয়ে রেখে হাসতে হাসতে ওদের ছ'জনের পিঠ চাপড়ে বললেন, বাসা ছেলে। প্রশংসনীয় কাজ। আমি নিজে তোমাদের দুটো কাউন্টেন পেন উপহার দেবো। একসেলেট।

তারপর?

—ওহা ইনস্পেকটর চক্রেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময়ে সে ওদের কানে কানে বলে, মামাকে বলিস্ মি বেন। আমার সাইকেলে রিক্লেকটায় ছিল না। কতকটা সেই কারণেও ঘটতে পারে।

ওহা বলে, রিপোর্ট করা আমাদের অভ্যাস নয়।

—দু'জনে খুশি হয়ে চলে এল। সেদিন আর ওদের কোচিং-এ বাওয়া হলো না।

কালু বলে, ইনস্পেকটর মামা কাউন্টেন পেন দুটো দিয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই। সোমবার দিন ইনস্পেকটর চক্রেব হাতে দিয়ে দুটো সেরা পাইলট পাঠিয়ে দেন।

—আচ্ছা, ইনস্পেকটর চক্রেব এখন কোথায়?

—কে জানে! ওর মামা বেন কোথায় বদলি হয়ে গেছেন। চল চল, চীনেবাদাম খাই গে।

—এই চীনেবাদাম?

তিন বন্ধু ছোট্ট পার্কের দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য করে।

গল্প

(নার্গারি রাইমের অনুবাদ)

শ্রীমুকমল দাশগুপ্ত

মন দিয়ে ভাই তোমরা সবাই

আমার শোনো গল্প

একটি ছেলে দুইটি মেয়ে

বহুস তাদের অল।

একটা ছিল বেড়াল ছানা

একটি সবুজ দরজা—

বেশ জমেছে গল্প দাধা

উচ্চ দরের পর্দা

এই সেবেছে। তুলেই গেছি

নেই মনে একরত্তি

এতক্ষণে যা ব'লেছি

সব ব'লেছি সত্যি।

মাধার ব্যামোয় এবার বুঝি

দরজা মনের রক্ত

আজকে তবে বিদায় নিলাম

কাগজ কলম হৃদয়।

পরহিতব্রতী

শ্রীমুণীলকুমার গুপ্ত

ধর্মশাস্ত্র পড়ে জগা জীবের দুঃখে ম'জে
পরহিতব্রতে গেল ভগবানের খোঁজে ।
চাকরিটা সে দিলে ছেড়ে, কারণ তারি পদ
পেলে একটি বেকার জীবের দুঃখ হবে বধ ।
অতসী কাঁচ হাতে নিয়ে করে চলাফেরা,
দেখে দেখে এড়িয়ে চলে পিঁপড়ে কঁচোর ডেরা ।
খাটায় না আর মশারি সে, একই থালা থেকে
মাছির সঙ্গে খায় বসে রোজ খাবার চেখে চেখে ।
হঠাৎ যদি অসাবধানে ঘটে কীটের নাশ,
করতে হবেই তাকে গঙ্গান্নান ও উপবাস ।
অমিষ ছেড়ে নিরামিষও খাবার সময় তাকে
দেখে নিতে হয় ভিতরে যদি পোকা থাকে ।
সকাল থেকে বেড়ায় ব্যাগে নানান জিনিস ভ'রে,
পথে পথে মানুষ এবং পশুর সেবা ক'রে ।
আত্মীয়েরা বুঝিয়ে শেষে বিফলে হাল ছেড়ে
দিয়ে ভুড়ের ওঝার হাতে দিলে ন'বার ঝেড়ে ।
কিছুদিনের ভিতরেই সে পড়ল ভীষণ রোগে,
প্রাণটাকেও রাখলে নাকে। বেশী কষ্ট ভোগে ।
মরার অ'ঙ্গ বলে গেল যেন মরার পরে—
সেহকে তার দেয় সকলে জীবের ভোগের তরে ।
শত্রু বললে, 'পাগল', তাকে মিত্র বললে, 'বোকা',
গুণী বললে, 'মহাপুরুষ, চিরকালের খোকা ।'

গল্প হ'লেও সত্য

শ্রীকর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার মাস। আকাশে ঘোর ঘনঘটা ক'রে মেঘ জমেছে। অঝোর-ঝোর বৃষ্টি ঝরছে হোটেলে আমরা তিন বন্ধু য'সে য'সে গল্প করছি। হঠাৎ কৃষ্ণা বলল—এমনি দিনে কি বেতে ইটে করে বলত? অহু খাবার কথা শুনে তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে উঠে বলল—কেন, গরম গরম কালমুড়ি। মিনতি বলল—আহা, কি যে বলিস। কালমুড়ি এখন পাব কোথায়? তার চেয়ে শ' মুড়ি ভাল লাগবে। গতিথাকে ডাক—বাজার থেকে আমাদের শশা মুড়ি এনে দিক। গতিথি আমাদের হোটেলের চাকর। ওকে নিহেও আমরা খুব মজা করি। গতিথার দেশ উড়িষ্যা এদেশে খুব সহজ সরল। তবে, বেগে গেলে জান থাকে না। আবার সময় সময় ভালমাহুষের পরাকারী ওকে যদি কেউ ব্রিজেস করে—গতিথি, তোর ছেলের নাম কি? অদ্বানবদনে পানের ছোপ-লাপ দাঁতগুলো বার ক'রে বেগে বলবে—পডু বহু, জালী।

সে যাই হ'ক। কৃষ্ণা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল—কি গো পেটুক বামনী! তোমার মত? আমি বললাম—আগে তোমার মতটা জানাও। কৃষ্ণা বলল—সে না হ'হ বলছি, কিন্তু খাওয়াবে বল? বেশ, আমিই না হ'হ আট আনা করে খাওয়াবো। কিন্তু তার আগে স্বপ্নর কাঁকে একটা হাসির গল্প বলতে পারবে, তাই বলো? এবং সেটা সত্যিকার ঘটনা হওয়া চাই। ও তিনজনেই বলে উঠল—বেশ, বেশ, আমি আগে বলব। মিনতি বলল—ধাম্ ধাম্, তোরা আবার হাসির গল্প কি বলবি রে! আমিই আগে বলব।—সে যাই হ'ক না কেন। তোমাদের এক-একজনের বল না কেন?—আমি বললাম।

মিনতি ভাল ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে বসে বলল—শোনু তবে। গত বছর স্বাধীনতা দিবসের আগে দিন আমার ছোট বোন খুকু বলল—বড়দি, কাল ভোরে আমার বাকী পোষাকটা পরিয়ে দিও কালকে আমাদের প্রভাতফেরী বার হবে। বন্দীদা বান্ধী বাজাবেন। শুনতে পেয়েই ছুটে এ লায়গার জড়ো হ'তে হবে। আমি আমা-কাপড়গুলো ঠিক করে রাখলাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বেতে দেখি—মা-বাবা ছোট বোন খুকুকে ধরে রেখেছে। আর খুকু তও নাছোড়বান্দা ভাবে চটেছে—না-না বন্দীদার বান্ধী বেছে গেছে, আমার বেতেই হবে। আ ডাবলাম, বুঝি ভোর হয়ে এসেছে। তাই মা-বাবাকে বললাম—ছেড়ে দাও না ওকে, বেতে বং হবেই।

বাবা বললেন—না-না, এই সব আড়াইটে বেজেছে, এখন কোথায় বিগল বাজবে। অনেক বুঝিরে ব'লে ক'রে খুককে ঘুম পাড়ান হ'ল। কিন্তু ওর বংশীদা বাঁশী বাজাচ্ছে ঐ বুলি আর ছাড়ে না। এরপর সত্যিই ভোর হয়ে যেতে যখন বিগলটা বেজে উঠল তখন ওর বিশ্বাস হ'ল।

কি রে হাসির নয়? অহ মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে বললে—ভারী তো। আমার গল্পটা শোন—আমার ছোট বৌদির মেয়েটা কিওয়ারপাটেনে পড়ে। নাম তার ললি। টিফিনে বৌদি গেছে মেয়েকে টিফিন খাওয়াতে। গিয়ে দেখে ললি খুব কাঁদছে। ব্যাপার কি ভিজেন্স করাতে একজন শিক্ষাবিদ্রী এসে বললেন—বলবেন না আর আপনায় মেয়ের কথা। আজ ওকে ধারাপাত পরীক্ষা কোরছিলাম। যত বলি—এক থেকে দশ পর্যন্ত মুখস্থ বল, ললি কেবলই বলে—এক ভালুক ছিল, আর তার তিনটে ছানা ছিল। আবার বললাম—না-না, তা নয়—এক, দুই, তিন এমনি করে শুনে শুনে বল। ও তখন ডেউ ডেউ ক'রে কাঁদে আর বলে—এক ভালুক ছিল, আর তার তিনটে ছানা ছিল। সেই থেকে কাঁদা আর থামছে না। আমার বৌদি বললেন—ওকে এই গল্পটা শিখিয়ে দিবে বলেছিলাম, যদি গল্প বলতে বলেন, তবে এই গল্পটা বলবে। ললি সেটা বুঝতে না পেরেই শটকের ঘাড়ে গল্প চাপিয়েছে। দিদিমণী তো দম-কাটা হাসিতে উজ্জসিত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বৌদিও।

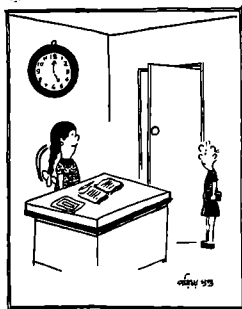
এবার ক্লষ্ণ মুখটাকে ভারাক্রান্ত করে বললে—আমার হয়তো আরও হাসির ঘটনা হবে। শোন তবে বলি—আমার ছোট ভাই হুশান্ত। স্বভাবে নামের ঠিক বিপরীত। ডয়ানক ছুটু ব'লে মা ওকে খুব বকতেন; মারধর থেকেও রেহাই পেত না মোটেই। কার ছেলের মাথা কাটিয়েছে ইট দিয়ে, কারও গাছ থেকে ডাব চুরি করে খেয়েছে, কোন্ কুমোর পালাপালি করাতে হাড়ির পাখায় ইট মেরে হাড়ি ভেঙে দিয়ে এসেছে। নিত্য-নূতন অভিযোগ। কে সন্ধ্যা করতে পারে বল তো? একদিন ডাঙা-গুলি নিয়ে খেলছিল, মা ভেড়ে গেছেন মারতে। হুশান্ত ছুটে পালিয়ে গেছে। হুপুয় গড়িয়ে গেল, সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ। তবু হুশান্ত বাড়ী না আসায় মা-বাবা-দাদার উত্তির হ'য়ে উঠলেন। চতুর্দিকে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। মা ও আমরা কান্নাকাটি কোরতে লাগলাম। পুলিশে খবর দেওয়া হ'ল। মা ছাড়ে উঠে গিয়ে চারিদিক ঘেঁষন আর কাঁদেন। বলেন, ঐ তো সবাই চারদিকে কেমন হাসছে, বেলছে, আনন্দ কোরছে, আর আমার ছেলেটা কোথায় গেল, হে ডগবান। এমন সময় মার লক্ষ্য পড়ল জলের ট্যাঙ্কের নীচে ঠিক একটা পাথর মতন কি যেন দেখা যাচ্ছে। মা খুব সাহসী মেয়ে, তবুও এই দৃশ্য দেখে, বুকটা তার কেমন ছ'য়াৎ করে উঠল। মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে, এগিয়ে গিয়ে, আমার তিনি একটা বাতি জেলে নিয়ে আসতে বললেন। গিয়ে দেখি, হুশান্ত দিবি আয়ামে ট্যাঙ্কের তলায় ঘুমুচ্ছে। একেই সে ঘুমকাতুরে ছেলে, পড়াশোনার চাপে

ভোর সাড়ে চারটেখ ওকে উঠতেই হৃৎ বাবার ভয়ে, দুপুর বেলা ঘুমতেই পারে না। আজ মায়ের তেড়ে আসাটা আর দূর হ'য়ে যা বলাটা ওর পক্ষে আলীদাদের মতই লেগেছিল।

এবার আমার পালা। মনে মনে ভাবছি—ইদ, অনেকগুলো পরসা আজ নষ্ট হবে। এমন সময় আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আরতিদি'র আবির্ভাবে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। তিনি টেঁচিয়েই বললেন—কি ব্যাপার তোমাদের? কানে কি ছিপি বেওয়া নাকি? কখন খাওয়ার ঘণ্টা বেজেছে শুনি? খাওয়ার টেবিলে বসা হয়নি কেন?

—আমি কি বলতে হবে আমাদের সকলের অবস্থার কথা? কখন যে এগারোটা বেজে গেছে তা আমরা বুঝতেই পারিনি। তোমরাই বল তো রাগটা কার ওপর হওয়া উচিত?

নকশা-ছবি :: শিল্পী : পরিচয় গুপ্ত



বিদি সত্যি কি আমাদের মাথায় গোবর পোরা আছে?

—কেন বল তো?

—আজ একটা ঘুঁটেওয়ালী আমার পেছন-পেছন আসছিল।



ত্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এই সहर কলিকাতা—এ সहर এই সেদিন ভৈরী হয়েচে—এ সहरের পতন ইংরেজী ১৬২০ খ্রষ্টাব্দে—কাজেই ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাক্ষসহল, দিল্লী, কাশী, এলাহাবাদ, মুদৈর,—এসব সहरের কাছে কলিকাতা সहर বরসে বালক বললেও অতুক্তি হবে না! বরসে ছোট হলেও এ সहरের খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি পৃথিবীর বড় বড় সहरের চেয়ে কম নয়! এই কলিকাতা সहरের স্থিতি এবং লাগনের-কাহিনী গল্প-উপন্যাসের চেয়েও কোতূহলোদ্দীপক, ক'জন তোমরা সে কাহিনী জানো? বলি, শোনো।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ হয়ে জব চার্নক জাহাঞ্জে চড়ে বাঙলা দেশে গঙ্গার তীরে হুতাশ্রী গ্রামে এসে নামেন। নামেই গ্রাম—এখানে তখন ছিল শুধু জলা আর জঙ্গল। কাদা আর পাক। আকাশে চিল উড়ছে, শকুনি উড়ছে—চারিদিকে মরা জানোয়ারের অস্থি-কঙ্কাল ছড়ানো।

এই হুতাশ্রীতে ক'ঘর লোকের বাস তখন—ভাড়া করতো। হুতো আর তুলোর ব্যবসা এবং এ কারবারে শেঠ আর বসাকরা ছিলেন অগ্রণী। জব চার্নক এসে এইখানে আস্তানা পাতলেন—কোম্পানির বিনা নির্দেশে নিজের বুনী মতো। দিল্লীর বাগশা বা বাঙলার নবাবের কোনো অহুমতিও তিনি গ্রহণ করেন নি!—নবাবের সঙ্গে তখন কোম্পানির বিরোধের আগুন প্রধুমিত হচ্ছিল।

হুতাশ্রী গ্রামের গায়ে ছিল আরো দু'খানি গ্রাম—দেখালকাটা আর গোবিন্দপুর। তিনখানি গ্রামই জলা আর জঙ্গলে পূর্ণ—জঙ্গল বলতে হোগলাবনের ছিল প্রাধান্ত এবং সে জঙ্গলে বাঘ-ভাস্কর অবাধে বিচরণ করতো। হুতাশ্রীতে হুতো আর তুলোর হাট—তাই এখানে ব্যবসার মন্ত্র কোম্পানির ফ্যাক্টরি খোলা হলো। শুধু ইংরেজের ব্যবসাক্ষেত্র নয়—ফরাসী আর পোর্চুগীজ ব্যবসারীদেও ছিল এ বাজারের সঙ্গে কারবার—কিন্তু ইংরেজ এখানে শুধু ব্যবসার ক্ষেত্র পত্তন করলো না—এখানে বসতির ব্যবস্থাও কয়েকটা করে তুললো।

হুতাশ্রুতী সীমানা ছিল—পশ্চিমে গদানদী, পূর্ব দিকে বৈঠকখানা বাজার, দক্ষিণে মেখালকাটা এবং তার আরো দক্ষিণে গোবিন্দপুর। বৈঠকখানা শেরাঙ্গদার কাছে—এখানে এক বিরাট অশখগাছ ঘিরে হাট বসতো—সে হাটে বহু ইংরেজ ব্যবসায়ী আসতো তুলো আর হুতো কিনতে—এই বৈঠকখানা বাজার ছিল তাদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র।

মেখালকাটা আর গোবিন্দপুর—এ দুটি গ্রামের মারখানে ছিল মত্ত খাল—সেই খাল পার হয়ে যাত্রীরা যেতো কালীঘাটে মন্দির দর্শন করতে, পূজা দিতে। এখনকার উত্তর কলিকাতা ছিল হুতাশ্রুতী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। পোর্ট স্মিথদের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলি গ্রামে। এখন যেখানে এসপ্লানড, চৌরঙ্গী—সেইখানে থাকতো ইংরেজ বণিকরা। হুতাশ্রুতী গ্রামে ব্যবসার সুবিধার জন্য ক'ধর বাড়ালীও আস্তানা পেতেছিলেন—এঁদের মধ্যে স্নেল আর মল্লিকরা ছিলেন প্রধান।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রদারিত করার সঙ্গে বাড়লার নবাবের সঙ্গে বিরোধিতা করে কোম্পানি গোবিন্দপুরে তৈরি করলো কোর্ট উইলিয়াম। যে জায়গায় কোর্ট তৈরী হলো, ওখানে বাস করতেন জহরাম মল্লিক—কোম্পানীর কোর্ট তৈরী হচ্ছে দেখে তিনি ও স্থান ত্যাগ করে হুতাশ্রুতী গ্রামের বর্তমান চৌরবাগান অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করলেন—তিনি তৈরী করলেন বিরাট প্রসাদ—এই প্রসাদই আজ চৌরবাগানের Marble Palace নামে প্রসিদ্ধ। গোবিন্দপুরের দিকটা ছিল গভীর জনসমষ্টি—বাঘ-ভালুকের আতানা। সে জনস্রোত হতে আজ বিরাজ করছে চৌরঙ্গীর পশ্চিমে বিরাট ময়দান।—আর তার দক্ষিণ দিকে বিরাজ করছে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট আলমগীরের পৌত্র আজিম ওসমানের কাছ থেকে বোল হাজার টাকা দাম দিয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা কিনে নিয়েছিল। ১৭৭২ সালে কোম্পানির দলে ইংরেজের সংখ্যা ছিল বারো হাজার এবং তাদের বসতি আর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছিল। এখনকার ভালহৌসি কোয়ার্টারের নাম ও লালদীঘির নাম ছিল লালবাগ। লালবাগ ছিল প্রকাণ্ড দীঘি আর বাগিচা—দীঘিতে মাহবুবন ঘান করতো—গোবু ঘোড়া মহিবও চান করতো। সাহেবরা এ দীঘিতে স্নান বন্ধ করে দিলে—এবং দীঘিকে আরো বড় করে স্থায়ী করে গড়ে তুললো। গভর্নমেন্ট হাউস বা এখনকার রাজভবন—ও বাড়ীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না—এখনকার ট্রাণ্ড রোড, নেতাজী স্তম্ভের রোড—ও জায়গায় ছিল ইংরেজ বণিকদের অফিস—তাছাড়া কোম্পানির বড় বড় অফিসাররা এসব অঞ্চলে সপরিবারে বাস করতো।

চাঁদপাল ঘাট আর কয়লা ঘাট—এ দুই ঘাটের মাঝামাঝি জায়গায় কোম্পানির বড় বড় জাহাজ এসে লাগতো—মাল খালাস করতো, মাল বোকাই করতো। নদীর একটি শাখা এখন থেকে তখন সোণা এখনকার হেরিংস স্ট্রীট ধরে গভর্নমেন্ট-হাউস বা রাজভবন ফুঁড়ে (তখন রাজভবন

আর হেলিংস স্ট্রীট ছিল অলগর্ভে) বেটির স্ট্রীট ডেব করে একটু দক্ষিণদিকী হয়ে আবার পূর্বমুখে বের যেতো—বর্তমান ধর্মতলা স্ট্রীট এবং ক্রীক রো ছিল নদীর এই শাখাগর্ভে লীন। এখন যেখানে শেরালবা রেল-স্টেশন, ওখানে তখন ছিল পক্ষি জলা এবং সে জলা ডেব করে নদীর ঐ শাখা সোজা গিয়ে মিশেছিল বেলিরাঘাটার ওদিকে সন্ট লেকে। চিংপুর রোডের পশ্চিমাংশটুকুতেই ছিল শুধু লোকজনের বসতি—পূর্ব দিকে ছিল জলা, পুকুর, মাটির ছুঁচারখানা ঘর আর ধানক্ষেত। বর্তমান এলপ্রানেভের দক্ষিণে ছিল অকল—সেই অকলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথে বাজীরা যেতেন কালীঘাট—এখনকার চৌরঙ্গী ছিল তখন অকলময়—এই অকলে এক শিব মন্দিরে এক সাধু থাকতেন, তাঁর নাম চৌরঙ্গী বাবা—তাঁর নাম থেকেই এ অকলের নাম হয়েছে চৌরঙ্গী।

নাসা জলা ডোবা বুঝিয়ে অকল সাক করে কলকাতাকে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা হলো ১৭২৪ খ্রষ্টাব্দে—ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সূতাহাটী, দেবালকাটা আর শোবিন্দপুর, তিনখানি গ্রাম মিলিয়ে সহর কলকাতা গড়ে তুলতে উত্তত হলো—কোর্ট উইলিয়ামকে আরো স্মৃদ্ধ করে গড়ে তোলা হলো—রাস্তা ঘাট তৈরী হতে লাগলো। তার আগে কলকাতার একটিও পাকা রাস্তা ছিল না—পাকা রাস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বসতি এবং আসা-যাওয়া বাড়লো। ১৭৫২ খ্রষ্টাব্দে মারাট্টারা কলকাতার লুণ্ঠপাট শুরু করলো—(বর্গীর হাকামা)—বর্গীর আক্রমণ থেকে ধনসম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সারা কলকাতা ঘিরে চওড়া পরিখা বা খাল তৈরী হলো—এ পরিখার নাম ইতিহাসে মারাট্টা ডিচ। আমাদের বাল্যকালে ১৮২৩-২৪ খ্রষ্টাব্দেও আমরা দেখেছি ডবানীপুরের বর্তমান টার্ক রোডে এ ডিচের চিহ্ন—১৮২৬-২৭ নাগাদ এ ডিচ বুঝিয়ে পথঘাট তৈরী হয়েছে।

কোর্ট উইলিয়ামের চারিদিকে ৬০ ফুট চওড়া ১২ ফুট গভীর বে পরিখা খান বেধা বার—সে পরিখা তৈরী হয়েছিল ঐ সময়েই বর্গীর হাকামা থেকে ধনসম্পত্তি ও প্রাণরক্ষার জন্য।

১৭২৪ খ্রষ্টাব্দে বিভিন স্ট্রীট এবং সাহুলার রোডের তিন মাইলের মধ্যে তিনখানি মাত্র পাকা বাড়ী ছিল—দক্ষিণ-চৌরঙ্গীতে পাঁচ সাতখানি পাকা বাড়ী। ১৭৫৭ খ্রষ্টাব্দে শোভাবাজার পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি অকল ছিল অকলময়—অকল কাটিয়ে এসব অকল বাসোপযোগী করে তোলেন রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতি। ষ্ট্রাও রোড তৈরী হয় ১৮২৩ সালে। বিদ্যাপুরের দক্ষিণে গার্ডেন রীচ—এ অকলে ছিল শোবিন ইংরেজ বণিকদের বসতি। তখন এখানে ছিল সতেরোখানি বাড়লো প্যাটার্নের বাড়ী—তার উইলিয়াম কোল থাকতেন গার্ডেন রীচে একখানি বাড়লোর এবং সেখান থেকে প্রত্যাহ পালকী চড়ে কলকাতার বাতায়ত করতেন। বর্তমান হেলিংস স্ট্রীট ছিল তখন নদীর গর্ভে—বড়বাড়ার অকলে ক'জন বাড়ালী ব্যবসারীর বসতি ছিল—মাদোহারির নামগন্ধ ছিল না বড়বাড়ারে। ১৭৫৬ খ্রষ্টাব্দে কলকাতার ইংরেজদের আত্মনা ছিল সত্তর এবং সে সব আত্মনা ছিল পদ্মার

ধারে—আমাদের এদেশী লোকজন বাস করতেন উত্তরাংশে—সাহেবরা এ অঞ্চলকে বলতো—মেট্রি টাউন। ইংরেজ-বণিকের আঘোলেও কলকাতার বহু আর্থানী বাস করতো। তারা থাকতো বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোডের (হ্যারিসন রোড) দক্ষিণে। ক্যানিং স্ট্রিটের উত্তরে থাকতো পোর্টগীজরা—তাদের সে বসতির চিহ্ন ঐ আর্থানী গির্জা এবং পোর্টগীজ চার্চ আজও আমরা দেখতে পাই। বহুবাজার স্ট্রিট ছিল পায়ে-চলা পথ—মেটে পথ। চৌরঙ্গীর মিডল্টন স্ট্রিট ছিল কোম্পানির বাগান—বর্তমান মিশন রো ছিল ময়দান। 'বাগবাজার' নাম হলো কেন জানো? ও অঞ্চলে ছিল ফেরিন নামে এক ইংরেজের বাগান—সে বাগানে কোম্পানির অফিসাররা আয়োদ্য-প্রমোদ করতো।

আলিপুর চিড়িয়াখানার পাশে যে বেলভেডিয়ার প্রাসাদ—এ বাড়ীর মালিক ছিলেন কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওরারেন হেস্টিংস। তার আগে এ প্রাসাদ আর বাগান ছিল নবাব মীরজাফরের—নবাবী পধি পেয়ে তিনি সেটি হেস্টিংসকে দান করেন। এ বাড়ী বাগান ছিল হেস্টিংসের নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁর কাছ থেকে এ বাড়ী বাগান কেনেন টলি সাহেব,—টলি সাহেবের কাছ থেকে কেনেন চার্লস প্রিন্সেপ—এবং প্রিন্সেপের কাছ থেকে কোম্পানি এ বাড়ী বাগান কেনে ১৮৫৪ সালে আশী হাজার টাকা মূল্যে। ১৮৫৪ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এ বাড়ী ছিল বাঙলা বিহার উড়িষ্যা ছোটলাট সাহেবের আস্তানা—তারপর ছোটলাটের পদ অবসান হলে লর্ড কার্জনদের ব্যবস্থায় এ বাড়ী বাগান সম্ভ্রান্ত অতিথি-নিবাস স্বরূপ ব্যবহৃত হতো—এখন এ বাড়ীতে হয়েছে জ্ঞানদাল লাইব্রেরী। ক্লাইভের রাজ্যপত্তন হবার পর থেকে কলকাতার কলেবর বর্ধিত এবং পরিশোভিত হতে থাকে। যে হালসীবাগানে পরেশনাথের মন্দির, ঐ হালসীবাগান ছিল উমিচাঁদের বাগানবাড়ী। নবাব সিরাজদ্দৌলা মুতাহতীতে এলে ঐ বাগানবাড়ীতে থাকতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কেন্দ্র ছিল—এখন যেখানে জেনারেল পোস্ট অফিস, ঐখানে—গভর্নমেন্ট হাউস তৈরী হবার আগে কোম্পানির গভর্নররা থাকতো ঐ কেল্লার মধ্যে।

কলকাতার সে মুগ্ধ পালকী ছিল একমাত্র বাহন। ১৮০০ সালে প্রথম ঘোড়ার গাড়ীর চলন শুরু হয়। তার আগে বাহক পথে ঐ পালকীর ডাক বসিয়ে লোকজন কলকাতা থেকে এমিকে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ এবং ওদিকে ডাঙ্গলপুর, মুন্সের, পাটনা ও কান্ধী বাতারাতে করতো। বর্তমান রাজমন্ডল বা ইংরেজের গভর্নমেন্ট হাউস তৈরী হয় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে। লাটসাহেবরা তখন গ্রীষ্মকালে ব্যারাকপুরে গিয়ে বাস করতেন—সিরলা বাজিলিয়ে নয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্নক এসে ব্যারাকপুরে বাস করতেন—তাঁর নাম থেকে ব্যারাকপুরের নাম হয়েছে চার্নক। লর্ড ক্যানিংয়ের ত্রী কলকাতার মাঠা গেলে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয় ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাউসের মধ্যে বাগানে।

আজ এই পর্যন্ত।

হেমস্তের ভোরে

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য

(১)

হেমস্তে আজ রাত পোহালো
পাহাড়তলীর গায়
পূব-আকাশে পলাশ-রাঙা
আবীর কে ছড়ায় ?

(৩)

পঞ্চমুখী জবার বনে
ভুন্তে যেন পাই
ঘুম থেকে সব জেগে উঠে
তুলছে বসে হাই ॥

(২)

লজ্জা পেয়ে উবারাগী
ঘোমটা টেনে তাই
সোনার জলে ভিজিয়ে শাড়ী
বলছে 'আমি যাই' ॥

(৪)

মাঠে মাঠে ঢেউ-খেলানো
ধানের শীষের গায়
ভোরের শিশির মুক্ত-ছড়া
বিছিয়ে দিয়ে যায় ॥

(৫)



শাখায় শাখায় ডাকলো পাখী
ফব্বা চারিধার
মায়ের বুকে কান্দলো শিশু
ঘুম ভাঙিয়ে তার ॥



গোলাপ-পাপড়ী

(বড় গল্প)

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

গোলাপপুরের রাজকুমারের ছিল একটি পরমাহুন্দরী বোন—তার নাম গোলাপকুমারী। রাজকুমার তাঁর বোনকে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে ভালো বাসতেন, আর তাঁর বোনের সকল সাধই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতেন। গোলাপকুমারী, চুল বড় ভালোবাসতেন, বিশেষ করে গোলাপ চুল। সেইজন্তে রাজকুমার তাঁর সারা রাজধানী গোলাপ গাছে ভরে দিয়েছিলেন। গোলাপকুমারী আরো ভালোবাসতেন তার সোনার মত পা পর্বন্ত লম্বা চুল আঁচড়াতে—তিনি চুল খুলতেন—আঁচড়াতে—আবার বাঁধতেন। চুল আঁচড়ে সেবার জন্তে তাঁর ছিল একঘল দাসী। দাসীরা সব সময়েই একখানি সোনার চিকনি নিয়ে গোলাপকুমারীর সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

গোলাপকুমারীর কান্নাই ছিল চুল আঁচড়ান আর দাসীদের সঙ্গে প্রাসাদের ছলবাগানে দৌড়ো-দৌড়ি করা। দৌড়তে গিয়ে এলিয়ে পড়ত তার চুল—দাসীরা আবার তার চুল আঁচড়াতে বসত।

একদিন সকালে দাসীরা গোলাপবাগানে বসে গোলাপকুমারীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, আর হুঁ শব্দের বিউনি করছে, এমন সময় গোলাপপুরের রাজকুমার, রাজকুমার চিরহুন্দরের হাত ধরে বাগানের ভেতর এসে গোলাপকুমারীকে বললেন :

—বোন, তুই ত জানিস চিরহুন্দর আমার প্রাণের বন্ধু—তার কথা তোকে আমি প্রায় বলি। আমার ইচ্ছে তুই চিরহুন্দরকে বিয়ে কর, তাহলে বন্ধু আমার চিরকাল আমার কাছে থাকবে। এই বেশ, তোব সামনে চিরহুন্দর দাঁড়িয়ে—তাকে তোব মনের কথা খুলে বল।

ঠিক সেই সময় বিয়ের চিকনি রাজকুমারীর চুলে আটকে বাওরাতে চলে টান পড়ল। গোলাপ-কুমারী বিরক্ত হ'য়ে বলে উঠলেন, “আঃ, তোরা কেবল আমার চুল ছিঁড়ে দিচ্ছিস।” দাসী কমা চেয়ে উত্তর দিলে, “বিস্ময়নি, আমি কি তোমার চুল টানছি, চুল টানছে ঐ রাজকুমার চিরহুন্দর, রাজকুমারকে দেখে আমি কেমন আনমনা হ'য়ে পড়েছিলাম।” রাজকুমার চিরহুন্দর, গোলাপকুমারীর কাছে কমা চাইলেন। আবার রাজকুমারীর চুলে টান পড়ল। তিনি বিরক্ত হ'য়ে দাসীর হাত থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে রাজকুমার চিরহুন্দরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, “দাদা, রাজকুমার, কুমড়োর সঙ্গে গোলাপ গাছের যদি বিয়ে সম্ভব হয় তা'হলে আমার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়েও সম্ভব হবে।” এই কথা বলে গোলাপকুমারী ছুটে ছুটে একটা গোলাপ কুণ্ডের ভিতর অদৃশ হ'য়ে গেল, দাসীরাও তাঁর পিছু পিছু ছুটে গেল।

রাজকুমার চিরহৃদয়কে সাধনা দেবার কিছুই ছিল না। গোলাপপুরের রাজকুমার বললেন,
“এর কথার আর নড়াচড়া হবে না।”

রাজকুমার চিরহৃদয়কে বললেন, “বেশ, আমিও এ অপমানের শোধ নেব।” এই বলে তিনি
চলে গেলেন বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে। তিনি তাঁর মালীর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করলেন।
তার মালী ছিল এক ভাইনি বুড়ী।



‘এই কথা বলে গোলাপকুমারী ছুটতে ছুটতে একটা গোলাপকুণ্ডের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল,
দায়ীরাও তাঁর পিছু পিছু ছুটে গেল।’

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন গোলাপকুমারী গোলাপবাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখতে
গেলেন একটা বুড়ী, একটার পর একটা গোলাপ ফুল দেখছে আর ঘাড় নাড়ছে। গোলাপকুমারী বুড়ীর
কাছে এসিয়ে গিয়ে বললেন, “হ্যাংগো বুড়ী, তুমি এমন করে ঘাড় নাড়ছে কেন?”

—যেখনি কোন ফুলটা সবচেয়ে ভালো আর চিরহৃদয় হ’য়ে ফুটে থাকে।

—এমন ফুল আছে নাকি। এমন গাছ পেলে আপনি বা দাম চাইবেন সেই দাম দিয়েই কিনতে রাজী আছি।

বুড়ী তখন তার হাতের সাজির ঢাকা খুললে। রাজকুমারী দেখলেন একটা কুমড়োর উপরে একটি হৃদয় গোলাপ গাছ হ'য়ে রয়েছে। কুমড়া থেকে রস পায় বলে গাছটি কখনও মরে যায় না।

গাছটি দেখে গোলাপকুমারীর ভাবি আনন্দ হ'ল, তিনি বুড়ীকে লিগ্‌পেস করলেন :

—গোলাপ গাছটির মতো কি দিতে হবে ?

—কেবল দুটি জিনিস, প্রথম হ'চ্ছে, আজ দুপুরে তুমি আমার অতিথি হ'বে আর বিতীরটি হচ্ছে গোলাপ গাছটি তোমার যখনই একটি ক'রে ফুল দেবে তখনই তুমি তোমার দাসীদের নিয়ে একটি উৎসব করবে। সেই উৎসবে তোমরা একে একে এই গোলাপ গাছটিকে লাঙ্ঘিয়ে যাবে, কিন্তু তোমাদের পোশাক গোলাপ ফুলদিতে ঠেকবে না। যদিও বা ঠেকে যেন গোলাপ ফুলের একটিও পাপড়ি খসে না পড়ে। যার পোশাকে ঠেকে গোলাপফুলের পাপড়ি মাটিতে ঝরে পড়বে সে গোলাপ গাছটিকে বলবে :

লাঙ্ঘাতে পারিনি ভালো করে তাই পড়েছে ঝরে
তোমার ফুলের পাপড়ী দুটি মাটির উপরে
আঘাত কর আঘাত কর মোরে
তোমার চুড়ি দিয়ে আমার করে
লাঙ্ঘিয়ে যাবার সময় যেন দল না ঝরে পড়ে।

এই কথা বললেই গোলাপ গাছ তার হাতে জোরে জোরে দু'বার মারবে।

এই কথা শুনে গোলাপকুমারী হেসে উঠলেন। বুড়ীর কথা রাজী হ'লেন। তখন বুড়ী তার থলি থেকে একটা কাঠের চমচে বার করে কুমড়োটাকে দু'আধবানা করে কেটে এক চামচে কুমড়োবিটি নিয়ে গোলাপকুমারীর মুখের কাছে ধরলে। গোলাপকুমারী কুমড়োবিটি খেয়ে মুখ বিকৃত করলেন, কিন্তু আর একবার খাবার পর তাঁর খেতে বেশ ভাল লাগল—তিনি অনেক কুমড়ো-বিটি খেলেন। তারপর বুড়ী গোলাপ গাছটি রাজকুমারীর ঘরের জানলার কাছে পুঁতে দিলে—গোলাপ গাছে একটি হৃদয় গোলাপ ফুল ফুটেছিল, সেইমতো বুড়ী গোলাপকুমারীকে বললে—
“রাজকুমারী তোমার দাসীদের ডেকে উৎসব আরম্ভ কর।”

রাজকুমারী তার দাঁধার কাছে গিয়ে সব কথা বললেন।

রাজধানীময় সাড়া পড়ে গেল, হ'ল উৎসবের আয়োজন।

উৎসব-মণ্ডপে হাজির হলেন রাজকুমারী তার দাসীদেব নিয়ে। কে আগে গোলাপ গাছটি লাক্ষিয়ে থাকবে এই নিয়ে হ'ল মশকিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল রাজকুমারী সব শেষে লাকাবেন।

অনেকেই গোলাপ গাছটি না ছুঁয়ে লাক্ষিয়ে গেল। কিন্তু যে দাসী রাজকুমারীর চুল টেনেছিল তার কাপড়ের ঝাঁচল লেগে গোলাপ ফুলের ছুটি পাপড়ি মাটির উপর খসে পড়ল। তখন দাসী বললে—

লাকাত্তে পারিনি ভালো করে তাই পড়েছে ঝরে

তোমার ফুলের পাপড়ি ছুটি মাটির উপরে।

আঘাত কর আঘাত কর মোরে

তোমার কাঁটা দিয়ে আমার করে

লাকিয়ে যেতে পারি যেন দল ঝরে না পড়ে।

এই কথা বলতেই গোলাপ গাছটি নড়ে উঠে দাসীর হাতের উপর গোলাপ ডালে করে ছ'বার খুব কোরে আঘাত করতে দাসীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। গোলাপ গাছের রকম দেখে সকলে ভো অবাক।

এইবার রাজকুমারীর পালা। তিনি যেই লাক্ষিয়ে থাকেন, অমনি তার চুলের বিউনি খসে পড়ল। বিউনিতে লেগে গোলাপ ফুলের ছুটি পাপড়ি ঝরে পড়ল। কিন্তু মাটিতে পড়বার আগেই গোলাপকুমারী পাপড়ি ছুটি হাতে করে ধরে নিজের মুখে ফেলে দিয়ে গিলে ফেললেন, সকলে খুব হাততালি দিয়ে উঠল।

ভোজের পর সকলে আনন্দে নাচ গান করলে। শেষে বুড়ী দাঁড়িয়ে উঠে বললে—

কুমড়োর বিচি আর গোলাপের দল

ভোজন করেছ তুমি গোলাপকুমারী

গোলাপ, কুমড়ায় লবে আপনার কবি

তোমার গরব বত হইবে বিকল

আমার হৃদয় তরে কাঁদিয়ে কেবল।

এই কথা বলেই বুড়ী অদৃষ্ট হ'য়ে গেল। রাজকুমারী হঠাৎ ককণ চিৎকার করে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। সকলে রাজকুমারীকে ধরাধরি করে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানার উপর শুইয়ে দিলে। রাজকুমারীর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি মনে মনে ভাবলেন সত্যিই যদি কুমড়ায় আর গোলাপ আছে বিয়ে হতে পারে, তা'হলে তিনিই বা কেন রাজকুমার চিরহৃদয়কে বিয়ে না করবেন।

রাত্রে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। “যেন তার মুখের উপর একটি হৃদয় গোলাপ ফুল ছুটে রয়েছে। বোঝই তিনি ঐ-স্বপ্ন দেখেন।

গোলাপ গাছে আবার একটি ফুল ফুটে উঠল। আবার হ'ল উৎসবের আয়োজন। কিন্তু রাজকুমারী ক্রমশঃ বিমর্ষ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। তিনি কিছুই খেতে পারেন না, কারণ কোন কিছুই বাব পান না।

তৃতীয় উৎসবের পর রাজকুমারী স্বপ্ন দেখলেন তিনি যেন একটি কুমড়ো হ'য়ে গেছেন, আর গোলাপপুরের রাজকুমার তার সঙ্গে কথা কইছেন, যন তার দুঃখে ভরা। তিনি যেন বলছেন 'গোলাপ গাছটি লাকানো'র উৎসব করা আর ঠিক হবে না।

পঞ্চম উৎসবের দিন রাজকুমারী নিজের ঘরে বসে কেবল কাঁদতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, “আমি কুমড়ো হ'য়ে গেছি।” কেউ তাকে ধর থেকে বার করতে পারল না।

রাজকুমার তার প্রিয় বোনের মতে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। রাজ্যের বজ্রিণের তিনি ডেকে আনলেন, কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলেন না।

ষষ্ঠ উৎসব এসে পড়ল। গোলাপ গাছটা তখন খুব বড় হ'য়ে উঠেছে। সেটাকে লাফিয়ে বাবার চিন্তা কেউই আর করতে পারলে না—তার উপর রাজকুমারী কেবল কাঁদেন আর বলেন, “আমি কুমড়ো হ'য়ে গেছি।”

সপ্তম উৎসবের দিনে গোলাপ গাছটা রাজকুমারীর আনলা দিয়ে উঁকি মারতে লাগল।

অষ্টম উৎসবের দিনে গোলাপ গাছের ডালগুলো একেবারে রাজকুমারীর বিছানার উপর এসে পড়ল এবং নবম উৎসবের দিন গোলাপ গাছটা রাজকুমারীকে ঢেকে ফেললে।

রাজকুমারী এখন -অপে অপেই স্বপ্ন দেখেন—তিনি যেন একটি কুমড়ো হ'য়ে গেছেন। তার মনে হ'ল তিনি আর বেশী দিন বাচবেন না, সেইজন্যে তিনি তার দাবাকে ডেকে পাঠালেন। রাজকুমারী একটি বাতি হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। রাজকুমারী দেখলেন, কাল তিনি যে-আধথানা সোনার কুমড়ো বসবার কোচের উপর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, সেই আধথানা কুমড়োর উপর একটি ছোট্ট ফুল ধুমোচ্ছে। রাজকুমারী খুব আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। তিনি তার দাবাকে বললেন, “আহা, আজ যদি রাজকুমার চিরস্থায়ী এখানে থাকতেন তা'হলে নিশ্চয় আমি তাকে বিয়ে করতাম। গোলাপ গাছের ফুলগুলো নড়ে উঠল। রাজকুমার ও রাজকুমারী শুনতে পেলেন যেন কে বলছে :

গোলাপ হ'য়েই ছুটব আমি

গোলাপ হ'য়েই মরব

গোলাপ হ'য়েই দিবস ধামী

চিরস্থায়ী থাকব।

(ক্রমশঃ)

ম্যাজিক শেখ

ষাট্ঠকর বি. দাস

ম্যাজিক ফানেল



একটা টিনের বা পেতলের ফানেল একেবারে খালি দেখান হোলো। তারপর ফানেলটা একটা গ্লাসের ওপর ধরে জল পড়তে বললেই জল পড়তে লাগলো এবং ষাট্ঠকর থামতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই জল পড়া বন্ধ হ'য়ে গেল। এইভাবে ষাট্ঠকরের কথামত জল পড়তে লাগলো ও জলপড়া বন্ধ হ'তে লাগলো।

২ নং ছবিতে ফানেলটি কি ভাবে তৈরী হবে দেখান হয়েছে। বড় ফানেলের ভিতরে ছোট আর একটা ফানেল বসিয়ে ওপর দিকটা এবং নীচটা ঝালাই ক'রে লাগিয়ে দেওয়া। এতে দুটো ফানেলের

মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা থাকবে। বড় ফানেলের হ্যাণ্ডেলের কাছে একটা ছোট ছেঁদা থাকবে, এবং ছোট ফানেলটার তলার দিকেও একটা ছেঁদা থাকবে।

জল ভর্তি করার সময় ফানেলটা একটা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ ধ'রে বুদবুদ বেগোতে থাকবে। বুদবুদ বেগোন বন্ধ হ'য়ে গেলে ওপরের ফানেলের গায়ের ছেঁদাটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে সেখানে একটু মোম লাগিয়ে রাখলে আর জল পড়বে না।

খেলা দেখাবার সময় আঙ্গুল দিয়ে মোমটা সরিয়ে দিলেই জল পড়বে এবং বন্ধ করে দিলেই জল পড়াও বন্ধ হবে।

সময় চলিয়া যায়

বাহুকের টেবিলের ওপর একটা টাইমপিস ঘড়ি আছে। তিনি সেটার এলার্ম বাজিয়ে দিলেন এবং তারপর একটা ক্রমাল চাপা দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে সেটা তুলে এগিয়ে নিয়ে এলেন। এলার্ম তখনও বাজছে।

বাহুকের ক্রমাল সামান্য তুলে দেখলেন যে ঘড়িটা তখনও ক্রমালের তলাতেই আছে।

এইবার বাহুকের ক্রমালের ছই কোণা ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ঘড়ি অদৃশ হ'য়ে গেল।

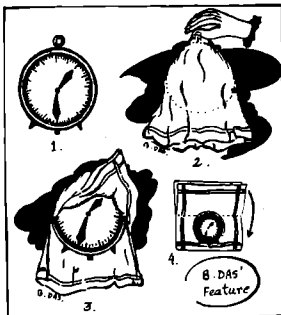
কৌশল : ঘড়িটিতে কান কৌশলই নেই। তবে ঘড়ির এলার্মের বাজনার মত শব্দ হবে

সে রকম একটা কলিং বেল বাহুকের কোটের তলায় লুকানো থাকে।

ক্রমালটাতেই যত কৌশল। ঘড়ির ডায়ালের মত আর একটা কাটা লাগানো ডায়াল স্বেতা দিয়ে ক্রমালের মাঝে বীধা থাকবে। ক্রমালের অর্ধেক মাপের এবং একই রংয়ের আর এক টুকরা কাপড় মাঝে সেলাই করে লাগান থাকবে।

৪নং ছবিতে ক্রমালের তৈরীর কৌশল দেখান হইছে। ঘড়িটা ক্রমাল চাপা দিয়ে নিচে বাবার সময় টেবিলের একটা গর্তে সেটা কেলে দেওয়া হয় এবং পরে আবার ঘড়িটা দেখাবার সময় আসলে ডায়ালটা দেখান হয় মাত্র। ক্রমাল ঝাঁকানি দিলেই ক্রমালের মাঝে লাগান কাপড়ের টুকরোটা ডায়ালটাকে ঢেকে ফেলবে।

এলার্ম বাজানটা আসলে কলিং বেল বাজান ছাড়া আর কিছুই নয়।





রাজবৈদ্য বললেন, "তাই হবে মহারাজ।"

দুই বৈদ্য

ত্রিভুতনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতা ও পুত্র। পিতা রাজবৈদ্য এদেশের। পুত্রও রাজবৈদ্য হতে বিদেশে গেছেন শিক্ষা লাভের জন্ত। কারণ পিতা ঘ বয়স হয়েছে—এবার পুত্রকেই রাজবৈদ্য হতে হবে এদেশের। রাজা আদেশ। এবং তারই জন্তে পিতা-পুত্রকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন আরো শিক্ষা

জন্মে বিদেশের মাটিতে। রাজবৈষ্ণ পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে ভালো দেখতে পান না—এবার তাঁর অবসর নেবার পালা। তাই একদিন এদেশের রাজা রাজবৈষ্ণ পিতাকে ডেকে বললেন :

“দেখুন বৈষ্ণমশাই, এবার আপনার ছেলেকে আনতে পাঠান ; অনেক দিন হোলো, তার শিক্ষা এতোদিনে নিশ্চয়ই সমাপ্ত হয়েছে। আর তাছাড়া আপনিও এবার অবসর নিয়ে বাকী জীবনটা আরামে ভগবানের নাম করে কাটান।”

“তাই হবে মহারাজ। আপনার কথামতোই কাজ হবে ; তবে—”

“তবে কি ? বলুন।”

“আমি তাকে পরীক্ষা করে তবে আপনার রাজবৈষ্ণরূপে বরণ করে নেবো।

“তা তো বটেই। তার জন্মে আমাকে কি করতে হবে বলুন ?”

“আপনাকে কিছু করতে হবে না মহারাজ—করবো আমি ; শুধু আপনার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে কিছুদিনের জন্মে আমার কথামতো কাজ করার আদেশ দিন।”

“কাকে আপনি বিশ্বস্ত বলে মনে করেন বলুন বৈষ্ণমশাই—নিম্ন বেছে নিম্ন।”

“আমি আপনার মন্ত্রীপুত্র কলিত্রকে বিশ্বস্ত বলে মনে করি, তাকেই আমি চাই মহারাজ।”

“তাই নিম্ন।”

রাজবৈষ্ণ মন্ত্রীপুত্র কলিত্রকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে গমন করলেন। রাজা এতোদিনে একটা অন্ততঃ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলেন। বৃদ্ধ রাজবৈষ্ণকে দিয়ে আর কতো চিকিৎসা করানো যায়, এবার যোগান পুত্র এসে চিকিৎসার ভার নেবে। আর বৈষ্ণমশাইও যাই হোক অবসর শেষে ভগবানের নাম নিয়ে ঝাঁঝবেন। অনেক বেটেছেন তিনি, আর কতো খাটবেন যোগান ছেলে থাকতে ?

এদিকে রাজবৈষ্ণ পিতা ঘরে গিয়ে মন্ত্রীপুত্র কলিত্রকে বললেন :

“দেখো বাপু, তোমাকে আমার ছেলের কাছে বেতে হবে। তোমাকে আমি বিশ্বস্ত বলে জানি ; আমি যেমন ভাবে বেতে নির্দেশ দেবো, তেমনি ভাবে তুমি আমার ছেলের কাছে যাবে, কেমন ?”

“তাই হবে বৈষ্ণকাকা, আমি আপনার কথামতোই কাজ করবো।”

“জানি—তাই তো তোমাকে নিয়েছি বাবা ; আমার এই কাজের যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে। আজ্ঞা, এবার আমার নির্দেশ শুনে নাও।”

“বলুন।”

“তোমাকে হেঁটে যেতে হবে আমার ছেলের কাছে।—দু’টো রাত্তা আছে : দক্ষিণের আর পূর্বের রাত্তা : তোমাকে পূর্বের রাত্তা ধরে তার কাছে পৌঁছাতে হবে।”

আপনি কি আমাকে তেঁতুলতলীর রাত্তা ধরে যেতে বলছেন ?”

“হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছো বাবা। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তেঁতুলগাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে যাবে ; তোমার কোনো কষ্ট হবে না—কেমন ? তা হেঁটে যেতে তোমার প্রায় মাসখানেক সময় লাগবে কি বলো ?”

“তা লাগবে। আমি আলই কি রওনা হবো ?”

“না কাল ভোরে তুমি রওনা হবে।”

“আচ্ছা তাই হবে বৈজ্ঞানিক।”

পরদিন ভোর হতেই পাখপাখালি জাগতেই সূর্যমাসা হামাগুড়ি দিয়ে সবমাত্র পাহাড় ভিগোবার চেষ্টা করতেই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রীপুত্রকে ঘুম থেকে তুলে তাকে তার ছেলের কাছে রওনা করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মনে মনে একটু হাসলেন। হাসলেন এই কারণে যে, এবার দেখা যাবে কিরূপ বিজ্ঞা আয়ত্ত করেছে তার ছেলে বিদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে। পরীক্ষাটা খুব কঠিন। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হোলে নিশ্চয়ই পারবে এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হোতে।—“ভগবান ! আমার মুখ রেখো ঠাকুর।” মনে মনে ভগবানকে ডেকে রাজবৈজ্ঞ একটু গর্বিত হলেন।

বাই হোক, এনিচে মন্ত্রীপুত্র কলিঙ্গ হাটতে হাটতে তেঁতুলতলার ছায়া দিয়ে, একদিন মাসখানেক পরে বৈজ্ঞপুত্রের কাছে গিয়ে হাজির হোলো। তখন তার মুমূর্ষু অবস্থা—সারা অঙ্গ তার কূঠব্যাদিতে ভরে গেছে। বৈজ্ঞপুত্র মন্ত্রীপুত্র, এবং তার বন্ধু কলিঙ্গের অবস্থা দেখে অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন তাকে :

“কি ব্যাপার কলিঙ্গ—কূঠব্যাদি ধরলো তোমাকে কি করে বলো তো ?”

“তা তো বলতে পারবো না বন্ধু,—তবে তোমার বাবার নির্দেশে তেঁতুলগাছের ছায়ায় ছায়ায় একমাস কাল হেঁটে তোমার কাছে এসেছি। তোমার বিজ্ঞার পরীক্ষা করতেই আমাকে তিনি তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। এখন উপায় করো বন্ধু, আমি যে নরি তোমার বাবার পরীক্ষার প’ড়ে।”

“তুমি বিশ্রাম করো বন্ধু—এক মাসের মধ্যেই আবার তোমাকে আমি স্বস্থ করে তুলবো, কিছু ভয় নেই তোমার।”

“বা করো ভাই, তাড়াতাড়ি করো।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধু, পরীক্ষার আমি সফলতা লাভ করবোই, তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে আমার ওষুধে। কালই আমি তোমার ওষুধের ব্যবস্থা দেবো। আজ তুমি বিশ্রাম করো বন্ধু!”

“তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জাই—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। হ্যাঁ, তোমার বাবা তোমাকে এই পত্র দিয়েছেন।”

“দাও। দেখি কি লিখেছেন?”

পত্র পড়ে বৈভূষণ মনে মনে একটু হাসলেন। তারপর একটা সৌভাগ্যের গর্বে গবিত হোয়ে উঠলেন মনে মনে। তার পরীক্ষার সাক্ষ্য তাকে একবারে রাজবৈভের সম্মানে সম্মানিত করে ছেড়ে দেবে। ভগবানকে হাজার হাজার প্রণাম। বৈভূষণ ভগবানকে প্রণাম জানালেন।

পরদিন। ডোর হয়েচে। বৈভূষণ বন্ধু কলিককে ডেকে তুললেন। বিছানা হতে উঠে দাঁড়ালো সে। বৈভূষণ অকণিম তাকে বললেন :

“আজই তোমাকে এই পত্রের অব্যব নিয়ে রওনা হতে হবে বন্ধু, তবে তোমাকে দক্ষিণের পথ ধরে যেতে হবে, পূর্বের পথে আর না। সাবধান।”

“আমার এই ব্যাধির কি করলে জাই—ওষুধ দাও।”

“এই পথে নিমগাছের ছায়ার ছায়ার চলে যাও—অস্থব তোমার নিশ্চয়ই সেরে যাবে বন্ধু। এই তোমার রোগের ওষুধ—তুলে যেও না আমি তোমাদের রাজ্যের ভাবী রাজবৈভ।”

“জাই হোক—আমি চললাম।”

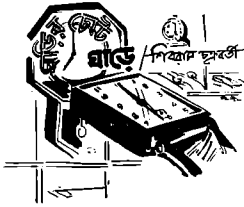
মন্ত্রীপুত্র হাটতে হাটতে হাটতে নিমের দেশে ফিরে এসে রাজবৈভের হাতে তার পুত্রের লেখা চিঠি দিল। তখন তার কুষ্ঠব্যাধি সম্পূর্ণ সেরে গেছে। কোনোদিন তার যে কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, তা বোঝাই যায় না।

রাজবৈভ গবিত হয়ে রাজাকে তার পরীক্ষার কথা জানালেন। এবং তার পুত্র যে উপযুক্ত হয়েচে রাজবৈভ হবার, তাও জানালেন তিনি মহারাজকে।

মহারাজ বৈভূষণকে নিজে দিয়ে সমাদর করে নিয়ে এলেন এবং রাজবৈভ পদে তাকে সকলের সম্মুখে সভা করে গ্রহণ করলেন।

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই বটে এই অকণিম।

বন্ধুগর্বে গবিত হোলো মন্ত্রীপুত্র কলিক এবং আনন্দে তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরলো সে। তার কাল-ব্যাধি অকণিমাই তো সরিয়ে দিয়েছে।



নাঃ, এ ঘড়িকে নিয়ে আর চলে না।
ঘড়ি-ঘড়ি এ টাইম পালটায়, একটা নতুন
ঘড়ি না কিনলেই নয় আর। একটা ঘড়ি
কিনেচিলাম আটশ বছর আগে। আটশ
টাকা দিয়ে। লম্বাটে চৌকো হাত-ঘড়ি।
সেই আঠাশে ঘড়িটাই এখনো আমার
কব্জিতে শোভা পাচ্ছে।

এ ধরনের ঘড়ির দেখা মেলে না
এখনকার দিনে। আজকাল ঘড়ির এ
ক্যাশান চালু নয়। গোলাকার হাত-ঘড়ির
মরশুম এখন।

কিন্তু বাইরে গোল না দেখালেও

আমার ঘড়ির ভেতরে গোল কিছু কম ছিল না। নিম্নের বেখালমাকিক ওর চাল-চলন। কখনো
টিক টিক ঘাবে না, রো না হয় কাস্ট হবেই। সর্বদাই তাই।

ঘটায় ঘটায় মিলোতে হয় এটাকে। এই আমার একটা বাড়তি কাজ। নিম্নেরই তাল
রাখতে পারি না তার ওপরে ঘড়ির তাল সামলাতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা আমার চাল পেয়েছে।

লক্ষ্য করছি আবহাওয়ার প্রভাব রয়েছে এর ওপর। বাইরে ঠাণ্ডা পড়লে আমি যেমন নড়তে
পারি না, এটারও তখন দেখি মন্থর গতি। ঘটায় আঠাশ মিনিট করে রো। আমার ডিমে চাল
হলে এটাও ডিম্বিখে চলে।

আবার বাইরে গরম পড়লে আমি যখন ছটকট করছি আমার ঘড়িটাও তখন চটপট চলে।
ঘটায় আঠাশ মিনিট করে কাস্ট।

কিন্তু এমন করে ত চলে না। সেদিন এক বিয়ের নেমন্তরের ভোজে গেছি। কাঁটার কাঁটার
আটটার গিয়ে পৌঁছবার কথা। তা, আমি হাতে আধঘণ্টা সময় রেখে সাড়ে সাতটার বড়না
হয়েছি...যেতে লাগবে পনের মিনিট পারে হেঁটে গেলেও...কাস্ট ব্যাচেই বাওয়া সেবে...পেটটি ভরে
নিখে পিঠটান সেব...ভা, গিয়ে সেবি সেবানকার দেয়াল-ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে-নটা। ষাণ্ড ব্যাচ
বেতে বলে গেছে তখন...ব্যাচের পর ব্যাচ নিমন্ত্রিত আসতে লেগেছে শেষ চোটে...ভিড়ে ভিড়াকার
...তাদের সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাতে বসতে সাতের ব্যাচে গিয়ে পড়লাম। বাহোটা বাকিয়ে
কিরলাম বাড়ি।

সব চেয়ে খাবাপ কথা, সাত নম্বর ব্যাচে খাবার মতন কিছুই ছিল না। সাতের প্যাচে পড়ে পাতে পেলাম খান দুই লুচি, দু'চামচ গোলাও, আখখানা আলুর দম, নো কি-ফ্রাই, নো চপ, নো কাটলেট, এক টুকরো মাছ, তিন টুকরো মাংস (তার দুটোই হাড় আবার—আগার করব কি।) দইয়ের একটু তলানি, বোমের কয়েকটি পরমাণু, নো সন্দেশ, নো রসগোল্লা, নো রাবড়ি, আখখানা পাশর ডাঙা আর প্রচুর ছ্যাচড়া। (তিনবার চারবার করে ঐটে দিল।) ঘড়িটার ছ্যাচড়ামির অগ্নই এমনটা হল। দায়া হাত ঘুম হল না আমার। মনটা বচবচ করতে লাগল। ঘড়ির পর ঘন্টা ভেগে কাটলাম। ঘড়িটার দিকে না তাকিয়ে।

পরদিন সকালে উঠে টেরিটি না বাগিয়েই ছুটলাম টেরিটি বাজারে। যে কোন এক ঘড়ির দোকানে। কাটার কাটার ঠিক ঠিক টাইম দেয় এমনি একটা ঘড়ি কিনব। এর পর থেকে ঘড়ি ধরে হবে আমার কাল...ভাবতেই পাখ কাটা দিল আমার। এরপর থেকে সজাকর মতই আমি কাটার কাটার চলব সোজা।

ছুকলাম দোকানে।

ছুকতেই ধাকা বেলাম গোড়ায়। না, গোড়ালিতে হোচট খাওয়া নহ, চোটটা এল দোকানের ঘড়ির থেকে। বেখলাম, দেখানকার প্রত্যেকটা ঘড়ি নিজের নিজের চালে চলছে। কারো একটা বেগেছে ত কেউ বাজিয়েছে আড়াইটা, কোথাও বা দশটা বেগে কুড়ি মিনিট। এমনি নানা ঘড়ির নানান বোলচাল।

ভাবলাম, ওমা, এই কিনা আবার ঘড়ির দোকান। এমনি দোকানে আমি ঘড়ি কিনতে এসেছি! এক ঘড়ির সঙ্গে আরেক ঘড়ির চাল চলনে দার মিল নেই দেখান থেকে চালু ঘড়ি কিনব। তাহলেই হয়েছে।

রহস্তটা কি? দোকানীকে জিজ্ঞেস করতে তিনি জানানেন, ঘড়িগুলো এখন সব নিজের তালে চলছে, কেউ কিনলে পরে তখন মিলিয়ে ঠিক করে দেয়া হবে; তারপর থেকে ঠিক ঠিক সময় বেবে সবাই। দিতে বাধ্য।

তুনে একটু আবস্ত হলাম। একটা দেহালঘড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম—ওটার দাম কত? ঐ ককটার?

আমার দরকার ছোট্ট একটা হাত-ঘড়ির—রিসটওয়াচের। কিন্তু বড়র থেকে দরদস্তর জ্বক করলে তবে আর ঠকতে হয় না। ছোটর দরের আঁচ পাওয়া যায়। তাই দেহাল ধরেই এগলাম।

'ওর দাম বেড়শ টাকা।' জানা গেল।

‘আর তার পাশের ঐ টাইম পিস্টির? অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের ঐ টে?’ বড়র থেকে মেজর বিকে আমার নজর।

‘দুশো টাকার বেশি নয়।’

‘ও বাবা! ওর দাম আরো বেশি? আর পাশের ঐ খুঁদে টাইমপিসটার?’

‘ওটারও খুব বেশি নয়। কলিটির তুলনায় দাম খুব কমই। আড়াই শো টাকার মধ্যে।’

‘বাবা, না, আমার টাইমপিস চাইনে। ও নিয়ে কি করব? গলায় বাঁধব না কি। আমাকে একটা রিস্টেণ্ডার দিন। আজকালকার ফ্যাশানের।’

তিনি একটা বড় সাইজের গোলাকার হাত-ঘড়ি আমাকে দেখালেন। চ্যাপটা, পাতলা, চকচকে।—‘এটা আপনার পছন্দ?’

‘হ্যাঁ, খুব। দাম কতো এটার?’ শুধালাম আমি।

‘দুশো পঁচাত্তর।’

‘বলেন কি। না মশাই, অতো বড়ো আমার চাইনে। বড় সাইজের বেশি দাম। আপনি আমাকে ওর চেয়ে ছোট সাইজের একটা দিন।’

দিলেন তিনি। কিন্তু তার দাম তিনশো পঞ্চাশ।

‘মানে, তিনশো টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা আপনি বলছেন?’ আমি জিজ্ঞাস্থ।

‘না মশাই, সাড়ে তিনশো টাকা ওর দাম।’

‘আরে সাবাস! এইটুকুন ঘড়ির দাম কিনা সাড়ে তিনশো। কী সর্বনাশ। ছোট সাইজের কম দামের ঘড়ি হয় না? যেমন এইটে——’

পছন্দসই একটা দেখালাম।

‘এটারও প্রায় ঐ দাম। তিনশো পঁচাত্তর। পঁচাত্তর নয় পয়সা নয়, টাকা।’

‘আর এইটে? ওর চেয়েও ছোটো এইটের?’

‘এটা মোটামুটি চারশো।’

‘কিন্তু এটা আরো ছোটো তো।’

‘হাক না। লেডিজ্ ওয়াচ বে।’

‘তাই বলুন। তা যেহেতু ঘড়ি নিয়ে আমি কি করব। আমার মনের মত হলেও আমার হাতে এটা স্বতন্ত্র থাকবে? আমার বোনের হাতে চলে যাবে। বেহাত হয়ে যাবে দেখতে না দেখতে।’

রায়ের মত আমারও প্রায় বনবাস। রায়কে অনেক নমননী পেরিয়ে বনে যেতে হবেছিল আর আমার ঘরেই বোন। তার খল্লর থেকে এ হাত-ঘড়ি বাঁচাতে পারব না। অন্তত আমি বস্ত্র হতে

পারি—আমার বাহাদুরি চলে, কিন্তু আমার বোনের কাছে আমি নগণ্য। বিনির সঙ্গে পায়ের জোরে আমি পারি না।

‘না। সেডিক্স ওয়াচ আমার চাইনে। আমাকে সত্তা দামের একটা আমপাড়া ঘড়ি দিন।’

‘আমপাড়া ঘড়ি। সে আবার কী মশাই?’ দোকানি ত হতবাক।

‘ছিল আমার একটা। আমার কবির এই ঘড়িটার আগে। বুক-পকেটে রাখা ঘড়ি। এখনকার ক্যানন নয় জানি, কিন্তু কি করব, সময় ত রাখতে হবে। আর সত্তার রাখতে হবে সময়। আমার সময় বহুমূল্য নয়।’

‘কিন্তু আমপাড়া ঘড়ি... আমপাড়া ঘড়ি... নামও ত শুনিনি আমরা...।’

‘বেশন সত্তা ভেমনি মজবুত ঘড়ি মশাই। আপনি গোড়ার বে বড় সাইজের গোলাকার ঘড়ি দেখালেন না? অত বড়ই গোল কিন্তু অমন চ্যাপটা নয়; পাতলা নয় অমন। বেশ ঘোঁটাসোটা ছটপুট ঘড়ি। সময়ও দেখা যায়, আবার দরকার হলে তাই ছুঁড়ে গাছের ডাল থেকে আম পেড়েও আনা বাবে আবার। ঘড়ি একটুও টস্কার না। চোট খায় না একটুও। আম পেড়ে মাটিতে নেমে এলেও একদম ভাঙে না, একটুও ক্ষতি হয় না ঘড়ির। বাজে ঘড়ি নয় মশাই, বেশ কাজের ঘড়ি।’

‘এখন সেদব ঘড়ি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ আমলে ছিল। এখন কোথায় পাব আমরা?’

‘সেদব ঘড়ি ছিল বিশ্বকর্মার তৈরি। এখনকার আপনাদের ঘড়ি ত একটুতেই বেচাল, বছরে বছরে তাকে তেল দাও, অরলিং করো। বাইরের আবহাওয়া পালটালো কি উনিও ওলটালেন—দুনিয়ার হালের সঙ্গে ঘড়ি-ঘড়ি নিয়ে চল বহলালেন—এসব কি ঘড়ি?’

‘কি করব, এই আমাদের আছে...’

‘আছে ত বলছেন, কিন্তু আছে কোথায়? কাঁঠাল পাছে। এত উচুতে, এমান সব দর বে ছুঁতেও ভয় করে। পাছে কাঁঠাল গৌকে তেল দেবাই সার। আহা, আমার সেই সাড়ে ছ-টাকা দামের আমপাড়া ঘড়ি দিবে অন্ততঃ সাড়ে ছ’শো আম পাড়ে গিয়েছে...’ ভাবতেই আমার জিতে হল এলো। একদিনের অন্তও একটুও খারাপ হয়নি ঘড়িটা। কে বে নিয়ে গেল সেটাকে। কোনো আম-ওয়ারাই কি না কে জানে।’ আমার চোখে হল এলো তারপর।

‘একি! বেশ আংটি তো—বেশি একবার। ঘড়ির দোকানে এই আংটি কেন? কত দাম এই আংটিটার?’

‘সেড হাজার।’ তিনি বললেন—‘আর এখো ছোট এইটার—এটার দাম আড়াই হাজার টাকা। এটা সেডিক্স কিনা।’

‘হীরের আংটি বুঝি? খুব দামী হীরে তো।’ বলতে হয় আমার।

‘হীরের নয়, ঘড়ির। আংটির মাথায় ছোট্ট এইটুকুন ঘড়ি বসানো আছে দেখতে পাচ্ছেন না?’

ওমা! তাই ত! ঘড়িই ত বটে! ওষুধের টেবলেটের মত, সেই আকারের একটা ঘড়ি—
পাথরের মতন আংটির মাথায় বসানো। লক্ষ্য করলে তার ভেতরেই ঘড়ীর আঁচড় ঘড়ির কাটা...
খুঁদে খুঁদে চেহারার দেখা যায় সব।

নাঃ, এবার এখান থেকে কাটতে হয়। এ দোকানের ঘড়ি টড়ির বা দাম তা আমার
কেনা-কাটার মধ্যে নয়। আমার নাগালের বাইরে সব। কিন্তু কি বলে কাটি? এতক্ষণ ধরে
এতগুলোর দাম-ম্বর করলাম, ড্রলোকের সময় নষ্ট করলাম এতক্ষণ, একেবারে কিছু না নিয়ে
চলে যেতে কেমন লাগছিল। কোথায় বেন বাধছিল আমার।

তাই একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে বললাম—‘আপনার দোকানের ঘড়িটড়ি সব দেখলাম। বড় রকম
থেকে ছোট টাইমপিস্ পৰ্বন্ত, ছোট বড় হাত-ঘড়ি কিছুই বাকী রইল না। আংটি ঘড়িও দেখা গেল,
জীবনে আমার এই প্রথম জ্ঞান হল বিস্তর। জানলাম যে ঘড়ির আকার যতই ছোট হবে দামও হবে
ততই বেশি। তাই...তাই আমি ভাবছি...না-ঘড়ির দাম কত হবে তাই—আমি ভাবছি।’

‘না-ঘড়ি? না-ঘড়ি আবার কি মশাই?’

‘মানে, একেবারে যদি কোন ঘড়ি না কিনি, কিছু না কিনেই আমি চলে যাই তাহলে আমাকে
কত দিয়ে যেতে হবে সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।’

‘মানে?’ ড্রলোক বেন একটু বিস্মিতই বোধ হল।

‘মানে, ঘড়ি যত ছোট হবে ততই তো তার দাম বেশি হবে, তাই ঘড়ি যদি একেবারে শূন্য হয়
তাহলে কত দিতে হয় তাই আমার জ্ঞাতব্য।’

‘ও তাই? না, তাহলে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। উলটে আমরাই আপনাকে কিছু দেব।’

‘তাই নাকি?’ এবার আমি অবাক।

‘হ্যাঁ। একটা আধুলি দেব আপনাকে।’ জানালেন ড্রলোক।

‘তাই নাকি? বাঃ বাঃ, তাহলে ত বেশ।’ গুনে আমি উল্লসিত হইঃ সে ত খুব ভালো
কথাই। আটআনা পরস পাওয়া গেলে একটা বোপলাই পরোটা আর এক কাপ চা খাওয়া যায় এখন।’

‘দিচ্ছি, এই যে, দয়া করে একটু পিছন কিয়ে দাঁড়ান।’

দাঁড়ালাম। দাঁড়াতেই পেছন থেকে কানে এল...‘আধুলি মানে একটি অর্ধচন্দ্র। আধুলিকে
সাদু ভাষায় ঐ তো বলে থাকে, তাই না?’ বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করে ড্রলোক
আমার বাড় ধরে পেছায় এক ধাক্কা মারেন। আর সেই ধাক্কাতেই আমি ঘড়ির দোকান থেকে
গড়িয়ে ফুটপাথে...ফুটপাথে এসে কাত!



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যখন লবাই জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গা, তোমার কোনও খবর দিয়ে গেল না পে? তখন গন্ডামনি চূপ করে নিজের দুঃখ নিজের মনেই চেপে রাখতো।

কাকে পে নিজের দুঃখের কথা বলবে?

কে বুঝবে তার দুঃখ?

গন্ডামনির নিজেরই মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করতো চৌকাঠে!

কী যে তার দুর্গতি হয়েছিল! কেন যে তার বাঘ দেখবার সব হয়েছিল! গন্ডামনি বলেছিল—আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে—

অনেক বলার পর শেষ পর্যন্ত বাজি হয়েছিল নিবারণ। দুটো ঘটিতে জল রাখা হয়েছিল। একটা ঘটির জল গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেই নিবারণ বাঘ হয়ে যাবে, আর তারপর অন্য ঘটির জলটা ছিটিয়ে দিলেই পে মানুষ হয়ে উঠবে। সব ব্যবস্থাই ঠিক করে রেখেছিল নিবারণ। কিছু গোলমাল হবার কথা নয়।

গন্ডামনি হস্তপড়া জলটা নিবারণের গায়ে ছিটিয়ে দিলেই হঠাৎ সেই ঘরের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা বাঘ গন্ডামনির চোখের সামনে গজিয়ে উঠলো। এককবারে আসল খাটি বাঘ। গায়ে জোরা-জোরা দাগ। লম্বা-লম্বা গাঁক। গোল-গোল ডাঁটার মত চোখ। লেজটা শাকিয়ে শাকিয়ে উঠছে পেছন দিকে। গন্ডামনির বুকটা ধরধর করে কাঁপতে লাগলো। মরে এমনও হয়। তবে তো নিবারণ মিথ্যে কথা বলেনি।

বাঘটা আঁতে আঁতে গন্ডামনির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ছোট ঘর। তাক পেই ছোট ঘরের কেতবেই একখানা বিরাট তক্তাপোষ। বাঘটা সামনে

এগিরে আসতে পক্ষামণি আরো ছ'শা পেছিয়ে গেল। কী যে নিবারণ বলেছিল, তাও তখন আর তার মনে নেই। মাথার মধ্যে সব গোলতাল পাকিয়ে গেল।

ওদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে তখন।

ভ্রামাণ্ড ঘূমোচ্ছিল তক্তপোষের উপর। তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে গিয়ে তক্তপোষের ওপর উঠে বসেছে। তারপর সামনে বাঘ বেখে হাউমাউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা'র কোলে। মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই পাটা লেগে গেছে ঘটির জলে, আর ঘটির জলটা সব মাটিতে পড়িয়ে পড়েছে। মাটির ওপর পড়তেই সব জল শুষে নিরেছে।

বাঘটা ঘেন সেটা দেখেই একেবারে আতঙ্কে উঠেছে—

পক্ষামণি টেঁচিয়ে উঠেছে—করলি কী খোকন, করলি কী ?

ওদিকে তখন ফৌদ-ফৌদ করে শব্দ করতে আরম্ভ করেছে নিবারণ। সেই ছোট বরখানার মধ্যেই ঘুরে-ঘুরে ল্যাঙ্গ নেড়ে ছুঁবে ঘেন কেটে যেতে চাইছে। কিছুতেই ঘেন আর তার সূক্তি নেই। নিবারণ একেবারে শব্দ হয়ে গিয়েছে। তার মাছব জন্ম কুরিয়ে গিয়েছে। এবার তাকে বাঘ হয়েছে কাটিয়ে দিতে হবে সারা জীবন। তার নিজের মস্ত পড়ে দেওয়া জল আর এক ফোটাও নেই। নতুন করে মস্ত পড়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই আর।

সেই মাঝ-রাতেই গরাণহাটির ছোট একটা ঘরের ভেতরে একটা চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। ঘনিয়ে এল পক্ষামণি, নিবারণ আর তার ছেলে ভ্রামাণ্ডের জীবনে। এমন সর্বনাশের কথা কেউ কল্পনাও করেনি। কেউ কল্পনা করবেও না। ভ্রামাণ্ড একবার উপর দিকে মুখটা তুলতেই আবার ডরে আর্তনাদ করলো।

পক্ষামণি বললে—ওগো, এখন আমি কী করবো, বলো ? বলে দাও ?

কিন্তু কে কথা বলবে ? কথা বলবার শক্তিই তো তার নেই। মস্তের অধীন তখন নিবারণ আবার নতুন করে মস্ত পড়ে দেবার ক্ষমতাও যে তার নেই।

কিন্তু হঠাৎ কী করে ঘেন বরখানার হড়কাটা খুলতে পেরেছে নিবারণ। বরখাটা ফাঁক হতেই নিবারণ এক লাফে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেছে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

পক্ষামণি সেই অন্ধকারের দিকেই বোঁড়ে গিয়েছিল।

ভ্রামাণ্ড তখনও তার কোলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

ধূ ধূ করছে অন্ধকার। জোনাকী পোকাগুলো পেয়ারা গাছটার ভালে ডালে চমকে-চমকে বোকাচ্ছে। তারপর মস্ত একটা শিটুনি গাছ। সেই শিটুনি-গাছটার তলা দিয়ে রাত্তা। রাত্তাটা

নিরুপ। বুকটা তখনও খড়াস-খড়াস করছে গঙ্গামণির। কোথায় গেল মানুষটা! কোথায় কোন্
পথ দিয়ে কোন্ দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল আর দেখা গেল না। একবারে শূন্য হয়ে গেল চারিদিক।

দেই থেকেই গঙ্গামণি গভীর হয়ে গেছে। কেউ কিছু বললেও যেন কানে যায় না তার।
গয়লা বউ এসে বলে—হ্যাঁ রে, তা কখন গেল জামাই তুই টেরই পেলি না কিছু?

গঙ্গামণি এর কী উত্তর দেবে? মনে হয় কপালটা চৌকাটে ঠুকে রক্ত বার করে ফেলে।
এর সঙ্গে কাকে দায়ী করবে সে?

গয়লা বউ সব দেখে শুনে আরো ধমকে দেয়।

বলে—তা ছেলেটা কী ঘোষ করলো তুমি? ছেলেটাকে বেশিদূর কেন? ছেলেটা যে না
খেঁদে মরে!

সত্যিই খোকনকেও কিছু বোঝাতে পারে না গঙ্গামণি: ও-ও কিছু জানতে পারলে না।
জানতে পারলে না কী সর্বনাশ হয়ে গেল তার।

বাড়ুন্ডে মশাই-এর কাছ থেকে মুকুন্দ আসে। নিবারণ কিরছে কিনা জিজ্ঞেস করে চলে
যায় আবার। কেউ কিছু সম্বন্ধ করে না, সবাই তাবে নিবারণ আবার হিমালয়ে লাধু হয়ে
গেছে। সে কি ঘরে থাকবার লোক! একবার যে ভগবানের দেখা পেরেছে, সে কি আর সংসারে
বাঁধা পড়তে পারে? তাকে হাজার ঘর লাগে, হাজার সংসার লাগে, সোনা বানা দিয়ে মুড়ে লাগে
তাকে, কিছুতেই আর সে পোষ মানবে না।

ওদিকে সবাই যখন বলে গরাণহাটিতে বাঘের আমহানী হয়েছে, তখন গঙ্গামণির বুকটা ছাৎ
করে ওঠে! এতদিন গরাণহাটিতে বাঘ ছিল না। হঠাৎ বাঘই বা এল কোথেকে? ও নিশ্চয়ই
নিবারণ!

নিবারণকে এসিকে সবাই খুঁজছে আর ওদিকে বাঘটাকে যেবে ফেলবারও যত্নলোব করছে।
গয়লা-বৌ খুব সাবধান করে বেশ গঙ্গামণিকে—মেথিল মেয়ে সত্যবেলা বোকনকে সাবধানে
রাখিস—গরাণহাটিতে তো কোনও কালে বাঘ ছিল না, কোন্ দিন এখানে এসে হাবির হবে—তা
সত্যিই অদ্ভুত বাঘটা।

যারা দেখেছে তারা বলে বাঘটি বড় অদ্ভুত। রাত-বিরেতে নাকি গরাণগটির আশেপাশে
ঘুরে বেড়ায়। ভয়ভর নেই তেমন। কথাই বলে বাঘের লেখা চোখের দেখা—

চোখের নজর পড়তে-না-পড়তেই বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ঘাড়ে। এইটেই
নিয়ম। চিরকাল সবাই শুনে এসেছে। এ বাঘটা সে জাতের নয়। কারো যদি নজরে পড়লো
তো চোখের পলকে কোথায় লুকিয়ে পড়ে। আর দেখা যায় না তাকে।

সেদিন গঙ্গামণি খাওয়া-দাওয়ার পর খিড়কীর দিকে আঁচাতে গেছে। হঠাৎ বশ্, বশ্, শব্দ হলো একটা। শুকনো বাঁশপাতার উপর হাটলে যেমন শব্দ হয় এও যেন তেমনি। বাড়ির পেছনে বড় বাঁশ বন। চাপ্, চাপ্, অন্ধকার।

হঠাৎ মনে হলো দুটো ভাঁটার মতন গোল গোল কী জলছে।

এখানে ভয় পেয়ে গিয়েছিল গঙ্গামণি। খিড়কীর দরজাটার হড়কো বন্ধ করে ঘরের ভেতরে পালিয়েই আসতো। কিন্তু কী যেন মনে হতেই পাড়িয়ে পড়লো সেখানে।

গঙ্গামণি পাড়িয়ে পাড়িয়ে দেখতে লাগলো—

গোল গোল ভাঁটা দুটো আন্তে আন্তে তার কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। একেবারে সামনে।

তবু গঙ্গামণি নড়ল না এতটুকু। এতটুকু তার ভয় হলো না।

আরো কাছে এসে নিবারণ।

একেবারে খিড়কীর দরজার সামনে।

গঙ্গামণি তখনও চুপ করে পাড়িয়ে।

বললে—তুমি এলে ?

কোনও উত্তর দিলে না নিবারণ। কথা বলবার ক্ষমতাই তার চুরি করে নিয়েছে গঙ্গামণি : নিজের অশ্রাব্যের বোকার নিষেধ চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—ওগো, আরি কী করবো বলো ? সব দোষ তো আমারই। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে। আমি কাকে দোষ দেব। কাউকে যে মুখ ফুটে বলতেও পারিনে আমার দুঃখের কথা ! তুমি বলে দাও আমি কী করবো ?

নিবারণ কিছু বললে না। শুধু চুপ করে পাড়িয়ে রইল।

—রাত্রে আমার ঘুম নেই। থোকাতে বুকে অড়িয়ে আমি শুয়ে পড়ে থাকি। আমার খাওয়ার রুচি নেই, আমার আর বাঁচতেও ইচ্ছে করে না—

নিবারণ চুপ করে একদৃষ্টে গঙ্গামণির দিকে দেখতে লাগলো। তার চোখ দুটোও চক্চক করছে।

গঙ্গামণির মনে হলো নিবারণ যেন কাঁদছে।

(ক্রমশঃ)



মেঠুড়ে

পরলোকে কাশু রায়

খাতার-কলমে নাম ছিল স্কে.এন.
রায়, কিন্তু দে-নামে মাঠে বা বাঙলার
খেলাধুলার জগতে তাঁকে খুব কম
লোকই চিনতেন। খেলাধুলার
জগতে তিনি কাশু রায় নামে পরিচিত
ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ.

এ. শিল্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল

মোহনবাগানের এগারোজন খেলোয়াড়দের ভেতর কাশু রায় ছিলেন একজন। শিল্ড কাইনালে
তিনি খেলেছিলেন রাইট আউটে। মোহনবাগান ক্লাব ছাড়াও কাশু রায় অনেক ক্রীড়া
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডেটারেন্স ফুটবল ক্লাবের শুরু থেকেই কয়েক বছর তিনি ছিলেন
তার সভাপতি।

অনেকদিন থেকেই শ্রীরায়ের স্বাস্থ্য ভালো বাড়ছিল না। ১৩ই সেপ্টেম্বর দকালে হঠাৎ
টালিগঞ্জের বাড়িতে হৃদরোগের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল
বাহাতর বছর। “মোচাক” স্বর্ণত রায়ের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

আই. এফ. এ. শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান

ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার শ্রেষ্ঠ আধার স্থম্পটভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এবার আই.
এফ. এ. শিল্ডের কাইনালে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণ ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত
হায়দরাবাদ একাদশ। আজ পর্যন্ত মোহনবাগান বোলবার শিল্ড কাইনালে উঠেছে ও ঘোলাবারের
ভেতর আটবার শিল্ড পেয়েছে। গৌরবের শেষ এখানেই নয়। চলতি মহম্মে মোহনবাগান
লীগ ও শিল্ড দুটোই জয়ী অধিকারী।

কাইনালের দিন মাঠে মোহনবাগানের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। দলের দলপতি চুনী
গোদারী অস্বিকৃতক্রমে মাঠে দলের নেতৃত্ব করেন, নিজে ভালো খেলেন এবং সহযোগীদের উৎসাহ
দেন। তাছাড়া স্টোপার জার্গাইল সিং, লেফট ব্যাক ফেন, রাইট হাফব্যাক বিহ্রাং মজুমদার, লেফট
হাফব্যাক কেম্পিরা, সেন্টার ফরোয়ার্ড মদল পুরকায়স্থ এবং লেফট আউট অরুময়ের নাম
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টপে জয়ী হয়ে মোহনবাগান ময়দান প্রান্ত রক্ষা করে বেগতে থাকে। ডেইস মিনিটের সময় কেম্পিয়া মঞ্চ পুরকায়স্থকে বল দিলে, তিনি ঐ পায়ের প্রচণ্ড ভলি সটে' প্রথম গোল করেন (১-০)। উন্নতিশ্রিত মিনিটে মোহনবাগানের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন অক্ষয়মল্লিক। বিরতির পর পেলা গুরু হলে জামরাজ মহম্মদ ইউসুফকে বল দেন। ইউসুফ মোহনবাগানের গোলের সামনে এগিয়ে গেলে রহমান তাঁকে চার্জ করেন—বলটি স্কয়ার না হওয়ার রহমান তা শেঠের উদ্দেশ্যে ব্যাক-পাল করেন। কিন্তু শেঠ নিজের জায়গা ছেড়ে বাইরে এসেছেন। এই অবস্থায় বল মোহনবাগানের জালে প্রবেশ করে (২-১)। ঠিক এর চার মিনিট পরে খো-ইন থেকে বল দিয়ে দীপু দাস সেন্টার করলে, মহম্মদ ইউসুফ 'হেড'-এর সাহায্যে বল সরাসরি গেলে পুরকায়স্থ অসাধারণ তৎপরতায় বল কেড়ে নিয়ে কোণাকুণি স্টিং-খেঁচা সটে মোহনবাগানের তৃতীয় গোল করেন (৩-১)। এরপর আর কোন পক্ষই নতুন করে গোল দিতে পারেন নি।

খেলা শেষ হতেই প্রিয় বলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা জানাতে হাভার হাভার অহুহাগী মাঠে নেমে পড়েন। আনন্দ-উজ্জ্বল ও কাদার-বস্তার আওড়ালে মাঠের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। আই. এফ. এ.-র সভাপতি ক্রীড়াত্মক বোধ অধিনায়ক চুনী গোশ্বামী হাতে বিন্দু তুলে দেন। মাঠে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে।

মরশুমের সেরা খেলোয়াড়

ভোটার্সেস ফুটবল ক্লাবের বিশেষত্ব করিটি ইন্টার্ন রেলওয়ে ক্লাবের গোলরক্ষক পি. বর্মণকে ১৯৬২ সালের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। পি. বর্মণ এবছর জাকার্তা ক্রীড়ার ভারতীয় ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেন। এর আগে ভোটার্সেস ক্লাবের পক্ষ থেকে নিবিল নন্দী, লালান, চুনী গোশ্বামী, রামবাহাদুর ও বলরামকে সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানে অভিনন্দিত করা হয়।

বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন সনি লিসটন

করেক দিন আগে সনি লিসটন বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন যুটীবোদ্ধার আখ্যা অর্জন করেছেন। ময়ড প্যাটারসনকে তিনি মাত্র দু'মিনিট ছ'সেকেন্ডের ভেতর প্রথম রাউন্ডে নক-আউট করে দেন। ময়ড প্যাটারসন কিছুটা ধীরস্থিরভাবে লড়াই পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু লিসটন দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিকল্পনা বানচাল করে দেন। লিসটনের ভানহাতের ঘূর্ণি

চোরালে পড়ার পর প্যাটারসন বেহের ভারসাম্য হারান, সেই-অবসরে লিসটন বাঁ হাতে চোম্বালের উপর দ্বিতীয় ঘূষি হাবার পর প্যাটারসন মাটিতে পড়ে যান।

এর আগে আরো দু'বার এইরকম অল্প সময়ের ভেতর চ্যাম্পিয়নশিপের ফয়দালা হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ডাবলিনে টমি বার্নস এক মিনিটআটান সেকেন্ডে জেন রককে এবং ১৯৫৮ সালে জো লুই হ'মিনিট চার সেকেন্ডে ম্যাকস শ্বেলিংকে নক-আউট করেছিলেন।

সনি লিসটন এ পর্যন্ত মোট পঁয়ত্রিশ বার মুষ্টিবৃদ্ধে অংশ গ্রহণ করে চৌত্রিশবার জয়লাভ করেছেন এবং প্যাটারসন চুয়ান্নশটি লড়াইয়ের ভেতর এই তৃতীয়বার পরাজয়-বরণে বাধ্য হলেন।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ভেতর সনি লিসটন আত্মত্বিতে বিশালতর। প্যাটারসনের অহুশাতে তাঁর দেহের ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বেশী। প্রতিযোগিতার শেষে প্যাটারসন বলেন : আমি আবার লড়তে চাই। হয়তো তিন মাসের মধ্যেই সে-লড়াই অহুস্তিত হতে পারে।

জাতীয় ফুটবল ক্রীড়া

ইশনেল অহুস্তিত জাতীয় ফুটবল ক্রীড়ায় (পরংকালীন অহুস্তান) সীতারে পশ্চিম বাংলার কিশোর এবং কিশোরী দু'বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। পশ্চিম বাংলার কিশোর দল পাঁচটি বিভাগেই এবং পশ্চিম বাংলার কিশোরী দল তিনটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে দখল করে ৪০ এবং ২৫ পয়েন্ট লাভ করেছে।

পশ্চিম বাংলা ফুটবল ফাইনালে মিসিপুরকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয়। শেষ পর্যায়ের খেলায় অরী হবার আগে পশ্চিম বাংলা মাদ্রাজকে ১০-০ এবং বিহারকে ৬-০ গোলে হারিয়ে দেয়।

নতুন বই

(সমালোচনার জন্য ছ'খানি বই পাঠাবেন)

মিষ্টি হাসির গল্প—ঐবিত্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ঐহুর্গাচরণ চক্রবর্তী কর্তৃক এম. চক্রবর্তী এও সল ২ বি, শ্রামাচরণ বে ট্রাট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১'৫০

কম নামে ছোটদের মুখে পুঁজোর সময় হাসি ছুটিয়ে তোলার জন্যে প্রবীণ সম্পাদক কয়েকটি নামকরা লেখক-লেখিকার হাসির গল্প একত্র করে এই সংকলনটি প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি গল্পই সচিত্র এবং প্রত্যেকটিতেই হাসির খোরাক আছে বোল-আনা। এতে আর নামে এমন একটি সংকলন হাতে পেয়ে ছোটদের মুখে খুঁই খুঁশি হবে। প্রচ্ছদপটটিতে ভীরা-সুন্দর, বড়চোঁদে। এতে লিখেছেন—সুখলতা রাও, শিবরাম চক্রবর্তী, অশ্বিনব্রহ্মা, শক্তিপদ বাজুওক, পতিতপাবন বন্দোপাধ্যায়, রামশর মুখোপাধ্যায়, পুষ্প বহু, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও আশা দেবী প্রভৃতি লেখক-লেখিকাগণ।

ভক্তের ভগবান—ঐদয়্যোগোপাল পাল। ঐবলরাম ধর্মগোপাল প্রকাশনী বিভাগ, বড়দহ, ২৫ পরগনা হইতে ত্রিযতীক্ রামাহুজ দাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১.২৫

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও উপনিষদ প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থাদিতে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মীলার কত যে কাহিনী আছে তা বলা যায় না। এই ছোট বইখানিতে গ্রন্থকার সেইরকম চৌদ্দটি কাহিনীর ভালি সাজিয়ে ধরেছেন। সহজ ও সরল ভাষায় লেখা সচিত্র গল্পগুলি ছোটদের স্নেহন তাল

লাগবে তেমনি তাদের মনকেও উন্নত চিন্তায় অগ্রপ্রাণিত করবে।

কান্না বেণুর গল্প—সতীকুমার নাগ। শরৎ সাহিত্য ভবন, ২৫ ভূপেন্দ্র বহু এভিনিউ, কলিকাতা ৪ হইতে ঐহুর্গাচরণ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১'৫০

পাঁচটি ছোট ছোট সুন্দর গল্পের সচিত্র বই। গল্পগুলির প্রত্যেকটি পড়েই ছেলেরা আনন্দ পাবে। লেখকের ভাষা সহজ এবং বাদ্যের মত লেখা তাদের মনহরণের উপযোগী। কভারের ছবিটি বিশেষ আকর্ষণীয়। নামও আকার এবং ছবি-ছাপার তুলনায় সস্তা।

সাত সমুদ্র—ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত। অন্নভী দেবী কর্তৃক ৪০ চিত্তব্রজ এভিনিউ, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২.৫০

শিশু সাহিত্যের অল্পতম স্থপরিচিতা লেখিকা ইন্দিরা দেবীর সম্পাদনায় প্রতি বছরের মত বর্তমান বছরেও পূজা-বারিকী 'সাত সমুদ্র' উদ্ভাসের কাগজে, ছবি-ছাপা ও লেখায় সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশের খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ করেছেন 'সাত সমুদ্র'কে। এমন একখানি পূজা-বারিকী হাতে পেয়ে সকলেই খুশি হবে। প্রচ্ছদপট থেকে এর সর্বাঙ্গই পরিষ্কার ও সুন্দর।

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

একটি লৌহমণ্ডের কাহিনী

সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি গ্রাম। গ্রাম না বলে তাকে শহর বলাও যেতে পারে, কেন না সমুদ্রের তীরে গল্পিয়ে উঠেছে ছোটখাট একটি হোটেল—স্থলও রয়েছে একটা। তাছাড়া খানা ও পোস্টাফিস তো আছেই।

দেই গ্রামটি সমুদ্রের তীরে থাকার জন্য এবং জিনিষপত্রের সস্তা দামের জন্যও সেখানে প্রায় প্রতি বৎসরই পুজো এবং বড় দিনের সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু কিছু লোক ভিড় করত।

একবার পুজোর সময় ওখানে বেড়াতে এলেন বিজন চ্যাটার্জী নামক কনৈক কেরানী সস্ত-প্রাপ্ত বোনাসের টাকা নিয়ে।

তিনি এসে উঠলেন দেই হোটেল। ভিড় এখানে বেশী হয়নি। ঘাইহোক বিজনবাবু হোটলে এসেই একটি ঘর ভাড়া করলেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, এই অন্ধ প্রথম দিনটার চারিদিকে না ঘুরেই বিজ্ঞানার এলিয়ে দিলেন নিজেকে।

আনালাব পাশেই তাঁর খাট এবং

জানালা দিয়ে শোনা যায় সমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনি। ঘরটি বিজনবাবুর পছন্দ হল খুবই। কিন্তু তাঁর খটকা লাগল ঘরের ছাতটা দেখে। তিনি দেখলেন ছাত থেকে তীক্ষ্ণগ্র বর্ষার মত একটি বিশাল লৌহমণ্ড বেরিয়ে রয়েছে এবং সেটার সঙ্গে নীচেকার খাটের ধেন একটা যোগও আছে। এর কারণ তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু কি আর করা যায় মনকে কোনো রকমে প্রবোধ দিয়ে তিনি পড়লেন ঘুমিয়ে।

সকালে উঠেই বিজনবাবু গিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ অদ্ভুত লৌহমণ্ডটা ছাতে থাকার কারণ কি? ম্যানেজার মানান রকম বাজে কৈফিয়ত দিয়ে প্রশ্নটাকে উড়িয়ে মিলেও বিজনবাবুর মনে একটা খটকা থেকেই গেল। কিন্তু তিনি আর এ নিয়ে বেশী কথা বললেন না।

বিকেলবেলা সমুদ্রের ধারে প্রচুর ষোলো হাওয়া খেয়ে বিজনবাবু ফিরে এলেন হোটেল। এসেই দেখেন হোটেলের বসবার ঘরে অনেকে বসে তাস খেলছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, শুধু তাস খেলা হচ্ছে না, খেলাটা হচ্ছে টাকা বাজী বেধে।

দেই খেলায় যোগদান করবার ইচ্ছে না থাকলেও তাঁকে খেলতে বসতেই হল খেলড়ুড়ের জাকাডাকিতে। প্রথমে তিনি সামান্য টাকা বাজী বেধে খেলতে লাগলেন। কিন্তু ধবন দ্রুততে শুক করলেন, তখন তিনি ঘর থেকে বেশী বেশী টাকা বের করতে

লাগলেন এবং প্রত্যেক বারেই ভিততে লাগলেন।

যেলা একসময় শেষ হুয়ে গেল। দেখা গেল, বিজ্ঞনবাবু কাছে নিজেই যত টাকা ছিল তার ঠিক ডবল টাকা তিনি পেয়ে গেছেন। অতঃপর সকল আহ্বাষিদের বিছানার গিরে শুয়ে পড়লেন।

বিজ্ঞনবাবুও টাকাগুলি বাগিসের তলার রেখে শুয়ে পড়লেন। শোবামাত্রই তাঁর মনে আবার সেই সৌহৃদ্যটার কথা জেগে উঠল। একে ঐ রকম বিতর্কিত্তিরি ভাবে মাথাব উপর একটা বর্শা ঝুলছে, তার উপর আবার বিশেষ অস্তগুলি টাকা পাওয়ার জন্য তিনি ভয়ানক দৃষ্টিভ্রম পড়লেন। ঘুম আর তার আসছিল না। শুভুও তিনি চোখ বুজে পড়ে রইলেন।

তখন বোধহয় অনেক রাত। বঠাং বিজ্ঞনবাবু মনে হল, কে যেন একটা লোক তাঁর বিছানার কাছে এসে একদৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে—তিনি ঘুমোচ্ছেন কিনা। একটু পরেই লোকটা চলে গেল। বিজ্ঞনবাবু ঘুমোনার ভান করে পড়ে রইলেন। কিছুকণ পরেই তিনি অসুস্থ করলেন, বিছানাহুড় তাঁর খাটটা ঘেঁষে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। বিজ্ঞনবাবু ভয়ে বিশ্বয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলেন। খাট

তখনও ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। তিনি আর কানবিলম্ব না করে খাট থেকে গড়িয়ে মাটিতে নেমে পড়লেন এবং একপাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন, খাটটা একেবারে উপরে উঠে ছাত্তর বর্শাটির সঙ্গে চেপে গিয়ে যিনিট খানেক শূন্যে রইল। তারপর আবার আস্তে আস্তে মাটিতে এসে নামল।

বিজ্ঞনবাবুর নিকটে সেই মুহূর্তে ঐ ভয়ংকর বর্শার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন তাঁর আর দাঁড়াবার সময় নেই। তিনি জানলা দিয়ে নীচে নেমেই মৌড়িতে মৌড়িতে থানার দিকে গেলেন।

থানা থেকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে হোটেলের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল।

বিচারে ম্যানেজার এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গের কঠোর সাফা তো হলই এবং হোটেল-টাও উত্তরে বেওয়া হল। শোনা গেল, এর আগেও ঐ হোটলে এসে অনেকে রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কিন্তু প্রমাণ অভাবে কিছু করা যায়নি। এতদিনে সেই ভয়ংকর ঘরের বিছানা এবং বর্শার রহস্য পরিষ্কার হল এবং ঐ বিপদও দূর হল।*

কুমারী তপনী ঘোষাল

* দ্বিসপ্তাহ পত্রের ছায়াবলধনে

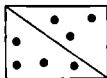


বাঙ্গালিকর

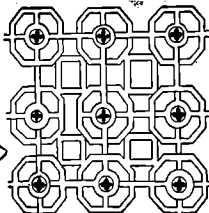
॥ পার্থক্য বিচার ॥

(১) নিচের ছবিটিতে পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের বৃত্ত ত্রিকূট প্রতীক আছে, এবং পাঁচটি কোই বিভিন্ন। প্রথমটি বর্গক্ষেত্র, দ্বিতীয়টি বৃত্ত, তৃতীয়টি ত্রিকূট প্রতীক। কিন্তু ছবিগুলির আকৃতির এই পার্থক্য থাক।

ছাড়াও আর একটি পার্থক্য আছে কোন একটি ছবিতে। কোন ছবিতে এই পার্থক্য এবং কি ধরনের পার্থক্য বলতে পার কিনা চেষ্টা করে দেখ।



॥ জুতো গোঁজার বোকা ॥



(২) পাশের ছবিটিতে একটি বিশেষ মেয়েকে মোটে ৮ ল ডে যে খতে পাচ্ছ। মেয়েটির একপায়ে জুতো নেই। তার হ'পাটি জুতোর এক পা টি সে কিছুতেই খুঁজে

পাচ্ছিল না। হঠাৎ তার নম্বর পড়ল সেটা পড়ে আছে ওরই সামনে ছককাটা বড় উঠানের ভাইয়ের উপর কোণে। কোন দিক দিয়ে গেল, কোন বাধা না পেয়ে জুতোটা তাড়াতাড়ি সে আনতে পারে বলতে পারো? কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে একে বাঁকটি নিয়ে বাঁক করে।



॥ জনবুলের প্রজাপতি ধরা ॥

(৩) বুড়ো জনবুলের প্রজাপতি ধরা একটা 'হবি'। নানা জায়গার জঙ্গলে নানা রঙের প্রজাপতি সে ধরে বেড়াইত।

সম্প্রতি সে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েছে প্রজাপতি ধরতে। একটি গাছের ডালে বিচিত্র রঙের একটি প্রজাপতি দেখতে পেয়ে জনবুল ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে প্রজাপতি পরীক্ষা করতে বাবে, এমন সময় একটি সিংহ গর্জন করে উঠল পাশ থেকে। সেই সঙ্গে বুড়োকে অস্ত্র দিয়ে হুক মিল একজন আফ্রিকান নিগ্রো। ছবিটির মধ্যে কোথায় ঐ নিগ্রো আর কোথায় ঐ সিংহ রয়েছে ভাল করে দেখে বার করো।

(১) নীচের ফাঁকগুলিতে এমন কতকগুলি শব্দ বসবে যা শরীরের কোন না কোন অংশ। শব্দগুলি কি কি হতে পারে চেষ্টা করে বসানো :—

নদী পার হ'তে—গোল অস্ত্রশর

নড়বড়ে অতি সী—পের ভর।

ভেলে—হেসে যার মাথা কুলাইয়া,

বলে আয়, মবে না—কুলাইয়া।

গভবানের ধাঁধার উত্তর

(১) বীড়ের সঙ্গে লড়াই করছে একটি বিদেশী মাল্লব। স্পেন ও যোমে এই ধরনের লড়াই বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে।

(২) ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ছ'মঘর ও আট মঘর ছবি ত'খানি (বা রাষ্ট্র-মার্ক টাকা) ঠিক এক রকম। সুতরাং ঐ দুটিই আসল—অপরগুলি জাল।

(৩) সবচেয়ে ছোটবাটি মাঝারি বাটির মধ্যে বেধে তারপর ঐ ছোট বড় বাটির মধ্যে ডুবিয়ে দিলে সব বাটিই ভলে কানায় কানায় পূর্ণ হবে।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ-১৩৬৯

[৮ম সংখ্যা

ভূগোলেন্ন প্রশ্ন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য



বৈচি থেকে এলো বোঁচা কোঁচা ছলিয়ে গায়ে
প্রিন্স কোট গায়ে তার, নাগরা জুতো পায়ে ।
রাঙা মামী কুটুছে মোচা, মাছ ভাজছে মাসী,
হাসি তখন বাজায় বসে তালপাতার বাঁশী ।

পড়ছে বোদে ভূগোল নিয়ে, দেখে শুধায় বোঁচা,
'বলতে পারিস্, ওরে মোটা, কোথায় আছে মোচা ?'
'রাঙা মামি কুটুছে ছাখ্—' বোদে তখন কয়,
বল্লে বোঁচা—'ওরে হাঁদোল, নয় রে ওটা নয়—'

গাড্‌ডু খাস বছর বছর, ভূগোল পড়িস্ ছাই,
পেটে বোমাও মারলে তোর অষ্টরস্তা নাই’—

অস্তুরেতে আঘাত পেয়ে ক্ষণেক চূপ্ করে
ভূগোল পানে বারেক চেয়ে বৌচার হাত ধ’রে
বল্লে বোদে—‘বল্‌তো তুই, কোথায় হটেনটট্’
মাথা ঘুরিয়ে বল্লে বৌচা—‘করিস্নে ফট্‌ফট্’
‘—ফট্‌ফটানি করছি আমি ?—দেখ্‌বি তবে মজা !
আজকে তোরে শেষ করবো খাইয়ে গয়ার গজা—’
ঘুনি উচিয়ে বল্লে বোদে, উঠলো বৌচা তেড়ে ।
গণগোলের স্রষ্টি হোলো ভূগোলখানা কেড়ে ।

জোর বক্সিং চল্‌তে থাকে আয়না ভেঙে পড়ে,
ভূমিকম্প হচ্ছে যেন টেবিল চেয়ার নড়ে ।
বল্লে বৌচা—‘চামড়া পিঠের করবো তুলে ঢোল—’
ঢাবল চুকে দেখ্‌তে পেলো বেজায় হট্টগোল ।

কান্না শুরু করলে খোকন, ভাঙলো খুকুর ঘুম,
কোনমতেই থামলো নাকো ঘুমোঘুমির ধুম ।
হৈহুয়ান বানরগুলো দোলায় গাছের ডাল,
ঝড়ের মুখে চল্‌তে যেন ছাত্তুকোটান তাল ।
রান্না ফেলে এলেন মাসী, ধমক দিলেন ক’সে,
মারের ভয়ে পালায় বৌচা, বোদে পড়লো বসে ।

লোভা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[হাটজাণার নিম্নাধ কলেজের প্রাক্তন দর্শনশাস্ত্র ডবলিউ. টার্নার সাহেব কবিতা সত্যকাহিনী অবলম্বনে নীচের গদ্যটি লিখিত ।]

এক

অনন্ত বেড়ি কর্তৃক ।

গোদাবরীর বক্সা তার ক্ষেত-খামারের সমস্ত শস্য ধ্বংস করেছে, তার দু'টো মহিষ ও চারটে গরু ডাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং তার চারটে ছাগল এখনো আছে বটে, কিন্তু বিপ-বিপটা ছাগলের কোনই পাক্তা পাওয়া যাচ্ছে না ।

উঁচু আঁহগায় ছিল ব'লে অনন্তের কুটীরখানা বন্ধা গেয়েছে, কিন্তু চতুর্দিক ঘিরে দুর্গম বস্তার কেন্দ্রায়িত অলরাশি তাওবে মেতে ছুটে চলেছে এবং তার মধ্যে সীতার কাটছে দলে দলে ক্ষুধাতুর কুমীর ।

বাড়ীর স্তম্ভে কর্দমাক্ত অমির উপরে ব'লে পড়ে অনন্ত কপালে করাঘাত ও হাহাকার করতে লাগল ।

লক্ষী তার বউ । সে এত বিপদেও মুবড়ে পড়েনি । লক্ষী এসে বললে, “হ্যাঁপা, ছেলেমাছবের মত কেঁপে কোন লাভ আছে কি ? কালো খামাও—আবার পায়ের ভয় দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর । আমার পায়ের রূপোর গহনাগুলো তো আছে, তাই বেচে অসংকতি পূরণ কর ।”

অনন্ত বললে, “তোমার মাথা খারাপ গিহি, তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ । তোমার খান কয়েক তুচ্ছ রূপোর গহনা বেচে যে টাকাগুলো উঠবে, তাতে আমার কতিপূরণ হওয়া অসম্ভব । তারপর তুমি কি স্বখোর মহাজন দুর্গাদাসের কথা জুলে গিয়েছ ? আগলের তো কথাই নেই, তার স্বপ্নও বাকি পড়েছে । সন্ত অহুসারে সে যদি এখন বাঁচি করে, আমার অমিয়মাও তার হাতে জুলে দিতে হবে । না গিহি, আমার আর বাঁচবার উপায় নেই—আমার সর্বনাশ হয়েছে ।”

লক্ষী বললে, “তুমি একবার ভাড়া মন্দিরের সাধুবাবার কাছে গিয়ে দেখ না, তিনি কি বলেন শুনে এস ।”

অনন্ত বললে, “এ সব ব্যাপারে তিনি কি বলতে পারেন ?”

লক্ষী বললে, “সাধুবাবার কথা শুনে আমাদের মরণাপন্ন খোকার জীবনরক্ষা হয়েছিল, তা কি তোমার মনে নেই ? এ ব্যাপারেও নিশ্চয়ই তিনি সংপরাশ্রম দিতে পারবেন । হাল ছেড়ে দিয়ে এমন করে ব'লে থেকো না—বাও সাধুবাবার কাছে ।”



‘এই লোটাটা তুমি লক্ষ্মীর হাতে দিও।’

সাধুবাবা নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি খবর অনন্ত ? বুঝছি, এবারে আর ছেলের অস্থব্র নয়—বানের জলে ভেসে তুমি এখানে এসে পড়েছ। তোমার সর্বনাশ হয়েছে, কেমন, এই তো ?”

অনন্ত অবাক। সাধুবাবা অন্তর্ধামী। সে আর বলবার কোন কথা খুঁজে পেল না। তার বা বলবার সে তো সাধুবাবা নিজেই বলে দিলেন।

সাধু বললেন, “যদি ভগবানের প্রীতি বিবাস থাকে তাহলে তোমার কোন ডাবনাই নেই। এইখানে একটু অপেক্ষা কর।” তিনি চালা ঘরে ঢুকে এককোণে ছড়ানো কতকগুলো টুকরো-টাকরা আঙুরোঙুরে গিনিসের ভিতর থেকে একটা কালিখুলিমাখা লোটা তুলে নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, “এই লোটাটা তুমি লক্ষ্মীর হাতে দিও। এখন এগিয়ে চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঝানিকটা বাব—আমার এক চালা গায়ের ভিতরে গিয়েছে, কিন্তু সে এখনো এল না কেন ?”

বেশ বড় আর ভারি লোটা। কিন্তু অনন্ত ভেবেই পেল না এই কালুচে-পড়া পুরোনো লোটাটা কি করে তার মুল্লি আসান করবে ?

ছুই

মাইল তিনেক দূরে সেই মাকাতার আয়লের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ভাস্করের হাতে গড়া খণ্ডবিখণ্ড দেবদেবীর মূর্তি—অথও অবস্থায় বাদে দেবদেবীর মূর্তি পরমহুন্দর।

সেই পোড়ো জঙ্গলাকীর্ণ দেবস্থানের এক-প্রান্তে ছোট একখানা চালাঘরের ভিতরে নিজের উপাস্ত দেবতার মূর্তি নিয়ে বাস করেন সাধুবাবা। সেখান থেকে বাকি সাধুবাবার বয়সের গাছপাথর নেই—মাথার ও দাড়ি-গোঁকের সব চুল সাদা ধবধব করেছে তুলোর মত। যুগচর্চাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে তিনি বসেছিলেন। এখনো বেশ শক্তসমর্থ।

অনন্ত মাটির উপরে লম্বা হয়ে পড়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

তিন

গাঁয়ের পথে ভারী গোলমাল। লোকজনের ভড়ি। অনেক পুলিশের জমাদার একটা গরুর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনে কাকুতিমিনতি করছে গাঁয়ের এক গরিব বাসিন্দা।

জমাদার চোপ বাড়িয়ে বললে, “এইবার নিয়ে তিনবার তোমার গরু বংশীলালের কললের ক্ষেতে চুবোছে, এবারে আমি আর ছাড়ব না, শুকে খোঁয়াড়ে নিয়ে যাবই। কিন্তু মনে রেখো, খোঁয়াড়ে নিয়ে গেলে তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা হবে। তবে ভালোয়-ভালোয় এখনি তুমি যদি আমাকে দুটো টাকা দাও তাহলে আর কোন গোলমালই হবে না।”

জনতার ভিতর থেকে এক ছোকরা বেরিয়ে এসে জমাদারকে বললে, “এই ডাকু! আমি স্বচক্ষে দেখেছি গরুটাকে তুমিই টেনে-হিঁচড়ে জোর ক’রে বংশীলালের ক্ষেতের ভিতরে নিয়ে গিয়েছ। এখন আবার গরীব-বেচারার কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের কিকিরে আছ?”

ছোকরার দিকে অসুনির্দেশ করে অনন্তকে ডেকে সাধু বললেন, “ঐ তো আমার চালা। দেখ, এখন ব্যাপার কি হয়?”

জমাদার ঝুপে উঠে বললে, “চোপরাও বদমাইল ছোকরা, আমাকে অপমান?” বলেই সে সাধুর চালাকে এত জোরে ধাক্কা মারলে যে, সে বেচারার ঘুরে সটান পপাত-ধরগীতলে এবং তার হাতের মাটির ভাড় ডেড়ে সব চুধ মাটির উপরে পড়ে এদিকে ওদিকে গড়িয়ে গেল।

সাধু চালায় দিকে তাকাতাড়ি এগিয়ে বাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কোথেকে জমাদার তাঁকেও মারলে সঙ্গেসঙ্গে এক ধাক্কা।

সাধুবাবার গায়ে হাত। সমস্ত জনতা কেপে মারমুখো হয়ে উঠল।

জমাদার তখন বৃহতে পারলে, কী অস্ত্রাঘ করেছে সে।

সাধু হাত তুলে জনতাকে সযোজন করে বললেন, “শান্ত হও বাছারা, শান্ত হও।”

তারপর জমাদারের দিকে ফিরে বললেন, “জমাদার, তুমি ধানার লোক ধানায় বাও—এখানে কারুর কাছ থেকে ঘুষ পাবে না। কিন্তু আজ তুমি যে অস্ত্রাঘটা করলে তার জন্তে শাস্তি পাবে অবিলম্বে—ষ্টিক লেনো, আমার কথা মিথ্যা হবে না।”

অভিশপ্ত জমাদার মুখ চুন করে ধানামুখো হল, অপরাধীর মত।

চার

লক্সী বললে, “মাগো, লোটাটা কী ভারী! ওর গায়ে কত ময়লা লেগেছে গো! বড়, আপে গটাকে মেলে আনি।”

অনন্ত মনে মনে বললে, “লক্ষী, বতই মাঝো আর ঘতই ঘষো, ও লোটা আমার দুঃখ দূর করতে পারবে না।”

দুর্ভাবনার অন্তরে তলিয়ে সে ভাবতে লাগল,—এখন হৃদযোঁর দুর্গাদাসের গল্প থেকে আমার জমিহীনতা বাঁচাই কেমন করে?

একটু পরেই লক্ষীর ডাক শুনে অনন্ত অন্ধরে ঢুকে দেখে, সে তেঁতুল, ছাঁই আর জাক্‌ড়া দিয়ে সেই লোটাটা মাড়ছে আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলছে, “ওগো দেব দেব, সাধুবাঘার দানের মহিমা দেব! এ লোটা কি দিয়ে গড়া এখন বুঝতে পারছ কি? জর হোক সাধুবাঘার, অর হোক!”

নিজের চোখকেই অনন্ত যেন বিশ্বাস করতে পারলে না—এ ঘে চক্‌চকে সোনার লোটা।

থেকে থেকে সে বললে, “এই ভারী লোটা সত্যিই যদি সোনার গড়া হয় তা’হলে অদৃষ্ট আমাদের কিরে বাবে।”

লক্ষী বললে, “লোটা নিয়ে এখনি বাজারে যাও, জেনে এস লোটোর দাম কত হবে।”

বলা বাহুল্য, অনন্ত তৎক্ষণাৎ লোটা নিয়ে স্বর্ণকার সোনারীলালের দোকানের দিকে দৌড় মারতে বিলম্ব করলে না। লোটা ওজন করে ও কট্টিপাথরে ক’বে সোনারীলাল বিম্বিত কণ্ঠে বললে, “ওহে অনন্ত, তুমি কি আজকাল চুরি-ডাকাতি করছ?”

অনন্ত বললে, “এ লোটা দান হিসাবে সংপথেই আমি পেয়েছি। এর কত দাম হতে পারে?”

সোনারীলাল বললে, “তিন হাজার টাকার বেশী তো কয় নয়। আমার এখন অত টাকা নেই, নইলে আমিই লোটাটা কিনে নিতুম।”

মহা-উৎসাহে অনন্ত বললে, “তা’হলে লোটাটা এখনি হৃদযোঁর দুর্গাদাসের কাছে বিক্রি করে দেনার দার থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু তুমিও আমার সঙ্গে এস, দুর্গাদাস আমার কথার বিশ্বাস করবে না। আমি তোমাকে দালালি দেব।”

পাঁচ

হৃদযোঁর মহাজন দুর্গাদাসের সঙ্গে কি পারবার জো আছে? অনেক প্রয়োত্তর, অনেক কথা-কাটাকাটি ও অনেক দর-কবাকবির পর অবশেষে সাব্যস্ত হল যে, দুর্গাদাস লোটাটা নিয়ে দেবে দুই হাজার ছয়শত টাকা।

অনন্ত বললে, “তুমি আমার কাছ থেকে পাবে দুই শো দশ টাকা। ঐ টাকাগুলো কেটে নিয়ে বাকি টাকা এগনি আমাকে ফিরিয়ে দাও।”

এই সব কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময়ে সেই ঘূষখোর জমাদারটাও সেখানে এসে হাজির হয়ে বললে, “যহাজন, আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন?”

দুর্গাদাস বললে, “জমাদারজী, আজ তিন দিন ধরে দেখছি, একটা দুশমন চেহারার লোক বোজ রাখে আমার বাড়ীর চারপাশে যোগাফেরা করে। তার মন্তলব নিশ্চয়ই ভালো নয়—হয়তো আমার বাড়ীর উপরে হানা দিতে চায়।”

জমাদার বললে, “হঁ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা আপনি এক কাজ করুন। আপনার দু’জন চাকরকে বোজ রাখে লাঠি নিয়ে পাহারার মোতায়েন রাখবেন। তারপর বা হর দেখা যাবে।”

বিদায় নেবার আগে জমাদার সেই সোনার লোটা দেখে ওঁতার ইতিহাসও শুনে গেল।

ছদ্ম

সেই রাতে বেশ খানিকটা সিঁড়ির সরষৎ গেছে জমাদার তার চারপাইয়ের উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর ঘুমোতে ঘুমোতে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখলে।

প্রথম দৃশ্য : সেই সমুজ্জল বাঁটি সোনার লোটা। তার গাছের উপর দিয়ে ঠিকবে পড়ছে বেন চাঁদের আলো।

দ্বিতীয় দৃশ্য : কাপড়ের ভিতরে কি যেন লুকিয়ে দুর্গাদাস সন্তর্পণে খিড়কীর জমির উপরে এসে দাঁড়াল। কাপড়ের ভিতর থেকে বার করলে সেই আলো-কন্ডমূল সোনার লোটা।

তৃতীয় দৃশ্য : একটা গাছের তলায় গিয়ে দুর্গাদাস মাটি খুঁড়ে সোনার লোটা পুঁতে রাখলে। অপ্রচোরেই জমাদার বললে, “দুর্গাদাসটা কি বোকা। চোর এলে আগে তো ঐ রকম সব জায়গাই খুঁজে দেখবে। হঁ, দুর্গাদাসকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।”

অপ্রচোরেই জমাদার বেন নিজেই চারপাই ছেড়ে উঠল। তারপর সে নিজেই দেখলে দুর্গাদাসের বাড়ীর পিছনে। তারপর পাঁচিল ভিত্তিতে লাফিয়ে পড়ল সে খিড়কীর জমির উপরে। তারপর সেই গাছের তলায়। তারপর—

দমাদম লাঠির চোটে জমাদারের ঘুমের ঘোর ছুটে গেল। সচমকে দেখলে, সে আর নিজের চারপাইয়ের উপরে গিয়ে নেই—উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুর্গাদাসের বাড়ীর পিছনকার জমির উপরে এবং দুর্গাদাসের দুই চাকর তার পিঠে লাঠি মারতে মারতে চীৎকার করছে—“চোর! চোর!...”

লঠন হাতে দুর্গাদাস ছুটে এল—তারপর এল এক চোকিদার। সারা পাড়ার ঘুম গেল ছুটে—চারিদিক লোকে-লোকায়ণ্য।

জমাদার বুকলে, সাধুবাবার অভিশাপের মহিমা।

দাঁড়ির ভুল

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মালতী মেয়েটি মিষ্টি ভারী
ঠাকুরদানার লেজটি খাড়া
খেকুরে কুকুর ঠুংরি গানে
বোসেনের ননী পেখম খুলে
বনের ময়ূর কোণের ঘরে
মাধু দাসী বসি' সিংহাসনে



সুপুরের রাজা ছপুর রাতে
হুতুম প্যাঁচাটা বোতাম ছিঁড়ে
শ্যামখুড়ো দিনে লুকিয়ে থাকে,
দুর্জন সিং চলেছে স্নানে
পটলী পিসীমা উঠিয়া খাটে
নেংটি ইঁহর খাঁড়ার ঘায়ে
কানাই কামার চরিছে মাঠে,
কাজলী গরুর বাবার মাসী
রস্তুা রায়ের লম্বা গলা

আধ হাত গৌক, এক হাত দাড়ি
ভিকিরী দেখলে করবে তাড়া
কালোয়াতে হার মানাতে জানে
মেঘ দেখে নাচে আপনা ভুলে
পান সেজে সেজে ডাবর ভরে
আদেশ জানান মস্ত্রিগণে



ব্যাঙ ধরে খায় খানাদোবাতে
চশমা হারাল মেলার ভিড়ে
রাতের প্রহরে শেয়াল ডাকে
ভাঙুর দেখিয়া ঘোমটা টানে
কাটুর-কুটুর বিছানা কাটে
মহিষের মাথা দেয় উড়িয়ে
সের-দুই ছুধ এক এক বাঁটে
গিয়েছেন কালী হয়ে উদাসী
ছাড়িয়ে উঠেছে এগারো তলা



শালগাছ ওই পুকুরঘাটে
 ক্যালা আর ভুলো সকালে ডুবে
 চাকা-পানা-চাঁদ ফুলিয়ে ছাতি
 ভাম-সর্দার—কলির ভাম
 ক্যাম্বেল হাঁস মোদের বাড়ী
 ফেৰ্পাঁড়ে জ্বলে অন্ধকারে
 জোনাকি মেয়েরা চরখা কাটে
 ভজু তাঁতি বাসা বাঁধিয়া গাছে
 টুনটুনি হাঁটে ছায়ে ভুঁড়ি,
 হারু শেঠ লেজে আগুন নিয়ে
 ধুমকেতু দিয়ে মস্ত কাঁকা
 দীহু ভট্‌চাক ভক্তি ভরে
 কালু মিঁয়া কাল একাদশীতে
 রাঙাদিদি পেলো যে-কোনো ছুতো
 রামের ভেড়াটা কাটিয়া মাথা
 গাঁদাগাছ নিজে দেখেছি চোখে
 কি হ'ল বলো তো? আরে ছ্যা, একি!
 কবিতা লিখিতে ভাবের ঘোরে।
 দাঁড়ি দিয়ে নিয়ো যথাস্থানে,

ঝালবড়া খেয়ে সাঁতার কাটে
 সন্ধ্যায় দেখি উঠেছে পুবে
 সিংহের পেটে মেরেছে লাখি
 মাসে গোটাকুড়ি পাড়িছে ডিম
 হরদম খায় গাঁজা ও তাড়ি
 হাজারে হাজারে ঝোপে ও কাড়ে
 কাপড় বুনিয়া পাঠায় হাটে
 ফুড়ুং ফুড়ুং উড়ে ও নাচে
 কতু বা হাঁকায় ল্যাঙো জুড়ি
 বিদ্বাৎবেগে আগুন এঁিয়ে
 বেবু ঠকায়ে কুড়ার টাকা
 দিনে পাঁচওয়ন্ত নমাজ পড়ে
 গঙ্গা নেয়েছে দারুণ শীতে
 শিং নেড়ে মারে পাঁজরে গুঁতো
 পুঁতিলে গজায় নৃতন পাতা
 লেখা প'ড়ে কেন হাসিছে লোকে?
 দাঁড়ি দিতে ভুলে গিয়েছি দেখি—
 পাঠক-পাঠিকা, ক্ষমিয়ে মোরে।
 সোজা হবে সব কথার মানে।

জালামুখীতে

শ্রীরামপদ যুগোপাধ্যায়

অমৃতসর থেকে পাঠানকোট মাত্র চার ঘণ্টার পথ। সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে চেপে রাত এগারোটার পৌছলাম পাঠানকোটে। ভারত-ভাগের আগে পাঠানকোটের গুরুত্ব খুব বেশী ছিল না—এখন এটা মস্ত বড় একটা জংশন স্টেশন হয়েছে।

এবারে আমাদের জালামুখী যাত্রা। রাত আড়াইটার ছোট গেলপথের গাড়ী ছাড়ে। রেলের কামরাঙলি খুবই ছোট ছোট—যেন খেলনা-গাড়ী। তা হোক, গাড়ীগুলি চলে মন্দ নয়। কাংড়া উপত্যকার পথটা তো সমতল নয়—আকাধাকা—উঁচু-নীচু; কখনো পাহাড়ের মাথায় উঠছে গাড়ী—কখনো দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে স্বল্পপথ দিয়ে চলছে—কখনো বা গভীর খাদের ধার ঘেঁষে ছুটছে। ভয় হয় নীচের দিকে চাইলে—একটু এদিক-ওদিক হয়ে গাড়ী যদি খাদের মধ্যে পড়ে যায়। আবার দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে সড়ক পুলটির উপর দিয়ে গাড়ী যখন চলছিল—তখন বা মনে হচ্ছিল। শুধু ভয় নয়, আনন্দ নয়, বিস্ময় নয়—সব মিলিয়ে চমৎকার একটা অবস্থা, যা বুঝিয়ে বলা যায় না।

সকাল সাতটার আমরা জালামুখী রোড স্টেশনে নামলাম। এখান থেকে জালামুখী মন্দির তেরো মাইল পথ। বাসে করে যেতে হবে।

পাহাড়ে জারগা বলে স্টেশনটা উঁচু-নীচু। স্টেশন ছাড়িয়ে আরও থানিকটা উপরে উঠে একটা চওড়া রাজপথ পাওয়া গেল। এই পথটা সোজা অমৃতসর থেকে আসছে—গেছে কাংড়া হয়ে কুলু উপত্যকার শেষ সীমানা পর্যন্ত। পাঠানকোট থেকে এটা দু'শো মাইলের মত দূর। এই পথেই আমাদের বাস আসবে।

পথের ধারে একটা ভাল মত চায়ের দোকান ছিল। সেটা হোটেলও বটে। অনেক সেখানে ভাত-ভাল-কুটি-পুরি খেয়ে নিচ্ছেন।

আগের দিন বিকেলে ঝড় আর শিলাবৃষ্টি এদিকে হবোছিল—কেননা জারগার জারগার দেবলাম, জল জমে রয়েছে—আর বেশ শীত-শীত করছে। ঘণ্টাব্যবসায় বাসে জালামুখীর বাস আসবে। আমরা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। পাহাড়ের চা-টা ভারী ভাল। চা আর দুধ আধাআধি—চিনিও বেশ থানিকটা থাকে। ঝাড়া চায়ের সমতলার তাঁরা বলবেন—ওটা আবার চা নাকি। আমাদের সঙ্গে বিশেষে এই রকমের একটি পুষ্টিকর খাদ্যই তো উপাদেয় লাগবে—কারণ আমরা চা খাই কখনো সখেনো।

চা খাওয়ার পর গাড়ী এলো। এদেশে বাসের একটা নিয়ম হচ্ছে, আগে টিকিট বেটে নিতে হয়। শুধু বসবার আসনগুলির অন্তর্গত টিকিট দেওয়া হয়—দাঁড়িয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই।

বাসের আসনগুলি দেখতে দেখতে ভরে গেল, তবু বেশ বানিকটী ঘেরি করে ছাড়ল গাড়ী।

এবার রেল লাইন ছাড়িয়ে আর একটা নতুন পথ ধরল গাড়ী। উঁচু-নীচু পাহাড়ের পথ। একটা ছোটমত গিরিবন্ধ পার হয়ে এসে বাস পড়ল সমতলভূমিতে। একেবারে আমাদের বাংলা-দেশের মাঠের মাঝখানে এসে গেলাম যেন। দু-ধারে অব্যবহৃত মাঠ—চাবারা হাল-বলদ নিয়ে মাঠে নেমেছে—পথের ধারে আম-জামের গাছ,—গাছে কোকিল আর ঘুঘুপাখি ডাকছে। আগের দিনে বৃষ্টি হয়ে বাওরাতে গাছের পাতাগুলি চকচকে সবুজ দেখাচ্ছে, আর পথের পাশে নদনজলিতে ঘল জমে রয়েছে। তবু এটা যে পুরোপুরি বাংলাদেশ নয় তা বোঝা যাচ্ছে যখন বা ধারের একটানা পাহাড়ের পাঁচিলটা চোখে পড়ছে, যখন ডান ধারের ডেউ খেলানো উঁচু-নীচু প্রান্তরটাকে দেখতে পাচ্ছি। আজ এই সকালে আকাশে মেঘ ছিল না—বোদটা ছিল নয়ম।

তেজো মাইল পথ এক ঘণ্টার বাবার কথা—কিন্তু পথের মাঝখানে আমাদের বাস বিকল হওয়াতে চার ঘণ্টা লাগল। জাগিয়াস্ আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা ছিল।

বাস ধামল প্রকাণ্ড একটা ধর্মশালার সামনে। ধর্মশালার সামনেটা দোকানপসার-হোটেল-রেইংয়েটে বেশ জমজমাট। একদিকে পাহাড়—নাম কালীঘর। ওই পাহাড়ের গায়ে বানিকটী উঠে গেলে আলামুখী মন্দির। অন্যদিকে নাথাল জমি—বাদ আর লতাগুলে ভরা বন ঘোপ—চাবের জমি।

এই ধর্মশালাটি আলামুখী শহরের সবচেয়ে বড় ইমারত বলে মনে হলো। দু'টি তলা মিলিয়ে অনেকগুলি ঘর। বৈদ্যুতিক আলো, ঘরের কল, সুশিক্ষিত স্ত্রীস্বামী ও শৌচাগার—একটি আধুনিক শহরের স্ব-স্ববিধার সব কিছু উপভোগ্যই রয়েছে এখানে। বাবাবের দোকান এবং হোটেল রেইংকেটেরও অভাব নেই। তবে আমিষ ভোজনের ব্যবস্থা নেই এইগুলিতে।

স্নান-আহার শেষে আমরা বানিকটী বিশ্রাম করে নিলাম। বৈকালে গেলাম মন্দির দেখতে। পাহাড়ে ওঠার পথ স্বক হইবে ধর্মশালার একটু আগে থেকে। দিবা পান্থর-বাধানো চওড়া পথ—পথের দু-ধারে ঘলের কল—বিদ্যুৎ আলো—দোকানপসার। আকাবাকা চড়াই পথ—সবটা পান্থর-বাধানো নয়—জারগাঘ জারগাঘ পান্থর ফেলা। সিঁড়ির মত—উঠতে কোন কষ্ট নেই। তিন ফার্লঙের মত পথ উঠে একটা পুল পাওয়া গেল। সেটা পেরিয়েই মন্দিরের প্রকাণ্ড সিংহরজা।

মন্দির অবশ্য বহুকালের পুরাতন—কিন্তু সেই পুরাতনের চিহ্ন আজ কোথাও দেখা যায় না। সিংহরজা থেকে ভিতরের পান্থর-বাধানো প্রাঙ্গণ—নাটমন্দির—মূল মন্দির—তার সামনে পান্থর-

বাদশা হকুম দিলেন, যে কুণ্ডে আগুন জ্বলছে—ওটা জল নিয়ে ভরিযে দাও—দেখি, তার পরেও কেমন জ্বলে আগুন।

বাদশার হকুমে কুণ্ডটা জ্বলে ভর্তি করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, আগুন তাতে নেড়েনি। আগেকার মতই জ্বলেছিল। দেবী-মাহাত্ম্যকে বীকার করে বাদশা দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন একটা সোনার ছাতা।

ছাতাটা বেশ বড় এবং ভারীও। সবটা সোনার কিনা বলা যায় না—সোনার রং আর কান্ডাকারী করা। আরও বহু মূল্যবান দ্রব্য দেবীকে উপহার দিয়েছেন অনেক রাজারাজড়, আর বণিক মহাজনেরা। সেইগুলিও ওই সোনার ছাতার সঙ্গে একটা ঘরে তুলে রাখা হয়েছে।

আরতির সময় পুরোহিত লাল কাপড় পরেন—গায়ে দেন লাল রঙের মেরজাই—কোমরে বাঁধেন লাল রঙের উত্তরীয়। গলায় আর বাহুগুলো থাকে রক্তাক্তের মালা—কপালে থাকে লাল চন্দনের ফোঁটা। এক হাতে ঘণ্টা, অল্প হাতে পঞ্চপ্রদীপ। আরতির তালে প্রবীণ আবর্তিত হয়, ঘণ্টা বাজে—মন্দির-দুহোরে ঢাক বাজে—কীসর বাজে। অনেকক্ষণ ধরে আরতি হয়। দেবদর্শনার্থীরা হাত ঝোড় করে বসে থাকে নাট-মন্দিরে। তখন মনে হয়—অনেক যুগ আগেকার একটি সম্ভ্রান্তকাল বেন কিরে এসেছে—আমরাও সেই আগেকার দিনের মন কিরে পেরেছি।

আরতির শেষে পুরোহিত মন্দির থেকে চলে যান—তখন জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব দর্শনার্থী মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন। তাঁরা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান—সব শিখাকে স্পর্শ করেন—আগুনের তাপ নেন সর্বাঙ্গে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। দেব-মহিমাকে আর একবার অহুভব করার স্বযোগ ঘটে।

একদিন পাণ্ডার কথামত দেবীকে প্যাড়া আর দুধভোগ দিতেছিলাম।

প্যাড়া বলেছিলেন, দেবীর মাহাত্ম্য লক্ষ্য করবেন। দেবী যদি প্রসাদ গ্রহণ করেন—ওই দুধের উপরে, প্যাড়ার উপরে আগুন জ্বলে উঠবে। দুধের ভাঁড়টা পাণ্ডা কুণ্ডের কাছে নিয়ে গেলেন—প্যাড়ার চৌকাটাও নিয়ে গেলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে সেবলাম—দুধের ভাঁড়ের উপরে, প্যাড়ার চৌকাটার উপরে, আগুন উঠে এসেছে! চৌকাটা না হয় পাণ্ডার ছিল—দুধ, মাটির ভাঁড় কিংবা প্যাড়া এগুলিতে তো দাহ্য পদার্থ ছিল না। আগুন উঠে এলো কেমন করে?

একি দেবী-মাহাত্ম্য, না পেট্রোল, গন্ধক আর অন্যান্য বনিজ পদার্থের কারসাজি?

লাগলো। দুটো পাহাড়ের মাঝে একটা সংকীর্ণ পথ ছিল, শেয়ালটা তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে অপর পারে গেল। বাঘটাও যেমন তার মধ্যে ঢুকল, অমনি আটকা পড়ে গেল। কিছুতেই আর বেরতে পারলে না। শেষে না খেতে পেয়ে সেইখানেই মরে রইল।

এদিকে শেয়াল বাঘের বাসায় এসে বাঘিনীকে বললে, রাজার দেপাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে রাজা বাঘকে গায়দে আটক করে রেখেছেন।

এই খবর শুনে বাঘিনী ও বাঘের ছেলেরা ভারী কান্দলে; না খেতে পেয়ে মারা বাঘে, এই ভয়ে তারা আরও আকুল হয়ে পড়লো। শেয়াল তাদের অভয় দিয়ে বললে যে, সে যতদিন সঙ্গে থাকবে, ততদিন তাদের কোন ভয় নেই। তারপর কথা ঠিক হ'ল, বাঘিনী ও তার বাচ্চারা বনের কত ভাড়িয়ে আনবে, আর শেয়াল তাদের শিকার করবে। প্রথমে শেয়াল ত'মহা আফালন করে নিলে যে, সে অনেক মস্ত ঘেঁরে ফেলবে। কিন্তু শিকারের সময় বধন তার পাশ দিয়ে একটা হরিণ পালিয়ে গেল, আর সে তার কিছুই করতে পারলে না, তখন সে ভারী লজ্জা পেল। নিজের অক্ষমতা চাকবার মত সে অস্থির ভান করে শুরু রইল।

বাঘিনী ও ছানারা কিরে এসে শেয়ালের অস্থির বেখে বড় দুঃখিত হ'ল। শিকার করতে পারেনি বলে তারা তাকে কিছু বললে না। পরদিন বাঘিনী একটা মস্ত হরিণ শিকার করলে। শেয়াল বললে, মাংস দেবতার কাছে উৎসর্গ না করে খাওয়া হবে না। তারা তাতেই রাজী হ'ল। বাঘেরা দূরে সরে গেল, শেয়াল পুজার ভান করে টুকরো টুকরো মাংসগুলো নিজে খেয়ে নিলে। তারপর তাদের ভেঁকে সব মাংস দিলে। তখন থেকে রোজ রোজ এইরকম হতে লাগলো, হুতরাং শেয়ালের আহ্বারের আর কোন কষ্টই রইল না।

মাহুষের পা যেন কঁকড়ার দাড়ি

নিউ ইয়র্কের পশ্চিম প্রান্তে এক জাতের আদিম আমেরিকানের বাস—তাদের হাতে-পায়ে আঙুল নেই—হাত-পা যেন কঁকড়ার দাড়ি! নিউ ইয়র্কের নৃত্যবিদ্ব অধ্যাপক চার্লস্ বার্গটিল লিখেছেন—সংবাদ পেয়ে এক জাতের মাহুষ দেখতে গিয়েছিলুম। ১৮৪ জন স্ত্রী-পুরুষকে দেখি—তাদের হাত-পা কঁকড়ার দাড়ার মতো। এরা হলো অস্পৃক্ত জাত—যেমন নেশাখোর তেমনি দুর্বৃত্ত, দুচ্চরিত্র। এদের হাত-পায়ে গড়ন এমন হলো কেন, পণ্ডিতরা তা বলতে পারেন না।

রাজির বন্দী

শ্রীকুলরাণী ৩৬

মেজমামা এসেছেন মেজদির বাড়ী। মেজদির বাড়ী মেজমামার বড় খাতির। ভায়ে-ভাগ্নীরা ছোট বড় সকলেই মেজমামার বড় প্রিয়। মেজদির বাড়ী বৃহৎ, ছোট বড় ছেলেমেয়েতে ভরপুর।

সন্ধ্যার পর ছানের উপরে সবাই বসেছে মেজমামাকে ঘিরে। ছোট পল্টু বলছে, একটা গল্প বলো মামা, একটা ডিটেক্টিভ গল্প।

হুমকি ওরফে নন্দু বলে উঠল, 'বা বলবে মামা, সত্যি ঘটনা বলবে কিন্তু।'

মেজমামা খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আজ্ঞা, দাঁড়াও বলছি একটি সত্যি ঘটনাই।' বলে শুরু করলেন : 'ঘটনাটি ঘটেছিল ফরাসীদেশের সমুদ্রোপকূলের একটি ছোট্ট সহরে। বাকি নিয়ে গল্প তার নাম মনে করো রবার্ট—খুব নামজাদা ডিটেক্টিভ। রবার্টের বাড়ী সমুদ্রোপকূলের কাছেই।'

নন্দু বলে উঠলো, 'মামা, তুমি কি করে জানলে এ ঘটনা; কার কাছে শুনেছো?'

হুমিত্রা বললে, 'চুপ কর না নন্দু, আগে মামাকে গল্পটা বলতেই দে না।' বত বাজে বকবক করা।' হুমিত্রা সকলের বড়।

জটু হুমিত্রার পরে। সে বললে, 'ঠিক বলেছিলাম দিদি, নন্দুর বাজে বাজে বকবকানি বন্ধ করতে না পারলে গল্প শোনার আমেজই নষ্ট হয়ে যাবে।'

দাবা-বিবির কথাই নন্দুর ত'মুখ ভার। একটু বেশী কথা বলে দাবা-বিবির কাছে বকুনি খাওয়া তার একটা প্রাণের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু মেজমামার সামনে বকুনি দেওয়া। নন্দু চুপ করে রইলো।

মেজমামার চোখে পড়েছে, তাঁর ভাগ্নীর পোমড়া মুখ। তিনি বললেন, 'আহা মা, রাগতে আছে কি?—হ্যাঁ, আমারই তুল হয়েছে, আমি শুনি নি কারও কাছে, গল্পটি আমি কাগজে পড়েছি।' মেজমামা একটা ইংরেজী কাগজের নাম করলেন।

হুমিত্রা অর্থাৎ মিতু বললে, 'গল্পটা আগে চালিয়ে বাও, তারপর ও সব বোলো।'

'হ্যাঁ, শোনো।' মেজমামা আবার বলতে শুরু করলেন।

'একদিন সকাল বেলা সমুদ্রের ধারে একটা বৃত্ত দেহ পাওয়া গেল। সমুদ্রের পারে বলাতে গোলমাল কোরো না। ঐ যে সহরের কথা বললাম, তারই সমুদ্রের পারে। দাবা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই প্রথম এটা চোখে পড়েছে। প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি, এটা

খুন বলে। শরীরের কোথাও কোন অস্ত্রাবাতের চিহ্ন নেই। আর লোকটিও কিছু উদ্ভয়ের নয়, ছেঁড়া জামা-কাপড় আর মুখের চেহারাও কোন আভিজাত্যের ছাপ নেই। কিসের লোভে লোকে একে খুন করবে? হতভম্ব পাওয়া গেলেই পুলিশে খবর দায়, পুলিশের লোকের কিন্তু সন্দেহ হ'ল, কোনও অস্ত্রাবাত নেই সত্য, কিন্তু বোধ হয় গলা টিপে ঘেরে ফেলা হয়েছে। একটা লোক মরেছে, —তদন্ত আরম্ভ হয়ে গেল। তদন্তের ভার পড়ল ডিটেক্টিভ রবার্টের উপর। রবার্টের উপর সকলেরই বিশ্বাস আছে। রবার্ট এ পর্যন্ত প্রতিটি খুনেরই কিনারা করতে পেরেছেন।

'রবার্টের সম্পর্কে একটু বলতে হচ্ছে। রবার্ট এ লাইনে আসে দ্বন্দ্ব কর্মচারী হয়ে—বস্ত্রিকের পাটুনির জন্য তার যথেষ্ট পদোন্নতি হয়েছে। মস্তিকের পাটুনি বলছি এই জন্য, ডিটেক্টিভের বৃত্তিই আসল, আর বৃত্তিও মস্তিকেরই সম্পদ। রবার্ট খুব পরিশ্রমী। কোনও তদন্তের ভার পড়লে রবার্ট কখনও চুপ করে বসে থাকেন না, মাথা বাট্টিয়ে তাকে বের করবেনই; ফলে রাত্রির অনেকটা সময় চিন্তা করে তাকে কাটিয়ে দিতে হয়।'

এবার মজুত মন্তব্য করলে, 'চিন্তা ত রাত্রি বেলাই ভাল হয়।'

হুজিরা অর্থাৎ চিত্ত বললে, 'দাদা, এ তোমার পড়ার চিন্তা নয়, এ অন্য চিন্তা।'

মজুমদার বললেন, 'হ্যাঁ, চিত্ত ঠিকই বলেছে—রবার্টের চিন্তা অন্য রকমের। কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ Boss-এর খুশি করতেও রবার্টকে রাত্রি আগতে হ'ত।'

'হ্যাঁ, এর মধ্যে আবার 'বন্দ' এসে কি করে?'

'মিতু, শোনোই না, এ ব্যাপার তুমিই বুঝবে ভাল, তুমি মনোবিজ্ঞানের হ'ত।'

মিতু সাইকোলজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে—আর ক'মাস বাদে তার পরীক্ষা।

'বন্দ্য সব জায়গায়ই চায়, চট্ট করে কাজটা দেবে ফেলু'। বন্দ্য চাইত প্রতিদিনই রবার্ট একটা চমকপ্রদ রিপোর্ট দেবে কতটা কাজ এগিয়েছে। কিন্তু রবার্টের নিয়ম ছিল অন্য রকম। সে ডাবড বেগী। প্রথম প্রথম এফটু অস্বিধায় পড়তে হয়েছিল রবার্টকে। কর্তৃপক্ষের মনোমত রিপোর্ট সে নিতে পারত না, চিন্তা করে গ্রহণ না ছাড়ান পর্যন্ত। কর্তৃপক্ষ মনে করত, রবার্টের কাজ এগোচ্ছে না, কৈফিয়ত তলব করত। কর্তৃপক্ষকে খুশি করতে গিয়ে রবার্ট তার কাজের সব কিছু চেপে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে রিপোর্ট দিত, আর বাকী সময়টুকু চিন্তা করে কাটিয়ে দিত। ফল হয়েছিল, রবার্টের বিশ্বাসের সময় ছিল খুব কম, রাত্রি বেলাও তার ঘুমোবার সময় প্রায় ছিল না; বহু রাত্রি কেটে যেত, মোটে ঘুমোতই না। শরীর গেল খারাপ হয়ে। রাত্রিবেলা ঘুমোলেও ভাল ঘুম হ'ত না, টেটিয়ে উঠত, খেন সেই কোন কিছু কাণ্ড করেছে। এ-ত অল্প কথা। মাঝাক ব্যাপার ঘটল পরে।'

‘রবার্টের উপর তার পড়েছে এই তদন্তের। রবার্ট গিয়েছে দেখতে। মৃতদেহ দেখেছে, চার-দিকের ছবি তুলে নিয়েছে, শোশাক ইত্যাদি সব কিছুর ছবি, মৃতদেহ বেখানে পড়েছিল, সে ভাঙাটোর ছবি—কোথাও কোন চিহ্ন পাচ্ছে না।

অফিসে বসে ছবি দেখছে আর ভাবছে। রবার্ট বেশী চিন্তা করত বলেছি ত,। হঠাৎ একদিন রবার্টের নিজের মুখই কেমন হয়ে গেল। ঠিক অপরাধীর মত মুখ। বরময় পারচারী করছে—এদিকে অফিসের অস্ত্র সবাই তার দিকে চেয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা স্থির সংকল্প নিয়ে রবার্ট এসে বসল। ফোনটা তুলে ধরে বললে, ‘আমি রবার্ট বলছি; এদিকে আপনারা চলে আসুন—তদন্ত শেষ হবে এসেছে।’

রবার্টের ‘বদ’ এসে পড়েছে। রবার্ট ছবিটি তুলে দেখাল, ‘এখানে একটু অস্পষ্ট পদচিহ্ন দেখছেন, ম্যাগনিকা ইং গ্লাস দিয়েও তাকে দেখাল। একটা পারের ছবি—তার বুড়ো আঙুল নেই।’ রবার্ট তার নিজের পারের মোড়া গুলে দেখাল, ‘এই আমার পা, খুন্দী আমি নিষেই; আর কেউ নয়!’...রবার্টের একটা পারের বুড়ো আঙুল ছিল না। খুন্দাও হয়েছে রবার্টের বাড়ীর কাছেই।... যৎসূক সব স্তম্ভিত। রবার্টকে গ্রেপ্তার করা হ’ল।

রবার্টের বিচার। প্রকাশ পেল রবার্ট খুন্দী ঠিকই; লোকটিকে খুন করার ওর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, লোকটিকে ও কোন কালে দেখে নি, জানে না, উপরন্তু খুন করা ওর স্বভাবও নয়। খুন করেছে স্বজ্ঞানে নয়, অজ্ঞানে...ঘুমের মধ্যে। অতিরিক্ত ষাটুনি আর ঘুমের অভাব রবার্টের মনের উপর অসুত এক প্রতিক্রিয়া করেছিল—তারই চরম পরিণতি হ’ল এই হত্যাগাণ্ড। ফেলের বন্দী থাকার কালেও দেখা যাক্সিল রাত্রি বেলার রবার্ট আর দিনের বেলার রবার্ট ভিন্ন প্রকৃতির—রাত্রি বেলা একটা খুনের তৃষ্ণা তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। দিনের বেলার খুব বাতাবিক বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পরিভ্রমী রবার্ট রাত্রিবেলা অবাভাবিক ক্রুর প্রকৃতির হয়ে যায়।’

মিহু বাদে সবাই বললে, ‘ওমা, সে আবার কি!’

মিহু পঙ্খীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘কোটের কি সিদ্ধান্ত হ’ল?’

‘কোটের রায় বেরিয়ে গেল...তারার বিজ্ঞানীদের এনে হাজির করেছেন। রবার্ট স্বজ্ঞানে খুন করেনি ব’লে, তার কোনও শাস্তি হ’ল না। তবে ইয়া, অপ্রকৃতিস্থতার জন্ত পাচ্ছে সে সমাজের ন্যতি করে, তাই তাকে বলা হ’ল রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। আর রবার্টও তাই করত। দিনের বেলা তদন্ত করে বেড়াও আর রাত্রিটা থানায় এসে কাটিয়ে দিত।’

সাইকোলজির ছাত্রীরা উৎসাহ আরও বেড়ে গেল—‘কেন রবার্ট এ রকম করত? কি বললে বিজ্ঞানীরা?’ জিজ্ঞাসা করলে মিহু।

‘বলছি শোন। তাঁরা সবাই বললেন, সমস্তটা সময় রবার্ট খুনের চিন্তা করত, আর তাকে বানিয়ে বানিয়ে রিপোর্ট লিখতে হ’ত; কোনও বিশ্রাম করত না। কলে রবার্ট অজ্ঞাতে নিষেধে খুনীর সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিল। এর কিছু আগেই রবার্ট গলা টিপে মারা এক খুনের সমাধান করেছিল; সংগোলভ অভিজ্ঞতা তার মনকে অস্ত্র বকম করে দিবেছিল, দিনের বেলা মাহুৎ স্বজ্ঞান অবস্থায় থাকে, আমাদের মনের কু-ভাব স্বজ্ঞান অবস্থায় চাপা থাকে; রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে চাপা-পড়া সব ভাব জেগে ওঠে। ভাল ঘুম হ’ত না বলে, অস্ত্রের কু-ভাব তার মনের ওপর চাপত, তাই সে খুনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে খুন করার সুযোগ খুঁজত। আর তার জন্তই এ খুন সে করে বসেছিল।’

মেজদি পাশে বসেছিলেন, তিনি বললেন, ‘ও মা, সে কি কাণ্ড!’

‘তারপর আর একটু শোনো দিদি। রবার্টের জীবনের বাকী অধ্যায়টুকু। সেদিন কাগজে বেরিয়েছে—রবার্ট মারা গেছে একাশী বছর বয়সে। এমন দিনের বেলায় ডিটেক্টিভ রবার্ট আর রাত্রিবেলায় বন্দী রবার্ট।’

‘এও ত’ এক অভিশপ্ত জীবন, মামা?’

মেজদি বললেন, ‘অভিশপ্ত বলতে। ডিটেক্টিভ হলে কি হবে, সারাজীবন রাত্রির বন্দী। কি সাংঘাতিক!’

‘আর কিন্তু আমাদের মা, বেশী রাত জেগে পড়তে বলবে না।’ ছেলেমেয়েরা মেজদির নিকে চাইল।*

* দিনেই কাহিনীর ভাব অফলনে।

শালিক গো

ত্রিনের্মলেম্বু গৌতম

মাঠের মাঝে জল জমেছে
এক পশ্চাৎ বৃষ্টিতে :
ছ’টো শালিক স্নান করছে
দেখছি অবাক দৃষ্টিতে !
শালিক শালিক শালিক গো :
আকাশখানার মালিক গো ;
ভাগ্যেতে জল জমেছিলো
আজকে হঠাৎ বৃষ্টিতে !

খয়ের ডানা ঝটপটিয়ে
লেজ নাচিয়ে একটানা—
জলটি যেন বিশাল নদী
এমনি দেখাস্ ভাবখানা !
শালিক শালিক শালিক গো :
সেই নদীটির মালিক গো ;
শুনতে আমার ইচ্ছে করে
একটুখানি গান গা’ না !!

ছোট-কা

ত্রিনিউলি গুণ্ড

আষাঢ় মাসের হুপুর। বাইরে কড়া রোদ, গরম হাওয়ার ঘোরাঘুরো মাঝে মাঝে ঝড়ের উল্লাহ ধুলোর কড়। দরজা-জানালা বন্ধ করে মার পাশে শুয়েছিলাম চুপচাপ—ঘুম আসছিল না কিছুতেই। এপাশ-ওপাশ করছিলাম, আর কি যেদব আবেল-তাবেল চিন্তা করছিলাম। কিন্তু সে চিন্তার বাক্য পড়ল। সদর দরজার কড়াটা উঠল সঙ্গেসঙ্গে নড়ে। উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম রতন গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে চাতালের এক কোণে মাদুর পেতে নিশ্চিন্তে দিবানিত্রা দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিলাম। সামনে দেখি এক অচেনা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, একমুখ দাড়ি, মাথায় একরাশ কৃষ্ণ চুল—মুখটা হোদে বে পুড়ে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, ভদ্রলোকের হাতে কোলান একটা হুটকেন্স।

জিজ্ঞেস করলাম,—কাকে চাই?

কিন্তু আশ্চর্য। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুই বিহু না? মস্ত বড় হয়ে গেছিস্ বে রে।—কি রে, আমায় চিনতে পারলি নে?

আমি কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে। তারপর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম—আরে ছোটকাকা?

ছোটকাকার হাতটা চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। বাড়ী ফাটিয়ে ঢাংকার করলাম, মা, দেখ কে এসেছে?

সিঁড়ি দিয়ে ঠেঠার সময় দেখলাম রতনের দিবানিত্রার আমরা যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটবেছি। সে লাল করমচা'র মত চোখ বার করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম, কি রে হাদা, ক্যালক্যাল করে দেখছিস্ কি? দরজাটা বন্ধ করে দে—ছোটকাকাকে চিনতে পারছিস্ না?

—‘আজ্ঞে,’ বলেই সঙ্গে সঙ্গে চাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল রতন। হাত কচলাতে-কচলাতে এক গাল হেঁদে ফেললে। বললে, তিনব কি করে? ছোট দাদাবাবু বাড়ী ছেড়ে পাগিয়েছিল সেই কবে—তখন তুমি তো গোকাবাবু এতটুহন। আর আজ বোধহয় আধ-কুড়িটাক বছর পরে ফিরে এলে। তা; বাই বল ছোট দাদাবাবু তোমার বং কিন্তুক গো টকটকে হয়েছে।

আমি আর ছোট-কা ততক্ষণে সিঁড়ির মাথায়। সামনেই দেখি মা দাঁড়িয়ে। ছোট-কাকে এই অশ্রমের এই ভাবে দেখে তিনিও বেশ অবাক হয়ে গেছেন—আর অবাক আমি নিজে কি কম

হয়েছি নাকি? যে ছেলেটা পরীক্ষায় কেল করে মাত্র-ধোর খাবার ভরে বাড়ীঘুরে হুয়নি—কোন খবর দেয়নি—এমন কি একটা চিঠিপত্র নর, সে-ই যদি দশ বছর পরে ফিরে আসে অবস্থাটা তখন বেশ গুরুতর হয়ে ওঠে বই কি।

মাকে টিপ করে প্রণাম করলে ছোট-কা। হুটকেনটা মাটিতে রাখলে। বললে হেসে, খুব আশ্চর্য হচ্ছ না বৌদি।

আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। তারপর মা খেমে বললেন,—একটা চিঠি-পত্র তো দিতে পারতে—আমরা ভেবেছিলাম—

—বুঝি মরে-টরে গেছি। মাকে ধামিয়ে দিয়ে বললে ছোট-কা। তা'হলে আজ আমার দেপে নিশ্চয়ই ভূত বলে ঠাউরেছিলে না বৌদি?

—ঘাট...ঘাট...ও কথা বলতে আছে? তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।—মা অগ্ৰবোগ করলেন। তারপর উৎকর্ষার সঙ্গে বললেন, কেমন ছিলে ঠাকুরপো? কোথায় ছিলে? আসছই বা কোথা থেকে?

—দাঁড়াও বৌদি, দাঁড়াও—একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও। হুটকেনের ওপর বেশ জুত করে বসলো ছোট-কা। তোমার হাজারটা প্রশ্নের ধাক্কার আমি একবারে বেসামাল হয়ে পড়েছি। তুমি বরং একে একে প্রশ্ন কর—আমি উত্তর দিই। তারপর কি হে বিহু, পাখাটা নিয়ে এস তো বাবা।—আমার দিকে চেয়ে হাসলেন ছোট-কা।

মা বাধা দিলেন। হাত-পাখা আবার কি হবে? ঘরে চল—ঘরে তো পাখাই রয়েছে।

—বেশ চল। উঠল ছোট-কা। চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, বাড়ীর ভোল দেখছি পাল্টে গেছে—বুঝলে বৌদি কলকাতার বাতাবাট দেখে আমার কেমন তাক লেগে গিয়েছিল—

ঘরে ঢুকেই মেঝেতে চিপ্পাতে হয়ে শুয়ে পড়ল ছোট কা। আমি হুইট চিপে পাখার স্পীড্‌টা দিলাম বাড়িরে। বিরাট এক হাই তুলে ছোট-কা বললে,—জান বৌদি। আজ এক নাগাড়ে ক'দিন থেকে বালি দেখছি কল...কল...আর কল...

—কল?—বিস্মিত হলেন মা।

—মানে তো সহজ বৌদি—সাহায্যে চড়ে আসছিলাম তোমাদের এখানে—

—কোথা থেকে আসছিলে ছোট-কা?—কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাস করলাম আমি।

—জাপান থেকে। জাপানেই তো কাটালাম এই দশটা বছর।

—জাপানে? সে কি ঠাকুরপো।

—অত ধাবড়াবার কিছু নেই বৌদি—স্বচ্ছন্দে হাসলেন ছোট-কা। তারপর উঠে বসলেন।—

যাই বল বোদি, ফুল যদি দেখতে চাও—চলে যাও জাপানে। অমন সুন্দর ফুল আর সেই ফুল সাজাবার অপূর্ণ কাঁচকাহন আমি আর কোথাও দেখিনি—ওরা গাছকে যে কি যত্ন করে।

আমি বললাম,—তাই জন্ত জাপানকে 'ল্যাণ্ড অব্‌ ফ্লাওয়ারস' বলে।

ছোট-কা মাথা দোলান। বলেন,—ঠিক বলেছি—কিন্তু থাকে পে ও কথা—যা বলছিলাম বোদি। প্রথম তো খেলাম হোকাইডোতে—জাংগাটা জাপানের উত্তরে—বীশের মত—অবস্ত্র জাপান তো অনেকগুলো বীশ নিয়ে গড়ে উঠেছে, তা হোকাইডোতে ছিলাম বেশী। পাহাড়ে জাংগা—প্রচুর বনভঙ্গল, যানে আমি বোঝাতে চাইছি অজস্র গাছপালা। সেই সব গাছপালা কেটে তো ফানিচার তৈরী হ'ত, আর সেই সব ফানিচার ঠিক জাংগায় চালান বাচ্ছে কিনা, সেটা লক্ষ্য করা আর দেখাশোনা করা ছিল আমার কাজ। কিন্তু তারপরে বুকে বোদি শীতকালে যা ঠাণ্ডা—ওরে বাপ্। ছোটো শীত কাটিয়ে ভাবলাম আর নয়—পালাই বাবা কোলকাতা। এমন সময় দেখা হ'ল এক জাপানী ভ্রমালোকের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি আমার সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওসাকায়। ভ্রমালোক সেখানে এক তুলোর কারখানার মালিক—সেই কারখানার কাজে অনেক চুকিয়ে দিলেন।—খামলেন ছোট-কা।

—তারপর ?—মা জিজ্ঞেস করলেন আগ্রহের সঙ্গে।

—তারপর আর কি। বছর-টাক হ'ল সেই ভ্রমালোক মারা গেছেন। নতুন মালিকের সঙ্গে বন্দোবাস—চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।

—তা তুমি তো এবানেই থাকবে ঠাকুরপো।

—নিশ্চয়ই—অবিশ্রুতি তুমি যদি তাড়িয়ে না দাও।—মিটিমিটি হাসল ছোট-কা।

মুখে থাকব বললেও দু'মাস পরে ছোট-কা আবার নিরুদ্দেশ হ'ল। কাউকে না বলে, কোন চিঠি না লিখে ছোট-কা আবার চলে গেল। যা অনর্থক চেঁচামেচি করতে লাগলেন, রতনকে ধমক দিলেন, ঠাকুরপো কবে থেকে বলছে তার সার্টটা সাবান দিয়ে কেচে দিতে—তা মিলেই হ'ত—আজ নয়, কাল নয়—করবার দরকার ছিল না তো। যা এমন ভাবে বললেন কথাগুলো, যেন সার্ট কেচে না দেওয়ার ভেত্রেই ছোট-কা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। তারপর মা আমার নিয়ে পড়লেন—বিহু, ঠাকুরপোকে লেখে তোর পড়ার খুম দেখি বেড়ে উঠেছিল—দেদিন তাকে যখন এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলল, তুই বললি তোর অঙ্ক আছে—তা অঙ্কগুলো পরে করলে কি চলত না ? বাবাকে সামনে দেখে বললেন, তোমার হাজার দিন বলেছি ঠাকুরপো বড় মাছ খেতে ভালোবাসে, তুমি যেন পাঁজা দিয়ে এক দিন ওজ্জের কুঁচো ট্যাংকা, চিংড়ি, চুনোপুঁটি মাছ আনতে আরম্ভ করেছিলে। বাবা বিপদ

বুকে সরে পড়লেন। নেতা সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছিল, তাকেও মা রেহাই দিলেন না—তোকে আমি বলেছি, ছপুরবেলা বাসনগুলো অত ঘোরে ঘনঘন করে মাজবি না—ঠাকুরপোর ঘুম বড় পাতলা।

আমি মাকে বললাম, সেদিন ছোট-কা বখন গল্পের বই পড়ছিলেন—তাড়া দিয়ে তুমিই চান করতে পাঠালে—তখন।

মা ধামিয়ে দিলেন আমার। বললেন, চুপ কর বিহু। আমি বা কবিতা ভালোর মজাই কবি।—গটগট করে পা ফেলে মা সেখান থেকে চলে গেলেন। হুলাম ছোট-কার এই অবস্থায় চলে যাওয়ায় মা বড় বেশী আঘাত পেয়েছেন।

কিন্তু সাত দিন পরে সকালবেলায় সুনলাম ছোট-কার চিঠি এসেছে—বতন খবর দিলে আমার। আমি দৌড়লাম বাবার ঘরে—দেখি মা চিঠি পড়ছেন। বাবা সুনছেন মন দিয়ে। চিঠির মাজখানটা বোধহয় পড়া হচ্ছিল। মা পড়ছিলেন, এখন আমি আরও সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে জেসে চলেছি বৌদি—সুনছি একটু পরে আমাদের জাহাজ লোহিত সাগরে ঢুকবে—সেকথা এখন থাক। তারপর তোমরা নিশ্চয়ই আমার এই হঠাৎ চলে আসা দেখে অবাক হয়ে গেছ। তোমরা আমাকে ছাড়বে না বলেই তোমাদের না-বলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তোমাদের আদর-বড় আমি কোনদিন ভুলব না বৌদি। একে তো ছোটবেলা থেকে আদেসী ছিলাম—তারপর ক'বছর কাজকর্ম করে ধাতটা বদলে গিয়েছিল—কিন্তু এই দু'মাস তোমাদের আদর পেয়ে কি ঝুঁড়ে বে হয়েছি তা ভাবতে পারবে না। সেই ভয়ে তো আমার বেরোলাম বাড়ী ছেড়ে—আর তাছাড়া বন্ধ ঘর আমার ভাল লাগে না বৌদি—তাই আমার পাড়ি জমিয়েছি অজানা সমুদ্রে। আর একটা কথা, আপন থেকে কিংবার সময় বিহুর মজ কতকগুলো খেলনা এনেছিলাম—সেগুলো আমার সেই স্কটকেপে রেখে এসেছি। ডেবেছিলাম বিহু সেই ছোট্টই আছে—কিন্তু অত বড় হয়ে গেছ ভাবতেই পারি নি, তাই লজ্জার আর বিহুকে সেগুলো দিতে পারিনি তখন। বিহুর ছেলে হলে আমার নাম করে ওগুলো তাকে দিও বৌদি। তুমি আর দাদা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। বিহুকে ভালো-বাসা জানিও। ইতি—

বেহের ঠাকুরপো।

মা পড়া ধামিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরে। দেখলাম, আমগাছের ডালে একটা ছোট্ট শালিক পাখী ক্রমাগত উড়ছে আর বসছে। কেন জানি না আমার মনে হ'ল ছোট-কাও যেন এক পাখী—দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারেন না কোথাও—ওই ডালে-ডালে উড়ে বেড়ান—পাখীটার মত কেবল ঘুরে বেড়ান দেশ হতে দেশান্তরে—সমুদ্র থেকে সমুদ্রে—

পণ্ডিতদের লাহুনা

শ্রীজয়দেব রায়

পণ্ডিত মনীষীরা চিরকালই সত্যের জন্তে অশেষ লাহুনা দিয়ে গিয়েছেন। কতবার যে তাঁদের দাঙরোনে পড়তে হয়েছে, আত্মীয়-স্বজন বিমূৰ হয়েছেন, লোকের ঠাট্টাবিজ্ঞপের পাজ হতে হয়েছে, তবু তাঁরা সত্য ও সত্যের পপ পরিত্যাগ করেন নি। শেষ পর্যন্ত লাহুনাই তাঁদের ললাটে জয়টিকা এঁকে দিয়ে গিয়েছে।

এই শ্রেণীর তিনজন লাহিত পণ্ডিতের কথা বলা হচ্ছে—

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহাপণ্ডিত ছিলেন রোজার বেকন। অল্পকোণ্ডে যখন তিনি পড়তেন, তখনই তাঁর নাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন ভাষায় ছিল তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ—গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবী সব ভাষাতেই ছিল তাঁর অসীম জ্ঞান।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য দান আছে। গান পাইডার বা বাক্স তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসও তাঁরই আবিষ্কার। এই গ্লাস থেকেই তিনি তৈরী করলেন চশমা। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় বিজ্ঞানেই ছিল তাঁর দমন অধিকার।

শেষে তিনি একটি কাঁচা কাজ করে ফেললেন, একখানি গ্রন্থ লিখে তাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন যে, মানুষ এরদিন প্রকৃতিকে ভয় করবে।

সেদিনকার খুঁটান জগতের একচ্ছত্র প্রতাপ ছিল পোপের। বেবনের এই দুগান্তবাহী উক্তি শুনে পোপ তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। তাঁর আবিষ্কারকে বলা হ'ল ম্যাগ্নিফাইড।

দশ বৎসর পরে তাঁকে যখন ছেড়ে দেওয়া হ'ল, বুদ্ধ বেকন তখনও সত্য প্রচার করে চলেছেন। ভূবিজ্ঞান নানা তথ্যাদি নিয়ে তিনি এই দশ বৎসর ধরে চিন্তা করেছেন—কড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারের ভৌগোলিক কারণ তিনি বিশ্লেষণ করে প্রচার করলেন।

আবার তাঁকে বন্দী করা হ'ল।

নিকোলাস কোপারনিকাস ছিলেন পোল্যান্ডের এক বৈজ্ঞানিক, যোগে তিনি পড়াশোনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণা জগতে আলোড়ন এনেছিল। রাতদিন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকতেন।

না খুঁটিয়ে সারারাত ধরে চাঁদ ও তারাদের গতিপথ লক্ষ্য করতেন। লোকের তাঁর চালচলন দেখে তাঁকে পাগল বলে মনে করত।

তিনি প্রচার করলেন যে, পৃথিবী ও অন্তর গ্রহেরা স্বর্ষের চারপাশে ঘোরে। সমস্ত সভ্যজগৎ এতদিন বিশ্বাস করত যে স্বর্ষই বৃষ্টি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে—তার কথা শুনে সবাই খাশা হয়ে উঠল। লোকে তাঁকে দেখলে ঢিল ছুঁড়ত, তাদের অন্যাচারের ভয়ে তিনি সব সময়ে লুকিয়ে থাকতেন। তাঁর গ্রন্থাদি ধর্মের বিপক্ষে লেখা বলে বাজেদাশু পর্বস্ত ক'রে ফেলা হ'ল।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্ববর হলেন গ্যালিলিও আর নিউটন। কোপার্নিকাসের মত প্রচার করতে গিয়ে গ্যালিলিও-র লাহনা ভক হ'ল। তাঁকে বন্দী করা হ'ল, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল যে, তাঁকে মত বদল করতে হবে, নচেৎ তাঁর নিষ্ঠার নেই। তবু তিনি অটল ছিলেন।

গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন টেলিস্কোপ—দূরের ভিনিস কাছে দেখায়। তার এই টেলিস্কোপ ভেঙে ফেলা হ'ল, তাঁকে শত্রুতানের চর বলে প্রচার করা হ'ল।

শেষ পর্বস্ত লাহিত ও দুর্গত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লোকে চিম্টি কাটে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণা ঘোষ

লোকে চিম্টি কাটে কেন ?

কিল লাখি চড় ধাকা মারা—

উচিয়ে তোলা চাশা মারা

গুল্ বেওয়া আর ধাশা মারা

ছেড়ে, লোকে চিম্টি কাটে কেন ?

আমার এই ধারালো নোকে

চিম্টি খেলে ভিরমী বাবে—

হাঁ ক'রে মূখ বিষম খাবে

আর কেবলি দেখতে পাবে

হলধে ছোট শর্বে ফুলই চোখে।

ছোট চিম্টি খেলে পরে—

নাম-করা সব পালোচানেরা

হিজি-বিজী বিলেত ফেঁগা

ভীষণরকম এই চেহারা

সবাই—উন্টে ছোট্ট ঘরে।

ও ভাই চিম্টি খেয়ো নাকো।

চলবে বখন রাস্তা দিয়ে

শিক-ডাঙা সেই ছাত্তার নিয়ে

বোকান দেবে দাঁড়িয়ে গিয়ে

হঠাৎ বেন চিম্টি খেয়ো নাকো।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এমনি শুধু একদিন নয়। প্রায় প্রত্যেক দিন। কেউ জানতে পারে না। কেউ বুঝতেও পারে না। কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

সবাই সাবধান করে দিচ্ছে বাঘ গলায়গিকে।

বলে—খুব সাবধানে থাকবে বাজা—

কেউ বলে—তোমার ছেলেকে চোখে-চোখে রাখবে মা, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—

কিন্তু কোনও কথাই উত্তর দেয় না গলায়গি। শুধু সবলের কথা শোনে আর চূপ করে থাকে। সারাদিন সাংসারের রান্না-বাছা দেখে, এটা-ওটা কাজ করে, কিন্তু কোথায় ঘেন মনটা পড়ে থাকে। গরলা-বউ আসে, কথা বলে। কিন্তু বানিক পরে বলে—কী হলো রে বউ? কী হলো তোরা?

তারপরে নিজের মনেই কারগটা অহুমান করে নেয়। বলে—আহা, তা তো হবেই, আমাই ঘরে না থাকলে মনটা তো ছ-ছ করবেই—

তারপর নিজেই স্ত্রীমাপদকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। ছেলটাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দুধ খেতে দে। স্ত্রীমাপদ বড় হয়েছে। তবু বোকবার ব্যেস হয়নি তার। কোথায় কেমন করে যে কতিটা হয়ে গেল তা সে বুঝতে পারে না। শুধু ভিজ্জেন ববে—বাবা কোথায় গেল?

গরলা-বউ বলে—বাবা কাজে গেছে—

—কোথায় কাজে গেছে ?

গয়লা:-বউ ভোলাবার অন্তে বলে—মুর্শিদাবাদে গেছে—

—সে কোথায় ?

এমনি অনেক মিথ্যে-কথা, অনেক স্তোক-বাক্য বলে তুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে গয়লা-বউ।

পাড়ার বউ ক্লিরা বলে—এমন সোনার চাঁদ ফেলে রেখে মাহুঘটা চলে গেল কী করে গা ?

এরকম ব্যাপার এমন কিছু নতুন নয়। সাধু হয়ে যাওয়ার ঘটনাও এমন কিছু হঠাৎ নয়। এ-নব হঠাৎই ঘটে। কারোর ঠাকুরা, কারো বাপ, কারো কাকা এমনি করে চলে গিয়েছে একদিন। তারপর আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি কখনও। বাঙলা দেশ। এ-দেশের হাওরায় সাধু হওয়ার নেশা মেশানো থাকে। কেউ কেউ বাড়িতে থেকেই সরিসী হয়ে যায়। কেউ আবার বিবাসী হয়ে যায়। আবার তারপর একদিন দেখা যায় নৌকো বোতাই করে জিনিষ-পত্র এনে হাজির হয়েছে। কোথায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড়লোক হবার পর দেশের কথা মনে পড়েছে, তখন ঘিরে এসে আবার শুঁড়িয়ে সংসার করছে।

এ-সব কথা লোকে জানে। তারা বলে—নিবারণ যাবে কোথায় আবার আসবে—

গয়লা-বউ বলে—তোমরা তাই বলো মা, তোমাদের মুখে ফুল-চন্দ্র পড়ুক—আমাই যেন আবার ফিরে আসে, যেঘেটার প্রাণ ঠাণ্ডা হোক—

গঙ্গামণির কানে সব কথা যায়। সব কথাই সে চূপ করে শোনে। কিন্তু কোনও কথাই উত্তর দেয় না। যখন সবাই খেয়ে নেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন স্ত্রীমাগণও ঘুমে অচেতন তখন আন্তে আন্তে বিড়কীর দরজাটা খুলে চারদিকে একবার চেয়ে বেখে। তারপর দরজার পাল্লা ছুটো ডেকিধে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাইরে তখন খাঁ খাঁ করছে অন্ধকার। একটা মাদার গাছ। পাতার পাতায় জোনাকির আলো টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে নিভছে। সেই দিকে খানিক চেয়ে নিড়ে পা ছুটো বাড়ায়। তার ওধারেই বাঁশ বন। মাঝে দু'একটা লম্বা আম গাছ। শুকনো পাতার ওপর পা পড়তেই কেমন বশ্ পশ্ শব্দ হয় একটু। কিন্তু একটু সাবধান হয়ে চললে শব্দটা আর হয় না। তারপর সেই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেই খানিক পরে ওধার থেকে আর একটা শব্দ কানে আসে। আর খানিক পরেই দেখা যায় ছুটো ভাঁটার মত চোখ জ্বলছে। চোখ দু'টো সামনে এগিয়ে আসে। গঙ্গামণিও দু'পা এগিয়ে যায়। তারপর একবারে মুখোমুখি। কারোর মুখেই কোনও কথা বোঝায় না।

গঙ্গামণির চোখ বেগে ঝর-ঝর করে জল পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে বলে—তুমি আর এসো না—

নিবারণের চোখ দিয়ে চল পড়ে কি না তা আর দেখা যায় না। একটা কেমন অকৃত শব্দ যেন তার গল থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি আর কিছু করবার নেই তার।

গঙ্গামণি বলে—খোকা ভালো আছে, তোমার কিছু ভাবনা নেই—

নিবারণের মুখটা আরও কাছে সরে আসে। সারা গায়ে তার বন-জমলের গন্ধ। গঙ্গামণি নিবারণের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় আন্তে আন্তে। নিবারণের ল্যাজটা ফুলে-ফুলে পাক যায়। গঙ্গামণি বলে—কিছু ভয় নেই তোমার, আমাদের কোনও কষ্ট নেই গো—

নিবারণ উটার মত চোখ দুটো তুলে গঙ্গামণির দিকে তাকায়।

গঙ্গামণি বেন এই ক'দিনেই বোবা নিবারণের ডাঘাটা বুকে ফেলেছে।

বলে—তোমার কষ্ট হয় বুঝতে পারি, কেন তুমি আসো? যদি কেউ ধরতে পারে তোমাকে তখন কী সন্ধানোশ হবে বলো তো?

তারপর আবার বলে—আমি কাউকে বলিনি তোমার কথা—তুমি এবার থেকে চলে বাও আমাদের কপালে বা আছে তাই হবে, আমার কপালে সুখ নেই তো তুমি কী করবে? তোমার তো কোনও দোষ নেই—আমিই তো মরতে তোমাকে বাধ হতে বলেছিলুম—

কথাগুলো বলতে বলতে গঙ্গামণির আর বেন কোনও ভয়-ভাবনা থাকে না। যেন হয় সে বেন মাতৃস্ব নিবারণের সঙ্গেই কথা বলছে। সেই আসে যেমন ছিল তেমনি। তারপর তেমনি করেই দু'জনে কথা বলে। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টের পাওয়া যায় না। হঠাৎ আশে পাশে কোথার কেউ ডেকে ওঠে। কেউ—কেউ—কেউ—

একটু চকল হয়ে ওঠে নিবারণ। গঙ্গামণিও ভয় পেয়ে যায়।

গঙ্গামণি বলে—তুমি এবার বাও—

নিবারণের বেতে ইচ্ছে হয় না। তবু আন্তে আন্তে পিছু হাটে। তারপর বেন কেউএর ডাকটা আরো কাছাকাছি এসে পৌছোয় তখন আর থাকতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে গা ঢাকা দেয়। আর তাকে দেখতে পার না গঙ্গামণি।

সেদিন গরাণহাটির ঝাড়ুচ্ছে মশাইএর বৈঠকধানার কথাটা উঠলো। ঝাড়ুচ্ছে মশাই বহুদিন ছিলেন না। মূর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন তবির-উদারকে। জীবন চৌধুরীকে এক করার কাজ তখনও শেষ হয়নি। মূর্শিদাবাদের অবস্থাও তখন সোজা নয়। অনেক গোলমাল পাকিয়ে বলে আছে। নবাবের শরীর দিন-দিন খারাপ হতে চলেছে। গদিতে বসবার পর থেকেই ঝামেলা

চলেছিল। কোথা থেকে বগীরা এসে লুট-পাট স্তব্ব করেছিল। তাদের সঙ্গে লড়াই করতে-করতেই কৌবনটা কেটে গিয়েছে বলতে গেলে। তারপর নাতিটা। নাতিটাকেও গদিতে বশিয়ে যাবেন, তারও শাস্তি থাকবে না। চারদিকেই শত্রু। কেউ ভালো দেখতে পারে না, একলা নাবালককে এতখানি দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। সে কি ঠিকমত দেখতে-শুনতে পারবে।

বলতে গেলে শুধু হাতেই কিরে এগেছেন বাডুজ্জে মশাই।

শিরাজ-এর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। সে তখনও ইয়ার-বক্সী নিয়েই যত।

শিরাজ বিজ্ঞেস করলে—সেই সাধু বেটার ববর কী?

বাডুজ্জে মশাই বলেছিলেন—তার কথা আর বলবেনা হ'জুর, সেই নিবারণের কথা বলছেন তো?

—হ্যাঁ।

—সে বেটা আবার সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গিয়েছে। তাকে অত বাঙালুম-দাওয়ালুম, এখন দ'য়ে মকিয়ে দিয়ে গেছে আমাকে—

—কেন?

—আজ্ঞে, তার কি সংসারে মন বসে? তার কেবল উজ্জু-উজ্জু মন, সে কি সংসার করতে পারে? একবার যে ভগবানের বিচুতি পেয়েছে, তাকে কে আটকে রাখবে বলুন?

শিরাজ হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

বলেছিল—সেই বেটাই তো আমাকে বলেছিল আমি নবাব হবো, বাঘ মারতে পারলে আমিই নবাব হবো মর্শিদাবাদের—

—তা বাঘ মেরেছেন নাকি হজুর?

মির্জা হাসলো। বললে—বাঘ আর মারতে কী? কিন্তু বাঘ মারতে গেলে তো সেই জঙ্গলে যেতে হয়, কোথায় আর বাঘ পাচ্ছি এই সহরের মধ্যে—

বাডুজ্জে মশাই বলেছিলেন—আমাদের গরান্ধাটিতে একটা বাঘ এসেছে হজুর, বাঘটা বড় জালাজে, সববাই বড় ভয় পেয়ে গেছে, মারবেন চলুন না—

হাসি এল নবাবজাদার।

হু' একজন ইয়ার-বক্সী ছিল বাবা, তারও হেসে উঠলো হো হো করে।

বললে—মেছো বাঘ নাকি? মাছ খায়?

বাডুজ্জে মশাই বললেন—আজ্ঞে মাছ কেন, মাছই পেলে মাছই খাবে, এখন তো সবাই বাঘের ভয়ে সন্ধ্যা বেলাই দরজায় খিল দিয়ে থাকে—খাবে কাকে? আপনিই চলুন না—

ইয়ার বন্ধীরা বলেন—চলো না ইয়ার, 'ক্ষুষ্টি করে আদি, চলো না'—

বাঘ মারা যেন নবাবজাদার ছেলে-খেল। ইয়ার-বন্ধীগুলোও তেমনি।

যা হোক শেষ পর্যন্ত বাঁড়ুক্ষে মশাই কথা আদায় করে নিয়ে এসেছিলেন মির্জা হুমায়ূনের কাছ থেকে।

বলেছিলেন—আপনাদের কোনও কষ্ট হবে না হজুর, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব—

—বাঁড়ু-বাঁড়ু?

—সব ব্যবস্থা করবো। যা খেতে চাইবেন তারই ব্যবস্থা করে দেব। দুগী, পাঠা, পরোটা পোলাও সব—

সেই ব্যবস্থা করেই বাঁড়ুক্ষে মশাই গরগহাটিতে চলে এসেছিলেন। যদি এই উপলক্ষ্যে নবাবজাদাকে হাত করা যায়। নবাবজাদা হাতে থাকলে জীবন চৌধুরী আর কবিন। জীবন চৌধুরীকে জব্দ করতে পারলে আর কী চান তিনি।

কিন্তু গরগহাটিতে এসেই গুললেন জীবন কাণ্ড। বাঘ নাকি একেবারে তাঁর বাড়ির আশে, পাশে ঘোরা-কোরা করছে। নিবারণের বাড়ির পেছন দিকে যে বাঁশ-ঝাড় আছে, সেখানেই বাজ্রে কেউ ডাকে। সবাই শুনেছে। জল কানার ওপরে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেছে!

বাঁড়ুক্ষে মশাইএর যেন এতদিনে টনক নড়লো।

বললেন—আর তো চূপ করে থাকা যায় না বে, শেষকালে কি বাঘের পেটে প্রাণটা যাবে নাকি?

— —

(ক্রমশঃ)

স্বলেখা সরকার প্রণীত

টক ও মিষ্টি বান্না

টক ও মিষ্টি পদার্থের আচার, চাটনি, জ্যাম, ডেলি, মোরকা ইত্যাদি রস্কৃত কবিরার সহজ ও সরল আধুনিক পদ্ধতির উল্লেখ বইটির বিশেষ আকর্ষণ।
বান্নারে প্রাপ্য তিনিবেষ চেয়ে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যপ্রদ ও বিজ্ঞানসম্মত কিনিম নিছের ঘরে বসে প্রস্তুত করতে এই বই প্রত্যেক গৃহিণীকে সাহায্য করবে।

৷ দাম—১'৫০ ৷

এই লেখিকারই রচিত

বান্নার বই (৩য় সং) ৫'০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৭, বঙ্কিম চাটুজো ষ্ট্রীট; কলিকাতা-১২

৷ শব্দত শিউলির গন্ধে ভরা ৷

যোগেশনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত

শিশু-ভারতী

ছোটদের বুক অবনলেজ। নানাবিধ... বিশেষজ্ঞদের
লেখা অল্প ছবি। মূল্য : ১০০'০০। দ্বিতী : ২'০০

৷ শব্দবানিক প্রকাশন ৷

তরুণ রবি ৪'০০

রবীন্দ্র-জীবনের নতুন বিশ্লেষণ।

বহু ছবিতে ভরা।

৷ ছোটদের চিত্রদ্রুপ বই ৷

বিজোহী বালক ২'২৫

রূপকথার দেশে ২'৫০ ৷ বাত্মপূরী ৩'২৫

রূশদেশের উপকথা ২'২৫

বীরসিংহের সিংহশিশু ২'৫০

রাজ্যের রূপকথা ৫'০০

শুশু হাসি ভেবো না ১'৫০

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬



রেনবো কালি

সর্বজনপ্রিয়

রেনবো ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

২-২এ, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

নোতার দাম গির্জার কুঁজো

সন্ধানী

ফরাসী দেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর নাম ভোয়রা অনেকেই শুনেছেন। হুইথানি উপন্যাস লিখে কেবল ফরাসী সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে ইনি অমর হয়ে আছেন। এর বই দুইখানির নাম—‘হাক্‌ব্যাক অফ্‌ নোতার দাম’ এবং ‘লে মিজারেবল’। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী এর জন্ম হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকে ছগো লেখা শুরু করেন। এর প্রথম লেখা আরম্ভ হয় গান, কবিতা, হাসির কবিতা ও সংগীত-প্রধান নাটক দিয়ে। কুড়ি বৎসর বয়সে ছগো তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন। এই কবিতা পড়ে দেশের রাজা খুব সন্তুষ্ট হয়ে একে বাৎসরিক চল্লিশ পাউণ্ড বৃত্তি দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এর ‘হাক্‌ব্যাক অফ্‌ নোতার দাম’ বই প্রকাশিত হয়। এর পর ইনি নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত হয়ে পড়েন। এর জন্য তাঁকে বহুবার ত্যাগ করে নির্বাসিত অবস্থায় কয়েক বৎসর বাস করতে হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ‘লে মিজারেবল’ নামে এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সমাজ দরিদ্রের উপর কি নির্মমভাবে অত্যাচার করে তার চিত্র এতে আছে। সামান্য করণার দ্বারা এই সব দরিদ্রকে কেমন ভাবে উদ্ধার করা যায়, তাও তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। এখানে আমরা তাঁর বিখ্যাত ‘কুঁজো’র গল্পটা সংক্ষিপ্তভাবে বলবো—

প্যারিস শহরের প্রকণ্ডে গির্জা ‘নোতার দাম’। এই প্রকণ্ডে গির্জার ঘটাগুলো বনন উৎসবের দিনে চং চং করে বাজতে থাকতো, তখন প্যারিস লোকরা গির্জার দিকে তাকিয়ে থেকে বলাবলি করতো—সেই অষ্টাবক্র কুঁজোটা আবার ঘটা বাজতে আরম্ভ করেছে। এই কুঁজোর নাম কোরাশিমোভো; দেখতে কিছুতুকিমাকার ও হাড়গোড় ভাঙা এই কুঁজোর দেহে কিন্তু অদম্যব শক্তি ছিল। সে জীবনে দুটি জিনিস ভালবাসতো—এই বিরাট গির্জার ঘটা আর অন্য একটা গির্জার পাত্রীকে। এই পাত্রীই তাকে শিশু অবস্থায় পুষ্টি নিয়েছিল।

ঘটার উদ্ভাস গম্ভীর আওরাজ বনন সমস্ত গির্জা কাপিয়ে বেছে উঠতো, তখন গির্জার চুড়া, ছাদের বরণা, পাথর ও নানা রকম ধাতুর তৈরী কুলন্ত জিনিসও নেই সঙ্গে কাপতে থাকতো এবং ঘটার আওরাজ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো। কুঁজো কেবল গির্জার এই গম্ভীর চড়া আওরাজই শুনেতে পেতো—আর কোন শব্দ তার কানে ঢুকতো না। বাল্যকাল হতে ক্রমাগত এই কর্কশ কোরাশিমোভো আওরাজ শুনে শুনে তার কানে তালো লেগে গিয়েছিল। সে এখন একেবারে বদীর।

ছেলেবেলা থেকে তার প্রিয়পাত্র ছিল মাত্র দুটি—ঘটা আর অন্য গির্জার শব্দ। কিন্তু এদের মধ্যে আর একজন প্রিয়পাত্র এসে পড়াল। সে হচ্ছে এসমারেভা নামে বেদের একটি মেয়ে।

গির্জার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। গির্জার পাহারাবার কোয়ার্টিমোডো দূরে আলো ও চিৎকার শুনে আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পারলো। এই উদ্ভ্রান্ত জনতা দেখেনী মেয়েটিকে কাসি দিতে আসছে মনে করে সে গির্জার চুড়ার উঠে পড়লো এবং সেখান থেকে অন্তর উপর ইট-পাটকেল, কড়ি, বরগা, বাশ ইত্যাদি ছুঁড়ে কেলতে আরম্ভ করলো। এই পুরোনো গির্জার মেয়ামতির জন্যে রাজমিস্ত্রীরা নানা রকম জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছিল। তার মধ্যে ছিল বস্তা বস্তা তাল তাল শিবে। গির্জার চুড়ার উপর সে এক অধিকৃত জ্বলে তাতে শিবে গলিয়ে, গলন্ত শিবে অন্তর উপর ঢেলে দিতে লাগলো। ভীত ও সন্ত্রস্ত-জনতা চারিদিকে ছড়িয়ে পালিয়ে গেল।

এর পর কোয়ার্টিমোডো সমস্ত গির্জার মেয়েটিকে পাগলের মত খুঁজতে লাগল—কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। গওগালের হ্রবোগ নিয়ে সে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

গির্জার এই কুঁজোর সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হোল। পরদিন মেয়েটি আবার ধরা পড়লো এবং সাধারণভাবে তাকে কাসি দেওয়া হোল। ভগ্নবর কোয়ার্টিমোডোও পৃথিবী হতে অন্ত হইবে গেল—তাকে আর কোথাও দেখা গেল না।

ছড়া

ঐপলাশ মিত্র

বাগবাজারের বাঘ :

ইস্কুলের পড়ার নামে

হতো যে তার রাগ।

এই না শুনে ন'মাসী তার

মারলো ছুঁচড় কিল গোটা চার

এতেই বাঘের পিঠে অমন

হাজার জোরা দাগ :

বাগবাজারের বাঘ।

সোনার মোড়া দিনগুলি

ত্রিবিমল দত্ত

বাড়ীটা বড়। তিন মহলা। ঘর কত! তাছাড়া তিনটে বড় বড় উঠোন আর শিছন দিকে প্রকাণ্ড একটা বাগান। ছাদ তিনটে তেতলার। ঘুড়ি ওড়াবার দেখার সুবিধে। যে সময়কার কথা বলছি সে সময়ে ছেলেরা এত ক্রিকেট ফুটবল খেলত না। তারা খেলত মারবেল, লাটু, আর ওড়াতো ঘুড়ি।

সোতলাঘ শিছন দিকেও একটা ছাদ ছিল। গরমের দিনে এখানে মাতুর পেতে শোয়া চলত। চানের আলোয় মেরেরা তাস খেলত আর ঠ্যাং ছড়িয়ে বস্ত্রাঙ্কুর আঁকে-বাঁকে গল্প করতো।

কর্তা, গিন্নী, ছেলে, বো, মেয়ে কত নে বাড়ীতে। তাছাড়া স্থায়ী ভাবে থাকতাম আমরা তিনটি ছেলে। ব্যাপা, আমি আর স্বজয়। ব্যাপা আমার ভাইপো, বরদে আমার থেকে কয়েক বছরের বড় হলেও সমবয়সীর মত থাকতাম আমরা। আর স্বজয় ছিল আমাদের ভাগ্নে, আমার চেয়ে, হ্যা, বছরখানেক ছোটই হবে।

খেলাধুলা, দুটামি, পড়াশুনা এই সব করে আর এঘর-ওঘর ঘুরে ছেলেবেলায় বেশ আমোদেই দিন কাটতো। এ ছাড়া ছিল এক মামা—বহুমামা। তাঁর সবই অদ্ভুত। ধরন-ধারণ কেমন এলো-মেলো—চেহারাটা অষ্টাবক্র না হ'লেও তার আদেক অর্থাৎ চতুর্ভ্রুত' আলবৎ। বেলা তিনটের তাঁর ঘুম ভাঙতো—তারপর আধ বাঙালি বিড়ি ধরে তিনি তেল মাখতে বসতেন। এতক্ষণ চলতো তাঁর ফাটা পায়ে তেল দেওয়া আর গৌক চোমরানো—‘আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত পণ্ড বানানো। তাঁকে বলা চলে স্বভাব কবি। মিল আসতো তাঁর মুখে অনর্গল ঝর্ণার মত। তবে ঝর্ণার জলও ত' উপলে অর্থাৎ হুড়ি-পাথরে বাধে—‘তেমনি পণ্ড মেলাতে মেলাতে বেধে গেলে, তিনি বিপুল চেষ্টার বাংলা ভাষায় শব্দগুলোকে চটকে কদাচার করে মিলিয়ে দিতেন।

বহুমামা তেল মাখছেন আর তাঁর সামনে চরছে পায়রাগুলো। এগুলো বহুমামার পুত্রি। একটু আগেই মূঠা দুই পায়রা-মটর উঠোনে ছড়িয়ে দিতেই তারা এসে বেজায় বক্ববক্ব হুঙ্কার দিয়েছে। মূথ্য, লোটন, পরপণ, গৃহবাস, লজ্জা কত রকমের পায়রা। যেন উঠোনে জল ফুটছে।

বহুমামা পণ্ড হাঁকরাচ্ছেন—

“ওরে আমার মূথ্য

বলতে পারিন্ হুঙ্কার কি?”

বলেই নোঁফে তা দিলেন বহুমামা। কিন্তু মূথ্য ত' মাহুয়ের ভাবা বোঝে না, তাই একটোর বার্ষনিক গভীরতা সে বুঝতেই পারলো না। তবু যেতে যেতে বহুমামাকে বেন ধমকে দিলে—

“বন্ধে কম

বন্ধে কম।”

বন্ধুমায়া পায়রাটার মূৰ্খতা দেখে আবার পদ্ম ছাড়লেন—

“মুখ্যি ত’ নয় মূৰ্বী

বাস্ কেন রে হরকি?”

এর জবাব দিলে পয়পণ পায়রা। সে অত্যন্ত দ্রুত বন্ধুমায়ার কাঁধের উপর এসে বলে কি একটা বিশ্রী অসভ্যতা করেই উড়ে গেল। এইটাতেই যেন তার হৃৎ। কিম্বা হরত মিতীর প্রেরণ জবাব।

বন্ধুমায়া, ‘আরে বাঃ’ বলে কাঁধে হাত দিয়ে সেই নোংরা পদার্থটা রোয়াকের ধারে মুছে কেলে এসে বসলেন। বললেন—

“পায়রা, তোরা নোংরা বড়,

তোদের পায়ে করছি গড়-অ।”

ডাবছ বোধহয় এইবার চারটে বেজেছে। কাম্বৈ বন্ধুমায়া বোধহয় স্নানটা সেয়ে নেবেন। উহঁ। এখনো তার নিত্যকর্ম একটা বাকী। বাড়ীতে একটা বই ছিল ‘বন্ধাধিপ পরাক্ষর’। এর প্রথম দিককার বেশ কিছু পাতা আর শেষ দিককার বেশ কিছু পাতায় ইতিমধ্যেই পরাক্ষর ঘটেছিল। অবশ্য বন্ধুমায়ার হাতে আসবার আগেই। এই বইটা নিয়ে চোখ কাত করে বন্ধুমায়া পড়তে বসলেন। চোখ কাত করাটা বন্ধুমায়ার এক অদ্ভুত ভঙ্গী। কেউ দেখলে মনে করবে বুঝি বন্ধুমায়া ট্যারা। মোটেও না, মোটেও না। ঐ স্বকম চোখ না করলে বন্ধুমায়া বইয়ের হরপ দেখতে পেতেন না। কতকাল আমরা দেখছি এটা ছাড়া আর কোন বই বন্ধুমায়া ছুঁতেন না, স্ববয়ের কাগজও না। দিনের পর দিন এই ‘দিগ্‌পরাক্ষর’ পড়ে তাঁর কী জ্ঞানবুদ্ধি বাড়তো তা বলতে পারি না। এতে কি আছে সিজ্ঞানসা করলে বন্ধুমায়া ধমকে উঠতেন, “বা-বা-বাঃ! এ সব বোকা তোদের কর্ম না।”

বই পড়তে পড়তে ঋনিক খেমে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি কি সব ভাবতেন। তারপর গোঁপ চুম্বরে পদ্ম বানাতেন—

“বন্ধের অধিপ বন্ধাধিপ

চরণে প্রণাম রইল—টিপ্‌।”

ডাবছ, এসব বানানো? একেবারে না। খঁটা নির্জলা সত্যি কথা। তবে হ্যাঁ, বন্ধুমায়াকে যদি অদ্ভুত হলো, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। আসেই ত’ তাঁর পরিচয় দিয়েছি।

এতক্ষণে চান করতে গেলেন বন্ধুমাঝ। বেশ করে জল দিলেন, পেটে জল খাবড়ালেন। তারপর গা মাথা মুছে একটা কাপড় কেটে ঠাকুরের মত ফেঁটা দিয়ে পরে অগ্ননার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা ভাল করে অগ্ননার পর্যবেক্ষণ করে কোথা থেকে একটা ভাঙা চিকনী এনে প্রথমে গোম্বের দু'ভাগ ভাল করে আঁচড়ে, হাত দিয়ে সমান করে, তারপর চুলের কেয়ারী ব্রু করলেন। কাঁচা পাকা চুল হলেও তাতে ছিল কৌকড়া-কৌকড়া গোছা, আলগোছে চিকনী ছোঁয়াতেই তারা বাধ্য সেনাদলের মত তাঁর কপালের উপর কুঁকড়ে এসে পড়লো।

এবার বালি গায়ে ভাগ্য-পেট বন্ধুমামাকে দেখলে লোকে বা বলে আমি শুধু সেইটুকুই বলছি। তিনি আমাদের পূজনীয়, কাছেই নিজেরা ত' বলতে পারি না। লোকে বলতো 'শব কার্তিক।'

বন্ধুমামার এবার ভোজন-পর্ব। বেলা এগারোটা থেকে একটা লোহার ঢাকা চাপা সেওয়া থাকতো তাঁর ভাত তরকারী। তার সামনে একটা কাঠের পিড়ি পেতে বন্ধুমামা খেতে বসলেন। ঢাকা তুলেই খালটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নিয়ে একটা পদ্ম বললেন—

“ভাল আর চকড়ি
ভাত কিন্তু কড়কড়ি
বাটি-ভরা কোল
পাথর বাটিতে ঘোল।
নাই কিন্তু অঘোল—”

কেমন? বন্ধুমামা একজন অতুত মানুষ নন কি?

বড়বাড়ীতে এমনি আরো কত অতুত মানুষ ছিল। আরেকজন ছিল স্বপ্নন ঠাকুর। বোধ হয় এ বাড়ী তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে জুটেছিল এখানে। তখন চৌদ্দ বছর বয়সের বালক। এখন প্রৌঢ়সে পৌঁছেছে। যদিও বাস তার ওড়িয়া দেশ, তবুও কঁড়, কিমিতি, কবিকি, কাইকি, খাউছি পরা ইত্যাদি শব্দ সে বড় ব্যবহার করতো না। আমাদের বাংলাই নিখে কেলছিল অনেকটা। তবে উচ্চারণে একটু এদিক-ওদিক করে ফেলতো।

আমাদের যখন ইঞ্চলে বাবার সময় হ'ত তখন 'ঠাকুর, ভাত দাও' বলে বাবার-ঘর থেকে ডাক পড়লেই ঠাকুর আমাদের ছোট খালাগুলো তরকারী সাজিয়ে কনাং করে কলে দিয়ে বেত। তার পরই ভারী যজ্ঞ করতো।

যদি আমরা বলতুম; “ঠাকুর, আর দুটি ভাত দাও”, ত' সে এসে খালা থেকে মাত্র দু'টি সোন। ভাত আমাদের পাত্রে কলে দিয়ে পাড়িয়ে পাড়িয়ে হাসতো।

আমরা বলতুম, “কি হচ্ছে, ইকুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?” তবুও সে হাসতো আর বলতো,
“আমি কি করবো, দুটি ভাত-ই শু’ দিয়েছি।”

খাপা বললে, “দুটি মানে চারটি।”

সে আরো দুটি দিয়ে বলতো, “ওগে দেখ, হয়নি।”

হজর হেসে বলতো, “আচ্ছা, আমাকে একমুঠো ভাত দাও।” সে শুধে একমুঠো ভাত দিয়ে
হি হি করে হাসতো।

আমাদের সঙ্গে তার এরকম রসিকতা নিত্য-দিনের ব্যাপার ছিল।

একদিন আমরা সকলে খেতে বসেছি। রাহের ব্যাপার। হঠাৎ সেগা পেগা দাদা কি একটা
জিনিস পাত থেকে উঁচু করে তুলে জিগোস করছে, “ঠাকুর, এটা কি? চক্কড়িতে কি দিয়েছে?”

ঠাকুর সেখলে জিনিসটা আরঙলা। শুঁড়ে কুলিয়ে দাদা সেখাচ্ছে। সে জ্ঞান-বদনে বললে,
“অ কুছু না, কুছু না, চোংড়ি মাছের মূড়া।”

সব্বাই হেসে উঠলাম। চক্কড়ি সে দিন কেউ মুখে দিলে না।

আরেক দিন ঝোলে এক টোব্লা টিকটিকি সেক হয়ে আমার পাতে পড়ল। ছোট পার্শে
মাছ মনে করে সব ছাড়াতে যাব, দেখি পা সেগা যাচ্ছে।

ঠাকুর যে তরকারী ঢাকা বের না, সে কথা কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করল না। বললে,
“ও কুমীরের খাচ্চা, বাজার থেকে মাছের সঙ্গে এসেছে।”

আমাদের কয়েক জনের সাক্ষ্য-সুমানের বদভ্যাস ছিল। কিন্তু খাবার আগে ঘুমিয়ে পড়লে
বড়দের হাতে বড নাশ্তানাব্ব হতে হ’ত। ভাত হতে ন’টা হ’ত। সারাদিন টুটুঁমি, ছুটে-ছুটি করে
সন্ধ্যার সময়ে পড়তে বসলেই আমাদের ঘুম আসতো। কোন ক্রমে জীবনবাবুর অঙ্কের টান্ড আর
অম্বরবাবুর ইংরেজীর টান্ড করেই আমরা স্বপ্নর্শন ঠাকুরের বন্দোবস্ত কতদূর, অর্থাৎ ভাত হওয়ার কত
দেরি দেখতে যেতুম।

আমাদের সেগলেই ঠাকুর খসি ঘুরিয়ে তড়া করতো। দেখতুম, ভাল ছুটছে—নাকে তার
স্বর গন্ধ এসে আমাদের ঝিমিয়ে-পড়া শরীর মনকে কেমন বেন কিস্কিমি করে সিত।

তখন অগত্যা এক জায়গার এসে আমরা স্তমতুম। উপরে ঘরে ঘরে বৌদিদের স্টল—সেখানে
এমন সময়ে হাজির হলেই প্রশ্ন হবে, “এরি মধ্যে পড়া হয়ে গেল? বা পড়তে যা”—কাজেই সেখানে
না গিয়ে আমরা এসে বসতাম সামনের বাড়ীর রোডকে।

এ বাড়ীতে আমাদের এক সমবয়সী ছিল, গণশ। সেও ঠিক একই সময়ে আমাদের সঙ্গে

এসে ভিড়তো। ওর মাথাটা নানা রকম মতলবে ভর্তি ছিল। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, কিসে ছ'পয়সা আয়দানি হবে—এই সব। আমাদের অচল নিকি দু'রানি সে অবসীলার কেঁরিওয়ালাসের কাছে চালিয়ে দিত। তার বর্তমান খবর জানি না, তবে আশা করি সে এখন মত্ত ব্যবসায়ী হয়েচে এবং অচল মাল পুরো দমে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

সে দিন গণ্শা আমাদের কাছে প্রস্তাব করলে যে সে মহুয়া পাখীর কারবার করবে। এবং আগামী রথের দিনই হবে তার কারবারের যারোল্‌ঘাটন। আমাদের ও একটা সান্নাইং এক্সেটের হবিধে দিতে চায়।

খ্যাপা বললে, “মহুয়া কোথায় পাবো?”

হুজুর বললে, “বন্ধুদ্বার খাঁচা থেকে? বলিস্ কি গণ্শা?”

আমি বললাম, “তা'হলে পিঠে হাঙ্ক-সোল দিতে হবে, আর মাথাটা রি-সোল করতে হবে।”

সকলেই হেসে উঠলো।

গণ্শা শুধু বললে, “না রে না-না। চুইচুইরি না। ও-সব কাণাখলি কারবার নয়। বা বলছি মন দিয়ে শোন—”

সবাই গণ্শাকে ঘিরে ধরলুম—ছেঁকে ধরলুম একেবারে।

গণ্শা বললে, “চড়াই পাখী চিনি?”

হুজুর বললে, “খুব চিনি। কতদিন ঘরে দোদ-জানলা বন্ধ করে ধরেছি।”

গণ্শা বললে, “বঃ বাস্! তবেই হবে। ঐ চড়াই পাখী আমাকে সান্নাই করতে হবে।”

খ্যাপা বললে, “এই যে বলি মহুয়া?”

গণ্শা বললে, “তবে আর ব্যবসা কি? চড়াই পাখী ঝাঁচা মাল তা থেকে পাকা মাল হবে মহুয়া পাখী। একে বলে ম্যানুফ্যাকচার।”

আমি ঠা করে ভাবছি যেখে গণ্শা বললে, “বান্নারে খুব ভাল পাকা রং পাওয়া যায়। তাই ঘিরে ওদের এইত্না রং করব, ধরে কার সাধ্য! তারপর রথের মেলায় বিক্রী করবো 'সিংগাপুরী মহুয়া' বলে। ছ'ছ আনা।”

হুজুর বললে, “কবে চাই তোর?”

গণ্শা বললে, “আজ থেকেই দিতে পারিস—তবে আমি ধোব ডোদের এক আনা করে পাখী পিছু।”

খ্যাপা বললে, “তুই অভ লাভ করবি?”

গণ্ণা বললে, “তা আমার পরচণ্ড ত’ রয়েছে—ওদের পাওয়াতে হবে—কিনতে হবে—খাটতে হবে—বিজী করতে হবে, কত কষ্টটা ব্যবসায়ের!”

খাপা বড় বাড়ীর সামনের থামগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, “কি রে স্বজয়, পারবি?”

স্বজয় হেসে বললে, “পারবো।”

আমি ওদের ইতিবৃত্তে না পেরে বললাম, “কি রে, কি?”

ওরা আমার কথার জবাব না দিয়ে গণ্ণাকে বললে, “তা’হলে এক আনা করে নিবি ত!”

গণ্ণা বললে, “ওয়ার্ড ইন্স্‌ ওয়ার্ড। বেকালে ব্যবসার নেমেছি মূলধন না নিয়ে কি নেমেছি! তোরা কি আজ থেকেই চালান দিবি?”

খাপা বললে, “দেখি, সেই চেষ্টায় চলাম।” বলে আমাকে ইশারার ভেঁকে নিয়ে বাড়ীর সামনে চলে গেল।

গণ্ণা অঙ্ককারে কোথায় আনি চলে গেল।

উঠোনে এসে দাঁড়ালাম তিন মূর্তি। গড্‌ দি ফানার, গড্‌ দি সন্‌ আর হোলি গোট্‌, (ইংরেজী মতে) বাংলা মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

চাঁদের মরা আলোর নিম্ন গাছটা ঝিম্‌ঝে। উঠোনের তিন দিকের বারান্দার কালো-শাদা সোহার থামগুলো দাঁড়িয়ে। তারই মাথায় দেখানে থাম আর কড়িকাঠের সংযোগ তার ছ’পাশের কোকরে বাক্যে চড়াই পাখী।

খাপা বললে, “ওহ্‌ স্বজয়, তুই যে বলেছিলি তোদের মজিলপুরে তুই সুপুঁরি গাছে তবু তবু করে উঠে কাদি কাদি সুপুঁরি পাড়তি!”

স্বজয় একটু বাড়িয়ে বলতো—এবার কিন্তু পড়ে গেল কাপরে। বললে, “সে ত’ গাছ। আমি কি বলেছি যে আমি লোহার থাম বেয়ে উঠতে পারি?”

খাপা বললে, “থামও বা আর সুপুঁরি গাছও তাই—সুপুঁরি গাছ দোলে, থাম দোলে না। নক্ত কাজ করেছিস এই দোলাটা পারবি না? তুই কি তোদের মজিলপুরের নাম ভোবাবি?”

আমি বললাম, “আমি উঠবো?”

খাপা বললে, “তুই আরেকটাতে উঠবি—পরে। এখন স্বজয় উঠুক, আমরা একজন সদরে পাহারা দেব আর একজন অন্যরে পাহারা দেব। কেউ দেখতে পেলে রক্ষা রাখবে না।”

স্বজয় বললে, “আমি পারবো না। বাবা বলেছেন চড়াই পাখী বায়ুন—ওদের কষ্ট দিতে নেই।”

স্বনাশ !

খাপা দেখলে সিংগাপুরী মহুয়া সাপ্লাই-এর এত বড় এজেন্সি বুঝি কসকার। বললে, “আজ্ঞা, বামুন হলে ত’ নৈতে থাকবে? কোন চড়াই পারী নৈতে দেখেছিল! তোমার বাবা কি বলেছেন, আর তুই কি শুনেছিল! ওঠ, তাই, ওঠ : অনেক ঘুড়ি হতো কেনা যাবে পরশা গেলে। আজ অন্ততঃ দুটো চড়াই পারী ধরতে হবে।”

হুম্মর বললে, “যদি আচড়ে দেয়?”

আমি বললাম, “তুই বেশ করে টিপে ধরবি।”

হুম্মর বললে, “কামড়েও ত’ দিতে পারে?”

খাপা বললে, “না না চড়াই পারী খুব ভীতু—কিছু বলবে না।”

তখন আমরা দু’জন ঠেলে ঠেলে হুম্মরকে ত’ ধানের মাথায় তুলে দিলুম। তারপর হুম্মর যেই কোকরে হাত দিয়েছে অমনি চড়াই পারী উঠলো ডীঘ চ্যা-চ্যা করে আর কামড়েও দিল হুম্মরের হাতে। হুম্মর সব চড়াইয়ের পরে হাত দিয়েছিল, ভয় পেয়েছে—ছেড়ে দিল। আর পারীটা ছুন্দু করে উড়ে গিয়ে নিমগাছে বসল।

ওপর থেকে দাদা আর কে কে বলে উঠলো—“কে রে পারী ধরে?”

আমরা তখন হাওয়া। হুম্মর ধানের মাথা থেকে বললে, “কেউ না দাদা, পারী উড়ে গেছে।”

আর কি বোকাটার অন্তে বাড়ীহুতু সবাই ছুটে এল। তারপর শুকে বহুনি আর গুর মুখ থেকে সব ব্যবসার কথা ফাঁস। সকলে আমাদের নিয়ে সেদিন বা ঠাট্টা জুড়ে দিল যে মনে হতে লাগল আমরা কেন মাটিতে মিশে গেলুম না। মনে মনে প্রতীক্ষা করলাম হুম্মরকে নিয়ে আর কোনদিন কিছু করবো না।

কি বলছ? তারপর?

সে অনেক ব্যাপার। ডেবো না আমরা এজেন্সি ছেড়ে দিয়েছিলুম। তবে এখন সে কথা থাক।

যদি তোমাদের এ গল্প ভাল লাগে সম্পাদক মহাশয়কে জানিও—অপর মৌচাকের পাতায় এ গল্পের শেষ জানতে পারবে।

গোলাপ পাপড়ী

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এই কথা শুনে রাজকুমারীর ভাবী চঃখ হ'ল। তিনি বেশ ব্যস্তে পারলেন রাজকুমার চির-স্বপ্ন, তাকে বড় ভালোবাসতেন আর সেই জন্যই তিনি গোলাপ গাছ হয়ে তার পাশে পাশে রয়েছেন। রাজকুমারী ছোট মেয়েটির নাম রাখলেন গোলাপকুঁড়ি, আর তাকে তুলে নিয়ে এসে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। কোন লোকের হাথেরে ঢোকবার স্বপ্ন ছিল না। রাজকুমারী দিনরাত সেই ঘরের ভিতরই থাকতেন—আর গোলাপকুঁড়িকে মাহুঁষ করে তোলেন।

ক্রমশঃ রাজকুমারীর মনের আনন্দ ক্রমে এলো। এতদিন তিনি চুল আঁচড়ান নি, কেবল একটি ফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়ে রেখেছিলেন। আজ তিনি দাসীদের থেকে চুল খুলে নতুন করে চুল বেঁধে সোনার মুকুট পরিয়ে দিতে বললেন।

চুল আঁচড়ান আরম্ভ হয়েছে ঠিক এমন সময় কে রাজকুমারীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে। একজন দাসী ঘরে ঢুকে বললে, যে বুড়ী কুমড়োর উপরে গোলাপ বাধা এনছিল সেই বুড়ী বাইরে বাড়িয়ে আছে—গোলাপকুঁড়িকে দেখবে বলে। রাজকুমারী বললেন, “আমার চুল আঁচড়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে বল।” পনের মিনিট পরে বুড়ী আবার দরজায় ধাক্কা দিলে—এমনি করে বার বার পাঁচবার বুড়ী দরজায় ধাক্কা দিলে, কিন্তু প্রতিবারই পেলো সেই এক উত্তর। শেষ বারের বার বুড়ী ভীষণ রোগে গেলো। তখন সে দরজায় ঢাবীর সঙ্গে হুঁচ লাগিয়ে এই কথাগুলি বললে।—

বাড়িয়ে আমি সাত কোরাটার ঘরে,

চুকতে আমার দিলি না তোর ঘরে।

আজকে থেকে সাতটি বছর গত,

এ চিরনি আনবে বিপদ বস।

গোলাপকুঁড়ির মাথায় ঘাবে ছুটে

পড়বে খুকী ধরার পরে লুটে।

এই কথা বলে বুড়ী রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল। গোলাপকুমারী বুড়ীর কথায় কান দেয়নি। গোলাপকুঁড়ি ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠল—তার মাহেরই মত তার মাথায় লম্বা, সোনার মত চুল। গোলাপকুমারী রোজই তার চুল আঁচড়ে সেন। মেয়েটির সাত বছর বয়স হ'ল—জাইনী বুড়ীর কথা বলবার সময় এলো।

আজকে থেকে সাতটি বছর গত

ঐ চিরুনি আনবে বিপদ যত

গোলাপকুঁড়ির মাথায় রবে ফুটে

পড়বে খুঁকি ধরার পরে লুটে ।

গোলাপকুমারী এ কথা একবারও ভাবেনি । যেমন তিনি গোলাপকুঁড়ির চুল আঁচড়ায়, আজও তেমনি আঁচড়ে নিচ্ছেন । আজ গোলাপকুঁড়ির হাল্লর, সোনার মত লম্বা চুল সেখে তাঁর মন হিংসে ভরে উঠল । তিনি রাগের মাথায় বলে উঠলেন—

তোমার মাথা একেবারে হয়ে দাঁক স্নাড়া,

তোমার চুলে বড় হ'ক আমার চুলের গোড়া ।

হেই এই কথা বলা—ভগবান যেন তার কথা শুনতে পেলেন, অমনি আকাশ থেকে নেমে এলো এক অদৃশ্য কাঁচী, রাজকুমারীর মাথার চুল সব কচক্ করে কেটে দিলে । রাজকুমারী, ভীষণ চমকে উঠলেন । তাঁর হাতের সোনার চিরুনি গোলাপকুঁড়ির মাথায় ফুটে গেল । গোলাপকুঁড়ি ডিংকার করে তার মাংসের পাখের কাছে লুটিয়ে পড়ল ।

ভাইনীর মায়ার গোলাপকুঁড়ি মরে গেল—তাকে বাঁচাবার আর উপায় রইল না । রাজকুমারীর এত আদরের গোলাপকুঁড়ি ঘরের মেঝের পড়ে রইল মরে । আর রাজকুমারীর এত দাখের সোনার মত লম্বা চুল পড়ে রইল ঘরের মেঝের ঘড়িয়ে । রাজকুমারী মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন এক গাছিও চুল নেই । তাঁর গর্ষ করবার আর কিছুই রইল না ।

রাজকুমারী কাঁদতে কাঁদতে, তাঁর মাথার চুল ভরে করলেন একটি গদি, আর গোলাপ পাপড়ি ভরে করলেন একটি মাথার বালিশ । বিছানার উপরে গোলাপকুঁড়িকে শুইয়ে তাকে একটি কাঁচের বাজের ভিতর পুরে রেখে দিলেন একটি ঘরের ভিতর ঢাবি দিয়ে । কেউ কিছুই জানতে পারল না ।

হুঃখে হুঃখে রাজকুমারী আর এক বছর বেঁচে রইলেন । তিনি যখন বুঝতে পারলেন তাঁর মরবার সময় হয়েছে, তখন তিনি তার দাদাকে ডেকে বললেন, “দাদা—আমি আর বাঁচবো না । আমার মনে হচ্ছে কিছুরই গর্ব করা ভালো নয়—যাক্, যা হবার তা-তো হয়ে গেছে, ভগবানের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি । তোমার কাছে যখন বা চেয়েছি তাই পেয়েছি—কোন ইচ্ছাই আমার অপূর্ণ রাখনি । আর একটি ইচ্ছা তোমায় পূরণ করতে হবে—তা’হলে আমি নিশ্চিত হয়ে মরতে পারবো ।

রাজকুমার চোখের জল ঝেলেতে ঝেলেতে বললেন—“বল বোন, তোমার কি চাই ?”

রাজকুমারী তার হাতে একটি চাবি দিয়ে বললেন, “দাদা—এই চাবিটি হচ্ছে পাশের ঘরের। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর তুমি কখনও ও ঘরটা খুলবে না।”

রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করলেন।

রাজকুমারী বললেন, “দাদা, তুমি অনেক দিন বেঁচে থাকো—আর ভগবানের কাছে আমার কল্যাণ প্রার্থনা কর।” এই বলে রাজকুমারী মারা গেলেন।

২

রাজকুমারী মারা যাবার পর রাজকুমার একটি মেরেকে বিয়ে করে আনলেন। মেয়েটি খুব হন্দরী, কিন্তু তার মন হিংসের ভরা। একদিন রাজকুমার বিশেষ যাবেন—তিনি মেয়েটিকে ডেকে বললেন বড়ী ঘর দোরের উপর নম্বর রাখতে, আর তার লেখবার টেবিলে যে ঘরের চাবি আছে, সে ঘরটি যেন কিছুতেই না খোলে।

রাজকুমারের বারণ করা সত্ত্বেও মেয়েটির কৌতূহল হোল জানবার ক্ষণে ঘরের ভিতরে কি আছে। সে চাবিটি নিয়ে, রাজকুমার যে ঘর তাকে এত ক’রে খুলতে বারণ করে গেলেন, সেই ঘরটি খুললে। কাঁচের বাস্কের ভিতর গোলাপকুঁড়িকে শুয়ে থাকতে দেখে, মেয়েটি একেবারে চমকে উঠল। গোলাপকুঁড়ি মরে-গেছে-ভেবে তার মা, তাকে কাঁচের বাস্কর ভেতর পুরে, এই ঘরে বন্ধ করে রেখে গেছেন। গোলাপকুঁড়ি সেই কাঁচের বাস্কের মধ্যে ক্রমশঃ বড় হ’য়ে এখন একটি চোদ্দ বছরের হন্দরী মেয়ে হয়ে উঠেছে। গোলাপকুমারী মরেনি ভাইনীর মায়ায় ঘুমিয়ে আছে।

হিংস্র মেয়েটি কাঁচের বাস্কটি ভেঙ্গে ফেল বললে, “ও! তোর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, তাই রাজকুমার আমার এ ঘরে ঢুকতে মানা করে গেছেন, নহ?—দাঁড়া, তোর ঘুম ভাঙাচ্ছি!” এই বলে মেয়েটি গোলাপকুঁড়ির চুলের ভুটি ধরে একটান দিতেই, গোলাপকুমারীর চুলের ভেতর থেকে সোনার চিহ্নটিটা খসে পড়ল। ভাইনীর মায়া কেটে যেতেই গোলাপকুমারী চিংকার করে উঠল, “আঃ মা, আমার ঘেরো না!”

—“দাঁড়া তোর মা বলা বার করছি।” এই বলে মেয়েটি গোলাপকুঁড়িকে বিছানা থেকে-টেনে তুলে তাকে কিল, চড় খুব মারলো গোলাপকুঁড়ি খুব কাদতে লাগলো, আর ভয়ে কঁপে উঠল। মেয়েটি বললে, “এ সব কথা যদি কাউকে বলবি তা’হলে তোকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব।” তারপর সে গোলাপকুঁড়ির হন্দর লম্বা চুল কাঁচি দিয়ে কচকচ করে কেটে, তাকে একটা গলের মত মোটা কাপড় পরিয়ে স্নান তুলতে আর বন থেকে কাট কুড়িয়ে আনতে বললে। গোলাপকুঁড়ি, স্নানতোলে

কাট কুড়িয়ে আনে, বাসন মাছে, ঘর পরিষ্কার করে—এমনি করে দিনরাত কাজ করে করে, আর তোমার মত খেয়ে খেয়ে কষ্টে কষ্টে তার গায়ের রং পাকা শানের মত হয়ে গেল।

গোলাপপুরের রাজকুমার ফিরে এলেন। মেয়েটিকে দেখে জিগ্যাস করলেন তার স্ত্রীকে, “এ মেয়েটি কে? আর একে দিনরাত অমন করে কাজ করাও কেন?”

—“ও একজন দাসী—কাকীমা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মেয়েটা এত কুড়, এত বোকা, আর পাখী যে দিনরাত বক্ছি—কিছুতেই ত’ তবু ওর স্বাভাব বাজে না।

গোলাপপুরে এক মস্তবড় মেলা বসল—রাজকুমার মেলার যাবেন—প্রাসাদে যে ঘেঘানে ছিল সকলকে কাছে ডেকে জিগ্যাস করলেন কার কি আনতে হ’বে। সকলে নানা রকম জিনিস আনতে বললে। শেষ গোলাপকুড়ি তার খেলার মত কাপড় পরে রাজকুমারের কাছে আসতে হ’ল। রাজকুমার তাকে জিগ্যাস করলেন তার জন্মে কি আনতে হবে। রাজকুমারের স্ত্রী বলে উঠলেন—“হাঃ হোলো—নোংরা মেয়েটা আবার সকলের সঙ্গে এসে পাড়িয়েছে দেখ—দূর হ’! আমি ত’ কিছুতে বৃকতে পারি না তুমি আবার ঐ ছোটলোক মেয়েটাতে কি জন্মে ডেকেছে!” (ক্রোধঃ)

হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হবুচন্দ্র কাব্য লেখেন

হিং-টিং-ছট্,

গবুচন্দ্র পড়েই বলেন

একবারে নট...

গবুচন্দ্র কাব্য লেখেন

হিং-টিং-ছিট,

হবুচন্দ্র কাব্য পড়ে

হেসেই হ’লেন ফিট!

হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র

আরে আরে রামচন্দ্র

কাব্য লেখা কি আর কঠিন

টোক নারে ঝটপট,

বলছি আমি কাব্য-বাগীশ

কসকে গেলেই ‘নট’।



বাজিকর

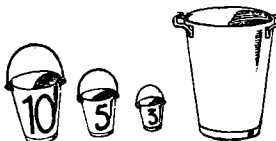
বুঝি করে রঙ লাগে

(১) ছবিতে পর পর চারটি বর্ণক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছ। চিত্রকর পর্যায়ক্রমে এই ছবি তিনটি একেছেন। চতুর্থ ছবিটি শেষ করবার আদেই তিনি চলে যান। ঐ চতুর্থ ছবিটি যদি তোমাকেই শেষ করতে বলা হয়, তাইলে কোন্ কোন্ ঘরে কি ভাবে কাজী দিতে হবে বলত !

ছুখ ধরানোর কন্ড

(২) ছবিতে একটা বড় বালতি দেখতে পাচ্ছ। ওটার প্রায় তিরিশ

সের জল ধরে। ওটার পাশেই ছোট বালতি আছে তিনটি। ঐ ছোট বালতিগুলিতে যথাক্রমে ৭শ সের, পাঁচ সের, এবং তিন সের দুধ ধরে।



যদি তোমায় বাইশ সের দুধ কিনে ঐ বড় বালতিতে করে নিতে হয় এবং যদি মাপবার ক্ষমতা ঐ ছোট তিনটি বালতি ছাড়া আর কিছু না থাকে, তা'হলে কি উপায়ে তুমি বাইশ সের দুধ কিনে নিয়ে যেতে পারবে—তাই বল ?

আসল-নকলের ধাঁধা

(১) ছয়টি রাজার মাথা বেগতে পাছ ছবিতে। ওর ছ'খানি ছবি ঠিক একই রকম এবং সেই ছ'খানিই রাজার প্রকৃত ছবি, আরগুলি ভাল। কোন্ ছ'খানি ছবি আসল আর কোনগুলি ভাল বলতে পার ?



(উত্তর আগামী-বার বেরবে)

গতমাসের ধাঁধার উত্তর

পাথর'কা বিচার

(১) তৃতীয় ছবি অন্য সেরগুলির মধ্যে তিনটি ও চারিটি ক'রে ফোটা আছে। তৃতীয় ছবিতে দ্বিত্ব একদিকে তিনটি ও অপর দিকেও তিনটি ফোটা আছে।

জুতো খোঁজার বোকা

(২) একটা পিনের চাপ্টা মাথা দিয়ে পথ ধরে চললে ধরা পড়বে। কোন পথ দিয়ে চললে সবুখে আটকে যাবে না ?

(৩) ছবিখানি উল্টিয়ে অর্থাৎ উপর দিকটা নীচের দিকে নিলে দেখা যাবে নিখোঁটির মূখ ও মাথা পাছের ডালের দিকে দেঁটে আছে আর ওর চোখ সাদা। আর সিঁহটিকে সোজা ডাববই দেখা যাবে একটা পাছের আড়ালে।



মেট্রেডে

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
প্রতিযোগিতা

উত্তরাঞ্চলে যাদবপুর বারাবাসীকে
১-০ গোলে (গোলদাতা রণজিৎ
লাহিড়ী); দিল্লিকে ১-১ গোলে
(গোলদাতা এস. পি. বহু), ১-০

গোলে (গোলদাতা জয়ন্ত নন্দী); বিহারকে ৩-১ গোলে (গোলদাতা অশোক চ্যাটার্জি ২, জয়ন্ত নন্দী ১); গোয়াটিকে ৩-২ গোলে (গোলদাতা অশোক চ্যাটার্জি, রণজিৎ লাহিড়ী, জয়ন্ত নন্দী) হারিয়ে দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দল এবার স্তার আন্তঃতাত্ত্বিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠে। ১৪ অক্টোবর বিশাখাপত্ৰনে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের মূল ফাইনালে যাদবপুর বনাম মহীশূরের খেলাটি অতিব্রিষ্ট সময় সবেও ৪-৪ গোলে অমীমাংসীত থাকার পর দু-দলই যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। পরে টেনে ফরী হয়ে যাদবপুর দল প্রথম ছ-মাস স্তার আন্তঃতাত্ত্বিক খুঁজি রাখবার অধিকার পায়। ফাইনালে বিশাখাপত্ৰনে মহীশূরের দিপক্ষে যাদবপুরের পক্ষে খেলেন এস. পি. বহু ৩টি ও জয়ন্ত নন্দী ১টি।

জার্মান অ্যাপলিট দল

তিন মাসের জন্তে ভারত সফরের উদ্দেশ্যে কুড়িজনকে নিয়ে গঠিত জার্মান অ্যাপলিট দল সম্প্রতি ভারতে আসেন। ডঃ ম্যাক্স ভানমের নৈকৃত্তে জার্মান দলটি টেন্স নামে অভিহিত সাতটি দৈত্য ক্রীড়ায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দৈত্য ক্রীড়াগুলো অহুস্তিত হয় দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, হাংগাংবাদ ও বোম্বাইয়ে। কমনওয়েলথ ক্রীড়ার আগে জার্মান দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে ভারতীয় দল বিশেষ লাভবান হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগে দুর্বলতর দলের ক্রীড়ায়ান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে। আগন্তুক দলে কয়েকজন ঈর্ষান্বিত অ্যাপলিট ছিলেন। সাতাশ বছরের ম্যাক্সভেল্ড জার্মান এর আগে কয়েকটা চ্যাম্পিয়নশিপে রেকর্ড করেছেন। ১৯৫৬ ও ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অলিম্পিক ক্রীড়ায় বোগ দেন এবং এছাড়াও পঞ্চাশটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গানে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

দিল্লিতে ভারত-জার্মান দৈত্য অ্যাপলিটিক প্রতিযোগিতায় ১৮ টি বিভাগে জার্মানী এবং ১০ টি বিভাগে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। এই প্রতিযোগিতায় দশটি ভারতীয় রেকর্ড অতিক্রান্ত

এবং ছুটি রেকর্ড স্পর্শ হয়। এর ভেতর ভারতীয় অ্যাথলিটার তিনটে বিভাগে রেকর্ড অতিক্রম ও পাঁচটি বিভাগে রেকর্ড স্পর্শ করেন।

যোধপুরে অচলিত দু-দিনব্যাপী ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিক টেন্স প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে জার্মানরা ভারতের থেকে এক পয়েন্ট এগিয়ে থাকে এবং পাঁচটি বিভাগে ভারতীয় রেকর্ড রান করেন। প্রথম দিনে দশটি বিভাগের প্রতিযোগিতায় জার্মান দল ৫২ পয়েন্ট এবং ভারতীয় দল ৫১ পয়েন্ট অর্জন করে। দ্বিতীয় দিন ভারত জার্মানীর সঙ্গে সমান সমান পয়েন্ট (৮৬) লাভ করায় এই টেন্স অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

জলদ্বারে মোট আঠারোটি বিষয়ের ভেতর জার্মান দল বাবোটি প্রতিযোগিতায় অয়লাভ করে তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখে। 'ট্র্যাক'-এর প্রতিযোগিতায় জার্মান দলের একাধিপত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়।

ভারতের মিলখা সিং চারশ মিটার দৌড়ে হাল্ফ মায়াকিম রন্ধের কাছে হার স্বীকার করেন। রেন্নে ৪৭'২ সেকেন্ডেও সময়ে দৌড় শেষ করেন। পোলভন্টে ভারতের আজাইব সিং জাতীয় রেকর্ড ও ত্রিসংস হোড়ার জার্মানীর জিগোটি উরবাক ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

কলকাতায় ১৭টি বিষয়ের ভেতর ১৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ১৭টি ক্ষেত্রেই বৈদেশিক দলের প্রতিনিধিরা দীর্ঘস্থান লাভ করেন। ভারতীয় অ্যাথলিটারা যে তিনটি বিষয়ে জরী হন, তার দুটিতে (হপ স্টেপ অ্যাও জাম্প ও হাইজাম্প) জার্মানরা অংশ গ্রহণ করেন নি।

মাজাজে জার্মান অ্যাথলিটারা ৪০০ মিটার হার্ডল এবং ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়ে এশীয় রেকর্ড রান করেন। ১৮টির ভেতর ১২টি বিভাগে দীর্ঘস্থান অধিকার করে জার্মান জীড়াকুশলীরা ভারত দলের আর একবার তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেন। হায়দরাবাসে ১৫টি বিভাগের মধ্যে ১১টি বিভাগে জরী হয়ে জার্মান দল নিষেধের অস্বাভাব্য অব্যাহত রাখে। এখানে চারটি ভারতীয় এবং দুটি এশীয় রেকর্ড রান হলেও অ্যাথলিটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আশাশূন্য উপকর্ষ দেখা যায় নি। ২০০ মিটার দৌড়ে আগত চ'জনই প্রথম এশীয় রেকর্ড (২১'৬ সেকেন্ড) অতিক্রম করেন। শটগুটেও প্রথমাগত দুর্জন পরতামন সিং কর্তৃক ১২৫৮ সালের এশীয় রেকর্ড (৪২৬. ৪ই.) অতিক্রম করেন।

বোম্বাইতে ভারতের বিরুদ্ধে সপ্তম বা শেষ অ্যাথলেটিকস টেন্সে জার্মানী অনায়াসে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এখানেও তারা ১৭টি বিষয়ের ভেতর ১২টিতে জরী হয়। ব্রাবোর্ণ কেডিয়ামে আয়োজিত এই অলুঠানে প্রায় ৬টি জাতীয় রেকর্ড রান হয়েছে।



আজ তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসে
—সব আগে বে কথা মনে হচ্ছে তা হলো—
উত্তর ভারত ও উত্তর পূর্ব সীমান্তে দৃশ্যের
কথা ।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই ধরনের
জাতীয় সঙ্কট জনকঅবস্থা এই প্রথম দেখা দিল
—আর সব চেয়ে বড় কথা এই সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টির জন্ম যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি দায়ী—মাত্র
কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সহরে পঞ্চশীল নীতি প্রস্তাবের সে একজন উৎসাহী সদস্য
ছিল । আজ সে আচোর-আচরণের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক আইনকাহন লঙ্ঘন করে পরহায্য
অক্রমণ করেছে এবং সেই কারণেই সে শুধু ভারতবাসীর নিন্দাই নয়, বিশ্বের সমস্ত শান্তি প্রিয়
রাষ্ট্রের কাছেই হেয় ও নিন্দিত হয়েছে ।

সীমান্তে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে এক ভয়ানক অস্থিরতা
এনেছে—সংশয় সৃষ্টি করেছে । এটা একটা জাতীয় সমস্যা । এই সঙ্কটজনক অবস্থার সমাধানের জন্ম
প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরীকে হৃদয়বন্ধ হতে হবে এবং অক্রমণকারীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে
হবে—আজকের দিনে এর চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কিছুই নেই ।

এই প্রতিরোধ করতে গেলে সরকারের অস্থানে নিঃসন্দেহচিত্তে যেমন সাড়া দিতে হবে,
তেমনি অপর দিকে আমাদের সমবেতভাবে সাড়া জাগাতে হবে জনসাধারণের মধ্যে । ভারতের
প্রতিটি জনসাধারণকে শেখাতে হবে আজকের তাদের দায়িত্ব কতটা আর কি কর্তব্য । আজ সকলেই
ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এগিয়ে আসছেন, এগেছেন সরকারের সাহায্যে—আনন্দের কথা । তবুও
তাদের মধ্যে আরো চেতনাইষ্ক করতে হবে, জাতির পবিত্র সম্পদ যে স্বাধীনতা তাকে বুকের রক্ত
দিয়ে বাঁচাতে হবে । বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশ যে কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে,
সংগ্রাম করে, আজ মাত্র কয়েক বছর আগে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান
তা হৃদয় দিয়ে যদি অঙ্গভব করতে না পারা যায়, তাহলে জীবনটাই ব্যর্থ ।

তাই বলছি, আজকের দিনে এই জাতীয় সঙ্কটে তোমরা নিজেকে নিসিদ্ধ রেখো না । যে যেমন
ভাবে পারো, টাকা পরিশ্রম, দেহের শক্তি দিয়ে, মনোবল দিয়ে, সবতোভাবে সাহায্য করবার চকু
এগিয়ে এসো ।

এখন এই দুদিনে সকলেরই উচিত হবে সাময়িক আনন্দের সব ব্যর্থ বন্ধ করা । তোমরাও

দেশের কথা ভাবতে দেখো, বুঝতে দেখো, এগিয়ে এসো। তোমাদের ছোট হাতে, ছোট মনে, যে সেবা আছে, যে শক্তি আছে, তা নিঃশেষে আম দাও দেশের জন্তে। আমাদের জাতীয়ত্বকে তোমাদের নিজের দায়িত্ব পালন থেকে তোমরা বিরত থেকে না। সীমান্ত হানাদারদের অস্ত্রায় অক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য হলে হলে যে সব অওয়ানরা নিঃশেষে প্রাণদান করছে, তাদের জন্য ভাবতে হবে, তাদের আত্মীয়স্বজনের বেবনাকে ফুরিয়ে দিতে বুঝতে হবে।

প্রচণ্ড দীনের মধ্যে, প্রতিজ্ঞা অবস্থার মধ্যে দিয়ে, যে নওয়ানরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করেছে, তাদের সামান্য সুখ-স্বাস্থ্যের সেবার জন্য যে দান সম্ভব তা নিজে বা প্রতিবেশীদের উদ্ধৃত্ত করে পাঠিয়ে দাও। তোমরা ছোট হলেও স্বাধীন দেশের নাগরিক—তুলো না তোমার দেশের, তোমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তোমার সামান্য শক্তিকে নিয়োজিত করো—সে সামান্য হলেও অসমান্য হয়ে দেখা দেবে।

ইতিমধ্যে আবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জন্মদিন ১৫ই নভেম্বর দেশব্যাপী শিশুদিবস হিসাবে প্রতিপালিত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণন জাতির উদ্দেশে এক বক্তার ভাষণ দিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ব্রীহস্পতি পেন তার বক্তার ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর বীর্ষবীবন কামনা করে বলেছেন : “আজ আমাদের চোপের সামনে যারা বড় হচ্ছে, কাল তারা ই নেবে দেশের ও সমাজের ভার—তারা ই আইন তৈরী করবে, তারা ই শাসন করবে দেশ, তাদের উপরেই নির্ভর করবে জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি।

আজ দেশ যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তখন আমাদের এক চরে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাড়াতে হবে।”

হৃদকামনার

তোমাদের—মধুদি

ঐতিহাসিক সরকার কর্তৃক ১৭ বক্স চাটুজো স্কিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রবু প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্কিট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০.৪৫ নয়া পয়সা।

* ছেন্নেমেরদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

পৌষ-১৩৬৯

[৯ম সংখ্যা

জানি আমি মানার হবে জন্ম

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

“এই সময়ে ঘুমিয়ে আছে থাঙ্গা,”

বললে শেয়াল—“দেখিয়ে দেবো বাঙ্গা।

শীগগির এসো ডাগন দাদা,

পারবে না সে দিতে বাধা।

এক ঝটকায় করবে কুপোকাং।

ভাগটা আমার মনে রেখো, করলে বাজী-মাং।”

শেয়াল চলে পথ দেখিয়ে, ডাগন পিছু পিছু।

সান্দ্রোপান্দ্রো তার পিছনে কম তারা নয় কিছু!

সিংহ-গুহার সামনে এসে চোখ-ইশারা ক’রে

শেয়াল পড়লো স’রে।

বিরোট গুহায় ডাগনগুলো ঢুকে অন্ধকারে

পশুরাজের পায়ে কামড় মারে।

স্বপন বোরে সিংহ ভাবে—
 ইঁদুর বুঝি—জ্বালিয়ে থাকে !
 সজোরে এক ল্যাজের ঝাপট মেরে
 নিশ্চিন্তে চোখ বুজে পাশ করে ।
 ল্যাজের ঘায়েই কতকগুলোর চোখ হ'লো প্রায় কাণা
 তার ল্যাজেতেই এতটা জোর ছিলোই না তা জানা ।
 কাঁপিয়ে পড়ে পশুরাজের ঘাড়ে ।
 চমকে জেগে সিংহ ছাখে—আরে !
 এ কোন্ জানোয়ার,
 ঘুমন্তকে মারতে আসে—দিই শিক্ষা তার ।
 চোখ দুটো তার উঠলো জ্বলে, কেশর উঠলো কেঁপে ।
 ছংকারেতে বন উঠলো কেঁপে ।
 বাধলো লড়াই—গুহাও কাঁপে ভূমিকম্পের মত ।
 একা সিংহ—আর এক দিকে ড্রাগন শত শত !
 দূরে শেয়াল দাঁড়িয়ে বলে—“এবার বাঁচো দেখি !”
 খানিক পরে দেখে ভাবে—হ'লো আবার একি !
 ড্রাগনগুলো পিলপিলিয়ে
 বেরিয়ে পালায় প্রাণটি নিয়ে
 কামড়ে আর থাবার ঘায়ে ক্ষত ও বিক্ষত ।
 মারাও গেছে হয়তো কয়েক শত ।
 বীর সিংহ বেরিয়ে আসে রক্তমাখা দেহে ।
 তাই না দেখে শেয়াল আসে ধেয়ে ।
 প্রণাম ক'রে কয়—
 “জানি আমি মামার হবে জয় ।”

বাসা-ভাঙা

ঐপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শীতের দিনে ঝাওরা-দাওয়ার পর দক্ষিণের বায়ুস্রাব ইন্ডিস্ট্রিয়ারে শুয়ে আরাম করছি। আরাম মানে ধবরে? কাগজ পড়া—মঞ্চথলে আমরা তো ভোর না-হতেই কাগজ পাইনে—আমাদের পেতে দুপুর হয়। চীনের আক্রমণ নিয়ে মনটা খারাপ—ভাবছি এই যারা কিছুকাল আগে বন্ধ বলে গলা জড়িয়ে ধরেছিল—আজ তারা গলা কাটবার জন্যে এগিয়ে আসছে। কথতেই হবে। কাগজ পড়ছি...

এমন সময় গুনি বাড়ির ভিতর বড় বউমার ঘরে কাদের সঙ্গে কাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঠিক ঠাওরাতে পারছিনে কিসের যুদ্ধ। বনু চৈতিয়ে বলছে, 'তোদের মেরে তাড়াবো। রোজ রোজ বলি এখানে আসবিনে—কথা কানে যায় না।'

টুল্কো তার পরিচিত তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করছে। বলছে, 'কামড়ে ছিঁড়ে খাবো, যদি না বের হ'স।'

এই সব চৈচামেটি ছাপিয়ে বন্ধনে আওহাজ কানে এলো : 'বলি ও বনুবারু—তুমি ক'দিন এসেছ এ বাড়িতে গুনি—ঐ তো সেদিন এলে পুঁটলি হাতে করে—ঝাড়গ্রাম থেকে—পুঁটকে ছেলে। আজ কিনা আমাদের ওপর চোখ রাঙাও।...আর তুই বেটা টুল্কো—এঁটো পাতা জড়িয়ে খেতিস—আজ বাবুর বাড়ি আস্রর পেয়ে, গলায় মালা পরে, শাবান মেখে ডব্বর হয়েছিস—আমাদের বলছিস—বেরিযে যাও।'

টুল্কো চৈচিয়ে বলে উঠলো—'বেরিযে যাবি কিনা বল—নইলে—'

উত্তরে গুনলাম, 'নইলে কি করবি—মই দিযে উঠে ঘর ডাঙবি নাকি—চারপেয়ে জানোয়ার কোষাকার!...তুই একবার বেরিযে গিয়ে একদিনের দানাপিনে জুটিয়ে আন দেখি। কালু, ভুলু, বেকির দল তোমার সাধা কোট ফাতরা কাঁতরা করে বেবে না? তোরা দাদার কি দশা হয়েছিল তা তো তুই জানিস নে! তোরাও সেই দশা হবে। বেরিযে একবার যা-না।'

বুঝলাম বনু টুল এলে তার উপর উঠে হাঁকছে—'এখনো ভালো চান্স তো ঘর ছাড়।' কানে গেল কে বেন বলছে, 'বনু ভাই—রাগ করো না। তুমিও দিবি ঘর পেয়েছ, তোমার কি কেউ বেরিযে যেতে বলে? তবে আমাদের উপর এমন খাল্লা কেন? ঘর নোংরা হয়? এই না। কি করবে বলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খাবার আনতে হয়—তারা তো এখনো বাইরে বের হয়ে ঠুকরে খেতে শেখে নি। আমিও তো এখানে জন্মেছিলাম; বাপ মা সব চলে গেছে। সেবার ঝড়-বাতলে বের হয়ে আর কিরতে পারে নি। বনুভাই আমাদের তাড়বার জন্যে কে তোমার বলেছে?'

হল বলল 'বউমা হাসাচল। তিনি হাসল—দান জগতে হওয়ার জো নেই - হোয়াস দান

পিশীর দল আসেন তার সঙ্গে মাসভুক্তো ভাইবোন, পিসভুক্তো ভাইবোন, খুড়ভুক্তো ভোষ্ঠভুক্তো আত্মীয় কুটুম্ব সব এসে যান, ডোজ করতে । কেন রে এ বাড়িতে এত উপদ্রব ।’

উত্তরে মোটা গলায় কে বেন বললে—‘বেধ বন্—বলসে তোমার বউদিদিকে—আমরা নড়চিনে । ওবে মুখ্য—তোমার বউদিদার শাশুড়ী ঐ বে গিন্নীমা—তিনি যখন এসেন এ বাড়িতে—সে আশ কত বছরের কথা—তখন থেকে আমরা বাপপিতামহের সময় থেকে এই বাড়িতে আছি ।’ বন্ উপর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তুমি আমার কে ? তোমার বয়স কতো শুনি ? আদিকালের বদ্বীড়ী সব খবর রাখেন ।’ উত্তর শুনলাম । সে বললে, ‘আমি আমার মার কাছে শুনেছি—তিনি শুনেছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে । আমরা ক’পুরুষ এখানে আছি জানিস ? এতদিন কেউ কিছু বললে না, আজ নুতন বউ এসে বলে কিনা আমাদের ঘর ছাড়া করবে ।’

এমন সময়ে ব্যুতে পারলাম বউমা ঘরে ঢুকলেন । তিনি এসেই বললেন, ‘কি রে বন্ এখনো ঘর সাক করিস নি ।’ সে বললে, ‘বউদি, আমি আর কত সাক করবো ? এই সকালে ইন্দুদি ঘর ঝাঁটিয়ে, মুছে গেল—আর এই বেধ না—এর মধ্যে ঘরের দশা কি করেছে ! বলছি ঘর ছাড়তে—তা বলে কি আনো বউদি ?’

‘কি বলে শুনি’, বললেন বউমা । বন্ ঢোক গিলতে গিলতে বলে, ‘বলছে কি আনো—ওরা বাপপিতামহের আমল থেকে এখানে বাস করছে ওদের অধিকার জন্মেছে ।’

এমন সময়ে একটা পুরুষের গলা শোনা গেল । সে বলছে, ‘বউমা, আমরা হা-ঘরে নই, ভবঘুরেও নই । আমাদের মাতের নানা শাপা শীতের সময় আসে এদেশে—গরমের সময়ে চলে যায় অস্ত্র দেশে । তারা হা-ঘরে অর্থাৎ হা-ঘর হা-ঘর করে ঘুরে বেড়ায় । আমরা ঘরের মধ্যে ছাড়া কোথাও বাস করতে পারি নে । একটুখানি কুলুবি, একটুখানি খোপ হলেই ছানাপোনা নিয়ে বাস করতে পারি । যাচ্ছে বাসা বাঁধতে ভয় করে—ঝড়ের সময় বা সোলা দেয় । দেখনি বাবুই অমন হুম্বর করে ঘর বানায় ; কিন্তু তুষ্টি পড়লেই ভয়ে ঘরের বাইরে এসে চুপটি করে বসে থাকে । আমরা তাই ঘরেই থাকি—রাগ করো না বউমা । ধান খাই, গুণ গাই । আমাদের এই পাকা বাড়িতে থাকতে মেখে, কুটুম্বরা হিংসা করে কম ? দেখো না—যাকে মাঝে এই ঘর দখল নিয়ে যুদ্ধ হয়ে যায় । আমরা ছাড়বো কেন আমাদের দেখলি বাড়ি । তুমিও রাগ করো না । আমরা আর কাউকে ঢুকতে দেবো না, আর আমরাও নড়বো না ।’

এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল—খোকন এসে বলছে, ‘দাদাই, ওদের ঘর-ছাড়া করতে দেবো না আমি । তুমি মাকে বলো । রোজ এই বালির মধ্যে ঘান করে, মল জমলে কী খেলাটা করে । আমার ঘুম ভালো লাগে । ওরা থাকবে ওখানে ।’

সীল ও ওয়ালরাসের কথা

ত্ৰিপ্রবোধবন্ধু সেনগুপ্ত

সীল জলচর প্রাণী। বছরের বেশীর ভাগ সময় জলেই কাটায়। বাওয়াদাওয়া এমন কি ঘুমও অনেকে জলেই সারে। কিন্তু সীলরা স্থলচর স্তন্যপায়ী জীবদের সমপোত্রীয়। এদের গায়ে লোম আছে এবং বাচ্চারা ওদের মায়ের দুধ খেয়েই বড় হয়ে ওঠে। জলচর জীব হলেও ডাকার মারা ওরা কাটাতে পারেনি। বছরে একবার এদের ডাকার আসতে হয়—মিলন কতুতে ও বাচ্চা হবার সময়। হুমেক থেকে কুমেক পর্যন্ত বিবৃত নির্ধন সমুদ্র তীরের নানান আয়তায় এদের দেখা যায়। তবে প্রধানতঃ নীচ-প্রধান মেরু অঞ্চলেই এদের বাস।

সীলদের জীব-বিজ্ঞানীদের ডাকার বলা হয় পিনিপেডিয়া। এদের পা নেই। তবে সামনে ও পিছনে দুটি করে পাখনা আছে, এবং পাখনার আঙ্গুলগুলো ফোড়া ও ঢেউ খেলানো। এদের পাখনাতে ধারাল নখ আছে এবং দাঁতগুলোও বেশ ছুঁচাল। শরীরের তুলনার পাখনাগুলো ছোট হলেও আঙ্গুলগুলো লম্বা ও ফোড়া হওয়াতে এরা দাঁতেরে বেশ পটু এবং বস্তার পনের মাইল দাঁতেরে যে কোন দ্রুতগামী মাছকেও ধরে ফেলতে পারে। এরা পিছনের পাখনা দুটো নাড়িয়ে নাড়িয়ে মাছ ও ডিম্বির মত দাঁতার কাটে। সামনের পাখনা দুটো ব্যবহার করে, জলে নিক-পরিবর্তনের সময়। সাধারণতঃ এরা মিনিট পনের পর্যন্ত এক নাগাড়ে জলের নীচে থাকতে পারে। তারপরই ভেসে ওঠে নিঃশ্বাস-গ্রহণের জন্য এবং সমুদ্রের দু'শ ফিট পড়ীর পর্যন্ত বাতাহাত করে বাস্তবের সন্ধানে।

সীলদের হাড়গোড় নিয়ে জীব-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এদের হাড়গোড়ের সঙ্গে স্থলচর স্তন্যপায়ী জীব কুকুরের হাড়গোড়ের বেশ একটা মিল আছে।

সাধারণতঃ সীলদের দুভাগে ভাগ করা যায়—ইয়ারড সীল ও টু সীল। ইয়ারড সীলদের কান আছে এবং সে-দুটো বাইরে থেকে দেখা যায় আর টু সীলদের কানের বদলে দু'পাশে দুটো ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দুটিই এদের কানের কাজ করে। কানওয়ালা সীলদের বলে হলো—কার সীল ও নী লায়নরা। বাংলা করলে হবে—লোমওয়ালা সীল ও সিঙ্কু সিংহ। সব সীলদের গায়ে লোম থাকলেও 'কার' সীলদের গায়ে মোটা মোটা লোমের নীচে একটা নরম লোমের আচ্ছরণ আছে। এরা আবার 'সি বিয়ার' বা সিঙ্কু ডব্লু নামেও পরিচিত। আর 'সি লায়নরা' সিঙ্কু সিংহ নামে পরিচিত হলেও, ডাকার সিংহের সঙ্গে চেহারাৰ এদের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কান ওয়ালা সীলরা পিছনের পাখনা দুটো সামনে ঝেঁকিয়ে এনে পায়ের মত ব্যবহার করতে পারে এবং সামনের ও পিছনের পাখনার সাহায্যে ডাকার লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ দ্রুত চলতে পারে।

এগিরে গিরে কোমল হয়ে ভেঁকে তাকে তার দলে আসার জন্য আহ্বান জানায়। যেই স্ত্রী সীলটি উপরে উঠে এলা, অমনি তার সামনের পাখনা দিয়ে স্ত্রী সীলটির পিছনে এমন এক খাঙ্গড় লাগায় যে স্ত্রী সীলটি আচমকা পড়ে গিরে তার হারেমে গিরে ঢুকল। একজনের হারেমে কোন স্ত্রী সীল অন্য পুরুষ সীলের হারেমে যদি চলে যেতে চায়, তবে পুরুষ সীলটি স্ত্রী সীলটিকে ঘেঁরে কিরিরে আনবে। যদি পাশের কোন পুরুষ সীল পলাতক স্ত্রী সীলটিকে চায়, তখনই শুরু হয়ে যায় ভয়ংকর যারামাণি ও কামড়া-কামড়ি। অনেক সময় স্ত্রীরা ও বাচ্চারাও আহত হয় এই ঝগড়া ও কামড়া-কামড়ির সময়। পাছে নিষেধের হারেম হাতছাড়া হয়ে যায়, সেজন্য পুরুষরা তিন মাস নিষেধের হারেম ছেড়ে কোথাও যায় না, এমন কি কিছু খায় না পর্যন্ত।

স্ত্রী কার সীলরা তীব্র আসার কয়েক দিন বাদেই ওদের বাচ্চা হয়। বাচ্চারা ওজনে পাঁচ ছয় শেরের মত হয়ে থাকে এবং তাদের সারা গা কাল লোমে ভর্তি থাকে। কার সীল মায়েরা বাচ্চাদের দিকে তেমন নজর দেয় না। ওরা অন্তান্ত প্রাণীদের মায়েদের মত বাচ্চাদের চেটেপুটে পরিকারও করে দেয় না। বাচ্চারা তাদের মায়ের দুধ নিজেরাই খুঁজে নিয়ে খেতে শুরু করে।

বাচ্চা হবার প্রায় সপ্তাহবানেক বাদে বাচ্চাদের ফেলে ওদের মায়েরা বাবারের সন্ধানে সমুদ্রে চলে যায়। সে সময় এক নাগাড়ে ছয় সাত দিন পর্যন্ত সমুদ্রে থাকে। সেই সময় বাচ্চারা উপোসই দেয়। তোমরা ভাবতে পার বাচ্চারা এতদিন দুধ খেতে না পেয়ে নিশ্চয়ই মারা যায়। কিন্তু তা নয়। আগেই বলেছি সীল মায়েদের দুধ খুব পুষ্টিকর এবং বাচ্চা সীলরাও এক নাগাড়ে অন্তান্ত প্রাণীদের বাচ্চাদের চেয়ে বেশী দুধ খেতে পারে। সীল মায়েরা বাবার আগে বাচ্চারা এত বেশী পরিমাণ দুধ খেয়ে নেয় যে, ওদের শরীর লোমশ ফুটবলের মত বেবায়। বাচ্চারা সেই সময় চলাফেরা পর্যন্ত করতে অস্বীকার বোধ করে। তিন-চার দিন কেবল ঘুমোয় ও বাড়তে থাকে। সীল মায়েরা, যারা বাবারের সন্ধানে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে অনেক বাচ্চাদের মধ্যে নিজের নিজের বাচ্চাটিকে ঠিক বেছে নেয়। ওরা কিছুতেই অন্যের বাচ্চাকে নিজের দুধ খেতে দেয় না। অনেক সময় মা-সীলদের মধ্যে অনেকে সমুদ্রে নানান বিপদে পড়ে আর ফিরতেই পারে না। তাদের বাচ্চা শুধন শুকিয়েই মরে।

এলিফেন্ট সীলরাও হারেম রাখে। এদের জীবনযাপন প্রণালীও অনেকটা কার সীলদের মত। যে কয় মাস ডানায় থাকে, এদের মধ্যেও পুরুষ-পুরুষে চলে সমানে লড়াই ও কামড়া-কামড়ি। সি-লারনরা ও গ্রে সীলরাও হারেম রাখে।

মাছের ছাড়া সীল ও ওয়ালাসদের প্রধান শত্রু হলো কিলার তিমি, শেত ভল্লুক ইত্যাদি। হাঙ্গররাও বেশ কিছু সংখ্যক সীল হত্যা করে। মাছের বহুদিন থেকে সীল শিকার করে আসছে—চামড়া ও চর্বি লোভে। মাছের বেহিশাবী শিকারের ফলে—হারপ, কার, এলিফেন্ট প্রভৃতি সীল

নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। আজকাল সীল-শিকার নিবন্ধ হওয়াতে এদের আবার বাৎসরিক আত্মনা-
ওলোতে বেধা বাড়ে। প্রিবিলিফ ধীপটি এখন আমেরিকান গভর্নমেন্টের অধীন। এদের নিয়ে রীতিমত
গবেষণা চলছে এখনে। প্রতি বছর বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় হু'হাঙ্গার সীলের বাচ্চাদের পাখনার খাত্ত-
নির্মিত কড়া পরিয়ে দেয়—বাতে বুঝতে পারে ওদের মধ্যে সামনের বছর কতজন ফিরে এলো,
বাচ্চাদের বয়েস হলো কত ও কত তাড়াতাড়ি তারা বাড়ল। প্রতি বছর এই ধীপে তিন বছর বয়স
কিছু সংখ্যক পুরুষ সীলদের হত্যা করা হয়—চামড়া ও তেলের জন্য বৈজ্ঞানিকদের তত্তাবধানে। কারণ
দেখা গেছে, বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুরুষ সীলদের চেয়ে অনেক বেশী পুরুষ সীল প্রতি বছর লক্ষ-
গ্রহণ করে। যে ফার সীলরা বিলুপ্তির পথে চলেছিল, আজ সেই প্রিবিলিফ ধীপে প্রতি বছর প্রায়
তিব্বিশ লক্ষ ফার সীল লভ হয়।

লাল চৈনিক

ঐচ্ছ্যত চট্টোপাধ্যায়

শোনো ভাই, জেনে রাখো, তারা লাল চৈনিক,
কথা দিয়ে যারা কথা বদলায় দৈনিক,
মুখে এক পেটে আর, ঠোঁটে হাসি মিষ্টি,
অন্তরে সংসারে ছায় শ্বেদ দৃষ্টি,
অপরের সুখ দেখে জ্বলে পুড়ে হয় খুন,
ভাতো করে ক্ষতি তার—যতো খায় তার হুন;
সত্যতা, ভব্যতা, চরিত্র নেই তার,
দস্তে সে কেঁপে হ'ল দশানন লঙ্কার।
মিথ্যার মহারাজা, শিরমণি চাতুরীর,
বিশ্বাস করেছে কি—পিঠে খাবে বিষ-ভীর;
বাইরের রং পীত, ভেতরটা কালো তার,
মানুষের চেহায়ায় বর্বর জানোয়ার;
আজ শাস্তির দূত, কাল হয় সৈনিক,
শোনো ভাই, জেনে রাখো, তারা লাল চৈনিক ॥

পাখীদের কূচ-কাণ্ডসাজ

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আমাদের বাড়ীর সামনের একটা মাঠে পাখীদের কূচ-কাণ্ডসাজ চলে। এ-ব্যাপারটা হঠাৎ সেদিন চোখে পড়ল। অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য! কতটুকু ছোট কীব, তাদের মধ্যে কেমন মূন্দর শিকার ব্যবস্থা।

মাগুহের ঘরে শিঙরা বনন প্রথম হাঁটতে দেখে, বড়রা তার ওপরের দাদা-দিদিরা তাদের হাত ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটতে দেখায়। শিঙরা যে একদিন বড় হবে, সব কিছু শেখার আগে তাদের যে হাঁটা শিখতে হবে এ-কথা সবাই জানে। আর কিছু না শিখলেও মাগুহ মাগুহের মত ছ' পায়ে ভর দিয়ে মোজা হয়ে ঝাঁড়াতে শিখবে, হাঁটতে শিখবে। তা না হলে সে মাগুহের কোন সমাজেই মিশতে পারবে না। আকারে মাগুহ হচ্ছেও, প্রকারে এবং চলাফেরার মাগুহের মত নয় বলে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকবে। তাই সমস্ত সেনেই শিঙদের 'চলি-চলি' করে হাত ধরে চলা শেখাবার ব্যবস্থা আছে।

মাগুহের মধ্যে যেমন সোজা হয়ে ঝাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখার অবশ্য দরকার আছে, পত্নদের মধ্যে তেমন লাক দিতে ও শিকার ধরতে শেখার প্রয়োজন অনেক বেশী। পাখীদের মধ্যেও সেই রকম উড়তে শেখাটা প্রথম কাজ। তা না হলে তারা বাসা থেকে বাইরে আসতে পারবে না। বাইরে আসতে না পারলে তাদের পান্ডুরবোর সন্ধান করাও হবে না। বাসার মধ্যে তো আর খাদ্য জমায় না। বহু দিন ছোট থাকে তাদের মায়েরা খাবার মুখে করে এনে তাদের খাওয়ার। চিরকাল তো আর মায়েরা অমন করে খাওয়াবে না। তাদের বাইরে যেতে হবে, খাবারের সন্ধান করতে হবে, সুতরাং তাদের উড়তে শিখতে হবে। এটা শেখানর ভার তাদের অভিভাবক অর্থাৎ তাদের মায়েরের ওপর।

উড়তে শিখবে, হাওয়া চিনতে শিখবে, খাবার চিনবে, কোথায় পাওয়া যায় তা শিখবে, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয় তা শিখবে, তাদের শত্রু কারা তাদের চিনতে শিখবে, শত্রুদের কাছ থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে শিখবে। সুতরাং তাদের শেখাবার বিষয় অনেক। এত সব পাঠ তারা অল্পদিনের মধ্যে শিখে তৈরী হয়ে যায়। এই সব বিষয় শিখতে তাদের চাই মাঠ।

আমাদের এ-মাঠটা এ-কাজের পক্ষে বেশ উপযুক্ত। ঝারগাটা বাড়ীর পিছনে হলোও বাড়ীর ভিতরের দিক থেকে সেটা সামনে। দালানে ঝাঁড়িয়ে মাঠের জিনিষ সব দেখা যায়। গ্রামটি বেশ নিরিবিবি; সকালের দিকে লোক বড় দেখানে যায়ই না। বিকালে বরং ছেলেরা সেখানে খেলা করে, লোকজনও কিছু কিছু হেঁটে চলে যায়। সূর্যোদয় হতেই বোন্ধুয়ে ঝারগাটা ভরে যায়।

ঘাসের ওপরে দু' চারটে ছোট ছোট আগাছা বেন সজীব হয়ে আছে। খেলাধুলার পরিবেশ ভারী হ্রস্ব, ডোরের হাওয়ায় নানা রকমের পানী এমিক-ওমিক ঘুরে বেড়ায়, আহাতির স্থান করে।

এদের মধ্যে আবার জাতি বিভাগ আছে, সমাজ আছে। একটা জাতি কখনও অপর জাতির সঙ্গে মিশবে না, অপরের সমাজে বাবে না। বাসস্থানের বেলাও সেই ব্যবস্থা। এক জাতির বাসার পাশে আর এক জাতি এসে বাসা বুনবে না। সকলেই বার-বার খজাতি নিয়ে সমাজ পড়ে তোলে। কাজেই বেড়াতে যখন বাবে, নিজে সমাজের লোকদের সঙ্গেই বাবে।

সেদিন সকালবেলা দেখলাম এক জাতের অনেকগুলো পানী—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা হবে, এক জায়গায় চূপ করে বসে আছে। কি ব্যাপার, এরা এখানে বসে আছে কেন? কোন কাজ নেই, ঘুবে কোন শব্দ করছে না, তবে কি হচ্ছে ওদের ওখানে? এরা কি সভা করতে বসেছে? দুটো একটা শব্দ করবে তো, তাও তো নেই। কাকেরা ওই রকম মাঝে মাঝে সভা করতে বসে যায়। তাদের সভা প্রায়ই বিকেলে বসে, সকাল বেলাটা কাজকর্মের সময়, এখন বাবার যোগাড় করতে হবে। এ-সময়টা ওরা সভা করে নষ্ট করে না। কিন্তু এরা তো কাক নয়, এগুলো যে সব চড়াই পানী। ওইটুকু ভাবতে-না-ভাবতেই দেখা গেল কতগুলো পানী মাটি থেকে হাত দুই তিন ওপরে উঠে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। ও! ওগুলো তো সব বাচ্চা। ওরা উড়তে শিখছে। বাঃ, কি হ্রস্ব! তাদের মায়েরা সব চূপ করে বসে আছে, আর ওরা বাবে বাবে মাটি থেকে খানিকটা করে ওপরে উঠছে, বেশ ভেসে ভেসে ওড়া অভ্যাস করছে, আবার কান্ড হ'য়ে নেমে আসছে। তারা উড়ে ঘুরে কেউ বাচ্ছে না অব্যাহার মতন, শাসনও কাউকে কিছু করতে হচ্ছে না। বড়টুকু আরও তাদের মায়েরা জুড়ে বসে আছে, ততটুকুর মধ্যেই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে! সে জমিটা বোধহয় পাঁচ সাত হাতের বেশী হবে না।

উড়তেই যদি শিখছে তবে বাসা থেকে ওরা উড়ে এল কেমন করে? আপনা হতেই প্রব্রুট মনে এল। পানীরা তো তাদের বাচ্চাদের কোলে করে আনতে পারে না, তবে কেমন করে নিয়ে এল ওদের মাঠের মধ্যে? প্রব্রুট উত্তর মিলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিসের একটা শব্দ শুনে ওরা সব উড়ে চলে গেল। বাবার সময় দেখা গেল, আগে চলেছে একটা মোটামোটা পানী, তার পেছনে দু'দিকে দু'টো লাইন করেছে ওই বড় পানীরা। লাইনটা ঠিক কাতকরা ৮-এর (<) মত। তার মাঝবানের আরগাটা ভর্তি করে রেখেছে সব বাচ্চারা। ছ'পাশের পাখার কাপ্টায় এদের সব উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তারপর বার-বার বাসার সামনে মায়েরা যেই ঢুকে পড়ছে, তার-তার বাচ্চারাও ঠিক হাওয়ার টানে ঢুকে বাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে যে ওরা দলের মধ্যে ওদের মায়েদের ঠিক করে রাখে এইটেই আশ্চর্য। বোধহয় চলে বাবার সময় বাচ্চারা এগিয়ে-পেছিয়ে নিয়ে বার-বার মায়েদের

কাছে কাছে থাকে। হয়তো ভুল করে। এরকম ভুল তো মানুষের শিতরাও করে থাকে। ভুল করে আর একজনকে কোলে গিঁথে বসে, শেষে ভুল বুঝতে পেরে কোল থেকে উঠে গিয়ে ভুল সংশোধন করে।

চড়াই পার্বতীর কূট-কাণ্ডরাজ এ মাঠেতে আরও দুই একদিন দেখা গিয়েছিল। মাঠটার গাছপালা দেখকম না থাকলেও, পচা-কলা কারাগার মাটি কেলে ভমিটাকে উঁচু করে নেওয়া হয়েছে। তাই পোকামাকড়ের বাসা এখানে অনেক। পার্বীর মেলাও লেগে যায় অনেক সময়। এরা পোকা-মাকড়, ষড়্ভিৎ-এর সন্ধানে চারদিক দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দোয়েল, কিলে, শ্রামা, পাপিয়া—এ প্রায় সব সময়ই দেখা যায়। টিরা পার্বী এখান দিয়ে বাতায়াত করে বটে, কিন্তু নামে না বড়। দুই-একবার সকালে শালীকের কূট-কাণ্ডরাজ দেখা গিয়েছিল। তারাত্ত বাচ্চা নিয়ে এসেছিল উড়ন দেখাতে। আর জাতের পার্বীদের মধ্যে এরকমটা দেখা যায়নি। এক সঙ্গে দল বেঁধে সভা করতেও আর কাউকে দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে কাকেরা বংগ বসে সভা করে। সেটা ততো সব কারগাতেই সম্ভব, হয়েও থাকে তাই। —

এই মুহূর্তে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ভাষাটাকে আরো চকচকে করে,
সূচীমুখ বক্তব্য,
গলা উঁচু করে, না হয় না হোক—
সুরটা সভ্য-ভব্য।
তুমি হুঁয়ার সৈনিক এক,
আর পরিচয় মিথ্যা—
এই মুহূর্তে এই সম্বোধি
ঝলসে উঠুক চিত্তে।
বুকের দুর্গে ছিল এতদিন
যে আবেগ অবরুদ্ধ,
লেখনীতে করো সফার তাকে
ভীষ্মতা সব শুদ্ধ।
আমার স্বাধীন রাজ্যে
হামলা দিয়েছে আচমকা ঐ
দুঃসমন-দল আজ যে।

ওরা নৃশংস তাতার দস্যু,
নরকের কীট ঘৃণ্য
পঞ্চশীলের তণ্ডামি, নেই
আচরণে কোনো চিহ্ন।
মুখোলের আড়ে হাড়রের হাঁকে
চিনতে পেরেছি সত্তা,
কুখতে এলো রে প্রাণ-গল্ফায়
জোয়ার কি অনবত্ত।
হিমালয় থেকে কুমারিকা এক
মহা জীবনের সর্ভে
জন-সমুদ্র উজ্জাল। পণ :—
মারতে কিংবা মরতে।
প্রাণ দেবো, দেবো রক্ত,
দেখবো হিংস্র ভাগনের বিষ
দাঁত কত বড়ো শক্ত!

রাজা

শ্রীশ্রীশ্রীকুমার শুভ

আজকে আমি রাজা, বিরাট রাজা ।

নামিয়ে মাথা দাঁড়াও ভয়ে সবাই,

নইলে পাবে সাজা ।

মাথায় আমি পরেছি লাল মুকুট,

শক্ত হাতে টিনের অসি অটুট,

বাঁশের ছোরা কেলে কোমর থেকে,

নাগরা পায়ে গর্বে আছে বেকে ;

পরেছি সব পোশাক দামী দামী,

ইটের সিংহাসনে জাঁকিয়ে থাকি,

ইচ্ছে মত আমি ।

ছড়িয়ে আছে রাজ্য বহুদূর,—

উঠোন জুড়ে সভায় শালিখ চড়ুই

তোলে নানান সুর ।

ভুলো পুষি হয়েছে তাল-বেতাল,

পায়রা ভয়ে রব ছেড়েছে ‘সামাল’,

ঘারের পাশে টগরটাপার শাখায়,

আমার কাতিগাথা বাজে হাওয়ায় ;

বিচারপ্রার্থী যারা এসে এখন,

শাস্তি দেবো নীতি স্থায়ের তুলায়

ক’রে দোষের ওজন ।

আমার কাছে গুণী পাবেন মান,

করবো সভা রত্ন বেছে বেছে

দেবো যে ঘাই চান ।

ছঃখাজনের হুঃখ ঘোচাবার

জন্মে খোলা থাকবে কোষাগার,

ঠেলাগাড়ি চেপে ছদ্মবেশে

দেখবো প্রজার কষ্ট হয় কি দেশ ;

টের পাবে সব রাজ-প্রতাপের বীজ,

মাকে মন্ত্রী ক’রে নির্ভাবনায়

চালাবো রাজ-কাজ ।



গোলাপ-পাপড়ী

(বড় গল্প)

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মেয়েটি চোখের লল কেলেতে-ফেলেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার ছিলেন বড় ভালো মানুষ, তিনি মেয়েটিকে ডেকে বললেন, “তুই কীদিস নি। বল তোর মস্তে কি আনতে হ’বে। এমন কিছু আনতে বল যা নিয়ে আমার সঙ্গে কেউ ঝগড়া করবে না—আর যা পেলে তুইও সন্তুষ্ট হতে পারবি।”

গোলাপকুঁড়ী বললে, “আমার মস্তে একটি পুতুল—একটি ছুরি আর একটি ছুরি খার করবার পাখর নিয়ে আসবেন। কিন্তু যদি আমার জিনিস আনতে তুলে যান, তা’হলে ফেরবার পথে যে নদীটি প্রথম পড়বে সে নদী আপনি পার হতে পারবেন না।”

রাজকুমার মেলায় চলে গেল, সকলকার জিনিস কিনলেন কেবল তুলে গেলেন গোলাপকুঁড়ীর জিনিস কিনতে।

ফেরবার পথে রাজকুমার সেই প্রথম নদীর কাছে এসেছেন—অমনি উঠল ভীষণ ঝড়—কোন নৌকাই তাঁকে পার করতে চাইল না। তখন তাঁর মনে পড়ল গোলাপ কুমারীর কথা। আবার তিনি মেলায় ফিরে গিয়ে গোলাপকুঁড়ীর জিনিস কিনে ডালোয় ডালোয় রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দার মস্তে যা’ এনেছিলেন তাকে তাই দিয়ে দিলেন।

গোলাপকুঁড়ী তার জিনিসগুলি নিয়ে বাঘা ঘরে গিয়ে, পুতুলটিকে উঠুন গোড়ায় বসিয়ে, নিজে পুতুলের সামনে বসে, খুব কীদতে কীদতে, পুতুলটি বেন মানুষ, এমনভাবে তাকে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে লাগল। রাণীর অভ্যাচারের কথাও সে পুতুলকে বললে। এই সব কথা বলে আর মাঝে মাঝে পুতুলকে জিজ্ঞেস করে, “সত্যি, নর ? তুই বুঝতে পারছিস ? শুনেতে পাচ্ছিস ? সত্যি নর ? কি কষ্ট বলতো ? এখন সব শুনে তুই কি বলতে চাস ?”

পুতুল কিছুই বলে না। গোলাপকুঁড়ী তখন পাখরের উপর ছুরি শান দিতে দিতে বলে—

“দেখ পুতুল ! তুই যদি আমার কথার উত্তর না দিবি তা’হলে...এই আমি আমার বুক ছুরি বসিয়ে দিলাম।”

পুতুলটা রবারের খলির মত ফুলতে লাগলো। কে যেন সেটাকে ছুঁ দিয়ে ফোলাচ্ছে—শেষে পুতুলটা বললে—

“তোমার কথা বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি।”...



একটি হুম্বর রাজকুমারের সঙ্গে গোলাপকুঁড়ীর ফিরে হ'ল।

বললে, “উত্তর দে—উত্তর দিবি না—তবে আমি মরি।” এই বলে গোলাপকুঁড়ী ছুরিখানা তা'র বুকে ছুঁদিয়ে দেয় আর কি!...

সেই সময় রাজকুমার ঘরে ঢুকে পড়ে গোলাপকুঁড়ির হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে, তাকে মস্তুরি বোলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মস্তুরি বউ গোলাপকুঁড়ীকে ভালো পোষাক পরিয়ে, খুব আদর-যত্ন করতে লাগলেন।

এক মাস পরে গোলাপকুঁড়ী হুম্বর হয়ে উঠবার পর রাজকুমার এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। যখন গোলাপকুঁড়ী কলম্বলে পোষাক পরে উৎসবে এসে হাজির হ'ল, তখন তার রূপ দেখে তাকে কেউ চিন্তেই পারলে না।

গোলাপকুঁড়ী পুতুলের সঙ্গে
 বোম্বই কথা কর—পুতুল বলে,
 “বুকেছি-বুকেছি-বুকেছি।” আর
 গোলাপকুঁড়ী বলে হুংখের কথা।
 একদিন গোলাপ কুমারীর কথা
 রাজকুমারের কানে গেল। তিনি
 রাঙ্গাঘরের দরজার কীক দিয়ে
 দেখলেন, পুতুলের সামনে বসে
 গোলাপকুমারী বলছে : রাজকুমার
 চিরহুম্বরের কথা—কুমড়ো বিচার
 কথা—গোলাপ গাছের উৎসবের
 কথা—গোলাপ-পাপড়ীর কথা—
 সোনার কুমড়োর কথা—মায়ের চুল
 আঁচড়ানোর কথা—ডাইনীর বাহুর
 কথা—রাজকুমারীর মৃত্যুর সময়
 রাজকুমারের প্রতিজ্ঞার কথা—
 রাণীর হিংসের কথা—তার চুল
 কেটে দেওয়ার কথা—রাণীর
 অত্যাচারের কথা—সব কথা বল-
 বার পর গোলাপকুঁড়ী পুতুলটাকে

রাজকুমার খাবার টেবিলের উপর ছোট্ট একটি মিছরীর বাড়ী বসিয়ে রেখেছিলেন। রাজকুমার তার স্ত্রীকে বাড়ীটির দরজা খুলতে বললেন। রাণী দরজা খুলে দেখতে গেলেন বাড়ীর ভিতর শাতটা কাঁচের বাস্কে ঢাকা সেই পুতুলটি শুয়ে রয়েছে—ঠিক যেমন গোলাপকুঁড়ী শুয়েছিল। এই দেখে রাণীর চোখে আঙুন জলে উঠল। তিনি কাঁচের বাস্কেগুলোকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙ্গে কেল পুতুলটাকে বার করতেই, পুতুলটা রাণীর হাতের কাঁক দিয়ে পালিয়ে গোলাপকুমারীর কাঁধের উপর বসে রবারের ব্যাগের মত ক্রমশঃ ফুলতে লাগল আর রাণীর অভ্যাচারের কথা সব বলতে লাগল। ক্রমশঃ বড় হতে হতে পুতুলটা ডাইনী বুড়ীর মত বড় হ'ল, দেখতেও হ'ল ঠিক ডাইনী বুড়ীর মত। তারপর হঠাৎ পুতুলটা বেলুনের মত জানালা দিয়ে উড়ে চলে গেল।

রাজকুমার হিংস্র রাণীকে গাড়ী করে পাঠিয়ে দিলেন বাগের বাড়ী। তাকে আর গোলাপ-পুরে আসতে দিলেন না।

একটি স্বন্দর রাজকুমারের সঙ্গে গোলাপকুঁড়ীর বিয়ে হ'ল। গোলাপপুরের রাজকুমার মাত্র বেতে গোলাপকুঁড়ী হ'ল সেই রাজ্যের রাণী—চিরস্বন্দর গোলাপ গাছে আবার চিরস্বন্দর গোলাপ ফুটে উঠল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা গোলাপকুঁড়ী তার স্বামীকে নিয়ে তার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় দেখতে গেলেন, গোলাপকুমারী তার দাসীদের নিয়ে গোলাপ গাছটি লাক্ষাচ্ছে আর রাজকুমার চিরস্বন্দর পাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন।*

* Rosenblattohen Von Clemens Brenano-র রচনা ইহঁতে অনূদিত।

আমেরিকায় প্রাচীন শিবমন্দির

আমেরিকার আবিষ্কোনা প্রদেশ—সেবানে একটি দ্বীপ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এ দ্বীপটি মহাপ্রদেশের অংশ ছিল। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে মহাপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। আবিষ্কোনা উপত্যকার উত্তরে বারশো ফুট গভীর এক খাত—খাতটি চওড়ায় এক মাইল। এই খাতের মাথার বিরাট এক মন্দির আছে—মন্দিরের মধ্যে কালো পাথরের তৈরী বিরাট শিবলিঙ্গ। এ মন্দির এবং এ বিগ্রহ কতকাল আগেকার ভূতত্ত্ববিদরা আকো তা নির্ণয় করতে পারেন নি।

ভয়ংকর

শ্রীধনঞ্জয় পাল

তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। চল্লিশ পরগনার
এক ছোট শহরে এসে কাজে যোগ দিয়েছি। কিছুদিন
পরে হুকুম এল একটি মামলার তরফকে হুম্মরবন অফলে
যেতে হবে। সেকালে হুম্মরবন ছিল অতি ভয়াবহ। কিন্তু

সরকারী চাকরি, না গিরেও উপায় নেই। ভয় আর ভাবনার সঙ্গে মালপত্র নিয়ে বেয়িয়ে পড়তে হ'ল।

যেখানে এসে উঠলুম, সেখানে না-ছিল কোন বসতি, না-ছিল লোকজন। জঙ্গলের মধ্যে
ফাঁকা জায়গায় এক ডাকবাংলো। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে লোকজন আসে, তাই সরকারের
তরফ থেকেই এই বাংলা তৈরী করে রাখা হয়েছে। বাংলায় মাত্র দু'খানি ঘর আর তারই সঙ্গে
একটি স্নানাগার। সারাদিন পরিশ্রম করে গা ঘামে চট্‌চট্‌ করছিল। ভাল করে গা-হাত ধুয়ে,
খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। নানা দুঃসপ্নে বড় অশান্তি বোধ করছিলাম। হঠাৎ মনে
হ'ল কে যেন আমার বুকে চেপে বসে দম আটকে দিচ্ছে।

চোখ মেলে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত জল হবার যোগাড়। আমার বুকে
লেপের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে এক ভীষণ কাল-কেউটে। নড়ানড়িতে ক্রুদ্ধ হয়ে সাপটা
আততায়ীর উদ্দেশে এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। চোখ দুটি যেন জ্বলছে।

আমি স্থির হয়ে পড়ায় সাপটাও ক্রমশঃ শান্ত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে গুয়ে পড়ল। ভয়ে আচ্ছন্ন
হয়ে পড়ে আছি। কিন্তু সাপটা এক জায়গায় চেপে বসে থাকার ক্রমশঃ তার ভারটা অসহ্য হয়ে উঠতে
লাগল। হরত পানিক পরে আমি নড়েই উঠতাম।

এমন সময় জানলা খুলে একটি লোক ঢুকলো আমার ঘরে।

আবছা-অন্ধকারে আড়-চোখে তাঁর চেহারা আর হাব-ভাব দেখে বুঝলাম চুবির উদ্দেশ্যেই সে
ঘরে ঢুকেছে। তার হাতে মস্ত বড় এক ছোরা।

আমার গায়ে ছিল লেপ। এদিক-ওদিক চেয়ে চোর আমার পায়ের দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে
লেপখানা ধরে টানতে লাগল। কিন্তু ভারী দেখে আশ্চর্য হয়ে মাথার দিকে এগিয়ে আসল। ভয়ে
ভয়ে আমার প্রাণ ধড়কড় করতে লাগল। সাপটা জেগে উঠে প্রথমে আমাকেই ছোবল দেবে তো।
চোর ততক্ষণে এগিয়ে এলে অন্ধকারে লেপের বসলে সহসা সাপটাকে ধরে দিলে এক টান। আর
বার কোথা। কেউটে চোরটার মুখেই মারলে এক ছোবল। বস্ত্রব্যয় সে একবার পিছিয়ে গেল,
তারপরই হাতের ছোরার আঘাতে সাপটাকে দু'টুকরো করে ফেললে। মৃত্যু নিকটে বুকে চোর
হতাশায় যেকের উপর বসে পড়ল।

এই ঘটনার পর চোরটি মাত্র বার ঘণ্টা বেঁচেছিল। তারপর বহুদিন আমি রাজিতে ভাল করে ঘুমতে
পারিনি। চোখের পাতা বন্ধ হলেই মনে হ'ত সাপটা যেন আমার বুকের উপর চেপে বসে আছে।

মি'ও মি'ও ম্যা'ও

শ্রীমদাংগু গুপ্ত

ছোটো বেড়াল ছানা। নিজের আন্তান ছেড়ে বেহিরে পড়েছে ঝাঝরের লছানে। ও ঘুরছে তো ঘুরছেই...পথের বেনো আর কুল-কিনারা নেই।

শেষটার বেচারী শাস্ত ক্রান্ত হয়ে ঢুকে পড়লো এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

কী ঘটুঘটে অঙ্ককার...দিনের বেলায় কিছু নজরে আসে না। রাত্তিরে না জানি কী ভয়াল রূপ ধারণ করে।

তা' হ'লেও...ওর চোখে বেন হাম্বারো তারার আলো। ও এর মধ্যেই দেবতে পেলো ঘোঁঘোঁষি করে পাঁচটি খুব বড়ো গাছ এক জায়গায় রয়েছে। সারা দিন হাঁটতে হাঁটতে ওর শরীরে এসেছে অবসাদ...গাছ পাঁচটির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়ো তার গুঁড়ির নীচে গিয়ে বসলো—ওর দু'চোখে ডর করলো ঘুমের বুড়ী...ছুঁইয়ে দিলো তার মাথার পরশ, কলে ও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু সে অতি অল্পকণের জন্য। হঠাৎ এক পাখীর বিচিত্র কিচিরমিচির শব্দে বেড়াল ছানার ঘুম গেলো ভেঙে।

ও সব চোখ বগড়াতেই দেবতে পেলো এক কুংসিত চেহাারার মানুষের হাতের মুঠোর একটি ভারী হুন্ডর পাখী। মানুষটি আর কেউ নয়... নিশ্চয় কোনো শিকারী। এ-বনে শিকার করতে এসে ওর হাতে পাখীটি ধরা পড়ছে। পাখীটি দেবতে ভারী হুঁশ্রী। দেহের গড়ন রক্তবেরঙের। ঠোঁটের রঙ হলদে, ডানা নীল আর পুচ্ছটি লালচে।

শিকারীর সে কী উল্লাস! নিজের মনেই বিড় বিড় করছে আর বলছে : বাছাধন, বার বার ধান খেয়ে পালিয়ে যাও—মামি ঘাবেল করতে পারি না—এবার পেয়েছি হাতে-নাতে—পালাও দেখি। পরাণে না বধে আর ছাড়ছি না।

আজই রাত্তিরে তোমার তুলতুলে মাংস—হাঃ হাঃ হাঃ...ওর জিভ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে খানিক জল গড়িয়ে পড়লো।

পাখীটা কিন্তু ডয়ে ঝুঁকড়ে গেছে। ও কেবলি বলছে—কল্প মিনতির স্বরে : তোমরা কে কোথায় আছো আমাকে রক্ষা করো...এ-ভূদান্ত দস্যুর কবল থেকে...না'হলে আমার মরণ নিশ্চিত।

বেড়াল ছানার পাখীর কাহুতিতে দয়া হলো। গৌক ঘোড়া ভীষণভাবে চাড়া দিয়ে শিকারীর সমুখ গিয়ে উপস্থিত হলো। বললে : মিছিমিছি কেন ওকে আটকে রেখেছে। এ-মুহূর্তে ছেড়ে দাও... নচেৎ কল ডাল হবে না—ও আবার স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াক নীল আকাশের কোলে।

খনখনে আওরাছে শিকারী ফবার দিল : তুমি কে গা। এত দরদ কেন একে ছেড়ে দেবার কাজে ? তুমি তো জান না কতবার ফসকে গেছে আমার শিকার...এবার অতি কষ্টে ধরতে পেরেছি... আর কি ছাড়ি !

কথা শুনে বেড়াল ছানার গলা থেকে গর-গর একটা বিলী আওরাছ বেরোল। চোখ দুটি জল জল করে আবার গাঁকে চাড়া দিয়ে ঝেঁকিয়ে বললে : আমাকে চেনো না...আমি হুজি হুগবেশে এক ভয়ংকর নৈদ্য। তোমাকে সাবাড় করতেই এসেছি। ভাল চাও তো ছেড়ে দাও—না হ'লে এখুনি তোমার ঘাড় মটকাবো।

শিকারীর তো ওর ঝারমুখে বিলী চেহারা দেখে হরে গেছে। ওর মূখ থেকে আর একটা কথাও বেরোল না। প্রাণের ভয়ে ও উর্ধ্ববাসে পাখীটিকে হাত থেকে ফেলে দিয়েই ভেঁ দৌড়।

মুক্তির স্বাদ পেয়ে পাখীটির কী আনন্দ। ছুটতে ছুটতে বেড়াল ছানার কাছে এসে বললো : ভাই, তোমার উপকার ছীবনে ডোলবার নয়...তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। আমি সামান্ত পাখী নই—আমি বাহু জানি। আমার কাছে একটি বর প্রার্থনা করো। তুমি আমার কাছে বা প্রার্থনা করবে তাই পাবে।

বেড়াল ছানা বললে : তুমি আমাকে এই বরই দাও বার বলে আমি যে-কোনো আকার ধারণ করতে পারি...বানর, মাছ, পাখী, উট বা বঘন ইচ্ছে।

তাই হবে...বলে পাখীটি হুজু করে নিমিষে শূভ মিলিয়ে গেলো।

বেড়াল ছানা পাখীর কাছ থেকে বর পেয়ে আবার চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে এক বৃহৎ পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছালো। সামনেই বেশ বড় এক ব্রহ্ম... কাকের চোবের মতো খচ্ছ জলরাশি। ওর অমনি ইচ্ছে হলো মাছ হবার। সীতার কটে এপার-ওপার হওয়ার। যেমনি মনে ভাবা...তখুনি মাছ হয়ে জলের বুকে ভেসে চললো। ভাসতে ভাসতে ডানার এসে দেবতে পেলে এক বিশাল মক্কুমি। ধূ ধূ করছে চারিদিক। সূর্যের সে কী তেজ দেখে মনে হচ্ছে কেউ বেন আঙন ধরিয়ে দিয়েছে।

মক্কুমিতে তো উটই একমাত্র বাহন। কাকেরই বেড়াল ছানার একবার সাধ হলো উট হবার। উটের বেশে ও ঘুরে বেড়াতে লাগলো গোটা মক্কুমির খাঁ-খাঁ বালুকা রাশির পথে পথে। তারপর এলো এক পাহাড়ের কাছে। এবার নিলে নিজের আসল রূপ বেড়াল। আরে আরে ও পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলো। ওপরে উঠেই ওর নজরে এলো এক অদ্ভুত ধরনের গাছ...তাতে ফলে রয়েছে অনেক রকম ফল। সেগুলোর চেহারা সাধারণ ফলের মতো নয়। একটি ফলের চেহারা অদ্ভুত ধরনের। শাখা-কালোয় মেশানো বিদ্যুটে দেখতে। ও মুখে করে একটি ফল নিলে।

নিম্নের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো ওর নিম্নের বাসা—চির-চেনা যাটি দিগে ঘেঁষা। 'ও এবার রূপ নিলে ঈগল পাখীর।' সৌ সৌ, স্নাই স্নাই শব্দ করতে করতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছলো প্রিয় মাটি-মারের স্নেহ নীড়ে। নানা জানলার ঘুরতে ঘুরতে বেড়াল ছানা ভীষণ হালিবে পড়লো। মিইয়ে পড়েছে ওর শরীর—যেন সব শক্তি কর্পূরের মতো উবে গেছে। তা' ছাড়া খিদেও পেয়েছে বেজায়। বিদের আলার কোনো কিছু না ভেবেই যে ফলটা এনেছিল তা টুক করে মুখে ফেলে দিলে।

কী আশ্চর্য ঘটনা! ঋণহারা সঙ্গে সঙ্গেই ওর পলার স্বর অন্তত বকম বদলে গেল। সে পরগরে বিশ্রী আওচাল আগে ছিলো তা বদলে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো ভারী মিষ্টি মধুর এক শব্দ—'মি'ও মি'ও ম'্যাও।

এর পর থেকেই নাকি পৃথিবীর সব বেড়ালের মুখ থেকে এ-মিঠে বুলি শুনতে পাওয়া যায়।*

* বিশেষ উপকথা অবলম্বনে।

দধীচির অস্থিদান

শ্রীশ্রীকুলচন্দ্র বসু

কেনারিত করি রক্ত নেকায়, গর্বে অহর চীন,
হিংসে নিশান উড়ায়ে, মুছিয়া নকল সাম্য-চীন।
পূণ্য-ভারতব্রাহ্ম্য গিলা, ভিত করে লকলক,
দম্ব নথর দেবার, হু'চোখ লালসার টকটক।
একঘরে ছিল, জাতে তুলিবারে যে ভারত করে চোঁটা,
'হিন্দী-চীন ভাই ভেদ নাই' বলে। ডোলে চীন
তাও শেরটা!
পঞ্চশীল-ব্রতী অহিংস ভারত—ভাবে চীন, কিবা
শক্তি?
তার সখল বোল হরিবোল, জপমালা অব ভক্তি।
অর্বাচানের মত চীনাশ্বর ভারত-স্বর্গ অরে,
ঝাঁপিয়া পড়েছে হিংসামত্ত অস্ত্রায় রণ লয়ে।

ডাবেনি, ভারত স্বর্গে রয়েছে অকুমান দেব-সৈন্ত।
ধর্মসমরে প্রাণ দিতে যার নাহিক কণ্ঠা সৈন্ত।
শতাবিহীন ভদ্রা বাহ্যারে হ'ল তারা অগুমান,
ব'লাগিয়া লক্ষদধীচি* করিছে অস্থিদান!
কমকি ডাবিছে চীনাশ্বর, 'আরে ফেলিয়া
অশের মালা,
ভারতভীর্ণ বস্ত্র নিয়েছে! পালায়ে এবার
পালা!'*
অশ্বরের মন অজানা, জোহান দেবসেনা থাক
ভৈরী,
ভারতসীমার বাহিরে থামাও রাজ্যলোলুপ
বৈরী।...

* দেবাসুর যুদ্ধে অশ্বরের বিরুদ্ধে ব্রহ্মনির্ধণের জন্য ধ্বংসিত হুই ধীর অস্থিদান করছিলেন।

শীতের সকাল

শ্রীশ্রীধীরেন্দ্র সাহা

শীতের সকাল দুই ভারী
বিছনা ছেড়ে তাড়াতাড়ি
একদিনও যে উঠতে নারি,
খোকন কেমন করে—
নতুন শ্রোণীর নতুন পড়া
সহজপাঠ আর ছবি-ছড়া
ইংরেজী নেই অঙ্কও নেই
শুধু মিষ্টি বই,
তবু কেন খোকন সোনার
ঘুম ভাঙতেই ভোরে
লেপের তলায় শুয়ে শুয়েই
নিতিয়া মাথা ধরে,
নতুন নতুন পড়া খোকন
পড়বে কেমন করে ?

ও-বুঝেছি ও-বুঝেছি
শীত পড়েছে খুব,
তাইতে খোকন পড়তে বলায়
রা করে না, চুপ !

এই দিচ্ছি শীত তাড়িয়ে
রোদ উঠল বোলে,
লক্ষ রাজার মাণিক খোকন
এস মায়ের কোলে ।

জাতকের গম্প : কম্পনার বিপদ

ত্ৰিপ্রদীপকুমার চক্রবৰ্তী

সমুদ্রতীরে এক বনে এক ধৰগোস বাস কৰতো।

ধৰগোস ছিলো একটু ভাবুক প্ৰকৃতিৰ। বিনা কাৰণে নানা চিন্তায় সে তাৰ মনকে ভাৱী কৰে তুলতো।

একদিন সে এক অদ্ভুত চিন্তায় অস্থিৰ হুহু উঠিলো। ভাবলো, যদি এই পৃথিবীৰ ধ্বংস হয় তাহলে তাৰ কি অবস্থা হব? কি কৰে সে বাঁচবে? কোথায় সে আশ্ৰয় নেবে? ঠিক এমনি সময় এক কাণ্ড ঘটিলো!

ধৰগোস যে গৰ্ভে বাস কৰতো, ঠিক তাৰ কাছাকাছি একটা বেল ও একটা তালগাছ ছিলো। ঠোং বেলগাছ খেকে একটা বেল আৰু তালগাছ খেকে একটা তাল ধূপ্ কৰে নীচে এসে পড়িলো!

ধূপধাপ শব্দ শুনে ধৰগোস চমকে উঠিলো। ভাবলো আৰু বন্ধে নেই! এতোকণ সে বা ভেবেছে ঠিক তাই স্বপ্ন হয়েছে—পৃথিবীৰ ধ্বংস স্বপ্ন হয়েছে!

ধৰগোস তক্ষুণি গৰ্ভেৰ ভেতৰ খেকে বের হয়ে এসে, প্ৰাণ ডয়ে প্ৰাণপণে ছুটতে স্বপ্ন কৰিলো।

ধৰগোস ছুটছে তো ছুটছেই!

পথে বাৰ সশে তাৰ দেবা হয় তাকেই সে সাবধান কৰে। বলে, ভাই, পৃথিবীৰ ধ্বংস স্বপ্ন হয়েছে। চল আমবা এখন খেকে পালিয়ে বাই।

ধৰগোসেৰ কথা শুনে বনেৰ অন্তান্ত পশুৰাও ভীত হয়ে ধৰগোসেৰ মতো প্ৰাণপণে ছুটতে স্বপ্ন কৰিলো। একে একে বনেৰ সব পশুই ধৰগোসেৰ সঙ্গ প্ৰাণ বাঁচানোৰ উদ্দেশ্যে বন ছেড়ে অন্তস্ত ৰওনা হোল।

ঐ বনে এক সিংহ বাস কৰতো।

ঐ সিংহকে বনেৰ পশুৰা ৰাজা বলে মানতো। তাৰ কানে বধন, কথাটা পৌছিলো তখন সে গুহাৰ ভেতৰ খেকে বের হয়ে এসে পলাতক প্ৰাণীদেৰ পথ আগলে দাঁড়ালো। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস কৰিলো, কি হে, তোমবা দল বেঁধে কোথায় ৰওনা হয়েছেো? আৰু কেনই বা বাছো?

পলাতক পশুদেৰ ভেতৰ খেকে একজন বলিলো, কেন পালাছি আৰু কোথায় পালাছি ত' জানিনা। তবে অনেকেই পালাছে বলে আমিও ৰওনা হয়েছি।

উজ্জব সিংহ খুশি হতে পায়লো না। তাই সে আৰু একজনকে জিজ্ঞেস কৰিলো, স্পষ্ট কৰে দল কেনি জমি কেন পালায়ছা?

পশুরাজ সিংহের বিক্রম দেখে অল্প সব পশুরা মুখ চাওরাচারি করতে লাগল এবং খরগোস কি উত্তর দেখে শোনার স্তম্ভে মকলেই উৎস্রোচ হ'ল।

খরগোস সিংহের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললো, মহারাজ, পৃথিবীর ধ্বংস হুঁক হয়েছে আমরা তাই প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছি।

সিংহ বিস্মিত হয়ে বললো, পৃথিবীর ধ্বংস হুঁক হয়েছে।

খরগোস হাত জোড় করে বললো, হ্যা, প্রভু।

খরগোসের কথা শুনে সিংহ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করে জানলে যে পৃথিবীর ধ্বংস হুঁক হয়েছে ?

খরগোস তার চোখ দুটো অব্যভাবিক রকম বড়ো করে বললে, ধূপধাপ শব্দ শুনে। খরগোসের কথায় পশুরাজ সিংহের হাসি পেলো। কিন্তু সে হাসলো না। হৃদয় অভিনেতার মতো পশুরা হয়ে বললো, তা তোমরা পালাছো কেন ? পৃথিবী ছেড়ে তোমরা কোথায় যাবে ? পৃথিবী যদি ধ্বংসই আরম্ভ হয় তবে পালিয়ে কি কেউ বাচতে পারবে ?

সিংহের কথা শুনে অন্তান্ত পশুরা বললো, মহারাজ ঠিকই বলেছেন। তবে আমরা এখন কি করব ?

সিংহ বৃহৎ হেসে বললো, এভাবে ছুটোছুটি করলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে—পৃথিবী যেমন আছে ঠিক তেমনিই থাকবে।

একটু থেমে সিংহ আবার বললো, এ জগতে সবই অনিত্য। পৃথিবীও অনিত্য। পৃথিবী একদিন ধ্বংস পাবে সত্য, তবে তা খরগোসের কথায় নয়। গাছ থেকে কল গড়ার শব্দে যে এতো বিচলিত হয়, তার মতো ভীক কল্পনা-প্রবণ জীবের কথার নাচানাচি করে নিজের বিপদকে ডেকে আনার কোনও অর্থ হয় না। আমার মতে তোমরা যে যেমন আছে ঠিক তেমনিই বাস করতে থাকো।

সিংহের কথা শুনে বনের পশুরা শান্ত হোল, তাদের মন থেকে ভয় দূর হোল।

তবু ওদের ভেতর থেকে দু'একজন বললো, আমরা পালিয়ে গেলে পশুরাজ কাদের নিয়ে রাজত্ব করবেন ? তাই উনি আমাদের পালাতে বাধ্য করছেন—চলো আমরা পালাই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই পালালো না। নিজ নিজ আশ্রয়ে বাস করতে লাগলো। ক্রমে তারা দেখলো বিপদের কোনও লক্ষণই নেই।

আস্তে আস্তে পশুরা বুঝতে পারলো যে খরগোসের কথা মিথ্যে শুদ্ধব ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন তারা দলবঁধে অলস কল্পনাগ্রবণ খরগোসকে ঘেঁরে ফেললো।

চতুর শত্রী

ত্রিভীক্ষস চক্রবর্তী

(পারস্তের গল্প)

কারাজ্যান গাড়ীতে তীর্থযাত্রীর দল মহা বাচ্ছিল। সেমদ্ নাম একটি লোক নিশাপুরের আরও দু'জনকে নিয়ে জুটল সেই দলে, পুণ্যসঙ্করের লোডে। পথ চলতে চলতে কিছুদিনের পর, তারা গিয়ে ঢুকল একটা মরুভূমির ভিতর।

কখন তারা আগে এরকম যাত্রার বেঘর নি ও কারাজ্যানের নিয়মকানুনও জানত না। তবে মাত্র স্বর্ধ ভূবে গেছে ও যাত্রি তার কালো কৌকড়ান চুলগুলো এলিয়ে দিচ্ছে যখন চার ধারে, তখন এরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেমদ্ বল, তোমাদের গাড়ী এখন দাঁড়িয়েছে—এই ফাঁকে এস না হাত-পাটা একটু ছড়িয়ে নেওয়া যাক—কি বলো তোমরা? সে দুজন সানন্দে মত দিল এবং রাস্তার ধারে তিন জনে গুয়ে পড়ল-না-মবল! যখন তাদের মরণ-ঘুম ভাঙলো, তখন রাতের কালো আকাশে হালকা উষার আভা ছুটে উঠেছে, কিন্তু রাস্তার তারা কারাজ্যানের কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। বাইরের আকাশে বত আলো ছুটল, মনের আকাশে জমা হ'ল তত অন্ধকার। তবুও তারা এগুলো জোর করে গাড়ীর সম্মুখে—কিন্তু প্রতিবারই তারা ফিরে এলো একই স্থানে বিফল মনোরথ হয়ে। একটা নৌকা ঘূর্ণি-ঝলে পড়লে যে দশা হয়, তামেও হ'ল প্রায় সেই দশা! শেষে তারা গাড়ী পাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হ'ল এবং ঠিক করতে পারল না কি প্রলেপ দিয়ে সারাবে এই দারুণ ক্ষত—এ দুর্ভাগ্যের কুয়ো থেকেই বা উঠে আসবে কি করে?

বিদে ও ডেষ্ঠার কাতর হয়ে, যখন তারা তিনজন তীর্থযাত্রী পাগলের মত মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ তারা দেখল, দূরে যেখানে আকাশ মিশেছে মাটির সঙ্গে, সেখানে কি যেন একটা নড়ছে! দেখে ভয়ই হ'ল তাদের। ক্রমশঃ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল—ঘোড়ার-চড়া এক আরব মূর্তি। লোকটা হাতে আরব হলেও আসলে সে মরুভূমির বেহুইন দস্যু। এক হাতে তার ছিল খোলা তলোয়ার আর এক হাতে দড়ির কঁাল, বাতে বুনা জানোয়ার বেঁধে রাখা বার।

পরীর তার লম্বা-চওড়া পারস্তের বীর কস্তায়ের মত, অর্থাৎ আমাদের দেশে বাকে আমরা বলি মহাভারতের ভীম। সে এসেই তাদের তিনজনকে কড়কড়ে করে বেঁধে, তার ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিল। তারপর ডেড়ার পালের মত টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা স্বর্ণার ধারে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই সে দুজনকে কচাকচ কেটে ফেলল। তারপর তলোয়ার মাটিতে রেখে, তাদের কাপড়-চোপড় খুলে কোথায় কি আছে সব টেনে বার করতে শুরু করল। তখনও মৃত্যু-বরণ করতে বাকী ছিল শুধু সেমদ্।

টানা-হেঁচকা করে আনতে আনতে সেমুসের বাঁধন আলগা হয়েছিল। যে সময় ডাকাতটা এক মনে মাল হাত করছিল মৃতদেহ থেকে, সেই সময় সেমুস নিজেকে মুক্ত করে, তুলে নিল মাটিতে রাখা ডাকাতের তলোয়ার; তারপর সে সেটা তার পিঠের ভিতর চালিয়ে দিল হৃৎপিণ্ড ভেদ করে। তৎক্ষণাৎ তার অভিশপ্ত আত্মা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সে দস্যুর পকেট থেকে তার সঙ্গীদের টাকাকড়ি বার করে, তারই ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে আল্লাকে ধন্যবাদ দিল এই ব'লে যে, পথের একটা কাঁটা অন্ততঃ সে নষ্ট করতে পেরেছে—যেটা সর্বদাই যাত্রীদের পায়ে বিধত। কিন্তু সে এখন বাবে কোথায়? পথঘাট তো জানা নেই। সে ঠিক করল, ঘোড়ার রাস ছেড়ে দেওয়া থাক, তাহলে সে নিশ্চয়ই তার নিজের আত্মানায় তাকে নিয়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে লোকালয়ের একটা সন্ধান পাওয়া যাবে।

এরকম করতেই, ঘোড়াটা বিদ্রাং গতিতে ছুটে গেল তার আজ্ঞায়। সেমুস সেখানে পৌছে দেখল—মকর বৃকে ছড়ান রয়েছে কতকগুলি কালো তাঁবু। এটাই ছিল নিহত দস্যুর বাসস্থান—যেখান থেকে সে ডাকাতি করতে বেরুত। প্রায় এক সপ্তাহের উপর সে বাড়ী না কেয়ার, তার স্নাতভাইরা বড়ই ভাবিত হয়েছিল। সকলেই তাড়াতাড়ি ছুটে এল, কিন্তু তার বদলে অপহরণে ঘোড়ার বেধে তারা আতর্ষ হ'ল। ঘোড়ার লাগাম ধরে তারা সেমুসকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গিয়ে আজ্ঞা মণ্ডন করার উপক্রম করল। তখন সেমুস অক্রমণকারীদের বল, “বেথ জাই সব। আমার প্রাণ চোঁটের আগায় এসেছে যাদের জালায়; না বেথে আর কথা বলতে পারছি না—আগে কিছু খেতে দাও; সবই তোমাদের জানাব— বড়ই লক্ষ্যী খবর আছে তোমাদের এবং তার লক্ষ্যই এ বিপদের মুখে আঁপিয়ে পড়েছি। একটু খাবার জল দাও আগে—”

সে ধীরে-স্থিরে বাওরাদাওয়া করতে করতে মন্তলব ডেঁজে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল—

—“ওহে তাঁবুর ভায়েরা। ভাল করে শোন আমি বা বলি—আমি একজন কারাভ্যানের তীর্থযাত্রী; এই কারাভ্যানটি যখন একজারগার ধাঁড়ায় বিশ্রামের ক্ষণ—সেই সময় সেখানে হঠাৎ হাজির হয় কৃত্যমের মত এক বোদ্ধা। তার হাতের তলোয়ার থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, যদি সে তলোয়ারটা আকাশের বৃকে চালিয়ে দেয়, তবে সেটাও বোধহয় ছ'ফাঁক হয়ে যাবে। যদি তার তলোয়ারের আওরাজ কান্ পাহাডের কানে যায়, তাহলে সেও ছুটে যাবে আত্মা পাখীর ডানার তলায় আশ্রয় নিতে। সে কারাভ্যান যাত্রীদের কয়েকজনকে ঘারেল ও আহত করল পাথরের দলে-পড়া বাগপাখীর মত—পাকা ফসলের কেতের ওপর পড়া আগুনের মত! ধ্বংস করল বহুজনকে।

—“এ কারাভ্যানের দলে দশ-বার হাজার লোক ছিল। এ ব্যাপার দেখে তাদের ভেতর

ভিতর কেউ আমায় ডেরার সাহস করে যেতে পার—তা খুব নিকটেই—তাহলে আমার জাত-ডায়েরা সে টাকা তোমাদের দেবে। আমার ঘোড়ার রাশ আগলা করে দিলেই সে পৌঁছে দেবে সেখায়।

—“আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, কে বাবে এই কাজে তাই নিয়ে। কেউ রাজী হ’ল না দেখে, নিহত লোকদের আত্মীয়রা তাকে ঘেরে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হ’ল। আমার প্রাণ কেঁসে উঠল এই ভেবে যে, এমন সাহসী জোয়ানের এত অল্প বয়সেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে! তখন আমি ঝাঁড়িয়ে বল্লম—আচ্ছা, আমি এই সব খবর নিয়ে যেতে রাজী। আমার বন্ধুরা বল্লম—তুমি পাগল হয়েছ। সেখানে গেলে কি আর কিরতে পারবে? দেখছ না, ঐ লোকটার জাতগাইরাও ডাকাডাকা তোমাকে ঘেরে ফেলবে—তোমার খবর বিশ্বাসই করবে না!

—“আমি একটা লোকের আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচবার আগ্রহে নিজের প্রাণের মাথা তুচ্ছ করে ছুটে এসেছি—এখন তোমরা বা ভাল বোঝ—শীঘ্র কর।”

সেমস তার বক্তব্য শেষ করল। ডাকাতের বন্ধুরা পরস্পরের মূখের দিকে চাইল। তারপর বল্লম, “তুমি বা বলছ সে কি সম্ভব? সে ছোকরা একজন পাকা বোকা ও ঘোড়ার চড়ার ওস্তাদ; সে শত্রুকে শেষ করার আশা না দেখে কখনও লড়ায়ে নামে না। এরকম দুর্ভটনা তার হতেই পারে না—তবে এ ঘোড়াটা তারই—সেদিক থেকে তোমার কথা কিছুটা সত্যি হতে পারে।”

সেমস জবাব দিল, “আমি বা বলেছি তা সবই সত্যি। আমার চেহারা দেখে তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি তাকে হারিয়ে তার ঘোড়া কেড়ে নিয়েছি? এখন আর তর্কাতর্কি করার সময় নেই। যদি তোমাদের বন্ধুর প্রতি একটুও মমতা থাকে ও নিহত লোকদের আত্মীয়ের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চাও, তবে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট কর না। আমি মাত্র দুহিনের সময় নিয়ে এসেছি ও এই সময়ের মধ্যে যদি না কিরে বাই, তাহলে তোমাদের আত্মীয়কে তারা হত্যা করবে। অল্পস অল্পসাপ করলেও সে আর কিরে আসবে না। তোমাদেরও তাই হবে, যে অবস্থা হয়েছিল চোরের পাল্লার পড়ে একজন পাহারাদারের।”

তারা তখন জিগ্যেস করল, “সেটা কি ব্যাপার?” তখন সেমস কেমন করে এক চোর পাহারাদাকে ঠিকিয়েছিল সেই গল্পটা তাদের বলল। গল্পটা হচ্ছে—

—“একজন চোরের অন্তলোকের দেহ থেকে শক্তি চুরি করে নিজের মধ্যে রাখবার ক্ষমতা ছিল (অর্থাৎ কোন বস্তু দিয়ে অপরকে অজ্ঞান করেও, নিজেকে ঠিক রাখত বেশী মাত্রায়)। সে একজন বড়লোকের বাড়ী গিয়ে ঢুকে বহুমূল্য জিনিষপত্র গুড় করল। এখন বাড়ী থেকে বেরবার জন্য সদর দরজার এল, তখন অনেকগুলি প্রহরীকে দেখল। ডাবল, এমন কি করে এদের চোখে

হুলো দিয়ে সরে পড়া যায়। তখন দেখানে একটা ঝাঁটা পড়েছিল। সেটা দেখতে পেয়ে সে সেটা নিয়ে ঝাঁটা দিতে লাগল। গ্রহরীরা জিগোস কল্প যে, এত রাতে ঝাঁটা দেবার কি দরকার? চোরটা অবাব দিল : বাড়ীর কর্তা আজ সন্ধ্যের সময় মারা গেছেন, তাঁকে নিয়ে বাবার রাস্তাটা বড় নোংরা হয়েছে; সকালে আরও অনেক কাজ আছে করবার, সেজন্য এখন থেকে এ কাজটা সেবে রাখছি।”

গ্রহরী আশ্চর্য হয়ে আবার শুধোল, “সে কি, কত মারা গেছেন। আমরা কান্নাকাটির শব্দ শুনেতে পাচ্ছি না কেন?”

চোর বল, “কাল সকাল বেলা শুনেতে পাবে কাণ্ডার শব্দ।”

সন্ধ্য হলে গ্রহরীরা চলে গেল এবং চোরও তার চোরাই মালগুলো সরিয়ে ফেল। সকাল হতেই বাড়ীর কত্তা চুরির ব্যাপার নিয়ে চিন্তার আরম্ভ করেন এবং পাহারাধারীরা গোলমাল শুনেই বুঝতে পারল যে, রাতের লোকটাই আসলে ছিল চোর এবং চালাকি করে বাড়ী কাঁট দিচ্ছিল। তখন তারা চারিদিকে বোঁঝাখুঁজি করল, কিন্তু অশুভাপ করা ছাড়া আর কিছুই করবার রইল না।

সেমুস বল, “এই গল্পটা বল্লম এই কারণে যে, যখনই আমাদের সামনে কোন সমস্যা আসে তখন বেশী ইতস্ততঃ না করে একটা কিছু তড়াতাড়ি করা দরকার। একটা কর্তব্য আছে তোমাদের বন্ধুর প্রতি—এখনই মুক্তি-পণ দিয়ে কতকগুলি লোক পাঠিয়ে দাও আমার সঙ্গে।”

শেষ পর্যন্ত সেমুসের কথায় তারা রাজী হ’ল ও দশজন লোক ঠিক করে প্রত্যেকের হাতে এক হাজার দিনার ও অস্ত্র উপহার দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

কারাভ্যান দল মাঝে মাঝে ধামে বিশ্রামের জন্ত। এরকম একটা জায়গায় তাদের ধরা হ’ল। সেমুস আরবদের বল, “তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এগিয়ে তোমাদের আসার খবর দিয়ে সব ঠিক করব।”

সে কারাভ্যানের সর্দারকে আগাগোড়া যা হয়েছে সব জানাল এবং সে কি করে বুদ্ধির জোরে নিজের জ্ঞান বাঁচিয়েছে তাও বলল।

সর্দার তার কথা শুনে তাকে খুব তাব্বিক করে। ডাকাতের বন্ধুদের ডেকে তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি ও জিনিষপত্র নেওয়া হ’ল। তারপর সর্দার সব ঘটনা খুলে বলল সবাইকে এবং হুকুম দিল, “এই ডাকাতগুলোকে কোতল কর—এরা বাজীর হুম্মন।” এতে সেমুস ও অস্ত্র বাজীর বল, “দেখুন, আমাদের যে বন্ধু ছুটি খুন হয়েছে, তার খেদারত পাওয়া গিয়াছে এবং সেই খুনটাকেও মারা হয়েছে, এ লোকগুলির সেই হত্যায় কোন হাত ছিল না, অতএব একজনের দোষে অপরের প্রাণ নেওয়া ক্রায়ে-সম্মত নয়।” তখন তারা আল্লার নামে শপথ করল, “আমরা আর কখনও বাজীদের খুন-জখম করব না বা তাদের কিছু লুটতরাজ করে নেব না।”



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এদিকে যখন এই অবস্থা অল্প দিকে কলকাতা সহরে ইংরেজরা তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। খুব নাম-ডাক। রাজা নেই, বাদশা নেই, একটা ফৌজদারও রাপেনি ইংরেজরা অঞ্চ কয়েকটা ব্যবসাদার ইংরেজ সহরটাকে এমন হৃদয় করে গড়ে তুলেছে যে দেখে থমকে যেতে হয়। লোকে বলতে লাগলো—আজব সহর কলকাতা।

মুর্শিদকুলী খাঁ'র আমল থেকেই বাংলা দেশের গ্রাম ছেড়ে সবাই কলকাতায় এসে বাড়ি ঘর করতে আরম্ভ করেছিল। এখানে এলে নবাবের পেয়াদা-চৌকিদারদের চোপ-রাঙানি নেই, কে হিন্দু আর কে মুসলমান তা নিয়ে ঝগড়া-মারামারিও নেই। প্রজারা সব কলকাতার চলে এসে ইংরেজদের ভক্ত হয়ে উঠেছে, নবাবরা খুশী হলেন না। প্রথম-প্রথম জমিদারদের ওপর হুকুম জারি করলেন কেউ যেন ইংরেজদের জমি-জমা না বেচে। শেষে ইংরেজরা এমন বিপদে পড়লো যে প্রায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উঠে যায়-যায়। তখন অতি কষ্টে তারা দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে একটা ফার্মান যোগাড় করে আনলেন। আর পেটা করলেন বাঙলার নবাবকে না-জানিয়েই। সেই ফার্মানে লেখা ছিল যে ইংরেজ কোম্পানী আগেকার মতই বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা মাসুল দিয়ে দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারবে। কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে এও লেখা ছিল যে, ইংরেজরা কলকাতার আশেপাশে তাদের ইচ্ছেমত আটত্রিশখানা গ্রাম কিনতে পারবে। তাদের তৈরি টাকা এদেশে চালু থাকবে। এই ফার্মান পেয়েই ইংরেজদের হৃদয়ে হয়ে গিয়েছিল।

সেই হুবিধের জোরে তারা নিজের প্রবাদের নিজের জমিদারীতে বসিয়ে দিলে পাকা করে। আগে ইংরেজরা ব্যবসা করতো, তখন থেকে জমিদার হয়ে বসলো।

ক্রমে ব্যবসা আর জমিদারী যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠলো, তখন প্রচুর টাকা আর হতে লাগলো। টাকা হাতে এলেই মামলা-মকদ্দমা করবার দরকার হয়। তখন দরকার হয় কোর্ট-কাছারির। তা তাও হলো, কিন্তু মূলমন্ত্রের কাজের বিচারের মত নাক-শোকাণ্ড কি করে নয়। রীতিমত আইন-আমলা ঘেঁটে। তাতে লোকজনদের আরও সাহস বাড়লো। দেখতে-দেখতে কলকাতা সহর ধনে-জনে-টাকায়-বিলাসিতায় ক্রমেই সম্মত হতে লাগলো। তাই দেখে গুলশাহ, করাসী, তারাও এসে আসে আসে জেঁকে বসতে চাইলো দেশের নানা জায়গার। কেউ বা চন্দননগরে, কেউ বা পণ্ডিতেরীতে—আর কেউ বা অল্প কোথাও।

বর্গীর হাঙ্গামার পর থেকেই কলকাতার আরো নানা জাতের লোক এসে আসে নিতে লাগলো। এখানে হাজারটা টাকা-কড়ি কেড়ে নেয় না, জোর করে ক্রীড়ান করেন না। কাজ করিয়ে নিয়ে স্ত্রী বা দাম মিটিয়ে দেয়।

কলকাতার যখন এই রম-রমা তখন দিল্লীর রাজধানীর কিন্তু বড় দুঃস্থ। বাদশা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই মোগল রাজত্বে ভাঙন ধরেছিল। একজন বাদশা হয় আর দু'মাস বেতে-না-বেতেই তার মাথা থেকে মুকুট খসে পড়ে। চারদিকে অরাজক অবস্থা। শনির দশা চলেছে রাজধানীতে। যেটুকু তখনও বাকি ছিল, ১৭৩৯ সালে পারস্য দেশ থেকে এসে নাদির শা তাও শেষ করে দিয়েছে। বলতে গেলে—তখন আমাদের এই ভারতবর্ষ শ্মশান হয়ে উঠেছে। শুধু এই কলকাতার ইংরেজ কোম্পানীর এলাকাটুকুই একমাত্র শান্তির নীড়।

একদিকে কলকাতার ইংরেজদের এই বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা, অন্য দিকে দিল্লীর বাদশার চরম বৈস্ত্র দশা, এরই মধ্যে পড়ে বুদ্ধ নবাব আলীবর্দী খাঁ'র মানসিক অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠলো। তিনি রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতেন। এত পরিশ্রম, এত কষ্ট করে বাঙালার মসনদ নিরাপদ করার চেষ্টা করেও তিনি কিছুই করতে পরেলেন না শেষ পর্যন্ত। বাকি সিরাজউদৌল্লাও ঠিক তাঁর মনের মত হলো না। নবাবের নাতি বলে কিছুই বেন পর্বোত্তর করে না। বাক-তাকে পথে-ঘাটে ধরে অপমান করে। চলতি নৌকো দেখলে মজা দেখবার জন্তে উল্টে দিয়ে সকলকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেয়। হোসেন কুলী খাঁ' নামে এক আমীরকে খুন করলে। অল্প যে-দোবই থাক হোসেন কুলী খাঁ, লোকটা নাকি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিল। শেষকালে সে যদি একদিন নবাবের মসনদ চেয়ে বসে, তখন? হুতরাং তার আগেই পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দিলে। সিরাজের বড় মেয়ে খসেটি বেগম সিরাজেরই ছোট ভাইকে পোস্তপুত্র নিয়েছিল। সেও একজন মসনদের

উত্তরাধিকারী হতে পরেতো। তা সিরাজের ভাগ্য ভালো যে সে অকালেই মারা গেল। সিরাজ-উদ্দৌলার বাবা জৈনউদ্দিনও আগে চলে গেছে। ঘণ্টাটি বেগমের স্বামীও চলে গেছে। থাকবার মধ্যে তখন ছিল স্কেল শৌকত্, জঙ্—আলিবর্গী খাঁর মেজ মেয়ের ছেলে। শৌকত্, জঙ্, তখন পুণ্ডিয়ার নবাব। পুণ্ডিয়ার না হোক, সিরাজউদ্দৌলার নবাবী পাবার পথ খানিকটা খোলসা হয়ে গেল।

কিন্তু সেই শৌকত্, জঙ্, থাকতে তো কোনও আশা নেই তার এখনও।

সেদিন সেই কথাই ভাবছিল নবাবের নাতি। বয়েস হচ্ছে। আগেকার সেই ছেলেমাহুবি আর নয়। এর পরে দাড়ও আর থাকবে না একদিন। দিল্লীর বাদশাহের কাছে থেকেও কোনও সাহায্য পাবার আশা নেই। ওদিকে কলকাতায় টোপীওয়ালারা কেঁলা বানিয়ে বসে গেছে। এই মনুসে বসে এত দুশমন নিয়ে রাজ্য চালাবে কী করে?

এমন সময় গরাণহাটির জমিদার বাবুজ্যো মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই গরাণহাটির ফকিরটার কথা। ফকিরটা তাকে বলেছিল তাকে একটা বাঘ মারতে হবে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। বাঘ মারা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু কে জ্বলে-জ্বলে ঘুরে বেড়ায়? ততক্ষণ বাঘের পেছনে ঘুরে না বেড়িয়ে বরং মুশিবাবাদের হাওয়া-মন্ডিলে বসে ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে কুর্তি করলে কাজ হবে। ততক্ষণ গান-বান্ধনা নিয়ে থাকলে মনটা খুশী থাকবে।

একজন ইয়ার বললে—না বোম্ব, চলো গরাণহাটিতে বাই, দিন কতক কালিয়া-কাবাব খেয়ে-দেয়ে আসি—

তা ত:ই ঠিক হলো। গরাণহাটিতে যাচ্ছে নবাবজাদা। সেই খবর পেয়েই গরাণহাটিতে তোড়-তোড় পড়ে গেল। গরাণহাটির লোক জানতে পারলো নবাবজাদা আসছে বাঘ মারতে। ক'মাস ধরে যে অশান্তি চলছে তা অগঙ্গ হয়ে উঠেছিল। দিনমানে যে-বার কাজ সেয়ে সন্ধ্যা নামবার আগেই যার-যার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে হয়। আগে ছিল বর্গী এখন এসেছে বঘে! এ আরো ভয়ানক। কোপ-কাজের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কখন যে ঘাড়ের ওপর কাঁপিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। আর কোথা থেকে যে এ বাঘটা এল তাও বোঝা যাচ্ছে না। কেউ বলে—বনগাঁ থেকে। বনগাঁয় বর্গীরা এসে সব স্থান করে দিয়েছিল। তারপর থেকেই সেখানে মাহুবি-জন ক'য়ে গেছে। সেখানকার হলকাতায় কোম্পানীর এলাকায় গিয়ে উঠেছে। সেখানে এমন জ্বল চারিদিকে। সেই জ্বলেই এখন বাঘের বাসা হয়ে উঠেছে।

চক্রবর্তী বলে—এ বনগাঁর বাঘ নয় গো, এ হলো উলোর বাঘ; উলোতে ওলা হয়েছিল

তা হবে। হওহাও বিচিত্র নদ। ১৭৩৭ সালের আশ্বিন মাসে একবার ঝড় হয়েছিল বাঙলা দেশে। দে-ঝড়ের সময় চল্লিশ হাত জল উঠে উঠেছিল গঙ্গার। এখন যেখানে রাইটার্স-বিজিং, তারই পশ্চিম দিকে একটা বিরাট গীর্জা ছিল। ইংরেজ কম্পানীর সেইটেই প্রথম গীর্জা। সেই ঝড়ের ঝাপ্টাতে গীর্জার চূড়োটা ভেঙে গিয়েছিল। লণ্ডনও হয়ে গিয়েছিল বাঙলা দেশ। সেই ঝড়ের পরেই কত গ্রাম যে অসল হয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। হুম্মরবন থেকে হরত বস্তার জলে কিছু বাঘ ভাসতে ভাসতে এসেছে। তারই একটা চুকে পড়েছে গরাপহাটিতে।

এবার ভালোই হলো। নবাবজাদা আসছে। বন্দুক বাকস নিয়ে আসছে। এবার আর ভয় নেই। এবার গরাপহাটির লোকের রাজে খুশি হবে, দিনে শান্তিতে ক্ষেত-খামারের কাজ করতে পারবে।

গঙ্গামণির বেন দিন আর কাটতে চায় না। রোজ রাতে নিবারণের সঙ্গে দেখা করে আর সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করে মনটা। গরলা বউ বলে—রাত্তির বেলা ঘুমো' না বুঝি মেয়ে?

গঙ্গামণির চেহারা দেখেই বুঝি ধরতে পারে গরলাবউ। মিন দিন কাটির মত রোপা হয়ে যাচ্ছে চেহারাটা। চোখ বসে যাচ্ছে গর্ভের মধ্যে। ছেলেকে বুকে নিয়ে থাকে সারাদিন। কিন্তু শ্যামাপদও বেন বুঝতে পেরেছে। ক'দিন থেকে গা-গরম হয়েছিল। শেষকালে সর্দি-কাশি হয়ে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লো।

গরলা বউ বলে—তুই নিজেও মরবি ছেলেটাকেও মারবি, তোর মস্ত ছেলেটারও ব্যামো হলো, যেখনি তো?

কিন্তু সেই অমুখ যে বেড়ে বেড়ে এত কঠিন হয়ে উঠবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। প্রথম প্রথম শিউলি পাতার রস কিংবা তুলসী পাতা মধু খাইয়ে খাইয়ে চলছিল, শেষকালে আর তাতেও কুলোল না। বুকে সর্দি-কফ বসে একেবারে কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন আর বাচেনা শ্যামাপদ।

গরলা বউ আর ভরসা করতে পারলে না। একদিন বিধু কবিরাজ মশাইকে ডেকে নিয়ে এল বাড়িতে। বিধু কবিরাজ মশাই বুজো মাহুখ। গ্রামের সব চেয়ে বিচক্ষণ কবিরাজ। আগে নাড়ি টিপে মাহুখের মরার তারিখ বলতে পারতেন। এমন চোখে ছানি পড়েছে। কোথাও বিশেষ ব্যান না। বাড়িতে বারো আসে তাদেরই চিকিৎসা করেন। আর কয়েকজন সাক্ষরও আছে তারা তাঁর কাছে আত্মবোধ শাস্ত পড়ে।

তিনি এলেন। এসে শ্যামাপদের নাড়ি টিপলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে রইলেন। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে, বুকে কফাধিক্য হয়েছে—

গরলা বউ পেছনে ছিল। বললে—কখন দেখেছেন কাকাবাবু? (ক্রমঃ)

সাবধান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সাবধান ! চূপ্, চূপ্ ! কাল বিন-হুপুয়ে,—

এসেছিল ছেলে-ধরা চন্দন-পুকুরে !

ঝোকা, তুই বড়ো পাজি,

ঘরে ব'সে থাক্ আজি ; —

চোখে চোখে রাখ্ তোর ছোটো বোন পুকুরে ।

এই কেলো, কি করিস্ পাঁচিলের বাহিরে ?—

ঝুলি নিয়ে যায় ওকে ?—দেখ্ তুই চাহিরে ।

ভিখারীর পরি' সাজ

ছেলে-চুরি ওর কাজ ;—

রাস্তায় পেলো তোরে—নিস্তার নাহিরে !

শোন্ ভূতো, একলাটি ঘাবি নাকো বাজারে, —

ছেলে-ধরা ঘোরে সেথা লাখে আর হাজারে !

ঝুকে পাটা, মুখে দাড়ি,

নেই ঘর, নেই বাড়ি, —

ব'সে খায় গাঁজা-তাড়ি বস্তির মাঝারে ।

নেই চাল, নেই চুলো—বেদে ওরা হাঘরে,

ছুপ্তমি ক'রবি তো ধ'রে নেবে ধাঁ ক'রে !

বেনেদের মাঠটায়

আজ রাত আটটায়,—

সাবধান ! কখ'খনো কেউ ঘাবি' নাকেরে ।

ওপাড়ার মুটুদের গনিটার বাঁধারে,

আজ্ঞা জমায় ওরা ঘুট্‌ঘুটে আধারে ।

ঠাট্টা না,—কাল রাতে

ইয়া বড়ো ঝুড়ি হাতে—

চুরি ক'রে নিয়ে গেছে চিশু-মিশু—রাধারে

গ্রাহক গ্রাহিকাদের (লেখা)

প্রভিরক্ষা তহবিলে দান করো
এবং
শত্রুকে প্রতিরোধ ও শাস্তি
করার জন্য অস্ত্র দরো

॥ সংকথা ॥

কাঠ' পিরিড শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল।
ঢং ঢং। এখন সেকেন্ড পিরিড। ক্লাস
সেভেনের ছেলেরা গোলমাল তুলে গেল।
পণ্ডিতমশাই-এর ক্লাস কিনা! সবাই তটন হয়ে
উঠল। ঘরের পড়া হয়েছে, তারা বার-
বার বই খুলতে লাগল। আর ঘরের পড়া
হয়নি তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে
অত্যন্ত বিষম হয়ে পড়ল। সবাই এখন এই
অবস্থা তখন পণ্ডিতমশাই-এর প্রবেশ।

চুকেই সবাই প্রতি দৃষ্টিপাত। তারপর
নস্ত্র নেওড়া। অভঃপর চেয়ারে বসা। দখিনা
বাতাসে টিকিট তুলে উঠল। বসেই শ্লোক
আওড়ালেন—“উত্তমৈ সহ সান্নিধ্যং, পণ্ডিতৈ
সহ সংকথাম্, অল্পমৈ সহ মিত্রত্বং কুর্বাণ
নাবসীদতি।” এরপর হংকার—“বিপ্নে, পড়া
বল? না—না, এই শ্লোকের মানে বল।”

অনেকের বুক কাঁপল। এইবার মায়ের
পালা। কারণ বিপিন সবচেয়ে খারাপ ছেলে।

বিপিনও দাঁড়িয়ে চিরাচরিত নিয়মে মাথা
চুলকাশো। ব্যাস! সবাই মনে করল
এইবার—! কিন্তু সেদিন পণ্ডিতমশাই মায়ের
ধার দিয়েও গেলেন না। তাঁর নির্দেশানুসারে

“যে ব্যক্তি উত্তমের সঙ্গে দল করে,
পণ্ডিতের সঙ্গে সংকথা আলোচনা করে, সে
কখনো দুঃখ পায় না।”

পণ্ডিতমশাই-এর মুখ থেকে বেরিয়ে এল
গালাগাল। যেমন' করে আয়েতগিরি থেকে
লাভা বেরিয়ে আসে। বলা বাহুল্য বিশিষ্ট
উদ্বেগ—“পাণ্ডী, হতচ্ছাত্রা বাহর! কোনদিন
পড়া করবে না, উল্লুক কোথাকার!...”

আরো কত কি যে মুখ থেকে বেরুত বলা
যায় না!

তাঁর কথার মাঝেই বিপিন বলে উঠলে—
“এটা কি স্তার সংকথা?”

পণ্ডিতমশাইয়ের সকলেই চমকে উঠল।
কি বলতে চায় বিপিন?

পণ্ডিতমশাই অবাক। কেউ যে তাঁর কথার
ওপর কথা বলবে—এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর।

“মানে—?”

এ হংকারে বিপিন ঘাবড়াল না।

“এই মাস্তুর যে জীবন গুই শ্লোকটার মানে
বললে—ওই যে স্তার, পণ্ডিতমশাই-এর সঙ্গে
সংকথা কইতে হবে...

এটা কি স্তার সংকথা??”

॥ ভাবতেও খারাপ লাগে ॥

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিলেও বেন শৈশবকেই বার বার মনে পড়ে। শৈশব-স্মৃতি আমার মনে আসা-যাওয়া করে দিন-রাত্রির। তারই মধ্যে একটি ঘটনা খুব বেশী করে মনে পড়ে। ঘটনাটি হচ্ছে—

সে রাতে কেন আনিলা খুব ঘুম পাচ্ছিল। হয়তো পরীক্ষার শেষে পড়ার কিছু নেই বলেই। কিন্তু মাসীর কড়া হুকুম, দশটার আগে কেউ খেতে পারবে না। তা শুলেও দিনই হোক আর রুটির দিনই হোক। তাই খুব চেষ্টা করলাম জেগে থাকতে—কিন্তু চোখ বেন আর সে-হুকুম মানতে গায় না। চোখ দুটো বুজে আসছে দেখে দিদি বললো, খুঁতু তোর ঘুম পাচ্ছে ?

ধড়মড়িয়ে উঠলাম। না না, ঘুম পাবে কেন ? এই বলে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলাম। কিন্তু আমার চোখ বেন আর বাগ মানে না। কিছুক্ষণ পরই ঘুমে ঢলে পড়লাম।

বাওয়ার সময় মাসী আমাকে জেগে উঠালেন। ঘুম-চোখে বেন দেখলাম, মাসীর মুখ হাসি হাসি। আমার বাওয়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মাসী কি ছাড়েন ! বললেন, আমার খেতেই হবে। রাগে গরগর করতে করতে আমি খেতে বসলাম।

কিন্তু বাওয়ার সময়ও শান্তি নেই। আমি বসে মাত্র সবাই আমাকে দেখে হাসতে লাগল। একই আমার মেজাজ খারাপ, তার উপর এত সব হাসির রোল দেখে গা জ্বলতে লাগলো। বললাম, “কি ব্যাপার ? তোমরা আমাকে চিড়িয়াখানার জীব বলে ঠাউরেছো নাকি ?

ছোড়া হাসতে হাসতে বললো, কি আর ব্যাপার। এই আন্ডকাল, মেয়েদের কথাই বলছিলাম। তারা এখন কি না করছে !

মেজদা টিটকারী দিয়ে বললো, যুগটা বমলে গেছে কিনা !

কি, ব্যাপার কি ? সবাই দেখি আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই হাসছে। রাগে অপমানে কঁদে ফেললাম। কিন্তু ওদের হাসি আর থামলো না। ওরা আরও হাসতে লাগলো।

মাসী আমাকে কাঁদতে দেখে একটু হেসে বললেন, দু' বোকা, এতে কি কাঁদতে আছে ! আমার সামনে একটা আয়না রেখে বললেন, দেখে দেখি তোর চেহারাটা একবার।

রাগে ভ্রূণে মূৰ তুলে আয়নার তাকিয়ে দেখি এক বিচ্ছিন্নি কাণ্ড ! ছি ছি, ভাবতেও খারাপ লাগে। আমাকে নিয়ে তারা এমন ভাবে কতকগুলি হাসি-ঠাট্টা করেছে কে জানে ! সোনারতের কালি দিয়ে ইচ্ছামত গৌণ দাড়ি এঁকেছে। আর ওরা এমনই অসভ্য যে, আমার বিহুনিটা পর্বন্ত বুলে পাগড়ীর মত মাথার উপর বেঁধেছে। আচ্ছা—আমি কি মরে ছিলাম !

সেদিন আমার একটা শিক্ষা হয়ে গেল। তারপর থেকে আর আমি কোন দিন ভুলেও পাবার আগে ঘুমই নি।

শ্রীশিবময় ঘোষ

॥ বাবুই-এর বাসা ॥

সে অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা, লোকালয় থেকে অনেক দূরে, পাখীরা একদিন বাবুইকে এসে ধরল বাসা তৈরীর কায়াটা নিখিয়ে দিতে। বাবুই রাঙ্গী হ'ল, তবে সর্ভ রইল যে পরদিন ভোরবেলা সবাইকে এই সময়, এইখানে, আসতে হবে—আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে শেখাবার মত অত সময় নেই তার।

ভোর না হতেই মাঠে, জঙ্গলে, শস্তক্ষেত্রে, গোলাবাড়ীতে, কাছে, দূরে, পাখীরা যে যেখানে ছিল উড়ে আসতে লাগল, আর কানে কানে এ-ওকে জানিরে দিল—বে-বাই বল! বাবুই-এর মত অমন বাসা বাধতে পারেনা কেউ! ভারী চালাক কিনা ও!

শেষ পাখীটিও উড়ে এলো। বাবুই তখন বাসার সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সবাইকে গোল করে দাঁড় করিয়ে দিল, যাতে করে সবাই ভাল করে দেখতে পারে। তারপর কতকগুলি শুকনো ডালপালা, আগাছা কুড়িয়ে এনে সেগুলো বালুতির মত সাম্বাল।

—“ওঃ—এবারে বুঝলাম!” বলে কাক উড়ে চলে গেল। সেই থেকে কাক শুকনো ডালপালা দিয়ে ঐ ভাবে বাসা বাধতে শিখল। বাবুই একতাল কাদামাটি নিয়ে বাসার ভিতর দিকে ডাল করে লেপে দিল। বেশ গভীর অথচ ঠাকা; একটা বড় বাটীর মত দেখতে হ'ল বাসাটা।

—“আমিও জেনে নিলাম!” এবারে উড়ে গেল খুঁস পাখী। তখন থেকে খুঁসেয়া ঐ নিয়মে বাসা তৈরী করে। বাবুই এবারে কাদামাটির দ্বিতীয় স্তর লাগাতে শুরু করেছে, “ও! এই তোমার বাসা বাধার কায়া!” তাক্ষিল্যভরে বলে গেল প্যাচা। সেই থেকে প্যাচার বাসা অসমাপ্তই রয়ে গেল। ততক্ষণে কতকগুলো শুকনো কাঠি-কুটো কুড়িয়ে এনে বাসার বাইরের দিকে লেপের মত করে সাম্বাচ্ছে বাবুই।

—“চের হয়েছে, গুতেই হবে!” বলে, ফুড়ুং করে উড়ে গেল চডুই। তাই গুর বাসা অমন এলো-মেলো হয়ে রইল। কোথা থেকে বাবুই হুল্লর-হুল্লর পালক, রঙীন হুতো, খুঁচে নিয়ে এলো আর তাই দিয়ে বাসার ভেতরে উক, আরামদায়ক আস্তরণ তৈরী করল। সব দেখে নিয়ে স্টার্লিং পাখী বলে গেল—“এই-ই ভাল!” তাই অন্ত পাখীদের তুলনায় স্টার্লিং-এর বাসা অনেক আশ্চর্যকারক।

এই ভাবে চলতে লাগল বাসা তৈরী কাজ। প্রত্যেকটি পাখী তার নির্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে এক একটি অসম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে গেল। সব শেষটুকু দেখে বাওয়ার দৈর্ঘ্য তাদের আর রইল না।

...পাহাড়ের আড়ালে হুপি গেল ডুবে। গাছের ঝাঁকে-ঝাঁকে নীচবে নেমে এলো আধার। বাবুই তখনও এক মনে কাজ করে চলেছে। বে-কাজের ভার ও নিয়েছে তা থেকে একবার মুখ তুলে চেয়েও দেখল না কে গেল বা কে রইল! রইল কেবল ঘুঘু। তা গোড়া থেকেই ঘুঘুও এমিকে করে দেখেনি! তার স্বাভাবিক করুণ হুরে গেরে চলেছে—“টেক-টু-উ...টেক-টু...উ...” বাবুই তখন একটা শুকনো ডাল নিয়ে বানার ওপরকার গন্ধুস তৈরী করছিল। এতক্ষণ ঘুঘুর কাছা ওর মনে এলো—টেক-টু—আর্ধাং দুটো নাও। ও বলে উঠল, “দুটো কেন?” একটা-ই ত যথেষ্ট। ঘুঘু মনে পেল না। ও গেরেই চলেছে “টেক...টু...টেক...টু...”

—“বললাম ত একটাই যথেষ্ট হবে!” টেচিয়ে উঠল বাবুই।

“টেক...টু...উ...টেক...টু...উ...”

এবারে বাবুই মুখ তুলে ভাল করে চেয়ে দেখল—ঘুঘু ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। তখুনি হাতের কাজ ধামিয়ে হতাশ ভাবে বলে উঠল—“আর আমি পাখীদের কখনও বাসা বাঁধতে শেখাবার চেষ্টাও করবো না!”—

সেই থেকে নানা পাখী নানা কাগদার আজও তাদের বাসা বেঁধে চলছে।*

*'Jakob'-এর The Magpie's Nest' অবলম্বনে।

শ্রীগীতা সিংহ (যোধপুর)

শয়তান চীন

আমাদের 'পরে হানা দেছে' তাই
ক্রুর, শঠ, খল শত্রু চীন।
প্রতিশোধ তার নেব মোরা তাই
আমরা মোটেই নইকো হীন ॥

লোভের বশেতে বাড়িয়েছে হাত
রক্ত-লালুপ শয়তান আজ।
শত্রু-নিধনে লাগো দিনরাত
হাতিয়ার নাও ফেলে সব কাজ ॥

শ্রীমিনতি মুখোপাধ্যায়

নতুন বই

(সমালোচনার জন্তু দু'খানি বই
পঠাবেন)

Children's Panchatantra—The Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. Delhi 8. Price: Rs. 1.25

পঞ্চতন্ত্রের গল্প ভারত-বিস্তিত—বিশ্বনাথ রচিত এই বই বহুপূর্বে লেখা হলেও, এর কাহিনী চিরকালের। রাজা-প্রজা, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন বালক-বৃদ্ধ সবর জন্তেই উপদেশমূলক এই কাহিনীগুলি উপভোগ্য। এ থেকে সমাজ-সংসারের অনেক কিছু শেখবার আছে। আর মজা হচ্ছে এই যে—জীবজন্তু নিয়ে, মানুষজন নিয়ে এর গল্পগুলি এমনভাবে লেখা, যা পড়ে প্রথমেই সকলে গল্পের বস উপভোগ করবে, তারপর প্রচ্ছন্নভাবে তার মধ্যে যে নীতি ও উপদেশ আছে তা পড়ুয়াদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

অপূর্ব হ'রগা কতকগুলি ছবি দিয়ে, ফুলসহ ইংরেজীতে-ভারত সরকারের প্রকাশন-বিভাগ ছোটদের জন্তে ইংরেজীতে এই বইখানি ছেপেছেন। বইখানির মধ্যে সর্বসময়েত এগারটি গল্প আছে এবং গল্পগুলির নির্বাচনও ফুলসহ হয়েছে।

ফিল-ফিল রাজার দেশ—সরলা বসু।

আনন্দের দ্বারা প্রকাশন, ৮ শ্রামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে যানোয়ারন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১'৭৫

লেখিকা ছোটদের লেখার ক্ষেত্রে পরিচিন্তা না

হলেও, এই ছোট-ছোট গল্পগুলির মধ্যে থেকেই তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য। যে রূপকথার গল্প চিরদিনই ছোটদের ভাল লাগে, সেই রূপকথার গল্প আর রূপকথার ধাঁচে লেখা ব্যাঙ, মাছ, কড়ি, পাখী, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতিদের নিয়ে এই বইয়ের সচিত্র গল্পগুলি ভারী ফুলসহ। সত্যিকার ছোটদের গল্প এই গুলিকেই বলা যায়। এই নতুন লেখিকাকে আমরা শিশু-সাহিত্যের আসরে আহ্বান জানাই। সর্বসময়েত দশটি গল্প আছে 'ফিল-ফিল রাজার দেশ'-এ, এবং প্রথম গল্পটির নামে বইখানির নামকরণ হয়েছে। প্রচ্ছদপটটিও আকর্ষণীয়। এঁকেছেন শিল্পী মণীন্দ্র মিত্র।

এক যে ছিল রাজা—সৌরভমোহন মুখোপাধ্যায়। এম. এল. সে এও কোং, ১৩/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১'৪০

ছোটদের গল্পের রাজা সৌরভমোহন লিখেছেন 'এক যে ছিল রাজা'। বইয়ের নামটি ভারী চমৎকার। রূপকথার গল্প বলতে গেলে এই ভাবেই গল্প আরম্ভ করতে হয়। এই বইখানি গল্পের বই এবং রূপকথার গল্পই আছে অধিকাংশ। পাতাল পুঁরী, চাঁপদাড়ি রাজপুত্র, গুপ্ত আর মূর্ত্ত, আড়িকালের কথা, নাসিপতবীর, ফোর বার, ব্রাহ্মণ বীর, চাবারকীর্তি নামে আটটি গল্প আছে বইখানিতে। প্রত্যেকটি গল্পেরই কিছু শিক্ষণীয় সার কথা আছে এবং গল্পের শেষে সেটি লিখেও দেওয়া হয়েছে। পাকা হাতের লেখা এই গল্পগুলি পড়ে খুশি হবে না এমন ছেলেমেয়েই নেই! প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গেই ছবি দেওয়া আছে!

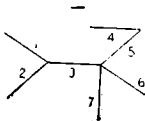


বাকীকর

(i) তিনটি বৃত্ত আছে ডানদিকের ছবিটিতে।
ওদের কোনও একটির পরিধি বা বেড় $U-V$
সরল রেখার সমান। কোন্টির সঙ্গে সমান
বলতে পার ?

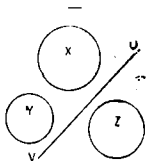


(iii) ডানদিকে যে ছবিটি আছে, তার আংশিক
বৃত্ত C-কে যদি সম্পূর্ণ করা যায়, তাহলে কি ওটা
1, 2, 3 অথবা 4 দিয়ে যাবে ?

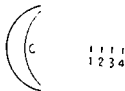


চোখের গাঁপা

(১) না মেপে, কেবলমাত্র দেখেই বলতে
পার ?



(ii) ঐ দিকের ছবির চিত্রের সাতটি সরল
রেখাই কি পৈথ্যে সমান ? না, কোনোটো অপর-
টার চেয়ে বড় ? ছবিটি ভাল করে দেখে আন্দাজ
করো।



(iv) ঐ দিকের চিত্রে ছয়টি সরল রেখার
মধ্যে দুটি সমান্তরাল। ঐ রেখাগুলোতে নব্বয় দেওয়া
এই সরল রেখাগুলির মধ্যে কোন্ দুটি সমান্তরাল
বলতে পার ?

গণিতের খেলা

(২) পাশের ছবিটি দেখ। উপরে বা-দিকের প্রথম ৪ থেকে কোন পাথে নীচে ডান-দিকের শেষ ৩-এ আসলে, রাশিগুণিত চিহ্ন অল্পসারে সরল করলে ফল = ০ হয় ?

শব্দ তোলার খেলা

(৩) কি নিয়মে ডান বা বা-দিক থেকে অক্ষর তুলে নিলে DWROORWD থেকে এতেই অর্থহীনক ইংরেজী শব্দ পাওয়া যায় ?

4	÷	1	×	8	÷
+	5			+	3
3					×
×					2
2	÷			9	+
+	1			×	1
9	-	5	÷	6	-
+	3	×	2	÷	3

(উত্তর আগামীবার বেকাবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। বুজি করে রঙ দাও



ছবি দেখ! চতুর্থ ছবিটি এইভাবে হবে।

২। দুই ধরনের দূধ

দশ সের বালতিতে সাভাঘ্যে ঐ বড়ো বালতিতে দু'বার দুধ ঢালো। তারপর পাঁচ সের বালতিতে সাভাঘ্যে ওর মধ্যে পাঁচ সের দুধ ঢালো। বড় বালতিতে তাহলে পঁচিশ সের দুধ হলো। এইবার তিন সের বালতিতে সাভাঘ্যে ঐ বড় বালতি থেকে তিন সের দুধ বের করে নাও। তা হলেই বড় বালতিতে বাইশ সের দুধ থাকবে।

৩। আসল-নকলের ধাঁধা

বিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা বাবে, দশ এবং এগার নং ছবি দু'খানি ঠিক এক রকম; হুতরাং ঐ দু'খানি ছবিই (বা টাকা) আসল—অপরগুলি দ্বাল।



মেরুড়ে

রোভার্স কাপ

ইন্টারন্যাশনাল ও অল্ড পুলিশকে ১২৬২ সালের রোভার্স কাপের যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। অতিরিক্ত সময় সবেও পুনঃস্থাপিত কাইনাল পেলাটি ১-১ গোলে শেষ হলে পশ্চিম ভারত কুটবল এসোসিয়েশন এই দিকান্ত নেন। টপে জয়ী অল্ড

পুলিস দল প্রথম ছ-মাস কাপটি নিষেধের কাছে রাখবার সৌভাগ্য অর্জন করে। রোভার্সের বাহকর বছরের ইতিহাসে এর আগে আর কখনো এরকমভাবে কাইনালে প্রতিযোগী দল দুটিকে যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয় নি। প্রথম দিনে অল্ড পুলিশ গোল দিয়ে এগিয়ে ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিন ঠিক তার উল্টো হয়। দ্বিতীয় দিন গোল দিয়ে এগিয়ে ছিল ইন্টারন্যাশনাল। প্রথম দিন অরণ ঘোষ প্রায় শেষ সময়ে গোল দিয়ে ইন্টারন্যাশনালকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। পুনরায়োজিত কাইনালে অল্ড পুলিশকে এভাবে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন লেফট ব্যাক নঈম।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলও—১ম টেস্ট ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলও প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হলে প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ৩২১ রান ওঠায়। কেন্দি ট্র্যান্সানের কার্ণকরী আক্রমণের চাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক সংকট দেখা দিয়েছিল, পরে ব্রায়ান বৃথ ও কেন ম্যাকারেয়ার চোঠায় দলের অবস্থার উন্নতি ঘটে। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প কিছু সময় পর ৪০৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ইংলও দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৬২ রান ওঠায়। তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হলে ৬৮২ রানে (পারকিট ৮০, ব্যারিংটন ৭৮) সফরকারী দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। বেনো ১১৫ রানে ৬ উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়া দিনের শেষে বিনা উইকেটে ১৬ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬২ রান ওঠার ফলে, অস্ট্রেলিয়া সর্বদমেত ৩৭৭ রানে এগিয়ে যায়। এই অবস্থায় রিচি বেনো দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পঞ্চম দিনের শেষ ভাগে প্রবল উত্তেজনার ভেতর ইংলও বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচের সমাপ্তি ঘটে—অমীমাংসিতভাবে। শেষ দিন ইংলওর অধিনায়ক টেড ডেব্রটার আকর্ষণীয়ভাবে ব্যাটিং করে দলের বিপর্যয়ের মুখেও যে কৌড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তাতে উপস্থিত দর্শকরা তাঁকে কেবল ইংলও নয়, ক্রিকেট জগতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে অভিহিত করেন। ডেব্রটার মাত্র এক রানের জোরে সেঞ্চুরী করতে

পারেননি। ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ২৭৮ রান ওঠে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ডেভিডগন ৪৩ রানে ৩টি ও ম্যাককি ৬১ রানে ২টি উইকেট পান।

কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সনাপ্ত কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সম্ভরণ প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ৯টি বিষয়ে অগ্রযোজিত বিশ্ব রেকর্ড স্থান হয়ে গিয়েছে। পার্থের ক্রীড়াস্থান শুধু যাত্রকমনওয়েলথকৃত অ্যাথলিটিক্‌সের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। নিউজিল্যান্ডের পিটার শ্বেল ও মায়ে হলবার্জ দুজনেই অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় এঁদের দুজনের কেউই বিশ্ব রেকর্ড ডাঙ্গার কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। পিটার শ্বেল দুটি বিভাগে (এক মাইল ও ৮৮০ গজ দৌড়) যোগ দিয়েছিলেন এবং সে-দুটোতেই স্বর্ণহান অধিকার করেছেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলীয় তরুণী কুমারী পান কিলবর্ন (হাউল রেস ও ব্রড জাম্প), ইংলণ্ডের কুমারী ভুরগোথী হিম্যান (১১০ ও ২২০ গজ দৌড়) এবং বেনিয়ার সেরাকিনো আর্টস (১১০ ও ২২০ গজ দৌড়) পার্থে বি-মুর্ট অর্জনে সফল হয়েছেন। স্বল্প পাল্লার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী কানাডার অ্যাথলিট হ্যারি জেরথ পার্থে আর্টিওয়ের কাছে হার স্বীকার করেছেন পার্থের জলক্রীড়ার ন-টি বিভাগে বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রমে সাকল্যের দাক্ষর রাখা সম্ভবপর হয়েছে মূলতঃ অস্ট্রেলীয় তরুণ তরুণীদের কৃতিত্বে। রিলে রেসে যোগদানকারীরা একাধিক ক্ষেত্রে রেকর্ড ভেঙেছেন; রিলে রেসের চিৎ সীতারে অস্ট্রেলীয় তরুণী সার্কেট নব-নজীর স্থাপনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ তরুণী লিগা লুডগ্রেন্ড এবার পার্থে স্বর্ণপদক পেয়েছেন চিৎ সীতারের উভয় বিভাগে এবং ২২০ গজের বিশেষ রেকর্ড স্পর্শের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লিগার বয়স মাত্র পনেরো এবং তিনি স্কুলের ছাত্রী। পার-স্পটিক নৌহার্দ্য-বিনিময়ে আয়োজিত পার্থের কমনওয়েলথ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অগ্রগত কার্যে যে সাধক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

জাতীয় সম্ভরণ প্রতিযোগিতা

কিছুদিন আগে ত্রিবেঙ্গামে জাতীয় সম্ভরণের উনবিংশ বার্ষিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। পরপর কয়েক বছরের বিজ্ঞতা, পার্টিসিপে দল এবারের প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করাতে রেলওয়ে দলের নিরক্ষণ প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। পুরুষ বিভাগে ঐ দল সর্বাধিক ৫৭ পয়েন্ট পেয়ে সর্বপ্রথম দলগত শ্রেষ্ঠ অর্জন করে। জুনিয়ার (৩৭ পয়েন্ট) এবং মহিলা বিভাগে (৩২ পয়েন্ট) বাংলা দল শ্রেষ্ঠ অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সিনিয়ার বিভাগে বাংলার দু-জন প্রতিযোগীর ভেতর নিমাই দাস একাই তিনটি স্বর্ণপদক পান। দু'শ, চার'শ এবং পনেরোশ মিটারে ক্রি স্টাইল সীতারে জয় জয়লাভ বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। রেলওয়ে দলের অক্ষণ সাহা একশ এবং দুশ মিটার বাটার জাই শ্রিং বোর্ডে জয়লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। এছাড়া এবারের প্রতিযোগিতার বাংলার সীতা যে মহিলাদের চারশ মিটার ক্রি স্টাইলে এবং হুনীল বিশ্বাস জুনিয়ারদের একশ মিটার ব্রেক্ট স্টোকে জয়ী হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।



ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে
বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এ নিয়ে তোমরা অনেকেই
আমার প্রশ্ন করেছে—কিন্তু কেনো এ অত্যন্ত
সাময়িক। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস যদি
মন্বন করো তো দেখতে পাবে ইতিহাসের নৃচনা
থেকে আজ পর্যন্ত অহিংস মহের পুণ্যভূমি এই

ভারতবর্ষের উপর অনেক বহিঃশক্তি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চেয়েছে। কেউ হয়তো সাময়িক
ভাবে আমাদের উপর রাজত্ব করে এই আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে, কেউ বা নিধন, কেউ বা লুণ্ঠনের মধ্যে
দিয়ে প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু কোনটাই স্বাধীন লাভ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের জীব-মন্ত্র সহন-
শক্তিতে এমন বলিষ্ঠ যে তার মধ্যে দানব-শক্তির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আজকের যে বিপর্যয় তা
এই একই কারণে সাময়িক। আমাদের মূলগত ভুল হয়েছিল যে, এমন একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের
সঙ্গে সহ-অবস্থানের মিতালী পাতিয়েছিলাম—বার মনে এক, মুখে এক। বান্দুং সংঘর্ষনের কথা
তোমরা বারো বড় হয়েছ তারা জানো বা সংবাদপত্রেও পড়েছ—সেখানে চীন একজন মূল উদ্বোধক
ছিল। তার চিন্তা-ভাবনার গতিপথ যে ভিন্নমুখী সেটুকু বুঝতে দেবার মত স্ববোধ সে করেনি।
আমরা খিধাহীন চিন্তে এইটাই মনে করেছিলাম যে, ভারতবর্ষের মত এক বিশাল উপ-মহাদেশ—বার
দগে সম্ভ্রান্তি ও সোহাগ্যের স্বয় আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, তার সঙ্গে এই ধরনের এক হীন
কার্ণে নিম্নে লিপ্ত করবে। অবশ্য এর ক্ষমতা হতাশ হয়ে পড়ার কিছু নেই। কারণ আজকের
রাজনৈতিক চিন্তা, বিশেষ করে এই জাতীয় পররাষ্ট্রাগ্রাসী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চিন্তা ধারা এই
পক্ষিল পথেই প্রবাহিত হয়। আত্মসম্মান জ্ঞান তাদের লোপ পায়। বিশ্বের প্রগতিশীল রাষ্ট্র
সমূহের দিক্কার ধ্বনি তার এই তথাকথিত অহমিকার কাছে স্তব্ধ হয়। কিন্তু এর পরিণতি অত্যন্ত
ভয়াবহ। আজ ভারতের এই সবটুকালে বিশ্বের সকল শক্তিশালী রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে নানা ভাবে
ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে। এখনও যদি হানাদারদের হাশ না হয়, তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির হীন
লোলুপতা তারা পরিত্যাগ না করে, তবে দুনিয়া থেকে তাদের স্থান, মর্যাদা, চিত্তত্বের ক্ষমতা বিলুপ্ত
হবে। তবে একথা আমাদের সকল সময় মনে রাখতে হবে যে, নিজের জীবন দিয়ে, শেষ রক্তবিন্দুর
বিনিময়ে অহিংস ও শান্তির পুণ্য পীঠ-ভূমি থেকে শেষ হানাদারটিকেও উৎখাত করার পবিত্র দায়িত্ব
—তোমাদের আমাদের প্রতিটি ভারত সন্তানের।

মীরা চন্দ্রবর্তী, মুর, এভিনিউ—তোমাদের প্রত্যেকের চিঠিতে প্রায় একই প্রশ্ন, একই
আলোচনা—এটা আজকের দিনে স্বাভাবিক। তোমার আমার সকলেরই মনের কথা আজ এই

একই গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে তোমার কথার উত্তরে বলি—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি নিয়ে দেখলে চলবে না। এ সড়ক আসমুদ্র হিমাচলের মধ্যে বসবাসকারী একটি ভারতবাসীর। আজকের যে সম্রাটা ভারতবর্ষের চৌহদ্দির সীমা পেরিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। আজকের আশ্বর্ষের সংঘ দেখা দিয়েছে—হানবের সঙ্গে মাহবের সংঘর্ষ। সেইজন্য প্রতিটি ভারতবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে—হানাদারদের প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ প্রতিটি ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য।

মালবিকা, হাওড়া—তোমার চিঠি পড়েই বুঝতে পারি তুমি বরষে কত ছোট। তুমি কি এতক্ষণ বা বললাম বুঝতে পারবে? না পারো কতি নেই—ভু এইটুকু বুঝতে নিখো, চীন দেশের লোকেরা অকারণ আমাদের বিরক্ত করছে, ঝগড়া করছে, মারামারি করছে। আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ যেমন হুম্মর তেমনই পেশানকার লোকেরা মানে আমরা, একদম মারামারি কাটাকাটি পছন্দ করি না। সকলে মিলে হুখে-শান্তিতে থাকবো তাই আমরা চাই। কি করলে দেশ বড় হবে, দেশের ভালো হবে, এই আমরা চাই—এ চাওমাটি সকলের ভালোর জন্যই। কে না চায় বসো দেশকে ভালো করতে, দেশের মাহবের ঘুখ ঘুর করতে, সব কিছু দেশে উৎপন্ন করতে। তাছাড়া অন্য অন্য দেশের সঙ্গেও বন্ধুত্ব রাখতেও চাই। আমরা চাই শান্তিতে বন্ধুত্ব করে বেঁচে থাকতে, ভালো থাকতে। এই অন্য অন্য দেশের কাছে ভারতবর্ষের খুব হুনা। কিন্তু সেখা ওয়া না বলে-কয়ে ঘুর করে খুনোখুনি শুরু করে দিল—কোন নিয়মের ধার ধারলো না। অবিশ্যি ওরা আমাদের বিশেষ কিছু করতে পারেনি—তবুও আমাদের দেশের অনেকে ওখানে ওদের সঙ্গে লড়াইছেন। এখন তুমি বুকেছ কি, আমাদের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মা নাইডু কেন বর্ধমান ও অন্য অন্য জায়গায় গিয়ে টাকাকড়ি তুলছেন? বুকের জন্য অনেক ভনিসপত্রও টাকার দরকার। দার বা আছে দরই তা দিলে। তুমি বর্ধমানে ঐ যে ছোট মেয়েটির কথা লিখেছ, তা আমরা সংবাদপত্রে পড়ে খুবই খুশী হয়েছি। রাজ্যপাল বখন অনেক টাকাকড়ি পেয়েছেন, তখন একটি মেয়ে বোধহয় তোমার মত হবে, তোমার চিঠি পড়ে তাই মনে হচ্ছে) ছুটেতে ছুটেতে এসে তার অতি আদরের বড় পুতুলটি দিয়ে বলবে, আমার কিছু নেই, কেবল অতি আদরের পুতুল মেরেটি আছে, তুমি নাও। রাজ্যপাল খুশী হয়ে আদর করলেন ওকে, আর পুতুলটি ঐ খানে নীলাম করলেন, ৫০১ টাকা পাওয়া গেল। দেশের অন্য তো ঐ ছোট মেয়েটি তার অতি প্রিয় পুতুলটি দিয়ে দিলে। আজকের দিনে তো তাই করতে হবে। দার বা আছে তাই দিয়ে শক্ত তাড়াতে সাহায্য করতে হবে। এখন তুমি বুঝতে পেরেছ তো—কেন টাকা পরদার দরকার, কেন বড়রা টাকা তুলছেন আর কেন ঐ ছোট বন্ধুটি পুতুল দিয়েছে? তুমি অনেক ছোট বলে এত কথা বললাম।

দেশের প্রত্যেকটি ছেলোমেয়ে নতুন করে জেগে উঠুক, শরীরে ও মনে শক্তি সঞ্চয় করুক। সব সময় সকলের মনে রাখতে হবে এই দেশ আমার, এই দেশকে আমি ভালবাসি, এর জন্য দরকার হলে সব ত্যাগ করতে হবে—আজকের দিনে এর চেয়ে বড় কথা আর নেই। সার্থক ব্রতী হও তোমরা।

তোমাদের—মধুদি

শ্রীমুখীরচন্দ্র সরকার, কলকাতা ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও
তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০৪৫ ন. প.

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

মাঘ—১৩৬৯

[১০ম সংখ্যা]

সৈনিক

শ্রীমতী বিভা সরকার



থামবে না চলবে সে চলবে সে ।

পথটি তার

গৈরিক যে

সৈনিক সে

থামবে না চলবে সে চলবে সে ।

জীবন তার

কা ছুঁবার

লক্ষ্য তার

দূর চলার

ক্রান্ত-পদ টলবে না টলবে না ।

নিশান তার

সবার সার

মত্যকার

ছুঁবিবার

ব্যর্থ কথা বলবে না বলবে না ।

তোতাপাখির পাকানি

শ্রীমিবরার চক্রবর্তী

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন চিড়িহাটা দিয়ে হাটছিলেন।

‘আবার পক্ষে এটা যেমন চিড়িহাটা তেমনি আবার চ্যাংড়াহাটাও।’ বললেন হঠাৎ হর্ষবর্ধন।

‘তার মানে?’ গোবর্ধন জিগেস করে।

‘তুই একটা চ্যাংড়া তো। তোার মতন চ্যাংড়ার সঙ্গে হাটা চ্যাংড়াহাটা ছাড়া আর কি!’

গোবর্ধন দাদার কথার সমুচিত জবাব দিতে চায়, কিন্তু কোনো কথা খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে।

‘তোমার টেরিটি এবার বাগিরে নাও দাদা!’ খানিক বাদে সে বলে ওঠে।

‘কেন বল্ তো!’

‘বদ্বের পাবে।’

‘কিসের বদ্বের?’

‘আমরা এবার টেরিটি বাজারে এসাম কিনা!’ গোবর্ধন প্রাঞ্জল করে : ‘তোমার টেরিট বদ্বের পাবে এবার!’

এতক্ষণে উপযুক্ত একটা উত্তর দিতে পেরে সে মনে মনে পুলকিত হয়। দাদা কিন্তু কথাটা গায়ে মাখেন না। বলেন, ‘পাখিহানটা কোথায় খুঁজে বার কর্ তো দেখি!’

‘ম্যাপ দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।’

‘কিসের ম্যাপ?’

‘ভারতবর্ষের। ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব—তুই দীর্ঘাঙ্গে পাকিস্তান অবস্থিত।’

‘দুস্তোর অবস্থিত।’ দাদা ভারী বিরক্ত হন, ‘আরে, আমি কি সেই পাকিস্তানের কথা বলছি নাকি? টেরিটি বাজার হচ্ছে পাখির বাজার। সেটা কোনখানে দাখ্ না! ভালো মতন একটা পাখি কিনে নিয়ে বাড়ি যাব আজ।’

‘বা-বা-বা!’ পাখির কথার গোবরা লাফিয়ে ওঠে : ‘আমি পাখি ভারী ভালোবাসি দাদা! আমাকে একটা তোতা পাখি কিনে দাও, আমি তাকে পড়াব।’

‘জাখ তাহলে কোথায় পাখির দোকান।’

‘উড়ে?’ গোবর্ধন জানতে চায়।

‘কী বা-তা বকচিস।’ বাধা হেন দাশী: ‘পাখি আবার উড়ে না? ছেড়ে দিলেই তো উড়ে যাবে।’

‘না না, আমি বলছিলাম উড়িয়ারদের ভাবা...’

‘হ্যাঁ, তাও জানে।’ জানালো দোকানী: ‘এক একটা আবার ইংরিজিও জানে বেশ।’

‘বলো কি।’ হর্ষবর্ধন তো হতবাক।—‘ডালোরকম জানে? বটে? ম্যাট্রিক পাশকরা পাখি নাকি?’

‘না। ইংরিজি পড়তে পারবে না। তবে বলতে-কইতে পারে।’

‘না। সেই রকম সাহেব পাখি আমাদের দিরো না।’ গোবর্ধন আপত্তি জানায়: ‘সাহেবদের গ্যাট-ম্যাট আমরা বুঝতে পারব না।’

‘হ্যাঁ, আমরা সাধাসিধে মাহুষ, আমাদের আটপৌরে বাঙালী পাখি দেবে।’ দাশীও সাহায্য করে কথায়। শুধু ভয়ের কথাই নয়, তাঁর পক্ষেও সেটা ভয়ের কথা।

‘তাহলে একটু দাঁড়ান বাবু, এন্ট্রি আমাদের পাখির ডাক হবে। আর সব খন্দের এনে পড়বে এন্ট্রি। তারা এলেই ডাক শ্রুত হবে। ঐ যে তোতাটা দেখছেন, দাঁড়ে বসানো, ওটা বাংলাদেশী। ওটাকেই না হয় সব আগে নিলামে চড়াবো।’

খানিক বাসেই অনকহেতু খন্দের জটিলো। ঘুরে কিরে দেখতে লাগলো পাখিদের। কেউ মরনা, কেউ টিয়া, কেউ শালিক, কেউ আবার সেই তোতাটাকেই পছন্দ করল। ডাক শ্রুত হল পাখিদের। কয়েকটা শালিক মরনা এক ডাকে বেরিয়ে গেল। তারপর তোতাপাখিটা উঠলো নিলামে।

‘পাঁচ টাকা।’ হাঁক দিল দোকানী।

‘সাতো পাঁচ।’ ডাকলো একজন খন্দের।

‘দশ টাকা।’ গোবর্ধনের ডাক।

‘বিশ টাকা।’ হর্ষবর্ধন ডাকলেন।

‘বাবো। আমিই তো ডাকছি। তুমি আবার আমার ওপর ডাকছো কেন?’ দাশীও কানে গোবরা শু অবাক: ‘দর বাড়াজ্জো মাস্থ থেকে? আমি কিনলে কি তোমার কেনা হবে না?’

‘ও, তুই ডাকছিস!’ দাশী একটু অপ্রতিজ্ঞ হন।

‘পঁচিশ টাকা।’ গোবর্ধন ডাকলো শুধন।

‘তুই আবার আমার ওপর ডাকলি যে! তুই আর আমি কি আলাদা?’ হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন: ‘তুই যদি এমন করিস তাহলে আমিও কের তোমার ওপরে ডাকবো আবার। তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।’

‘না না, আর এমনটা হবে না আমি কথা দিচ্ছি...’ গোবর্ধন বলতে বার এমন সময়ে আবার ডাক ওঠে—‘তিরিশ টাকা।’

‘কে ডাকলো আবার?’ হর্ষবর্ধন বলেন।

‘আমি ডাকিনি...’ গোবর্ধন বলে : ‘আমার ডাক চলিশ।’

‘শকাল।’

‘আবার তুমি ডাকছো দাদা?’

‘কই, আমি তো ডাকিনি। কে ডাকলো তবে?’ বলে তিনি হাঁক পাড়েন : ‘সত্তর। আমি ডাকছি সত্তর।’

‘বাহাস্তর।’ মিহিগলার শোনা যায়।

‘নিরনকই।’ হর্ষবর্ধন ডাক ছাড়েন।

‘একশো আট।’ কে ডাকে কে জানে।

‘তিনশো ছাব্বিশ।’ হর্ষবর্ধনের হাগ চড়ে, ডাক চড়ে।

‘পাঁচশো।’ গোবর্ধনের ডাক নয়।

‘দু হাজার।’ হর্ষবর্ধনের হাঁক।

‘বাস্ বাস্, আর নয়।’ দোকানদার মাঝে পড়ে বলেন : ‘দু হাজার এক—দু হাজার দুই... বাস্। থতম্। দিন দু হাজার টাকা।’

কুড়িখানা একশো টাকার নোট গুণে দিয়ে পাখি নিয়ে দুই ভাই রওনা দেন। কিছুদূর এসে দাদার বটকা লাগে—‘আরে, এতগুলো টাকা দিয়ে কিনলাম পাখিটা। কিন্তু পাখিটাকে তো বাম্বিরে বেড়ায় হয়নি। এটা এখন কথা বলতে জানে কি না কে জানে।’

‘উজ্জ্বক।’

‘তুই আমাকে উজ্জ্বক বলি?’ হর্ষবর্ধন ভারী থাপ্ থাপ্ হন : ‘উজ্জ্বক না উজ্জ্ব কি বলি তুই? ছোট ভাই হয়ে কিনা দাদাকে উজ্জ্ব বলে!’

‘আমি কোথায় বললাম! বা রে।’ গোবর্ধন প্রতিবাদ করে।

‘উজ্জ্বক কোথাকার!’ পাখিটার গলা থেকে আসছে কথাটা, স্পষ্ট শোনা যায়।

‘আরে, পাখিটা গাল পাড়ছে বে।’

‘অবাক কাত!’ গোবর্ধন গালে হাত দেয়।

‘আমি যদি কথা কইতে জানি না তবে এতক্ষণ কে কথা কইছিল তোমাদের সঙ্গে?’ ভোতাপাখিটা বলে।

‘তার মানে ?’

‘নিলাম ডাকছিল কে ? নিলামের ডাক চড়াছিল কে এতক্ষণ ?’

‘মানে, তুমিই ডাক বাড়াছিলে ? বটে !’ হুই ডাই বিশ্বয় মানেন।

‘চ কিরে সেই পাখিওয়ালার আড়তে।’ হর্ষবর্ধন বলেন : ‘বে পাখিটাকে এমন করে পড়াতে পারে সে না জানি...’

হু ভাবে আবায কিরে আসেন টেরিট বাজারে।

‘হ্যাঁ গা, তোমরা সামান্য পাখিটাকে এমন শিক্ষিত করলে কি করে ?’

‘আলমবাজারে বে আমাদের পশুপক্ষীর ইস্কুল আছে বাবু।’ ব্যক্ত করে আড়তদার : ‘সেখানে আমরা জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মাহুয করি।’

‘বেশ ভাল কথা। আমি বলছিলাম কি, তোমরা যখন জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মাহুয করো, তখন আমার এই ভাইটিকেও যদি...’

‘আপনার ভাইকে।’

‘হাঁ, আমার ভাইও একটা জন্তু।...জন্তু ছাড়া কিছু নয়।’

‘আমি জন্তু।’ গোবর্ধন কৌস করে ওঠে।

‘তা জন্তু না হলেও জানানোয়ার তো বটেই। এমন জান বাবর করে বেব আমার একেক সময়। মাহুয হল না ছোড়াটা। একে আমি তোমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে চাই।’

‘খাটি জানানোয়ার নিয়ে আমাদের কারবার মশাই। সেখানে এসব ভ্যাঙ্কাল চলে না। আসল জীবজন্তু নিয়ে আসুন, মাহুয করে ছেড়ে দেব।’

‘আপনারা কী দেখান ? শুনি ?’

‘ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, অঙ্ক, জিমনাস্টিক, ড্রিল প্যারেড, সব। সার্কাসের বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ-হাজী—এদের দেখায় কারা ? আমরাই তো।’

‘আচ্ছা, সেই ভালো।’ হর্ষবর্ধন বলেন তখন : ‘পোবরাটার যখন ইচ্ছে নয়, মাহুয হতে চাইছে না যখন, আর আপনারও যখন নারাজ, তখন ওর বদলে ওর কুকুরটাকেই ভর্তি করে দেব আপনাদের ইস্কুলে। দেখা যাক সেটা যদি আপনাদের কুপায় শিক্ষিত হয়। তারপর তার দেখা-দেখি আমার ভাইও যদি...’ তার বেশি আর তিনি ব্যক্ত করেন না।

শেষটা গোবর্ধনের বুলুঙগটাকেই আলমবাজারের পশুপক্ষীর পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল। দ্বীতিমত আবাসিক বিদ্যালয়। পশুপক্ষীরা হোস্টেলে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। গরমের আর পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসে। সব ইস্কুলের বেয়ন রেওয়াজ।

গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরল বুলভগ। দুই ভাই তাকে নিয়ে পড়লেন—কদুর শিখেছে সেখা থাক।

‘অক পারিস—অক ? দুই আর দুয়ে কত হয় ?’

‘ঠক ঠক ঠক ঠক ।’ কুকুরটা পাঠকে জানালো—চার ।

‘বাঃ, অকটা তো বেশ শিখেছে দেখছি । নামতা জানিস, নামতা ? বোলো বোলং কতো হয় বলতে পারিস ?’ গোবর্ধন শুধায় ।

কুকুরটা হাত পা নাড়ে না, চুপ করে থাকে ।

‘একেবারে বোলো বোলোং ।’ হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন : ‘কেউ তা বলতে পারে ? তুই পারিস বলতে—বোলো বোলোং ? আমি পারি ? কেউ পারে ? যে ও পারবে ?’

‘আজ্ঞা, থাক । ভিন্নভাষিক শিখেছিল ? ড্রিল ? প্যারেড ? লেকট...রাইট...লেকট...রাইট...’

কুকুরটা লেজ নাড়ে কেবল ।

‘ওই তো শিখেছে । লেজের ড্রিলটাই শিখেছে দেখছি । ডাইনে-বামে নাড়ছে তো ! ক্রমে ক্রমে শিখবে সব । ক’দিন আর পড়েছে বল ।’

‘সমস্কৃত শিখেচিস ?’ গোবর্ধন শুধায় ।

কুকুর চুপ ।

‘কি করে শিখবে সমস্কৃত ? কুকুরবা কি অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে ? তোর বত বাড়াবাড়ি ।’

‘তাহলে জাতীয় ভাষা শিখেচিস কিছু ? হিন্দী ?’ গোবর্ধন বিজ্ঞাসা ।

কুকুরটা চুপ ।

‘বিভাতীয় ভাষা ? ইংরেজি, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন...?’ হর্ষবর্ধন বিজ্ঞাসু ।

‘ন্যাও ।’ কুকুরটা মুখ খোলে এবার ।...

‘হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে দেখছি ।’ তোতাপাখিটা ঠাঁড়ে বসে কোড়ন কাটে ।

‘মিউ ।’ ককশ সুরে কুকুরটা সাড়া দেয় ।

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

ঐ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

যেখো শুনে মনে হচ্ছে আমাদের এ যুগটা বেন বর্বর যুগে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ এর অন্ত দায়ী।

সত্ত ৪০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে দু' দুটো মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে। এই সম্ভ্রান্তি আমাদের প্রতিবেশী চীন দেশ আমাদের মাতৃভূমি আক্রমণ করেছে, যুদ্ধ চলছে সীমান্তে।

অতীতকালে আরো অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে। ইতিহাসে তার কিছু কিছু বিবরণ তোমরা পড়ে থাকবে। যুদ্ধের একটা ধারণাও নিশ্চয় জন্মেছে তোমাদের। কিন্তু কথা এই যে, আগেকার দিনের যুদ্ধ আর একালের যুদ্ধের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের নিয়মকানুন, রীতি-নীতি বিলকুল পাল্টে গেছে। যুদ্ধ-ব্যবহারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আধুনিক কালের যুদ্ধের উপকরণ, হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র সব নতুন ধরনের। সেকালের অস্ত্রশস্ত্র বর্তমান যুগে একেবারে অচল। অতীতে যে ধরনের যুদ্ধ হত আজ সে ধরনের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। মানুষ বিজ্ঞানের যুগে এসে পৌঁছেছে কিনা? প্রাচীনকালের যুদ্ধ-পদ্ধতিকে বিজ্ঞান এখন প্রায় বাতিল করে দিয়েছে।

সত্যি, বর্তমান যুগে যুদ্ধের ধরন কতই না বদলে গেছে ডাবলে অবাক হতে হয়। আগেকার দিনে যুদ্ধ হত সামনা-সামনি ঠাঁজিয়ে, বেধা-বেধি ডাবে। একালে যুদ্ধ হচ্ছে চোখের অন্তরালে। লোগজীবাণু যেমন অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ চালিয়ে মানবদেহকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তেমনি যুদ্ধমান দু' দলও অন্তরাল থেকে পরস্পরকে ধারেল করে থাকে।

রায়-রাবণের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেছিল। এ যুগেও মানুষ আড়াল থেকে যুদ্ধ করবার পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছে বটে, তবে ঠিক মেঘের আড়াল থেকে নয়। আকাশে এরোপ্লেন থেকে, মাটির তলায় ট্রেক থেকে, কিংবা জলের তলে সাবমেরিন থেকে।

এ যুগের প্রথম মহাযুদ্ধে যুরোপে উত্তর সমুদ্রের ধার থেকে শুরু করে আল্প্‌স পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত গভীর গর্ত খনন করা হয়েছিল। ফ্রান্স ও বেলজিয়মে মাটির তলা দিয়ে বশ হাজার মাইল পর্যন্ত নাকি অনারাসে হেঁটে যাওয়া বেত ; হাজার লোক নুকিয়ে থাকত সেখানে। ওর বিপরীত দিকে কার্মান প্রান্তে ঠিক ঐ ধরনের গর্তে আবার হাজার হাজার সৈন্ত ওত পেতে ছিল। কোনো একটি গর্ত থেকে একটি সৈন্ত উকি মেরে দেখবার জন্য মাথা বের করলে আর কথা ছিল না, পক্ষপক্ষের একটিমাত্র বুলেটে তার দশা নিকেশ।

দু' পক্ষের সৈন্তদল এখন আর রক্তবর্ণ পোশাকে সাজসজ্জা করে মার্চ করতে করতে পরস্পরের

সম্মুখীন হইল না। দামামা বাজিরে যুদ্ধক্ষেত্রে বাওরা আর খোলা মাঠে সামনা-সামনি, মুখোমুখি যুদ্ধ করা—যেমন আমাদের পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধ হয়েছিল, সে ধরনের যুদ্ধ আর হবে না। কিংবা, ওদেশের নেপোলিওন, ওয়েলিংটন যেমন অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের সৈন্যদলকে যুদ্ধ করতে দেখেছেন, তেমন ধরনের যুদ্ধ? সে তো আরব্যোপক্সাসের কাহিনী।

সে ধরনের যুদ্ধ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে, তুমি অদূরে দাঁড়িয়ে দেখবে? সে আর হচ্ছে না। সেনাপতিই ত যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পান না। যুদ্ধক্ষেত্রে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ঘরে বসেই তিনি জানতে পারেন। বিজ্ঞানের দৌলতে।

যুদ্ধ যদি করতে হয় তবে দু'পক্ষকেই আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে হবে। পরিচা ধনন করে আর ন্যস্ত আকাশে এরোপ্লেন থেকে। আর হাঙ্গা যুদ্ধ করবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের ঐ বর্ষা যুগের ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে,—অর্থাৎ চাই লাঠি আর প্রস্তরখণ্ড। তবে কিনা এ যুগের লাঠি আর প্রস্তরখণ্ড আলাদা ধরনের। ওগুলোকে বলা হয় বোমা, রাইফেল, কামান, মর্টার ইত্যাদি। তফাৎটা এই।

পুরাকালে লড়াই—এর অস্ত্র ছিল লাঠি ও প্রস্তরখণ্ড। মানুষ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্ত্রজন্তু মেরে ফেলত পাথর ছুড়ে ছুড়ে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার বুদ্ধি খেলতে লাগল, উদ্ভাবন করল হরেক বকমের অস্ত্র, হাতিয়ার। সেগুলোকে ব্যবহারের নানা কলাকৌশলও জেনে গেল। শুরু হল নতুন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ। ক্রমে মানুষ লৌহচর্ম দ্বারা বেহে আচ্ছাদন করার কারদাটাও আবিষ্কার করে নিল। লাঠি আর প্রস্তরখণ্ড, তীরধনুক, কুঠার, বরষা আর তলোয়ার—ওসব নাকচ হয়ে গেল কালক্রমে। এর পরে মানুষ বন্দুক, কামান তৈরি করতে শিখল। এসে গেল আসল অস্ত্রশস্ত্রের যুগ। আগেকার অস্ত্র আর হাতিয়ারের স্থান হল বাড়ুঘরে। কতক বা প্রাচীন জমিদার প্রৌঢ় লোকদের ঘরে রইল বেয়ালে ফোলানো। মানুষ বন্দুক আর কামান থেকে যে গোলা ছুড়তে লাগল, দেখা গেল তা অনায়াসে ঐ লৌহচর্ম ভেদ করে।

একালের যুদ্ধে হাঙ্গারো বকমের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধ ত আর কিছু নয়, কেবল মারণাস্ত্রের খেলা। আন্তর্জাতিকশৈলীর বক্রগতি রকেট এবং আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের কথা ছেড়ে দেওয়া বাক। ওসবের প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সাধারণ যে সমস্ত অত্যাব্যস্তক অস্ত্রাদি যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় তার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মানুষ মারার ক্ষমতাও তাদের অদ্ভুত।

রাইফেল, মেশিনপান, হাতবোমা, এন্টিট্যাংক কামান, মর্টার ইত্যাদি সাধারণতঃ পদাতিক কিংবা গোলন্দাজ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র। পিল্ডল আর বেহেনেটের কথা বলা বাড়ল্য। এক সময়ে রাইফেলে প্রতিবার গুলি ছোড়ার পরেই বারুদ ভরতি করতে হত, আর গুলি ছোড়া যেত মিনিটে

দশ বাহ। এখন তার স্থান নিধেছে অটোমেটিক রাইকেল; আপনা থেকেই ভরতি হয় আর গুলি শেষ হয় প্রতি মিনিটে ত্রিশটা। আগেকার দিনে ছিল সব ভারী ওজননের অস্ত্র। আজকালকার অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু বেশ হালকা ওজননের।

তারপর ধর মেসিনগান। ওটা দু-রকমের। এক রকমের কামান কাঁধে রেখেই গুলি ছোড়া যায়; আর দ্বিতীয়, একটা তেপায়া কিংবা একটা ভিতে স্থাপন করে গোলা ছুড়তে হয়। বড় সাংঘাতিক অস্ত্র, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি বের হয়ে যায়। আর এক অস্ত্র হল মর্টার কামান। এটাও খুব মারাত্মক। ঘুর পাল্লায় গোলাগুলি ছুড়ে শত্রুপক্ষকে ঘারেল করা সহজ। পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের পক্ষে এই অস্ত্র খুব কার্যকরী।

এক ধরনের অস্ত্রের নাম হাউটকার। কতকটা মর্টারের মতো। তা ছাড়া আছে বড় কামান। কোনটা টেনে টেনে নিয়ে বেতে হয়, কোনটা বা নিজে থেকেই এগেয়। গোলাবাক্সও আলাদা ধরনের। এখন এ্যাণ্টিট্যাঙ্ক আর এ্যাণ্টিএয়ারক্রাফ্ট কামান অচল হতে চলছে। তার স্থান নিধেছে গাইডেড মিসাইল। এরোগ্রেনের গতির বেগ এত বাড়ছে যে এ্যাণ্টিএয়ারক্রাফ্ট কামান আর বেশি দিন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

পিলল, রিডলভারের ব্যবহার সামনা-সামনি যুদ্ধে। বেরনেট আর খুকির প্রচলন এখনো আছে।

সৈন্তেরা ট্রেক কেটে তাতে বাস করে। ওদিকে অপর পক্ষ স্ক্রডস কেটে কেটে এগিয়ে চলে এবং ঐ ট্রেকের ঠিক তলার মাইন বা বোমা রেখে আসে। তারপর হঠাৎ একসময়ে ঐ বোমা ফাটে, লোকজন আর ট্রেকের চিহ্নও থাকে না।

সমুদ্রে জাহাজ চলছে নির্বিবাদে। হঠাৎ বিপদসংকট ঘটাধরনি। ব্যাপার কী? না, জাহাজের তলা চিটিকাক। আর রক্ষা নেই। শত্রুপক্ষ সমুদ্রের তলার মাইন পেতে রেখেছিল। কিংবা সাবমেরিন থেকে টরপেডো ছুঁড়ে ওটাকে ঘারেল করা হল। যুদ্ধ হল বটে, কিন্তু আড়াল থেকে, কেউ দেখতে পেল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আকাশ ছিল যুদ্ধের প্রধান আসর। এরোগ্রেন থেকে বোমা, আগুনে বোমা কেলা হত। তারপর জরমানীর বকেট বোমা। ঘরে বসেই হাউই বাজির মতো আকাশে ছুঁড়ে দাও—হাজার মাইল দূরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়বে আর সব ধ্বংস করবে। সে এক অদ্ভুত বোমা!

তারপরে এল এ্যাটম বোমা। একবারে সর্বচূর্ণ পদার বাড়ি। এক বোমাতোই যুদ্ধ বতম। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। এর পরে আবার হাইড্রোজেন বোমা, ব্যালিস্টিক মিসাইল, আনবিক অস্ত্রশস্ত্র। বাই কোথা বল? এটা নেহাতই সর্বনেশে যুগ।

কিশোর ক্লাবের কীর্তিকাহিনী

শ্রীকান্ত মন্ডল

কিশোরগঞ্জের কিশোরেরা কিশোর ক্লাব করেছে। কেরি, কেটি, কাহ্ন, কানাই, কেঠা, কৃষ্ণদয়াল, কেশার, কেন্দু, করিম, কবীর, কালাম—কত আর নাম কবব সভ্যদের। ওরা ঠিক করেছে, যাদের নামের প্রথম অক্ষর 'ক' নয় তাদের মেথার করা হবে না। ভাল নামে না-হোক, ডাকনামে 'ক' থাকা চাই-ই।

কেন্দুর ঠাকুরদার বৈঠকখানাতেই কিশোর ক্লাব। ক্লাবের সামনে একটা অক্ষর বাগান, তাতে করবী, কেঠা, কদম, কুম্ভ, কামিনী, ক্যানা, ক্রিসেনথেনাম্, কাঠালিটাঙ্গা প্রভৃতি ফুলের গাছ। আর কমলা, কলা, কাঁঠাল, কুল, কয়েংবেল, কামরাঙ্গা, করমচা প্রভৃতি ফুলের গাছ থাকার 'ক' অক্ষরের স্মরণকার। টক ফলের উপর কিশোরদের সাংঘাতিক রকম প্রীতি। তারা কুল, করমচা, কামরাঙ্গা ইত্যাদির নামে জিভের জল আটকাতে পারে না। সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই ক্লাবের সভা সংখ্যাও ক্রমশঃই বাড়তে থাকে।

কিশোরীদেরও টকের উপর লোভ কম নয়। ডাইনের হাতে লোডনীর ফল দেখে এবং চেয়ে চেয়ে না-পেরে কয়েকজন কিশোরী বললে, আমরাও মেথার হবো কিশোর ক্লাবের। কিশোরীদের মেথার করা বাবে কিনা এ-বিষয়ে কিশোরেরা একটা মিটিং করল ক্লাব-ঘরে। কেন্দু বললে—না না, যেহেতু মেথার করা হবে না। যেহেতু বড় ঝগড়াটে আর বজ্জাত। কালকেই আমার বোন আমার হাতে কামুড়ে ধিয়েছে কামরাঙ্গা দিইনি বলে। যেহেতু মেথার করলে হুঁদিনেই ক্লাব ঠাকুরদা হয়ে বাবে।

কেন্দুর ঠাকুরদা অম্বদিন হল মারা গেছেন। ডাই ক্লাবের ক্ষণে বুঝতে ও 'ঠাকুরদা' কথাটি ব্যবহার করে ফেলেছে। কিন্তু কানাই, ক্যাব্লা, কেরি, করিম—এরা সবাই মেহেদের মেথার করার পক্ষপাতী।

কেরি বললে, কেন্দু, তুই কেবল মেহেদের ঝগড়া করতেই দেখিস। কই, আমাদের বাড়ীর কোনো মেয়েই তো ঝগড়া করে না, আমার হাতেও কামুড়ার না। ওরা থাকলে দেখবি ক্লাব ঠাকুরদা না হয়ে ঠাকুরমা হয়ে বাবে।

কেন্দুর ঠাকুরমা বেঁচে আছেন তা কেরি জানে। কেন্দু এবার আনন্দিতই হল। ফলে, মেহেদের মেথার হতে আর কোনো বাধাই রইল না। কবরী, করবী, কাবেরী, কালিঙ্গাঙ্গী, কনক,

কানন, কাঞ্চরী, কল্লনা, কাকনমালা, লতা, কুকা, কাজল, কমল, কুলসমের দল ক্রাব-ঘর ভরে ফেলল। মেঘেরা বখন বেনিকে ঝোঁকে বজ্রের মতই এসে পড়ে। বজ্রের সাথে মিল রেখেই ওদের বলা হয় কক্স। কক্স মানেই শুঁড়ওয়ালা বজ্র। ব-এ শুঁড় দিলে যে 'ক' হয় তা সবাই জানে।

কিন্তু এর পর থেকে কিশোরীদের পরামর্শ ছাড়া কিশোরদের আর কিছুই করার উপায় রইল না। কেননা কিশোরীরাই দলে ভারী হয়ে পড়েছে।

একবার ওদের ক্রাবে লাইব্রেরী করার আলোচনা শুরু হল।

কাল্যাম বললে : লাইব্রেরীর নাম রাখা হোক 'কেতাব-ঘর'। বিনা প্রতিবাদে সমর্থন পেল তার প্রস্তাব।

কাবেরী : ক্রাবের বইগুলোর নাম 'ক' অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া দরকার।

কবীর : আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

কাজরী : শুধু বই কেন, লেখকদের নামও 'ক' দিয়ে আরম্ভ হওয়া চাই।

কেরি : এটাও ভাল কথা। আমি সমর্থন করছি।

কক্স : তাহলে সবাই নিলে আমরা বই বাছতে থাকি।

কেন্টু এতক্ষণ চুপ করেছিল। আর থাকতে পারল না চুপ করে। সে বললে : যদি মেঘেরের বৃষ্টি অস্থায়ী চলি আমরা, তাহলে কক্সটা বই আর ক'জন লেখক টি'কবে ?

কাবেরী : যদি কুড়িজন লেখক আর কুড়িখানা বই টে'কে তবে তাও ভাল।

কেন্টু : কুড়িজন লেখকও টি'কবে মনে হয় না। বিখ্যাত লেখকদের প্রায় সবাইকেই বাধ দিতে হবে।

কল্লনা : আমি বলি কি, বই কিংবা লেখকের নামের কোনো জায়গায় 'ক' থাকলেই চলবে। 'ক' অক্ষরটা প্রথমে রেখে নামটা উল্টেপাল্টে দিলেই হবে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত অন্তত একজন লেখককে যদি আমরা বাধ দিই তাহলে অভ্যস্ত অস্ত্রায় হবে। আমরা ঐ নামটাকেই উল্টে পাল্টে লিখব—কুঠার রবীন্দ্রনাথ। তেমনি 'রামকাহিনী' হবে 'কাহিনীরাম', আর তার লেখকের নাম হবে কুঠার অবনীন্দ্রনাথ।

তখন সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে কল্লনার মূল্যবান কথাটাকে সমর্থন করল।

করিম : কিন্তু ব্যাপারটা একটু গোলমালে রয়ে গেল। কুঠার রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী', 'কাবুলীওয়াল' নেওয়া গেল, কাজী নজরুলের কি নেব ?

কুলসম : কেন ? ঐ যে 'কাঠবেড়ালী, কাঠবেড়ালী পেয়ারা তুমি খাও ?'

করিম : কবিতাটার নাম তো 'ক' দিয়ে শুরু হয় নি।

কুলসম : নাম দরকার নেই। কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ—‘ক’ দিয়ে আরম্ভ হলেই হবে।
 বাতে বড়রাও পড়তে পারে এইভাবে ‘ক’ অক্ষরকে প্রথমে রেখে সাহিত্যিকদের নাম লেখা হল :—
 ক্রিম্ব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেলমাই মধুসূদন, কুঠার রবীন্দ্রনাথ, কুঠার অবনীন্দ্রনাথ, কুম্ভার রায়,
 কান্তনন্দনী সেন, কুমার হেমেন্দ্র রায়, খো (খ=ক+হ) মুখোপাধ্যায়-সৌরীন্দ্রমোহন, ঐ
 বিদ্যুৎ, কেশবতারা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার প্রবোধ সান্নাল, কুমার অচিন্ত্য, কুমারি বন্দ্যোপাধ্যায়,
 ক্রমবর্তী শিত্রায়, ক্রিপাণ (ক=ক+ব) মিত্র মজুমদার, কুমার দিলীপ রায়, কান্তনন্দনী, কীচা
 জ্যোতিভূষণ, কারসর পি, সি... কাজী নজরুল, কামিনী রায়—এঁদের নামে কোনো গুণগোল
 নেই।

লেখকদের তালিকা থেকে শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ ইত্যাদির নাম বাদ গেলেও এঁদের বে-সব
 বইয়ের প্রথম অধ্যায় ‘ক’ দিয়ে শুরু সেগুলো বেছে নেয়া হবে ঠিক হল।

বাড়ীতে গিরে কাকাদের সঙ্গে ‘কনসার্ট’ করে ছেলেরা আলাপা লিষ্ট করল। তাতে
 ইকবাল হলেন কইবাল। কালিদাস, কবীর, করমরাস মোহনচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা), কীটস,
 কাউপার, কার্লাইল, কোলরীজ কোনান ডয়েল, কশেপীর—এই নামগুলোও তালিকাভুক্ত হল।
 শাস্ত্রপ্রবন্ধের মধ্যে কঠ উপনিষদ ও কোরাণের স্থান হল। পত্রিকাগুলোর মধ্যে ‘মোচাক’ হল
 ‘কচামো’, ‘কুস্তারায়’ হল ‘কস্তারায়’ আর ‘মাসিক বহুমতী’ হল অক্ষর সরিয়ে ‘কসিমা বহুমতী’।
 পরশুরামের ‘কঙ্কজী’, ব্রীজবিন্দের ‘কারাকাহিনী’ ‘ক’-এর মাহাত্ম্যেই অহুমোদন পেল। অধ্যাত্ত
 সাহিত্যিকদের ‘ক’ দিয়ে শুরু করা বই আর লেখা বাতে লাইব্রেরীতে স্থান পায় তার অন্ত রীতিমত
 চেষ্টা ও প্রবেষণা চলবে ঠিক হল। এর পর ওরা সবাই মিলে ঠিক করল যে, প্রতি শুক্রবারে ওদের
 গান-বাঞ্ছনার আসর বসবে। তবে শুক্রবারকে ‘ক্রমবার’ বলতে হবে। কিশোর ক্লাবে একটা
 কনসার্ট পার্টির স্থিতি হল। জলসায় ছেলেদের কমিক এবং মেয়েদের কীর্তন বিশেষভাবে উপভোগ্য।
 কলের গান অর্থাৎ গ্রামোফোন রেকর্ডে ওরা কেশববাসী, ক্রিম্ম আবদুল, কুমার শতীন দেব, কৃষ্ণচন্দ্র
 যে প্রভৃতির গান শুনতে লাগল। বেশ আনন্দের কাটছিল ওদের দিন।

কেন্ট একদিন বললে : ‘ক’কে বেছে নিয়েছি বলেই তো আমাদের মধ্যে এত মিল। এই
 দেখ না, ‘ক’এ খুঁটানদের জাইট, হিন্দুদের কালী, কৃষ্ণ, মুসলমানদের কলেমা, কোরবানি, কোরাণ,
 কাবা মসজিদ। আন্তর্জাতিক মিল হতেই হবে ‘ক’-এর কল্যাণে।

কৃষ্ণা বললে : আমাদের ধারের আর পোশাকেও ‘ক’ থাকে চাই।

কবরী : এই সেয়েছে! তবে কি ভাতকে বরকট করতে হবে?

কেন্ট : ভাতকে বাদ দেওয়া চলবে না। তবে তার সঙ্গে ক-যুক্ত জিনিস ব্যবহার করা

দরকার, যেমন, কাৎলা, কই, কাঁকড়া, কাঁকড়, কাঁকরোল, কুমড়া, কপি, কচু, কাচকলা, কলা, কমলা ইত্যাদি। মেঠাইয়ের মধ্যে কালোজাম, কচুরী।

কৃষ্ণা : ছেলেরা কোট-কামিজ পরবে, মেয়েরা চোখে কাজল, হাতে কাঁকন, কানে কুণ্ডল দিতে পারে।

করিম : আর প্রত্যেক বোকার 'ক' অক্ষরের কোনো একটা দৃষ্ট বা পাবী পুঁথি।

• কলসম : কাক পুঁথি নাকি তাই বলে ?

করিম : কোকিল, কাকাতুরা, কবুতর, কুকুর, কাঠবেড়াল না গেলে অগত্যা তাই পুঁথিতে হবে।

কানাই : মাংস খাওয়া বন্ধ। 'ক' অক্ষরের জীবজন্তুদের মাংস চলবে না। কুকুর আর কাক খেলে লোকে বাত্বস বলবে।

করিম : আহা, মাংস বন্ধ হবে কেন ? মাংসের কালিয়া, কোপ্তা, কোর্মা খেতে দোষ কি ?

একদিন কেঁটা তার কাকার কাছ থেকে একটা তালিকা এনে হাজির। কাকা টোলের পণ্ডিত। কেঁটা বললে : কাকা বলেছেন যথাসাধ্য সব জিনিষের 'ক' মুক্ত প্রতিলিপ্য ব্যবহার করতে। শোন এই কিরিত্তি : পোনা—কার্ত্তব্য (তুনেই তো করা আস্তে আস্তে করে টেঁচিয়ে উঠল), হাতী—করপু, বানর—কৌশ, ডেড়া—কুরব, শূয়ার—কিটি, জল—কৌলল, আয়না—কুকবিন্দ, দেয়াল—কুডা।

তুনে সভ্যদের মাথার দেওয়াল ভেঙে পড়বার উপক্রম।

কালাম : মোবারক বাদ, এবার আমার পালা। কেঁটা সংস্কৃত তুলিয়েছে। মৌলবী কসির মিকার কাছ থেকে আমি আরবী শব্দ যোগাড় করেছি। কর্দ পেশ করছি, শোন : চাঁদ—কামার, বল—কুরাত, কাহুয—কিন্দিল, লেখা—কিতাবাত—আরও চাই নাকি ?

কৃষ্ণা : আরে সর্বনাশ। একে পণ্ডিত পাগল করে তুলেছে, মৌলবী এবার ঘেরাই কেলেনে। এক রাত্রে রক্ষা নেই, স্ত্রীও হোলর। বাপ রে বাপ ! এগুলো মুখস্থ করতে হবে নাকি ? তবেই তো হয়েছে।

করিম : জোর ক'রে কিছু তাপানো ঠিক নয়। তবে ব্যবহার করতে পারলেই তো ভাল, 'ক'-এর মহিমা বাড়বে।

কাজল : বেড়ে কাজ নেই। না—না—না, ব্যবহার করতে আরও পাব না। মনেই রাখতে পারব না আমার।

সুভদ্রা কেঁটার চেঁটা গোড়াতেই নষ্ট হয়ে গেল।

এইবার খেলার ব্যাপারে কি হল দেখা যাক। ঐ শব্দ সমস্তার মিটিং-এর কিছুদিন পর

স্ববিচার

ঐকগিভূষণ বিশ্বাস

গাজী সাহেবের পাখী ।

হুন্স করে এগিয়ে চলেছে । গরুর গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন জমিদার সতীনাথ

রায় । গাড়োয়ানকে বললেন : মনোহর, মেথিস বেন গাজী সাহেবের পাখী এগিয়ে না বার । কিছুতেই পথ ছাড়বি নে । একজন ক্ষুদ্র জমিদারের পাখী সতীনাথ রায়ের গরুর গাড়িকে পিছনে কেলে এগিয়ে বাবে, এ বেন তাঁর কাছে অসহ্য ।

গাড়োয়ান প্রাণপণে গরুর লেজের মোচড় দিল । পাকা গাড়োয়ানের হাতে পড়ে গরু ছ'টো ঊর্ধ্বদ্বারসে ছুটে লাগল । কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে গরু ছ'টো দাঁপিয়ে পড়ল । দ্বিপদগরের সাকো পর্যন্ত ছোটোছোটো তীর প্রতিবেশিতা চলল ।

সাকো পেরিয়েই চণ্ডা রাস্তা । সেখানে এসে গাড়োয়ান ঘরিতা হয়ে উঠল । গরুর পিঠে ছ'বানা পাঁচন ডাঙল, তথাপি পাখীকে টেকা দিয়ে গরুর গাড়ী এগিয়ে বেতে পারল না ।

এত করেও মনোহর শেষে উঠল না । দেখতে দেখতে গাজী সাহেবের পাখীটা কিছুদূর এগিয়ে গেল । সতীনাথ রায়ের গরুর গাড়ীটা হাত ধ'শেক পিছনে পড়ে গেছে ।

গাজী সাহেব তখন পাখী থেকে মুখ বাড়িয়ে কৌতুকর হাসি হাসলেন । সতীনাথ রায়ের দিকে বেন কটাক্ষ করে বললেন : দুয়ো হেরে গেল । সঙ্গে সঙ্গে ছ'জন জোয়ান বেহারাগ বেন তারস্বরে হুঁ হুঁ করে বললে : হেরে গেল, হেরে গেল ।

গাজী সাহেবের সেই কটাক্ষ বেন অপমানের চাবুক বসিয়ে দিলে সতীনাথ রায়ের মুখের উপর । তিনি আর থাকতে পারলেন না । তড়াক করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন । ক্রোধে তখন তিনি ক্রিষ্টপ্রায় । গাজী সাহেবের এ স্পর্ধা বেন তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকল । একজন ক্ষুদ্র জমিদার, সামান্ত কাকের, সতীনাথ রায়কে সতীহ করবে না, সে কথা তিনি ভাবতেই পারলেন না । তিনি চীৎকার করে উঠলেন : মহেশ্বর, বেহারাগলোকে জুড়িয়ে লাস করে দে । ব্যাটাঘের আশ্পদা কদ নয়, সতীনাথ রায়ের উপর টেকা মেবে বাবে, এমন লোক এ তল্লাটে কে আছে দেখি ।

জমিদারের বেহরাকী মহেশ্বর । ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ জোয়ান । জমিদারের আবাল্যের সতী । তাঁর যতিগতি মহেশ্বর ভালো বোঝে । ধরে আনতে বললে বে, বেঁধে আনতে পারলে জমিদার হুঁ হ'ন, মহেশ্বর তা ডালোভাবেই আনে ।

সে বেন এমনতর হকুমের অপেক্ষার ছিল ।

সে এবার পাখীর পিছনে ধাওয়া করল । ছ'জন লোকের সঙ্গে মহেশ্বর একাই যথেষ্ট । তবু সে জন তিনেক পাইককে সঙ্গে নিল ।

সতীনাথ রায় গরুর গাড়িতে চেপে বসলেন। বেশ আরাম করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কণির নলে টান দিলেন। খেন কিছুই ঘটেনি, এমনি নিশ্চিন্তায়ে চোখ বুজলেন।

ওদিকে তখন লাঠীলাঠি বেধে গেছে। বাঘের মত লাফিয়ে পড়েছে মহেশ্বর। লাঠির ভাঁড়ের ছ'জন বেহারা-ই অল্পবিস্তর লুণ্ঠন করেছে। পাখী ফেলে তারা কে কোথায় পালায়ে গেছে। গাঙ্গা সাহেব পাখীর এক কোণে বসে ভয়ে কাঁপছেন।

তখনও বটতলার পাখীটা পড়ে রয়েছে।

সতীনাথ রায়ের গরুর গাড়ীটা শব্দকে এগিয়ে আসতেই, মহেশ্বরের দল বিজয়দর্পে চীৎকার করে উঠল : অর সতীনাথ রায়ের লুণ্ঠন।



‘বিজয়ের দাবলো সতীনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠল।’

বিজয়ের দাবলো সতীনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

এতটা অপমান গাঙ্গী সাহেব সহ্যে পারলেন না। তিনি স্বয়ং জেলা-শাসকের সঙ্গে দেখা

করলেন। আহত বেহারাদেরও নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন কোর্টে। বিচক্ষণ জেলা-শাসক মন দিয়ে সব শুনলেন।

বক্তব্য শেষ করে গাজীসাহেব বললেন : হজুর, এর একটা বিহিত করতেই হবে। বাতে ভবিষ্যতে নিরীহ প্রজারা এতদন অত্যাচারী জমিদারের হাতে এইভাবে আর নাগ্নেহাল না হয়।

—কি হয়েছে গাজী সাহেব ? জেলা-শাসক জিজ্ঞাসা করলেন : ভণিতা রেখে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে বলুন তো।

—সে কথাই বলছি হজুর। গাজী সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন : জমিদার সতীনাথ রায়ের লোকেরা খাম্বা আমাদের মারশিট করেছে। পাণ্ডার বেহারাদেরও মেরেছে।

—বলেন কি গাজী সাহেব ? জেলা-শাসক বেন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : জমিদার সতীনাথ রায়ের লোকেরাই যে আপনার পাণ্ডা-বাহকদের মেরেছে, তা প্রমাণ করতে পারবেন ? আপনার সাক্ষীসাব্দ আছে তো ?

—না হজুর। এ ব্যাপারে কেউ সাক্ষী দিতে চাইবে না।

—কেন ? লোকে বা দেখেছে, কোর্টে এসে তাই বলবে।

—আইনত : তাই বলা উচিত হজুর। কিন্তু সতীনাথ রায়ের নাম শুনলে কেউ কোর্টে আসতে সাহস পাবে না। তারা জানে যে, জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে কাকুর ঘাড়ে মাথা থাকবে না। তা ছাড়া ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে, সেটা সতীনাথ রায়ের জমিদারীর মোক্ষম ঘাটি। যোন এলাকা। সেখান থেকে একজন সাক্ষীও পাওয়া যাবে না।

—তা হ'লে ? জেলা-শাসক জিজ্ঞাসা করেন। বললেন : সাক্ষী না হ'লে কিসের জোরে লড়াই করবেন। আপনার কথা যে সত্যি, তা প্রমাণ করতে হবে গাজী সাহেব।

—একটিমাত্র সাক্ষী আছে হজুর। গাজী সাহেব বেন আয়ত্যা আয়ত্যা করলেন। বললেন : কিন্তু সে সাক্ষীকে তো কোর্টে হাজির করা যাবে না হজুর। তার ক্ষত্ব একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

—সে বিশেষ ব্যবস্থাটা কি শুনি ? জেলা-শাসক কৌতূহল প্রকাশ করলেন। বললেন : তার ক্ষত্ব কি করতে হবে গাজী সাহেব।

—সরস্বতিনে ভদ্র করতে হবে। গাজী সাহেবের কণ্ঠে অহরোধের স্বর ফুটে উঠল। বললেন : জমিদারের কাছারি বাড়িতে একটি কাকাতুরা পাণ্ডা আছে। পাণ্ডাটি চমৎকার কথা কইতে পারে। সেই আমার মূল সাক্ষী। তার মুখেই শুনতে পাবেন জমিদার সতীনাথ রায় কি ভীষণ অত্যাচারী।

—কিন্তু পারবী মূৰ থেকে কি সব কথা আদার করা বাবে ? জেলা-শাসক প্রশ্ন করলেন ।

—আপনাকে কিছুই প্রশ্ন করতে হবে না হজুর । গাজী সাহেব যেন একটা কৌশল বাতলে দিলেন । বললেন : আপনি যে তদন্তে এসেছেন, একথা জমিদারের কাছে ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না । বেড়াতে বেড়াতে জমিদার সতীনাথ রায়ের কাছারি বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন । তারপর প্রসন্নক্রমে ঐ পারবী কথা তুলবেন, তা হলেই জমিদার খুশি হয়ে অন্ধর থেকে পাখোটিকে আনিতে নেবেন । ব্যাস্, ওতেই আপনার কাজ হাসিল হবে বাবে ।

—ঠিক আছে । জেলা-শাসক এবার কোর্টের বাইরে এসে ঠাঁড়ালেন । গাজী সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে বললেন : আপনার পরামর্শ মতই কাজ হবে । আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান ।

সপ্তাহখানেক পরে ।

জমিদার সতীনাথ রায়ের কাছারি বাড়ির কাছে জেলা-শাসকের জীপ গাড়ি এসে থামলো ।

জমিদার সতীনাথ রায় হস্তমস্ত হয়ে বার হয়ে এলেন । দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সাহস অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন : আহ্ন, আহ্ন মিঃ ব্যানার্জি । আজ আমার কি সৌভাগ্য ! আপনার মত লোককে পাওয়া তো ...

জেলা-শাসক তাঁর কথার বাধা দিয়ে বললেন : ভাগ্যের কথা কি বলেন সতীনাথবাবু ?

—একশ' বার । সতীনাথবাবু যেন গঙ্গা নদে উঠলেন । বললেন : ইঠাং যে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, তা ভাবতেই পারিনি । কাজেই এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য বলেই মনে করছি । আশা করি এ আগমনের একটা উদ্দেশ্য আছে । বনুন, আপনার জন্তে কি করতে পারি ।

—না, না, এ আদার পিছনে কোন হেতু নেই । সোকার বসে জেলা-শাসক হেসে উঠলেন । বললেন : একটা জরুরী কাজে পাশের গায়ে এসেছিলাম । সেখানে এসে শুনলাম, আপনার একটি হরবোলা পারবী আছে । পারবী যে কথা বলতে পারে, একথা অনেকের মুখেই শুনেছি, কিন্তু কোনদিন হরবোলা পারবী দেখিনি । তাই কৌতূহল হলো । হরবোলা পারবী দেখার জন্তে আপনার এখানে ছুটে এলাম ।

—তা বেশ করেছেন । সতীনাথ রায় যেন উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন । বললেন : শিক্ষাগুণে বনের পারবীও যে মানুষের মতই কথা বলতে পারে, আমার কাকাতুয়া পারবী দেখলেই তা বুঝতে পারবেন ।

উৎসাহের আভিষেক সতীনাথ রায় অন্ধরের দিকে ছুটলেন । ডাবলেন জেলা-শাসককে হাত করার এমন সুযোগ বোধহয় আর মিলবে না ।

একটু বায়েই ঠাঁড়হুড় কাকাতুয়া পারবীটাকে আনা হলো । মহেশ্বর পারবীটাকে জেলা-শাসকের সামনে রাখল । জমিদারবাবু তখন জেলা-শাসকের পাশে গিয়ে বসলেন ।

—মহেশ্বর, দশ ছুতো লাগাও। অভ্যাসবশতঃই কাকতুরাটা কপ্চে উঠল।

—কাকতুরা, কাকে ছুতো লাগাতে হবে, মহেশ্বরকে বলে দাও তো। জেলা-শাসক বেন পাখীর মুখে কথা যুগিয়ে দিলেন।

—মহেশ্বর চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পাকী সাহেবের বেহারাগুলোকে ছুতিয়ে লাশ করে দাও। পাখী বেন এবার সবোথে ছাড় ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ঘটনার পরদিন আলোচনাশ্রমণে পাখী বা শুনেছিল তারই বেন পুনরাবৃত্তি করল।

—এ কি! জেলা-শাসক বেন চমকে উঠলেন। বললেন : দিবি কথা কইতে শিখেছে তো। মাঝ গালাগালি পর্বত আরম্ভ করে কেলেছে। না, আপনাদের শিক্ষার বাহাদুরী আছে।

—সবই আপনাদের পাচকনের আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে। আমি তো কেবল নিমিত্তমাত্র। সতীনাথ রায় তখন বেন পক্ষমুখ হয়ে উঠেছেন। বললেন : গালাগালির কথা বলছেন? ও কিছু নয় মশাই, যোক্ত বা শোনে, তাই শিখে কেলেছে।

—টিক কথা জমিদারবাবু। হরবালা পাখীর স্বধর্মই এই, ওরা বা শুনবে, অবিকল সেই কথাই বলতে শিখবে। জেলা-শাসক বেন কথাটার উপর কোন গুরুত্বই দিলেন না।

—বনমালী! শিগ্গীর চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। জমিদারবাবু বেন আতিথেরতার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

একটু বাবেই বনমালী চা-জলখাবার নিয়ে এলো। সতীনাথ রায় দানশ্বে চা-জলখাবার জেলা-শাসকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

জেলা-শাসক চারে চুম্বক দিতেই, কাকাতোরা আবার অভ্যাসবশতঃই চীৎকার করে উঠল : মহেশ্বর ছুতো লাগাও।

তারপর ব্যাকবাক ঐ একই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

—বাঃ! ভাগ্যশ্রমেই রত পেয়েছেন, মশাই। জেলা-শাসক এবার চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

তারপর জীপ গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন। সতীনাথ রায় এগিয়ে গিয়ে জেলা-শাসকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন : আমার সেই কেসটার বিষয় একটু বিবেচনা করে দেখবেন, স্যার।

—নিশ্চয়। যাতে আপনার মান-ইচ্ছা বজায় থাকে, সে দিকে নজর রাখতে হবে বৈকি। চলন্ত জীপ থেকে জেলা-শাসক বেন জমিদারবাবুকে আশ্বস্ত করে অভয়-বাগী শুনিতে গেলেন।

দু'মাস পরে বিচারের রাব বার হ'লো ।

বিচারক এবং জুরীরা একমত হয়ে রাব দিলেন । গাজী সাহেবকে অপমান ও তাঁর বেহারাদের অথবা লাহিত করার জন্য জমিদার সতীনাথ রাবের পকাশ টাকা জরিমানা করা হলো । অন্যদ্বায়ে তিন মাস কারাদণ্ডেরও আদেশ জারী করা হলো ।

রাব শুনে লোকে বললে : এক চালেই গাজী সাহেব বাজিমাত করে দিয়েছেন । কাকাতুয়াই কাজীর বিচার করে দিয়েছে ।*

* একটি মত। ঘটনা অবলম্বনে লিখিত ।

॥ বড়দা যাবেন খড়দা ॥

শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম

গোবর্ধনের বড়দা

কালকে যাবেন খড়দা

সঙ্গে নিয়ে যাবেন তিনি

তিনটে পিণে জরদা !

চূনের জন্য শেষটা

মুখুজ্যেদের কেষ্ঠা

জাহাজ চেপে ঘুরে এলো

সাগর পারের দেশটা !

লোক গিয়েছে আনতে

সুদূর আলাম প্রান্তে

তার জন্তে সব সেরা পান

খবর পেলাম জানতে !

খয়ের কোথা জানতে

বই হলো যে আনতে ।

খবর পেয়েই গেছে হু'জন

ব্রহ্মদেশের প্রান্তে !!

ম্যাজিকের খেলা

শ্রীশ্রীনির্মল রায়

প্রথম প্রথম খুব কঠিন মনে হলেও একটু চিন্তা আর একটু চেষ্টা করলেই শেষকালে দেখা যাবে সব জিনিসই সোজা হয়ে গেছে। এরকম অনেক ম্যাজিক আছে যা প্রথম প্রথম খুব কঠিন মনে হলেও ম্যাজিকের সূত্রটা একটু ধরতে পারলেই ম্যাজিকটা একেবারে সোজা হয়ে যায়। ম্যাজিক শ্রেফ হাতসামান্যই আর যন্ত্রের কলাকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকে তোমাদের এমনি একটা আশ্চর্য অথচ সোজা ম্যাজিক শিখিয়ে দেব। ম্যাজিকটার নাম 'অজানা সংখ্যা বলা'।

ম্যাজিসিয়ান কি দেখাবেন তাই আগে বলে নি।

ম্যাজিসিয়ান দর্শককে ছুই অংকের যে কোন একটা সংখ্যা ভাবতে বলবেন। এবারে তার সঙ্গে তার ভাবা সংখ্যার দশকের অংকের দ্বিগুণ যোগ করতে বলবেন। এই যোগফলের সঙ্গে ৭ যোগ করতে বলা হবে। এবারে যা পাওয়া গেল তাকে ৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। এবারে যা হ'ল তার থেকে দর্শকের ভাবা সংখ্যার এককের অংকের ৪ গুণ বিয়োগ করতে বলা হবে। এবারে যা হল তা ম্যাজিসিয়ানকে বলতে হবে। ম্যাজিসিয়ান তা শুনে বলে দেবেন দর্শকের ভাবা সংখ্যাটা কি।

তোমরা হয়ত ভাবছ ম্যাজিসিয়ান কি করে দর্শকের ভাবা সংখ্যাটা বলে দেবেন। এবারে ম্যাজিকটা কি করে করতে হবে তা বলে দিলে ম্যাজিকটা একেবারে জলের মত সোজা হয়ে যাবে। শেষকালে দর্শক ম্যাজিসিয়ানকে যে সংখ্যাটা বলবেন, ম্যাজিসিয়ান মনে মনে সেই সংখ্যাটা থেকে ৩৫ বাদ দেবেন। এই বিয়োগফলের এককের অংকই দর্শকের ভাবা সংখ্যার এককের অংক। আর এই বিয়োগফলের থেকে এককের অংকটা বিয়োগ দিয়ে যে সংখ্যাটা থাকে, তাকে ৬০ দিয়ে ভাগ করলেই দর্শকের ভাবা সংখ্যার দশকের অংক পাওয়া যাবে। তাহলে দর্শকের ভাবা সংখ্যার দশকের অংকও এককের অংক ছুটোই পাওয়া গেল।

বাস্য, এবারে গম্ভীর হয়ে বলে দাও দর্শকের ভাবা সংখ্যাটা কি। আমার এ ম্যাজিকটার বিশেষত্ব হল এই যে,—এ খেলাটা সহজে ধরা যাবে না ; কিন্তু ম্যাজিকটা দেখাতেও কোন কষ্ট হবে না।

(১)

তোমরা যারা বুদ্ধ করো—

এই ভারতের লাগি’

ওগো জওয়ান, বীর,

রাত্রি দিবস সতর্কতায়



সীমান্তে রও জাগি’,

—উন্নত, ধীর, শির !

সেই তোমাদের, আমরা জানাই

জাগ্রত সব : দেশের জনগণ,

প্রাণের গভীর প্রীতির সম্ভাষণ !

(২)

তোমরা যে আজ এগিয়ে গেছ

ভুচ্ছ করে জীবন-মরণ,

‘শত্রু নিধন’ পণে—

হুর্গম পথ লাডাক নেকায়

কষ্ট কতই করছ বরণ

—রক্ত-রণাঙ্গনে !

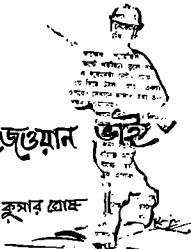
সেই তোমাদের, আমরা পাঠাই

গরম পোষাক, মিষ্টি উপহার,

বীর জওয়ান তোমরা ভারত মা’র ।

জয়তু জওয়ান ভাই

শ্রীবারীকৃষ্ণ কুমার ঘোষ



(৩)

জাতির প্রতিরক্ষা তহবিলে

মা-বোনেরা সোনার অলংকার

—সব দিতেছেন খুলে ।

অর্থ, সেবা, শক্তি এবং রক্ত দিতে ভাই

আজ করেছে নূতন অঙ্গীকার ;

দেশের সেবায়, সকল বিভেদ ভুলে ।

‘দেশ ডাকছে’, তোমরা জওয়ান ভাই—

‘বিলাসীতার সময় গেছে চলে’

—এই কথাটি দাও সবারে বলে ॥

কাবুলী বেড়াল

(উপন্যাস)

ঐশ্বরকৃষ্ণ বসু

(১)

বেশ চলছিল।

কিন্তু গোল বাধাল একটা কাবুলী বেড়াল।

চোর-জোচ্চোরের চেহারা নয়। সাদা ধবধবে, নান্দন-মুহূন একটা বেড়াল। কালো কুচুচে মোটা লেজ।—গ্রাম্পু করে ফুলিরে-কাপিরে তোলা বেন।

মাথার মাঝখান থেকে নাকের ডগা অবধি পেরুর-রঙের লোম, যোগা জিভুয়ের মত চোখা হয়ে নেবেছে। তিলক বলে ভুল হয়।

তাই কাকর খাবারের সময়, সে বখন হাত-পা শুটিয়ে চোখ বুজে কাছে বসে, মনে হয়, পরম বোটম ঐক্যের সীলটি ভিডের লোড কাটিয়ে, নিখিষ্ট মনে ইষ্টনাম অশছে। শুধু তাই নয়, মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভিড দিয়ে যাচ্ছে মুড়ো আখামনের চেহে, মনের নিরালায় হরিণাম শ্রবণ, জীবের জীবনে বিপদভ্রমের সহজ উপায়।—সে বড়লোকের দলানী আফ্রাসীরা জাওটা বেড়াল। কাক নানা না মেনে, একপাতে মাছ, দুধ, ছানা ও নানা খাবার খেয়ে, দুজনে ঘেন গলাগলি ধরে গোলগাল হয়েছিল। তবুও হৈসেলে মাছ দুধের গন্ধে মুখ চুলবুল করে বলে, কেউ তাকে গালাগাল দিলে, আফ্রাসী মুখ লাল করে বলে, “সে টাইপের মেয়ে তুই নোস্ বেলা। হিংস্রটে লোকগুলো অপর ছাঁচুড়া বেড়ালের সোষ তোর কাঁধে ফুলিয়ে ঘেঁষ। কী ভীষণ।”

সে তাকে আফ্রাস করে ‘বেলা’ বলে ডাকে। আর সে আতুরে ডাকের রস বুকে, বেলা ওর কোলে উঠে, মুখে লেজ বুলিয়ে কুওলী পাকিয়ে বসে। তারপর মিট মিটে চোখে তার কুংকুতে চোখের পানে চেয়ে, আফ্রাসভরা শব্দ করে,—ঝ্যাও।

আফ্রাসী সে ভাষা বোঝে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, “তোর দুঃখ বুঝি বেলা। মিছা-মিছি গালমন্দ করলে কার না কারা পায়? পরের বাড়ীর রান্না তুই খাস্ না, তা জানি। কাঁদিস্ না। আমি তোকে আরনা করে মাছ দুধ খাওয়াব।”

আতুরে বেলা ডাকে সে টলমল। তাতে অমন ঝলমল লোড দেখানো। সে আফ্রাসীর মুখে কালো লেজ বুলিয়ে, ঘব্বু শব্দ তোলে। আর আফ্রাসী তার গালে চুমু খেয়ে বলে, “দিন দিন

তুই টিঙ্টিঙে রোগা হচ্ছিল। কিছু খাদ্য না,—তবু হিংস্রটের খুনতটি! দোকান থেকে তোকে আমি মাছ-ভরা টিন আর পাখীর ডিম কিনে দোব।”

এমন আশাস-বাণী শুনে, বেলায় মন নুপুর পায়ে বিনুদিন নাচে। স্বপ্নের ঘিন রঙীন নিশান নিয়ে বনকনিরে চলে।...

(২)

সত্যি এমন মোটাসোটা বেড়াল বড় একটা দেখা যায় না। শুধু তিলক ফোঁটা কাটা নয়, এমন রূপের ছটা বেড়াল সমাজে জোটে না। বাহুয় হলে ঘটা বাজিয়ে এর ঘটা সৌন্দর্য-প্রতি-যোগিতায় রটনা হত। সে ‘মিস্ বেড়াল’ গ্যাডালাভ করত। কান্নে ঘট্টা বেলত। এ ঘটনা ত কম নয়।...কিন্তু তার অভাবে বেলায় মনে মোটে ক্ষোভ নেই। সে কাবুলীদের মত হুটপুট বলে, আফ্রানী আফ্রানী করে তাকে ‘কাবুলী বেড়াল’ বলে ডাকে। তুট হবার পক্ষে তা যথেষ্ট। বেলা হুট হয়ে ডাবে, একের পিঠে শূভ জুড়ে মনের মত, তাই তার পরম বশ। এবং এর স থেকে ফসকে বাবার জাস না জাগার, সে আঁক করে ডাবে, চিরকাল তার ও আফ্রানীর জীবন এমন ঘেঁষাঘেঁষি করেই থাকবে। আপসোসের কারণ দেখা দেবে না।

কিন্তু আশার রচনা দিয়ে সত্যিকার ঘটনা আটকানো যায় না। হুতোর গিঁঠের মত তা ফসকে যায়। আফ্রানীর বিয়ের বয়স হয়েছিল। দাঁত উচু, টেকো মাথা, কুৎসুতে চোখ, কালো ঢাপসা মেয়ে। কালোবাজারি বাপের ঘর আলো করা শিবরাজির সন্তে। আফ্রানী তৈরী। লেখাপড়া ঘরকন্যা শেখেনি। এ বয়সেও নানা আবদার ও বায়না। এমন মেয়ের পরের ঘর করার কথা বাপ মায়ের প্রাণে সহ না। বাপ ঢাক ঢোল বাজনা বাজিয়ে, অচেনা নানা স্থানে বোঁজ করছিলেন। কিন্তু পছন্দ সই পাত্র জোটানো সম্ভব হয়নি। কেউ আফ্রানীর রূপগুণ দেখে খসে পড়ে,—কেউ ঘরজামায়ের প্রস্তাবনা। তখন গাছ থেকে ফল পাড়ার মত জামাই বোঁজার মন্ত, টাড়ির মই কাঁধে আফ্রানীর বাপ পাত্রের বাগান বোঁজেন। ফলের পরিচয় গাছ নয়, গাছের পরিচয় ফল। সিঁড়ুরে আয়গাছ হলেই হল,—তার ফল পেকো হোক, টক হোক, এসে যায় না। কেবল বংশ, এবং তার কংসঙ্গি। তার ব্যান্থানীই আসল।

নামকরা অমন বংশধর ক্যাবলরাম বোঁজে এল। বাপ নেই, ম্মা নেই, ভাইবোন নেই। কাকা, জেঠা নেই—পেঠাও নেই। গুলো কাঠের চেহারা, তামাটে রং, বিছানুজিতে গবেট। নিজেই নিজের মুকলি। একা একা দিবি মেয়ে দেখতে এল।

আফ্রানীকে সাজিয়ে-ওজিয়ে দেখানো হল। মাথার টাক ঢাকার জন্তে ছোট ঘোমটা।

সমোট করা দিন। কিন্তু হঠাৎ হাওয়ার বাপুটা আসার টাক নিয়ে বিত্রাট হবার কথা। হঠাৎ বেলা পেছনের একটা তোরঙ্গে ঢঙ করে বসল। তার কালো লেজ ছড়িয়ে দিল আফ্রানীর মাথার ও ঘাড়ের। সমুদ্র কাটল। ক্যাবলরাম মনে মনে তুলে তারিক করল।

সুইকো মাছের মত নিজের শুকো চেহারার প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না। সে আফ্রানীর নান্দ-হুস চেহারা বেধে ভাবল, কত না দুখ ঘি, ডিম মাসে আর ভেটকী মাছ খেয়ে অমন হয়েচে। এ বাড়ীর সবাই, বেড়ালটাহুত চ্যাপলা মোটা। সেও অমন হতে পারবে। তাই ভেবে সে রাজী হয়ে গেল। পাঁজি বেধে, একদিন গাঁবের বেলা ঢোল সানাই কীসর বাজনা, ঠাক ও উলুপনির মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।

বেলা ভাবল, ভালই হল। ক্যাবল ও ক্যাবলী নামে বখন মিল আছে, মনের পরমিল হবার কথা নয়।

ক্যাবলরাম আফ্রানীকে টাইট করল। সে শব্দকে বাবা শান্তীকে যা ভাষা শুক করল। তারপর গায়েপায়ে বড় স্ত্রীকে দিদি ডাকতে বেয়ে, কিন্তু কামড়ে উঠ করল। স্ত্রীর স্নাওটা বলে, বেলাকে কোলে তুলে নাচাবার নামে নিয়ে ক'পাক নাচল।

বিয়ের পরদিন স্ত্রী আচারের সময়, বাজনার তালে হেলেদুলে, গাঁঠছড়া বাঁধা আফ্রানীকে নিয়ে সে চলছিল। ছোট্ট সীমলক্ষের পেছনে প্রকাণ্ড গাধাবোট! সবাই মনে আফ্রানী,—বেলারও। সে আফ্রানীর বদলে ক্যাবলরামের পায়ে লেজ তুলল। হুড়হুড়িতে পা সরিয়ে ক্যাবলরাম বেলাকে বাড়াল। আর তাতে বেলা ব্যথা পেয়ে, ফোস করে ওঠে দিল খ্যাৎ করে নখের আচড় বসিয়ে।

আর দ্বার কোথায়? ক্যাবলরাম ভাবল সাপ। আর টেচিরে উঠল, “বাপরে বাপ,—সাপ।”

ও নামে আফ্রানী ভিন্নমী ধার। সে মাগো বলে লাঞ্চিত উঠল। আর গাঁঠছড়ার ছাচকা টানে ক্যাবলরাম হোঁচট খেয়ে পড়ল বেধে, আফ্রানী তার ওপরে।

ক্যাবলরাম চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে টেচাতে লাগল, “সাপ, সাপ।”

বাড়ীর পুরুষরা লাঠিদোটা নিয়ে, তপদাপ করে ছুটে এল। কিন্তু কোথায় সাপ? তার টিকির পাত্তা নেই। ক্যাবলরাম বুদ্ধি বাড়িয়ে বলল, “পালিয়ে গেছে।”

প্রাণ ও মান বাঁচল বটে। কিন্তু ক্যাবলরাম মনে মনে তুলল, বেড়ালটা তার সম্মান ক'হাপ নিচে নাখিয়ে দিল।

(০)

বেলার তাতে পথোন্না নেই।

বাংলার সময় সে ক্যাবলরামের সামনে আত্মীয়ের ক্ষেত্র নিয়ে এসে বসে। বেন সে তার শব্দ

বাজীর আপন জন। আহারের তত্ত্বতালপি করে, পরম স্নেহে ‘এটা খাও, ওটা খাও’ বলা তার প্রয়োজন!

শান্তড়ী ও রাধুনী বড় খালা ও বাটিতে পোলাউ, ডাভ, তরিতরকারি ও রকমারি মাছ মাংস সমূখে দেন। ক্যাবলরাম আসন করে বসে। জামাইমাস্তুর, ধীরে স্নেহে খায়। এত খাবার সে কখনো খায়নি। সব নামও জানে না। মন আনচান করে।

গুজো, ভাল, ভাঙ্গাভুজি খেয়ে, যাচ্ছের কালিয়া বা মুড়িঘট কোন্টো ধরবে ভাবে। হঠাৎ নজরে আসে, বেলা তপস্রা শেষে, মিটমিট করে মুড়োর বাটি দেখচে। কেমন স্নেহে হয়।

একটা রামকইয়ের মাথা। তেল, ঘি, গরম মশলা ও পিঁরাঙ্গের কোডন দিয়ে রাঁধা। নতুন জামাইকে তোহাঙ্গ করার তাল্লা ব্যবস্থা। খোশবুতে ভিঙে হ-হ করে বল আসে। বাধা মানে না।

সে বাটিতে হাত দেয়। কিন্তু তার আগে, আই. এক্. এ’র শিক্ত বিজয়ী সেক্টার-করোয়ার্ডের চেয়ে ক্ষতভাষ, বেলা তা কুড়িয়ে ক্যাবি করে নিয়ে যায়। তারপর খাটের তলায় টিকিনে লেগে গেল। তখন হাততালি দেওয়া ছাড়া করণীয় কিছু নেই!

হতভব ক্যাবলরাম মনে মনে মাথা চাপড়ে ‘হা রাম’ করল।

ততক্ষণ শান্তড়ী মিষ্টার নিয়ে এসেছেন। তিনি হা হা করে উঠলেন। আফ্লাদী পেছনে পেছনে চাটুনী নিয়ে এসেছিল। সে ঝিল্‌ঝিল্‌ করে হেসে উঠল। বলল, “নিয়ে গেলি বেলা! শালী-শালাঙ্গ নেই যে একপাতে খাবি। ডাকে খোঁজে নি। তাই আপন হাত জগমাথ করে নিয়ে গেলি!”

শান্তড়ী অবাক হয়ে বললেন, “শোন কথা!” তারপর ক্যাবলরামকে সাব্বনা দিয়ে বললেন, “ভাইবোন নেই। বেলা খুব ক্রাওটা। তুমি ততক্ষণ কালিয়া খাও বাবা। আমি আর একটা মুড়ো নিয়ে আসি।” তিনি আনলেন। ক্যাবলরাম বলল। কিন্তু স্নোভ গেল না। সেই বড় মুড়োর না জানি কি ঘাে ছিল। ছ্যাচড়া বেড়াল সাধে বাধ সাধল। ততক্ষণ মুড়োটা সাব্বাড করে বেলা আবার এসে লপে বসল। আফ্লাদী বলল, “খেলি জামাইবাবুর সঙ্গে? একটু মিষ্টার খাবি?”

বেলা মিউ শব্দ করল। অর্থাৎ,

মুড়োর পর পরমা

যে না খায়, তার মিছেই জন্ম।—

ক্যাবলরামকে অবাক করে আফ্লাদী বেবাক মিষ্টার তাকে ঢেলে দিল!

শান্তড়ী আহা-হা করে আর এক বাটি এনে জামাইকে দিলেন। সে গোমড়া মুখে খেল।

ছ্যাচড়াতে লক্ক কোডনের মত আফ্লাদী বলল, “আর মোব?”

কিন্মিন্দু, পেস্তা, বাদাম দেওয়া ঘন দুধের মিষ্টায়। লোড বথেষ্ট ছিল। তবু ক্যাবলরাম বলল, “নো।” বেগে গেলে তার মুখ থেকে ইংরাজি বকুনী বেরোয়।

(৪)

দুঘটনার এইখানেই শেষ নয়।...

অত্যন্ত সাবধানে খাকা সবুজ, বেলা ক্যাবলরামের কাছ থেকে নিত্য যাচ্ছের মুড়ো নিয়ে যায়। আটঘাট বেঁধে ও পরীক্ষিতের সর্পদংশনের মত আটকানো যায় না। কোন্ কাক দিয়ে তাক লাগায়।

অগত্যা মাথা খাটিয়ে ক্যাবলরাম মোটা ভাঁটের একটা হাতপাখা ছোটায়। বাড়ীতে ক্যান নেই। তার ইচ্ছা, অছিল। করে আহ্লাদীকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে, পাখার বাট দিয়ে বেড়ালটাকে টিট করে বেবে। পিঠি ভাঙলে গুর মাছ, পরমায় ও পিঠি বাবার লোভ ভাঙবে।

আমর করে কাছে ডেকে, সে বেলাকে খানিক মাছের কাটা দিল। সেই সুযোগে তার পিঠি ভাঙার ভক্ত পাখার বাট তুলল। কিন্তু এমন বরাত, হঠাৎ আহ্লাদী এসে বিদ্রাট বাঁধাল। তখন কবাতের মত উন্টে টান দিতে হল। চোখের পলকে ক্যাবলরাম পাখা পাল্টে ধরল। বেলাকে আঘাত নয়, ভক্ত করল বাতাস! বলল, “চোত মাসের ফুটকাটা রোদ। বেলা ঘেমে গেছে, তাই—”

বে কটা দাঁত পুক ঠোঁটের আবডালে ছিল তা বার করে, আহ্লাদী বলল, “দেখলি বেলা, জামাইবাবু তোকে কত ভালবাসে? ঘেমে বাস বলে বাতাস করে।” বেলা বা সেবার দেখল। তারপর বা বেধাবার দেখাল। এমন ম্যালিক বাহুসম্রাট সরকারও দেখাতে পারে না। চমৎকার পা সাকাই। আশ মুড়ো পায়ের আড়াল করে, তাদের নাকের ডগা দিয়ে ভ্যানিশ (উধাও) করে দিল।

“বা দুই নিয়ে গেলি।” আহ্লাদী হেসে গড়ায়। অবশ্য আর একটা মুড়ো এল। গুন্ডো মুখে ক্যাবলরাম বেল।

দ্বীপ দৌলতে ঘরজামায়ের ফুটানী। তাই তার পেটোয়া বেড়ালকে পেটোতে মন পিটপিট করে। অথচ নজ্জারটাকে সাদেস্তা না করলে রাগে দুঃখে হাসকষ্ট হয়।

একটু খোলা হাওয়ায় চাষা হবার অন্ত সে বেধিয়ে গেল। এদিক-ওদিক খানিক পায়চারি করল। তারপর একটা পার্কে ঢুকে, নিয়িবিবি বেক খুঁজে বসল।

মাথার ভেতর ছাঁচড়া বেড়ালটা রকেটের মত ঘুরপাক খেতে লাগল। অথচ হাতের নাগালে এল না! এ ক’দিন অন্তরবাড়ী বার বার খেয়ে সে লোভী হয়েছিল। এতক্ষণে শাওড়ী তাকে লুচি-পরোটা ঝাওয়াতেন। সঙ্গে ঘন দুধ ও সন্দেশ।

বাগ ও হুং ছাপিয়ে তার ক্ষিধে পেল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, গড়ের মাঠ। এক কোণে খোলামহুতির মত মাত্র একটা হু-আনির ঠাট। তাতে মোড়া মেঠাই কিনে পেট ঠাণ্ডা করা চলে না।

অমন সময় কানে ঘুঙ্ঘর বেজে উঠল। আফ্রানী মল পরে। সে চমকে উঠল। কিন্তু দেখল, আফ্রানী নয়,—ঘুঙ্ঘর বাজিয়ে দূরে কিরিওয়াল্লা আসচে। সে হাঁকল,—

‘চট্টরাজের চটপটি, কাং করে সব ফটকটি, চার পরদা এক প্যাকেট, হাতড়ে দেখ নিজ পকেট।’—সবে সবে নিশ্চক্ৰ শোনা গেল, “ও চটপটি, চটপট এক প্যাকেট দাও।”

“আমার আর একটা।”

তারা কুড়মুড় করে চিহিয়ে এসিকে এল। সঙ্গে ভাঙ্গা মশলার সোঁদা গন্ধ। তাদের আলোচনা কানে এল, “চট্টরাজের ফটকটি,—কাষ্ট কেলাস, নারে?”

“চট্টরাজ কি? চটিজুতোয় রাজা?”

“ধোং। চটিজুতোয় রাজা চটপটি ভাজে? চট্টগ্রাম জানিস ত? সেখানকার রাজা হবে।—”

সে বাই হক, ক্যাবলরামের এসে যায় না। কিন্তু কচি দাঁতের চিবুনি আর ভাঙ্গা মশলার হুংঘা হাত ধরে এসে, তার কাঁচা মূখা খুঁচিয়ে পাকাল।

ছেলেগুলো সরে গেল। তখন ক্যাবলরাম ডাকল, “এই চট্টরাজ—”

ঘুঙ্ঘর বাজিয়ে, কিরিওয়াল্লা এসে হাঁকল, চট্টরাজের চটপটি, কাং করে সব ফটকটি—”
টিং টিঙে শব্দে ভেঙ্গে সে দেখলে।

“হু-আনার ফটকটি দাও।”

“ফটকটি নয়, চটপটি। এই নিন হু’ প্যাকেট—”

“তিনটে নয়?”

“কি বে বলেন দাও। এক প্যাকেটে অনেক থাকে। গুণে দেখুন।”

সে ঝামেলায় যেতে ক্যাবলরাম রাজী নয়। কিরিওয়াল্লা চলে যেতে, সে থাওয়া শুরু করে। হঠাৎ কোণে বড় লোমওয়াল্লা, খাবড়া-মুখো একটা কালো কুকুর এল। ঝোলান কান সমেত মাথা নেড়ে শব্দ করল—ঘেউ, ঘেউ।

গভীর আওয়াজ। তালপাতার বা বাঁশের বাঁশীর নয়, কর্ণেটের শব্দ। যেন গাল ফুলিয়ে কোনও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাজাচ্ছে।

ক্যাবলরাম চমকে উঠল। থাওয়া থামিয়ে ডাল করে চেয়ে দেখল, খানদানী বংশের কুকুর। অমন লোম, ঝোলানো কান ও আওয়াজ হেজিপেজি কুকুরের হয় না।

কুকুরটা আবার শব্দ করল, ঘ্ ঘেউ...ঘেউ। ক্যাবলরামের মনে হল, কুকুরটা কেতাদুরস্ত

ভাবায় বলল, শুভ্, যর্পিং স্ত্র। আপনি বাঘ, আর আমি আপনায় কেউ—। সে খুশী হয়ে বলল, “ইয়াস্, মিষ্টার খেউ।” তার কণ্ঠে হৃদয়তা শুনে, কুকুরটা বেফিতে হু’পা ডুলে ডেউ-খেলানো শব্দ করল—খেউ-উ-উ-উ ।

ক্যাবলরাম অস্থমান করল, সে বলছে, কুখার পেট চো চো করছে । সবে ছ-চার পরশা নেই যে কিনে খাই । আপনায় ব্যাডার বেবে মনে হয়, আপনি দাতাকর্ণের অবতার । জিভের ছটকটি লেগেছে,—ফটকটি আবার দিন স্ত্র ।

কুকুরটা দকলকে ঝিড বার করে দেখাল । মাহুকের চেয়ে বড় জিভ । বেখে মায়া হল । ক্যাবলরাম খানিকটা চটপটি তাকে ছুঁড়ে দিল । এক মিনিটে তা মুড়মুড়িয়ে ধেবে, সে কের শব্দ করল—ব্, খেউ উ...খেউ উ । অর্থাৎ খেটুখ্ মিলেন স্ত্র তা ত একটিপ নস্ত । দাতার মত দাঁত বার করা নয়, কৃপণের মত মুখেটেপা হান্স ।—

অগত্যা নিজে না খেয়ে, ক্যাবলরাম সবটুকু তাকে খাওয়ার । কুকুরটা কাটা লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল, খেউ খেউ ভেক্...খেউ খেউ ।

টেলিগ্রাফের টরেটকার মত ক্যাবলরামের কাছে সে কথা হুস্পষ্ট হল । অর্থাৎ ব্যাহু স্ত্র । একট: নছার বেড়াল আপনাকে ভ্যাংচাচ্ছে । আমার বডিগার্ড করে দিন । ঘেয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে যোব ।

শুধু কাকচরিত নয়, কুকুরটা ইঙ্গিতের মত লড়ায়ে বীর । ক্যাবলরাম ছুট হল । কিন্তু পকেটে রেশ ছিল না । তাই কুকুরটার পেটে হস্ত বুলিয়ে, সে চোস্ত করে বলল, “ভুই দোস্ত হলি । চ আমার সঙ্গে । চোর বিলিকে সারাজা করতে পারিস ত তোকে বাস্তা মিল্লী লাজু খাওয়াব ।” কুকুরটা আশ্চর্য হয়ে কাটা লেজ নাড়ল ।

(ক্রমশঃ)

“অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু পদগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে।”

“আমাদের বাতৃচুম্বির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম । উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ।”

“মহা নিঃস্বার্থ নিকাম কর্ম ভারতেই প্রচাৰিত হইয়াছে ; কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি ক্রমবর্ধন—নিষ্কেষ মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারি না ।” —স্বামী বিবেকানন্দ

হীরেলালের কাহিনী

ত্রিসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সোমবার। বেলা নটা বাজে। হীরেলাল এখনো বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেছে। মা এলেন ঘরে—ছেলেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে মা বললেন,—ওমা, এখনো তুই বিছানায় পড়ে আছিস। বেলা নটা বাজে—নেয়ে খেয়ে ইকুলে বেতে হবে না?

কাতর কণ্ঠে হীরেলাল বললে,—বড্ড মাথা ধরেছে।

ছেলের কপালে গায়ে হাত বুলিয়ে মা বললেন,—পা তো গরম নয়। না, জ্বর হয় নি।

হীরেলাল বললে,—জ্বর না হলেও মাথা ধশে যাচ্ছে। শরীর কেমন...

তার কথা শেষ হবার আগেই মা বললেন,—মাথা ধরবে না। কাল সারা দিন বাইরে কি হৈ-হুলা করে বেড়িয়েছো। বাড়ীতে চুলের টিকি দেখতে পাইনি। থাকো পড়ে বা খুশী করো।

মা গেলেন ঘর থেকে বেরিয়ে...মায় এ কথাগুলো হীরেলালের কানেও গেল না। সে তখন ভাবছে, হায়রে, শনিবারের বিকেল থেকে সারা রবিবারটি এত চট্ করে চলে যায় কেন? রবিবারের পর সোমবার...ব্যস্ত মনডে...সোমবারের পর মঙ্গল, বুধ...জারো তিনটে দিন...দিন নয় তো বেন এক-একটা মাস...ও ক'টা দিন বেন কাটতে চায় না। আর এই রবিবারটি...

এমনি চিন্তার তরঙ্গ বয়ে চলেছে হীরেলালের মনে...ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো...খাওয়া-দাওয়া সেরে পানি চিবুতে চিবুতে বাপ এলেন ঘরে—ছেলেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে জলে উঠলো। বাপ ডাকলেন,—হীরে...

হীরেলাল শুধু বললে,—উ...

বাপ বললেন,—দশটা বাজলো। এখনো ঘুম ভাঙলো না। ইকুলে বেতে হবে না?

হীরেলাল বেশ কাঁচুমাঁচুভাবে বললে,—আমার মাথা ধরেছে। বাপ বি'চিয়ে উঠলেন,—মাথা ধরেছে, না হাতী। ভারী ভোঁ মাথা...ওঠো...নেয়ে খেয়ে ইকুলে বাও।

কাঁদো-কাঁদো গলা হীরেলাল বললে,—কিন্তু মাথা...

বাপ বললেন,—মাথা ধরে থাকে, একটা এ্যাসপিরিনের বড়ি খাবে...খুল কামাই করা চলবে না।...ওঠো...ওঠো...

বাপ এলেন বিছানার দিকে এগিয়ে...হীরেলাল বললে,—কিন্তু এখন কি করে যাবো! বড্ড লেট হবে!

—হোক লেট। আমি চিঠি লিখে দেবো'বন।

বাপকে হীরেলাল ডালো করে আনে। বাপ ভারী কড়া মাহুষ...বাপের কাছে অস্থগ-বিস্থগের কথা তুলে কানাকাটি অচল। তবু চেষ্টা...চেষ্টা চাই। Try try try again।

হীরেলাল বললে,—চিঠিটি কষ্ট-আওয়ারে স্মার পড়েন না... ছিঁড়ে ফেলেন! লেট্ হলে তিনি সাজা বা সেন - মার, কামখলা, নীল-ডাউন্।

তখন বাপ তত্ত্বিত। তিনি বললেন,—লেট্ হলে এমন সাজা।

—হ্যা! টেবিলে মাথা ঠুঁকে সেন...তাছাড়া বেত! পরশুদিন ক্রাশের অঙ্কুলের দশ মিনিট লেট্ হয়েছিল, তার বাবার অস্থখ...ওষুধ কিনতে বাবার দক্ষণ ঘেরী - তবু রেহাই নেই...আর তার পিঠে শুশে ছ'ঘা বেত দিলেন!

বাপের দৃষ্টি স্থির, অকম্পিত...সে দৃষ্টি হীরেলালের মুখে নিবন্ধ।

হীরেলাল বললে,—তারপর গেল সোমবার...ক্রাশের বনমালী...তার মামাতো বোনের বিয়েতে বাইরে গিয়েছিল...সোমবার ট্রেনে করে ফিরে ফুলে আসতে পনেরো মিনিট লেট্...তার ফুলের স্টুটি ধরে দিলেন ঝালা...দেহালে মাথা ঠুঁকে সে পড়ে গেল...তারপর তার পিঠে পটাপট বেত...তার কামা ছিঁড়ে পিঠ কেটে রক্ত বেরলো...এমন স্মার...

নিবাস ফেলে বাপ বললেন,—হঁ। এমন পিশাচ মাষ্টার...তার নাম?

হীরেলাল বললে,—তারাপদবাবু।

বাপ বললেন,—এমন মারধোর করা এখন চলে না। তোরা হেডমাষ্টারকে বলিদ্ না কেন?

হীরেলাল বললে,—তিনিও ঠেকে যমের মতো ভয় করেন।

—কেন?

—কেন, তা জানি না।

বাপ নীরবে কি চিন্তা করতে লাগলেন...হীরেলাল বললে,—আর একদিন...আমাদের শব্দর... তার ঘেরী হয়েছিল। স্মার বললেন,—হোয়াই লেট্?...সে বললে,—পুতুর পাড় কি পিছল... আসতে আসতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল...কাপড়ে স্নল-কদা...সে কারণে বসলে আসতে ঘেরী।... স্মারকে কারণ দেখালো...তবু ছাড়ান নেই। তার ছ'হাতে কোরে-কোরে ছ'ঘা বেত—বেচারীর হাত কেটে রক্ত-গলা!

বাপের ছ'চোখ উঠলো কপালে—বাপ বললেন,—ফ্রিমিনাল। না, তুমি বাও নেহে-বেহে তৈরী হও—আমি হেডমাষ্টারকে চিঠি লিখে দেবো—তুমি ইকুলে গিরেই হেডমাষ্টারকে সে চিঠি দেবে।

নিরুপায়। হীরেলালকে উঠতে হলো—এবং বাপের ভাগিদে পনেরো মিনিটের মধ্যে নাওয়া-খাওয়া সারা। বাপ বলেন তার হাতে হেডমাষ্টারের নামে চিঠি লিখে—বললেন,—নিশ্চয় দেবে—নাহলে সাজা পাবে বাড়ীতে। এখন ইকুলে বাও—ঘেরী নয়।

চিঠি নিয়ে গুটিগুটি হীরেলালকে বাড়ী থেকে বেরতে হলো—বাপের কি মনে হলো—তিনি বললেন,—চলো, আমি তোমাকে ফুলের কটক পর্বত পৌছে দিয়ে বাবো।

হীরেলাল বললে,—আমার নাম করে লিখেছো নাকি এ চিঠি? তাহলে স্ত্রীর বাপ—

বাধা দিয়ে বাপ বললেন,—না, না, তোমার নাম করে লিখিনি—আমি শুধু লিখেছি তারাপদ-বাবুর ঐ মারখোর করার কথা।

হীরেলাল একটু বস্তি বোধ করলো। সে ভাবলো—বাবা না জানতে পারেন—অফিস ঘরে হেডমাষ্টার বখন থাকবেন না, তখন চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে তাঁর টেবিলের উপর রেখে দেবে।

ছেলেকে ইঙ্গুলে ঢুকতে দেখে বাপ চলে গেলেন। হুলে ঢুকেই হীরেলাল নিঃশব্দে তার কক্ষে হাজির হলো। কাষ্ট-আওয়ার...স্ত্রীর হিট্টী পড়াচ্ছেন। তিনি পড়াচ্ছেন—নাদির শাহের আক্রমণ। হীরেলালকে তিনি বললেন,—ইউ আর সো লেট্,?...কেন?

হীরেলাল বললে,—বজ্র মাথা ধরেছিল, স্ত্রীর...

—এখন সেরেছে?

হীরেলাল বললে,—একেবারে সারেনি...তবে অনেকটা কমেছে।

—তাহলে হুলে এলে কেন?

হীরেলাল বললে,—বাবা বললেন, হুলে বাও...মাথাধরার জন্য হুল কামাই করবে না।

স্ত্রীর বললেন,—ঠিক কথা বলেছেন। বখন জর নেই, শুধু মাথাধরা, তাও কম...তখন হুল কামাই করে বাড়ীতে থাকা...নিজের ক্ষতি।

হু' পার্তা পড়ানোর পর, স্ত্রীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

হীরেলাল বললে,—আমি আনসাব্ করবো?

—না।...স্ত্রীর বললেন,—তুমি তো শোনোনি সব...তুমি বলবে না।

হীরেলাল নিদ্রাস কেসে বাচলো...কিন্তু মনে অশান্তি...হুলে না আসতে পেলে কি মজাই না হতো! বাবা অফিসে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ডেলিদের মাঠে...সেখানে ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যবস্থা...তা নয়, এ কি বিপদ। হুলে বখন এসেছে, তখন কোন্ না সেই বেলা চারটে পর্যন্ত বন্ধী! হেডমাষ্টারের নামে চিঠি...স্ত্রীর জন্য ভাবনা নেই...এক সময় কাক পাবে...বা ডেবে রেখেছে...কাষ্ট-আওয়ারের পর সেকেন্ড-আওয়ার ইংলিশ্, থার্ড-আওয়ারে সংস্কৃত...এ হু'আওয়ারে কোনো হাল্কা না নেই...কোনো স্ত্রীর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন না...কোনোমতে পড়িয়ে ঘটা কাটিয়ে চলে যান। শুধু এই বন্ধী।

থার্ড-আওয়ারের পর টিফিন। এই টিফিনের পরিদ্রব্ধ বা হলো...সে এক অপূর্ব কাহিনী। অর্থাৎ...অফিস ওদিকে মনে বাপের অশ্রুতি...হেডমাষ্টারের নামে চিঠি লিখে তারাপদবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ জানালেও তিনি ভাবছিলেন—ছেলে বলেছে, হেডমাষ্টারও বখের মতো ভয় করে ঐ তারাপদবাবুকে! কেন? কেন? এ প্রশ্নের খোঁচা তাঁকে এমন অভিভূত করে তুললো যে তিনি টিফিন-টাইমে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা হুলে এলেন এসে হেডমাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ...হুলের

অফিস-কামারাব! হেডমাষ্টার তখন আর একজন টীচারের সঙ্গে বসে কি সব কাগজপত্র খুলে আলোচনা করছেন। বাপ বললেন,—আমি এসেছি হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে...আমার এক নালিশ জানাতে। আমি মার্জেন...আমার ছেলে পড়ে, আপনার খুলে ক্লাশ নাইন্-এ।

হেডমাষ্টার বললেন,—আপনার কি নালিশ?

বাপ বললেন,—আপনার খুলে সেকেণ্ড টীচার তারাপদবাবু।

হেডমাষ্টার বিম্বহ-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকালেন...তারাপদবাবু। না, তারাপদবাবু বলে কোনো টীচার নেই!

বাপ চমকে উঠলেন, বললেন,—ক্লাশ নাইন্-এ হিট্রী পড়ান।

হেডমাষ্টার বললেন,—তিনি উমাচরণ বাবু...এই তিনি বসে আপনার সামনে।

বাপ একটু কেমন অপ্রতিভ হলেন...তাঁর মুখে কথা নেই। হেডমাষ্টার বললেন,—কি নালিশ?

একটা নিশ্বাস কেলে বাবা বললেন,—তিনি নাকি ছেলেদের প্রেচ ও প্রহার করেন...বেত বেতের রক্তপাত করেন?

হেডমাষ্টার বললেন,—মোটাই না। বেত খুলে নেই? তাছাড়া উমাচরণবাবু এত ভালো করে পড়ান যে ছেলেরা তাঁকে খুব ভালোবাসে। তবে যে সব ছেলে অমনোবোঙ্গী, ক্লাস অবহেলা করে...তাঁদের উনি আলাদা রেখে নিজের সামনে বসান...তাঁদের উপর সর্বদা নজর রাখেন! ছেলেদের বেত মারার কথা কে আপনাকে বলেছে? মিথ্যা কথা।

বাপ চূপ...মুখে কথা নেই। এবারে উমাচরণবাবু কথা কইলেন। তিনি বললেন,—আপনার ছেলের নাম?

বাপ বললেন,—হীরেলাল।

উমাচরণবাবু বললেন,—ও...মাক্ করবেন...আপনার ছেলেটি অত্যন্ত অমনোবোঙ্গী...অন্ত ছেলেদের পিছনে লাগে...তাই তাঁর উপর নজর রাখি। আজই ক্লাশে এসেছে ঘেরী করে...বললে,—মাথা ধরেছিল।...আমি আপনার ছেলেকে এখনি ডাকাচ্ছি। আপনার সামনে শীমাংসা হোক।...

বাপ তখন লজ্জার এতটুকু। তিনি উঠতে পারলে বাচেন...

উমাচরণবাবু ডাকালেন হীরেলালকে। হীরেলাল এলো...অফিস-রুমে এঁদের সঙ্গে বাপকে দেবে সে আর ঘরে ঢুকলো না...একবারে পলায়ন। সেদিন খুল থেকে বাড়ী ফিরলো প্রায় সন্ধ্যার সময়...এবং তারপর বাপের কাছে সে যা হালো...

সে সব কথা সবিস্তারে বলবো না, তোমরা শুনলে কেঁদে ফেলবে। তবে খুলে উমাচরণবাবুর নজর তাঁর উপর আরো কড়া হলো এবং তাঁর কাছ থেকে প্রত্যহ হীরেলালকে রিপোর্ট এনে পেশ করতে হতো বাবার কাছে—খুলে তাঁর 'কনডাক্টের' সম্বন্ধে।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কবিরাজ মশাই বললেন—বাত-শ্লেষ্মার প্রকোপ হইছে—

গয়লা-বউ শুয় পেতে গেল। বললে—কী হবে তাহলে?

কবিরাজ মশাই বললেন—আমি সালসা তৈরি করে দেব, তাইতেই আরোগ্য হবে, কিছু ভাববার কারণ নেই—

সেই সালসা পাইয়ে ক'দিন ধরে চললো। যেমন তেতো, তেমনি দুর্গন্ধ সালসা। বলের চেতরে মধু দিয়ে মাড়লেও তেতো-ভাব যায় না। দুর্গন্ধও দূর হয় না। সে এক বিকট সালসা। ক্রামাপদ সেই সালসার নাম শুনলেই ভয়ে আংকি ওঠে। শুধু বালি কিছুকটা সেথলেও কাদতে আরম্ভ করে।

সে সালসাতে যখন কিছু হলো না, তখন কবিরাজ মশাই আর একটা বটিকা দিলেন। শাস্তি-বটিকা। সেই বটিকা গুঁড়ো করে ছাগল-দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হবে।

তা দে-ব্যবস্থাও হলো।

কিন্তু বটিকাতে কী ছিল কে জানে। বটিকা পেটে যাবার আগেই সমস্ত বমি হয়ে যায়। এতটুকু পেটের মধ্যে ঢোকে না।

গঙ্গামণি সারা দিন সারা রাত ছেলেকে কোলে করে নিয়ে থাকে। বিছানা মোটে হোবে না ক্রামাপদ। বিছানার শোয়াতে গেলেই কঁকিকে কঁদে ওঠে। কখনও গয়লা-বউ কিংবা কখনও গঙ্গামণি পালা করে কোলে নিয়ে বসে থাকে।

তখনকার দিনে ডাক্তারি বলতে যা কিছু সে এক ওই কবিরাজী। হোমিওপ্যাথিও নেই, গ্রালোপ্যাথিও নেই। ও-নব আবিষ্কারই হয়নি তখন। কিছু গাছ-গাছড়া আর কিছু খনিজ পদার্থ, এই দিগেই কবিরাজী ঔষুধের কারবার। আর তখনকার দিনে এত ব্রহ্ম রোগও ছিল না এমনকার

মত। তখন ণটিকেরক রোগ, তাইতেই কবিরাজী ঙ্খুধে কেউ মরতো আবার কেউ বা বাচতো। অথচ এখন নানা রকম ঙ্খুধ আবিষ্কার হয়েও যত লোক মরছে, তখনও তত লোকই মরতো। হের-দরে জন্ম-মৃত্যু প্রায় সমানই আছে। মাঝখান থেকে এখন শুধু জাক্কার করে আর ঙ্খুধের কাহবার করে কিছু লোক বড়লোক হয়ে উঠছে। এই নবাবী আমলের চেয়ে এই আমলে যে মাহুষ বেদি সভ্য হয়েছে কিবা বেশী স্বৰী হয়েছে তা বলবার মত নবীর নেই।

তা ক্রমেই দুর্ভাবনা বাড়তে লাগলো গঙ্গামণির।

শেষে যদি শ্যামাপদকে আর সারিয়ে তুলতে না পারে, তখন কী হবে? সে-কথা ভাবতে গিয়েও যেন শিউরে ওঠে গঙ্গামণি। শ্যামাপদ নেই, এ-কথা যেন কল্পনাও করা যায় না। তাহলে কী নিয়ে বাচবে সে। তার চেয়ে ঠাকুর তুমি আমাকে নাও। আমার প্রাণটা নিয়ে তুমি শ্যামাপদকে সারিয়ে তোল। আমার কেউ নেই সংসারে, শুধু এক ছেলেই সখল। তাকে নিও না ঠাকুর। তুমি বরং আমাকে নাও। আমি অনেক পাপ করেছি। আমার পাপের শাস্তি আমি মাথায় তুলে নিছি। তুমি শ্যামাপদকে বাচিয়ে রাখো।

সেদিন গয়লা-বউও ভয় পেয়ে গেল। এতদিন হয়ে গেল রোগ সারছে না। এমন ভাবে তো আর রাখা চলে না।

সেদিন গয়লা-বউ আবার গেল বিধু কবিরাজ-এর বাড়িতে।

বিধু কবিরাজ বললেন—আর একবার বেথতে হবে গয়লা-বউ,—না দেখে আমি কিছু বলতে পারি না—

গয়লা-বউ দু'সের দুধ নিয়ে গিয়েছিল। সেই দুধটা কবিরাজ মশাই-এর বাড়ির ভেতরে গিয়ে রেখে দিয়ে এল।

বিধু কবিরাজ বললেন—হ্যাঁ রে গয়লা-বউ, সেদিন দেখলুম তোমার বাড়িতে বড় বড় লাউ কলছে—

—হ্যাঁ খুড়োমশাই, আপনি লাউ খাবেন?

—আরে, লাউ কি আর খাবার মন্ডে চাইছি। লাউ দিয়ে ঙ্খুধ তৈরি করবো, আমাকে দু'টে লাউ দিতে পারিস।

গয়লা-বউ বললে—দু'টো লাউ কেন খুড়োমশাই, আপনি যত লাউ চান তত দিতে পারি আমার তো খাবার লোক নেই কেউ—

—তা হলে দিস ষটা পারিস। সেই লাউ কুটে এখন ঙ্খুধ তৈরি করবো, সে ঙ্খুধ মাটির ভেতরে নকুন-হাড়িতে করে পুঁতে রাখবো, দশ বছর পরে তাই থেকে ঙ্খুধ হবে—তখন বার করবো—

তারপর বহু-জোড়া পায়ে গলিরে, চাদরটা কাঁধে ধেলে, এলেন গঙ্গামণির বাড়িতে। তখন গঙ্গামণি ঘোমটা দিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছিল।

কবিরাজ মশাই অনেকক্ষণ নাতী টিপে রইলেন। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে বসলেন। গদলা-বউ জিজ্ঞেস করলে—কী দেখলেন খুঁড়ামশাই?

কবিরাজ মশাই বললেন—

—কিছু ভয় নেই, পক-তিক্ত কথার পাচন তৈরিই আছে, তাতেই আরোগ্য লাভ করবে রোগী—

বিধু কবিরাজের পাচনে হেন রোগী নেই যে সারে নি, বলতে গেলে ধ্বংসরী। কিন্তু আবার তাঁকে আসতে হলো, আবার তাঁকে ভাল করে দেখতে হলো। এবার তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

গদলাবউ জিজ্ঞেস করলে—আজকে কেমন দেখলেন খুঁড়ামশাই?

বিধু কবিরাজ কথা বললেন না প্রথমে। একটু চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন—আমি একটু ভাবি, তুমি মা কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা কোর, আমি একটু ভাবি—তত্ত্বপন পাচন যেমন চলছে তেমনি চলুক—

সেদিনও রাত্রে গঙ্গামণি আবার গিড়কীর দরজা পেরিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে আর পাছটার তলার গিরে দাঁড়াল। আজকাল গঙ্গামণি গন্ধ পায় নাকে। নাকে গন্ধ পেলেই বৃথতে পারে আসবার সময় হয়েছে। নিবারণও বোধহয় কাছেই ছিল। গঙ্গামণি যেতেই নিবারণ বেরিয়ে এল। সেই গন্ধ! মুখটা তুলে নিবারণ চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ দুটো উটার মত জ্বলতে লাগলো তার।

গঙ্গামণি বললে—কবিরাজ মশাই আজও এসেছিলেন, জানো, বলেছে, কিছু ভয় নেই, আর একটা নতুন ঔষধ দেবেন কাল—

নিবারণ মাথা নিচু করলো।

গঙ্গামণি বললে—আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে গো, তুমি থাকলে আমি কিছু ভয় করতুম না। তুমি অন্ততঃ একটা কিছু মস্তুর-চিকুর দিয়ে ঠিক ভাল করে দিতে। আগে তো কত লোককে ভাল করে দিয়েছ, এখন কার ভরসাও যে থাকি—

নিবারণ যেন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ধেললে একটা। ফোস্ করে একটা শব্দ হলো।

—খোকাকে একলা ধেলে এসেছি, দরজাও ভেজিয়ে দিয়ে এসেছি। জানি তুমি আসবে তাই না এসে পারলুম না। কিন্তু কী হবে বল তো? আমি তো মা-মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকছি কেবল, মানত করে রেখেছি পোকা সেরে উঠলে আমি বোড়শ পুজো দেব।

নিবারণ গুনতে লাগলো শুধু কথাগুলো। কী-ই বা তার-করবার আছে, কী-ই বা তার

বলবার আছে ? কিছু বলবার করবার ক্ষমতাটুকুও যদি থাকতো। গঙ্গামণি কী করে জানবে কত কষ্টের মধ্যে তার দিন কাটছে। সারা দিন জঙ্গলের ভেতরে নুকিতে থাকতে হয়। কেউ যেন দেখতে না পার তাকে। কতদিন উপোষ করে কাটাতে হয়। কী-ই বা থাকবে। গরু-ছাগল-ভেড়া কিছুই মারতে পারে না। মারলেই জানাজানি হয়ে যাবে। লাঠি-শোটা-বন্দুক নিয়ে মশাল জ্বলে তাদা করে আসবে সবাই। তখন এই গরানহাটির দিকেই হয়ত আর আগতে পারবে না, আর গঙ্গামণির সঙ্গে এই যেমন রোজ দেখা হয় তাও হয়ত হবে না। তখন এই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বনগাঁ কিংবা উলোর দিকে যেতে হবে। ছেলের অস্থব ভালো হলো কিনা তাও জানবার উপায় থাকবে না।

গঙ্গামণি বললে—ডেবে আর কী করবে ? তুমি এবার এসো—অনেকক্ষণ থোকাকে একলা কেলে এসেছি—

নিবারণ তবু নড়ে না। তার যেন থাকতে ভাল লাগে।

গঙ্গামণি বললে—যার কেউ নেই তার ভগবানই ভরসা, তুমি ডেবো না, আবার হয়ত কেউ ডাকবে এখন, সব জানাজানি হয়ে যাবে—

ব'লে নিবারণের পায়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিলে। হঠাৎ পেছনে কেউ জ্বক উঠলো—কেউ-কেউ—

গঙ্গামণি বললে—ওই, ওই—

তবু নিবারণ যায় না। গঙ্গামণি বললে—কই, এখনও যাচ্ছে না, যাও তুমি—এসো—

নিবারণের তবু যেন নড়বার নাম নেই।

শেষকালে গঙ্গামণি চলে আসবার জন্তে পা বাডালো। তারপর ফিরতে গিয়েও আবার পেছন দি়ে দেখলে। নিবারণ তখনও পাড়িয়ে আছে দেখানে। কেউ ডাকছে তাতেও যেন তার জব-জব নেই। এখন হয়ত কেউ কেউ-এর ডাক শুনে এসে পড়বে লাঠি-শোটা নিয়ে।

গঙ্গামণি আবার ফিরলো। বললে—ওগো, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—তুমি শুনেছো ? মুনিদ্বাবাদ থেকে নবাবের নাতি আসছে সুনলুম তোমাকে মারতে—সুনে আমার হাত-পা হিম হয়ে গেছে।

নিবারণ চুপ করেই রইল।

গঙ্গামণি বললে—সুনলুম বাডুজো মশাই-এর বাড়িতে তাদের দল-বল নিয়ে সবাই থাকবে, খাওয়া-দাওয়া করবে, বন্দুক গুলি-বান্ধন নিয়ে আসছে তারা—কী হবে বলো তো ? কার শাপে আমার এমন হলো ? কী করবো এখন আমি বলতে পারো ? আমি কোন্ দিকে সেখি ? আমার বে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে—হ্যাঁ গো, তুমি কিছু বলো ! আমি কী করবো বলে দাও—

নিবারণ তবু কিছু কথা বলছে না।

গঙ্গামণি আর থাকতে পারলে না। নিবারণকে সেইখানে কেলে আবার তাড়াতাড়ি নিজেই ঘরের ভেতরে চলে এল। রেড়ির তেলের শিমিটা কুলুঙ্গিতে তখন টিম্-টিম্ করে জ্বলছে। আর থোকা কাঁথার ওপর শুয়ে ছুট্-ছুট্ করছে। গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি থোকায় মুখের ওপর নিচু হয়ে বলতে—কী হয়েছে বাবা, এই তো আমি এসেছি বাবা, কী কষ্ট হচ্ছে তোমার ? বুকে হাত বুলিয়ে দেব !

আর ওদিকে বিড়কির ওপারে তখনও আগুয় হচ্ছে—কেউ-কেউ—

(ক্রমশঃ)

এই হা হালকা। লোমের চুলগুলো হালকা কৃষ্ণবর্ণ চক্রে বেষ্টিত। এতে এদের সমস্ত দেহ চকচকে দুটকির মত দেখায়।

বেজির প্রত্যেক খাবাতে পাঁচটি তীক্ষ্ণ ও শক্ত এবং এক চল্লিশটি ধারালো দাঁত আছে।

অনেকের পূর্বে ধারণা ছিল, বিঘাত সাপের কামড় এদের কিছুই করতে পারে না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অত্যন্ত ক্ষতের মত সাপের বিবে এরা যে কোন মুহূর্তে মৃত হতে পারে। কিন্তু প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই দুইটি বিশেষ কারণে সে সাপকে কাবু করে যেতে ফেলতে পারে। একটা কারণ হচ্ছে—এর অধিকতর ক্রিয়াজ্ঞা এবং অপরটি চেঁখের ক্ষমতা। কোনক্রমে সাপের কামড় এড়ালেও সাপ তাকে বিঘাত কামড় দিতে পারে না—এই দুই কারণে।

আক্রমণের সময় বেজির শক্ত লম্বা লোমগুলো ঝাড়া হয়ে ওঠে। সাপ তার বিঘাত দাঁত এই সেঁচা ঝাড়া শক্ত চুলের ভিতর দিয়ে বেজির দেহে প্রবেশ করতে পারে না।

আগেই বলেছি এরা সাধারণতঃ মৃত্র ও নিরীহ জীব—সেই মতে সহজেই মাতৃবের গ্রিহপাত্র হয়ে ওঠে।

পরীক্ষার আগের রাত্রে ত্রীত্বপর্ণা মুখোপাধ্যায়

পরীক্ষার আগের দিন রাত্রিবেলা—কাল হইতে বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হইবে। কাল ইরোজী পরীক্ষা। তাই রাত্রিবেলা পড়িতে বসিলাম। সামনে ট্রান্সলেশন খাতা খুলিয়া ও ট্রান্সলেশন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

তখন মনের অবস্থা যে কি হইতছিল তাহা আমি ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। ট্রান্সলেশন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে হইতেছিল সমস্তই ভুল হইতেছে। সামনে খাতা খোলা রহিয়াছে—আমি জানালা দিয়া রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। স্রোতস্রার আলো দেখিতে পাইরা দূরে গাছের শাখায় কাক ডাকিতেছে। বাহিরে শীত—রাতার লোক চলাচল কম। দূরে কাহার গৃহে আমারই মতো কোন পরীক্ষার্থী আপন পড়ার নিমগ্ন। সে বেশ মনোযোগসহকারে পড়িতেছে, কিন্তু হায়—আমি কেন উহার মতো মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি

না? বাহিরের পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত ও নিরুদ্ভব। সেই পরিবেশকে ভঙ্গ করিয়া আমি কিছুতেই পড়ার মধ্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না। মনেও নাই কখন আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অন্তরমন্থভাবে খাতার পাতার উপর কলমের হিজিবিজি রেখা টানিয়াছি। মনের মধ্যে কেবল একটি কথাই চলাফেরা করিতেছে, “আমি কি করিয়া পাশ করিব?” যখনই মনে হইতেছে এই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারিব না তখনই সমস্ত মন ভাবিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ এইসব কথা চিন্তা করিবার সময় মনে হইল, কেন পারিব না? তৎক্ষণাৎ আবার মনে পড়িল কবি বলিয়াছেন—

“পারিব না এ’ কথাটি বলিও না আর

কেন পারিবে না তাহা বলা আরম্ভ।”

আমি যদি সারা বৎসর মনোনিবেশসহকারে পড়াশোনা করিয়া থাকি তাহা হইলে কেন পারিব না? মনকে এই সকল সাধনা দেওয়া সত্ত্বেও মনের মধ্যে যেন কি একটা অশান্তি ঘোরাক্ষেপা করিতেছিল। কিছুতেই মন মানিতেছিল না।

বাহিরের ঘরে বসিয়া মা, ঠাকুমা, বাবা, কাকা ও দাদু কথা বলিতেছেন, আমার কিছু তখন ভালো লাগিতেছিল না। কখন বা ট্রান্সলেশন বই খুলিয়া বসিয়া ট্রান্সলেশন করিবার চেষ্টা করিতেছি, কখনও বা বাহিরের ঘরে গিয়া মা, ঠাকুমাদের কথার মধ্যে যোগদান করিতেছি। যখন ট্রান্সলেশন করিতে বসিতেছি তখন মনে হইতেছে পারিব, আবার যখন মা, ঠাকুমাদের কথার মধ্যে যোগদান করিতেছি তখন মনে হইতেছে, এ আমি কি করিতেছি? সময় পাইয়াও সে সময়ের উপযুক্ত মূল্য বুঝিতেছি না। সমস্ত মনের মধ্যে তখন আমার আলোড়ন চলিয়াছে। ট্রান্সলেশনে যখন দেহিলাম মন বসিতেছে না তখন আর কি করিব? ‘Deepak Readers’ খুলিয়া বসিলাম। অনেকগুলি গল্প ও তাহার প্রস্তোত্তর শেষ করিলাম। তখন আমার আবার মনে হইতে লাগিল আমি কি করিতেছি? কি পড়িতেছি?

এই সকল অস্থিরতার মধ্যে আবার ঘুম আসিতে লাগিল। এক বিপদকে অতিক্রম করিতে না করিতেই আবার আরেক বিপদ আসিয়া আমার সমুখে উদ্ভব হইল। কিছুতেই ঘুমের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। বইয়ের অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে টেবিলের উপর কখন যে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। খেয়াল হইল মাত্র বকুনিতে— জনিলাম মা বলিতেছেন, “সারা বছর পড়বে না, পরীক্ষার আগের রাত্রে পড়ে যেয়ে পরীক্ষায় পাশ করবে!” আমি বলিলাম, “কি করব, না পড়লে চলবে কি করে?” মা আমাকে ঠেলিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিলেন।

বিছানায় গিয়া শুইলাম বটে, কিন্তু বিছানায় আপন দেহকে এলাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কোথায় চলিয়া গেল জানি না। নানারকম বিস্ত্রী চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। সারা রাত্রি বিস্ত্রী স্বপ্ন দেখিয়া কাটিল। সে রাত্রে কিছুতেই ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

সকালে ঘুম ভাঙিতেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। হায় হায়!—রাত্রিটা এমন করিয়া ঘুমাইয়া কাটাইলাম, এখন তো আর সময় নাই? মনে হইল, এবার ভগবান সহায়, আপামী বৎসর হইতে পড়াশোনায় এতো অবহেলা করিব না। হে মা সরস্বতী এবার আমার পাশ করাইয়া দিও।

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

আমার জীবনে একটি ঘটনা

খুঁজু বানার্জী

সেরিনটোর কথা হাত ও আমার মনে পড়ে। আমার এক বন্ধু ছিল। নাম তার হুতপা। খুব ভাল ছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। হুতপা আর আমি পরস্পরকে খুবই ভালবাসতাম। এত মিল দেখে অনেক মেয়েই আমাদের ফিঁদা করত। দুজনেই এক ঘুলে পড়তাম। হুতপা আমার থেকে পড়াশুনায়ে ভাল ছিল। আমিও নেহাৎ বন্দ ছিলাম না। হুতপার ছিল সামান্য গদীব। হুতপার বাবা ছিল না। বাড়ীতে থাকত হুতপা, হুতপার মা ও বোন কথা। হুতপার বয়স যখন আট বৎসর, কণার যখন চার বৎসর, তখন হুতপার বাবা মারা যান। হুতপার বাবা ওদের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছিলেন। ওতেই ওদের কোনরকমে চলে বেত। হুতপা ঘুলে ফাট্ট হত বলেই বিনা মাইনেতে পড়াশুনা করত। হুতপার মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমার ঐ পরিবারকেই ভাল লাগত। আমার বাবা নাথাকায় ওদের সাহায্য করতেন। ইতিমধ্যে হুতপার না একটি ঘুলে কাজ নিয়েছেন। আমি

প্রায়ই ওদের বাড়িতে যেতাম। হুতপাও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসত। আমার মা হুতপা ও কণাকে খুব ভালবাসতেন। হুতপা প্রতি বছর একটা না একটা প্রাইজ পেত। আমিও পরকটা প্রাইজ পেয়েছিলাম। এরই মধ্যে বিধাতা বে আমাদের উপর চরম পরিহাস করবে তা কে জানত! সেদিন ঘুল থেকে আমি ও হুতপা গাড়ি বাজিলাম। আমাদের হাতে প্রাইজগুলো রয়েছে। আমরা ঘুল হাতে রাখায় বেরিয়ে গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছি। বেশ খানিকদূর যাবার পর হুতপা আমার থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছিল। মূহুর্তের মধ্যে কি বেন হয়ে গেল। তখনও হেঁটে চলেছি আমরা। মিনিটখানেক পরে কিনে যেন চাঁৎকার শব্দেতে পেলাম। কে বেন বলছে, “খুঁজু আমাকে বাঁচাও পিছনে তাকিয়ে দেখি যে, একটি ট্যাক্সির নীচে হুতপা পড়ে আছে। তাজাতাড়ি ছুটে গেলাম ওর কাছে। হুতপা প্রাইজটি (সোনার মেডেলের তৈরী) আমার কাছে দিয়ে বলল, “এই প্রাইজটি কণাকে দিয়ে দিও। মাকে বলো হুতপা তারের ছেড়ে তার বাবার কাছে চলে গেছে।” এই দু’টি কথা শুনে আমি তার কথা আর শুনতে পেলাম না। আমার মনে হল, সূর্যাস্ত হবে গেছে আর উঠবার সম্ভাবনা নেই। তার প্রাইজ হাতে নিয়ে আমি ডাবতে লাগলাম যে, যখন ওর মা আমাকে হুতপা কোথায় জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমি তাকে প্রেরণ কি উত্তর দেব? আর কথা যখন আমাকে বলবে দিদি কখন আসবে, তখন কি আমি তার ছোট্ট মিষ্টি মুখখানি দেখে বলতে পারব যে, তোমার দিদি কখনই আর ফিরবে না? এই কথা চিন্তা করতে করতে আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম।



মেঠুড়ে

মুখার্জির মৃত্যুতে রশম দীপটি নিবে গেল, এখন বইলেন সেই দলের একমাত্র খেলোয়াড় রোহায়েৎ হুদীর ব্যানার্জি। মৃত্যুকালে হীরালালবাবুর বরেন্স হয়েছিল উন্নয়ন। সধালাপী, অমারিক চরিত্রের এই মানুষটিকে হারিয়ে বাংলা দেশের ক্রীড়ারলিকরা রাখিত। “মোটাক” স্বর্গত মুখার্জির আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করে।

স্তার জ্যাক হবস

ক্রিকেট জগতের ‘মাস্টার,’ সারে ও ইংলণ্ডের প্রাক্তন খেলোয়াড় জ্যাক হবস আশী বছর পূর্ণ করে একাশী বছরে পা দিয়েছেন। সাসেক্সের হোম-এ নিজের বাড়িতে পরিজনদের ভেতর স্তর হবস তাঁর জন্মদিবসটি কাটান। আশী বছর পূর্ণ করলেও জ্যাককে এখনো বেশ তরুণ দেখায়। ক্রিট দীটে তাঁর ক্রীড়া-সরঞ্জামের দোকান দেখাওনোর জন্তে সপ্তাহে তিনি তিনদিন লওনে আসেন। জন্মদিনে জ্যাক বলেছেন : আমি ডাঙোই আছি। তবে কভার পয়েন্টে বখন কিংি করতাম তখনকার মতন তৎপরতা আমার নেই। এখন বংসের ঠাক দিয়ে বল গলে যাওয়া সহজ নয়।

এালান ডেভিডসন

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বর্তমান পর্যায়ের টেস্ট ম্যাচগুলো শেষ হলেই অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিস্তৃত চৌকস খেলোয়াড় এালান ডেভিডসন ক্রিকেট জগত থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ১১ ডিসেম্বর তিনি শেকিড শীল্ডের শেষ বেলা খেলেন। ডেভিডসনের এখন বয়েস মাত্র তেত্রিশ। চল্লিশটি টেস্ট ম্যাচে ডেভিডসন ১৬৫টি উইকেট নিয়েছেন এবং ১১২০ রান করেছেন। ডেভিডসন অবসর গ্রহণ করলে অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ সফরে খুবই অল্পবিধে হবে কেননা বেনড, ম্যাকে ও গ্রাউট আগেই জানিরে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়া দলের বিদেশ সফরের সময় তাঁদের আর পাওয়া যাবে না।

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

ঐতিহ্যপূর্ণ মেলবোর্ণ মাঠে অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পাঁচদিনব্যাপী দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে প্রথমে ব্যাটায়ের ‘হুযোগ নিয়ে দিনের শেষে ৭ উইকেটে ২৬০ রান ওঠায়।

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলাররা পরপর তিনটি আঘাত হানেন এবং মাত্র ১৬৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার ছ-জন ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত কেন ম্যাকার ও প্রবীণ চৌকশ খেলোয়াড় অ্যালান ডেভিডসন সপ্তম উইকেটে ৭৩ রান ধোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ইংলণ্ডের রান ৬৪৫। ডেম্ফটার ২০ রান করে বিদায় নিলেও কাউন্ডে দিনের শেষে ২৪ রানে অপরাধিত থেকে বান। তৃতীয় দিনে ৩৩১ রানে (কাউন্ডে ১১০) ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেলে—দ্বিতীয় দফার অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে। দিনের শেষে ৪ উইকেটের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে রান ৩৪৫ মাত্র ১০৫। চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৮ রানে শেষ হলে ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় দফার দিনের শেষে ১ উইকেটে ২ রান ওঠায়। অস্ট্রেলিয়ার ত্রায়ায় বৃষ্ণ ১০৩ রান করেন; ইংলণ্ডের ফ্রেডি টুম্যান বোলিংয়ের ৬২ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। পঞ্চম দিনে ডেভিড শেপার্ড (১১০—রান আউট) অধিনায়ক ডেম্ফটার (৫২—রান আউট) ও কলিন কাউন্ডে (৫৮ রানে অপরাধিত) ধীরে ও হুনিচ্চিতভাবে ইংলণ্ডকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে বান। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে ইংলণ্ড টেস্ট পর্যায়ের খেলায় ১—০ ম্যাচে এগিয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া ৩১৬ ও ২৪৮; ইংলণ্ড ৩৩১ ও ৩ উইকেটে ২৩৭।

বীর রমণী

নিউজিল্যান্ডের অধিবাসিনী হুল শিক্ষিকা মিস ডারনা ফ্রেডারিকা হুডি মাইল চওড়া নিরাশা হ্রদ অতিক্রম করেছেন। হ্রদটি বিপদসঙ্কুল, কেননা হ্রদটি নরখাদক কুমীরে পরিপূর্ণ। তাঁর জীবন-রক্ষার জন্যে দেহরক্ষীদের সর্বদা তৈরি থাকতে হয়েছিল। এ ছাড়া সন্তরণকালে মিস ডারনার মাথার ওপর সব সময়েই হেলিকপ্টার উড়েছে খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্তে। হুডি মাইল চওড়া নিরাশা হ্রদ অতিক্রম করতে মিস ডারনার সময় লেগেছিল ২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট।

একশ বারো মাইল সাইকেল রেস

কারবালা স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালিত দশম বার্ষিক নিখিল ভারত ১১২ মাইল সাইকেল রেস প্রতিযোগিতায় (কলকাতা থেকে শান্তিপুর এবং শান্তিপুর থেকে কলকাতা) বঙ্গাক্রিমম্যাসিয়ামের আর, ডি, শর্মা প্রথম স্থান অধিকার করে ডাঃ বিধানেন্দ্র রায় ট্রফি লাভ করেন। মোট চল্লিশজন সাইক্লিস্ট ভোরে বগাহনপথের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পনের জন প্রতিযোগী নির্ধারিত পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যায়ে প্রথম তিনজন সাইক্লিস্টের ভেতর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছিল। এবছর প্রতিযোগিতায় মিল্লি, অম্বু, কেতলা, গুজরাট, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও রাজস্থানের সাইক্লিস্টরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। একশ বারো মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে ঐশ্বর্য্যার সময় লেগেছিল ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ১ সেকেন্ড।



কোলকাতায় এবার হাড কাপিয়ে শীত
পড়েছিল বেশ কয়েক দিন। বর্ডমেনের সময়
কোলকাতা সব দিক থেকে বনন উৎসব-মুখর
হয়ে থাকে—তখন প্রতি বছরই চিড়িয়াখানা,
মিউজিয়াম, সার্কাস ইত্যাদিতে গিয়ে সকলে
আনন্দ করে, গারে গরম কাপড়জামার আচ্ছাদন
দিয়ে, ছোটদের আনন্দের কথাই নেই, সার্কাসে
সেই বেশী ভিড়—এ ছাড়া দল বেঁধে পিকনিকে

বাগরা আছে। শীতকালে যেমন আহারের মুকব্বাচক ব্যবস্থা, আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থাও তেমনি—
এই হাড-কাপানো শীতেই এসব হয়। কিন্তু এবারে এই ব্যবস্থার বেন ছেঁব পড়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।
এই ডাবটা সকলের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বড়রা তাদের বুদ্ধি দিয়ে, বিচারশক্তি দিয়ে
বা করছেন, বিলাস বা আমোদ-প্রমোদ বাদ দিচ্ছেন। প্রয়োজনীয় সবকিছু সীমিত করে আছেন,
সস্তব হলে বাদ দিচ্ছেন। দেশের স্ত্রী আর কি কাজ করতে পারেন—ত্যাগ করতে পারেন
ভাবছেন—কিন্তু ছোটরাও পিছিয়ে নেই। তোমানদের মত ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি অনবরত
চিন্তি : এখন আমোদ-আহ্লাদের সময় নয়, এবং কাজেও তারা তাই করছে দেখে অবাকই হচ্ছি
না, ভবেছি এই চেতনাবোধ এতদিন কোথায় ছিল ?

একটি ছোট ছেলে সে চীনা আক্রমণের সব কথা গভীর ভাবে বোঝে না, বোঝবার শক্তি বা
বয়স হয়নি তার এখনও—তবু সে একদিন পড়াশুনা করতে করতে—লেখার খাতায় একখানা চিঠি
লিখে ফেললে—কল্পিত এক চীনা বন্ধুর উদ্দেশ্যে। চিঠিতে যা লেখা ছিল মোটামুটি এই রকম—
'ভাই চ্যাং, তোমার সঙ্গে আমাদের খুব বন্ধুত্ব ছিল সত্যি কথা, কিন্তু এখন আর বন্ধুত্ব থাকলো না
কারণ তোমরা খুব অকৃতজ্ঞ' ইত্যাদি। এরপর অব্যবহৃত-ভাবলো অনেক কথা...কিন্তু ভাবলে বা
দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, যে এইটুকু ছেলের মন কিভাবে নাড়া দিয়ে উঠেছে।

এক দিবসে চীনারা আমাদের কিছুটা উপকার করেছে বলা যায়—যেমন আমরা অনেকেই
নিজেরা নিজেরাই ভাই-বোন বা একাধিকের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। মনে বিভ্রমের
প্রাচীর উঠে যাচ্ছিল—এমন সময় চীনারা যুক্ত করতে এলো—আর আমরা সবাই একসঙ্গে ষোট
বেঁধে এগিয়ে এলাম। সবাই একসঙ্গে হয়ে গেলুম। এতে কি ভালো হলো বলায়। দেশরক্ষার
সবাই এগিয়ে এসেছেন, এককোটা হয়েছেন—সেই 'একহাজে পাঁচিরাচ্ছে সহস্রটি মন'—আমাদের
একতা দেখে ওরাই ভীত হয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি মন আজ ভেগে উঠেছে, প্রত্যেকটি দেশ
এগিয়ে এসেছে। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত দেশপ্রেমের যে বিরাট আবেগের
স্রোত হয়েছে—তা বিশ্বের বস্তু—তাই এই প্রবল ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে নিরোগ করতে হবে
শত্রু বিকৃত। বিপদের হুকি এসে পড়লো বলেই আমরা আমাদের চিনতে পারলুম। তাই
বলছিলাম এদিক থেকে শত্রুপক্ষ আমাদের ভালোই করেছে।

মনে রেখো এই যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের মনে এসেছে দেশের স্ত্রী, তা বেন বিন্দুত হওয়া
না—স্বতঃস্ফূর্ত না শত্রু বিতাড়িত হচ্ছে।

এর প্রতি মূল কলেজে যে শরীর শিক্ষা বিভাগ প্রচলন হয়েছে—তা তোমরা গ্রহণ করো—
বেহে ও মনে শক্তিস্বরূপ করা ।

কয়েকখানি চিঠির উত্তর দিই—

পলা শত্রুনাশ, কলাইকুণ্ডা—মহাশয়ী পুজো করবে কিনা জিজ্ঞাসা করছে । পুজো করাটা সব
সময় করবে, তাতে মনে শক্তি আসে, কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র ব্যতীত এবার আমোদ-আলাহের মত যে
ব্যয় করো সেগুলো বায় বেড়াই ভালো—বয় চাঁদা বা তুলসে, সামান্য ব্যয় করে তা প্রতিরক্ষা
তহবিলে দিবে সিদ্ধ । এতে সত্যিকারের কাজ হবে । পুজা শেষে অল্প দিবে মায়ের কাছে
শুধু বিজাই প্রার্থনা করবে তাই নয়—দেবের অস্ত্র প্রার্থনা জানাবে—আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক,
সসৌরবে বাবা ভুলে যেন ঠাডাতে পারি ।

সুনীলিয়া বোম, বিহারগড়—অনেক কাহলেও চোখের জল ফুরিয়ে যায় না কেন ? কাহার
সঙ্গে আমায়ের মস্তিষ্কের কয়েকটা স্নায়ুর সম্পর্ক রয়েছে । সেই সব স্নায়ুতে কাঁপন লাগলেই—
কাঁপনের ডেউ এসে লাগে চোখের গ্রন্থিতে । আর সেই গ্রন্থি থেকে হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে
পড়ে । কাজেই বতব্ব কাঁপনের ডেউ লাগবে, ততব্ব চোখের গ্রন্থি কাজ করবেই—জল তাতে
ফুরিয়ে যাবে না ।

মালা, হাওড়া—সাধারণ লোকের পোশাকের সঙ্গে পুলিশের পোশাকের তফাত কেন ?
পুলিশ তো সাধারণ নয় । সাধারণের সঙ্গে তফাত করা হয়েছে বলেই সে পুলিশ—আর পুলিশকে
চিনতে পারা যাবে বলেই পোশাকও তার অন্তরঙ্গ । রাজা ভুলে যাও যদি, পথের পুলিশকে
জিজ্ঞাসা করবে । রাজা যদি পার হতে না পারো গাড়ী-ঘোড়ার ভক্ত—তাহলে পুলিশের সাহায্য
চাইবে, সে তখনি তোমার সাহায্য করবে । কেবল সাঁস করে এগিয়ে যাবে । কিছু ভয়
নেই এদের ।

বর্ণধীর দোলা, নিলয় ও মোনালিসা, লক্কো—চরিত্র, টাকা, বিজ্ঞা এদের মধ্যে কোনটির স্থান
উঁচুতে জানতে চেষ্টা ? এ সবকে তোমরা নিজে কি ভেবেছ বলতো ? জানতে পারলে খুশি
হতাম । মোটামুটি আমাদের কাছে এদের প্রত্যেকটিই প্রয়োজন আছে । তবে এদের মধ্যে
কোনটির স্থান উঁচুতে তা যদি বলো তবে আমি বলবো—চরিত্রের দ্বারাই আমি যেখা দবচেষ্টে
যেই । অবশ্য বিজ্ঞায় সঙ্গে চরিত্রের খুব কাছাকাছি সম্পর্ক । চরিত্র গঠন করতে বিজ্ঞার প্রয়োজন
হয় । কিন্তু কেউ যদি বিজ্ঞানভেদে হুযোগ না পায়, আর বেশীর ভাগ লোকেই তো সে হুযোগ পায়
না—তাহলেও মানুষ হিসেবে তার স্থান খুব উঁচুতে হতে পারে, যদি সে চরিত্রবান হয় । বিজ্ঞান
হবেও যদি কেউ চরিত্রবান না হয়, তাহলে মানুষ হিসেবে তার নাম অনেকখানি কমে যায় বলেই
আমার মনে হয় । তাই আমি মনে করি এ তিনটির মধ্যে চরিত্রের স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে ।

রত্নপ্রমোহন পাহাড়ী, তেলপুর ; কণাকলি মন্ত, বাবুল বোম, কোলকাতা ; টুকর, বেহালা ;
চিহ্না চক্রবর্তী, আগানসোল ; বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, বালি ; স্বপ্ন ও গলি, বহরমপুর—চিঠি পেয়েছি ।
ইতি—
তোমাদের—মধুধি'

ঐতিহাসিক সরকার কর্তৃক ১৪ বক্সি চারুকো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও

তৎকর্তৃক প্রকৃ প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত । মূল্য : ৪৫ ন. প,

* ছেলেমেয়েদের গচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

ফাল্গুন-১৩৬৯

[১১শ সংখ্যা]

প্রণো আহ্বান

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

কৈশোর হল ভোর যুতুর মর্ত্যে,
হিমালয় ভরে যায় সূর্যের রক্তে ।
গহীন পাহাড় গাঙ
প্রাণ করে আনচান—
হিমালয় ডাক দেয় সম্মান-ভক্তে ।
দলে দলে আগুয়ান জোয়ান ও শক্তে ।

দেশমাতা ডাক দেয় চলে যাই যুদ্ধে ।
ফেলে যাই হাসি খেলা,
ভালবাসাবাসি খেলা,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি গিয়ে অরির বিরুদ্ধে ।

শ্রামল খেলার মাঠ—সবুজ অরণ্য—

মন ভার হয় নাকো মোটে তার জন্ত !

দেশ মা যে ডাক দেয়

প্রাণ লাখে লাখ দেয় ।

ক্রন্দন...হাহাকার...লাঞ্ছনা...দৈন্ত...

ধূয়ে মুছে চলে যাই বিজয়ের সৈন্ত ।

দেশ মাতা ডাক দিলে কে যে ঘরে থাকবে !

কে দেবে না সাড়া যাকে দেশমায়ে ডাকবে ।

মার চকল চোখ

ছল ছল হয় হোক—

আমার মা বার মা তো রাখবে না আঁকড়ে ।

চলে যাবো অশ্রুর পারাবার সীতরে ।

জিনে আনবো যে মার হারা সাম্রাজ্য

শত্রুর তরবারি করি' শিরোধার্য ॥

॥ বাহুবল আর শারীরিক বল ॥

বাহুবল আর শারীরিক বলের মধ্যে প্রভেদ আছে । স্ববি বহুমুচন্দ্র এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা এ দুটির পার্থক্য বুঝতে পারবে । তিনি লিখেছেন, “শারীরিক বল বাহুবল নহে । উত্তম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়—এই চারটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার বে কল, তাহাই বাহুবল । বাঙ্গালীর ধর্মপ্রচাৰ, বাঙ্গালীর বাণিজ্য, বাঙ্গালীর নৌবিহার, বাঙ্গালীর উপনিবেশ সংস্থাপন—সেই উত্তম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের সম্মিলন । যুদ্ধ-বিগ্রহাদি এই বাহুবলের একাংশ মাত্র ।”

নসীবের খেলা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মধ্যপ্রদেশের এক সহর। কিছুকাল আগে সেখানে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল বা সত্য, কিন্তু আশ্চর্য। খবরটা কাগজে বেরিয়ে সেই সময়ে বিশেষ উত্তেজনায় সৃষ্টি করেছিল। ঘটনাটা ইংরেজ কবি বায়রণের কথাই প্রমাণিত করে—“এ হচ্ছে আশ্চর্য, কিন্তু সত্য; কারণ সত্য হচ্ছে সর্বদাই আশ্চর্য—কল্পকাহিনীর চেয়ে বেশী আশ্চর্য।”

মিঃ হিনেসেন (আই-সি-এস) সেখানে নূতন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন।

আমালতের কাজ সেরে তিনি বাসার দিকে কিরছেন পদব্রজে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ একটা মত্ত বেশী কুকুর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

কেউ কাছে নেই, তবু একবার এপাশে আর একবার ওপাশে মুখ ফিরিয়ে কুকুরটা বার বার তেড়ে দংশন করছিল যেন শুল্লতাকেই। প্রায় জিম গম্ব দূর থেকেই তার ঠাঁতের ঠক্কটকানি শোনা যাচ্ছিল এবং তার দুই চোখাল দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছিল সন্দেশ লাল।

চারিদিকে ভীত চীৎকার উঠল—“পাগলা কুকুর! পাগলা কুকুর!”

পথ থেকে ছুঁড় করে লোকজনরা ছুটে পালাতে লাগল।

কিন্তু সামনেই একটা বৃহৎ পিপুল গাছের তলার উপবিষ্ট ছিল জটনৈক সৈনিকধারী সাধু। ক্যাপা কুকুরটাকে দেখে তিনি কিন্তু একটুও নড়লেন না, কোলের উপর দুই হাত রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে সমান বসে রইলেন পাথরের মূর্তির মত।

হিনেসেন চোঁচিয়ে উঠল, “এই নির্বোধ! বাচতে চাও তো তাড়াতাড়ি সরে পড়।”

সাধু কিন্তু অটল, যেন বাইরের অগতের সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই।

কুকুরটা একেবারে তাঁর সামনে এসে পড়ল।

নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে সাধুকে রক্ষা করবার জন্তে সাহেব পকেট থেকে রিভলভার বার করে বোড়া টিপ দিলে।

—আর্ত চীৎকার করে কুকুরটা যাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সাধু তবু কথা কইলেন না, এমন কি মাথা তুলে চেয়ে দেখলেনও না।

সাহেব তো মহা ক্লান্ত। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা দেখে সাধুকে তার গ্রহণ করতে ইচ্ছা

হল। কিন্তু সে ইচ্ছাটা হমন করে সাহেব তার সামনে গিরে দাঁড়াল। প্রৌঢ় সাধু, কিন্তু পেশীবদ্ধ সবল দেহ, মাথায় জট-পাকানো লম্বা চুল, গায়ে ছাই-মাখা। যেমন আকচাৰ দেখা যায়।

সাহেবকে দেখেও সাধুর কোন বকম ভাবান্তর হল না। কেবল তিনি সহজভাবেই বললেন, “তুমি তো নতুন কমিশনার-সাহেব?”

—“হ্যাঁ, গেল হস্তার আমি এখানে বসিছি হয়ে এসেছি। কিন্তু বাপু, তুমি আজ খুব বেঁচে গিয়েছ।”

—“এ হচ্ছে নসীবের খেলা।”

—“রাবিস। নসীব, কিম্বৎ ও-সব আমি জানি না। ঘটনাগুলো ঘটে গেল বৈব-পতিকেই। বৈবক্রমেই আজ আমার শকেটে ছিল রিভলভার। আর ঘোড়ার অস্থির হয়েছিল বলে আজ আমি গায়ে হেঁটেও আসছি বৈবক্রমেই। এর মধ্যে কিছুমাত্র নসীবের খেলা নেই।”

সাধু কিছুক্ষণ কথা বললেন না, বেন তিনি গভীর চিন্তার নিমগ্ন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, “কিবা রাত, কিবা দিন, রিভলভারটা সর্বদাই সঙ্গে রাখতে চুলবে না।”

হিনেসেন বললেন, “অকারণে আমি সঙ্গে রিভলভার রাখি না।”

সাধু বললেন, “অকারণে নয়, কারণ থাকতেও পারে।”

সাহেব জানতে চাইলেন, “এ কথার অর্থ কি?”

সহ্যাসী বেন অন্তমনস্কের মত বললেন, “বিপদের ছায়া তোমার চারপাশেই ঘনিয়ে উঠছে। নসীবের খেলা।” তারপরেই তিনি গড় গড় করে কতকগুলো দুর্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

হিনেসেন আর কোন বাক্যব্যয় না করে মাইলখানেক হেঁটে একটা মাঠ পেরিয়ে নিজের বাংলোর গিরে উঠল। রিভলভারটা টেবিলের একটা ‘ড্রয়ারে’র ভিতরে রেখে দিয়ে নিজের মনেই বললে, “ধাঞ্জাবাজ সাধু! আমাকে বোগবলের মহিমা দেখাতে চায়। এ-সব বুদ্ধকবিতা আমি ভোলবার পাত্র নই।”

হস্তাধানেক পরে।

বেজার গরম। ঘরের ভিতরে প্রাণ হাঁপায়। হিনেসেন বাংলোর বারান্দার ক্যাম্প-বাট পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডোরের দিকে আচম্বিতে এক বিবর গঙগোলে তার ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখলে, একটা কপ্‌নি-পরা প্রকাণ্ড প্রাণ-নর মূর্তি তার পারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সাহেব বিছানা থেকে নামতে না নামতেই সেই বগুমাঝের মত মূর্তিটা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ছুই হাতে সজোরে তার গলা টিপে ধরল।

তাকে বাধা দিতে গিয়েই হিনেসেন বৃকতে পারলে তার কাছে সে শিশুর মতই অসহায়। দেখতে দেখতে তার বলিষ্ঠ হাতের চাপে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

সাহেব আর কিছু না করতে পেরে তাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরলে—কিন্তু বৃথা। তার ধংশন সে আমলেই আনলে না, উন্টে হাতের চাপ আরো বেড়ে উঠল, হিনেসেনের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসতে লাগল—

—এমন সময়ে নৌ করে কি—একটা আগুয়াজ শোনা গেল, তারপরেই একটা প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের গলার উপর থেকে হাতের চাপ আলগা হয়ে গেল এবং শব্দের মূর্তিটা ধপাস করে তার দেহের উপর আছড়ে পড়ল।

ততক্ষণে চারিদিক থেকে চাকর-বাকররা ছুটে এসে আক্রমণকারীকে ধরে ফেলেছে, কিন্তু তার শরীরে এমন বিবর শক্তি যে কয়েক জন মিলেও তাকে বাগে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হল—যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতেই হল। সকলে মিলে দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেললে।

হিনেসেন ভীষণ হাঁপাতে লাগল, ব্যাপারটা কিছুই বৃকতে পারলে না।

তখনও ভালো ক'রে আলো কোটেনি, চারিদিক ছায়াময়। লর্ডন আলতেই হিনেসেন সচমকে দেখলে, বারান্দার দাঁড়িয়ে আছেন সেই সাধু, তাঁর হাতে একগাছা মোটা লাঠি।

এতক্ষণে হিনেসেনের হাঁশ হল, সে বৃকতে পারলে কে তার রক্ষাকর্তা।

সাধু বললেন, “আজ তোমার ফাঁড়া আছে কেনেই আমি এখানে এসেছি। ও লোকটা উন্মাদ-এক। একবারে বন্ধপাগল।”

হিনেসেনের মন কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হয়ে উঠল। সাধুরে কবরদর্শন করবার অন্তে সে তাদাতাড়ি নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে।

সন্ন্যাসী কিন্তু ভাবহীন যৌন মুখে নিম্মল, নিম্পন্দ।

হিনেসেন বললে, “সাধু, তুমি কি বকশিশ চাও?”

সধু বললেন, “বকশিশের কথা তুলো না সাহেব। আজ আমি খালি কৃতজ্ঞতার স্বপ্ন দেখে গেলুম”, বলতে বলতে ও লাঠি ঠক ঠক করতে করতে তিনি বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে গেলেন।

লোকজনরা বলে উঠল, “সজ্জানী ঠাকুর চোখে দেখতে পান না।”

আশ্চর্য হ’য়ে হিনেসেন বললে, “চোখে দেখতে পান না?”

—“না। উনি অন্ধ।”

হিনেসেন হতভয়। সে ডাবতে লাগল, তাহলে কি বোগবল, অস্ব’দৃষ্টি, অলৌকিক শক্তি, এ-সব ব্যাপার মিথ্যা নয়?

তারপরেও আবার সাধুর কাছে গিয়েও সে তার প্রেমের স্রাব পায়নি।

॥ গুজব দাছ ॥

শ্রীযজ্ঞপদ চট্টোপাধ্যায়

সাত গাঁয়েতে বিখ্যাত সে সবার সেরা টাক তার ;

সে আমাদের গুজব দাছ গুজবপুরের ডাক্তার।

কিনকিনে বায় দমকা হাওয়ায় শনের মতো দাড়ি ;

উড়লে আঁহা কুর্ কুর্ কুর্ লাগতো মজা ভারী।

গুজব দাছ লোকটি কিস্ত বড্ড বেশী ঠাণ্ডা ;

পান থেকে চুন খসলে শুধু মারতো মাথায় ডাণ্ডা।

কাটিয়ে মাথা চুন লাগাত এতই উদার মনটি ;

মিষ্টি বুলি বলত মুখে—লক্ষ্মী বাছাধনটি।

গুজব দাছর বাপের ভিটে হজুক নদীর পূর্বে ;

চোখটি বুজে দখিন গিয়ে বাম দিকেতে ঘুরবে।

তারপরেতে ডাইনে বঁকে দশ হাত যাবে মাত্র ;

সেখায় থাকে গুজব দাছর উজ্জবকুমার ছাত্র।

তার কাছেতেই খবর নিয়ে ঠিক-ঠিকানা জানবে ;

গুজব দাছর দেশের থেকে গুজব কিছু আনবে।

সংগীতে বিবেকানন্দ

শ্রীসংকুমার গুপ্ত

পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করিবার পূর্বে এবং স্বামী বিবেকানন্দরূপে বিশ্বখ্যাতি-লাভের অনেক পূর্বেই গৃহস্থসম্মান ভক্ত নরেন্দ্রনাথ সংগীত পরিবেশে বসিত হইয়া নিজে ক সংগীত-রূপে গঠিত করিয়াছিলেন। বাল্যের শোনা আগমনী-বিজয়া সংগীত, বৈকুণ্ঠ শ্যামলী-সংগীত, বাজ্র-কবিগান-জুড়া-পাঁচালী-গাথা প্রভৃতি তাঁহার বিশেষরূপে অধিগত হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-পরিবেশে অবস্থান সময়ে তাঁহাকে সংগীত-রসিকরূপে দেখা গিয়াছিল। এই সময়ে বিভিন্ন সাধক-রচিত ব্রাহ্মসংগীতগুলি তাঁহার হৃদয়ে প্রায়ই শোনা যাইত। শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে তিনি সংগীতের অর্থ্য লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যানাথ পাকডাঙ্গী রচিত “মন চল নিম্ন নিকেতনে”—এই ব্রহ্মসংগীত তাঁহার গুরুদেবকে মোহিত করিয়াছিল। বিভিন্ন জনসমাবেশে অহরোধ্যাধাত্রী নরেন্দ্রনাথ সংগীতদ্বারা ই উক্তজনকে আপ্যায়িত করিতেন। এই শিক্ষা তাঁহার বাল্য হইতেই গঠিত হইয়াছিল।

ভক্তকবি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত কয়েকটি আধ্যাত্মিক সংগীত বিবেকানন্দ স্বামী আপন মনে গাহিতেন, সে সময়ের অপরূপ পরিবেশ ভক্তজনের মনপ্রাণ আকুল করিত। ‘বৃন্দসেব চরিত’-এর একটি গান “জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,” গাহিতে গাহিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ভক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে বাহা লিখিয়াছেন—

“নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যখন এই গানটি গভীর স্বাভিহিতা করিয়া শ্রীমদার সৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট বাড়ির হালানে আপন মনে পাণচাষি করিতে করিতে গাহিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে গানটি এমন ঐতিমধুর হইত যে বাড়ির আশেপাশের ঘরের নিখিত ব্যক্তিরা নিজা-ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতে। স্বয়ং-ভাল-বাগের কথা নহে, ভিতরের প্রাণ থেকে নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্তভাবে গানটি গাহিতেন। বাহ্যিক নরেন্দ্রনাথের মুখে স্বাভিহিতা সেই গান শুনিতে, তাঁহাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না। সংসারের মায়াবশত ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম ভগতে প্রবেশ করিতেন।” —শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় ভাগ।

এরূপ ভক্তের কণ্ঠে জুড়াবা সংগীত আহরণ করা পথম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই। বহুদিন হইল স্বামীজির কণ্ঠ নিঃসৃত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান ভক্তগণের শ্রবণে সেই অপরূপ সংগীতের রসান্বাদন করা আর কোন মতেই আর সম্ভব নয়। স্বামীজি তাঁহার স্বল্পকালীন গৌরবময় জীবনকালের মধ্যেই

কয়েকটি সংগীত রচনা করিয়া আমাদের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই।

স্বামীজির গানের ভাষা ও ভাব সর্বজন গ্রহণযোগ্য। তিনি নিজে ভাষা সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করিতেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

“ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরু ভাবাকে অহুসরণ করি। উহা যেমন চলিত তেমনি ভাষের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অভাবে প্রকাশ পাইতে পারে।”

স্বামীজি-রচিত কয়েকটি সংগীতের মধ্য হইতে একটি সংগীত এখানে তোমাঘের লক্ষ্য পরিবেশন করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

। বাগেশ্রী আড়া ॥

নাহি হৃদে, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক হৃদয়।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসব ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অশ্রুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে।
ওঠে ভাবে ডোবে পুনঃ অহং হ্রোতে নিবস্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াসল, মহালয়ে প্রবেশিল।
বহে মাত্র ‘আমি’ ‘আমি’ এই ধারা অহঙ্কণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল।
অবাঞ্ছনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে বার।

হবেই হবে জয়

শ্রীমঙ্গলদন চট্টোপাধ্যায়

গ্রহণ করো আজকে সবাই প্রতিরক্ষার কাজ, যে যেখানে যেমন আছে—সেটাই প্রিয় হোক,
নাও তুলে নাও দেহের পরে পূর্ণ বীরের সাজ। এগিয়ে চলো দেশের কাজে তুচ্ছ ক’রে শোক।
জাতির নিকট হতে যে আজ এসেছে এই ডাক, স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে, রক্ষা করাটাই—
অলস দিনের আরামগুলি আজকে তোলা জগৎ মাঝে সবার বড়, অরুণ রেখো তাই।
শাক।

দল বড় নয়—দেশ যে বড়, নাই এতে সংশয়,
বীর সৈনিক এগিয়ে চলো, হবেই হবে জয়।

বুড়োর একটি উদ্ভ্রম

শ্রীমন্ত ব্রজব্রত

শেরালের গায়ের বঁটা যে কেমন
তা তোমরা নিশ্চয়ই জান; কিন্তু এই
বাগামী বংবের শেরালের লেমের শেষ
প্রান্তটা যে কেন শাবা, সেটা হয়তো
অনেকেই জানো না। এ নিয়ে
নরওয়েতে ভারী হুম্মর একটি গল্প
আছে। সেই মজার গল্পটা এখন
তোমাদের বলছি।

এক বুড়ী লক্স-জানোয়ারদের নিয়ে থাকতে খুব ভালবাসতো। তার ছ'টা শূকরছানা আর
দশটা মুরগী ছিল। একদিন বুড়ী মনে মনে ভাবলো, তার ততো দিনে দিনে বরস বাড়ছে; এখন
একজন সাহায্যের লোক না হলে আর চলে না। এই ভেবে একটি লোককে সে জিজ্ঞেস করলো,
তাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা।
লোকটি বুড়ীর কথার অসম্মতি
জানালো; কারণ তার নাকি অনেক
কাজ।

এরপর বুড়ী একটি খেঁড়ে
ডালুকের কাছে গেল। ডালুক সব
জনে সম্মতি জানালো; আর এদিকে
মনে মনে ভাবলো—বাঃ, মাঝে মাঝে
বেশ আরাম করে এদের দিয়ে ভোজন-
পর্বটা সারা বাবে।

ডালুকের কথার খুশি হয়ে বুড়ী
জিজ্ঞেস করলো—তাদের সঙ্গে বেশ
ভাল ভাবে কথাবার্তা বলবে তো?

নিশ্চয়ই। আমি তাদের আদর
করে গরর-গরর-গরর আওয়াজে
ডাকবো।



'তোমার নিয়ে লেবে না বাপু।'



‘একটা মূরগকে খুঁধ নিয়ে পালান্বে।’

আদরের ডাকে তারা যে ভয়ে আংকে উঠবে।

শেষে বুড়ী গেল এক খেঁকশেরালের বাড়ী।

শেরাল শুনে বললো—তোমার কিছু ভাবতে হবে না বুড়ীমা; আমি তাদের খুব আদর করে ডাকবো—এসো এসো, আমার ছোট্ট সোনারা এসো।

বুড়ীতো ভারী খুশী। বললো—ঠিক ঠিক, তুমিই পারবে আমার সাহায্য করতে।

তারপর শেরাল বুড়ীর বাড়ীতে থেকে শূকরছানা আর মূরগীদের ঘেঁষাশোনা করতে লাগলো। তার কাছ ঘেঁষে বুড়ীর আর আনন্দ ধরে না। শূকরছানা আর মূরগীদের বাঁওরায় ধেঁওরা, আগলানো—সকল কাজে সে বুড়ীকে সাহায্য করে।

একদিন কালো শূকরছানাটাকে দেখতে না পেয়ে শেরালের কাছে বুড়ী খোঁজ নিল। শেরাল জানালো—পাশের ক্ষেতে গেছে, এখুনি ফিরবে।

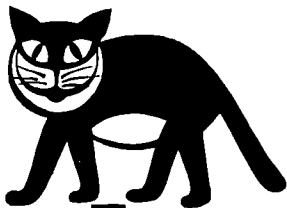
বুড়ী মাথা নেড়ে বললো,—
তাহলে তো তোমার মিথে চলবে
না বাপু; আমি অন্তর বাই।
তোমার ঐ পরগরানি আওয়ারে
তারা যে সবাই ভয় পাবে।

পথে বেতে বেতে বুড়ীর
সাথে নেকড়ে বাঘের দেখা। সব
শুনে ভালুকের মত সেও মনে মনে
ডাবলো—কি যজ্ঞ। শূকরছানা
আর মূরগী বেতে সেও তো ওস্তাদ।
তাই নেকড়ে বুড়ীকে জানালো, সে
সাহায্য করতে প্রস্তুত। আর খুব
আদর করে তাদের ডাকবে। মূখ
মিথে আওয়ার করবে—আউ-আউ-
আউ।

শুনে বুড়ীর মন গেল ভেঙ্গে।
বললো—না-না, তোমার দ্বারাও
চলবে না বাপু। তোমার ঐ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(৪)



ক্যাবলি বেড়ান | (উপন্যাস)

ত্ৰিপ্রকৃষ্ণচন্দ্র বসু

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত
হুয়েছে। ঘেরাটোপ-ঢাকা আলোয়
পার্কি বিভ্রম জেগেছে। ক্যাবল-
রামের মনেও তাই। কাজেই
গোঁসার জট খসে গেল। সে খুলী
হয়ে শিথলগুহে গোঁসাই প্রভুর মত
বস্ত্রবাজী হেলেদুলে চলল।

কুকুরটা নেমক হালাল।
নেচে নেচে সঙ্গে চলল। বস্ত্র-
বাজীর গেটের কাছে থেমে,
ক্যাবলরাম বলল, “অ্যা, সত্যি সঙ্গে
এলি!” কুকুরটা মুখ তুলে শব্দ
করল, যেউউ ডেক্, যেউউ ডেক্।

অর্থাৎ, অবাক হবার কি আছে শুধু? কুকুর যদি যুঁথিটির সঙ্গ স্বর্গে যেতে পারে, আপনার বস্ত্রবাজী
আমি যেতে পারব না কেন? নিজে না থেবে, হুন বেওয়া চটপটি আযার খাইয়েছেন। তার গুণ
গাইব না?—

ঠিক কথা। ক্যাবলরাম তাকে নিয়ে বস্ত্রবাজী ঢুকল। কিন্তু প্রথমে নাকসিট্‌কালেন
শান্তভী খরং। ক্যাবলরাম স্তব্ধ করাল, “বেড়াল যখন ঘরে আছে মা, কুকুরে দোষ কি?”

শান্তভী বেড়াল ও কুকুরের আহ্বারের তুলনা করে বলেন, “বেড়াল দুধ মাছ চুরি করে, কিন্তু
ভরাল করে না। আর কুকুর বা তা চেটে খায়,—ঝড়টি করে।”

ক্যাবলরাম ব্যস্তে বলে, “কেপেছেন! এর ঝোলানো কান দেখুন। সারথ-বাজীর হুন
থেয়েছে,—তার কত গুণ! চাল-চলনে পান থেকে চুন খসার জো নেই। তা ছাড়া যেখানে-সেখানে
লোটাতে বলে লেজ দাঁটা।

ক্যাবলরামের শান্তভীর চোখে চেয়ে, কুকুরটা শব্দ করল, ডেক্ ডেক্ যেউ ডেক্ ডেক্ যেউ।—

অর্থাৎ, কিছু ছাটাই না করে কেউ কি সমাজে বাস করতে পারে ঠাকুর মা? ঝাঁটাঝাঁটি না করে ছাটাছাটি ভাল। তারপর ফের শব্দ করে, ভেক্ ভেক্ ভেক্ ভেউ ভেউ।

ক্যাবলরাম অহুবাধ করে বোকার, ও বলছে বনেহী বংশের ছেলে আমি, ঠাকুর মা। আমার পূর্বপুরুষ স্বর্ণ বেখে এসেছে।

এই ওপর আর কথা নয়। সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজো-তর্পণ আর গঙ্গাশ্রান করেও এবাবৎ তাঁর স্বর্ণ-বর্ণনের সৌভাগ্য হয়নি। আর কুকুরটার কি পুন্ডিয়া গা।

তিনি বলেন, “বধন বলছ, কি আর করা। তবে বাড়াঘরে, ঠাকুরঘরে—”

ক্যাবলরাম জিভ কেটে বলে, “কি বে বলেন মা।”

শান্তডীকে মানিয়ে ক্যাবলরাম কুকুর নিয়ে শোবার ঘরে গেল। তখন বেলা এসে পিঠ ঝাকিয়ে চালোড় করল, ম্যাও ম্যাও ক্যাচ্।

অর্থাৎ, তুমি কে বট হে বাপু? উড়ে এসে জুড়ে বসার মংলব? এ বেন কোথাকার এঁড়ে গক।—কুকুরটা দাঁত দেখিয়ে শব্দ করল, ঘ্ ঘেউ ঘেউ ভেক্ ভেক্ ঘেউ ভেক্। অর্থাৎ, তুই আবার কেহে? ঠাকুরমা পাশপোর্ট দিলেন, আর তুই কিনা কোর্ট আগলাতে চাস্।

বেলা তবু কুঁজো পিঠে ক্যাচ্ ক্যাচ্ ম্যাও, ম্যাও শব্দ করতে থাকে। অর্থাৎ আগ্লাব না ত কি? এটা পাগলাগারদ নয়। আমাইবাবুর সঙ্গে আমাদের ঠাট্টা তামাশা, ইরাকী ফাজলামো হয়। কিন্তু তাতে মনের এমন চিড় খায় না যে একজনে চিঁড়ে-ডাঙ্গা খাবার লজ্জা তোমাকে ডাকা দরকার। বাও, ভাগো হিঁদ্রাসে—

কবিগানের পাজার কুকুরটাও বেলা বাধ না। সে মুখ ভেঙে শব্দ করে, ভেক্ ভেক্ ভেক্ ভেক্ ঘেউ ঘেউ ঘেউ—অর্থাৎ, ফাজলামো নয়। বোন আমাইবাবুর সঙ্গে এসেছি। ফেউ নই, ফিঙা নই,—আমি বড় কুটুম।

ক্যাচ্ ম্যাও ম্যাও, ক্যাচ্ ম্যাও ম্যাও,—বেলা শব্দ করে। অর্থাৎ, বা বা, কুকুর আবার কুটুম। তেলাপোকা আবার পাবী, কেঁচো আবার সাপ। তুই নকরেরও অধম।

কুকুরটা বেগেবেগে শব্দ করে, ভেক্ ভেক্ ভেক্ ভেক্—ঘেউ ঘেউ—

অর্থাৎ, কি বলি নকর? জানিদ্ শান্তরে লেখা আছে, দত্ত কাকর তৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে। আমাদের বংশের কুমারী লাইকার কথা কাগজে পড়িস্ নি? সে শ্মৃটনিক চেপে কুমারিকা ও কুমেরু পেরিয়ে সকলের মাথার ওপর ফর্ফরু করে উড়েছে। কাউকে পরোয়া করেনি।

তুনে লেখের উপর বসে, সামনের পা গালে ঠেকিয়ে, বেলা শব্দ করল, ম্যাও ম্যাও ম্যাও ক্যাচ্ ক্যাচ্—। অর্থাৎ একেবারে সবরি (পুঁটিমাছ) ফর্ফরাতে।—ফর্ফরী বাধ। শ্মৃটনিকে

চড়ে ফুটানোর কথা জানি যে জানি। কতটুকু আর গিয়েছিল! দেখবি যেদিন আমাদের বংশের মেয়েরা বাবে। তারা কোনও এহ বাহু বেবে না। নিজে ঘুরপাক না খেয়ে তোদের বাওয়াবে।

ঠাট্টার কেটে কুকুরটা শব্দ করল, ডেউ ডেঙ্ ডেঙ্ ডেউ ডেঙ্ ডেঙ্ ডেউ ডেউ।

অর্থাৎ, পুঁচুকে বেড়াল, ওসব ফুঁস মস্তরের কথা সিকের তুলে রাখ। তোয় হেলাকেলার নাম বেলা, আর আমার নাম ডেক্রাম। ড্রাম্ করে ছোট্ট বন্দুকের গুলির আওয়াজ। বাঘও ডর পায়। নামেই পরিচয়। আমার মুনিয়ের নামও ক্যাবলরাম। তার মৌলতে তোয় মুনিয়ের সিঁথির সিঁহর, হাতের নোয়া, রঙিন শাড়ির ধুমধাম নৈলে—”

এ কথার অব্যব নেই। হেরে গিয়ে বেলা মিহি মিউ মিউ শব্দ করে, আল্লাদীকে জানায়। কিন্তু কুকুরটাকে যেদান যায় না।

ক্যাবলরাম সালিশ-মীমাংসায় নালিশ বরবাদ করে। সে ছড়া কেটে বলে,

“লস্কীর বাহন পোঁচা, গপেশের হুঁদ্র,
তোমার বাহন বেলা, আমার কুকুর।”—

উত্তম কথা। আল্লাদী মেনে নেয়। মীমাংসা হয়, ডেক্রাম ক্যাবলরামের আর বেলা আল্লাদীর পাতে থাকে। যে বার স্নাওটা। ক্যাবলরাম নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ নামকরণ করেছিল। কুকুরের ডেঙ্ ডেঙ্ শব্দ আর নিজ নামের শেষ দু’অক্ষর।

আসলে কিন্তু মীমাংসা হয় না। বেলা ক্যাবলরামের পাত থেকে মাছের মূড়ো চুরি করার চেষ্টা করে। কিন্তু ডেক্রাম ধরে কেলে। তখন গুরু হয় বগড়া, হটোপুটি।

বেলা মার খেয়ে, মিউ মিউ করে আল্লাদীকে নালিশ জানায়, বগুমার্ক কুকুরটা আমাকে অন্যায় করেছে। তোমার সঙ্গে গুই, পাতে খাই, তাই হিংসা। আমাইবারু বম এনেছে। দুষ করে দাও।—

নিত্য বগড়া, নিত্য বিটিমিটি। অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাদী ক্যাবলরামকে বলে, “ডেক্রাম বেলাকে ধামোকা কামড়ায়।”

“ধামোকা? পাতের মাছ চুরি করে, তাই—”

“চুরি করে। বেলা সে ধাঁচের মেয়ে নয়। ডেক্রামই বরং—”

“উহঁ। ডেক্রাম বনেদী বংশের ছেলে—”

“আর বেলা বুঝি হেলা-কেলার?”

কথায় কথা বাড়ে। বগড়া বাড়ে। গুরু হয় বার বার স্নাওটাকে নিয়ে নাচানাচি। তারপর দু’জনে কথা বন্ধ করে গুম হয়।

(৬)

হুট্ট হুট্ট মোটর । তারপর একের আড়ালে অপরের পেটোহাকে পেটানো ।

বিন হুপুং নহ, হাত হুপুং । সবাই ঘুমোয়, কিন্তু ওরা মইকা মেবে থাকে । আর স্তবোগ মত এ ওকে ডিকিহে, হাতপাখা দিয়ে ভেক্রামও বেলার শিঠে পট্কা ফুটায় । মোটা ভাঁটের পাখা ওরা ফুটিয়েছিল ।

বেলা শোর আল্লাদীর ওপাশে, খাটে, আর ভেক্রাম শোর ক্যাবলরামের ওপাশে মাটিতে । তাদের হাত পায়ে নাগালের একবারে বাইরে নহ ।

কোণ বুকে কোণ মাঝার মত, আল্লাদী ও ক্যাবলরাম মার দেয়,—আর ভেক্রাম ও বেলা ভেউ ভেউ, ম্যাও ম্যাও করে চোঁচায় । শুধু তাই নহ, অন্ধকারের কান-মার পরস্পরের পায়েও পড়ে । আর ক্যাবলরামের গলার ভাঙ্গা কাঁদর, আল্লাদীর শাঁখ বাজে ।

তারপর দু'জনে স্বীকার করে স্বপ্নের ঘোরে ভুল হয়েছে । কিন্তু ভেক্রাম ও বেলা তা স্বীকার করে না । ওরা কারা ভুলে জানার, নিভুল ভাবে শিঠের ছাল তোলা হয়েছে ।

এরপর আর একত্র থাকার মানে হয় না । ওরা মানে মানে আলাদা হয় । কিন্তু তাতে মান-অভিমানের যে বিটিমিটি লাগে, তাও চাটখানি নহ । ক্যাবলরাম ছড়া কেটে হাওয়ার সঙ্গে ব্যঙ্গ করে,—

“ল্যাক মোটা চ্যাচ্চা বেড়াল,
তার কপালে রাজার হাল ।
বিন-হুপুং হুটি-চামারী,
য়েতে পালও খাটে আমিরা ।—”

আল্লাদী সইবার শাজী নহ । সে ছাবের দিকে চেয়ে কবিগানের পান্টা গায়—

“নিমেরটা যে নিজে খায়,
তার নাগাল কেউ না পায় ।
ঘর-আমাদের যে হয় কেউ,
সে পচা ডোবার বোঁচা চেউ ।”

ছাবে হুঁড়ে যারলেও ঠাট্টার তীর ক্যাবলরামের মনে এসে লাগে । শুধু ঘর-আমাই নহ, সে বোচাও বটে । কাজেই সে চটে ওঠে । বলে, “আমাকে বলা ।”

আল্লাদী বলে, “আমি কেউ-এর কথা বলেছি ।”

“তা এক কথাই হল । ওর নাম করে আমার বলা ।”

“কখনো নয়। বেলায় কথা তোলায় আমি ডেক্রামকে ভেঙি কেটেছি। বেলা তার মূনিবেরটা যায়,—ডেক্রামের মূনিবের নয়। আর পরের খেয়ে—”

—“কী, তুমি ভাতের খোঁটা দিলে।”—ক্যাবলরামের আঁতে ঘা লাগল। সে ধৌস করে উঠে বলল, “আমি সেখে আসিনি। তোমার বাবা এনেছিলেন। অথচ একটা পুঁচকে বেড়ালের মত অপমান! আমি এহুনি চলে বাছি। আর ডেক্রাম, তু তু।”

গায়ে একটা লামা চড়িয়ে, ক্যাবলরাম পায়ে জুতো গলায়। ডেক্রাম কাটা লেজ নেড়ে কাছে আসে। তারপর বেলাকে দাঁত দেখিয়ে শব্দ করে, ডেক্ ডেক্ ডেক্।—অর্থাৎ বেকুব বেড়াল, চলে বাছি বটে, কিন্তু বাইরে পেলেন তোর বাপের নাম ডোলাব। নৈলে আমার নাম ডেক্রাম নয়।

বাইরে কেন, ঘরের ভেতরও বগা কুকুরটাকে বিশ্বাস নেই। বেলা আহ্লাদীর আঁচলের আড়ালে লুকে। আর আহ্লাদী থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন দাঁড়াতে সে তা ভাবে নি।—

ক্যাবলরাম রাগের মাধ্যম ডেক্রামকে নিয়ে হন্থন করে হেঁটে চলে।

বস্তুর ক’মোড়া জুতো দিয়েছিল। কিতে বাধা, সেলিম, পম্পত্ত, চম্পল, স্ত্রাওল। তাড়াহড়ায় সে এক পায়ে পম্পত্ত, এক পায়ে চম্পল পরে। শালা শালাজ নেই যে ঠাট্টা করবে। তবু পম্পত্ততে একটা পেরেক উকি দিয়েছিল।

তা ধরা পড়ল বানিক এ নিয়ে। তার গাট্টা খেয়ে তবন শোধরানোর উপায় নেই। সে নেংচাতে নেংচাতে চলল, আর ডেক্রাম লাফাতে লাফাতে।

কিন্তু সেদিন রাতে ডেক্রামকে নিয়ে যে হাস্যম পোছাতে হয় নি, আশ তা যেন ঝাঁক বেঁধে এল। শুধু পথের কুকুর নয়, গলায় বকলদ বাধা, এমন কি শেকল ধরা পেড়িগ্রী কুকুরের গা শুঁকে, ডেক্রাম ডেক্ ডেক্ করে আলাপ জমাতে চায়।

ওদের উত্তরের মর্ম বোকা যায় না। রাত্তার কেউ কেউ ক্যাবলরামকে প্রশ্ন করে, “বেশ কুকুর ত! ঘরের নাকি?”

ক্যাবলরামের ঠাট্টা করতে ইচ্ছা হয়,—ঘরের নাকি গাছের?—

“কোথায় পেলেন মশায়? কত দিয়ে কিনেছেন? কি খেতে যেন? দুধ কটি না ভাত মাংস? কি নাম বললেন,—ডেক্রাম? অদ্বুত নাম ত। ডেক্+রাম=ডেক্রাম। কিন্তু ডেক্ ত ব্যাং?”

ক্যাবলরাম শুধরে বলে, “উহ। ও ডেক্ ডেক্ শব্দ করে, আর আমার ক্যাবলরাম নামের শব্দ হ’লুকের জুড়ে ডেক্রাম।”

“অদ্বুত দ্বিতি ত। বিভাসাগর মশায়ের ব্যাকরণে নতুন শব্দটা জুড়ে যেবেন। নাম হবে।”

মায়ের অন্ত বিভাসাগরের নামোদর নদী পেরুবার কথা ক্যাবলরাম জানে। কিন্তু তিনি

ব্যাকরণ লিখে দায়োদর স্রোতের চেয়েও বেশী নাকানী-চুবানী বাইরেছেন। তাই সে তরবার।
যদি ঐক্যকর্তৃরা সত্যি শক্তি ও গদা শব্দরূপ নিয়ে পথের মাঝে নাকাল করে।

সে পাশ কাটাতে চায়। তবু ক'টা ছুঁই ছেলে চেঁচায়, “ও ভালুকওয়ালা, ডুগডুগি বাড়িয়ে
নাচ দেখাও।”

ক্যাবলরাম মনে মনে তাদের মুণ্ডপাত করে। হ্যাঁচড়া বেড়ালের দরুণ আজ ঘবে ঝগড়া
হয়েছে,—আর বাইরে নয়। তাই এড়াবার জন্য সে সেদিনের পার্কে ঢুকে পড়ে। বেকিতে বসে।
এখানে বসে খানিক আগে কে চটপটি ধরেছে। ভেক্রায় নাক টেনে টের পায়।

সে ক্যাবলরামের দিকে চেয়ে শব্দ করে, ড্ ডেউউ ড্ ডেউউ ফেৎ—।

অর্থাৎ, সেদিনের মত ট্যাকের পদসারি নিজের জন্য কিনে, আমাকে চটপটি বাওয়ান স্তম্ভ।
চটপট পুণ্ডিলাভ হবে। কুহরের আশীর্বাদ চাট্টিখানি নয়। চাই কি স্বত্তরবাড়ীর খিটিমিটি কেটে
ধাবে।—

(ক্রমশঃ)

হামলা

ত্রীগোপাল ভৌমিক

বেশ তো মুখে ছিলাম বাবা,
হঠাৎ এল চীনারা ;
নেফা লাদাক কি চায় তারা
ভেবে পাই না কিনারা।
আমার দেশ, আমার মাটি,
সেখায় কেন হামলা ?
লড়াই করে, থামেও নিজে,
বেশ তো মজার মামলা !
সৈন্তসাম্রাজ্য আছে অনেক
তাই দেখিয়ে ডড়কে
নেবে ভারত ভাবছ বসে ?
বেশ তো খাও খড়কে !

আমরা মায়ের কোটি ছেলে
মরণে ভয় করি না,
স্বাধীনতা কাড়তে যে চায়
তাকে দেখেও ডরি না।
ঘরের ছেলে ঘরেই ফেরো
হামলা করে লাভ কি ?
ভরবে খুলি কুড়িয়ে নিয়ে
ঘৃণার অভিশাপ কি ?
পশু বলের কড়াই করে
এগোও যদি চীনারা
মরবে পুড়ে ঘৃণার তাপে
পাবে না কুল-কিনারা।

এলো ওই বসন্ত

ত্রিভিউলি গুপ্ত

মাঘ মাসের রাত। চারপাশে কুয়াশার ঘচ্ছ মসলিনের আবরণ। ঘুরে আকাশের নীল জলে মত্ত চাঁপটা বনহংসীর মত দাঁতবে দাঁতবে ভেসে চলেছে দক্ষিণ দিকে। ঘাসের মাথায় মাথায়, গাছের পাতায় পাতায়, মঞ্জরী ও লতায় লতায়, ফুলের ছায়ায় ছায়ায় অবসর হয়ে পড়ে আছে অসংখ্য শিশির-কণা। রাত্রির আধারের ডালা ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে আসছে। পদ্মকলি তখনও মুক্তি নয়নে সর্বাঙ্গে লাভপ্যের জোয়ার তুলে পড়ে আছে পুকুরের অঁধে ঘলের মাঝে আবশে বিহ্বল হয়ে।

পলাশ—তুমি গুনতে পাচ্ছ ফুলের রাগী, দূর থেকে কার পায়ের কমকুম শব্দে ভেসে আসছে?

গোলাপ—গুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কে আসছে এই নিবিড় অন্ধকারে?

পলাশ—আধার কিকে হয়ে এসেছে ফুলের রাগী। কিন্তু কুয়াশার পর্দায় অন্তরালে যে কি রয়েছে তা আর দেখতে পাচ্ছি না।

গোলাপ—মনে হচ্ছে পুকুরের ওপারের বনানী মূখর হয়ে উঠেছে সংগীত-তরঙ্গে। নৃত্যের জোয়ারে ভাসিয়ে তুলেছে চারিদিক। কারা আসছে কে জানে?

পলাশ—ধাম ফুলের রাগী। আমি বরং শ্বেত করবীকে শুধাই ব্যাপারটা।

গোলাপ—কেন...কেন...তাকে আবার কেন?

পলাশ—আরে সে আমাদের থেকে অনেক বড়...মাথায় অনেক উঁচু। ও যদি কিছু দেখতে পেয়ে থাকে।

গোলাপ—থাক...থাক। আমার কি মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে শুধু বনেই নয়—পুকুরের গজিয়ে...আকাশের নীলে...মাঠের ওপরে...সর্বত্র এক অজানা সুরের বাণী বেগে উঠেছে।

করবী—তোমাদের আঙ্গ সারা রাত্রির কি এত কথা পলাশ?

পলাশ—এমন কিছুই নয়। আচ্ছা তুমি ওই গহন অরণ্যে কাউকে দেখতে পাচ্ছ?

করবী—কই না তো—তবে এক অপূর্ব সুরের মাহাজাল আছুর কয়ে তুলেছে নিখর বনানীকে।

গোলাপ—সে আবারও গুনতে পাচ্ছি।

করবী—রাতের এই আধার—এই অকম্পিত স্তব্ধতা আমার বড় ভালো লাগে। দিনের বেলায় সূর্যের আলো সব কিছু বড় স্পষ্ট করে তোলে। নিজের দীনতা বজ্র বেগী ফুটে ওঠে তখন। কিন্তু দেখ, রাতের অসংখ্য তারার দীপাধারে যখন জলে ওঠে হাজার আলোর রোশনাই...আমি তখন অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

গোলাপ—কিন্তু শ্বেত করবী, কান্নার যদি দীনতা থাকে সে তো কোন না কোন সময় ফুটে উঠবে।

করবী—না, সব সময় ফোটে না গোলাপ। তোমার ওই রক্তাক্ত অধরের রাঙা হাসিটুকু আধারে চাপা থাকে...দিনের আলোর ফুটে ওঠে। তবু ফুলের রাণী সেটা তোমার দীনতা নয় বরণ গৌরব।

পলাশ—কিন্তু তোমার দীনতা কোথায় যেত করবী?

করবী—দীনতা আমার সর্বস্ব। দেখছ না আমি কত রিক্ত...কত নিঃশব্দ। আমার কোথাও নেই মত্ততা...নেই মুগ্ধিত ফুলের মুঠো মুঠো হাসি। বিশ্বাস কর, নিজেকে বখশ দেখি তখন হুঁচোখ আমার জলে ডুবে আসে। শীতকালের এই সর্বহারা সাদা শূন্যতা কবে বুঝবে বল তো—

পলাশ—শীতের রাত্রি যে দীর্ঘ তা কি জান না যেত করবী?

করবী—জানি, সেই সঙ্গে এও জানি, দুঃখের রাত্রিও দীর্ঘ—কিন্তু কে আসছে? কুহ... কুহ তানে ভরিয়ে তুলেছে দিগন্ত—

কোকিল—আমি গো। ভালো খবর আছে।

করবী—তুমি এই অসময়ে...

কোকিল—না না অসময় কি—স্বপ্নের দিতে এলাম। শীতের বড়ী কাল শেষ রাতে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বলে গেল,—আমার বেলা ফুরলো। তুমি সন্ধ্যাইকে আমার বিদায়-বার্তা প্রচার করে দিও—কারণ সকলের সঙ্গে দেখা করা তো আর সম্ভবপর নয়। প্রকৃতি দেবীর কাছে বসন্ত নিবেদন করেছে, তার নাকি আবির্ভাবের সময় এসেছে, অতএব বিদায়। সামনে বছরে বথাসময় তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

পলাশ—এই স্বপ্নের দিতে তুমি এত দেরি করলে কেন?

কোকিল—সর্বত্র বসন্তের আগমন-বার্তা প্রচার করতে করতে দেরি হয়ে গেল।

পলাশ, গোলাপ, করবী—বুঝতে পেরেছি। এখন বুঝতে পেরেছি কে হৃদয়ে বাশী বাজাতে বাজাতে বন্যনীরে সচকিত করে এগিয়ে আসছে—কার চঞ্চল চরণের ধনি ঝংকারিত হয়ে সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে শিহরন—কার অধরের সৌরভ লুটে নিয়ে বাতাস হয়েছে মাতাল—কার হাসির কনকস্থদা আশ্রিত করেছে সারা আকাশ—কার কপোলের রাঙা আবার রক্তচন্দনের ডিলক এঁকেছে আকাশের শিথ ডালে—কার আঙুলের ঈষৎ সঞ্চালনে কেঁপে উঠছে গাছের পাতা...ফুলে উঠেছে ঘাসের মাথা—বুকেছি গো বুকেছি...সব বুকেছি। কিন্তু তুমি আজ চূপ করে কেন বসন্তদূত... গাও—গান গাও। তোমার কণ্ঠের হললিত স্বর-ভরদে মূগ্ধ কর...মুগ্ধ কর...মোহিত কর এই বনভূমি। পল্লকলি এখনও ঘুমে বিভোর। তোমার স্বরের মায়াকাঠির পরশে তাকে জাগাও—তার ঘুম ভাঙাও। জানাও সন্ধ্যাইকে...সন্ধ্যাকে...সর্বত্র সে এসেছে—বসন্ত—বসন্ত এসেছে...

কোকিল—কুহ...কুহ...কুহ...

অভিনব অভিজ্ঞতা

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় আমার কাছে গল্প শুনতে এসেছে। আমি যখন গল্প বলছি, তাদের কয়েক জন আমাকে প্রশ্ন করেছিল, “এসব কি সত্যি কথা?” আমি তখন মুস্থিলে পড়েছি। কারণ বুকেছি তারা সত্যি গল্প চায়, অথচ সত্যিই আমার গল্প সত্যি না। তখন আমাকে বলতে হয়েছে এমন সত্য ঘটনার কথা যা আমার নিজের চোখে দেখা—আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। তখন দেখেছি তারা সেই সব সত্য ঘটনা উপলব্ধি হয়ে শুনছে এবং প্রভূত আনন্দ লাভ করেছে, যে বকম আনন্দ আজগুবি রূপকথার বা উপকথার পায়নি। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—‘ক্যাক্ট্ ইজ স্ট্রোরার ড্যান্ ফিক্শন্’, অর্থাৎ সত্য ঘটনা আমাদের কল্পিত রচনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বজনক।

সেই সব গল্পগুলো এখন লিখতে বসেছি, যাতে করে আমার কাছে ধরা রয়েছে তাড়াই শুধু জানবে না, দূরে ধরা আছে—বাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ই নেই, তাড়াও নিছক সত্য ঘটনা পড়ে আনন্দ পাবে ও উপকৃত হবে।

উড্ডিয়া প্রদেশে ময়ূরভঙ্গ রাজ্যের পাশে আছে কেওনুর নামে রাজ্য। পাহাড়-জঙ্গলে, নাল-বন্দরে পরিপূর্ণ, সাপ, বাঘ, ভালুক, বুনা হাতীতে আতঙ্কিত। আর আছে লৌহ, ম্যাংগানীজ ইত্যাদি বহু ধাতুর খনি। এই সকল খনিজ পদার্থের ব্যবসা করতে লেগে গেছে অনেক ব্যবসায়ী অনেক দিন থেকে। বার্ড কোম্পানি নামক বিখ্যাত ব্যবসাদারের এই ব্যবসা আছে কেওনুরের মধ্যে বড় ভায়দা নামক জঙ্গলাকীর্ণ এক জায়গায়। লোকেরা ভায়গাটার নাম দিয়েছে “বম্বাঘর”। কারণ এখানে ব্র্যাক ওয়াটার ফিটার নামে এক দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপ ছিল, বাকি ধরতো তাকে বম্বের ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে তবে ছাড়তো।

যখনকার কথা বলতে বাজি তখন আমি ছিলাম বার্ড কোম্পানির বাদের রাসায়নিক। জঙ্গলে কোন পাথরে কি রস পাওয়া যেতে পারে তাই অধেষণে ঘুরতে হতো দিকুবিরিকে। পাথরের মধ্যে রস। হ্যাঁ, সত্যি তাই। কবি বলেছিলেন, “ক্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর,” যে পাথর রসে ভরা। আমরাও তেমনি ক্যাপারই মতো পাথর খুঁজে বেড়িয়েছি কেওনুরের বনে, জঙ্গলে, পর্বতে, প্রান্তরে।

এক

আমাদের ছুটির পাশেই রবার্ট নামে এক ফিরিশী ষ্টিকাদারের ছিল কতগুলো ছাগল। একদিন ভোরে উঠে সে দেখে যে একটা ছাগল কম। চুড়ি করলো কে? ম্যানেজার ছিলেন অলিভার সাহেব, তার কাছে নাশিন গেল। তিনি তদন্ত করে চোরের বদলে হদিস পেলেন ডাকাতের। অর্থাৎ সেখান বাঘের পায়ের ছাপ রয়েছে ঘরটার আশেপাশে! আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম; কিন্তু অলিভার সাহেব ছিলেন পাকা শিকারী, তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। শিকারের নেশায় যেতে উঠলেন। বললেন, “একটা ছাগল বাঘটার শুধু একদিনের খোরাক, নিশ্চয়ই আজ রাতে আবার আসবে আর একটা ছাগল গ্রাস করতে।”

পাশেই মাচা বেধে সন্ধ্যা হবার আগেই তার উপর চড়ে বসলেন বন্দুক হাতে করে। আমরা বে-ঘর ঘরে চূপচাপ পড়ে আছি উৎকর্ণ হয়ে—ঘুম আসছে না কৌতূহলে, আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায়। চৌকিদারের ঘটা, ঘটার পর ঘটা বেগে চলছে—১১টা, ১২টা। তারপর সেই একটার ঘটা বাজলো চং করে, অমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুড়ম করে বন্দুকের আগুয়াজ ও হলো একটা। আমরা উদ্ভ্রষ্ট হয়ে কান পেতে রইলাম, কিন্তু আর কোনোই শব্দ নেই—না কোনো জানোয়ারের আর্তনাদ, না মানুষের কলনিদাদ। ভাবতে লাগলাম, হলো কি ব্যাপারটা!

ভোরে উঠেই গিয়ে দেখি সাহেব তখনো মাচান থেকে নামেন নি। আমাদের দেখে বললেন, “বাঘটা গুলি খেয়েছে নির্দ্বাণ্ড, কিন্তু এখানে ত কোথাও দেখছি না। চল, সবাই বেগি গিয়ে কোথায় মরে পড়ে আছে নিশ্চয়। দেখলাম, রক্তের দাগ রয়েছে। সেই করে পড়া রক্তের দাগ অনুসরণ করে চলতে চলতে আধ মাইল পথ গিয়ে দেখা গেল একটা গাছে হেলান দিয়ে বাঘটা মরে পড়ে রয়েছে।

সেই দিন ম্যানেজার সাহেব হুকুম দিলেন, “আজ থেকে দিন সাতেক সকলেই যে ঘর কাজ বিকাল ৪টার মধ্যেই সরে নিয়ে সূর্যাস্তের আগেই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকবে। কারণ ঐ মৃত বাঘটার জুড়িটা নিশ্চয়ই আসবে তাকে খুঁজতে।” সাহেবও ঘরে থিল গিয়ে থাকবেন, এটাকে হারবার চেষ্টা করা সম্ভব নয়, কারণ এই বিরহী বাঘ ভীষণ আকার ধারণ করে আসে।

আমরা কথাতাকে তেমন বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু বিশ্বাস হতেও দেয়ি হলো না। তখনো সূর্য অস্ত যায়নি, ওনলাম দূরে তীব্র একটা হংকার-ধ্বনি। ব্যাঘ্রগর্জন বটে। সেই গর্জন সারা রাত হতে লাগলো—কখনো দূরে, কখনো কাছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ডাকছে না, আমাদের ক্যান্টো বেঠন করে নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। ভোর হতেই চীৎকারটা থেমে

গেল। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার চাঁৎকার। এমনি করে ঠিক সাতটা রাত গর্জন করে বেড়িয়ে অষ্টম দিনে কোথাও উধাও হয়ে গেল। তখন বুঝলাম, অলিভার সাহেব পাকা শিকারী বটে। শিকারের বীভূতিনীতি সব জানেন।

দুই

আমাদের ক্যাম্পের ছোট একটা কুঁড়ে ঘর ছিল হাসপাতাল। অভিনব হাসপাতাল বটে। সেই হাসপাতালে একদিন বেলা তিনটার সময় একটা লোককে দুইজন নিয়ে এল। তার একটা পা একেবারে ভ্রম হয়েছিল। আমরা ছুটে গেলাম দেখতে। ভাবলাম, খানের কাজ করবার সময় বোধ হয় কোনো পাখর ভেঙ্গে পড়েছে পারে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম তা নয়। খাসেই বাচ্ছিল তিনজন কর্মী মধ্যাহ্নভোজনের পর, দিনে দুপুরেই তাদের আক্রমণ করলো একটা ভালুক। তারা ছুটে গিয়ে একটা গাছে চড়তে লাগলো। দু'জন তবুতবু করে উঠে গেল, কিন্তু তৃতীয় জন সবে একটুখানি উঠেছে, এমন সময় ভালুকটা ডেরে এসে তার একটা পা কামড়ে ধরলো। বারি গাছে উঠেছে তাদের একজনের হাতে ছিল একটা টাঙি। সেটা ছুঁড়ে ঢাঁই করে ভালুকটার মাথার মারতেই সে লোকটির পা ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালালো। তখন আহত লোকটিকে দুইজনে বয়ে নিয়ে এলো হাসপাতালে। এক মাস লাগলো তার সেয়ে উঠতে।

তিন

একদিন এক সাঁওতাল মজুর এসে ধবর দিল একটা, কুহুম গাছে প্রকাণ্ড এক মৌচাক হয়েছে, কিন্তু চাক ভেঙ্গে মধু আনতে সাহস করছে না কেউ; কারণ চাকের পাহারায় আছে জীর্ণ এক জীব। ব্যাপারটা কি দেখতে ছুটলাম আমরা ক'মনে মিলে। গিয়ে দেখলাম, জঙ্গলের মধ্যে একটা টিলার উপর প্রকাণ্ড একটা কুহুম গাছ। তারই একটা ডালে মৌমাছি বেঁধেছে বিরাট এক চাক। আর তারই নিচে পাহারা দিচ্ছে কণা বাগিয়ে এক কেউটে সাপ। মনে হলো, আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। সাঁওতালরা তীর ছুঁড়ে অনেক সাপ মারে, কিন্তু এই সাপটা নাকি 'দেবতা'র কাছে ব্রতী—এক কিছুতেই মারতে চাইল না কেউ। আর কেউ যে মারবে, তাতেও তাদের মহা আপত্তি।

চার

আমার আঙানার পাশেই থাকতেন ক্যাম্পের বড়বাবু, যাকে বলে হেড্‌ ক্লার্ক। তার ছিল কয়েকটা মুরগী। একদিন বিকাল বেলায় কাজ থেকে ফিরে আমার স্থানের ঘরে ঢুকে দেখি মাচাংএর উপর একটা মুরগী বসে আছে। আমার দেখেই পালিয়ে গেল কিন্তু বেধে গেল, একটু ডিম। ডিমটা তুলে রেখে ভাবতে লাগলাম—মজা মন্দ না, পাশের বাড়ীর মুরগী ডিম পাড়তে এলো আমার বাড়ী। তার পরের দিন ফিরে দেখি মুরগী নেই, কিন্তু ডিম রয়েছে আর একটা। এমনি করে আরও দুই দিনে আরও দু'টো ডিম পাওয়া গেল। তখন ভাবলাম, আর চূপ করে থাকা ঠিক হচ্ছে না, এবার কিছু করা দরকার। অর্থাৎ পরের দ্রব্য লুকিয়ে রাখার একটা প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। বড়বাবুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলাম। খেতে বসেই তিনি বলে উঠলেন, “বাঃ অমলেট্‌ করছেন দেখছি! এই মজলে আপনি ডিম কিনলেন কোথেকে? আমার মুরগীগুলোর একটাও এ পর্যন্ত ডিম দিল না।” আমি হেসে বললাম, “না, এতটা অলবাহ দেবেন না। আপনার একটা মুরগী ডিম দেব, তবে সে আপনার ঘরে না দিয়ে আমার স্থানের ঘরে এসে ডিম পাড়ে, আর এ অমলেট্‌ সেই ডিমেরই।” তখন সব ব্যাপার পরিত্যক্ত করে বলে কেলে পরম তৃপ্তিদহকারে দু'ভনে ডবল জিমের অমলেট ভোজনে রত হলাম।

পাঁচ

ক্যাম্পের টাইপিষ্ট বাবু এক রবিবার সকালে এসে আমার নিমন্ত্রণ করে গেলেন দুপুরে আহােরেব মন্ডে। অংশদান করে জানলাম, যাংস রান্না হচ্ছে। পুলকিত হয়ে উঠলাম, কারণ মন্ডে রান্নাভোগ ছোটো কম। কিন্তু ক্যাম্পের গুদাম বাবু আরও একটু তলিয়ে অংশদান ক'রে ফিরে এসে আমায় কিস্কিস্‌ করে বললেন, “কেমিষ্টবাবু! খবরদার! এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন? পাঁচতাল পল্লীর একটা পাঠা ঘাস খেতে খেতে টাইপবাবুর আঙতার এসে পড়েছিল, আর উনি সেটাকে ধরে নিয়ে বলি দিয়েছেন, আর তারই যাংস রাখছেন বসে বসে। এমন পাশের ভাগী আমাদের সবাইকে করতে চাইছেন নেমস্তন্ন খাইয়ে। খবরদার!”

তখন আমি তো থেমে গেলাম।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের কথা

— ১০ শ্রীসত্যগোপাল পাল —

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। তখন খ্রীস্টীয় ৮ম শতাব্দীর যুগ তিরুমঙ্গাই আলোয়ার নামক এক মহাপুরুষ সেই সময় দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হন।

তিরুমঙ্গাই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যেমনি ছিলেন উক্ত ও কবি তেমনি ছিলেন জন-দরদী মহাসাগর। সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তাঁর প্রভাব ছিল দেশের একচ্ছত্র রাজার মত।

তিরুমঙ্গাই-এর গুণে মুগ্ধ হয়ে চারজন সিদ্ধপুরুষ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এই চারজন শিষ্যই তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার বলে নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেন।

চার শিষ্যের চার গুণ। প্রথমজন তর্কে সকলকে পরাস্ত করে দেন। দ্বিতীয়জন যে কোন বস্তু ভালো এক হুঁসে খুলে দিতে পারেন, কোন চাবিকাঠির প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়জন কোন মাহুকের ছাড়া পা দিয়ে স্পর্শ করেই তার গতিরোধ করে দিতে পারেন। আর, চতুর্থ শিষ্য যে কোন জলাশয়ের উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যেতে পারেন।

তিরুমঙ্গাই তাঁর এই শিষ্য চারজনকে নিয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণের পর শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথমুখীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন।

তীর্থময় ভারতের বহু প্রাচীন শ্রুতি-বিষয়িত এই শ্রীরঙ্গনাথমুখীর মন্দির। কিন্তু তিরুমঙ্গাই তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সে মন্দিরে এসে দেখেন যে, মন্দিরটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে বাবার শেষ স্তরে এসে তখন পৌঁছেছে। মন্দিরের ছাদ ও দেয়ালগুলি সব নড়বড়ে। চারিদিক বনজঙ্গলে ঘেরা। আর দিন-রাত্রে নানা হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যনের আনন্দে অব্যাহত ঘুরে বেড়ায়।

ভারত-বিখ্যাত শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের এমন দুর্দশা দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পেলেন তিরুমঙ্গাই। তিনি নতুন করে মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে ধনী ব্যক্তিদের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু, কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন না।

পরমুগ্ধ তিরুমঙ্গাই-এর প্রাণের কাটা ঘাড়ে যেন স্থনের ছিটা পড়ল। তিনি সেখলেন, ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ভোগবিলাসে উন্মত্ত হয়ে জলের মত অর্থব্যয় করে দিচ্ছেন, অথচ সৎকর্মের ব্যাপারে একটা পরসাদ কারো কাছ থেকে বেরোচ্ছে না। এ ভাবনা হতাশ হয়ে তিনি তাঁর বিচিত্রগুণের অধিকারী শিষ্য চারজনকে আদেশ দিলেন,—তোমাদের নিজ নিজ গুণের সাহায্যে বিলাসমত্ত সকল ধনী কাছ থেকে বস্তু পার অর্থ লুটে এনে আমাকে দাও।

গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিম্ন চারজন তাদের নিজ নিজ অচুচরসহ একমল বেধে লেগে গেল অৰ্ধশঃগ্রহের কাজে ।

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অৰ্ধ সংগ্রহ করে তারা জমা দিল গুরুদেবের কল্যাণহস্তে ।

তিলকমন্ডই মনের আনন্দে মনের মত করে মন্দির নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করলেন । দেশের যেখানে বড় সেরা শিল্পী ছিলেন, তাঁদের তিনি সমাদরে ডেকে এনে নিযুক্ত করলেন মন্দির নির্মাণের কার্কে ।

তিলকমন্ডই-এর মন্দির নির্মাণের সমারোহ দেখে দেশের অনেক রাজা ও ধনী ব্যক্তির সর্বশেষে চৈতন্ত উদয় হল । তাঁরা এবার একে একে বেচে এসে বখাসাধ্য অর্থ নিবেদন করতে লাগলেন ভক্ত-প্রবরকে । ফলে, তিলকমন্ডই-এর মহৎ সংকল্পসাধনের পথ আরও সুগম হয়ে উঠল ।

স্বর্ধীকাল অগণিত শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সপ্ত-প্রাকারবিশিষ্ট ঐরব্বনাথজীর মন্দির নির্মিত হয় । এ হ'ল ভারতবর্ষের এক সুবৃহৎ মন্দির ।

মহাত্মা তিলকমন্ডই নির্মিত ঐরব্বনাথজীর এই সুপ্রসিদ্ধ দেবমন্দির যুগে যুগে বহু ভারত-বিখ্যাত মহামানবের আবির্ভাবে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ।

মহাত্মা বম্মনাচার্য এই মন্দিরেই ঐরব্বনাথজীর সেবা করেছিলেন । বৈষ্ণবাচার্য ঐরামাসুজ তাঁর জীবনের শেষ ভাগের স্বর্ধীকাল এই পবিত্র তীর্থে যাপন করেন । এই মন্দিরে শুভ-পরাণপণ ঘটেছিল বাংলার প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের ।

যুগে যুগে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে এমনি কত মহান্ কীর্তি ঘটে গেছে তার অস্ত নেই ।

ঐরব্বনাথজীর মত তাঁর শ্রীমন্দিরও নানা রঙ্গে ভরা ।

খুড়ো :: শ্রীঅমিত রায়

তেল চপচপ খুড়োর ঢাক,
কোথায় যেন একটু ফাঁক,
সেই ফাঁকেতে মশার ঝাঁক
দিনরাত্রি বাজায় ঢাক ।

ঢাকের বাড়ি রাখরে ঢাকি'
খুড়োর তেলের দাম যে বাকী ।
ও খুড়ো তুই হাটে যা'
পান-সুপারী কিনে খা ।

পান বেচেছে স্খামের মা,
ক্যান্ডিপিসারি খোঁড়া পা ।
সেই পায়েতে মারল ল্যাঙ
পড়ল খুড়ো ভাঙল ঠ্যাঙ ।

নেড়ার স্বত্ব

শ্রীবিদ্যাসাহারায়

নেড়াকে তোমরা চেন কি? যদি তুমি পলাশ গাঁয়ের লোক হয়ে থাকো তবে নেড়াকে তোমার চিনতেই হবে। এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে নেড়া না বাস, এমন কোন পথ নেই যে পথ দিয়ে নেড়া না হাঁটে।

তার বাবা নেই, মা নেই, ভাই কোন কেউ নেই। আত্মীয়পরিজন কেউ আছে কি না তাও কেউ জানে না। নেড়া নিজেও জানে না।

কোথায় তার বাড়ি ছিল, কেউ বলতে পারে না। এ গাঁয়ে কবে থেকে এলো সে হিসাব ও কেউ রাখে না। যোতের ফুলের মতই একদিন বৃষ্টি ভেসে এসেছিল।

নেড়া।

সেই নেড়ার মৃত্যু হয়েছে।

খবরটা এমন কোন গুরুতর নয়। পথে-ঘাটে নেড়ার মত অনেক ছেলে ঘুরে বেড়ায়। কেউ তাদের খবর নেয় না, তাদের দুঃখে এক কোঁটা চোখের জলও কেউ ফেলে না। নেড়াও সেই মূল্যে।

তবু তাকে নিয়ে আমি গল্প লিখছি কেন সে প্রশ্ন অনেকেই করবে। তবে তুমি যদি পলাশ গাঁয়ের লোক হও তবে সে-প্রশ্ন করবে না। কারণ পলাশ গাঁয়ের সবাই জানে এই গল্প লেখার একটা ইতিহাস আছে।

নেড়া।

‘সর্বঘটের বেলপাতা।’ তোমার বাড়িতে বাজার করার লোক নেই? ডাকো নেড়াকে। তখনই এসে হাজির হবে। কোন জ্বরী খবর নিয়ে ঘুর গাঁয়ে বেতে হবে? ডাকো নেড়াকে। বাড়িতে কাকর অস্থখ। মাথার হাওয়া দিতে হবে? শুষ্ক আনতে বেতে হবে শহরে? নেড়াকে ডাকলেই সব সমস্তার সমাধান হবে যাবে।

এমনি আপন-ডোলা পরোপকারী ছেলে নেড়া। প্রতিদানে সে কিছু চায় না। টাকা নেবে না, পরস্না নেবে না। শুধু চারটি খেতে পেলেই যথেষ্ট। তাতেই সে খুশী।

খনী গরীব ভেদ নেই। সব লোকই তার কাছে সমান। সবায় বাড়িতেই তার সমান গতিবিধি। ভালমন্দের বিচার নেই। খুশী মনে বা দেবে তাই সে থাকে।

পথে পথে ঘুরে বেড়ায় নেড়া। বখন খুশী—বেথানে খুশী। একদিন সকাল বেলা বাজারের পথ দিয়ে হেঁটে বাড়িল নেড়া। হঠাৎ হারাধন মূদীর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানের ঝাপ বন্ধ।

নেড়া ভাবলে, এমন সময়ে দোকান বন্ধ থাকে না তো। তবে কি হল আবার হারাধন মূদীর ?

দোকানের একটি পাট মাত্র খোলা। সেই পাটটি হাত দিয়ে তুলে ভিতরের দিকে ঊকি মেরে দেখল। ভিতরে হারাধন মূদী জ্বরে খুঁকছে। হাঁস নেই—একেবারে বেঁহস হয়ে আছে জ্বরে।

নেড়া ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একটা হাত-পাখা কাছেই পড়ে ছিল। পেটাকে নিয়ে হারাধনের মাথায় হাওয়া করতে লাগল।

মাথায় বার বার হাত দিয়ে দেখল—ভয়ানক তাপ। হাত রাবা বার না। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা জলের ছোট বালতি দেখতে পেল নেড়া। কিন্তু তাতে একটুও জল নেই। খানিক দূরেই আছে মণ্ডলদের পুকুর। সেই পুকুর থেকে এক বালতি জল তুলে নিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

হারাধনের দোকানে পুরনো নেকড়ার অভাব ছিল না। সেই নেকড়া ছিঁড়ে নিয়ে নেড়া হারাধনের মাথায় জলপটি দিতে লাগল। জলপটি আর হাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ মেলে চাইল হারাধন। ধীরে ধীরে স্নহ হয়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ পর ঘাম দিয়ে জর ছাড়লো হারাধনের। ধীরে ধীরে বলল—নেড়া, আমার একটা কাজ করবি ?

—কি কাজ ?

—একটু সাগু জাল দিয়ে এনে দিবি কাকর বাড়ির থেকে ? বজ্র বিদে পেয়েছে।

নেড়ার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। বলল—হ্যাঁ, পারি।

হারাধনের দোকানেই সাগু বিক্রী হয়। তাই সে বলল—ঐ কোঁটো থেকে নিয়ে বা একটু সাগু। আর ঐ তাকের তলায় আছে একটা এনারেলের বাটি। ওটা নিয়ে বা।

নেড়া সাগু আর বাটি নিয়ে চলে গেল। এ গাঁয়ের সব বাড়িই তার চেনা। সব বাড়ির দোকানের কাছেই তার আদর। কাজেই সাগু জাল দিয়ে আনতে ঘোটেই কষ্ট হলো না নেড়ার। ঘেরিও হলো না। এক টুকরো নেবুও সেই বাড়ি থেকে নিয়ে এল আর নিয়ে এল এগুটি বাওয়ার জল।

এক চুম্কেই সাঙটুকু শেষ করে জল খেয়ে শান্ত হল হারাধন। বলল—বৈচে থাক বাবা নেড়া।

এদিকে বেলা তখন বেড়ে চলেছে। সূর্য প্রায় উঠে গেছে মাথার উপর। হারাধন বলল—কিছু খেয়েছিল নেড়া?

নেড়া নিরন্তর? হারাধন বলল—ঐ দিনের ভেতর চিড়ে আছে আর ঐ হাড়িতে আছে শুড়। নিম্নের হাতে তুলে খেয়ে নে।

নেড়া বলল—না থাক, খাবো না।

হারাধন দ্রুত পায়ল নিম্নের হাতে নিয়ে বেতে লক্ষ্য বোধ করছে নেড়া। তাই বলল—লক্ষ্য করিস্ নে। খেয়ে নে। আমিই তো বলছি।

অগত্যা নিম্নের হাতেই দু'মুঠো চি'ড়ে ও একটু শুড় তুলে খেয়ে নিল নেড়া। তারপর ঢক ঢক করে ঘটির বাকী জলটুকু খেয়ে নিঃশেষ করলো। হয় তো এই তার সারাদিনের খাওয়া। লোভ নেই, প্রত্যাশা নেই, বখন বা জোটে তাই খেয়েই খুশী থাকে।

অপরিপুষ্ট, লিকলিকে বেহ, লাভণ্যহীন চেহারা—সেবেই বুঝা যায় সময় মত উপযুক্ত আহার তার ভাগ্যে জোটে না। তবু নেড়াকে কেউ কোনদিন মলিন মুখে দেখতে পায়নি।

এই তো কিছুদিন আগেকার কথা। আকাশ জুড়ে সে কি প্রলয় কাণ্ড। সকাল থেকে বৃষ্টির বিরাম নেই। তার উপর ঝড়।

নেড়া সেদিন আশ্রয় নিল মতিবাবুর বাইরের দিকের একটি ঘরে। গায়ের সেরা ধনী মতি হাস। বাড়িটাও তাঁর বিরাট। বাইরের দিকটা খালি পড়েই থাকে। নেড়া বোধ হয় আগের দিন রাত্রির সেখানেই ঘুমিয়েছিল। তাই ঝড় বৃষ্টিতে আর বেহ হতে পারেনি।

সে বাড়ির কেউ নেড়াকে দেখতে পায়নি। খুব মরকারী সময়টিতেই তাকে সবাই দেখতে পেল।

মতিবাবুর বাড়িতে তাঁর ছোট্টছেলের অস্থখ। খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি খবর পাঠানো দরকার। অথচ ডাক্তার থাকেন দু'কোশ দূরে ঝোঁকুল ডাঙার।

বাড়িতে লোক নেই। মতিবাবুর অস্ত্রান্ত ছেলেরাও বয়সে খুব বড় নয়। তাই কেউ বেতে চায় না। বাড়ির চাকর দু'জন শেষ রাত্রে গেছে নৌকা নিয়ে বাবুগঞ্জের হাটে। এখনো ফেরেনি।

নৌকা ঘাটে থাকলে না হয় কথা ছিল। নদীপথে গোঁকুল ডাঙার খাওয়া যায় কম সময়ে। বৃষ্টি পথে বেতে সময় লাগে অনেক। এই ঝড় বারেলের দিনে নৌকা ভাড়া পাওয়াও কঠিন। এখন দু'কোশ পথ হেঁটে কে যাবে?

নেড়া! মতিবাবু যেকো ছেলে মটুই তাকে আবিষ্কার করল। বাইরের ঘরে গুটিমুটি হয়ে বসে আছে নেড়া।

পেট ভরে পাক্সা ভাত বাইরে মতিবাবু তাকে পাঠিয়ে দিলেন গোহুল ডাঙায়। বৃষ্টি-বানলের দিন, তাই সঙ্গে ছাড়াও দিলেন। একটি চিঠি লিখে দিলেন তার সঙ্গে। বলে দিলেন—ডাক্তার-বাবুর সঙ্গেই আসবি। নৌকা অনেক ভাড়া পাওয়া যায় গোহুল ডাঙায়। কাছেই কোন অহুবিধা হবে না।

হেঁটেই বণনা হল নেড়া। গায়ের কাঁচা পথ। তার উপর বৃষ্টির জলে ভয়ানক পিছল হয়ে উঠেছে। পা টিপে টিপে সাবধানে চলতে হয়।

তবু বিশেষ কোন অহুবিধা হলো না নেড়ার। বড় বৃষ্টিতে এই পথে চলা তার অভ্যাস আছে। কিন্তু এই গায়ের সীমানার যে খালটি আছে, সেটা পার হওয়াই বিপজ্জনক। সেই খালের উপর আছে একটি বাঁশের সঁকোটা।

ছুটি লগা বাঁশ বেঁধে সঁকোটা তৈরী করা হয়েছে। তার উপর দিয়ে চলতে-কিরতে খুবই অহুবিধা হয় লোকদের। কিন্তু কেউ এর দিকে নজর দেয় না। সঁকোটা ভালো করে তৈরী করার প্রয়োজনও বোধ করে না কেউ। সেই কোন্‌ যুগ থেকে চলে আসছে—আজও তাই চলছে।

অতিকটে পা টিপে টিপে বাঁশের সঁকোটা পার হয়ে গেল নেড়া। বাঁশ বা পেছল হয়েছে, আর একটু হলোই পা কসকে পড়ে যেতো আর কি।

গোহুল ডাঙায় গিয়ে সে খনন পৌছল তখন দুপুর গড়িয়ে পড়েছে। বৃষ্টির তগনো বিরাম হয়নি।

ডাক্তার বাবু বাড়ি নেই। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে চিঠি রেখে নেড়া ফিরে এল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে আরো বেশী।

এদিকে রাত হয়ে এল তবু ডাক্তারবাবু আসছেন না দেখে মতিবাবুর বাড়ির লোকেরা চক্কল হয়ে উঠলো। রোগীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলেছে।

মতিবাবু বারান্দায় চিন্তিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। ভাবলেন, কে জানে, নেড়া হয়তো নাহয়নি ডাক্তারের বাড়িতে। বৃষ্টি দেখে কোথাও হরতো চূপ করে বসে আছে।

চাকর দু'জন বাবুগৃহের হাট থেকে ফিরেছে ততক্ষণে। তাদেরকেই ডাক্তার বাড়ি পাঠাবেন ঠিক করলেন। যতই রাত বাড়তে লাগল, নেড়ার উপর রাগও ততই বাড়তে লাগল মতিবাবুর।

নেড়া চালাকি করেছে! সে যায় নি। এবার বন্ধাতকে দেখতে গেলে ধরে মার লাগাবো। ছাতাটা নিয়ে পালালো ছোঁড়া!

চাকর দু'জন রওনা হবার ঘন্টা প্রায় হইছে, এমন সময় ডাক্তারবাবু এসে পৌঁছলেন। তাকে দেখেই মতিবাবুর রাগ এক নিমিষে মল হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বোগী দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইনজেকশন দিলেন। বললেন—একুনি ঘেতে হবে একজন আমার সঙ্গে। গুণ্ধ ঘেবো।

নেড়া কোথায়? সে-ই বাবে।

এতক্ষণ নেড়ার কথা চাকর মনে হয়নি। তাকে দেখতে না পেয়ে মতিবাবু জিহ্বাস করলে ডাক্তার বাবুকে—নেড়া আপনার সঙ্গে আসেনি?

ডাক্তারবাবু বললেন—না, সে তো বিকেলেই আমাকে না পেয়ে চিঠি বেখে চলে এসেছে।

তাই নাকি? তবে গেল কোথায়? একটু যেন চিন্তিত হলেন মতিবাবু।

পরক্ষণেই ডাবলেন—বে ডানপিটে ছেলে, কোথায় ঘুরছে কে জানে? একটু পরেই হয় তো কিরবে।

কিন্তু সেদিন রাতে কিয়লো না নেড়া। পরদিনও না। দু'দিন পরে তার খোঁজ পাওয়া গেল। বাঁশের সাঁকোর নীচে বাঁশের অলে তার মৃতদেহ জেসে উঠেছে।

ডাক্তার-বাড়ি থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাঁশের সাঁকো থেকে গা পিছলে পড়ে গিয়েছিল নেড়া। আর উঠতে পারে নি।

নেড়া। 'সর্বঘণ্টের বেলপাতা' নেড়া। গাঁয়ের হিঁতবী, আপনভোলা নেড়ার মৃত্যু হল। মতিবাবুর ছেলে, অল্প ভালো হয়ে বেঁচে উঠলো—কিন্তু নেড়া বাঁচতে পারলো না। তবু কেউ চোখের জল ফেললো না নেড়ার মৃত্যু। কারণ কেউ তার আত্মীয় নয়, কেউ তার বন্ধু নয়। তার দুঃখে কে কাঁদবে?

দেখতে দেখতে চলে গেল পাঁচ ছয় মাস। নেড়ার কথা সবই ভুলে গেল।

মতিবাবুর ব্যাড়তে সেদিন মহা ধুমধাম। বড় মেয়ের বিয়ে। এই তাঁর বাড়িতে প্রথম কাজ। কত লোকজন আসবে পাশের গাঁ থেকে।

তাই বাঁশের উপর বাঁশের নড়বড়ে সাঁকোটাকো এবার ভেঙে ফেললেন। কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করলেন ভাল একটি পুল। গাঁয়ের লোকেরা ধন ধন করতে লাগল। মতিবাবু এবার সত্যি গাঁয়ের একটা মস্ত উপকার করলেন!

কিন্তু হারাধন মূদী এবং আরও কেউ কেউ বলল—আর ছ'মাস আগে যদি মতিবাবু এই উপকারটা করতেন তাহলে অমন করে নেড়ার জীবনটা বেতো না। এখন নিম্নের দরকার হয়েছে তাই সাকো তৈরী করেছেন।

নিম্নের জন্তই হোক আর পরের জন্তই হোক, মতিবাবু সাকো তৈরী করে দিয়েছেন। তাই সটার নাম হয়েছে 'মতি সাকো'। কিন্তু গাঁবের লোকেরা সে নামটা মুখে আনে না, তারা বলে—'নেড়া পুল'।

আজও অনেক সেই সাকোর উপর দিয়ে বেতে বেতে বলে—এখানেই একদিন নেড়া ডুবে গিয়েছিল।

কিন্তু এর বেশী খবর কেউ রাখে না। কারণ নেড়া যে সাধারণ একটি ছেলে। তার মত ছেলে পথে-বাটে কত মরে থাকে, কে তার হিসাব রাখে? স্রোতের ফুলের মতই ভেসে এসেছিল, আবার সে ভেসে গেছে।

কর্মচারীবিহীন ডাকঘর

অন্য অনেক দেশে নাকি দোকানীবিহীন দোকান দিব্যি চলে। জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে—দাম লেখা আছে—খরিদদার দরকার মত জিনিস নিয়ে দাম যথাস্থানে রেখে চলে যায়—জিনিসও বোয়া যায় না, দামও কম পড়ে না। আমাদের দেশেও সম্প্রতি জামালপুরে ঐ ধরনের একটি ডাকঘরের খবর পাওয়া গেছে। জামালপুর রেল কারখানার ডাকঘর। সেখানে খাম, পোষ্টকার্ড, ডাকটিকিট সাজানো রয়েছে কাউন্টারে। কোনো কর্মচারী নেই। বার যা, দরকার নিয়ে নির্দিষ্ট বাক্সে দামটা রেখে চলে যায়। এ পর্যন্ত কোনো ঘাটতি পড়ে নি।

পটিলার পণ

শ্রীআশুতোষ সাহা

তাইতো দেখি ওদের ঘরে কচ্ছে' সবাই জটলা !—
পণ করেছে খাবে না আজ চাটুজ্যেদের পট্টলা !
কিছুতে আজ ভাত হোবে না মোটেই পটল শর্মা,
যে-কেউ ডাকো, যে-কেউ সাধো বাংলা থেকে বর্মা ।
চোখের জলে বুক ভিজে যায়,—মেরেছে কোন্ ডাক্তার ?
ডাকছে দাও, “আয়রে যাত্, বাধাসুনে আর ক্যাকড়া ।”
দাঁড়িয়ে পটল অচল অটল—মুখটি কেবল গোমড়া,—
ব্যাপার কি হে ?—বলতে পারো আজকে আমায় তোমরা ?
গাল দুটো তার চুপ্সে গেছে, চোখ হয়েছে লালচে,
সোনার ছেলের রঙটা গায়ের হ'ল যে আজ কালচে ।
কে মেরেছে লক্ষ্মী ছেলের মাথায় এমন গাঁট্টা ?—
পুলিশ ডাকো, থানায় ছোটো—এ নয় কতু ঠাট্টা !
বলেন পিসী, “ভাত না খেলি, আয় খাবিরে পানতো ;—
হ্যাঁলা টেপী, একটা থালা গরম পায়ের আনতো !
দিশে দশেক আনতো লুচি এবং ছ'চার গণ্ডা
বাগবাজারের রসগোল্লা, মালপো-গজা-মণ্ডা ।”
পট্টলা বলে, “মিছেই সাধা—খাবো না আজ কিছু ;
সবাই ভাবে—ছেলে তো নয়—এ যেন এক বিচ্ছু !
এমনি ক'রে দিনটা গেল—এলো আঁধার রাত্রি,
সবাই হল খেয়ে-দেয়ে শোবার ঘরের বাড়ী ।
জান্নল-কবট বন্ধ হল, উঠলো নাকের বাড়ি,
ঘোং ঘোং ঘোং আওয়াজ নুন্ন—দাঁড়ায় কাহার সাধি !
সবাই যখন ঢুলছে ঘুমে,—ভাবলে পটল শেষটা—
চুরি ক'রেই করতে হবে খাবার কিছু চেষ্টা ।
কিনেয় নাড়ী কচ্ছে' চোঁ চোঁ—গেল এবার প্রাণ তো,
উপোস করা এত কঠিন কে আগে তা' জানতো !
“আর একবার ডাকলে খেতুম”—লিখে জ্বালের গাজে,
একটি হাঁড়ি পাশ্চাৎ সাবাড় ক'রলে হোঁড়া রাত্রে !



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এদিকে যখন এই অবস্থা, এদিকে তখন মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে আর এক দৃষ্টের যবনিকা উঠেছে। বাঙলা সেশের সেই চরম অবস্থা। নবাব আলীবর্দীর আবার অস্থির হয়েছে। এবার একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থা। তিনি দেখতে পেলেন তার এত সাধের রাজ্য বোধহয় তাঁর মৃত্যুর পর রাখতে পারবে না কেউ।

তিনি তাঁর পাশের লোকটার দিকে চাইলেন।

—কিছু চাইছেন জাহাপনা?

—মীর্জা? মীর্জা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে লোক গেল সিরাজউদৌলাকে খুঁজতে। নবাবজাদা তখন গরাণহাটিতে বাবার জন্তে তৈরি হচ্ছে। গস্যার নৌকা সামান্য হয়েছিল। পাঁচ ছ'জন বন্ধুবান্ধব বাবে, তাদের খাবারদাবার নেওড়া হয়েছে।

লোক গিয়ে ডাকতেই নবাবজাদার মেজাজ বিগড়ে গেল। এই অসময়ে ডাক? ডাকবার আর সময় পেলো না দাছ!

প্রাসাদে এসে দেখলে নবাব তখন বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

—কোথায় যাদো, এখন?

সিরাজউদৌলা বললে—গরাণহাটিতে, চার-পাঁচ দিনের জন্তে।

*—কেন? না গেলেই নয়?

—ওখানে যে ওরা যেতে বলেছে, আমি কথা দিয়েছি যে, যাবো আমি—

নবাব কিছুকণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—আমার তবিরতটা আজ বড় ধারাপ—

—তোমার তবিরত্ খারাপ তো আমি কী করবো? বুড়ো লোকের তবিরত্ তো খারাপ হবেই, আমার আর কথা শোনার সময় নেই—

কথাটা শুনে নবাব বড় আঘাত পেলেন, বললেন—বাম্বো বাও, কিন্তু ফিরে এসে আমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না দাড়—

—কিন্তু আমি থেকে কী করবো বলো? আমি তো হকিম নই, কবিরাজও নই—

—কিন্তু তোমাকে আমার দু'টো কথা বলবার ছিল, হরত আর বলবার সময় পাবো না—

সিরাজউদ্দৌলা বললে—তা কী বলবে বলো না, আমি শুনছি—

—তুমি জানো: শারা জীবন আমি লড়াই করেই কাটিয়েছি, সংসার দেখতে সময় পাইনি, তাই এখন আপনোস হচ্ছে দাড়, তোমাদের মাহুদ করে যেতে পারলুম না।

সিরাজউদ্দৌলা রেগে গেল।

—কেন? আমি মাহুদ হয়নি?

—না না, রাগ কোর না, আমি সে-ভাবে কথাটা বলিনি। নবাবের নাতিকে যে-ভাবে মাহুদ করা উচিত তা তো আমি করতে পারিনি। তুমি রাজ্য-চালানোর কতটুকু জানো? কতটুকু আমি তোমাকে জানিয়েছি? কিন্তু বা কিছু করেছি সব তো পথের কাঁটা বাতে দূর হয়, সেই জন্তেই করেছি। হোসেন কুলী খাঁ গেছে, নোয়াঙ্গিস্, মহম্মদও গেছে—সেদিক থেকে তোমার কোনও ভর আর নেই—

সিরাজউদ্দৌলা তখন অধৈর্য হয়ে উঠছিল, বললে—কিন্তু নবাবী তুমি কাকে দেবে সেটা তো বলছো না—

আলীবর্দী হাসলেন।

—শুধু তো নবাবী দিলেই হয় না, সে নবাবী রাখতে পারা চাই, যে-নবাবী রাখতে পারবে না সে-নবাবী তুমি নিয়েই বা কী করবে? এই যে টোপীওয়ালারা এসেছে কলকাতায়, ওরা জানে কী করে পয়ের দেশ গ্রাস করা যায়, ওরা জানে কখন নিচু হতে হয়, আবার কখন মাথা উঁচু করতে হয়—ওদের কাছেই শিখতে হয় রাজ্য-চালানো। তুমি এখন আর ছোটটি নও, তোমার বিয়ে হয়েছে, তোমার বয়স হয়েছে, এখন তো আর আশংকার মত ছেলেমানুষী করবার বয়স নেই!

—তা এই সব উপদেশ সেবার জন্যেই তুমি আমাকে ডেকেছিলে নাকি?

—না উপদেশ দিলে তুমি শিখবে কী করে? জানবে কী করে? বুঝবে কী করে? আমার কাজ তো আমি করেছি, দেওয়ান মানিকচাঁদ তোমার ক্ষতি করতে পারে ভেবে তাকে প্রাণদে চাকরি দিয়ে খুশী করে রেখেছি! এখন তোমার কাজ তুমি করো?

—আমার কী কাজ ?

—তুমি ইংরেজদের সঙ্গে খরাপ ব্যবহার করো কেন ? জানো শরতানের জাত তারা। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে করে এখানে এখন বেশ ভাগাভাগি বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কলকাতা নিয়েছে ইংরেজরা, চন্দননগর নিয়েছে ফরাসীরা। গুয়ের মধ্যে এখন আর কোনও ঝগড়া নেই। এই সেদিন আলীকার রাজাকে হারিয়ে তার রাজ্যটা নিয়ে নিয়েছে—এটা জানো ? সাগর-পার থেকে বতগুলো জাত এসেছে, তাদের মধ্যে সব চেয়ে শক্ত জাত হলো ইংরেজ, এটা তুমি বুঝতে পারো ? তাহলে তাদের চটাও কেন তুমি ?

সিরাজউদ্দৌলা চূপ করে শুনছিল।

আলীবর্দী আবার বলতে লাগলেন—এ সব কথা সারা দিন রাত আমার মাথার মধ্যে ঘোরে। ইংরেজরা তো ন্যায়ের জন্যে লড়াই করে না। যেখানে টাকা আছে, যেখানে ক্ষমতা আছে, তা তারা দখল করবেই, যে-কোনও রকমে হোক।

—তা খরাপ লোকদের চাটবো না কী করবো ?

—না না খবরদার, এরসঙ্গে সমস্ত ইংরেজদের সঙ্গে কখনও লড়াই করতে যেও না। ওরা সব সজ্জ করতে পারে, দরকার হলে তোমার পা-ও চাটতে পারে, কিন্তু অত বড় অহংকারী জাত আর আর নেই। সেই অহংকারে হাত পড়লেই ওরা ক্ষেপে যাবে, তখন তুমি আর সামলাতে পারবে না।

সিরাজউদ্দৌলা বললে—তা এবার আমি বাই ? আমার দেহি হয়ে যাচ্ছে—

—তা গরামহাটিতে বাবার এত কী কাজ পড়লো তোমার শুনি ?

—ওরা বে নেমস্তন্ন করেছে। ওখানকার জমিদার। আমাদের জন্যে কালিয়া-কাবাবের বন্দোবস্ত করেছে—

—তা কালিয়া-কাবাব খাবার এত লোভ ? কালিয়া-কাবাব কখনও খাওনি ?

সিরাজউদ্দৌলা কী বলবে প্রথমে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—কালিয়া-কাবাব নয়, আমি বাঘ মারতে বাচ্ছি—

—কেন ? হঠাৎ বাঘ মারতে বাচ্ছো কেন ?

সিরাজউদ্দৌলা বললে—বা, মনে নেই ? একদিন তুমিই তো আমাকে বাঘ মারতে বলেছিল ?

—আমি ?

অনেক খুঁজেও মনে করতে পারলেন না আলীবর্দী খাঁ। ছোট বেলায় কতদিন নাভিকে কাছে বসিয়ে রেখে গল্প করতেন তিনি। নাভি কতদিন এই মদন চাইতো। সে কি আজকের কথা !

বললেন—ছোট বেলায় খুশী করবার জন্যে কত কী বলেছি, তা কি মনে আছে দাদু ? তা যদি বলেই থাকি তো সে কি আর সত্যি সত্যিই বাঘ মারতে বলেছি ! আসলে ইংরেজ জাতটাই তো বাঘের জাত ! বাঘের মতোই গুদের গৌ, বাঘের মতোই গুদের গায়ের তেজ ! বাঘের মতই গুরা পাকী—হরত গুদের কথাই আমি বলেছিলুম—তুমি বুঝতে পারোনি—! তা যাও, বাঘ মেঝে একবার দেখে এসো ! বাঘ মারতে সাহসের দরকার হয়—বাঘ মারতেও বুদ্ধির দরকার হয়, বাঘও ইংরেজদের মত সহজ জিনিস নয়, তা যাও, বাঘই ঘেঁষে এসো—

বিধু কবিরাজ সেদিনও এসেছিলেন। ঘেঁষে বললেন—যা যা শুধু ছিল সব তো দিলাম, এমন শুধু বদলাতে হবে—

পরলা-বউ বললে—শ্রামাপস ভাল হবে তো খুড়োমশাই ?

কবিরাজ মশাই বললেন—একটা অহুপানের জন্যেই একটু অহবিধে হচ্ছে, সেটা গেলেই আর ডাবনা ছিল না কোনও—

—কী অহুপান ?

বিধু কবিরাজ বললেন—বাঘের চর্বি—

বাঘের চর্বি ! গায়লা-বউ ডাবনার পড়লো। পাছ-পাছড়া হলে না-হয় বন-বঙ্গল খুঁজে যোগাড় করে আনা যেত ! বাঘের চর্বি কোথায় আর পাওয়া যাবে !

বিধু কবিরাজ বললে—পুরোন-ঘি আমার কাছে আছে, কিন্তু বাঘের চর্বি না গেলে তো অহুপান সম্পূর্ণ হবে না। আমাদের শাস্ত্রে শুধুধের চেয়ে অহুপান বড়। অহুপান না হলে শুধু কোনও কাজে লাগবে না—

—তা হলে কী হবে খুড়োমশাই ?

কবিরাজ মশাই বললেন—অনেক খুঁজেছি মা, কোথাও পাচ্ছি না। কেউ চক্কোস্তির জামাই-এর কফাধিকা হয়েছিল, সেই সময়ে আমার কাছে যে-টুকু চর্বি ছিল সব শেষ হয়ে গেছে—! বাক্যই বলি, সেই বলে নেই। সকলকে বলে রেখেছি, এসে যেতে পারে—

পরলা-বউ বললে—তা কোথায় গেলে চর্বি পাওয়া যেতে পারে যদি বলে দেন তো আমিই না হয় যেতে পারি—

সে কি তুমি চিনবে মা ? আশ্চর্যকাল যে বাঘের চর্বিতেও লোকে ভেজাল দ্রব্য মেশাচ্ছে। ও কি তুমি চিনতে পারবে মা ? বাঘের চর্বির সঙ্গে ময়াল সাপের চর্বি মিশিয়ে দিলেই হলো ! খাঁটি বাঘের চর্বি না হলে যে উল্টো ফল ফলবে মা—

গয়লা-বউও ভাবনার পড়লো ।

আড়ালে দাঁড়িয়ে গঙ্গামণি তখন থরথর করে কাঁপছে ! তার মনে হলো তার পাড়াবার ক্ষমতা-টুকুও যেন লোপ পেরে যাচ্ছে । সে যেন এখনি মাটির ওপর পড়ে যাবে ।

কবিরাজ মশাই আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না । জামাপন'র তখন খুবই ঝাসকট হচ্ছে । হাঁপাতে আগন্তু করেছে । বুকের পাঞ্জরাগুলো হাঁপরের মত একবার উঠছে, একবার নামছে ।

গয়লা-বউ সে-দৃশ্য আর দেখতে পারলে না । তাড়াতাড়ি কবিরাজ মশাই-এর পেছনে গিয়ে বললে—কই, কিছু তো বললেন না আপনি খুড়োমশাই ?

—বলবো আর কী মা, ঈশ্বরকে ডাকো, ঈশ্বরই ভরসা এখন । আর আমি চেষ্টা করে বেধি এসিকে, যদি পাই—

হঠাৎ গঙ্গামণির নিকে চোখ পড়তেই গয়লা-বউ বললে—এ কি রে ? এমন করে মূহুর্তে পড়লে চলবে তোয় ? একটু শরু হতে হবে তো এই সময়ে ? তুই যদি এই সময়ে ভেঙে পড়িস তো ছেলেকে বাঁচাবি কী করে ? ছেলের সেবাই বা করবে কে ?

গঙ্গামণির মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না ।

গয়লা-বউ সাক্ষ্য দিয়ে বললে—বাঘের চর্বি পাওয়া যাবে না বললেই ওম্নি হলো ? আমি নিজেই বেরোচ্ছি, সেধি কী করতে পারি । তুই ছেলের কাছে বোস, আমি একবার ছিন্নাথপুরে যাচ্ছি, বিধু কবিরাজ ছাড়া কি আর কবিরাজ নেই বেশে ?

বলে গয়লা-বউ চলে গেল সেই ভাবেই । আর গঙ্গামণি তখনও পাথরের মত দরজার চৌকাট ধরেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল । (ক্রমশঃ)

॥ প্রজ্ঞাপতি ॥

শ্রীপরিচয় শুভ

সেপটিপিনের অঙ্গ জুড়ে

স্বরূপ নিয়ে গর্ব ক'রে

সোনায় গড়া প্রজ্ঞাপতি

হেসেই খেল লুটোপুটি ।

অবশেষে বললে হেঁকে,

মূল্য বেশী তোমের থেকে ।

ওরে জীবৎ প্রজ্ঞাপতি

মরণ ছাড়া নেইকো গতি ।

স্বাক্ষর এল নিক্তি নিয়ে ;

কি গড়াবি ওটা দিয়ে ?

মা শুধালে, বলনা বুড়ী—

বুড়ী বলল, গড়াব চুড়ি !

লগুনে কোথায় থাকবেন?

আবেদন হোসেন

নিত্য অহল-চলভি-শাক-শুকতুনি খেয়ে খেয়ে মুখের স্বাদ বহন বিবাদ হতো, তখন চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, ভালহোসী কিংবা এসপ্লানেন্ডের কোন বড় রেস্তোরাঁয় কাটা-চামচ-চুরিতে ছিমছাম চপ-কাটলেট কিংবা রোট খেয়ে মুখের স্বাদ ফিরিয়ে আনার মধ্যবিত্ত বিলাসিতা আমাদের অনেকেই ছিল। চপ-কাটলেট-রোটের এ মাহাত্ম্য শিখিয়েছে ইংরেজরা, যেমন ইংরেজী শিখেছি আমরা।

বিলেতে এসে মজার-মজার চপ-কাটলেট-রোট-টিপস্ খেয়ে মুখের স্বাদও পোষাক-পরিচ্ছদের মত বিলিত করেছি যদি ভাবেন, তাহলে সত্যিই ভুল করবেন। ইংরেজী ভাষার সাংবাদিকতার পেশা নিয়ে বিনয়'দা বিলেতে এসেছেন ক'দিন হলো। লাক খাবার সময় লপেৎ কর্ণার হাউসে একটা 'Hamburger' আর এক পেয়াল; কফি সেন্‌স সাউন্স কাউন্টারে টেস দিয়ে লাক খাওয়া হলো। বিনয়'দা বলেন, বাপু, এ খেয়ে দিন কাটবে কি করে? বম্বু, বিনয়'দা, যদি ভাবেন আসনে খাবড়ি পেতে বসেছেন আর বৌদি ঝালে ভাত, চলভি, ভাজা, মাছের ঝোল বেড়ে হাতপাখা নাড়ছেন—স্বস্তিতে দু'দু'মুঠো থাকেন, তাহলে ভুল করবেন। এ দেশের বার্তিক সভ্যতার ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া সবই Drip-dry wash and wear। উহুনে আঁচ ঘেঁষা, কলতলার ঝালা-বাটি মাজা, খাওয়া শেষে বারান্দা নিকোনার ঝামেলা পোহাতে এরা রাজী নয়, সময় নেই।

ভালো করে এটা-ওটা ভালোমন দু'দু'মুঠো আরামে-আয়েসে খাওয়া এদেশে বিলাসিতা, ব্যয়-সাপেক্ষ। রেস্তোরাঁ বলতে এখানে দামী জাহাঙ্গীর ব্যার। হরহামেশা সজা খাওয়ার জন্ত রয়েছে সেন্‌স সাউন্স ক্যাফেটেরিয়া, ক্যান্টিন, ছোটখাটো কন্টিনেন্টাল গ্যাক-বার কিংবা কিশ অ্যাণ্ড টিপস্ বার; মাছ আর আলুভাজা দিয়ে এক সন্ধ্যার খাওয়া শেষ হয়। বহু ইংরেজ মাছ খেতে বাঙালীদেরও হার মানার। স্নাভুইচ, রোট বিক্ এবং ইয়র্কসায়ার পুডিং কিংবা ভোল এবং হ্যাম পী, বড়জোর ল্যাং চপ পী'স, এবং ক্যাবেজ আর তার সঙ্গে লীমন টী, এই হলো নিত্যের খাওয়া—এমিক-ওমিক এটা-ওটার বেশী কিংবা কয়ে নিত্যের এই একঘেয়েমি কাটে।

কোন সন্ধ্যা বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে আপনার যদি খেতে ইচ্ছে করে বাইরে, তাহলে কোথায় থাকবেন এ নিয়ে সমস্তা হতে পারে। লগুন বিরাট নহর, হাজারো দেশের লোকের ভিড়, হাজারো রকমের

খানা-পিনার রেস্তোরা, হোটেল, রিস্টো পাবেন। যদি জানা না থাকে কোথায় কি ভাবে কি পাওয়া-পাওয়া যায়, কত দাম, কত খরচ হবে, তাহলে নিরাশ হতে হবে। Dining out এদেশের এক হুম্বর আচার। পরমাণুমালা লোকেরাই তাদের বাড়িতে Cook-chef-এর হাতের রান্না খাইয়ে প্রতিটি আপ্যায়ন করতে পারে। সাধারণ লোকের বাড়িতে রান্নাবান্নার সাতসরস্বাম থাকে অল্প, লোক বসানোর আয়গাও হয় সংকীর্ণ। তাই বেশীরভাগ লোককেই নির্ভর করতে হয় রেস্তোরা, ক্যাফে-টেরিয়ার উপর।

লওনে দেশী-বিদেশী পাওয়ার জায়গা পাবেন সবচাইতে বেশী লওনের আন্তর্জাতিক পাড়া মোহোতে। এককালে মোহোতে আসতেন নাইটরা ফ্রাঙ্ক-হাটিং করতে। এখন এখানে লোকেরা আসে ফ্রুটি করতে, নাচতে, খানা-পিনার সন্ধ্যানে। লওনের ডায়েট এণ্ডের মাঝখানে মোহো পাড়া। এর একদিকে রীজেন্ট স্ট্রিট, পিকাবেলি, স্ট্রাফটসবারি এ্যাভিনিউ, অল্প দিকে টোটেমহাম কোর্ট রোড, অক্সফোর্ড সার্কাস। সারা এলাকার সর্ব সর্ব রাস্তার বহর, লোকজন, গাড়ি-ট্রাফিকের হাঙ্গামা। ইতালীয়, স্পেনিশ, গ্রীক, ভারতীয়, ফরাসী, রুমানীয়, হাঙ্গেরীয়—জর্নিয়ার সারা দেশের খানা পাবেন এখানে। মোহোর গ্রীক স্ট্রিট, ডিন স্ট্রিট দিয়ে চললেই দেখতে পাবেন নিচোন-সাইনে লেখা নানা রেস্তোরা'র নাম। ডিন স্ট্রিটে ইতালীয় বাবার রেস্তোরা 'জেনারিয়স'-এ শুধু যে পরিবেশন আর খাবারই বহর উচ্চাঙ্গের তাই নয়, এদের আপ্যায়নও ভারী অজুত। আপনার সঙ্গে যদি কোন মেয়েরা থাকেন, তাহলে তাদের দেখা হবে একটা করে গোলাপ ফুল।

এখানকার রেস্তোরাগুলির বৈশিষ্ট্য শুধু দামে নয়, পরিবেশন ও পারিপাট্যও। টেবিলে বসা মাত্রই পরিবেশক এসে আপনাকে বলবে 'at home' বোধ করতে এবং আপনার পছন্দমত আপনাকে ভুট্ট করবে। তাছাড়া রেস্তোরা'র টেবিল, চেয়ার, ছুরি-কাটা-চামচ, এমন কি চতুর্দিকের দৃশ্য পর্যন্ত ঝলসস্বত উপায়ে সাজানো। বতাইর সময় আপনি রেস্তোরা'য় কাটাবেন, সেই সময়টুকু ঘেন আপনার মনোরম হয়, সেইদিকেই রয়েছে পরিবেশকের দৃষ্টি।

চলুন নিয়ে যাই রীজেন্ট স্ট্রিটের উপর 'কেফ 'রয়েল'-এ, এডওয়ার্ডার্ড যুগের নামকরা রেস্তোরা এটি। লাল কার্পেট-মোড়া, খবার ঘরের চারদিকে সোনালী ফ্রেমে আয়নারাজোড়া দেয়াল। এখানে ঢুকলে মনে হবে আপনি এসেছেন অস্কার ওয়াইল্ডের যুগে, থিয়েটার-কোর্তা সৌখীন মেজাজে। অস্কার ওয়াইল্ড, এইচ. জি. ওয়েল্‌স আসতেন এখানে হরহামেশা আজ্ঞা দিতে। আজকে এখানে বা থাকেন তার স্থান এক শতাব্দী আগে কেমন ছিল তা বলতে না পারলেও, একথা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন যে 'Importance of being earnest' নাটকটির সাফল্যের পর অস্কার ওয়াইল্ডের তাঁর গুণগ্রাহীদের নিয়ে এখানে যে খানা-পিনার আজ্ঞা বসিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই

ভরজনাই হয়েছিল। আজকেও সেই অমলমাটির বেশ আছে, আর আপনার বরচ হচ্ছে দুই থেকে আড়াই পাউণ্ড।

বাগ্‌য়ার সঙ্গে হরা থাক। এবেশের রাস্তা। ধীরে ধীরে আপনার সামনে স্পিরিটের আগুন খাওয়া গরম করছে মশালচি, পরিবেশক দেবার চেষ্টা করছে আপনার স্বাদ ও রুচির উপভুক্ত করে। বেতোয়াতে বাগ্‌য়ার আগেই আপনার সামনে থাকবে খাবার তালিকা।

দোহো পাতা ছাড়াও লণ্ডনের সৌকীন পাতা Knightsbridge, Chelsea, Belgravia, Mayfair, Kensington, Humpstead-এ রয়েছে বহু বাগ্‌য়ার ভাষণ। নিত্যের স্বামেলা থেকে দু'পও আবেশ করতে লোক যায় নানা বাগ্‌য়ার সন্ধান—গাড়ীতে, বসে-টিউবে, হেটে। Chez Luba, Magic Carpet, Balkan Grill, El Cubano, Bistro d'agran, Trattoria Toscana এমনি সব নাম। হাল ফ্যাশনে সাজানো রেস্তোরা, পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ থাকতেই হবে রেস্তোরাগুলোতে। খেতে বসে ইউরোপীয়দের সব চাইতে বড় ক্ষেত্র বাড়াবার ব্যাপার হলো পরিবেশ। ইতালীয় খাবার খেতে এসেছেন ধকন কেনসিংটনের এক চোন্ট গলিতে, Casa Porelli রেস্তোরা। পর্দা সরিতে ঢুকতেই মনে হবে আপনি লণ্ডনে না ইটালীয়ান Rivieraতে। Pasta, Risotto বাগ্‌য়ার ভাষণ হলো এটা। কিছুক, শামুক, ফ্রাঙ্কমেন আর চিড়ীর কুখ্যাত রাস্তা হর কানিংহাম-এ ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার মেকেরাবে। মার্বেল আরের লোটাস হাউসে, চেলসের ফুটব-এ পাবেন 'পিকিং-ডাক'-পুত্রো হাস—টক-মিষ্টি-কালের মিশ্রণ সবচাইতে বিদেশীয় সৌকীন খাবার।

তালিকা দিয়ে আর খানাপিনার সম্বন্ধারদের ভুট করতে পারা যায় না। এখানকার ব্যস্ত-সমস্ত জীবনে কালেভেঁষে যদিবা দু'পংসা ভরিবে, ধার করে নিজের তুষ্টির জন্তে, বাগ্‌য়ার বিলাসিতা করি, তবু মন পড়ে থাকে বেশে গাঁয়ের হৈশুলে—মারের হাতের পোড়া-জলা অন্তরের পানে।

* লণ্ডন বি.বি.সি. বেতার-বিজ্ঞান সৌজ্ঞেয়।

রেড সী

রেড সী কোথায় এবং কি তা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু এই সাগরের নাম কেন হ'ল রেড তা বোধহয় তোমাদের মধ্যে অনেকেই জানো না। এই সাগরের অতল তলে ট্রিকো-চেপিয়াম বলে এক জাতের গুল্মলতা জন্মাতো, তার নির্ধানে সারা সাগরের জল হ'ত লাল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্টর প্রভৃতি পণ্ডিতরা এই তথ্য আবিষ্কার করলে, তখন এই গুল্মলতার উচ্ছেদ-সাধন করা হয়।

অল কথার গল্প

শ্রীজয়দেব রায়

প্রসিদ্ধার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেট যেমন স্নায়ুপরাধীন ছিলেন, তেমনই বসিক ছিলেন। সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি অতিমাত্রার সন্ধান ছিলেন। একটি সাধারণ সৈনিক ঘুমে অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কোন পদমর্যাদা ঘটেনি, কিংবা কোন পুরস্কার লাভও হয় নি। সে এ বিষয়ে সম্রাটের কাছে দরবার করবার সুযোগ খুঁজছিল। এমন সময়ে একদিন সম্রাট স্বয়ং তাদের ব্যাবাক পরিদর্শনে এলেন। সৈন্যটি সম্রাটের খেড়ালের কথা জানত, তার চাকরির উন্নতির ক্ষেত্রে আবেদন করে সে একটা দরখাস্ত লিখল। সম্রাট আসতেই, দরখাস্তট হাতে নিয়ে তাঁকে স্ত্রান্ত জানিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে বলল—হুজুর একটা কথা। সম্রাট কৌতুক করবার ক্ষেত্রে বললেন—কিন্তু দুটি কথা বললে তোমাকে কাশিতে কোলাহো, তিনি জানতেন সৈনিকটি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবে না। সৈন্যটি অভিমান করে তার দরখাস্তটি এগিয়ে দিয়ে শুধু বলল—সই! সম্রাট এত চমৎকৃত হলেন যে, তার পিঠে হাত দিয়ে হেসে তার প্রমোশনের আদেশে ‘সই’ করে দিয়ে গেলেন।

একবার এক সৈন্যবাহিনীর কর্ণেল তার অধিনায় আর এক সামরিক অফিসারের উপর চটেছিল। কূটকাওয়ারে তার খুব তুলচুক হত, আর কাঙ্ক্ষকর্মেও তেমন সে উন্নতি দেখাতে পারছিল না। সৈনিক ব্যারাকের একটা ঘরে তারা দু’জনে বসেছিল, কর্ণেল তার অধস্তন অফিসারটিকে এ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আডাস-ইজিতে ভিজ্ঞান ক’ল—হ্যাঁ হে, তোমার বাবা কি কাজ করতেন? সৈন্যটি সরল মনে বলল—আজ্ঞে, তিনি চাষবাস করতেন।

কর্ণেল হেসে বলল—হায় হায়, তোমার বাবা যদি তাঁর কাজে তোমাকে দিতেন তো ভাল হত।

অধস্তন সৈন্যটির বড় রাগ হ’ল, কাজে তার দোষ থাকলেও ঘটে তার বুদ্ধি কম ছিল না। সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল—সাহা, আপনার বাবা কি ছিলেন? কর্ণেল বিরক্ত হয়ে বলল—কেন—ভদ্রেন’স!

সে এবার ভিড়ে একটা আওয়াজ করে বলল—ইস্, তিনি নিজের আদর্শে আপনাকে গড়ে যেতে পারেন নি।



১। মাতের বহন তার ছেলের চেয়ে
তিনগুণ। তারের দুই জনের বয়স হচ্ছে ৩৬;
ছেলের বয়স কত?

২। অক্টোবরের উত্তর ঠিক আছে, কেবল
মাত্র যোগ এবং বিয়োগ চিহ্ন চাই। সেই চিহ্ন-

গুলো বন্টিয়ে অঙ্কর ফল ঠিক করে পাবে।

(ক)	১৫	৮	৫=১৮
(খ)	৫	৫	৭=১৬
(গ)	১২	৪	৬=২১
(ঘ)	১১	৭	৫=২
(ঙ)	৮	২	৭=১০
(চ)	৭	৫	৮=১১

৩। যদি $A=২$, $B=৫$, $C=৩$ এবং $D=১$ হয়

তাহলে (১) কোন দুইটি অঙ্কর যোগ করলে ৭ হবে

(১)	"	"	"	৩ হবে
(৩)	"	"	"	৪ হবে
(৫)	"	"	"	৭ হবে

উত্তর

১। ২ বৎসর

২। (ক) $১৫+৮-৪=১৮$ (খ) $৫+৪+৭=১৬$

(গ) $১২-৪+৬=২১$ (ঘ) $১১-৭+৫=৯$

(ঙ) $৮+২-৭=৩$ (চ) $৭-৫+২=২$

৩। $B+C$; $A+D$; $A+B$



মেঠেডে

সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাঙলা দল

জাতীয় ফুটবল খেলায় বিজয়ী পুরস্কার
সন্তোষ ট্রফি এবার পথেছে বাঙলার দল।
খেলাটি হয়েছিল স্বপ্ন বাঙ্গালোরে। এ
পর্যন্ত উনিশবার এ প্রতিযোগিতা হয়েচে
এবং উনিশবারের ভেতরে এগারো বার
বাঙলা দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।
এবার বাঙলা দলের সন্তোষ ট্রফি জয়ের

আনন্দ আমরা বেশী করে করতে পারি এইজন্য যে মহীশূরের মাটিতে ফাইনালে বাঙলা দল মহীশূর
দলকে হারিয়ে নিয়ে সন্তোষ ট্রফি জিতেছে। এর আগে জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে মহীশূর ও
বাঙলা দল চারবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। চারবারের ভেতর দু'বার বাঙলা মহীশূরকে এবং
মহীশূর দু'বার বাঙলাকে হারায়, কিন্তু মহীশূরের মাটিতে বাঙলা একবারও মহীশূরকে হারানো
পারেনি—এবারই প্রথম হারালো। গতবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলকে সেমি-
ফাইনালে ভারতীয় রেল দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। এবার যে বাঘোটি দল নিয়ে
জাতীয় ফুটবল খেলার তালিকা তৈরি হয়েছিল, তার ভেতর ছিল অম্বু, রেলওয়ে, মহীশূর, মহারাষ্ট্র,
বাঙলা প্রভৃতি। প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে রেলওয়ের কাছে হার স্বীকার করে অম্বু দল
আগেই বিদায় নেয়। কোয়ার্টার ফাইনালে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব দলের খেলাটিও বিশেষ প্রতী-
দ্বিতার ভেতর শেষ হয়। পাঞ্জাব শুধু গোল বেগু ছাড়া আর সব ব্যাপারেই মহারাষ্ট্র দলের সঙ্গে
সমানে সমানে পাজা দেয়। তবুও শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব দলকে হার স্বীকার করতে হয়।

বাঙলা তার প্রথম খেলায় কেবলকে ৫—০ গোলে হারিয়ে নেয়। সেমি-ফাইনালে বাঙলা
দলকে খেলতে হয় মহারাষ্ট্র দলের সঙ্গে। খুব কষ্ট করেই এ খেলাটিতে বাঙলা দল এক গোলে জয়ী
হয়। গোলাটি দিয়েছিলেন বাঙলা দলের লেফট আউট এস, চ্যাটার্জি। মহীশূর দল রেল দলকে
১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে গঠে।

ফাইনালে বাঙলা ও মহীশূর দলের খেলাটিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। বাঙলা মহীশূরকে
দু' গোলে হারিয়ে দেয়। বাঙলা দলের পক্ষে গোল দু'টি দেন বথাক্রমে দীপু দাস ও মনল পুরকায়স্থ।
জাতীয় ফুটবল সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুটো দলের ভেতর একটি খেলার ব্যবস্থা আছে। এই
খেলার যে জেতে সে পার 'দাম্পাজী' কাপ। মহারাষ্ট্র ও রেলদল এ খেলার একটা করে গোল

করায় অর-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। দু' দলকেই যুদ্ধ-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। টেসে অরী হয়ে রেলদল প্রথম দু' মাস 'সাম্পাদী' কাপ রাখার অধিকারী হয়েছে।

দলীপ সিংজী ট্রফি

এবার দলীপ সিংজী ট্রফির ফাইনাল খেলা হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল এ দু'টি দলের ভেতর। দু' দলেই ভারতের কয়েকজন নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৪১৫ রান করে তাদের ইনিংস শেষ করে। এই রান তুলেছিলেন পশ্চিমাঞ্চল দলের হুধাকর অধিকারী (১০৬), পলি উড্ডিগড় (১০০), ভ্রাতা ব্যাটসম্যান অজিত শ্রওয়াসকার (২০) প্রমুখ খেলোয়াড়রা। দক্ষিণাঞ্চল মোটেই ভালো ফিফিং করতে পারে নি। অরসীমা ৭৬ রানে ৪টি উইকেট নিলেও তাঁর বোলিং খুব ভালো হয়নি। চতুর্থ দিন মোট চল্লিশ মিনিট খেলার পরই এ খেলাটির অর-পরাজয়ের একটা মীমাংসা হয়ে যায়। পশ্চিমাঞ্চল দল দক্ষিণাঞ্চল দলকে এক ইনিংস ও ২০ রানে হারিয়ে দিয়ে দলীপ সিংজী ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে। পশ্চিমাঞ্চল দল এইবার নিয়ে পরপর দু'বার দলীপ সিংজী ট্রফি বিজয়ী সন্মান লাভ করল। তৃতীয় দিনে অধিনায়ক অরসীমা এবং আকাশ আলি বেগ এই দু'জন খেলোয়াড়ের ব্যাটিং মাঠে ধারা হাজির ছিলেন তাঁদের সকলের খুব ভালো লেগেছিল। দক্ষিণাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসে অরসীমা ও বেগ যথাক্রমে করেছিলেন ৬১ ও ৭০ রান।

ইংলও বনাম অস্ট্রেলিয়া—তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়ার লিডনী মাঠে ইংলও বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দল আট উইকেটে অরী হয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দু' দেশের ভেতর এটি ছিল শততম টেস্ট। তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া অরী হলেও দু' দলের অবস্থা ধাঁড়ায় সমান সমান।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ভেরুটার টেসে জেতার পর অনেকেরই ধারণা হয়েছিল ইংলও দল বোধ হয় এবার এ টেস্টে জিতবে। প্রথম দিনের শেষে ইংলও দল রান উঠিয়েছিল ৭ উইকেটে ২৫৬। এর ভেতর কলিন কাউড্রে এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওক পুলার রান তুলেছিলেন যথাক্রমে ৮৫ ও ৫০। দ্বিতীয় দিন ২৭২ রানে ইংলওর প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দল ৫ উইকেটে রান তুলে ২১২। অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটসম্যানদের ভেতর ববি সিম্পসন ২১ ও নীল হার্ভে ৬৬ রান করে বিশেষ ঠিকানা পেরিয়েছেন। একদিন খেলা বন্ধ থাকার পর তৃতীয় দিন ৫ উইকেটে ১০৭ রান

যোগ করে ৩১২ রানে অস্ট্রেলিয়া তার প্রথম ইনিংস শেষ করে। ব্যাটী শেফার্ড ৭১ রান করে নট আউট থেকে বান। ইংলণ্ডের পক্ষে ব্রেন্ড টিটমাস তিনটে উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪০ রানে শিচিয়ে থেকে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়া দলের ন্যাটী কাস্ট বোলার ডেভিডসনের যাবতীয় বোলিংয়ের জন্তে মধ্যাহ্নভোজের আগেই মাত্র ২৭ রানে ইংলণ্ড দলের চারটি উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ড ৬ উইকেটে মাত্র ৮৬ রানে করে। চতুর্থ দিন ১০৪ রানে ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় জয়ের জন্তে অস্ট্রেলিয়া দলের মাত্র ৬৫ রানের দরকার হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর ২ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া স্বয়ংভার মতো রান তুলে ৩ উইকেটে বিজয়ী হয়। খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের দেড়দিন আগেই তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়।

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া—চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ

এডিন্‌ব্রু-এ ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম দিনে টেসে জিতে অস্ট্রেলিয়া দল সারাদিন ব্যাট করে দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৩২২ রান তোলে। অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম দুটো উইকেট মাত্র ১৬ রানের ভেতর পড়ে যায়। বাকী রান তোলেন নিল হার্ভে ও নরমান ওনিল। দ্বিতীয় দিন ৩২৩ রানে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ইংলণ্ড দল ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৯২ রান তোলে। তৃতীয় দিন চা-পানের আগে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককি, ডেক্সটার ও ক্রিড টিটমাসের চেষ্টায় ইংলণ্ড কলো অনেক হাত থেকে রক্ষা পায়। চতুর্থ দিন ৩৩১ রানে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিং শুরু করে সারাদিন ৬ উইকেটে ২২৫ রান করে। এই রানের ভেতর প্রথম উইকেটের খেলোয়াড় বিবি ডিম্পসন ৭১ ও ব্রাদ্যান বুথ-এর ৭৭রান ছিল। ডেক্সটার পাঁচ শতাব্দ বল করে ২০ রানে তিনটে উইকেট নখল করেন। শেষ দিন অস্ট্রেলিয়া দল বাকী ৪ উইকেটে আর মাত্র ৬৮ রান ওঠায়। তারপর ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করে দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২২৩ করলে অসমীয়াসিত ডাবে খেলা শেষ হয়। ইংলণ্ডের কেন ব্যাটমেন্ট দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩২ রান করে অপরাধিত থেকে বান। ডেক্সটার খেলার শেষে বলেন যে টিটমাসের বলে বোনের ক্যাচ কেলাতাই আমাদের জয়ের আশা নষ্ট হয়। এই ক্যাচ লুফতে পারলে আমরা হয়তো তাড়াতাড়ি প্রতিপক্ষের ইনিংস শেষ করতে পারতাম।

নতুন বই

(সমালোচনার জন্য সুখানি বই পাঠ্যমেন)

স্বামী বিবেকানন্দ—রাগা বহু। বাক-সাহিত্য, ৩০ কলেজ রো, কলিকাতা-২ হইতে বণনকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১.০০

বিগত বদৌলত-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যেমন বদৌলতনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে নানা ধরনের অধ্যয়ন বই প্রকাশিত হইছিল, স্বামী বিবেকানন্দ, জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষেও সেই স্বরূপ অনেক নতুন নতুন বই বেরিবেছে।

কম দানের মধ্যে রাগা বহুর এই বইখানি ভারী হৃদয় লেখা। আঠারোটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে, জন্ম থেকে স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক। বিবেকানন্দের বিভিন্ন সময়ের ছবিও আছে কয়েকখানি। শিকাগো ধর্মসভার বক্তৃতা-মঞ্চের উপর স্বামী বিবেকানন্দের ছবিখানি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরের প্রচ্ছদ-পটটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বইখানি বড় টাইপে এবং ভাল কাগজে ছাপা।

প্রেত পাঁহাড়ের সরোবর—রবীন্দ্র সরকার। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ ভ্রামাচরণ মে ক্লিট, কলিকাতা ১২ হইতে মনোরঞ্জন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২.০০

বইখানির নামটি যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি এর কাহিনীগুলিও পড়ুয়াদের মুগ্ধ করবে এবং তারা সম্পূর্ণ নতুনদের দার পাবে। যে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আত্ম পৃথিবীতে নানা বিস্ময়কর

আবিষ্কার ও নানা ধরনের গবেষণা হয়ে চলেছে, সেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করেই লেখা হয়েছে এই গল্পগুলি। কল্পনার সাহায্যে গল্পগুলিকে উপভোগ্য করে তোলায় চেষ্টা হলেও এর মধ্যে ফোটা-ঘাফি, ধাতুবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ও আকাশবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সম্ভান পাবে তোমরা সবাই। প্রথম গল্প 'প্রেত পাঁহাড়ের সরোবর'-এর নামে বইখানির নামকরণ হলেও, এর সঙ্গে আছে 'অতীতের ছায়ামূর্তি', 'মানসদ্বিহের রহস্য', ও 'আকাশ পারের আগন্তুক' নামে আরও তিনটি গল্প। প্রত্যেকটি গল্পই রহস্য ভরা এবং উপভোগ্য। বইয়ের ভিতরের ছবিগুলি ও উপরের রঙিন প্রচ্ছদপটটি আকার দিক থেকে ভারী হৃদয়।

বিলিতি ছড়া (২য় খণ্ড)—শ্রীমুকুল দাশগুপ্ত। ইউনাইটেড বুক প্রিটার্স, পৌন্ডম বুক মার্গ, লখনউ। মূল্য ১.২৫

বাক্যের ছড়ার বই টিক বে ধরনের হওয়া উচিত, এই বইখানি ভারী সেরা নিদর্শন। যেমন দু'তিন রঙের পাতা-স্তর এর ছবিগুলি, তেমনি বেশ বড় ডবল-গ্রেট টাইপে ছাপা সহজ ও হৃদয় ছড়াগুলি। এমন একখানি বই হাতে পেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে এবং অক্ষর চেনা থাকলে নিজেদের আগ্রহেই যে পড়ে ফেলবে তাতে আর সন্দেহ নেই। নামে 'বিলিতি ছড়া' হলেও এর মধ্যে পুরোপুরি শিশুর দৃষ্টিই রেখেছেন লেখক। এটি তাঁর সৃষ্টিশেষেরই পরিচয় দেয়।



বাংলা তথা ভারতের পুণ্যভূমিতে
আবির্ভূত হয়েছেন বহু স্বপ্নকন্যা মহাপুরুষ।
কেউ রাজনীতিতে, কেউ ধর্মচিন্তায়, কেউ বা
আবার অবহেলিত মানুষের সেবারতী হয়ে
নিজেষ্টের আত্মত্যাগ করেছেন। এমনিই

দুই মহামানব হলেন যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ আর সর্বভাগী—গান্ধীজি। ভারতবর্ষের সমগ্র
অবহেলিত মানুষের সেবায়, তাদের উন্নতিবিধান—মানুষ হিসাবে সমাজে মর্যাদা দেবার ব্রতে
আলোকবক্তিতা বহন করে এনেছিলেন এই দুই ভারতদাস্তান। স্বামীজি ও গান্ধীজির কাজের
মধ্যে আকৃতিগত কিছু তফাত থাকলেও, প্রকৃতিগত কোনো বিভিন্নতা ছিল না। মূঁচ মেথর বলে
সমাজে বাঘা উপেক্ষিত ছিল, স্বামীজি তাদের উন্নতিকল্পে যেমন প্রচেষ্টা করেছেন, গান্ধীজিও তেমনি
হরিজনদের সমাজস্খীবনে হুগ্ৰতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। স্বামীজি বলতেন যে,
দেশের সামগ্রিক উন্নতিই যদি আমার সংকল্প হয়, তাহলে সহস্রমুখী আদর্শের মাধ্যমে তা মোটেই
সম্ভব নয়। আমাদের ফিরে তাকাতে হবে গ্রামের দিকে—যে গ্রামকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ আজ
গাড়িয়ে আছে, সেই গ্রামের সার্বজনিক উন্নয়ন, ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলে গিয়ে প্রত্যেককে মানুষের পূর্ণ
মর্যাদা দেওয়াই একমাত্র উন্নতির পথ।

পরবর্তীকালে গান্ধীজিও সেই অমর আদর্শ আমাদের জীবনে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন
এবং সার্থকতার পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে যখন কাজ করার সময় হলো,
ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, তখন আমরা গান্ধীজিকে হারালাম।

১৭ এবং ৩০ জাহ্নবীর দু'টিই আনন্দ ও বিধাদের দিন। এ দু'টি দিন এবছর চলে গেছে
তবুও এই পবিত্র দিন দু'টিই আমরা স্মরণ করবো প্রতিদিন। দুই মহাপুরুষের মহান চিন্তাকে,
আদর্শকে, আমরা রূপ দিয়ে আগামী কালের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলবার প্রয়াস পাবো।

চিঠির উত্তর :—

শ্রীকর্ণা ঘোষ, রাণীগঞ্জ—মধুসূদন ও বিজ্ঞানাগরের যে তার প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে—মধুসূদন আর
বিজ্ঞানাগর দু'জনেই খ্যাতিমান ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের খ্যাতি আমাদের দেশ ছাড়িয়েও বাইরে
চলে গিয়েছিল। তবে ইয়োরোপের লোক কার নাম বেশী জানে এ কথা যদি জানতে চাও, তাহলে
বলবো—বিজ্ঞানাগরের নাম অনেকেই জানে—তোমরা পড়েছ তো, যদেশে লোকেরা পূজা করে
রাণাকে কিন্তু বিজ্ঞানকে পূজা করে সেখ-বিদেশের লোক। আর তিনি তো যেমন-তেমন বিজ্ঞান ছিলেন
না, ছিলেন বিজ্ঞানাগর। কিন্তু ইয়োরোপের লোকের কাছে মধুসূদন ছিলেন আরো বেশী পরিচিত।

তিনি বিলেতে অনেকদিন ছিলেন, শুধু সেইজন্যই নয়, প্রথম যখন সাহিত্যচর্চা করতে শুরু করেন, তখন তিনি ইংরেজী ভাষার কবিতার বই লিখেছিলেন—আর সেইজন্যই ওদেশের লোকদের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল বেশী। আর বিদেশী ভাষার ছ'জনেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তবে ইয়োরোপীয় ভাষার বেশী পণ্ডিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন স্রীমধুন্দন।

বেণুলেখা ও অনুলেখা রায়, দমদম—তোমরা লিখেছ—চারিদিকে বসন্তুরোগ হচ্ছে বলে কাগজে লেখে, বেডিক্রেত বলে—একত্রে তোমরা কি করবে? প্রত্যেক বছরই শীত চলে যাবার সময় গরম বেণা দিলেই—নানারকম অতর্কিতকরণ দেখা দেয় এবং সাবধান না হলেই এর হাত থেকে পরিমোহ পাওয়া যায় না। এই সময় খুব সাবধানে থাকা সরকার—প্রতিষেধক টিকা অবশ্যই নিতে হয় এবং বাইরের খাবারদাবার খেতে নেই। অপরিস্কৃত জায়গায় যেতে নেই, হাত পা চুল নখ জামাকাপড় সব সময় পরিষ্কার রাখতে হয়। ঢাকা দেখতে নেই এমন খাবার খুব সোজানীত হলেও পরিত্যাগ করা সরকার। নিজেতে এসব মানবেই—বন্ধুদের ও ছোট ভাইবোনদেরও যাতে এসবকরে সেরিক লক্ষ্য রাখবে। আমরা অসাবধান হয়েই তো অতর্কিতকরণ জেরে আনি, নাহলে ওদের দাখ্যও নেই যে আমাদের দ্রিসীমানার আসে।

কুন্সু লাহেড়ী ও শম্মা মৈত্র, কোলকাতা—হোলী উৎসব বা দোলধাত্রায় যে উৎসব আমরা পালন করি তা আমাদের জাতীয় উৎসবের অনেকগুলির মধ্যে একটি—জাতীয় উৎসবগুলি পালন করা উচিত বৈধি। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরস্পরের মধ্যে যেলোমেশা! এই সব উৎসবই ঘটাবার ব্যবস্থা পাও কিয় উৎসবগুলিকে বিকৃত করা উচিত নয়—তার উদ্দেশ্য এবং মধুরতা বজায় রাখা উচিত। সবচেয়ে পুণ্য, দোলধাত্রা প্রকৃতি এমনি সব উৎসবগুলিকে কি ভাবে বিকৃত করা হয় বলোতো? বিশেষ দোলযাত্রায়। স্বগন্ধি আবার কাগ দিয়ে কোথায় প্রীতি শ্রদ্ধা জানান হবে, তা না কাশা মাটি গোবর চুল ও বিক্রী রং দিয়ে তার গুচিকাকে নষ্ট করে ফেলি আমরা। তোমরা উৎসবের তাৎপর্য বুঝতে শেন এবং তাকে সম্মান দিতে শেন—এই কথাই আমি বলতে চাই।

শর্মিষ্ঠা ও নির্মা মুখোপাধ্যায়, জামসেদপুর—বাংলা ভাষার প্রথম কোন সংবাদপত্র ছাপা হয়েছিল মদ্যনেতে চেয়েছ। বঙ্গবন্ধু জানা যায়, বাংলা ভাষার প্রথম যে সংবাদপত্রটি ছাপা হয়েছিল তার নাম 'সমাচার দর্পণ'। ১৮১৮ সালের ২২শে যে সীরাযপুরের ছাপাখানা থেকে এটি প্রকাশ করা হয়েছিল। 'অবশ্য এ সংঘে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, 'বেঙ্গলী গেজেট' নামে পরিচিত সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'র আগে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সাধারণভাবে 'সমাচার দর্পণকেই' বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র বলে মনে করা হয়।

আম্মা, আম্ম এই পর্যন্ত। তোমরা আমার শুভকামনা ও ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের—মুন্সু

স্রীমধুগুপ্ত সরকার কর্তৃক ১৪ বক্সি চাইলো স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রকৃ প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০৪৫ ন. প.

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *



৪৩শ বর্ষ]

চৈত্র-১৩৬৯

[১২শ সংখ্যা

বৃক্ষসাপ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়



“চূপ মেরে যাও, গোল কোরোনা। এখন একটু ভাবব।

ফেলব লিখে এখনি এক আজব মহাকাব্য।

খোকনবাবু নায়ক তাহার, খাকীর পোষাক আছে,

চকোলেট আর টফি-লজ্জেল খাও নিয়ে সঙ্গে

যুদ্ধে যাবেন ঠিক করেছেন চ'ড়ে কাঠের ঘোড়া,

উঠবেন তিমালয়ের টঙে—ভয়-ডর নেই খোড়া।

“নাক-খ্যাদা সব ট্যারছা-চোখে চীনে হতুমান—

আরসোলা আর সাপ-ব্যাড খেয়ে করছে অতুমান—

ভারতবাসী হীন কাপুরুষ, চড়াইপাখীর ছানা,

ফুডুং ক'রে পালিয়ে যাবে দিলে পরেই হানা।

হা রে রে রে ! জয় মা কালী ! বন্দে মাতরম্ !
 দিল্লী চল ! মুম্বৈ চল ! হুমদাম্ দমাস্ দম্ !
 লে আও খুকী, কল্দি লে আও আমার এয়ার-গান,
 আন্ তরোয়াল, অ্যাটম-বোমার বাজাগুলোও আন্ ।
 তুঁইপট্কা আর চীনে-পট্কা, আর আন্ ছুঁচোবাজী,
 তাঙতে হবে চতুখোর ঐ চৈনিক কারসাজি ।
 আয় রে কেঁদো হলোবেড়াল, বাঘা-কুকুর আয়,
 খুকুমণি, দাও গো হলু, লগ্ন বয়ে যায় ।
 জয়যাত্রার গান ধরো সব—”

“ওকি খোকন, থামলে কেন ?”

“পায়ের শব্দ শুনছি ও কার ? মষ্টারমশাই আসেন যেন !”

“মহাকাব্য লিখতে ব'সে মাষ্টারকে ভয় করে কেউ ?”

“রাম-গাট্টা তাঁর খাওনি বুঝি ? কাদতে হবে ভেউ-ভেউ-ভেউ !”

‘আলোক-বর্ষ’ কাকে বলে ?

পৃথিবী থেকে তারা কত দূরে আছে, তার গণনা হয় এই আলোক-বর্ষ দিয়ে । পৃথিবী হয়ে তারার দূরত্ব এতো বেশী যে অসংখ্য শত (০) বসিয়েও তা বোঝানো যায় না । অসংখ্য শত দিয়ে দূরত্ব বোঝাতে হলে তার কোন অর্থ হুঁজে পাওয়া যায় না । তারারা যে আলো দেয় তা পৃথিবী দিকে প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬, ৩২৬ মাইল বেগে আসে । স্বর্ঘ হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে নিকটতম তারকা—অর্থাৎ পৃথিবী হতে ৯২ মিলিয়ন মাইল দূরে । পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌঁছতে প্রায় আট মিনিট লাগে । এখন যদি বলা হয়, একটা তারার আলো পৃথিবী থেকে এক আলোক-বর্ষ দূরে—তাহলে অর্থাৎ হবে এই রকম—১৮৬, ৩২৬ মাইল দূরে তারা অবস্থিত $\times ৬০ \times ৬০ \times ২৪ \times ৩৬৫$ = প্রায় ৬ মিলিয়ন মাইল Pollux নামে একটা তারা পৃথিবী হতে ৫০ বা তার চেয়ে বেশী আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত । তা হলে ভেবে দেখ এই দূরত্ব কি মাইলে লেখা যায় ?

নীল সেলেটে নানা রং

শ্রীবিমল দত্ত

বড়বাড়ীর ছাদের কথা বুঝি তোমাদের বলিনি! যেখান ত' বুড়ো হয়েছি, এবার। সব
যেন কেমন কুলে কুলে বাজি।

বড়বাড়ী তিন-মহলা—এক এক মহলে একটা করে ছাদ আর একটা করে উঠোন—এ ছাড়া
পিছন দিকে মস্ত একটা পাঁচিল ঘেরা বাগান। এই বাগানে গোটা দুই আমগাছ একটা এঁবড়ো-
খেঁবড়ো অষ্টাবক ডুমুরগাছ একটা চ্যাংচেঙে পেয়ারা গাছ আর গোটা দুই লেবু গাছ ছিল।
বাগানের একধারে গোয়াল আর এক কোণে হাঁসের ঘর। তাতে থাকতো পাঁচ-ছ'টা হাঁস, যেমন
কদাকার তাদের চেহারা তেমনি ছিল তাদের প্যাক প্যাক ডাক—আর খতাবটা ছিল বেজায় দুটু,
—মুখ ছুঁচ করে বাড়িয়ে আমাদের এমন ডাড়া করতো যে বাঘের চেয়েও এদের আমরা ভয় করে
চলতাম। গাইগর ছিল একটা—দেটার যখন বাছুর হ'ত, তখন তার ভারী আঁধর। রাতামহলে
বটখটে সিমেন্ট বাধানো উঠোনে তাকে বেঁধে রাখা হ'ত। এই রাক্ষসী গরুটা একবার আমার
অঁধর খাতা কচবু-মচবু করে চিবিয়ে খেয়ে নেয়। অঁধর উপর এত খোঁক পশুদেরও থাকে তা
সেদিন টের পেলুম। কিন্তু অঁধর খাতা খাবার পর গরুটার বুদ্ধি বেড়েছিল কিনা তা বলতে
পারবো না।

এই বাগানটা ছিল আমাদের গরুরা, সাতসুদুদুর ভের মদী পারের মরনামতীর মাদ্রাকানন
—স্বপ্নে দেখা মুক্তাকলের দেশ—আর সমুদ্রতীরে আবার দুটু মি করে গা-ঢাকা দেবার দুর্গ।
বাগানের কথা আরেক দিন।

এখন বা বলছিলাম তা বড়বাড়ীর ছাদের কথা—এক দুই তিন, তিন-তিনটে ছাদ ছিল
আমাদের তিন বাগপুত্রের দখলে—না, না, রাজ্য ভাগ হয়নি। এই তিনটে ছাদের সঙ্গে লম্বা
লম্বা কালি ছাদ যোগ বন্ধা করতো। এই ছাদ থেকে পাঁচটা যেমন দেখাতো তা এবার
বলে নিই।

আজকালকার ছেলে তোমরা সবাই গিয়ে পাড়িয়েছ মাঠে—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি খেলার
মাঠ আর আমবা ছিলাম তখন আকাশের জীব! আমাদের জীবনের আদখানা জুড়ে ছিল
আকাশ—আমরা ছিলাম ঘুড়ি ওড়ানোর দল। নীল সেলেটের মত আকাশ জুড় উড়তো আমাদের
নানা রংয়ের ঘুড়ি। সে যে কী চমৎকার খেলা ছিল আমাদের, তা তোমাদের কি করে
বোঝাবো।

আচ্ছা এসো ত' সবাই বড়বাড়ীর ছাদে। কল্পনায় মনে করো বাহুড় বাগানের পকানন ঘোব লেনের একটা বাড়ীর ছাদে এসে দাড়িয়েছ সবাই। ইংরেজী E অক্ষরের মত তিনটে ছাদের চেহারা। সোজা বাড়ি ঝড়িটা এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে বাবার মক পথ। আচ্ছা এবার পূবে তাকাও—মিস্ত্রিদের বাড়ী, তারপর ইঞ্জিনিয়ার গিরীশ দাসের বাড়ী—তারপর গুলুদের সোতলা ছাদ আর এদের পিছনে সার্বেন্দ্র কলেজের বিরাট বাড়ী। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সিংঘীঘের শুবোনো বাড়ীর ছাদ তারপর ওধারে দপ্তরী পাড়া—আটনী বাগান, পাটোয়ার বাগান। দক্ষিণে হুহু হয়েছ কাতিকদের সোতলা ছাদ, গণেশদের সোতলা আর একটা খোলার বস্তী তারপর একটা মাঠ—তাতে একটা বটগাছ তার পিছনে ওয়াই-এন্-সি-এর বাড়ী। মাঠ আর নীতুদের বাড়ীর মাক-মধ্যে একটু দূরে সোতলা ছাদে পাণ্ডকে দেখা যায়। এ পাড়ার চেংগিজ খাঁ বা কালাপাহাড়—ঘুড়ির প্যাচে তার কাছে কেউ পারে না। এবার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে চাও—উহুতে দেখ যাচ্ছে কুন্তলীনের এইচ. বোসের বাড়ী আর পশ্চিমে আম গাছের আড়ালে রমণবাবুদের বাড়ী। তার সামনে অক্ষর বোসের ছাদ আর ডাক্তারবাবুদের ছাদ—এ দুটোই বড়বাড়ীর ছাদের সামিল আর আনাদের লুটপাটের এলাকা—পশ্চিমে বড় বড় কাউ আর দেবদাক গাছ হচ্ছে আমহাট' ক্লিটের 'আম্‌স্‌ হাউস' অর্থাৎ সাহেবদের গরীবখানার এলাকা—এখানে মাঠ থেকে সাহেবরা ঘুড়ি ওড়াতো—এই সব কাউ আর দেবদাক গাছ আমাদের কত ঘুড়ির দিবিজয়-সুখা লোপ করছে কে তার সংখ্যা রাখে। আম্‌স্‌ হাউসের ওপারে লাহাদের বাড়ী। উত্তরে ময়নাদের বাড়ী, তারপর 'লালবাড়ী' বলে কুতুড়ে বাড়ী আর কাঁচ তৈরীর একটা কারখানা। বাগানের পাঁচিল টপুকে এখান থেকেও আমাদের ঘুড়ি ধরে আনতে হ'ত। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সিংঘীঘের বাড়ীর ওদিকে ছিল তোমানদের সম্পাদক মশাইয়ের বাড়ী—মেটা ঠিক দেখা যেত না, তবে সেখান থেকেও ঘুড়ি উড়তো। আকাশে এবং হরত না-কেনে আমরা তোমানদের সম্পাদক মশাইয়ের ঘুড়ি কেটেছি বা তোমানদের সম্পাদক মশাই আমাদের ঘুড়ি কেটেছেন।

এ ছাড়া আকাশটার দিকে চাও তো—কেমন নীল। সমস্ত পাড়াটা ঢেকে রেখেছে বেন একটা বিরাট নীল এনামেলের বাটি। এই ছাদ আমাদের ডাকতো বিকেল হলোই। বিকেল হলোই বলছি কেন জানো—আমাদের ত' পড়াশুনো করতে হ'ত! তবু আকাশে বখন সকাল থেকেই কোন স্কুল-নামকাটানো ছেলের ঘুড়ি উড়ে একাই একঘেরে চড়চড় ফড়ফড় করতো, তখনো আমাদের ডাকতো এই নীল আকাশ। নীল সিলেটে রং দিতে ডাকতো আমাদের।

স্কুলের ছুটি হলোই এক ছুটে বাড়ী এসে বই খাতা ঝপু করে ফেলে রেখে গো-গ্রাসে খাবার খেয়ে আমরা উঠতাম ছাদে।

নীল আকাশটার দিকে তাকাতেই মনটা লাকিয়ে ছুটতে। দিগন্ত থেকে দিগন্তে। ছোট ছোট রঙের ফুল যেন ফুটে উঠেছে আকাশে। দপ্তরী-পাড়ার দিক থেকে হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে আসছে একটা। মধুপঙ্কজী ঘুড়ি—সেটা কেটে গেছে। কে পারে ধরতে—অস্ত্র ঘুড়িগুলো হতো ছেড়ে শেটাকে ধরতে যাচ্ছে। তাদের হুতোয় এর হুতোয়া। জড়িয়ে নিয়ে দুটো। ঘুড়ি একসঙ্গে টেনে আনাকে বলতো লটকে আনা। এর অস্ত্র চার দিক থেকে ঘুড়িগুলোর কী উদ্দাম চেষ্টা। তার মাঝে নতুন প্যাচ লটকাচ্ছে ঘুড়িগুলো। কাক্তিকের ‘ঘরলা’ ঘুড়ির সঙ্গে সিংখীদের চামিয়াল প্যাচ খেলছে—আমাদের ছায়েব মাখার ওপর দিয়ে দুটো ঘুড়ি চলেছে, হুতো ছেড়ে ছেড়ে পাক বেতে খেতে ‘আম্ হাউসের’ কাউগাছ আর দেবদাক গাছের মাখার ওপর দিয়ে চলেছে—কোন নিকশের দিকে—এদিকে গাঙর ঘুড়ি আসছে ওপর থেকে চিলের মত, গণ্ণার পুঁচকে ঘুড়িকে কাটতে। চড়চড় চড়বড় শব্দে নেমে এল গাঙ ওস্তাদের ঘুড়ি। তারপর গণ্ণার ঘুড়িটার পান দিয়ে নেমে চড় চড় করে টেনে একেবারে গণ্ণার ঘুড়িকে কেটে দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমরা টেঁচিয়ে উঠলাম—ভোঁ কাটা! গণ্ণা শুকনো মূখে হুতো টেনে নিচ্ছে। এদিকে সিংখীদের ঘুড়িটা গেল কেটে। কাক্তিকের ঘুড়ি ছোট্ট একটা টিপের মত হয়ে গেছে। আমাদের মাখার ওপর দিয়ে করাতেব রত ধারালে! মাঙা হুতো চলে যাচ্ছে। সিংখীরা হাঁকছে “ববদমা!” অর্থাৎ ভাবছে আমরা এই হুতো ধরে ছিঁড়ে নেব। এটাকে বলে মাঙা—এটা ধরে নেওয়া ঘুড়ি ওড়ানোর একটা উপরি লাভ হলও ওদের হুতো আমরা বড় ধড়তাম না। ধরলে পথঘাটে কানমালা আর চাঁচি বেতে হ’ত।

খাপা তার বোমা-লাটাই নিয়ে ঘুড়িটা ওড়ালো। সামনের বাড়ি থেকে কারা একটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। হুতো টেনে তাকে মাঝিরে নিলে—অর্থাৎ প্যাচ খেলবে না। খাপার ঘুড়ি উঠলো আকাশে—আমাদের আঁজ ঘুড়ি নেই ধরতে হবে। তাই কাটা ঘুড়ির প্রত্যাশায় আমরা একটা করে লগি নিয়ে অপেক্ষা করছি। এদিকে কাক্তিকের সেই বিজয়ী ঘুড়ি নেমে আসছে। খাপার ঘুড়ির সঙ্গে প্যাচ খেলবে। দুটো ঘুড়ি হুঁদিক থেকে তাল ঠুকছে। হুবাগ হুঁজছে। এমন সময় চিলছাদের ঘব থেকে বেরিয়ে এল ছোড়না। ছোড়না আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিল। কিন্তু ছেলেমানুষিতে আমাদের চেয়ে ছোট। তার ঝোঁক ছিল কাব্য লিখে বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে মাগাবে। তাই তাদের অস্ত্র কেবল উপদেশমূলক কবিতা লিখে চলতো দিশের পর দিশে। এই কবিতা কিছু লেখার পর আমাদের শোনাতে আসতো। তখন না গুনলেই অস্থির! আমরা ছোড়নাকে দেখেই চমকে গেলাম। বগলে একতাড় কাগজ নিয়ে ছোড়না আমাদের ছাঁদ আর ডাক্তারবাবুদের ছায়েব মাঝে উঁচু আলসের উপর পা খুলিয়ে বসলো।



‘আমরা ছোটলোক কেটেই চমকে পেলাম।’

তারপর চাইলো আকাশের দিকে, তখন
সারা আকাশে হয়েকরকম ঘুড়ির ভেল-
ভিগ্‌ভিগ্‌ খেলা লেগে গেছে।

ছোড়না বলে উঠল—

“কাগজ-পরী কাগজ-পরী

আকাশ-ভরা রঙীন অরী

খলমলিয়ে নাচছে—

তুমহো ভোলতাবারু,—কবিতাটা ?

বলি, মেলাও দেখি এর সঙ্গে ?” বলেই

আবার হ্রস্ব করে পড়তে লাগলো—

“কাগজ-পরী কাগজ-পরী...

আমি বলে উঠলাম—

“কেউ বা নাচে মেঘের পুরে

কেউ বা কাছে,

কেউ বা দূরে”...

ছোড়না তারিফ করে বলে উঠলো

—“আচ্ছা! হোক—হোক—তোর ত’

বেশ বিল জ্ঞান হয়েছে রে! লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখছিল বুঝি ?” আমি লজ্জা পেয়ে পেলাম।

সত্যিই লিখছিলাম। কিন্তু রেগে গিয়ে কবিতা মেলাতে লাগলাম—

“কেউ বা কাছে কেউ বা দূরে

কেউ বা শুধু লাভছে।”

ছোড়না ছাদের কাণিশ থেকে ছাদের উপর লাকিয়ে নেমে জরফানি করে উঠলো। স্বজর
কাছেই ছিল। আমার কৃত্তিমে বোধহয় তার একটু ঈর্ষা হ’ল। আমাকে একেবারে নত্যাৎ
করবার জন্তে বলে উঠলো, “আমার বাবা একবার একটা কবিতা বানিয়েছিল।”

স্বজনের মৃত্যুদোষ ছিল তিনটি। সে মজিলপুর, কহুলিয়াটোলা আর বাবা এই তিনটি বিষয়
ছাড়া কথা কইতে পারতো না।

খাপা তাকে তাতাবার জন্তে উর্ধ্বমুখ হয়ে ঘুড়ি সাইলাতে সাইলাতে জিজ্ঞাসা করলে,
“মজিলিয়াটোলার ২১ মজিলপুরে ?”

হৃদয় শতর্ক হয়ে বললে, “না, ওসব আরগায় নয়!”

খ্যাণা বললে, “তবে গুল্পটি!”

হৃদয় খেপে গেল, “হ্যাঁ গুল্পটি? জিগোস করে এমো না বাবাকে! সেবার আমরা যত্নপূরে গেছিলাম। সেখানেই ত' বাবা কবিতা বানিয়েছিলেন।”

খ্যাণা বললে, “সে কবিতার কথা ত' কাকপক্ষীও জানে না!”

হৃদয় বললে, “সে ত' কাককে নিয়েই লেখা কবিতা!”

আমি বললাম, “বলনা শুনি—”

হৃদয় বললে, “খাম্, ভেবেনি—হ্যাঁ, একবার ক্যুয়েতলা থেকে কাকে বাবার টুথব্রাশ নিয়ে পালায়—তাই বাবা কাকের উদ্দেশে কবিতাটি বানিয়েছিলেন—

“কালো কালো কাক তার কালো কালো কাল

টুথব্রাশ নিয়ে কেন পালাইলি আজ?”

ছোড়না বিকট শব্দে হেসে উঠে গভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে, “তা শুনে কাক কি বললে?”

আমরা সবাই হেসে উঠলুম। কিন্তু শুধুনি ঠকঠক করে দুটো কাটা ঘুড়ি আমাদের ছাদে পড়তেই আমরা সে দুটো ধরে বিপুল উৎসাহে যে বার লাটাই বার করে ওড়াতে লাগলুম।

গণেশ ঘুড়ি গাঙ কেটে দিয়েছিল। গাঙ এমনি সকলের ঘুড়িই কাটে। তাই আমাদের একটা মত কোড ছিল। কিন্তু গাঙ কি করে মারা দিয়ে নেয় হত্যার তা আমরা কেউই জানতাম না। কোনদিন কোন অজানা লোকের ঘুড়ি এসে গাঙের ঘুড়ি কাটলে আমরা আকাশ ফাটিয়ে ভেঁ কাটা বলতাম।

গণেশ মনের দুখে আমাদের ছাদে এসে উঠলো। গাঙের ঘুড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যেই খ্যাণা, আমর, হৃদয়ের আর কার্তিকের সব ঘুড়ি কেটে দিলে। ওমিকে যে দক্ষিণের মাঠ যেখানে একটা বিরাট বটগাছ ছিল, সেখান থেকে এবার লুপীপরা হয়ে হমো মূলমানরা বিরাট বোমা-লাটাই হাতে পক্ষী, সতরঞ্জি, চোখগুলো সব বড় বড় ঘুড়ি ওড়ালো। গাঙের ঘুড়ি তখন আকাশে ভাংি ভাং করে নাচছে যেন!

আমরা চোখগুলো আকাশে পুঁতে দেখতে লাগলাম।

গণেশ ফিসফিস করে বললে, “কাল মজা দেখাবো।”

আমি চমক উঠে বললাম, “কেন ভাই? আমি কি করলাম!”

গণেশ বললে, “হ্যাঁ তোকে কেন, ঐ গাঙকে।”

আমি বললাম, “পারবি? তাহলে ত' খুব মজা হয়।”

গণনা 'আম্ম হাউসের' দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে। খালি পায়ে ছেঁড়া পেণ্টুল পরা মাইনাস সেভেন চশমা চোখে ঢাংড়া জন্ আর কৌকড়া-চুল ফোঁকলা দাঁত জ্বোলেশ ঘুড়ি ওড়চ্ছে।

আমি বললাম, "ওদের ভারী মজা! খালি মদের বোতল গুঁড়ো করে মাঝা দেয় ওরা।"

গণনা ঠোঁট উটে বললে, "ছাই জানিস! হাড়কুচি—সেক, হাড় কুচি! ওরা হাড়কুচির মাঝা দেয়।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কি করে জানলি?"

গণনা বললে, "বাজার ময়ূর একদিন ওখানে উড়ে গেছিল। ধরতে গিয়ে দেখি, জন্ হামান-মিস্ত্রায় কী গুঁড়ো করছে। জন্ ত' আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে বোজ বাজাবাজাবে বাজার করতে যায়। আমি বলি, 'হোয়ার গো?' ও হেসে বলে, 'মার্কেট গোইং; কাম এলং'—আমি হাসি।"

আমি বললাম, "ঘাসনা কেন ওর সঙ্গে কত ইংরেজী শিখতে পারিস!"

গণনা বললে, কুং! ইংরেজী শিখতে গিয়ে শেষে একদিন মাইকেল গণেশ হয়ে যাই আর কি! ওরা যে ধরে ধরে ঐঠান করে! হ্যা, যা বলছিলাম—জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাষ্ট্রিং হোয়ার টি থিং"—জন হি হি করে বললে, "মাঝা—bones, bones of cows—উটম মাঝা—টেক সাম্—"বলে কি যেন সব আমার দিকে দিলে। আমি ময়ূর নিয়ে যে দৌড়!"

এবার আমার খুব কৌতূহল হ'ল। বললাম, "একদিন নুকিয়ে নিয়ে আয়না—গাঙকে একবার দেখব—কত বিস্মে ধরে—হ্যা হ্যা, হাড়কুচির মাঝার কাছে ঢালাকি নয়!"

ছোড়না আমাদের কথার শেষটা শুনে ভূক কপালে জুলে বললে, "কিসের মাঝা বললি?"

গণনা বললে, হাড়কুচির মাঝা।"

শুনত ত' ছোড়নার হাসি আর থামতেই চায় না। আমবা ত' হতভম্ব! এতে এত হাসির ধোয়াক কোথায় পেল ছোড়না!

ওদিকে আকাশের চোখ ঘূমে বুজে আসছে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। ঘুড়ি তখনো উড়ছে—শব্দ আকাশ চিবে ছুটছে। আর দেখা যায় না!

এমন সময় লম্বা সূতো একটা পায়ে লটকে গেল। হাত দিয়ে ধরে দেখি খুব সূতোবদ্ধ একটা ঘুড়ি ধরেছি। কি আনন্দ। অন্ধকারে সূতো টানছি—ঘুড়ি আর নামে না! সূতোর ছাদ ভরে গেল—এমন সময় নিচে থেকে বাবা ডাকলেন, "ভোনতা—ভোনতা—ভোনতা—"

ঘুড়ি গেল মাথায় উঠে। স্বপ্নকে সূতোটা ধরতে বলে তিন লাফে নীচে নেমে গেলাম। বুক ছকছক করছে। ঘুড়িওড়াতে বারণ করেছিলেন। কখন নেশায় পড়ে উড়িয়েছি। এখন কি করি?

কুরুক্ষেত্র ভ্রমণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এ কথা ভাবতেই পারা যায় না—কুরুক্ষেত্রের নাম শোনেনি এমন কোন ছেলেমেয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষে আছে। যারা ইংল-পাঠা সংক্ষিপ্ত মহাভারত পড়েছে, কিংবা যারা মহাভারত না পড়েও মা-ঠাকুরমার মুখে তার গল্পটা শুনেছে—কুরুক্ষেত্রপতনের কাছে অজানা নয়। এমত তো দূরের কথা—দেশে-গায়ে নিজেদের পাড়াতে কিংবা বাড়ীতে একটা-বিত্তী রকমের ঝগড়াঝাটি, যারামারি হয়ে গেলেও তো শোনা যায় মায়েদের মুখে—উঃ, কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। যদিও কুরুক্ষেত্র জায়গাটি আমাদের বাংলা দেশ থেকে অনেক তফাতে—হাজার মাইল দূরে, কিন্তু মহাভারতের ঘটনা আর মাহুগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই ঘটনাগুলি কিংবা মাহুগুয়া এদেশে-ওদেশে ছড়িয়ে নেই, তারা ভারতবর্ষের সব দেশের আর সব কালের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা আমাদেরই আত্মীয়স্বজন—আমাদের প্রতিটি শুভ-কর্মে, শ্রদ্ধা-পূর্বে তাঁদের আমবা স্মরণ করে থাকি।

তোমরা জান—এই কুরুক্ষেত্রের মাঠে এক সময়ে, সেটা পাঁচ হাজার বছরেরও আগে, হস্তিনার সিংহাসন নিয়ে কোরব আর পাণ্ডব দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের রাজারা যোগ দিয়েছিলেন। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, কাম্বুজ, সৌরাষ্ট্র, বিদর্ভ, কেরল, দ্রাবিড় কোন রাজা বাদ রাখনি। কোরব পক্ষে ছিল এগারো অকৌহিলী সৈন্ত—পাণ্ডব পক্ষে ছিল সাত—মোট আঠারো অকৌহিলী সৈন্ত এসে মিলেছিল এই যুদ্ধক্ষেত্রে। অকৌহিলীর হিসাব হ'ল—২,১৮,৭০০ সৈন্ত। রথ, অশ্ব, গজ আর পদাতিক—এই চার রকমের সৈন্ত থাকত এক একটি অকৌহিলীতে। একে বলা হ'ত চতুরঙ্গ বাহিনী। আবার এই চতুরঙ্গের ভাগটা ছিল এই রকম, রথ—২১,৮৭০, অশ্ব—৬৫,৬১০, গজ—২১,৮৭০ আর পদাতিক—১,২০,৩৫০। তাহলে আঠারো অকৌহিলীতে প্রায় চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি সৈন্ত এসেছিল এখানে যুদ্ধ করতে। একটা কথা মনে রাখবে—তখনকার দিনে পৃথিবীর জনসংখ্যা এমন বিপুল ছিল না। স্বতরাং অন্যত্রাসে ধরে নেওয়া যায়—সে সময়ে ভারতবর্ষে বড় রাজা আর বোকা ছিল তারা সবাই এসেছিল এখানে। এই বিরাট মাঠের বিস্তারও বড় কম ছিল না। লহরায় আর চণ্ডীয়ার জায়গাটা ছিল পঞ্চাল মাইলের মত। এই বিরাট জায়গা জুড়ে দু'পক্ষের তাঁবু পড়েছিল—পূবে আর পশ্চিমে দুটো বড় শহর গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধ চলেছিল আঠারো দিন ধরে। আর সেই যুদ্ধে চল্লিশ লক্ষ লোক সবই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমন যুদ্ধ ভারতবর্ষের মাটিতে আগে কখনও হয়নি, পরেও হয়নি। তাই কোন বড় রকমের একটা হান্সামা বাধলে আমরা কুরুক্ষেত্রের তুলনা দিয়ে থাকি।

তা ছাড়া এই কুরুক্ষেত্রের নামটা ছড়িয়ে পড়েছে একখানি বইয়ের মত। গীতার কথা বলছি। এই গীতার যে শ্লোকগুলি রয়েছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণ যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন অর্জুনকে, সেইগুলিরই ছন্দে-গাঁথা রূপ। সেগুলি এমনই অপূর্ব ভাষায় লেখা—যা সব কালের একখানি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গ্রন্থ। আবার সেই উপদেশগুলি শুধু সেই কালেরই উপযোগী করে লেখা নয়, আজও, এই বিজ্ঞানের যুগে, অগ্রগতিশীল মানবের মনের কথা—তার চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক-সাংসারিক গতি নিয়মের কথা। এই বইখানি আমাদের দেশ ছাড়াও এশিয়ায়, ইউরোপে, আমেরিকায় বেথানে-বেথানে শিক্ষিত মানবের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ বেশ উচ্চরেখা—সেইখানেই সমাদর লাভ করেছে। গীতার সত্যভূমি বলে কুরুক্ষেত্রের একটি মর্মাধা আছে বই কি !

এ ছাড়াও পরবর্তীকালে কয়েকটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটেছে—একটি সীমানায়। তোমরা ইতিহাসে অবশ্যই পড়েছ ধনজনসমৃদ্ধ ধানেশ্বর নগরের কথা—সেখানকার রাজা হর্ষবর্ধনের কথা। আসলে ধানেশ্বর হ'ল কুরুক্ষেত্রেরই একটা অংশ—একই রাজ্যের এপাশে-ওপাশে দু'টি জায়গা। কুরুক্ষেত্রে এখনও কোন ডাকঘর নেই ; ধানেশ্বর ডাকঘর থেকেই তার চিঠিপত্র বিলি হয়—জেলাটাও হলো কর্নাল। বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র পানিপথ সেকালের পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী কুরুক্ষেত্রেরই একটা অংশ। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে এই পঞ্চাশ মাইল ছোড়া মাঠে বার বার যুদ্ধ হয়ে গেছে। এক পানিপথেই যুদ্ধ হয়েছে তিনবার। ধানেশ্বরে, কর্নালে, তিরোহীতে ও কইথালে ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আবার গঙ্গারী মামুদ কতবার এসে যে হান্না দিয়েছেন এই জনপথে তার সাক্ষী ধানেশ্বর নগরে আর চারিদিকের ভাঙ্গাচোরা মন্দিরে মঠে শিল্পকর্মে এখনও পাওয়া যায়। এমন নামকরা ভাঙ্গাটা দেখবার ইচ্ছা কার না হয় ? বিশেষ করে এই সময়ে যখন আমাদের হিমালয়ের স্বপ্ন নিয়ে আর এক বৈদেশিক শক্তি হামলা বাধিয়েছে।

কুরুক্ষেত্র আবার ধর্মক্ষেত্রও। এই ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধ্বংস হয়েছিল। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে নানাভাবে ধর্মের মানি জমে উঠেছিল। দুর্বলের সম্পত্তি গ্রাস, শত্রু-নীতির অন্যায়, নারীর অসম্মান, স্বরাগান, জুয়াখেলা প্রভৃতি নানা ধরণের অন্যাচারে ভারতের বাতাস দূষিত হয়েছিল—সেই পুত্রীভূত অবস্থার শেষ পরিণতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগেও জায়গাটা যে ধর্মক্ষেত্র ছিল—তার কথা আছে বামনপুরাণে। গল্পটা বলে রাখি।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের আরও এক হাজার বছর আগে এইখানে কুরু নামে এক রাজা ছিলেন। সম্রাট নদীর ধারে বিস্তীর্ণ এক ভূমিখণ্ডে কল ফলাবার কার্যে রতী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর

ছিল সোনার রথ আর সোনার লাঙল। তিনি শিব আর যমের কাছে থেকে ধার নিয়েছিলেন বৃষ আর মহিষ। এই সব নিয়ে তিনি জমি চাষ করতেন। এইভাবে একদিন তিনি জমি চাষ করছেন, এমন সময় ভগবান বিষ্ণু তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, বাব্বা, এ ভূমি কি করছ ?

কুরুবাজ বললেন, আমি ভূমি কর্ষণ করছি।

বিষ্ণু বললেন, নিশ্চয় শস্ত লাভের জন্য ?

কুরুবাজ উত্তর দিলেন, হাঁ। তবে এই শস্ত দেহ পোষণের জন্য নয়—এ মনকে আরও উচু করবে—প্রশস্ত করবে। আট বকম ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্যে এই চাষ।

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ কোন্ ধর্মের সাধনা ?

কুরুবাজ উত্তর দিলেন, তপস্বী, সত্য, ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, ধান, বোণ আর ব্রহ্মচর্য।

ভাল, ভাল। এই মহৎ বৃক্ষের বীজগুলি কোথায় ?

আমারই কাছে। বললেন কুরুবাজ।

বিষ্ণু হেসে বললেন, উত্তম। বীজগুলি আমাকে দাও—আমি সেগুলি জমিতে ছড়িয়ে দিচ্ছি।

কুরুবাজ ভান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নিম্ন।

বিষ্ণু তাঁর স্বদর্শন চক্ষু দিয়ে সেই হাত টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দিলেন জমিতে।

তারপর কুরু বাড়িয়ে দিলেন ঐ হাত। তারপরে দু'টি পা। সেগুলিও টুকরো টুকরো করে জমিতে ছড়িয়ে দিলেন বিষ্ণু। এর পরে কুরু তাঁর মাথাটি এগিয়ে দিলেন। কুরুর আঘোঃসর্গে-স্রীত হয়ে বিষ্ণু তাঁকে দু'টি বর দিলেন।

এই ভূমি তোমারই নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধ হবে। আর এ হবে পুণ্যভূমি—এখানে দেহভাগ করলে মানুষ স্বর্গভোগের অধিকারী হবে।

তার পর মূনি-ঋষিরা এখানে এসে আশ্রম তৈরি করে বিদ্যালয় স্থাপন করে লাগলেন। ওই আট বকম বিদ্যায় মানুষকে শিক্ষিত করে তাদের চরিত্রকে শক্ত করে তুলতে লাগলেন। ক্রমে এখানকার সাতটি বন আর সাতটি নদী বিখ্যাত হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে চারটি কূপ আর চারটি সরোবর। জায়গাটা বিখ্যাত হলো আর একটি কারণে।

দক্ষযজ্ঞের কথা তোমরা নিশ্চয় জান। সেই যজ্ঞে দক্ষের কন্যা সতী এসেছিলেন বিদ্যা নিমন্ত্রণে। পিতার মৃত্যু-বিন্ধা শুনে তিনি দেহভাগ করেন। সেই কথা শুনে ক্রুদ্ধ শিব এসে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে দেন। তারপর সতীর মৃতদেহটা কাঁধে করে তিনি ভারতবর্ষের চারদিক ঘুরেছিলেন—সেইকালে বিষ্ণু তাঁর স্বদর্শন চক্ষু দিয়ে সতীর দেহ কেটে কেটে নানা জায়গায়

ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সতীর দেহের টুকরো যে যে জায়গায় পড়েছিল—সেই জায়গাগুলি হয়ে উঠেছিল পীঠস্থান অর্থাৎ পরম পবিত্রভূমি। ভারতবর্ষে এই রকম একাধিক পীঠস্থান রয়েছে। তাই বাংলাদেশেও আমাদের বাড়ীর কাছে রয়েছে কালীঘাট। তেমনি কুরুক্ষেত্রে রয়েছেন ভক্তকালী; তাঁর সঙ্গে থানেশ্বর মহাদেব। এই দুটি মন্দির অনেক পুরোনো কালের।

সাতটি নদীর মধ্যে একমাত্র সুরম্যতীই এখন ঝিরঝির করে বইছে—যেন একটি নালী। সাতটি বনের কোনটিই নেই। কুয়াগুলি আছে—নামহাজ। আর সরোবর চারটি বিচ্ছিন্নভাবে—তাও হাজা-মজা মত। এর মধ্যে একটির নাম ভোয়াতিঃসর—যেখানে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আগে দুই দলের মাঝখানে বধ ধামিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর একটির নাম ব্রহ্মসর। এই সরোবরে হিন্দুবা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ দান-ধ্যান ইত্যাদি করে থাকেন। আবার স্বর্গগ্রহণের সময় এখানে লক্ষ লক্ষ বাড়ী আসে হানি করবে বলে।

মহাবীর কর্ণ যেখানে লগুয়া মণ সোনা দান করেছিলেন—সেখানে সরোবরের মাঝখানে একটি শিবমন্দির রয়েছে। এ ছাড়া গীতা মন্দির, গোড়ীর মঠ, শাদু শ্রবণনাথের মঠ আছে। আর আছে বাণগঙ্গা—সেইখানটিতে শিতামহ ভীষ্ম পরশুয়া গ্রহণ করেছিলেন। অর্জুন তাঁর বাণ দিয়ে মাটি ভেদ করে গঙ্গার জল তুলে ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন বলে এর নাম বাণগঙ্গা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ সময়ে দুর্ভোধন যে ব্রহ্ম লুকিয়েছিলেন—কুড়ি মাইল দূরে রয়েছে সেই বৈশ্যদন ব্রহ্ম। পাঁচ মাইল দূরে 'আমিন' বলে আর একটা জায়গা—সেখানে চক্রবাহু ভৈরবী করে সপ্তবথী মিলে অভিমত্যাংক বধ করেছিল। দশ মাইল দূরের ভূমিঃসরও বীরশ্রেষ্ঠ ভূমিঃশ্রবাব নামের স্মৃতি বহন করছে। এমনি দশ-বিশ-ত্রিশ মাইল জুড়ে নানা স্মৃতিচিহ্নে ভরে আছে কুরুক্ষেত্র।

সম্প্রতি আরও দুটি দর্শনীয় বস্তু যোগ হয়েছে এই পুরোনো চিহ্নগুলির সঙ্গে। প্রথমটি কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়। এক মাইল জুড়ে নতুন একটা শহর—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিস্তার বাড়ীঘর, বাগান, বাগিচা, পুদ্র...যেন বঙ্গভূমির মধ্যে ওয়েসিস। দ্বিতীয়টি বিবলা-মন্দির। তার তো তুলনা নেই। শাদা কক্ককে পাথরে গড়া মন্দির—বধ, নাট্যমন্দির, দেওঘালে দেওঘালে কত সম্ভবানী, গীতার স্লোক—পুরাণের ছবি—নীতিকথা—ইতিহাস। মন্দিরে স্নেহদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মূর্তি। মন্দিরের সীমানায় মনোহর স্কুল-বাগিচা—ফোয়ারা—লতাপাতার কুণ্ড—সবুজ ঘাসের গালিচা—একটি চোব-জুড়ানো ছবি।

বিশ বছর আগেও ধারা কুরুক্ষেত্রে এসেছেন—তাঁরা এমন ছবি কল্পনা করতে পারবেন না। তখন এই শহরে দোকান-পাট তেমন ছিল না, হোটেল বা চা-বাগানের দোকান ছিল না—ভালমত থাকবার জায়গাও মিলত না। এখন কোনদিক দিয়ে কোন অবস্থিতি নেই।

তোমরা তো মাঝে মাঝে এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে বেড়াও। এবার ইন্ডলের ছুটি হ'লে পাঁচাবের এই জায়গাটা ঘল বেঁধে একবার এসো না? এলে ভারী আনন্দ পাবে। যদি কখনো দিল্লী পর্যন্ত আসার সুবিধা হয়—আরও নকসুই মাইল অবশ্যই এগিয়ে যাবে। এই নকসুই মাইলের মধ্যেই পাবে পানিগধ—কর্না—ভিরোরা। আবার যদি হরিদ্বারে যাও কখনো, সেখান থেকে মোজা বাসে করে চলে আসবে কুরুক্ষেত্রে। মোজা রাস্তা—ভাড়াও খুব বেশী নয়। ফিরবার সময় দিল্লী ঘুরে যেতে পারবে। সেই সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবন আগ্রা সেও, কানপুর এলাহাবাদ পাটনা দেওঘর দেখতেও পারো হাতে যদি সময় থাকে। আর হরিদ্বার দ্বারার পথে কানী, অমোধ্যা লক্ষৌ—এগুলি তো রইলই। একই ভ্রাম্য ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শহর, তীর্থস্থান, কীর্তিস্থাপন, শ্রুতিমন্দির, গঙ্গা, পাহাড়, যুদ্ধক্ষেত্র সবই দেখা হয়ে যাবে। ভারতবর্ষকে একরকম চেনাই হবে।

শেষে একটা কথা বলে রাখি—এই ভ্রমণ-তালিকা থেকে আর যে জায়গাটা বাদ দাও না কেন—কুরুক্ষেত্রকে যেন বাদ দিও না। আজ হিমালয়ের মাথায় হাজার মাইল জুড়ে যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ক্ষয় হচ্ছে—তার মহিমাকে উপলব্ধি করতে হলে কুরুক্ষেত্রের মাটিতে একবার আসতেই হবে। এই ক্ষেত্রে গীতার শ্লোকগুলি উচ্চারিত হয়েছিল—তার মর্মকথাটি জানতেই হবে! নিজের ধর্ম—নিজের ধর্ম—নিজের জাতি—এর চেয়ে বড় মিনিস আর পৃথিবীতে নেই। এসবের গৌরব রক্ষাই হলো মানুষের ধর্ম। সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হলো জীবনের সার কথা। গীতা বলছে : নিজের ধর্মে থেকে মুক্তও ভাল, --পরের ধর্ম ভয়াবহ। কদাচ এমন ঘটনা ঘটতে দেবে না—যাতে তোমার নিজের ধর্ম বিপর্যয় হয় বা দেশের গৌরব নষ্ট হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণ

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

খটমটে বুলি মটমট চলে

কটমটে তার সমাসগুলি।

হায়, ব্যাকরণ, সংস্কৃতের!

চিরকাল তারে গুলিয়ে ফেলি।

অং বং চং লং ঠং ঙং

বুঝি না কালো কি হলদে সে রং

ঘড়িতে যখন বাজে চং চং

ইঙ্গুল থেকে পাই যে ছুটি।

আর পরদিন আবার সে ক্লাসে

প্রাণখানা নিয়ে হাঁপিয়ে উঠি।

টিকটিকে হাতে লিকলিকে বেত

ঠিক মার খাবো এবার বুঝি।

অং নাকি বং, নাকি সেটা লং

মনোমাকে, হায়! বুঝাই খুঁজি।

'কং' যদি বলি, গনগন ক'রে

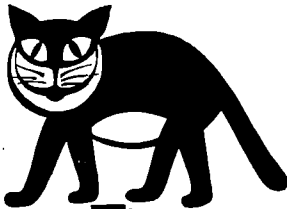
হাতে বেত পড়ে বনবন ক'রে

কনকন করে হাতখানা আর

ঝনঝন করে মাথার খুলি।

সংস্কৃতের এই চংটাকে

হা অদৃষ্ট! কোথায় ফেলি?



কাবলি বেড়ান | (উপন্যাস)

শ্রী প্রকুলচন্দ্র বসু

কাবলরাম ঘাড় ভুলে চটপটি-
ওয়ালাকে খুঁজল। তাকে পেল
না। তার বদলে গটুমই করে যে
এল সে কোটালরাহের কটুমটি।
খাকির পোশাক, হেল্মেট, জপ-
বেণ্ট ও পিত্তলধারী এক সন্ন্য-
াসান পুলিশ-সার্জেট। কোটাল-
পুর না হ'ক কোটালের কটুম!

প্রথমে ইংরেজি, তারপর
ইংরেজি মেশানো হিন্দীতে সে
ধমক ছুঁড়ল। পিলে-চমকানো
কাহানের গমকের মত! সঙ্গে সঙ্গে
ভেক্রাম তার কাঁধে বিচিত্র ঠমকে
লাকিয়ে পড়ল।

একটা ভীষণ লড়ায়ের ভয়ে কাবলরাম কঁপে উঠল। এই বুঝি কাছ আর কেকর
দিঃ-এর কৃতি লাগে!

কিন্তু কৃতি নয়, দম্ভের মত দোষ্টি।

ভেক্রামকে দু'হাতে সরিয়ে, সার্জেট বলল, “টাইগার! গুড্, গড্, হোয়ার হাড্, উ বীন!
সার্জ্, হেভন্ অ্যাণ্ড হেল্ কব্ ইউ।” (দয়াময় ঈশ্বর! কোথায় ছিলে? স্বর্গ-মরক তোমার মন্ত
বুঁজেছি)।

আহ্লাদ করে সার্জেটের গাল জিন্তে চেটে, ভেক্রামে শব্দ করল, ভেক্ ভেক্ যেউ উ
দেউ উ, ভেক্ ভেক্ যেউ।

অর্থাৎ, কটুমবাড়ী বেড়াতে গেছলেন স্তব্ধ। বেশ বন্ধ-আস্তি করেছে। খালি একটা ঢাশা
বেড়ালের আলায় চলে এলাম। ওটার নাম বেলা। একেবারে খতাব-দুবুঁড়। দাঁও সে ধাবায় ঠেলে।

বোধকরি এই ক'দিনে সার্জেটের বুজবার মত ডাবা সে ভুলে গিয়েছিল। সার্জেট, তা
বুল না।

কাবলরামকে চোখ রাপিয়ে বলল, “ইউ কিড্ ম্যাণড্, মাই ডগ? (আমার কুকুর চুরি
করেছিলে)?”

শব্দ ইংরেজি বুঝতে না পেরে কাবলরাম বলল, “ইয়াস্ তব্।”

“হোয়াট! , চোরি কিয়া?”

“নো তব্। ডেউ কা মাক্কি আমার পিছু লিয়া থা। তোয়াক্ করকে থাওয়াকে, ব্রা-
জনায়ে ফেরত যেনে আগিয়া। চুরি করনেদে কি ভয়সা করকে লে আয়া?”

ভাষা ও ব্যাকরণের ভুল সব্বও বুদ্ধিসম্মত কথা! সার্জেন্ট যেনে নিল। কথা না
বাড়িয়ে, শিস্ দিয়ে কুহুর নিয়ে চলে গেল।

ভেক্রাম ছন খেয়েছে। তার শুণ গাইতে কাবলরামের দিকে চেয়ে শব্দ করল, ডেউ তেব্
তেব্ ডেব্ ডেব্। অর্থাৎ, থাভ্। পুলিশের কুহুরকে তোয়াক্ করা ফেলা যাবে না। তা
শিঁয়াজের খোশবু ছড়াবে। যদি কাক হাতে বেঘোরে খুন হও, খুনের গন্ধ শুঁকে আসামী ধরে
দেব। ভূণ তৈরী রাখব।

অত্যন্ত আশ্বাসের কথা। শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় এ বিবাসের দাম কম নয়। কাবলরামের
ঘাম দিয়ে অর ছাড়ল। কালা-অরে কঠিন ইংরেজন নয়, ক’পিল চিমির প্রলেপ-মাথা কুইনিম।
অল দিয়ে কোং করে গিললেই হ’ল।

ভিৎ, চাই না, কুহুর সাম্ভাও। এখন সরে পড়লে রক্ষা। বাপ্, যেমন পুলিশের সার্জেন্ট,
তেমন তার কুহুর! যেমন জাকল কাঠ, তেমন তার মুণ্ডর!

অত বহু-আন্তি করে থাওয়ানো, বেলা ও আফ্রাদীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি,—আর তার প্রতিদানে
ডেব্ ডেব্ বলে শুক একটুকুন ঠাটা ছিটিয়ে লবা। তার সঙ্গে খুনী-ধরার লোভ দেখানো রস্তা!

তার যেনে হ’ল, পরের চেয়ে ঘর ঢের ভালো। মাঝে মাঝে মেঘের আঁধার এলেও সেখানে
ফোটে চাঁদের আলো। কী হৃদয় নাম আফ্রাদী আর বেলা! যন অল করে দেয়। আর সার্জেন্ট,
টাইগার, ভেক্রাম—যেন মেঘ-চিরে বজ্রের ধমক মারে!

কখন সেদিনের চটপটিওয়ানো ঘুড়ুর বাজিয়ে গুটিগুটি এল। সে বলল, “নেবেন দাদু, টাইকা
ভালা চটপটি আর ঘুড়ুনী?

ছুটে। কিনে, কাবলরাম খালি ঘুড়ুনী বেল। চটপটি একটা বেকির ডলার রাখল। ভেক্রাম
ভালবাসে। যদি আসে, যেন থায়।

সে উঠে আনমনে পায়েচাচি করল। তারপর বস্তুরবাড়ী ফিরে গেল। বেয়ে দেখল,
আফ্রাদী কাদছে। তার চোখের অল ঝগড়ার ধূলা-কাদা মুছে গেছে।

আফ্রাদী বলল, “এতক্ষণ কোথায় ছিলে? জান না—”

কাবলরাম সাব্বনা দিয়ে বলল, “সত্যি কি চলে গিয়েছিলেম! এই ত ফিরে এলাম—”

“সে ভুল নয়। বেলাকে নিয়ে গেছে।”

“কে? ছেলেধরা বুঝি?”

“ছেলেধরা নয়।”

“পুলিস? পরের মাছ ছুরি করেছিলো?”

“উঁহ, পুলিশের মেয়ে—”

“ওহো, মেয়ে পুলিশ।

“মেয়ে পুলিশ নয়, পুরুষ পুলিশ। গাট্টাগোটা সত্যিই মত চেহারা। সত্যি সত্যি কি করে বাবার মিতে হ’ল কে জানে? তেপান্তরে বধনী হবার সময় মেয়েটার স্রাওটা বেড়াল বাচ্চা রেখে যায়। আর আমি সেটাকে কত আদর করে বড় করি। বেলা আর কাবুলী বেড়াল নাম দি’। আর এদিন পর ফিরে এসে কিনা নিয়ে গেল।” আল্লাদীর গলা দুঃখে কুন্দ্র এল।

“কেন?”

“আব্দেবে মেয়ে কান্নাকাটি করল।”

“তুমি আরও কান্নাকাটি করলে না কেন?”

“করিনি আবার! কিন্তু বাবা বললেন, কান্নার শাস্তা দিয়ে পুলিশের সঙ্গে জেতা যায় না। ওদের জুংসই বন্ধুক-গিল্ডল আছে।”

“ঠিক। তাই ভেক্রাহকে আমি দিয়ে এলাম। স্বগড়া করিনি।”

“সত্যি দিয়ে এলে?”

“দেব না? বেলার সঙ্গে স্বগড়া খিটখিটি করে তোমাকে জালাত।”

“তাই দিয়ে এলে অমন ভালো ভেক্রাহকে?”

“তার চেয়ে ভালো অমন বেলাকেই বধন দিয়ে দিলে।”

এ বেন একই পাশেমে ছ’জনের পা গোছা। ওদের আগোষ হয়ে যায়। মনে আগলোল থাকে না।—

(৮)

আল্লাদী ভিন্ন স্বরে বলে, “ভাত বাড়ি আছে, খাবে এসো।”

অন্যত্র দিন শাওড়ী দেন। দুমকাজুরে আল্লাদীর বেলাকে নিয়ে নাক ডাকে। এক কাকে বেলো উঠে এসে পা-সাকাই করে। আজ তার ব্যতিক্রম। ক্যাবলরায় তার কারণ বোঝে। বেলার দুঃখ ভোলার জন্য আল্লাদী আজ কান্ন চায়।

ভাল কথা। তার চেয়েও ভাল চোর-জোচ্চোর কাছে নেই। খালা ঘিরে ধরে ধরে মাছের কালিয়া, কোর্মা, ঘণ্ট। ঘণ্টা বাজিয়ে ষাও,—তবু নিশ্চিন্ত।

সে মনে মনে অদেখা পুলিশ-কন্সটাবে ধন্যবাদ জানায়।

আফ্রান্দীর জন্ত বাড়া খাবার কাছে ছিল। সেখান থেকে মুড়োর বাটটাও সে টেনে নেয়। আফ্রান্দী মনে করিয়ে দিতে, সে জিত কেটে বলে, “গাম্ব বল! ভেবেছিলেম, কেবির করার ঝামেলা কমাতে বেলার জন্ত বাড়া। সে নেই মনে ছিল না।”

আফ্রান্দী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, “আহা, তোমার সঙ্গে খেতে কি আফ্রান্দী ছিল। না আমার জন্ত বড় মুড়ো রাখতে। বেলার জন্ত তা আমি তোমার পাতে দিতেম! বেন পা-সাফাই করে নিয়ে যায়।” শুনে আনুন্ননে লজা পেয়ে ক্যাবলরাম জিত টানল। তারপর আড়চোখে চেয়ে দেখল, শুধু স্বাভাবিক নয়, ওজনও মুড়োটা ভারী।

একটু চাইনী মুখে তুলে সে বলল, “বদলে দি। আমায় ভালো দিয়ে তুমি খারাপ খাবে, তা হয় না।”

আফ্রান্দী বাধা দিয়ে বলল, “ও মুড়ো জামায়ের খেতে নেই!”

“কেন?”

“জামাই যে বেটা ছেলে।” মুড়ো খাবার লোভে ক্যাবলরাম হয়ত জানাত সে বেটা ছেলে নয়। কিন্তু ওঁকো-মুখ বেড়ে সে কথা বলা যায় না। তার মনের কথা কেড়ে নিয়ে, আফ্রান্দী হেসে বলল, “বাবা বলেন, ঘরজামাই নাকি মেয়েছেলে। খোৎ, তা’হলে গৌফ-দাড়ি কেন?” পর মুহূর্তে রীমান্সা করে বলে, “বেলা ত’ মেয়ে বেড়াল। কিন্তু ওর গৌফ দাড়ি আছে।”

হঠাৎ ক্যাবলরামের গলায় মাছের কাঁটা আটকালো।

আফ্রান্দী বলল, “বাট, বাট! গলায় কাঁটা ফুটল বুঝি? বেলা মনে করেছে। যা জাওটা ছিল। মনে মনে ওর পা ধরে, শুক্লো ভাত গেল দেখি।... দেখ মরে গেল।”—

ওদিকে হাত বদল হয়ে তখন বেলা ট্রেনের একটা ক্যাস্ট ক্লাসে চড়ে অনেক দূরে চলেছিল।

তার নতুন মনিবের নাম পল্লবী। পুলিশের ডেপুটি-সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিটার সফটমোচন বর্ণনের মেয়ে।

পল্লবী আফ্রান্দীর চেয়ে অনেক ছোটো। সে বেলায় কচি বয়সে কুড়িয়ে এনে পোষে। কিন্তু তার বাপ অনেক দূরে বদলী হতে, পল্লবী বেলাকে সঙ্গে নিতে না পেরে, আফ্রান্দীর জিন্দার রেখে যায়।

সম্প্রতি সড়টমোচন চেষ্টা-তথ্য করে দেশে ফিরে এসেছেন। এনেছেন সঙ্গে করে প্রামোশন। একটা মহাকুমার চার্ঘ (তার) নিয়ে যাচ্ছেন। পল্লবীও তার বেড়ালের চার্ঘ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মাথার ওপর বৌ বৌ করে ফ্যান ঘুরছে। আর ফৌসফৌস ভূঁদ-ভাষ করে দৈত্যের মত টেনে ছুটছে। ভেতরে-বাইরে সমান তাওব। কি জানি ভেক্রাই দল বেধে আক্রমণ করেছে কিনা! ভয়ে বেলা পল্লবীর কোলে মুখ গুঁজে ছিল।

পল্লবী তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, “দেখলে বাবা, বেলা কেমন চূপ করে শুয়ে আছে। কক্ষনো টেনে চড়েনি বলে ভয় পেয়েছে বুঝি?”

“হাত হয়েছে, ঘুমোও দেখি। বেড়াল, বেড়াল, যতো সব।”

কাটাগোষ্ঠী গলা শুনে, বেলা ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখল,—খাকির পোশাক পরা, গাট্টাগোষ্ঠী চেহারা লোকটা খামোখা খেকিয়ে উঠছে।

আহ্লাদীদের বাড়ীতে এই লোকটি সাদা পোশাক পরে গিয়েছিল। তখন এমন তিরিকি মেজাজে গেলেনি। আহ্লাদীর বাগের মেজাজ এমনতর নয়।

কি জানি কি হাল হবে? ভাবতে ভাবতে তার ফিসে পেল। ছক-বাধা আহ্বারে বেড়ালের চলে না। আহ্লাদী তাকে খাবার এন্ডার স্বযোগ দিয়েছে। তা ছাড়া ছিল পা-সাকাই। কিন্তু এদিকে পল্লবীর বেন খেয়াল নেই। সঙ্গে খাবার আছে,—অথচ তাকে দিচ্ছে না!

মা সবাইকে দিলেন! পথোটা, হালুয়া, মাছ, মাংস, কিন্তু তার বেলা পাতের কুঁচোকাটা। ছুঁচোর আহ্বার। পেট চো-চো কচ্ছিল। মনের কণ্টে কখন সে পল্লবীর কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। তখন পল্লবীর ঘুমন্ত বাগের নাকে টিকান্ডা-নাকান্ডা বাজছিল। বেন বেলাকে ঠাট্টা করে বলছে, তিকের আবার কান্ডা-আকান্ডা! পেয়েহিস্ তাই ঢের!

কিন্তু তা ছাপিয়ে হঠাৎ কানে এস মিঠে স্বর। বেড়ালরা এ হবে পাগল হয়। বাতি নেতানো। সে শিকারী চোখ মেলে দেখল, ছায়ে বোলান একটি পাবীর খাঁচা। আর সেখানে দুটো পাহাড়ী ময়না নিজেদের মধ্যে খুনগুটি লাগিয়েছে। ডানার কাঁপট ও বাগায়াগিতে খাঁচার কপাট ঝাঁক হচ্ছে সে খেয়াল নেই।

তার একটা হাইজাম্পের ওয়াস্তা। তারপর ক্যাক্ করে ধরে রাড়ের চমৎকার ডিনার (আহ্বার)!

ওরা কারা সে হিসাবের দরকার নেই। সংসারে কেউ কারুর নয়, আবার ভেবে দেখলে সবাই সন্সার!

যেই ভাবা, অমনি মন থেকে সব দ্বিধা উবে গেল। সে পল্লবীর কোল থেকে আলগোছে নেবে, খাঁচা সই করে লাক দিল। একেবারে অর্ধমের গাভীর-দহক সম্ভান। কিন্তু খাঁচাটা বুক পেতে সে আঘাত সইতে পারুল না। হুক-ফস্কে খাঁচা সমেত পড়ল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক শব্দ উঠল।

ওপরের ব্যাক থেকে কে হাত বাড়িয়ে হুইচ্-টিপে আলো জ্বাললো। বেলা সন্ডারে দেখল গছমাধন পাহাড়ের মত একটি দৈত্য! থাকির পোশাক পরা, কাঁধে তিনটি তারা, কোরবে পিস্তল।

সে খাঁচা পরখ করে, কটমট চোখে তার দিকে চাইল। তার দিকারী চোখের ছোঁষাকে পাল্লা দিতে খাপখোলা তলোয়ারের বলক!

তার নাবার শব্দে সবাই জেগে উঠেছিল। ততক্ষণ বেলা পল্লবীর কোলে লুকিয়েছে। তাই লোকটি তাকে কিছু না বলে, পল্লবীর বাপের দিকে চাইলেন এবং তার থাকির পোশাকে হু'টি তারা দেখে, রাগ চেপে বললেন, “দেখিয়ে জী, আপকা বিন্নী, ক্যা কিয়া।—” (দেখুন মশাই, আপনার বেড়াল কি করেছে)।

ময়না দুটো ট্যা-ট্যা করে অজ্ঞানত করল। অর্থাৎ, সত্যি সত্যি। খাঁচার মধ্যে ট্রেনের দোলানিতে আমাদের খালি চুলুই এসেছিল। হঠাৎ বেড়ালটা লাকিরে উঠে দোর ধরে টানটানি।

পল্লবীর আঁচলের আঁড়াল থেকে বেলা নিজের লাক্কাই দিয়ে মিউ মিউ শব্দ করল। অর্থাৎ, মিছে কথা সত্যি। ওদের পাখা আর আমার লেগ, কাঁধে-কাঁধেই সম্পর্ক আছে। ট্রেনের ঘর্ষ শব্দে ঘুম নেই। ভাবলেম, নাগরদোলায় দোল খাওয়া ইটিফুটের কাছে বেশখা-বেশখীর গল্প শুনে আসি।

সেখানে ময়না দুটো ঠোট বাকিরে কের ট্যা ট্যা শব্দ করল। অর্থাৎ, গল্প শোনার নামে ঘাড় হুকানো!

বেলা পৌন্ডের কঁকে মিউ মিউ শব্দ করল। অর্থাৎ, খাম্-খাম্-টোটি। তোরা আমার কবর কব্ধ জানিস? চতুই পাখীর চতুইভাতি, ভেটকী মাছের চুইকী মজলিস, ইলিশ মাছের সালিস-সভায় বরাবর সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়ে, আমি তিলক কোঁটা পরেছি।

(ক্রমশঃ)

কুঁড়ে ও জলদেবতা

(মধ্য-আফ্রিকাৰ জনগণ)

শ্রীতৰুণ সান্ধ্যল

মুলেলী আৰু তাৰ বড়ী মা কসোৰ জনলৈৰ এক গ্ৰামে বাস কৰতো। মুলেলী ছিল খুবই কুঁড়ে। শিকাৰে সে কৰ্মাচিং বেৰ হ'ত। কেবল মাত্ৰেৰ কাছেই তাৰ আবদাৰ। আৰ, এমন আবদাৰ যে শুনেলৈ কাৰ না গাং হয়। মুলেলী কেবল পাছাতাভেৰ আমানী-পচা খেৰে মাতাল হৰে ঘুমাতে চায়। মা যদি এতে একটু গড়িমসি কৰে তো মুলেলী আক্ষেপ কৰে, 'আহা, যদি সৰ্গাৰে ঘৰে জন্মাতাম! তবে কতই না দাসদাসী হকুমে হাজিৰ থাকতো। মুখেৰ একটি কথা বদলেই বা চাইতাম তাই হাজিৰ হৰে যেত।'

মা শুনে জবাব দিতে, 'কুঁড়েৰ বাদশা, নিজেই তুই নিজের বশ নোস, সৰ্গাৰ হলে গ্ৰামাংস্তৰ মানাল দিতি কী কৰে? কথাতাই আছে, 'দখল নেই নিজের পরে, পাড়াপড়শীকে তৰি কৰে।' ওৰ চেয়ে হাও বাছা ফিটো'ৰ নিয়ে এখন শিকাৰে বেৰ হও। কিছু মুখে উঠবে তা'হলে।'

মুলেলী আৰু কী কৰে। ঠান্ দিয়ে পাখী ধৰতে বেৰ হ'ল। শম্মা নাগাঁও এক বনমোৰগ তাৰ ফাঁদে ধৰা পড়লো।

নদীৰ ধাৰ দিয়ে বাড়ী ক্ৰিতে মুলেলী শোনে, জলদেবতা তাকেই বলছেন :

মুলেলী, যদি দিগ আমাকে মোবগ, শুনিগ কথা

মিলবে খাবাৰ—বা চান তুই, হবে না অন্তথা।

মুলেলী তৎক্ষণাৎ বনমোৰগটা নদীৰ জলে কপাস কৰে ছুঁড়ে কেলে দিল। বাড়ীতে ক্ৰিৰে মাত্ৰেৰ মুখঝামটা বেৰেও মুলেলী খুশিই বহিল। মনে তাৰ জলদেবতাৰ সেই কথাগুলি ভাসছে, 'মিলবে খাবাৰ—বা চান তুই, হবে না অন্তথা।'

পৰদিন শিকাৰে বেৰিয়ে মুলেলী এক বনপায়টা ধৰলো। সেদিনও নদীৰ ধাৰ দিয়ে বাড়ীতে ফেদাৰ সময় জলদেবতা তাকে বললেন :

মুলেলী যদি দিগ আমাকে পায়রা, শুনিগ কথা,

মিলবে খাবাৰ—বা চান তুই, হবে না অন্তথা।

মুলেলী পায়রাটা কপাস কৰে জলে কেলে দিল। তখন জলৈৰ মধ্যে চেউ ফুল ফুলে উঠতে লাগলো, কেনা ফুটে লাগলো। শেষে জলদেবতাৰ গলা শোনা গেল :

মুলেলী, আমি বা চাই, সে তো নিজের 'পরে জোৰ,

আমাৰ কৰে তবেই হবে অনেক কিছু তোৰ।

হাতের টোকাই ঢাক বাজাবি সর্দারদের মত

—লাঠি পেটায় ঢাকে কেবল রামকামারী দত্ত ।

মুলেলী প্রতিজ্ঞা করলো সে সব সময় আত্মসংবরণ করবে। সর্দারদের মত গাভীরপূর্ণ চালচলন দেখাবে। সাধারণ রামাকামারীদের মত কাঠি দিয়ে ঢাক বাজাবে না, আঙুলের টোকা দিয়ে ঢাকে শব্দ করে বাজানার উৎসব উদ্বোধন করবে। ভাবলো, এ তো সবই সোজা কাজ।

তখন জল ক্রমশঃ লাল হতে লাগলো! শেষে হয়ে উঠলো টকটকে লাল। মুলেলী এবার জলদেবতার মন্ত হাঁ-মুখ দেখতে পেল। গুনতে পেল জলদেবতা বলছেন : 'মুলেলী, নির্ভয়ে জলে নেমে আয়। আমার হাঁ-মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যা পাখি সব টেনে-হেঁচড়ে বের করে নিয়ে যা।'

মুলেলী জলে নেমে মুখের মধ্য থেকে একটা লাউ টেনে বের করলো। তারপর পাড়ে সেটাকে রেখে, আবার নীচে নেমে আবারও একটা মন্ত লাউ টেনে বের করলো। তারপর, আরও—আরও। শেষে এমন দাঁড়ালো যে নদীর পারে একবারে লাউ খইখই। লাউগুলো কেমন ফাঁপা মনে হ'ল, তবে প্রত্যেকটা লাউয়ের ছেঁদাগুলো একবারে বন্ধ।

জলদেবতা মুলেলীকে লাউগুলিকে তার মাথের ঘরের পেছনের চ্যাপ্টা পাখরের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে ভাঙতে বললেন। তা হলেই তার যা চাইবার, সব সে পাবে।

লাউগুলো নিয়ে মুলেলী ধখন বাড়ী ফিরলো, তার মা তো শুঙলো দেখে খুব রেগে গেল। ঠাট্টার স্বরে বলতে লাগলো, 'অন্ন বাড়ীর ছেলেরা কেমন শিকার করে এটােসটা নিয়ে আসে। কী ভাগ্যি আমার! আমার কাজের ছেলে মুলেলী কেমন বুড়ো লাউ এনেছে। ঘাই, পাড়াপড়শীকে ডেকে এনে তোর শিকারের লাউ দেখাই।' ধনখনে গলায় বুড়ী মা চটে বললো, 'হাঁ রে মুলেলী, আজকাল বৃষ্টি বনে লাউ-কুমড়ো। ফাঁদে ধরা পড়ছে?'

অল্প দিন হলে মুলেলী খুব চটে বেত। আজ সে কিছুটি বললো না। মাথের ঘরের পেছনে চ্যাপ্টা পাখরের বুকে ঝুঁকে ঝুঁকে সে লাউগুলি ভাঙতে লাগলো।

প্রথমটা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে একদল হুন্দর জোয়ান পুরুষ বেহিয়ে এসে মুলেলীকে সর্দার বলে সম্বোধন করলো। তারপর দ্বিতীয়টা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে এক সার হুন্দরী মেয়ে বেহিয়ে বললে, মুলেলীই তাদের বর। তৃতীয়টা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে বের হ'ল, অতি চমৎকার পোশাক। মুলেলী আর তার মা ধীরে ধীরে চামড়ার তৈরী পোশাক বদলে, ভালো আর জাঁকজমকের পোশাক পরে তো আফ্রান্দে আটখানা। চতুর্থটা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে বেরোলো গরম কবল। পঞ্চম লাউটা ভাঙতেই বেরোলো এক বোকা শিকার করার বনুক। ষষ্ঠ লাউটি ভাঙতে বেরোলো,

গুলিবাক্সের পুলিশার পর পুলিশা! মগ্নমটি ভাঙতেই বেবোলো মগ্নমুক্তা চুমিগারার কত
অন্যকার—হাঁস, তাগা, মূহুট, কোমর-বন্ধনী প্রভৃতি। মুলেলীর লাউ-এর সংখ্যা ছিল অগুনতি।
লাউ ভেঙে কি কি সে পেলো, তার ফল করতে রাত কাবার হয়ে ঘাবে। তাই আর দিলাম না।



‘অপন্য! ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে একদল ছন্দর মোহন পুরুষ ঘেরিয়ে সে মুলেলীকে সর্গীর বলে সম্বোধন করলো।’

মুলেলী বা চেয়েছিলো, তা তো সবই সে পেয়েছে। সে এখন মস্ত বড় সর্গীর। বউ,
শৈলবাহিনী, বাগবাগিচা, পশুর পাল, পোশাকআসাক, বাগবন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি সবই
সে পেয়েছে। বলতে গেলে, তার আর কোন অভাবই নেই।

সে আর তার বা মহা আড়ম্বরে দিন কাটায় এখন। শত শত অল্পগত দাসদাসী তাদের
সেবার কল চলিগ ঘটা হাজির থাকে। মুলেলীর পচা পান্ডাভাতের আমানী খাবার অত্যাঁস
কিন্তু বরাবরের মতই রইল। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে ঐ খেয়ে ঢুলুচুলু চোখে থাকতো,

কিংবা কেবল ঘুমতো। রাজা দেখাশোনার বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র নজর ছিল না। শেষে প্রজারাও তাকে আর পছন্দ করতো না।

একদিন মুল্লী আপন খেদাল মত, মত্ত নাচের এক আলর ডাকলো। আর এ-সব নাচের বা বা উপকরণ, অর্থাৎ জালা জালা আমানী, সারি সারি ডঙ্কা ঢাক ইত্যাদি, সব আনা হোল। মুল্লী তো আমানী খেয়ে বিস্তোর। সবই বেশ চলছিলো। শেষে মুল্লী আমানী খাওয়ার ভোঁকে এমন ক্ষেপ গেল যে জলদেবতার নিষেধাজ্ঞা একদম ভুলে গেল। এক ঢাক-বান্নিরের হাত থেকে ঢাক বাজাবার কাঠি কেড়ে নিয়ে দুমাদুম ঢাক বাজাতে লাগলো প্রাণপণে, নুগুডি—নুগুগু, নু-গিডি—নু গিডিডি।

বাজাতে না বাজাতেই মুল্লী হঠাৎ বিকট এক শব্দ শুনলো। মাথা তার দশদশ করছিলো, চোখে জল টলয়ল করছিলো, অর্থাৎ নেশা হলে যেমন হয় আর কি! যখন মুল্লীর নেশা কাটলো মুল্লী দেখলো তার স্বন্দর রাজ-পোশাক আর মাঝ জলমলে শাড়ী অস্তহিত হয়েছে। তার বরলে সেই আগেকার বীদরের চামড়ার পোশাক তাদের পরনে। নাচিয়েরা ঢেউ খেলানো ঘাসে আর কদলগুলি ঝাপাতার ঝপ নিয়েছে। মুল্লীরা যেমনটি আগে ছিল, ঠিক তেমনটি হয়ে গেল তারা। বোঁগা, আধপেটা, গারে খড়িওঠা, মাখার জট।

যা তার চোঁকার করে কৈদে উঠলো, 'বলিনি আগে তোকে, সর্দার হতে যে-আস্বাসংবম রাখা দরকার, তা তোর একদম নেই।

বেচারী মুল্লী! এই খাফা সামলাতে তার বেশ কিছুদিন লাগলো। শেষে একদিন বনে গিয়ে এক পাহুটে রঙের বনবেড়াল আর এক মেটে রঙের বনবেড়াল শিকার করে নদীর পাড়ে এসে হাজির। সেখানে পৌঁছে করুণলায় জলদেবতাকে মে ডাকতে লাগলো :

জলের দেব, জলদেবতা, দেবো এদের জলে ?

শেষে জলদেবতা মিথিকার স্বরে বললেন :

ইচ্ছা হলে দিয়ো, দিয়ো না ইচ্ছা নাহি হলে।

মুল্লী বনবেড়াল দুটিকে জলে ছুঁড়ে দিলো।

পরদিন আবার সে একটি পাণ্ডটে রঙের বনবেড়াল আর একটি মেটে রঙের বনবেড়াল শিকার করে নদীর ধারে এসে চৌচিয়ে বললো করুণলায় :

জলের দেব, জলদেবতা, দেবো এদের জলে ?

জলদেবতা জবাব দিলেন :

ইচ্ছা হলে দাও, দিয়ো না ইচ্ছা নাহি হলে।

তখন মুলেলী বললো :

জলের দেব, জলদেবতা দেবেন নাকি লাউ ?

জলদেবতা তার উত্তরে বললেন :

সাধ হলে লাউ মাও, নিয়ো না, যদি না লাউ চাও !

মুলেলী আগ্রহের সঙ্গে শিকার দুটি জলে ছুঁড়ে দিলে, জলের ধারে এসে দাঁড়ালো। আবার সেই টকটকে লাল হাঁ-মুখ দেখা গেল। মুলেলী একটার পর একটা লাউ বের করে পাড়ে শাজিরে রাখলো তারপর পড়ি-মরি করে বাড়িতে এসে তখন সে লাউগুলি ফাটাতে বসে গেল।

প্রথম লাউটা ভাঙতেই, বাপের কী ডহানক ! একটা কালো কেউটে বেরিয়ে এসেই মুলেলীকে ভাড়া করলো ! ভয়ে ভয়ে, অথচ কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আশায়-আশায় মুলেলী তখন দ্বিতীয় লাউটা ভাঙলো। ভাঙতেই, ওরে বাবা, এক কুমীর বেরিয়ে এলো। বেরিয়েই লেজের এক ঝাপট নারলো মুলেলীকে। তৃতীয়টা ভাঙতেই এক কাকড়াবিছা তাকে দাঁড়া তুলে ভাড়া করলো।

মুলেলীর মা তখন বেগে চৌচিরে উঠলো : 'মুলেলী, আমার ঘরের কাছে এমন উপহারের ঝাঁক না দেখালেই চলবে ! বা, বাকী লাউগুলি জলে ফেলে দিয়ে আর ।'

মুলেলী বিষম-মুখে নদীর পাড়ে গিয়ে লাউগুলি একে একে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো। জলদেবতা হাঁ-মুখের মধ্যে সেগুলি টপাটপ ভরে ফেললেন। তখন জলদেবতা তাকে বললেন :

মুলেলী,

দেখলে তো! ধনরত্ন দিলে কাজ-না করার দাম
কি হবে ফল, নিজেই এখন বুঝতে পারো, তাই
কাজ করে যাও, তাতেই তোমার পুঁজবে মনসাম
খেয়াল-খুশি মনন করো, সেটাই আমি চাই,
অলস বোকা পেয়েও হারায় ধনরত্ন মান
শ্রমের দামে শাস্তি পাবে, সেই তো সমাধান।

মুলেলী সে কথা শুনে মনে জোর নিয়ে বাড়ী ফিরলো। পরদিন থেকে আর কুঁড়েমি না করে, বা মাভাল না হয়ে শিকারে বের হতে শুরু করলো। অবশ্য আর সে সর্দার হলো না, কিন্তু সং-পরিশ্রমের প্রতিদানে সে আর তার মা বোটা ভাত-কাপড়ের অল্প কোনদিনই আর কষ্ট পায়নি। কিন্তু বোকা মানুষের মিথ্যা ঝাঁকজমকের চেয়ে তা অনেক ভালো।

দাছুর গল্প বলা

শ্রীসতীকুমার নাগ

‘আমি তোমাদের কি গল্প বলবো, বল তো?’ দাছুর বললেন। নিম্নের দাড়িতে হাত বুলালেন, আর কি যেন একটু ভাবলেন।—‘বেশ, আমি তোমাদের আমার এক বন্ধুর কথা বলছি।’

‘কে?’ নাতি-নাতনীরা প্রশ্ন করে।

‘যে আমাকে সব চেয়ে ভালবাসতো; আমিও তাকে খুব ভালবাসতাম।’

‘কি তার নাম?’ আবার তারা প্রশ্ন করে।

‘এই তো বলছি! চুপটি করে বস। কেউ কোন কথা বলবে না। চুপ করে শোন।’ এই বলে দাছুর তার গল্প বলা শুরু করেন।

‘ভোর হয়েছে। জানালায় শিক ধরে দাড়িয়েছি। সূর্য উঠেছে...তার লাল আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে পূর্ব-আকাশে সমুদ্রের পারে। গাছের ঝাঁক দিয়ে দেখা যায়...সমুদ্রের জাহাজের আনা-গোনা। ঘরের সামনে গাছ। সব গাছের নামও জানি নি। বাইরের সঙ্গে তো আমার কোন যোগাযোগ নেই। ছোট ঘর। নির্জন, নিরাশা। আমি এ-ঘরটিতে থাকি। এক, দুই করে অনেক বছর কেটে গিয়েছে। যত দূর চোখ যায়, তত দূর দেখি। দেখি, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক কাক পাখি। কোথায়, কত দূর কে জানে? চোখ কাপুসা হয়ে আসে। ভাবি, আমারও যদি জানা থাকতো। তবে, আমিও উড়ে যেতাম...অনেক দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে যেতাম। ওরা কত সুখী। সত্যি, ওদের দেখে হিংসে হতো—।’

‘দাছুর সকালে কিছু খেতে না?’ ছোট নাতনীর প্রশ্ন।

‘হ্যাঁ, সকালে স্নেলের স্নেলার খাবার পাঠাতো রুটি, জেলি, আর চা। একদিন রুটি খেয়ে বাকী টুকরো রেখে দিয়েছি ছোট টেবিলটির ‘পরে, চাহের কাপে খুব দিয়েছি, ঠিক এমনি সময়ে একটা পাখি...সাদা...পায়ের পালকগুলো সাদা...আমার ঘরে এসে চুকলো ছোট জানালাটির ঝাঁক দিয়ে। টেবিলের আধ-টুকরো রুটির ভাগটুকু হুকুরে খেতে লাগলো। আমি গুকে বাধা দিলাম না।—’

‘পাখিটার কি নাম দাছুর?’ এবার ছোট নাতি প্রশ্ন করে।

‘পাখিটার কি নাম জানি নে। আমাদের সাদা পায়রা দেখেছ তো? ঠিক তেমনি দেখতে ঐ পাখিটা। যতটা পায়লো, পাখিটা খেলো। খানিকটা টুকরো আবার ঠোটে করে

নিরে গেলো। আমি ওকে জেক বললাম, 'তুমি আজ থেকে আমার হলে। আমার বন্ধু, তুমি আমার এদো ঠিক এমন সময়ে। আমি তোমার জন্য রুটি, জেলি, বাথবো।'

আমার আমন্ত্রণ সে গ্রহণ করেছিল—সে রুটি নেড়ে তার সম্মতি জানালো, 'আবার আসবো, বন্ধু।'

বক্ বক্ করে উড়ে গেলো গাছপালা ছাড়িয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে, কতদূর—কে জানে ?

তারপর আমি বড়টা পেরেছি, জানালার দিক ফাঁক করে দিয়েছি। সত্যি, আমার খুব আনন্দ হলো বন্ধুকে পেয়ে। ঐ নির্জন কারাকক্ষে শুধু আমি একা। কেউ আমার সঙ্গী-সাবী নেই!—

তারপর দিন, আমি ওর জন্যে রুটির ভাল অংশটুক রেখে দিয়েছি। জেলার মধ্য করে আমাকে একখানা রুটি বেশি দিওন।—

'তোমার বন্ধু আর এলো না ?' নাত্তি-নাত্তিরা সবাই প্রশ্ন করে।

'সেই তো বলছি।—' বলে রাহু একটু থামলেন। আবার শুরু করলেন বলতে—'আমার মনে হলো, আমার বন্ধু হয়ত আসবে না! কিন্তু, আমার বন্ধু এলো। তাকে স্বাগতসম্বাধন জানলাম, 'এদো আমার বন্ধু।'

এবার বন্ধু গলা দু'লিখে, শরীর দু'লিখে, বক্ বক্ করে আমাকে প্রীতি জানালো। ঘরে চুকেই যেতে শুরু করে হিল। খুব ধীরে ধীরে খুঁটিয়ে যেতে লাগলো। আমি সেই ফাঁকে তাকে আমার মনের কথা বলতে শুরু করলাম—'বন্ধু দেখতে পাচ্ছ, আমি কত অসুখী। তুমি তো জানো না, আমি আমার বেশ ছেড়ে কত দূরে আছি একা। আমার বাড়ীতে ফুলের বাগান আছে, কসলের বাগান আছে, কসলের মাঠ আছে। বাগানে কত রকম ফল—আম, জাম, লিচু, কলা, পিচ—সব পাকা।'

'হম্!' বলে সে একটা শব্দ করলে। আমার কথা বেন সে বুঝতে পেরেছে, বলে রুটি নাড়লো।

শুভ আসে। তখন কুয়াশার চারিদিক ঢাকা, এমন কি গাছপালাও কিছু দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু কুয়াশার জাল ছড়িয়ে আছে। তখন আমার ভারী অসুবিধে হয়। তখন আর আমার বন্ধু আসে না।

শীত চলে যায়। বসন্ত শুরু আসে।

এবার আমার বন্ধু শুধু একা আসে না। সঙ্গে করে আয়ো তিনজনকে আনে। তারা খুব ছোট—কচি। বুঝতে মেয়ি হয় না, ওই কচি বাচ্চারা আমার বন্ধুর ছেলেমেয়ে।

আমার ভারী আনন্দ হলো ওদের দেখে। উঃ, কতদিন পরে আমার বন্ধু এলো। ওরা আসতেই নির্জন ঘরখানা মুখর হয়ে ওঠে। আমিও যেন প্রাণ ফিরে পাই। আমি যে কি করব না করব, ঠিক করতে পারি না।

কটির একখানা টুকরো হাতে নিয়েছি। হাত থেকে কটির টুকরো ছিনিয়ে নেয়—বাচ্চাদের খেতে দেয়। বাচ্চাগুলোও আমার হাত থেকে কটির টুকরো কেড়ে বেলে।

‘ভারী হ্যাংলা তো!’ নাতি-নাতনীরা বলে উঠলো।

‘হ্যাঁ, গোটা টুকরোটাই গিলে কেল। আমার ভারী ডাল লাগছিল। আবার ওরা চলে গেলো। সেই পাছপালা ছাড়িয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে, বতবুধ দৃষ্টি ধার, ততবুধ আমি তাকিয়ে থাকি।—এর পর থেকে দেখেছি, ওদের কারো আর ভরভর ছিল না।’

একদিন দেখা গেল, ওরা আর আসছে না। কেন? আমি রোজ ভেবে মরি। কটি ওদের ক্ষেতে রেখে দিই। ওদের আসা-পথের দিকে চেয়ে থাকি। সেখতে দেখতে বেলা ব’য়ে যায়। আর ওরা আসে না। আমি ভাবি, আমি কি ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। সহসা আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়।—রোজই ভাবি, আজ আসবে।

এমনি করে তিনটি মাস কাটলো।

একদিন ওরা এলো। কটি বাচ্চারা এখন বেশ বড় হয়েছে। আগের মতোই ওরা আনন্দের ঝাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকলো। সোজা আমার টেবিলের উপরে এসে বসলো। ওদের আদর করলাম। বললাম, ‘এতদিন তোরা আসিগ নি কেন?’—

ওরা কিন্তু বেশী কিছু খেলো না। ঘরের আনাচে-কানাচে কটির টুকরো এখনো ছড়ানো রয়েছে। ওরা ও-সব কিছুই ছুঁলো না। ওরা অঘোর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। কি যেন কথা বলতে চায়। তাই তো—সেই সাদা পালক—যে আমার ঘরে প্রথম দিন অতিথি হয়ে এসেছিল—যাকে আমি বন্ধু বলে ডেকেছিলাম—ওদের মা কে তো দেখতে পাচ্ছি না।—

প্রশ্ন করলাম, ‘তোমাদের মা কোথায়? মা কে তো দেখতে পাচ্ছি না?’

ওরা—তিনজনই খুঁটি নেড়ে আমার কথায় সাধ দিলো। পরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। বেশ স্পষ্ট দেখলাম, ওদের তিনজনের চোখ কেমন সজল।

আবার প্রশ্ন করলাম, ‘মার কি অসুখ হয়েছিল?’ এবার তিনজনে এক সঙ্গে খুঁটি নেড়ে আমার বুকের দিকে, ‘হ্যাঁ, মার অসুখ হয়েছিল।’

বুকেতে সেবি হলো না, ওদের মা মারা গিয়েছে। তাই কেউ ওরা আসেনি। মার পরিচয় নিয়েই ওরা আমার কাছে এসেছে। ওরা জানতো, আমি ওদের মাকে ভালবাসতাম। ওদের

মাও ওষের কাছে আমার কথা বলেছে। আজ আমার বেশ মনে পড়ে, কত দিন আমি ওর মায়ের সঙ্গে কত কথা বলেছি। আমারও চোখ ছুটি ছলছল করে ওঠে। আমার মনে হলো, এ বেন আমারই আত্মীয়বিয়োগ-বেদনা। আমি ওষের সহায়কুতি জানলাম। আমি বললাম, 'তোমাদের মায়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। রোজ আসতো ঠিক এমনি সময়।'—গুয়া ওষের মায়ের কথা আগ্রহেরে শুনলো। আমি বললাম, 'তোমরা রোজ এমনি সময়ে আসবে কিন্তু!' গুয়া চলে গেলো সেদিন।

এই নির্জন বন্দী-ঘরে বছরের পর বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে নিজের বেশে কি ঘটেছে না ঘটেছে, কিছুই জানি নি।

ভারপর একদিন আমার বন্দী-ঘরের দরজা খুলে গেলো। সকাল বেলা। ডু'অন সার্কেট এলো আমার ঘরে। ঘোষণা করলো আমার জেবে, 'মিষ্টার লৌডার, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে। এই বেশ...হ্যাঁ, আজই এ কালাপানির দেশ থেকে তোমাকে তোমার দেশে যেতে হবে। তৈরী হয়ে নাও—জাহাজ ঘাটে ডিড়ে আছে।—'

ভাড়াভাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে কেলি। হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আমার বন্ধুর কথা—বন্ধুর ছেলেমেয়ের কথা।

সেদিন আমি আর ওষের দেখতে পেলাম না। হয়তো আমার ঘরে নূতন মাহুব বেধে গুয়া ফিরে গিয়েছে।

কিরে এলাম আমার দেশে, আমার বাড়ীতে।

ভারপর ?

এখানেই শেষ হলো দ্বাদশ গল্প বলা।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

- ১। Hat trick কাকে বলে ?
- ২। আমাদের প্রত্যেক দিনের ব্যবহৃত একটি জিনিসকে বৈজ্ঞানিকরূপে sodium chloride বলে, আমরা কি বলি ?
- ৩। বিশেষ শতাব্দী ১লা জাহাজারী, ১২০০ খৃঃ আব্দান্ত হয়েছে—ভুল না ঠিক ?
- ৪। বেড়ালের ক'টা আঙ্গুল আছে ?

(উত্তর অন্তর্ভুক্ত দেখ)



মেঠেডে

রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ডেভিডসনই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট (৩৩ রানে ৫টি) নেন। অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৭৪ রান সংগ্রহ করে। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের শুরু তেমন সুবিধে হয় না। আঠাশ রানের সময়ে ডাণের প্রথম উইকেট (বিল লরি) পড়ে যায়। ইংলণ্ডের অফ স্পিনার ফ্রেড টিটমাস আট ওভারে মাত্র ১০ রানে দুটো উইকেট নেন। তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটের বিনিময়ে ২৮৫ রান সংগ্রহ করলে দু' পক্ষের প্রথম ইনিংসের তফাত থাকে মাত্র ছত্রিশ রান। এইদিন বার্ক (২ নট আউট) এবং ওনিল ৭০ রান করেন। সাতটি বাউন্সারি নিয়ে ১২৪ মিনিটে ওনিল ৩০ রান ওঠান। চতুর্থ দিন প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে মোট ৩৩২ রানে খেলা শেষ করার পর ইংলণ্ড দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করে এবং ৩ উইকেটে ১৬৫ রান ওঠে। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে বেনো একাই তিনটি উইকেট নেন। পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের শেষ দিন দু' ঘণ্টা ব্যাট করে ইংলণ্ড আরো ১০০ রান সংগ্রহ করার পর ডেব্রটোর দলের ইনিংস শেষ ছানিয়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই পর পর তিনজনকে আউট করে ইংলণ্ড জয়ের আশাকে পুনরুজ্জীবিত করে। কিন্তু বার্ক ও বিল লরি অনমনীয় দৃঢ়তায় ইংলণ্ডের অভিষ্ট সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। এবারের শেষ টেস্ট ম্যাচ অসমীয়াসিতভাবে শেষ হলে 'অ্যাসেস' অস্ট্রেলিয়ার ঘরেই থেকে যাবে।

জাতীয় এথলেটিক প্রতিযোগিতা

এবার এলাহাবাদের আলক্রেড পার্কে নতুন তৈরি স্টেডিয়ামে চারদিন ধরে জাতীয় এথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় পাঁচশ জন প্রতিযোগী এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম দিন রাজ্যদলগুলির বর্ণাশ্রমিকভাবে কূচকাওয়াজের পর উজ্জ্বল উত্তর প্রদেশের অধিনায়ক ক্রীড়াহুষ্ঠানের শপথ গ্রহণ করেন। প্রথম দিন একটি মাত্র জাতীয় রেকর্ড ভাঙার কৃতিত্ব অর্জন করেন বিহারের তরুণ এথলিট নোয়েল টিরকো। বর্শা নিক্ষেপে বালকদের বিভাগে পশ্চিম বাঙালার এস. গাঙ্গুলী প্রথম স্থান অধিকার করেন। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় দিনে বাঙালার এথলিটরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। দু'হাজার মিটার ভ্রমণে বিবেকানন্দ সেন প্রথম, পোলভন্টে হুনীল ঘোষ ও এম. গাঙ্গুলী প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কেরালার স্থলের ছাত্রী কিলোমিনা বোশেক মহিলাদের ৮০০ মিটার দৌড়ে ২ মিনিট ৩৭২ সময় নিয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেন। তৃতীয় দিনে ৫ টি বিভাগে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়।

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া—পঞ্চম

টেস্ট ম্যাচ

কেন ব্যারিংটনের উল্লেখযোগ্য ব্যাটিং সত্ত্বেও ইংলণ্ড পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিনের খেলার তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ইংলণ্ড সমস্ত দিন ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২৫ রান করে। এই রানের মধ্যে একা ব্যারিংটনই ১০১ করেছিলেন। এই নিম্নে ব্যারিংটন টেস্ট ম্যাচে পরপর দু'ইনিংসে সেকুরি করলেন। দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড ৩২১

মহিলাদের সটপুটে মধ্যপ্রদেশের কমলেশ ছাত্তোয়াস এবং বালকদের ইপ্স্টেপ ও জাম্পে উত্তর প্রদেশের ঘোগেন্দ্র সিং হেকর্ড করেন। মহীশূরের শীলা পাল এই মিন চারটে বিষয়ে স্বর্ণপদক পান। শেষ দিনে পুরুষ বিভাগে সটপুটে এবং বালকদের আটশ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড হয়। মহারাষ্ট্রের দিনশ ইংলী এবং মহীশূরের কিশোর হুমিতলাঙ্গা; নতুন রেকর্ড করার সম্মান অর্জন করেন। উত্তর প্রদেশের গুলভারা সিং ২৪, ৩৬মি, ১০৮ থেকে ১০০ ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হন। বঙ্গ পার্কার শত মিটার দৌড়ে পুরুষ বিভাগে মহীশূরের কে. এল. পাণ্ডেয়ল এবং মহিলা বিভাগে স্টেফি-ভিস্তাকাকে দ্রুততম দৌড়কুশলী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এবার বিলেতে মহিলা ও বালক বিভাগে বাঙালী তৃতীয় স্থান এবং বালিকা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের সম্মান লাভ করেছে।

ডন ব্র্যাডম্যান

পনেরো বছর জিকেট অগত থেকে অবসর নেবার পর গত ৬ কেকুয়ারি এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে একদিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের অধিনায়ক হিসেবে ব্র্যাডম্যান আবার নেমেছিলেন। ডন ব্র্যাডম্যান মাত্র পাঁচটি বল খেলেই এবং চার রান করে স্ট্রাথামের বলে আউট হন। ইংলন্ডের প্রাক্তন টেস্ট বোলার বেডসার এই একদিনের খেলায় বিশেষ শাফল্য লাভ করেন। বেডসার অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক রিচি বেনোকে আউট করেন। ডেস্কটার টেসে জিতে এম. সি. সি. দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। দলের ব্যাটসম্যানরা ৭ উইকেটে ২৫০ রান করলে ডেস্কটার ইনিংসের সমাপ্তি জানান। ডেভিড সেপার্ড ও কাউড্রে যথাক্রমে ৭২ ও ৭২ রান করেন। প্রধানমন্ত্রীর দলের সকলে মোট ২৫০ রানে আউট হয়ে যান। বেনোই দলের সবচেয়ে বেশি রান (৬৮) করেন। খেলায় জিতে এম. সি. সি. মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়।

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

এবার এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা হয়েছিল কলকাতার উডবার্ন পার্কের সাউথ ক্লাবের লনে। এবারের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানীয় বিদেশী টেনিস খেলোয়াড়রা যোগ না দিলেও ভারতের আর কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎলাল, আশুতার আলী, নরেশকুমার; জাপানের ইসিওরো, এম. কুজি প্রমুখ নামকরা খেলোয়াড়রা যোগ দেন। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় দিনে মোট বাইশটি খেলার নিষ্পত্তি হয় এবং প্রতিযোগিতায় বাছাই খেলোয়াড়রা জয়ী হন। তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিৎলালকে হারিয়ে দিয়ে কৃষ্ণান ও নরেশকুমার এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ডাবলস্ কাইনালে জয়লাভ করেন। এই খেলাটির শেষ দিকে কৃষ্ণানের কয়েকটি 'ডলি' যেমন দর্শনীর তেমনই কার্যকরী হয়েছিল। রমানাথন কৃষ্ণান বিশিষ্ট খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জিকে টেনে সেটে হারিয়ে দিয়ে এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে দ্বিতীয়বার বিজয়ীও সম্মান লাভ করেন। কৃষ্ণান ১৯৫২ সালে কুস্তিগারের ব্যাগী ম্যাচকে হারিয়ে সর্বপ্রথম 'চ্যাম্পিয়ান' হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এই খেলার কৃষ্ণান এত নিখুঁত খেলেছিলেন যে জয়দীপ মুখার্জিকে তার নুবোমুগি হয়ে খেলতে যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছিল। কৃষ্ণান ডাবলস্ খেলার আগেই জয়ী হয়েছিলেন। সিঙ্গলস্ কাইনালে আবার জয়ী হয়ে কৃষ্ণান এবার এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ট্রি-টুক্ট লাভ করার সোভাগ্য অর্জন করেছেন।

গ্রাহক গ্রাহিকাদের (লেখা)

ব্যাঙের লাফ

অনেক দিন আগের কথা। একটি গ্রামে একজন লোক ছিল, নাম ছিল তার শিলে। লোক তিনেবে খুব খারাপ না হলেও শিলের এমন একটা দোষ ছিল যেটার জন্তে সে গ্রামের অন্তান্ত লোকের কাছে অপ্রিয় হয়ে

উঠেছিল। এটাকে দোষ না বলে রোগ বলাই ভাল। শিলের স্বভাব ছিল অনাবশ্যক সকলের সঙ্গে বাজী ফেলা। বাজী ফেলে ফেলে তার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, সম্পূর্ণ বিনা কারণে, অগ্রপচ্চাৎ কিছু না ভেবে সে বাজী ফেলে বসত। এর ফল অবশ্য যে খুব ভালো হ'ত না সেটা ভ' সহজেই অত্মমান করা যায়। তার বন্ধুরা এবং অন্তান্ত সকলে তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন রাজা দিয়ে যেতে যেতে শিলের সঙ্গে তার এক বন্ধুর দেখা হয়ে গেল। সে শুনেছিল যে, ঐ বন্ধুর প্রায় কিছুদিন হোলো খুব অস্থির থাকছে, তাই সে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, “এই যে, বহুদিন বাধে দেখা, তারপর তোমার প্রায় স্বর কি?” বন্ধুটি বলল, “স্বর ভাল, আশা করছি ডগবানের কপার তাড়াতাড়ি সেয়ে উঠবে।” এই কথায় শিলে খুব খুশী হলেও, তার অভ্যাস-বশত: বলে উঠল, “আমি তোমার সঙ্গে দ্ব'টাক; বাজী রাখতে পারি সে কখনো তাড়াতাড়ি সেয়ে উঠবে না।” এই ধরনের অসুত ছিল তার স্বভাব আর এই জন্তেই মনে হয় এটাকে রোগ বলাই ভাল।

শিলে দুটি বিনিময়-ভালবাসত, একটির কথা ভ' আগেই বলেছি, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—সে গরু, ছাগল, মুরগী, কুকুর ইত্যাদি পুষতে খুব ভালবাসত। শুধু পোষা নয়, সে এদের পেছনে খাটতও খুব—এদের ছুটতে, খেলতে, নানারকম মজা করতে দেখাত। আবার এদের নিয়েই অন্ত সকলের সঙ্গে নতুন নতুন বাজী ফেলত।

একদিন শিলের মাথায় চঠাৎ একটা খুব মজার মতলব এল। সে তখন কাছাকাছি একটা পুকুরে গিয়ে একটা ব্যাঙকে ধরে নিয়ে এস। তারপর তার অপূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সে ব্যাঙটাকে দু'দিন কিছু খেতে না দিয়ে রেখে দিল। সেটা যখন ক্ষিধেতে আধমরা, তখন শিলে একটু বাস্তব হাতে করে খানিকটা ওপরে ধরে রইল। ব্যাঙট। কাতর চোখে বাস্তবট।র নিকে খানিকক্ষণ চেয়ে তারপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লাফ দিল, কিন্তু নাগাল পেল না; আবার লাফাল, কিন্তু এবারেরও পেল না। শিলে তখন তাকে ধেতে দিল বটে, কিন্তু সে ব্যাঙটার জন্তে খুব কম পরিমাণে খাদ্য বরাদ্দ করে দিল, যাতে সবসময়েই সে ক্ষুধার্ত থাকে। আর রোগ ঐরকম খাবার হাতে নিয়ে ব্যাঙটাকে লাফান

প্রাকটিক করাতে লাগল। প্রতিদিন তার লাকের উচ্চতা একটু একটু করে বেড়ে চলল। ছিলে ব্যাঙটার নাম রেখেছিল ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার। ব্যাঙের ভাগ্যে নামটা একটু বেশী ভাল জুটে গিয়েছিল। ছিলে বেই বলত, “ড্যানিয়েল রেডি,” অমনি ড্যানিয়েল এক বিরাট লাক দিত।

ড্যানিয়েলের আশাতিরিক্ত কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে ছিলে তার ঘরে একটা ছোটখাটো বাক্স করে দিয়েছিল, আর সর্বদা সেটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। একদিন রাত্তায় ছিলেও সঙ্গে তার তিন চারজন বন্ধুর দেখা হতেই তারা বলল, “কি হে ছিলে বে, আবার কোথায় বাজী খেলতে চললে?” ছিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যাঙের বাক্সটি দেখিয়ে বলল, “এই যে ব্যাঙটি দেখছ, আমি বাজী রেখে বলতে পারি, পৃথিবীর কোন ব্যাঙ এর চেয়ে বেশী লাফাতে পারবে না।” “ওঃ এই কথা, তোমার ব্যাঙটি ত’ বোণা এবং ছোট, আমি যদি একটা বড় শক্ত-সমর্থ বেখে ব্যাঙ পাই, এতুনি তোমারটা হেরে যাবে।” তারা বলল। ছিলে একটু হেসে বললে, “বেশ ত’ এনেই দেখ না।” বন্ধুদের অনেকেই চেষ্টা করল, কিন্তু শিক্ষিত ড্যানিয়েল, তার সঙ্গে পারবে কেন? সে অস্ত্রান্ত ব্যাঙের বিগ্ণ লাফায়, কাছেই ছিলে প্রত্যেকটি বাজীই জিতে নিল।

ছিলে আর ড্যানিয়েলের কীর্তি গ্রামে হরত আবার কিছুদিন ধরে চলত, কিন্তু হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল একটি বিদেশী সেই গ্রামে এসে উপস্থিত হওয়াতে। সব শুনে সে একদিন ছিলেকে বলল, “আমি আপনার সঙ্গে বাজী রাখতে রাজী আছি, কিন্তু আমার কাছে ত’ ব্যাঙ নেই।” ছিলে বলল, “তাতে আর কি হয়েছে, আপনি আমার বাক্সটিকে ধকন, আমি এতুনি আপনাকে খুব ভাল একটা ব্যাঙ এনে দিছি”, বলে সে চলে গেল।

এমনিতে হরত ছিলেকে হারানো খুবই শক্ত হোত, কিন্তু বিদেশীটির কাছে নিজে ব্যাঙটিকে রেখে গিরে ছিলে এক বিরাট ভুল করল আর বিদেশীটিও সেই ভুলের স্বযোগ নিল। সে টেবিলের ওপর করেকটা সীসের গুলি সেখতে পেয়ে সেগুলি নিয়ে ড্যানিয়েলের মুখের সামনে ধরতেই থাবার ডেবে সে সেগুলি খেয়ে নিল। এইভাবে সে অনেকগুলি সীসের গুলি খেয়ে খুব ভারী হয়ে গেল, ছিলে কিছুই জানতে পারল না।

খানিক পরেই ছিলে সর্বাধ ভিষে অবস্থায় একটা ভাল ব্যাঙ এনে বিদেশীটিকে দিল। প্রথমে বিদেশীটির ব্যাঙই লাফাল। তারপর ছিলে আগের মতই বলল, “ড্যানিয়েল রেডি,” কিন্তু ড্যানিয়েল নড়তেই পারল না। এই প্রথম হেরে ছিলে খুবই লজ্জিত এবং আশ্চর্য হলেও, সে সঙ্গে সঙ্গে বাজীর টাকগুলি দিয়ে চলে এল।

ড্যানিয়েলকে সে খুবই ভাল বাসত, কাছেই তাকে কিছু না বলে সে দুঃখিত মনে ড্যানিয়েলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ একটু নাড়া পেতেই চারটে সীসের বল

জ্যানিরেলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। খুব আশ্চর্য হয়ে ছিল তাকে বড় নাড়াতে লাগল, ততই তার মুখ থেকে সীসের বল বেরোতে লাগল। প্রথমটার আশ্চর্য হয়ে গেলেনও একটু পরেই দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বিদেশী লোকটি তাকে ঠকিয়ে বাজী জিতেছে বুঝতে পেরে সে রেসে আশুন হয়ে তাকে ধরতে ছুটল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে অনেক আগেই চলে গিয়েছে—ছিল তাকে খুঁজে পেল না।*

শ্রীমুনির্দল ভট্টাচার্য

হার্ভ চৌরেন অবলম্বনে।

একটি শিকার অভিযান

এই গল্পের শুরুতে গল্পের স্থানটার পরিচয় দিয়ে নিই।

সুদূর আফ্রিকার বৃষ্টি উপনিবেশ কেনিয়া প্রদেশ। এই কেনিয়া উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। এর পূর্ব দিকে নিচু জমি আর পশ্চিম দিকে উঁচু মালভূমি। এই মালভূমি ৪,০০০ ফুট উঁচু। মাঝখানে টানা নদীর উপত্যকা নিচু আর সমতল। এখানেই মাউন্ট কেনিয়া পর্বত ১৭,০৪০ ফুট উঁচু। কেনিয়া মাউন্ট এলগন-এর একটা খুব উঁচু শৃঙ্গ। পশ্চিমের মালভূমিতেই রাজধানী। এই রাজধানীতেই থাকতেন হুনীলের কাকা প্রিয়তোষবাবু। এখান থেকে ৪০ মাইল বিস্তৃত গ্রন্থ উপত্যকা চলে গেছে। এই গ্রন্থ উপত্যকার কয়েকটা গভীর হ্রদ আছে। এর মধ্যে একটা হ্রদের নাম কন্ডলক্। আর এই কন্ডলক্ হ্রদের তীরেই একটি হুল্লর মজবুত বাগো। প্যাটার্নের বাড়ী ছিল প্রিয়তোষবাবুর। এই বাড়ীতে প্রিয়তোষবাবুর একজন বিশ্বাসী স্থানীয় কিছু কৃষক ভৃত্য থাকত। এই ভৃত্যটির নাম ছিল কাশালা। কাশালা বেরকম সাহসী ছিল, তেমনি ছিল তার বুদ্ধি। সে যে কতবার আফ্রিকার গহন বনে, কত বিপদের মুখ থেকে প্রিয়তোষবাবুকে উদ্ধার করেছিল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে হুনীলকুমার এয়ার বি. এল. সি. পাশ করে বেরিয়েছে। হাতে প্রচুর সময়। হুনীল ছোট বেলা থেকেই ডানপিটে গোছেহর, কামেই তার মত চেলে যে হাতে এত সময় পেয়ে স্থির থাকবে, এটাই অস্বাভাবিক। বর্তমানে সে একজন খুব বড় শিকারী। তার উপর আবার সুদূর কদা থেকে তার কাকার চিঠি এসে পৌঁছাল শিকারের আহ্বান নিয়ে। আফ্রিকার শিকার! হুনীল একেবারে লাগিয়ে উঠল। তার আর সর না! ঘরের

মত নিতে অস্বিধা হলেও, স্থানীলের কথার কাছে মাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হ'ল। মত পেয়েই স্থানীল ছুটল তার বন্ধু হুমিথের কাছে। হুমিথ বোটানী নিয়ে খুব পড়াশুনা করে। আফ্রিকার নানা প্রকারের নতুন ধরনের উদ্ভিদের সম্বন্ধ জানে, এই আশাতেই হুমিথ রাণী হয়ে গেল স্থানীলের সঙ্গে আফ্রিকার তার কাকার বাড়ীতে যেতে।

আফ্রিকার দ্বারার ভ্রম স্থানীল ও হুমিথ তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বোঝাও করতে লাগলো। পরীক্ষার ভ্রম স্থানীলের কিছুদিনের অব্যবহৃত বন্ধুটি আবার পরিচায়ক করতে লেগে গেল সে। আর হুমিথ আফ্রিকার উদ্ভিদ সম্বন্ধে বইগুলো বাস্তব ভরতে লাগল।

তারপর তারা একদিন আফ্রিকানামী একটি জাহাজে উঠে বসল। বন্দরে নেমে স্থানীল কাকার ভ্রম এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। সেই সময় একটি কাকি এসে স্থানীলকে সেলাম করে, হাতে একটি চিঠি দিল। তাতে লেখা, “স্থানীল, আমি বিশেষ কারণে যেতে পারলাম না। যে তোমাকে চিঠিটা দেবে, তুমি তার সঙ্গে চলে এস। ইতি—কাকা।”

তখন স্থানীল, হুমিথ ও কাকিটি ট্রেনে উঠে বসল। ট্রেন রাস্থানীতে এসে পৌঁছল। কাকিটির পিছনে পিছনে স্থানীল ও হুমিথ তার কাকার বাড়ী এসে উঠল। অনেক দিন পর দেখা হওয়ার দু'কনেই খুব আনন্দিত হ'ল। স্থানীল, হুমিথের সঙ্গে প্রিয়তোষবাবুর আলাপ করিয়ে দিল। প্রিয়তোষবাবু হুমিথকে আনার ভ্রম খুবই আনন্দিত হলেন।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর প্রিয়তোষবাবু আসল কথা বলেন। তিনি বললেন, “কালকেই আমার স্বাস্থ্য, আমার রক্ত-লক্ষ্যের তীরের বাড়ীতে। শিকারে সেলেই আমি সেই বাড়ীতে উঠি। কারণ সেই বাড়ীটা প্রায় ভ্রমের মধ্যে। এর প্রধান হুমিথ শিকারের সম্বন্ধে যেতে বেশী হাটতে হয় না।”

তার পরদিন, সকালের বাগরাদাওয়া সেরে ওরা বেড়িয়ে পড়ল রক্ত-লক্ষ্যের বাড়ীর দিকে। স্থানীলের বাড়ীটা খুব পছন্দ হ'ল। হুমিথ এসে অবধি ঘুতে ঘুরে গাছ-পাছড়া দেখছে। হুমিথের একটা বৌক হচ্ছে নানা পাছের পাতা সংগ্রহ করা। হুমিথ হঠাৎ “কাগারা”^১, এবং “মুহুহুতা”^২, দেখতে পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। হাতে নিয়ে ফিরল কয়েকটা পাতা। পাতাগুলো সংগ্রহের স্থানীতে রেখে দিল।

তারপর ওরা আন ও দুপুরের দ্বারার ধারে বেরিয়ে পড়ল ছোটখাটো কিছু শিকার করতে।

১। ছিটের মত একপ্রকার পাছের কোপ ও পাতা।

২। আফ্রিকার সোদাশ ও পাতা।

কাখাসা ও সঙ্গে এল। হুনীল চলেছে আনমনে। হঠাৎ কাখাসা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পড়ল এক বিরাট অজগর সাপ; যেখানে আর এক মুহূর্ত আগে হুনীল দাড়িয়েছিল। ওরা তখন গুলি করে সাপটাকে মারল। তারপর গোটাকয়েক হরিণ শিকার করে ওরা সে দিন ফিরে এল। বিকেলের চা খেয়ে ওরা পরের দিনের ব্যংহা করতে বসল। হুমিধ ধরে বসল—কালকে সকালে কাখাসাকে নিয়ে ও বাবে ভাল ভাল পাতা সংগ্রহ করতে। এতে হুনীলও প্রিয়তোষবাবু অমত করলেন না। কাখাসার মুখ হুমিধ শুনলো যে, কাল কাখাসা ওকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে—মুকেবি ৩ রপানো ৪ সারখা ৫ কন্টনামোরা ৬ প্রভৃতি নানা জাতের আফ্রিকান উদ্ভিদ পাওয়া যাবে। এ সব শুনে হুমিধ একেবারে নেচে উঠল।

পরের দিন সকালে কাখাসা ও হুমিধ বেঙ্গল পাতাগুলো সংগ্রহ করতে। হুনীল এবং প্রিয়তোষবাবু গেলেন শিকারে। হু'লন করে হু'দিকে ভাগ হয়ে গেল।

প্রিয়তোষবাবু ও হুনীল শিকার খুঁজতে খুঁজতে বেশ একটু দূরেই এসে পড়লেন। কারণ, এটাই তাদের শেষ শিকারের দিন। তারা হু'লনে প্রথমে একটি কুড়ু ও ইল্যাও-এর ৭ মলকে তাড়া করলেন। এদের গারে জোর খাশা সবুও, অতিক্রিতে তাড়া খেলে ওরা খুব ভাষাচাচাকা খেয়ে যায়। তখন দু'একটাকে অনায়াসে মারা যায়। ওরা তাই করল। সেগুলোকে নিয়ে ওরা কিছু দূর এসে একটা নিউ-এর ৮ মলে হানা দিয়ে কয়েকটাকে মারল। সবগুলো নিয়ে যাবার পথে একটা মুনকিলে গড়ে গেল ওরা। 'নিউ' হ'ল, ওয়ার্ট হ'ল সে ২ প্রিয় খাত্ত। কাছেই ওদের উপর হানা দিল।

প্রিয়তোষবাবু বললেন, “ওদের ক্ষেপিয়ে লাভ নেই।” তার আগেই হুনীল ওয়ার্ট-হ'লগুলোকে বাধা দিতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রিয়তোষবাবুর কথায় ছেড়ে দিল। প্রিয়তোষবাবু আবার বললেন, “ওরা একবার রেগে গেলে আমাদের দফারদা করে দেবে! তারচেয়ে বরং একটা 'নিউ' কেলে দিলেই ওরা শান্ত হয়ে যাবে। ওদের, একটা 'নিউ' শেষ করতে

৩। কালজাম পাখি ও পাতা।

৪। এক প্রকার বাপ পাতা।

৫। এক প্রকারের গুলুগুলা জাতীয় পাতা।

৬। এক প্রকারের হলুদ ফুল ও পাতা।

৭। ওরা দু'বকনের ফলেও এক মলে থাকে। দুই প্রকারের হরিণ। প্রভৃতির এক হলুও রঙ আলোনা, জীবন গায়ের মোর, কিন্তু বেশ ভীতু।

৮। হরিণের মত শিংওয়ালা হরিণ।

৯। আফ্রিকান বস্ত্র বরাহ।

করতে আমরা ওদের নাগালের বাইরে চলে যাব।" তখন ওরা একটা 'নিউ' ফেলে দিয়ে, শিকার-গুলো ঘাড়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে লাগল। পরে আসতে আসতে ঈঠাং দেখতে পেল, ওদের আক্রমণ করবার জন্য একটা সিংহ প্রস্তুত হচ্ছে। তাই দেখে ওরা দু'জনে সরে এল এবং স্থানীয় প্রিয়তোষবাবুর হাতে শিকারগুলো বিয়ে, কয়েকটা গুলিতে সিংহটাকে ঘায়েল করে, পিঠ নিয়ে মহানন্দে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

বাড়ী কিরে দেখে হুমিথের কি আনন্দ! হুমিথেরা ওদের আগেই বাড়ী ফিরেছে। হুমিথের আনন্দের প্রধান কারণ হ'ল যে, সে আফ্রিকার উদ্ভিদ সংগ্রহ বেশ কিছু ভাল করে শিখে নিয়েছে। এতে ওকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে কাখাসা। এমনকি হুমিথ সত্যিই কাখাসার কাছে কৃতজ্ঞ।

এত আনন্দের মাঝে ওদের মনে দুঃখের স্বর বেজে উঠল। কারণ, আফ্রিকার মেথাদ ওদের ঘুরিয়ে এল এবার।' আবার চল সেই বাধাছাড়া, তোড়বোড়। এবারে ফেরার পালা।

দেশে কিরে এসেও ওরা কিছু ভুলতে পারেনি ওদের আফ্রিকার শিকার অভিযানের অভিজ্ঞতা আর আনন্দ। সত্যি, ওদের আফ্রিকার শিকার অভিযান হয়েছিল অপরূপ সাফল্যমণ্ডিত।

— — — ॥ আগামী নতুন বছরের নতুন মোচাক : — — —

এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ৪৩ বর্ষ শেষ হয়ে গেল। আগামী বৈশাখ সংখ্যা থেকে মোচাকের নতুন বছর আরম্ভ হবে—মোচাক পড়বে ৪৪ বছরে। বাংলা ১৩৭০ সালের এই মোচাককে আমরা নানাভাবে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। ছবি, ছাপা ও লেখায় আগামী বছরের মোচাক সবাইকে ছাগিয়ে যাবে।

তোমাদের মধ্যে যাদের চাঁদা এই সংখ্যার সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে, তারা নতুন বছরের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা মনিঅর্ডার করে ভাড়াভাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। মনিঅর্ডার না এলে, অথবা গ্রাহক-গ্রাহিকা না থাকার জন্য কোন চিঠিপত্র না এলে, আমরা ভি: পি: করে তাদের নামে কাগজ পাঠিয়ে দেব। ভি: পি: ফেরত দিয়ে আশা করি তোমরা আমাদের কতিগ্রস্ত করবে না। মোচাকের বার্ষিক মূল্য ৫'০০, ষাণ্মাসিক ২'৫০ নয়। পরস্পর।



ইদানীং ভারতবর্ষের উপর গিরে নানা
বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে চলেছে। গত এক বৎসরের
মধ্যে আমরা এক একজন করে অনেক শ্রদ্ধাশীল
নেতাদের হারালাম। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের

পর একে একে কালিদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ

বিনয়তনু ধর, ধীরেন্দ্রনাথায় মুখোপাধ্যায়—ইত্যাদি। তারপর আকস্মিক ভাবে সেদিন যখন
: রাভেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর খবর এলো—তখন দেশবাসীর মন গভীর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।
যেতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা অর্জনের অঙ্গীকৃত একনিষ্ঠ কর্মরূপে
: প্রসাদ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। চিন্তায় কাজে আচার আচরণে তিনি ছিলেন ভারতীয়।
রত্নবাসীর জীবন-আদর্শ তাঁর সকল কাজে সক্রিয়রূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর ছাত্রজীবনের
ফটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছিল বাংলা দেশে। বাঙালীর সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্য,
বিধারার সঙ্গে তাঁর সম্মতি ছিল স্বাভাবিক। কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সন্ধ্যাকত
প্রমের শান্ত পরিবেশে থেকেও তিনি নিজেকে নানাভাবে লিপ্ত রেখেছিলেন জাতির সেবার।

মাহুস অমর নয়। একদিন না একদিন মৃত্যুকে আহ্বান জানাতে হয়ই। বুদ্ধদেব, মহাপ্রভু
তত্ত্ববেব, ঐরামচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী সবাইই ভাবময়, কর্মময় জীবনের অবসান
রছে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কর্মের, আদর্শের, জীবন-চিন্তার ছাপ রেখে গেছেন আমাদের মধ্যে—
যরা সেই পথে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি। পে কথা শ্রবণ করে আমরা ডাঃ রাভেন্দ্রপ্রসাদের কর্মময়
বনের অবসানের পর তাঁর জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করে, তাঁর প্রতি স্বাধীনতা সন্ধান
র্শন করে তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি মধ্যদা দিই।

মৌচাকের যে সব বন্ধুরা এর মধ্যে জড়িয়ে আছেন—তাঁদের সংখ্যা দেখতে গিয়ে দেখছি নানা
সের বন্ধুরাই ভীড় করে আছে। সবচেয়ে বেশী বয়স ১৮ আর নীচের দিকে নামলে তো কথাই
ই—পড়তে শিখতে পারলেই হলো। আমরা অবিশিষ্ট সকলকেই গ্রহণ করছি বা করে থাকি।
ক তোমরা যারা বয়সে একটু বড়, তাদের প্রশ্নর সঙ্গে যারা একেবারে ছোট—তাঁদের প্রশ্নের ভিতর
রত্ন্য থাকে না। সত্যি কথাই—বয়স অনুযায়ীই প্রশ্ন করে—তাই আমাকে সাত বছরের

বহুদূরকে উত্তর দিতে হয়—আর ওদিকে শুধন সতেরো বছরেটুকু এসে গেছে। হালকা প্রু আর কিছু কষ্টিন প্রু বা জিজ্ঞাসাও থাকে—আমাকে তাই সাত থেকে সতেরোর বিভিন্ন উত্তরই দিতে হয়—একটু অসামঞ্জস্য এসে পড়ে বৈকি! কিন্তু উত্তর দেবার চেষ্টা তো করতেই হবে। এরপর আবার বারো প্রাক্তন বন্ধু আছে তারাও মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি দেয়—‘বড় হতে গেছি বলে কি হেঁহের ভাগ কমে যাবে?’ বাই হোক তোমাদের সকলকেই আমার সন্তান্য জানাতে হবে বলেই তোমরা বলি। তোমরা যদি চিঠির মধ্যে বরসটা উল্লেখ করো তাহলে আমার কানের ঘুংঘুবিধা হয়।

রীতা, সীতা ও পীতা বাগ্গাচি, আমসেনপুত্র—বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস কি জিজ্ঞাসা করেছ। বাংলা ভাষার লেখা প্রথম উপন্যাস হলো টেকচাঁদ ঠাকুরের লেখা আলালের ঘরের দুলাল। টেকচাঁদ ঠাকুর বলে সত্যি-সত্যিই কেউ ছিলেন না। তাঁর আসল নাম—প্যারীচাঁদ মিত্র। ছদ্মনামেই বইটা লিখেছিলেন। রত্না চক্রবর্তী, নবদীপ—বোলপুরের শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তুমি যে প্রশ্ন করেছ তাঁর সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব জানতে হলে ওধানকার কতৃপক্ষের কাছে পাঠ্যভালিকা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি দিও। তবে মোটামুটি একথা বলা যেতে পারে যে, কবিগুরু যে বিভাগের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে শিশুমনকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। চারদিকে বেগাল আঁটা ঘরে দেখানে ছোটবের বই হাতে সব সময় বসে থাকতে হয় না। বোলা মাঠের বৃক, অকাশের তলায়, ছাতীম গাছের নীচে, আমের, আমলকীর তলায় বসে ছেলেমেয়েদের পড়ার দ্রাল বসে। রেণু, মিত্র, সিত্র, ও পুষ্পাঞ্জলি রায়, বহরমপুর—‘কবি বহ্মিনচন্দ্র’ একথা বলা হয় কেন? কি ভাবছো—কবিরা তো সেই কবিকার সত্যযুগের লোক—বহ্মিনচন্দ্র তো তাদের তুলনায় সেদিনকার—তবে তাঁকে কবি বলা যায় কি করে? কবি বলা যায় তাঁদের, বারো অনেকখানি পর্বন্ত ভবিষ্যৎকে দেখতে পান। বহ্মিনচন্দ্রও ছিলেন এমনি মহাপুরুষ—যিনি বর্তমানের গত্তী পার হয়ে ভবিষ্যৎকে অনেকখানি পর্বন্ত দেখতে পেরেছিলেন—তিনি যে পদ দেখেছিলেন তা আজ সার্থক হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর দেশবাসী তাঁকে কবি আখ্যা দিয়েছে।

রীতা মৈত্র, রপেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ডেজপুত্র; চিত্তর ও কুইনী, আসানসোল; অমীতা ঞ্জাপুত্র; রাধারানী দত্ত, বিলু ঘোষ, কোলকাতা; অনিমা, নীলিমা, প্রতিমা দে, লিঙ্গুয়া—সকলে চিঠি পেয়েছি।

সকলের অন্ত তত্বকামনার—

মহুদি।

শ্রীমদ্রচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বহ্মিন চাইলো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত তৎকর্তৃক

প্রত্ন প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০৪ ন. প.

অন্নদাশঙ্কর রায়

জাপানে



এই বৎসরের সাহিত্য আকাদেমী

পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভ্রমণ-কাহিনী

জাপানে

‘পথে প্রবাসে’র লেখক অন্নদাশঙ্কর একদা ইউরোপে গিয়ে তাঁর চোখজোড়াকে অশ্রমেধ ঘোড়ার মত ছুটিয়ে দিয়েছিলেন দেশে দেশে। জাপানে গিয়েও তিনি সেই বিশ্বায়ই জয় করে এনেছেন আমাদের জন্ম। দাম—৬.৫০



লেখকের আরো কয়েকখানি বই

- ★ পথে প্রবাসে (ভ্রমণ) ৪.০০
- ★ ইউরোপের চিঠি (,,) ১.৫০
- ★ রাঙাধানের খই (ছড়া) ২.০০
- ★ ডালিম গাছে মো (,,) ৩.০০
- ★ অসমাপিকা (উপন্যাস) ৩.০০
- ★ কামিনীকাকুন (গল্প) ৩.০০
- ★ রূপের দায় (,,) ৩.৫০
- ★ দেখা (প্রবন্ধ) ৩.০০
- ★ অপ্রমাদ (,,) ৩.০০
- ★ সাহিত্যে সঙ্কট (,,) ২.০০
- ★ নুতন করে বাঁচা (,,) ১.৭৫

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য ভ্রমণ-কাহিনী

- ★ মন্দিরময় ভারত—১ম খণ্ড (২য় সং)—
অপূর্বরতন ভান্ডারী ৫.০০
- ★ মন্দিরময় ভারত—২য় খণ্ড—এ ৬.০০
- ★ ভোভার পেরিয়ে—
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ৪.৫০
- ★ পথের টানে—বিভা সরকার ৩.৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বাক্সম চার্চরো ট্রাট, কলিকাতা—১১

শ্রীমুখীচন্দ্র সরকার
সম্পাদিত

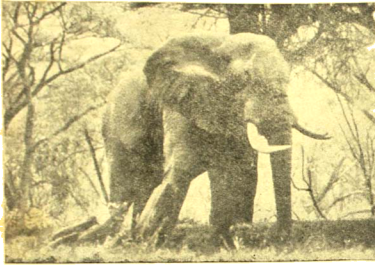


মুদ্রিত
শ্রীমুখী

বৈশাখ-১৩৬৯



অনু ও তার শাবক
বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর জ্যাক এডুইন গ্যাণ্ডসিয়ার অঙ্কিত চিত্র



আফ্রিকার হুনা হাতী

দামাত্র অন্তরনয়
ভাব, যেটা তার
পক্ষে ষাভাবিকই
ছিল। সে মহৎ
দ্রুতগতিতে এগিয়ে
চললো।

পাহাড়তলীর
কাছে এসে দেখা
গেল একটা মালা
পা হাড়ের পা
থেকে নীচে প্রায়
আধ মাইল নেমে
খানিক জায়গা
জুড়ে এক ঢালু ও
অগভীর খোয়াই

হুটি করেছে। জল সেখানে দেখা যায় না, কিন্তু চতুর্দিকে ঘাস গজিয়েছে এবং ঘাসে ফুল ধরে এক
সুন্দর বাগানের মত হয়ে রয়েছে। দৃষ্ট অতি সুন্দরই কিন্তু সেই ঢালু খোয়াইয়ের ওপাশেই এক
বিরাট সিংহ শুয়ে আছে এবং তার অল্প তরফে, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আরও দশ-এগারোটি সিংহ।
তার মধ্যে পাঁচটা পূর্ণ বয়সের সিংহী এবং আরও একটা বড় সিংহ। অন্তর্গতি ছোটবড় শাবক।
কুখা গেল যে দলপতি আলাদা রয়েছে অন্তেরা খাওয়াদাওয়া শেষ করে লাকালাকি করছে।

হঠাৎ দেখা গেল যে দলটা একঘোটে কিংবে ঐ খোয়াই লক্ষ্য করে আসছে, বোধহয় ঘরে
কেরার সমস্ত হয়েছে তাদের। সেই দেখে আমাদের বোদ্ধার দলও দ্রুত এগিয়ে চললো বাতে
সিংহের দল ওদের এড়িয়ে চলে বেতে না পারে। কিন্তু কাছে পৌঁছবার মুখে এমন এক অদ্ভুত ঘটনা
ঘটলো যে সবাই থেমে তাই দেখতে লাগলো।

সিংহের দলটা দলপতি যেখানে শুয়ে ছিল তার চেয়ে কিছু এগিয়ে খোয়াইয়ের ঢালু পাড়ে
যখন নামছে তখন দলপতি উঠে তাদের দিকে এগিয়ে এলো, এবং তাকে এগোতে দেখেই অন্য বড়
সিংহটা ক্রমে ঠাড়িয়ে কেশর জুলিয়ে গর্জে উঠলো। কুখা গেল যে দলের অধিকার সে নিজে নিজে
চার আগেকার দলপতিকে হটিয়ে।

সিংহের পশুরাজ বলে খ্যাতি শুধু তার প্রচণ্ড সংহারশক্তি কি সমকালো চেহারার জন্ত নয়, তার স্বভাব প্রকৃতিও অন্য বনের পশু থেকে উন্নত।

কিন্তু শুধু দরাজ মন ও জাঁকালো চেহারা হলেই রাজ্য হওয়া যায় না—বিশেষ জ্বলে, যেখানে মান-মর্যাদা রাখতে হ'লে প্রতিপক্ষ শক্তিশাস্র্বে ও লড়বার সাহস ও কৌশল দরকার হয়।

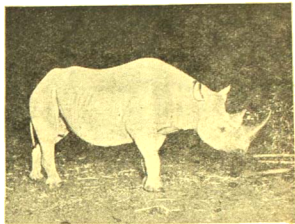
আর সিংহের প্রকৃতি যে সদা-

সর্বদাই ঐরকম উদার-উন্নত হয় একথাও ঠিক নয়। সিংহ বাহুবলকে হ'লে তার স্বভাবের মধ্যে ছলচাতুরি নিহিততা সবই দেখা দেয়। “সাতের বাহুবলকে” নামে প্রসিদ্ধ কাহিনীতে ঐরকম ভয়ানক কয়েকটা সিংহের বিবরণ পাওয়া যায়। অন্য দিকে শক্তিশাস্র্বেও সিংহকে হারাতে পারে ঐরকম বনের পশুও আছে।

আফ্রিকার জঙ্গল ও প্রান্তরেই সিংহের প্রধান রাজ্য। কিন্তু সেখানে হাতী ও গজ, এই দুই প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রাণীর বাসভূমি। গজের দেহ বিরাট। আশি নরই মন ওজনের এই জীব বৃদ্ধিতে ও দৃষ্টিশক্তিতে বিশেষ খাটো এবং বেজাজও বেজায় রুক্ষ। তোসকাড়ের মধ্যে বা খোলা ঘাসের মাঠে-জঙ্গলে সিংহের দল আছে যেবে গজের আচরক। ভীষণ জোরে তেড়ে “হামলা” করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে—এরকমটা অনেকবার দেখা গিয়েছে। হাতী আরও বড় আরও শক্তিশালী এবং তার দাঁত ও ভাঁড় দুইই মোক্ষম অস্ত্র বিশেষ। উপরন্তু হাতী দল বেঁধে থাকে স্বতরাং সিংহ তাদের দূরে রেখেই চলে।

কিন্তু এই দুই প্রাণী অন্য বনের পশুর উপর সাধারণভাবে বীরবিক্রম ফলায় না বা তাদের নিকার করে যায় না। স্বতরাং তাদের সিংহের স্বত দুর্গান্ত প্রত্যাপের খ্যাতি নেই এবং সেই কারণেই পশুরাজ নামের যোগ্যতাও নেই। তবে তারা রাজা না হলেও সিংহের প্রজ্ঞাও নয়।

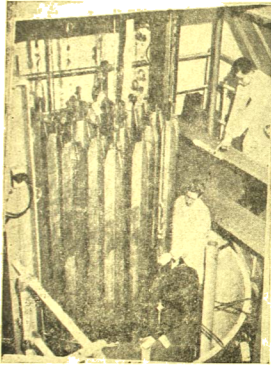
ভারপর আসে আর এক বনের রাজার কথা। ইনি হলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ঘন জঙ্গল এবং উত্তর মাইবিরিয়া এবং উত্তর চীনের শীতপ্রধান অঞ্চলের ঘাসের জঙ্গল ও



আফ্রিকার গজ

এ্যাটম-চালিত জাহাজ

সন্ধানী



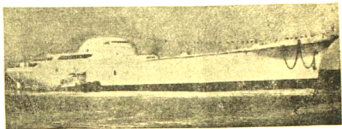
এ্যাটম-চালিত জাহাজের Reactor—বার সাহায্যে
উত্তাপ ও গতিবল সঞ্চারিত হয়।

এক পাউণ্ড Uraninum ধাতুর তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে সারা পৃথিবী এই জ্বলো-জাহাজ ঘুরে এসেছিল। ৩,৫০০ টন কয়লা কিংবা ৩০০,০০০ গ্যালন পেট্রল পুড়িয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে, এই সামান্য এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার এই পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি করতে পারে। এই এ্যাটম-চালিত জাহাজের মধ্যে nuclear reactor নামে একটা ঘর স্থাপন করা হয়, যা এ্যাটম-শক্তি উৎপাদন করে। এটা কিন্তু অগ্নি নয়, এই reactor^{*} উত্তাপ

ভোমরা অনেকেই টিমারে বা জাহাজে চড়ে। এই জাহাজ বা টিমার সাধারণতঃ কয়লা বা পেট্রোলে চলে। কিন্তু ভোমরা শুনে একেবারে অবাক হয়ে যাবে—যে এমন দিন আসছে, কয়লা বা পেট্রোল কিছুই লাগবে না, অথচ সমুদ্র বা নদী-পথেও টিমার বা জাহাজ চলেবে। এটা সম্ভব হয়েছে এ্যাটম বা পরমাণু শক্তির সাহায্যে। আমেরিকার মুক্ত-রাজ্য প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এই ধরনের জাহাজ সমুদ্রে চলা সম্ভব।

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার নৌবিভাগ সর্বপ্রথম এ্যাটম-চালিত জ্বলো-জাহাজ "Nautilus" তৈরী করে। এতে কোন বকম তেল বা কয়লা না পুড়িয়ে, মাত্র

সৃষ্টি করে জাহাজের turbine চালনা করবার জন্য বাষ্পের সৃষ্টি করে। এই বাষ্পই জাহাজের পাখাগুলোকে (propeller) চালিত করে জাহাজকে চল-পথে অগ্রসর করে।



আমেরিকার এ্যাটম-চালিত জাহাজ 'সভানা'

রিএকটরের ভিতরে ইউরেনিয়াম ধাতুর এ্যাটম বিন্দুগুলো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে বিরাট শক্তি ও উত্তাপের সৃষ্টি করে। তারপর এই উত্তাপের সাহায্যে পাইপে চালিত জল, বাষ্পে পরিণত হয়ে, জাহাজের বাষ্পচালিত পাখাগুলোকে ঘুরাতে আরম্ভ করে। ফলে, জাহাজের পাখাগুলো দ্রুতভাবে ঘুরতে আরম্ভ করে জাহাজকে চলান করে।

এ্যাটমের কথাগুলো যাতে কোন রকমে বাইরে বেরুতে না পারে—কারণ, এর তেজস্ক্রিয়রশ্মির বিজ্ঞুরণের ফল অতি ভীষণ—তার জন্য জাহাজের দেওয়ালগুলো কেবলমাত্র শক্ত নয়, বেশ পুরুও করতে হয়। এর ফলে, এ্যাটম-চালিত জাহাজ বেশ ভারী ও বড় হয়।

সর্বপ্রথম এ্যাটম-চালিত জাহাজ প্রস্তুত করে রাশিয়া। রাশিয়ার 'লেনিন' নামক জাহাজটি সমুদ্র-পথে বরক-ভান্ডার জাহাজ। উত্তর সাইবেরিয়ার সমুদ্র-পথগুলি শীতকালে চলাচল রাখবার জন্য এই জাহাজ ভাসমান বা জলের নিচের বরকের তৃপগুলো চূর্ণ করে দেবার কাজে নিযুক্ত থাকে।

উত্তর সাইবেরিয়ার সমুদ্র-পথ বছরের মধ্যে প্রায় ৪০ সপ্তাহ বরকের জন্য জম্যাট হয়ে থাকে। এই পথে কোন জাহাজ যেতে পারে না। এই সমুদ্র-পথ সব সময় হুগম রাখবার জন্য 'লেনিন' জাহাজ ক্রমাগত বরক কাটার কাজে নিযুক্ত থাকে।

এর পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ্যাটম-চালিত "Savannah" নামে একটি জাহাজ ২১এ জুলাই ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সমুদ্র-পথে চালু করে। এই জাহাজ কতটা শক্তিশালী তাই দেখ—একটা বোতাম টোপা মাত্র এতে ২০,০০০ অশ্বশক্তি উৎপন্ন হয়।

'সভানা' লম্বায় ৫২৫ ফিট এবং এর গতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৫ মাইল।

মৌচাক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯



আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান

বিল্লিমান্ করালকালকবলিত
দৈত্যকুলকলহ তিমিরিল অজ্ঞান
তিমিরাত্মে

গুণান্বিত বিজ্ঞাপনক
বিশেষ আজ্ঞাপনক অত্রমিশ্র,—

আমি খ্রীষ্টপন্থর উত্তারক
সকলকলাপারসত্ত প্রবলপ্রতাপ
সমুদীপাদিপতি মহারাজাবিবাজ
দাড়িম্বচন্দ্র বজ্রহকার অস্ত চরমুখে
সংবাদ পাইলাম যে তুমি আমার
রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে আমার
প্রজাদের উপর অত্যাচার করি-
তেছ। তুমি নিতান্ত বর্বর এবং
অল্পবুদ্ধি বলিয়াই মোহবশে এতাদৃশ
অশ্রায় কর্ষ করিতেছ, আমি
রাজোচিত ঔদার্যবশতঃ এখনও
তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত
আছি। কিন্তু তুমি অবিলম্বে
আমার অধীনতাধীকারপূর্বক দস্তে
তৃণ লইয়া তোমার জন্ত দৈনিক
নির্দিষ্ট রাজকরবরূপ দশটি ব্যাঘ্র

এবং পলাশটি হরিণ সঙ্গে লইয়া অত্র পত্র প্রাপ্তিমান্ত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অন্তর্ধায়
আগামী কলাই আমার হস্তে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া কৃতান্তমননে স্বাত্রার জন্ত প্রস্তুত
হইবে।’

হাতীর দাঁড়ের কোটোয় লিখন নিয়ে এরও ঘেরণ্ড তৈরি, কিন্তু তাদের তর ঘেন আর
যেতে চায় না। এরও দৈত্যরাজের পায়ে ধূলা নিয়ে বললে, “প্রভু, যদি আর পরিবর্তন না
করি তা’হলে আমার দরগাতেকে আপনি যেখা, আর আমার বউ গোষ্ঠতা হইল হাকিমের
অঙ্গল”— !



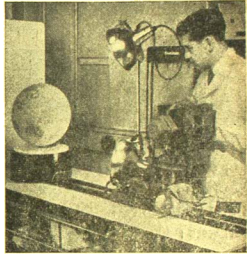
অগস্ত্য বড়বা বড়ের রক্ত দিয়ে শিশুরা ভাবায় লিখন দিলেন

সবজাতার আসর

সন্ধানী

অঙ্কুর ক্যামেরা

মনে কর, একটা বড় আপিসে
গায়ে চুরি হয়েছে; সিঁচুকাটা খোলা
পড়ে আছে, মেঝের চারিদিকে টাকা
নোট ছড়ানো। এরপর আরক্ত হোল
চুরির রহস্য ভেদ করার চেষ্টা। প্রত্যেক
জিনিষ ভাল করে পরীক্ষা করা হচ্ছে;
প্রধানতঃ যে সব জিনিষ পড়ে আছে
তার গায়ে হস্তাঙ্গুলির রেখার ছাপ
আছে কিনা। অনেক খুঁজতে খুঁজতে
জিটেকটিত দেখতে পেলেন মেঝের
উপর একটা পেনসিল পড়ে আছে।
চোররা এই পেনসিলটি ব্যবহার
করেছিল? তা'হলে নিশ্চয় হস্তাঙ্গুলি-



চেষ্টাও না। স্টাট ছবি তোলায় নতুন 'See-all-round camera'
রেখার ছাপ এতে আছে। হ্যাঁ, এই পেনসিলে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেল। কিন্তু এই আঙ্গুলের
ধাপের রেখাগুলো গোল পেনসিলের গায়ে ছাপ পড়ায় বক্ররেখার পরিণত হয়েছে। একে সনাক্ত
করা ভারী মুশ্কিল! এই বক্ররেখাগুলো যদি সমতল বা চোটালো ভাবে পাওয়া যায়—তবে চোরকে
ধরা খুব সুবিধা হয়।

সম্প্রতি একরকম নতুন ক্যামেরা আবিষ্কার হয়েছে, যার নাম 'See-all-round camera'।
এই নতুন ক্যামেরার সাহায্যে সমতল বা চোটালো ছবি নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই ক্যামেরা
পেনসিলের এমন ছবি তুলবে যাতে মনে হবে, পেনসিল বেকা ও গোল নয়, একটা চোটালো সমতল
জিনিষ। পেনসিলে যে আঙ্গুলের রেখার ছাপ পড়েছে, তা সমান চোটালো ভাবে এই ক্যামেরায়
সমস্তটা উঠবে।

কোন গোল জিনিষের চোটালো বা সমতল ছবি তুলতে হলে এখন এই ধরনের ক্যামেরা



নতুন ক্যামেরায় মানুষের মুখ ও কানের চ্যাপ্ট ছবি এবং
আগুন নাতির ভাঁড় ও তার পায়ে লেখাওনি কেনন সমতল।

ভাবে উঠছে তাই দেখান হয়েছে।

হচ্ছে সমতল ছবির নমুনা। সমতল ছবি তোলায় ক্যামেরার ছবিও এখানে আগের পাতায়
যেওনা হয়েছে। যে গোল জিনিষের সমতল বা চোটালো ছবি তোলা হবে, সেই জিনিষটা কিন্তু
ছবি তোলাবার সময় মোবের মত ক্রমাগত ঘুরবে।

ব্যবহৃত হচ্ছে। ধর, প্রভুতবহিদরা একটা
২০০০ বৎসরের মাটির ভাঁড় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার
করলেন। এই ভাঁড়ের গায়ে নানা রকম
অঙ্কর ক্ষোদিত আছে। সমস্তটা এক
সঙ্গে সমতল ভাবে প'ড়ে এই লিখিত
লাইনগুলি উদ্ধার করতে হবে। এই
ক্যামেরার সাহায্যে ভাঁড়ের সমস্ত ছবিটা
চোটালো ও সমতল ভাবে উঠবে, তাতে
প্রভুতবহিদরা ভাঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে না প'ড়ে,
এই কটোগ্রাফে সোজা সমতল পাতার
ছাপার মত অঙ্করগুলো পড়তে পারবেন।

একটা মানুষের মুখ ও দুই কানের সমতল
ছবি তুমি দেখতে চাও? এখানে মুদ্রিত
ছবিটা দেখ, দেখলে হাসি পাবে; কিন্তু এই

নেকড়ে-মানুষ রামু

ছয় বছর হয়ে গেল; উক্ত প্রদেশের বলরামপুরের হাসপাতালে 'রামু' এখনও পড়ে আছে।
এই হুঁসীর্ষ ছয় বছরেও তাকে 'মাছুষ' করা গেল না। হাসপাতালের ডাক্তাররা একে মাছুষ করবার
আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। রামু প্রায় পন্থ, তার বয়স এখন পনের বৎসর। ১৯৫৬ সালে
একটি রেলওয়ে প্রাটকরমের কাছে পুলিশ 'রামু'কে উদ্ধার করে। তখন সর্বাঙ্গ খবরের কাগজে
নেকড়ে বাঘের এই মাছুষ-ছেলের কথা প্রচারিত হয়। তখন তার চেহারা ছিল অদ্ভুত, পন্থ, এবং
বয়স নয় বৎসর। তার অদ্ভুত ব্যবহার এবং কাঁচা মাংস ছাড়া কিছুই খেত না দেখে বিশেষজ্ঞরা ঠিক
করলেন যে, সে নিশ্চয় মন্বলে কোন হিংস্রজন্তুর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিল। তখন গবেষণা চলতে

খেলা ধূলার খবর

কী কুন্দগেই না এবার ভারতীয়
ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পা
বাড়িয়েছিল! ১৯৬২ সালের ওয়েস্ট
ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল
চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।
সফরের মোট ১২টা খেলার কলাকল
দাড়িয়েছে : খেলা ৬, জয় ২ এবং
হার ৬। হেরেছে ৪টা টেস্ট ম্যাচে এবং

বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে চারদিনের খেলায়। জরুলভ করেছে—দুর্বল চৌবাগা একাদশ দল
এবং সফরের শেষ খেলার উইণ্ডহার্ড-লীওয়ার্ড আইল্যান্ড একাদশ দলের বিপক্ষে। হুতরাং জরুলভ
মোটাই গোরবের হরনি। ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার প্রধান কারণ, দলের ব্যাটিং
বিপর্যয়। ব্যাটসম্যান হিসাবে যাদের খ্যাতি, তারা নিজেদের ওপর আস্থা রেখে খেলাতে পারেন
নি। টেস্ট ম্যাচের কথাই ধরা যাক। প্রথম সারির খেলোয়াড়রা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, শেষের
খেলোয়াড়রা তুলনায় যা ভাল খেলেছেন। তা না হলে ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত।
ব্যর্থতার দ্বিতীয় এবং অন্তিম কারণ, খেলোয়াড়দের শারীরিক অসুস্থতা এবং খেলার আঘাত
লাগার ঘটনাগুলি। ভারতীয় দলের অনেক নামকরা
খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জনবাহু ধাতস্থ
করতে পারেন নি। প্রথমতঃ একটানা দীর্ঘপথ
বিমান-ভ্রমণ এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নিঃশ্বাস
ফেলার সময় না নিয়েই দলকে সফরের খেলা
আরম্ভ করতে হয়েছে; এক-আধ-দিনের খেলা
নয়—তিন মাসের সফর। একেই তো ভারতবর্ষের
মাটিতে ইংলণ্ডের বিপক্ষে খেলে তারা ক্লান্ত
হয়েছিল, তার ওপর খেলোয়াড়রা ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সফরের আগে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে পারেন
নি। এই সমস্ত অসুবিধার মধ্যে আবার খেলাতে
চোট পেড়ে অনেকেই কাবু হয়েছেন, বিশেষ করে
দলের অধিনায়ক নরী কনটাস্তির। তৃতীয় টেস্ট
খেলার ঠিক আগের খেলায় বার্বাদোজ দলের



পলি উমরীগড় (ভারতবর্ষ)

বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের শুরুতেই তিনি ত্রিকিধের বলে মাথায় আঘাত পান। তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে পাড়িয়েছেন, তবে সফরের শেষের কোন পেলার আর বোগ দিতে পারেন নি। অধিনায়কের এই বিপদে দলের মন ভেঙ্গে যায়, মন দিয়ে কেউই ভাল খেলতে পারেনি।

টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলার মধ্যে পর পর তিনটে টেস্ট খেলার ক্ষয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' সন্ধান পেয়ে যায়। তখন বাকি দুটো খেলার আকর্ষণ কমে যায়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের, এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর— দ্বিতীয় সফর। ওয়েস্ট ইন্ডিতে ভারত প্রথম খেলতে যার ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৩ সালের সফরে টেস্ট খেলার ফলাফল এত খারাপ হয়নি। পাঁচটা টেস্ট খেলার



৬২সালে হল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

মধ্যে চারটে টেস্ট ড্র যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বার্বাদোজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ১৪২ রানে ক্ষয়লাভ করায় 'রাবার' পায়। ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে এ পর্যন্ত চারটে টেস্ট সিরিজের খেলা হয়েছে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রত্যেকটি সিরিজে 'রাবার' সন্ধান লাভ করেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রথম টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায়, ১৯৫২-৫৩ সালের দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায়, ১৯৫৮-৫৯ সালের তৃতীয় টেস্ট সিরিজে ৩—০ খেলায় এবং ১৯৬২ সালের চতুর্থ টেস্ট সিরিজে ৩—০ খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতবর্ষকে পরাজিত করে 'রাবার' লাভ করেছে। ১৯৫৮-৫৯ সিরিজে চারটে, ১৯৫২-৫৩ সালের সিরিজে চারটে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের সিরিজে দুটো টেস্ট খেলা ড্র যায়। এই ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ ক্রমশই খারাপ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে। ১৯৬২ সালের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'রাবার' বিজয়ী ভারতবর্ষ যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে এরকম শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট মহল এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের ক্রিকেট সমালোচকেরা ভারতবর্ষের শক্তি সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাষ্ট বোলার হলের বল খেলতে না পারার দরুনই ভারতবর্ষের এই দুর্ভোগ। হল বর্তমান সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাষ্ট বোলার। হলের সমান না হোক কাছাকাছি বোলারও ভারতবর্ষে নেই। ফলে, কাষ্ট বল খেলার অভ্যাস ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের হয়নি। হলের



লাল গিবস (ওকেই ইণ্ডিয়ান)

বাংশার এবং বাড়িমার বল আমাদের খেলোয়াড়ের কাছে জুড়ুর মতই ভয়ের কারণ। টেস্ট খেলার গোড়ার দিকে দেখা গেল, ভারতীয় খেলোয়াড়রা কাস্ট বোলারদের বলে কার্‌বু হয়েছেন; তারপর দেখা গেল স্পিন বলেও তথৈবচ। কাস্ট এবং স্পিন দুই-ই তাদের কাছে দাকন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাটিংয়ে এখন এই অবস্থা তখন একমাত্র বোলিংয়ের উপর নির্ভর করে খেলার ফলাফল করা যায় না। তাও কিংকিং যদি উন্নত হ'ত। ভারতীয় দলের ব্যাটাপ কিংকিংয়ের দক্ষন ভয়েটে ইণ্ডিয়ান বেশী রান করেছে—হাত থেকে বল ছাড়া পেয়ে মাঠে আনন্দে গভাগডি খেয়েছে।

টেস্ট সিরিজের পাঁচটা টেস্ট খেলার মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলা দ্রুতগতির হয়ে থাকবে তিনজন খেলোয়াড়ের অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্যের সৌরবে। ক্রিকেট দলগত খেলা হলেও কোন খেলোয়াড়ের

অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে সমস্ত খেলাটাই কৃতী খেলোয়াড়ের নামে অভিহিত করার রীতি আছে। সেই হিসাবে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলা তিনজনের নামে নিঃসন্দেহে উৎসর্গ করা যায়। তৃতীয় টেস্ট খেলাকে বলবো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অফ-স্পিন বোলার লাল গিবসের খেলা। তৃতীয় টেস্ট খেলার শেষ দিনে লাকের সময় ভারতবর্ষের স্কোর দাঁড়ায় ১৪২, ২ উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন অপরাজেয় আছেন সারদেশাই (৬০ রান) এবং স্বর্গরকার (৪১ রান)। দু'জনেই হাত জমিয়ে গেলছেন। ভারতবর্ষের তখনও ৮টা উইকেট পড়তে বাকি এবং খেলার সময়ও কম। সুতরাং খেলাটা অমীমাংসিতই থেকে যাবে—সকলেরই তাই ধারণা। তবে চালাক লোকেরা মুখ ফুটে তা বলছেন না। কারণ ক্রিকেট খেলার কলাকল আগে থেকে ঘোষণা করা কত যে বোকামী তা তোমরাও জান। ক্রিকেট খেলার ঐতিহ্য—খেলার অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং অপ্রত্যাশিত কলাকল। তৃতীয় টেস্ট খেলার তার কোন অভাব ঘটেনি। লাকের পরই লাকের চোখ কপালে উঠে যায়। লাকের বিরতির পরবর্তী ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের খেলার ভারতবর্ষের বাকি ৮টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬৮ রানে। দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৭ রানে শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান এক ইনিংস এবং ৩০ রানে ফলাফল করে। ভারতবর্ষের এই 'হাড়ির হাল' করে

মৌচাক—আষাঢ়, ১৩৬৯



মধুর লব্ধানে হামিং পাখী

—



কবৈট নাচনের উপর থেকে ভালুকের সঙ্গে একটা

দুগুন বাঘের লড়াই লক্ষ্য করছেন।

করছেন, সেই সময়েই তিনি দেখলেন যে, তাঁর পাছের পাশ দিয়ে এক প্রকাণ্ড কালো ভালুক সেই বাঘের শিকারের দিকে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। কাছে পৌঁছেই সে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, বিকট চীৎকার করে দাঁত মথ বাগিয়ে। লেগে গেল প্রবল যুদ্ধ, শিকারের ধবল নিয়ে। দশ পনরো মিনিটের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাহেব দেখলেন যে, ঐ অতবড় দুর্গাখ বাঘ তার শিকার ছেড়ে পালিয়ে গেল। এই জাঁখানোর বংশধরের বিক্রম দেখে সাহেব চমৎকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু আহত ভালুক তখন ক্ষেপে গিয়ে সাহেবের কাছে উঠে তাকেই পেড়ে ফেলার চেষ্টা করায় তাকেই গুলি করে মারতে হয়। বাঘটা মার পেয়ে পালিয়ে আর ফেরে নি। হতভাগ্য সে জনলে বাঘের যে একছত্র রাজত্ব নেই তার প্রমাণ ওখানেই হয়ে গেল।

তবে পশুস্বাস্থ্য কে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সবদিক বিচার করে বলা যায় যে, দিচ্ছেই পশুস্বাস্থ্য হওয়ার যোগ্য। তবে এগুন্যারে—কি হাছের জগতে, কি জনলে—যোগ্যতার দাবী খুবই কম।

পরে তাকে অতি মন্তর্পণে এগিয়ে নিয়ে যখন বাঘের খোঁজে সেই কোণের কাছে গিয়ে দেখা গেল যে বাঘ নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে তখন হাবী একবার চেষ্টা করেছিল সেটাকে আক্রমণ করতে। হাছত দেবারও তাকে সহজেই সামলাতে পেরেছিল। কিন্তু যখন মার বাঘকে তার পিঠে তোলার চেষ্টা করা হোলো, তখনই হাছতকে বীভতিমত বেগ পেতে হয়েছিল হাবীকে সামলাতে। তার দারা জীবনে বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা যে এই প্রথম, সে কথা সে ভাল করে বুঝিয়ে দিল ঐ ব্যাপারে।

এই সব বস্ত্র পশু, অর্থাৎ বুনো গুয়ার, শোণকুত্তা, হাতী ইত্যাদি, বাঘকে পাল্টা আক্রমণ করে নিক্ষেপে আক্রান্ত হয়। প্রসিদ্ধ শিকারী জিম কর্বেটের মতে হিমালয় অঞ্চলের কালো ভালুক (Himalayan Black bear) নামে মাংসালী পশু বাঘের উপর নিজের থেকেই চড়াও করে। কর্বেট একবার একটা ছুরত বাঘকে হারবার চেষ্টায় "মরি" গরুর কাছে পাছের উপর মাচানে বসে এ বিষয়ে জলদ্যাক্ত লাক্সা পেরেছিলেন।

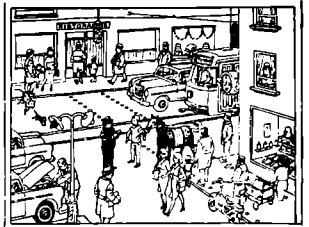
মছার মুখে বাঘ এসেছে টের পেয়ে কবৈট যখন তাকে ঠিক মত দেখার চেষ্টা

ধাঁধার পাণ্ডা

বাজিকর

(১) কাঠ আর লোহা এ দুটির মধ্যে
উন্নয়ন টেনে নেওয়ার শক্তি কার বেশী ?
কি করে সহজে তা প্রমাণ করা যায় ?

(২) পাশের ছবিতে রাস্তা, গাড়ী-
ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি সব দেখা
যাচ্ছে। কিন্তু ছবিটিতে কয়েকটি
তুল আছে। এই তুলগুলি কি কি
ভাল করে দেখে বার করার
চেষ্টা করো।



(৩) নীচের এই ছবিটিতে ঠিক
ঠিক কটি জিনিস আছে বৃত্তি খাতিয়ে
বলতে পারো কিনা দেখ।



(৪) এখানে নীচের ছবিটিতে দুটি সরল রেখা দেখা
যাচ্ছে। ও দুটিকে কি ভাবে সংযুক্ত করলে একটি চতুর্ভুজ
হবে তা চেষ্টা করে বার করতে হবে।



গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(২) $1 + 2 + 3 = 6$

(৩) শব্দ ছবিটিতে তুল আছে।

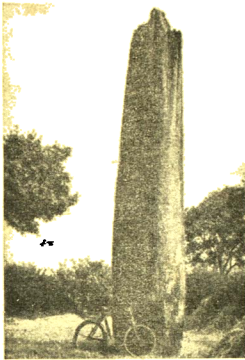
(১)

$1 \times 2 \times 3 = 6$

ওটিতে পাঁচটি রেখা হবে।

মৌচাক—শ্রাবণ, ১৩৬৯





মিথ্যে নক্স

দ্বীরাণা বহু

॥ শয়তানের শর ॥

অনেক অনেক দিন আগের মাহুয়া
কোনো ক্রিমিস সাধারণ থেকে একটু
আলাদা হলেই তাকে শয়তানের সৃষ্টি
বলে মনে করতো। লেখাটির সঙ্গে
প্রকাশিত ছবিতে যে প্রস্তরস্তম্ভটি
তোমরা দেখছো এটি ইয়র্কশায়ার-এর
বরোব্রিজের পথের ওপর কতকাল ধে
জল বড় সহ করে পাড়িয়ে আছে তার
টিক নেই। মাঃঃ এই প্রস্তরস্তম্ভটির
নাম দিয়েছে 'Devil's Arrow' যার
বাঙলা অর্থ 'শয়তানের শর'। কথিত
আছে শয়তান ধহুবিজ্ঞা শেষার সময় এই

প্রস্তরস্তম্ভটিকে তার ধহুকের তীর হিসেবে ব্যবহার করতো। তোমরা যে একথা বিশ্বাস করবে
না আমি জানি। তোমরা হয়ত বলবে এতো বড়ো একটা প্রস্তরস্তম্ভকে কি কেউ বাণ হিসেবে
ব্যবহার করতে পারে! তবে যদি বলি শয়তান এই প্রস্তরস্তম্ভটিকে ঠান্ডারি হিসেবে কাজে লাগাতো,
তাহলে তোমরা বিশ্বাস করলেও করতে পার।

বিজ্ঞানীরা আশ্চর্যবীর খার খারেন না। 'শয়তানের শর' প্রস্তরস্তম্ভটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের
অভিমত হল : প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইয়র্কশায়ার-এর এই অঞ্চলে Brigantes নামে এক জাতি
বাস করতো। Brigantes-রা Dui নামে এক দেবতার উপাসক ছিল। হয়তো Brigantes-রা এই
স্তম্ভটিকে তাদের দেবতা হিসেবে পূজা করতো। কিন্তু কথা হল : একটা ওজনের ভারী এই
প্রস্তরস্তম্ভটি এল কোথা থেকে? স্তম্ভটি যে কতো বিশাল তা তোমরা স্তম্ভটির নিচে পাড় করানো
মাইকেলটি নজর করলেই বুঝতে পারবে।



॥ একটি গাছকে ঘিরে দোকান-ঘর ॥

জাপানীদের চরিত্র যেমন
অদ্ভুত তেমনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
জাপানীরা গাছকে অভাস্ত মহাদর
করে। মাতৃদেহ প্রতি জাপানীদের
যে শ্রদ্ধা তার চেয়ে গাছের প্রতি
শ্রদ্ধা কোনো অংশে কম নয়।
জাপানী কার্টুরে কুড়ল হাতে গাছ
কাটিতে বাবার আগে তার উপাস্ত
দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে, দেবতার
কাছে গাছ কাটার অহুমতি ভিক্ষা
করে তবে সে বাড়ি থেকে বের হয়।
জাপানের নিকোতে (Nikko)

একটি অদ্ভুত দোকান আছে। অদ্ভুত বলছি এই মস্ত্রে, দোকান-ঘরটি গড়ে উঠেছে একটি বিরাট
গাছকে বেঠন করে। দোকানটি গাছকে ঘিরে কী ভাবে তৈরি তা এই লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত
ছবিটি দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। কাচ দিয়ে ঘেরা দোকানটির নীচের অংশে লক্ষ্য কর।
দেখো, গাছটিকে টেচে-টুলে কী স্বন্দর রূপই না দিয়েছে জাপানী ছুতাররা! নিকোর এই
দোকানটিতে বহু বিচিত্র ও দুর্লভ নিপোনিস (Nipponese) ব্যবসায়গ্ৰী কিনতে পাওয়া যায়।

॥ আশ্চর্য শিকল ॥

পরের পৃষ্ঠার ছবিটি দেখে তোমরা খুবই বিস্ময়বোধ করবে। মাটির বুক থেকে আকাশের
দিকে ঘূড়ির মতন ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে চলেছে বস্তুটি কি? তোমরা হয়তো ভাবছো—বস্তুটি
“আরব্যারজনী”র ম্যাজিক কার্পেট, অথবা কোনো জাদুকরের রোপ টি-ক্স। কিন্তু তোমরা যা
ভাবছো বস্তুটি তাদের কোনোটাই নয়। আর বিশ্বয় না বাড়িয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর আমিই
বলে দিচ্ছি।

প্রথমে বলি, ঘুড়ির মতন ক্রমশ আকাশের দিকে উঠে চলেছে যে বস্তুটি ওটিকে দেখতে হলে তোমাদের যেতে হবে স্টল্যাণ্ড। স্টল্যাণ্ড-এ গ্রীটনা গ্রীন (Gretna Green) বলে এক অঞ্চল আছে। সেই অঞ্চলের 'গ্রীটনা হল'-এর বাগানে আছে ছবির এই বিশ্ময়কর বস্তুটি। এই বস্তুটি যিনি তৈরি করেছেন তিনি একজন কর্মকার (চলতি বাঙালি, কানার)। কর্মকারটির খুব পায়রাব শব্দ। বাড়িতে তাঁর অনেক পোষা পায়রাও আছে। পায়রাদের বসবার জন্তে কর্মকারটি এই আশ্চর্য জিনিষটি বানিয়েছেন। ছবিটি তোমরা লক্ষ্য কর : একটি লোহার শিকল মাটি থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে গেছে—শেষে শিকলটি একটা চ্যাপটা মতন লোহার জিনিসকে ধরে আছে। লোহার শিকলটির শিকলের প্রত্যেকটি লোহা পরস্পরের সঙ্গে ও পেষে ওপরের চ্যাপটা পাতটির সঙ্গে শিকলটি ঝাল দিয়ে ঝোড়া। পরস্পরের সঙ্গে ঝাল দিয়ে ঝোড়া বলে শিকলটি ওইভাবে (ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে) ওপরের দিকে ক্রমশ উঠতে পেরেছে আর ভেতরের এই রহস্যটি না জানার আমরা বিশ্বয়বোধ করছি।



ছড়া।

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস

নীল আলো—জ্যোতিশ

জ্বলজ্বল—হিশহিশ

ঝিকঝিক—ঝমঝম

রেল ছাড়ে দমদম ॥

মাথা নীচু সিগনাল

নীল আলো হ'ল লাল।

হিশ—হিশ—ঝা—ব—ড়া

রেল আসে হাবড়া ॥

মঙ্গলটু

“যদি বাই, মুকুতা যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি ।
যবে হায় সব গান হয়ে যাবে অবসান
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি ।”



আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

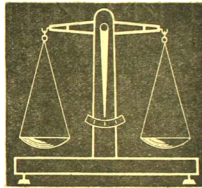
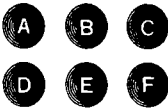
স্মৃতি : ১৯৭২]*

[প্রত্যা :

বাঁধার পাণ্ডা

বুদ্ধি নিয়ে খেলা
শ্রীনন্দী গোপাল চক্রবর্তী
২

(ক) ছবিতে একটা দাড়ি-পালা ও ওজন
নেওয়ার তক্ত ছয়টি বাঁধার দৈর্ঘ্যে পাচ্ছি।
এই বাঁধারগুলির সব ক'টিই এক ওজন।
কেবল একখানি বাঁধার ওজন অল্প বকম
আছে। দাড়িপালায় ঐ বাঁধারগুলি চাপিয়ে বলতে পার—কোন বাঁধার ওজন অল্প বকম?
মনে রাখবে, দাড়ি-পালাটি তিন বাঁধার বেশি ব্যবহার করবে না।



(খ) ছয়টি রানীমার্ক টাকা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে। এর মধ্যে যে তিন টিক একই বকম
ঐ দুটিই আসল টাকা—আরও তিন সব জাল। কোন দুটি আসল টাকা বলতে পার?



মোটাক—ভাত্র, ১৩৬৯



শ্রীমতী সত্যজিৎ গোস্বামী

তোড় ছুঁ। গোরাকে খামিয়ে
রাখা বলে—জানো কেটেরা, পাঠ-
শালার ঐ হাড়পিলে ষোণেন
শক্তিতও আহাদের কোনও দিন
ওঠবোশ্ করতে পারলো না আর
ও বাটা। রায়লোচন কিনা তাই
করালে। সর্দার কেট সব কিছু
স্তনে গভীর হয়ে বললো—তোরা
এখন যা! ও বাটা রায়লোচন
ঘৃষ্মেখেছে কীম দেখেনি; ওকে
এবার ফাঁদ দেবিরেই ছাড়ব।

দম্বোতে আসর বসল।
আদরটা ওদের কোথায় বসে
জানতো? ঐ যে ননীবাবুয়ের
পুকুর পাড়ে আশস্তাওড়ার মোটা
কাঁকড়া গাছটা আছে, বার পাশে
আধ-পোড়ো একটা বাড়ী এখনও
দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই। সবাই

বলে ওখানে নাকি ভূতের বাস। স্ত্রীম মুখের তো একদিন বলেই বসল, সে নাকি ওখানে ভূত
দেখেছে। অনেকটা গেছো-ভূতের মত দেখতে। লম্বা লম্বা হাত পা বাড়িয়ে ভূতটা নাকি তাকে
ধরতে আসছিল। এমন কি জামার কোনটা ধরেই ফেলেছিল বললে হয়। কোনও রকমে
প্রাণটা নিয়ে রাস নাম জপতে জপতে পালিয়ে এসেছে। মজাটা কোথায় জান—কেটের বল
জুতকে ভর পায় না। তাই এই নির্জন জায়গাটা হল তাঁদের আসল আশ্রয়। গোপন বৈঠকের
গোপনভদ্র স্থান। বৈঠক শুরু হল; সবাই হাজির। বাবু, খোকন, পলা, ফোকলা এরা তো
প্রায় লাফাতে লাফাতেই এসে গেল। সর্দারী কায়দায় সর্দার কেট সবাইকে এ বৈঠকের গুরুত্ব
বুঝিয়ে দিল। সবাই মিলে স্থির হল ঐ দারোয়ান বাটাকে ধ্বংস করতেই হবে।

ভারপর কি হল জান? প্রান অল্পখারী সবাই একদিন সন্ধ্যার একটু আগে আশস্তাওড়ার
গাছের কাছে জমা হল। কেট সবার দস্ত বেখেছিল অস্ত্র ধরনের মুখোশ আর পোশাক। তা



রায়লোচন বলে, 'দিন কতি আরো তো টাং তোড় দেবা'

এবারে ঘটল আরও অদ্ভুত ব্যাপার ! তার চোখ বোলাটে হয়ে এলো, এবং মাথাও ঘুরতে লাগলো। এই হোল মগ পান করার কল। রিপ সেখানেই এবারে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল।

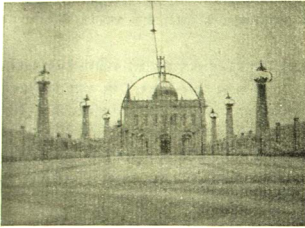
হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল ! ঘুম থেকে উঠে সে দেখে যে, গোলাকার টিলায় প্রথমে যে অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেখানেই সে শুয়ে আছে। চমৎকার স্থানালোকিত সকাল বেলা।



নিজের গায় এসে রিপ ব্যান উইঞ্চল তো অবাক ! এটা কি তারই গা ?—এই কবাই সে বার বার ভাঙতে লাগল।

রিপ তো একেবারে অবাক ! সমস্ত রাত তাহলে সে এখানেই ঘুমিয়েছে ! তার বন্দুকটা সে খুঁজতে লাগল। দেখলে তার পাশে পড়ে আছে একটা মরচে পড়া অকেজো পুঁঝোবো বন্দুক। কুহুর তো কোথায় অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে। তার মনে হোল, ঐ অদ্ভুত ধরনের লোকরা নিশ্চয় তার সঙ্গে কোন চাতুরী করেছে।

ভাবশর ভবে-চিন্তে সে নিজের গায়ের বিকেই এঙতে লাগলো। রাতায় সব নৃতন নৃতন লোকের সঙ্গে দেখা—কাউকে সে চেনে না—সবাই তার অপরিচিত। সে একেবারে অবাক। গায়ের



দুর্গা-মন্দির—অদ্যন্তর

বেদীর ভাগ বাড়ীই এই-
গুলিতে আশ্রয় নিয়ে থাকে।
স্টেশন থেকে শহর খানিকটা
দূর বলেও এখানে থাকার
সুবিধা।

আমরা ধর্মশালাতে
আহারাদি সেবে খানিকটা
বিজ্ঞান মি লা ম—তারপর
শহর দেখতে বা'র হলাম।

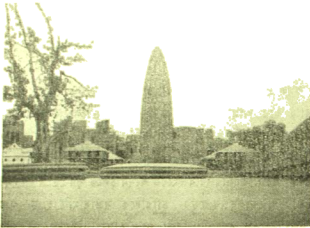
শহর এমন কিছু নয়,
সাধারণতঃ পশ্চিমের শহর
যেমন হয়ে থাকে—তেমন।

পুরোন অংশের বাড়ী-ঘর

পুরোন—গোকানঘরের খ্রীষ্টান বেই—পথগুলিও সরু সরু গলি-ঘুঁজিতে ভর্তি। যে অংশটা নতুন
তৈরী হচ্ছে—সেটুকু চোখে ধরার মত। চওড়া-চওড়া পথ—বাড়ী-ঘর-দুটোর আধুনিক ছাঁদের—
মাকে মাকে পার্ক আছে। বান-বাহনও নতুন পুরাতন মিশিয়ে—মেটর, টাক্সি আর সাইকেল-
রিকশা। একার কাল শেষ হয়েছে—সারা ভারতবর্ষে কচিং দু'একটি শহরে ওর দর্শন মেলে।

আমরা টাক্সির চোপে শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। পুরোন শহরের অনেক গলি-ঘুঁজি
পার হয়ে দুর্গা-মন্দিরের পাশের গলিতে গাড়ী ধাঁড়াল।

মন্দিরের চারধারে সরোবর—ঋণ-মন্দিরের অঙ্কুরণে তৈরী বলে মনে হ'ল। খুব খোলা-
মেলা আয়গায় চমৎকার সাজানো-গোছানো পাথরের মন্দির। মন্দিরের বেষ্টীতে মূর্তি আছে
তিনটি—দুর্গা-মূর্তি কোনখানেই দেখলাম না। অথচ মন্দিরের নাম দুর্গা-মন্দির। হাতখানে
রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ—হুঁপানে রামসীতা আর রাধাকৃষ্ণ। মূর্তিগুলি মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ
ও অলংকার দিয়ে হুন্দর করে সাজানো। বেষ্টীর সামনে খানিকটা ফালি আয়গা, মন্দির-নাট্যমন্দির
মিলিয়ে একটি প্রকাণ্ড হলঘর, তার হাতখানে জামিন তাকিয়া পাতা প্রকাণ্ড এক আসন। সেই
আসনে পাথর, বাস্তর ও শ্রোতার মল বসে ভজন গান পরিবেশন ও উপভোগ করছেন। সবটাই
ঋণ-মন্দিরের মত। দুর্গা-মন্দিরের পরিবেশটি চমৎকার। রাত্রিতে আরও হৃদয় দেখায় আলোক-
সজ্জার মন্ত্র।



শহীদ দণ্ডিরস্ত—জালিনওয়ালাবাগ

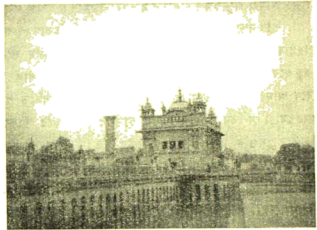
মধ্যে। কত লোক যে
হতাহত হ'ল তার সীমা
সংখ্যা নেই! প্রায় হাজার
জন গুলির মুখে আত্মহতী
দিল—আহত হ'ল বেড়
হাজারের উপর। সারা
ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল
জালিনওয়ালাবাগের এই
আত্মহত্যার গল্প। জালিন-
ওয়ালাবাগ অমর হয়ে রইল
ইতিহাসের পাতায়।

গাড়ী থেকে নেমে

আমরা বাগানের কটকের সামনে এলাম। কটক পেরিয়ে কাঠের ফলকে পড়লাম—সেই দিনের
বক্তাক্ষ ঘটনার কথা। বিষয় মনে গুরু করলাম উদ্ভান-পরিক্রমা—তেতাল্লিষ বছর আগেকার সেই
ভয়ংকর দিনের মৃত ও মৃত্যু আত্মাগুলি যেন আমাদের আশেপাশে নিঃবাস ফেলছিল। আমরা সেই
ঈশ্বার কান্ধে এলাম—বার গর্ভ থেকে একশে কুড়িটি শহীদের মৃতদেহ তোলা হয়েছিল। এগিয়ে
এলাম—হু-উচ্চ শহীদ স্তম্ভগুলির পাদদেশে। এগুলির গঠনশৈলীতে বিষয় গান্ধীর্ষের ছায়া লেগে
আছে। এর কাছে এগে দাঁড়ালে একই মনে চোখে মল আনে—মন গৌরবমহিমায় অভিভূত হয়।
আপনি মত হয় শিব। সেখানে প্রদক্ষিণ করে আমরা উদ্ভানের সীমানার বাড়ীগুলি দেখতে লাগলাম।
সেখানে প্রতিটি দেওয়ালে গোলাগুলির ক্ষতচিহ্ন; সারা উদ্ভান বর্বর জন্তর নখরস্তের আঘাত-চিহ্নে
প্রজ্বলিত। দুঃখতির ভার নিয়ে বেশিক্ষণ ওখানে থাকা যায় না। আমরা বেরিয়ে এলাম।

পথের দ্বাধারে কত পণ্য-সস্তার—কত সাধনজ্ঞা বিপণির। মন ভারী হয়ে ছিল বলে
সেগুলি ভাল করে দেখা হয়নি। ভারী মন নিয়েই আমরা বিখ্যাত শিব গুরুদ্বার স্বর্ণ-ব্রহ্মিরের
সামনে এসে নাযলাম। গুরুদ্বারে প্রবেশ করার আগে মাথার কিছু আচ্ছাদন দেওয়া নিয়ম।
বাসের মাথায় টুপি বা পাগড়ী নেই—তারি মাথার একখানা রুমাল বেঁধে নেয়। আর মন্দির
সীমায় ঢুকবার আগে পায়ের জুতো খুলে পা ধুয়ে নিতে হয়। মন্দির সীমা বড় কম বিস্তৃত
নয়—তার মধ্যে জুতো পরে খুঁবে বেড়ানো একমহ চলবে না। মন্দিরটি বিশাল সরোবরের
মাঝখানে অবস্থিত। সরোবরের লাগাও প্রাক্নটিও কম বিস্তৃত নয়। এ-পারের প্রাধনে

ধাড়িয়ে ও-পারের মানুষকে
চেনা যায় না। মন্দিরটি
আকারে ছোট হলেও—
সর্বাঙ্গ কালকার্য করা।
মাথাটা সোনার পাতে বোড়া।
—কিংবা সোনালী কাপ
করা। নানা ধরনের
নকশার আগাপোড়া ভর্তি।
ভিতরে দেবদেবীর কোন
মূর্তি নেই। গ্রন্থদাহেবই এই
মন্দিরের প্রধান দেবতা।
শিব গুরুবা বেগব উপদেশ

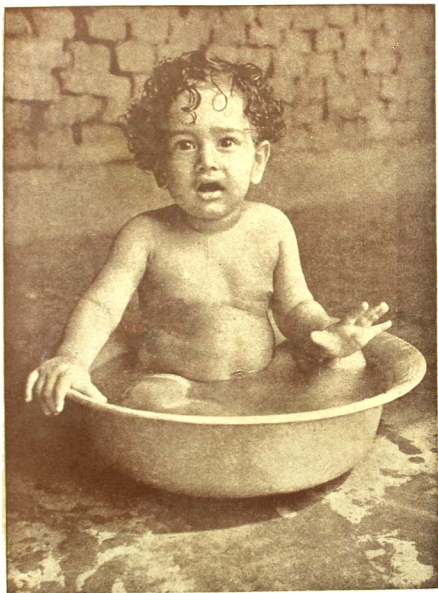


মন্দির—মন্দির

ও অহুশাসন দিয়ে এই ধর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন—সেইগুলি লিপিবদ্ধ আছে
বইয়ে। সেই গ্রন্থকে দেবতার বেরীতে বসিয়ে বহুমূল্য আভরণ ও আচ্ছাদনে ভূষিত করে
ভজনা করার ব্যবস্থা দেখলাম। ইনি শিবেবের আদিত্যেবতা গ্রন্থদাহেব। ঐর সামনে ধূপ-দীপ
জালিয়ে, ফুলের মালা দিয়ে, ভজন-সংগীতের আদর বসিয়ে অর্চনা চলছে—সারা প্রহর ধরে। তক্তি-
নম্র শিব নরনারী যেরেয় মাথা লুটিয়ে প্রণাম করছে—গুরুদাহের ধুলো তুলে মাথায় বিচ্ছে—
প্রদক্ষিণ করছে মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ পথের ধুলো সাক করছেন কোন কোন ভক্তিমতী যেরে।
আবার ইধাবার ধারে দেখলাম—জলপান করে যাত্রীরা চলে যাবার পর—ভাণের উচ্ছিষ্ট পান-
পাত্রগুলি মেঝে-ঘষে পরিষ্কার করছেন সন্ন্যাস ঘরের যেরেয়া। মাহুকের সেবা সকল ধর্মেরই একটি
প্রধান অঙ্গ। ধর্মের আচার-অহুঠানগুলিকে ঠিক ঠিক অর্থ বুঝে পালন করতে পারলে মানি সমার
অবকাশ থাকে না; কিন্তু গোড়ামীর লব্ধই যত অঘটন, অহুবিধা। গুরুদাহের সেবার দৃষ্টান্তগুলি
উজ্জল।

মাইকের সামনে বসে ভজন-গান করছিলেন গায়করা। অত বড় জাহাজের সেটা ছড়িয়ে পড়ে,
হুয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছিল আকাশ-বাতাস। দলে দলে আসছেন শিব নরনারী। হৈ চৈ,
ঠেলাঠেলি, হড়াহড়ি নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন তক্তি-নম্র যাত্রীদল—মন্দির-পরিক্রমা করে
যেরেয়ে আসছেন ধীরে ধীরে। চমৎকার শৃঙ্খলাবোধ। দেহে বা মনে দিব্যপ্রসঙ্গ ভাব; তপ্ত ধূপ
চোখ—বচ্ছন্দ গতি। ক্লান্তি অমছে না।

শারদীয়া মৌচাক, ১৩৬৯



কেমন যজ্ঞ !

কটো : ত্রিহৃত ত্রিশটি

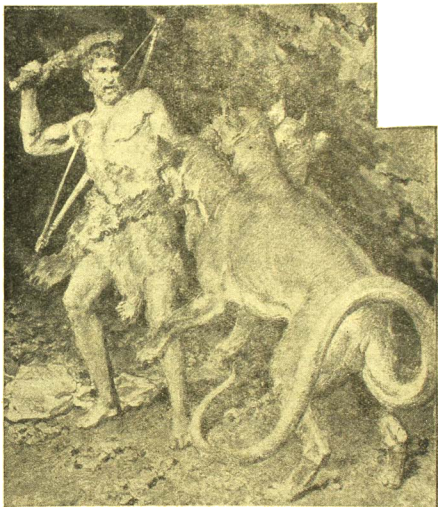
শারদীয়া মৌচাক, ১৩৬৯



ভয় পেয়েনা—মুখোঁস!

কটো : শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

আমার কাজ আজ শেষ হয়েছে, আপনার কথা মত দিরিবারাসকে এখানে ধরে এনেছি। এখানে উপস্থিত অস্ত্র কেউ যদি পায়ে একে অস্ত্রজে নিয়ে থাক। এ কাজ আমার নয়।



তিন মাথা দিরিবারাস কুবুড়দের বন্দী করার অস্ত্র হারকিউলিস তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে

রাজ্য ধরবারের মাচ, গান, হাসি সব এক মিনিটে থেমে গেল। চারিদিকে উঠলো কান্নার ঘোল। সকলেই এখন প্রাণ নিয়ে জ্বল। প্রকাণ্ড মৃগের হাতে নিয়ে হারকিউলিস পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেবতার কি তাকে আর কোন দিন নতুন কর্মভার দিতে সাহস করবে?

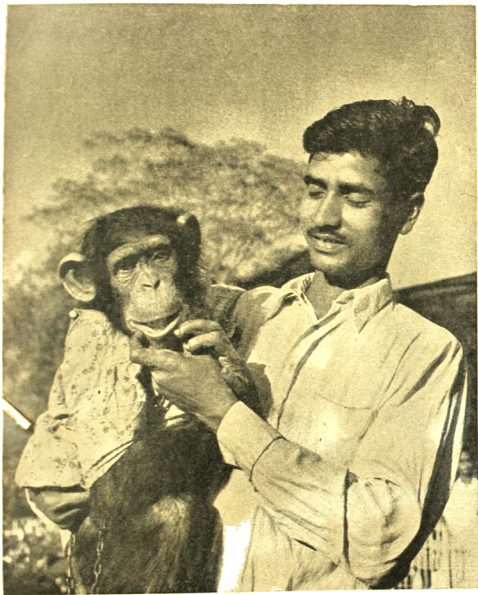
মোচাক—কাভিক, ১৩৬২



পোজ দিয়েছে পুশি

কবিতা : শ্রীভোলানাথ বৈ

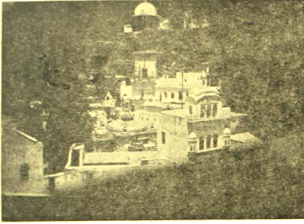
মোটাক—অগ্রহাট,



মুখখানি কি চমৎকার !

কটো : শ্রীমতি পদ্মাশাখার





আশাখুঁ-বন্দির

নেওরা হয়। আর সেই মত দণ্ডে দণ্ডে ভোগরাগের ব্যবস্থা। মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্তি নেই। বেঙরালের গায়ে অনেকগুলি কুলঙ্গি মত আছে—সেইগুলিতে প্রার্থীর সিংহাসন মত আসন জলছে। কোনটি স্থির—কোনটি চঞ্চল—কোনটি স্থল—কোনটি বা অপেক্ষাকৃত স্থল। সিংহগুলি সব সময়ে জলে না। ভোগ ও আরতির আগে মন্দির-দুয়ার খুলে পুরোহিত জালিয়ে দেন। কেবল দুয়ারের কাছে যে কুণ্ডটি আছে—তার মধ্যকার আসনটা সব সময়ে জলছে।

পণ্ডিতরা বলল, এই পাহাড়ের মধ্যে পেট্রোল, গন্ধক প্রভৃতি দাহ পদার্থ থাকতেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। কয়েক বছর আগে পেট্রালের সন্ধানে একটা পরীক্ষাও চলেছিল এই পাহাড়ের তলার। কিন্তু মাকপথে একটা বড় পাথরে আটকে বাধ ভূরপুনঃ বস্ফট—কাল বস্ফ রয়েছে সেই থেকে। শেনা গেল—আমেরিকা থেকে আর একটা শক্তিশালী ভূরপুনঃ বস্ফ আনিবে পাথর ভেদ করার ব্যবস্থা হবে শীঘ্র।

ওই আসন দিনরাত জলছে কেন—একি সত্যিই দেবী-মহাশক্তি, না কোন নৈসর্গিক ব্যাপার—এ সম্বন্ধে সব ঘূর্ণের মাহুকের মনেই উঠেছিল। সেকালের একটা গল্প করলেন পাণ্ডারা—আর সেটা যে গল্পমাত্র নয় তার প্রমাণ-চিহ্নও দেখালেন।

পাণ্ডা বললেন : অনেককাল আগে হিন্দুস্থানের বাদশা আকবরের মনেও এমনি সম্বন্ধ জেগেছিল—একি সত্যিই দেবতার লীলা, না দেব-মহাশক্তিকে প্রচার করার মন্ত্র মাহুকের কারশালি ?

শেয়ালের চালাকি

(গীতালি উপকথা)

শ্রীমতীলা মুখোপাধ্যায়

এক বনে এক বাঘ ও বাঘিনী তাদের দুটি ছানা নিয়ে বাস করতো। প্রতিদিন তারা ছানা দুটিকে বাসার বেধে বনের মধ্যে শিকার করতে যেত। নিকটেই একটা শেয়াল থাকতো। দিনকাল এমন পড়েছিল যে, শেয়ালটা পেট ভরে খেতে পেতো না। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে বাঘের বাসার কাছে এসে দেখতে পেলে, ছানা দুটি অনেকটা হরিণের মাংস খাচ্ছে।

শেয়াল মহাগম্ভীর মূর্তি ধরে তাদের ধমক দিয়ে বললে, “তোরা এত মাংস কোথায় পেলি বল? আমি রাজার সেপাই, তিনি আমার হরিণের মাংস আনবার জন্য বলে দিয়েছেন, সারা রাজ্য খুঁজে এক টুকরা মাংস পেলাম না, আর তোরা এত মাংস খাচ্ছিস? এখুনি মাংস আমার দে, নইলে জোর করে কেড়ে নেব, আর রাজার কাছে তোদের নামে নালিশ করবো।”

বাঘের ছানা দুটি শেয়ালের কথা বড় ভয় পেলে। কি করে, তখনি তাকে মাংসটা দিয়ে দিলে। ভারী খুশি হয়ে শেয়াল মাংস নিয়ে গিরে পেট ভরে খেলে।

পরদিন সে সেইরকম সময়ে এসে বাঘের ছানাদের ভয় দেখিয়ে আবার মাংস নিয়ে গেল। এই ভাবে রোজ রোজ ছানাদের ঠকিয়ে তাদের খাবার সে খেতে লাগল। বাচ্চাগুলি না খেতে পেরে দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলো। বাঘ ছেলেদের দশা দেখে মনে মনে ভাবলে, এর কারণটা



‘রাজার কাছে তোদের নামে নালিশ করবো।’

কি? দেখতে হবে। একদিন শিকারে না গিরে সে কোপের মধ্যে চূপ করে বসে রইল। শেয়ালটাও অন্য দিনের মত ছানাদের ঠকিয়ে মাংস নিতে এল। মাংস নিয়ে সে বখন চলে বাচ্ছে, বাঘটা শুখন দব ব্যাপার বুঝে ভারী রেগে গেল। শেয়ালটাকে মেয়ে কেলবার মতো সে ভাড়া করলে। প্রাণের ভয়ে শেয়াল চোঁচা দৌড় দিলে। বাঘও পেছনে পেছনে ভাড়া করতে



আমি,
ছুতুল,
দিপু-

আমাদের সকলেরই ভালো লাগে—

মার্গো সোপ

এর প্রচুর নরম ফেনা কোমল চামড়ার
পক্ষে সত্যিই খুব ভাল।

নিম্ব টুথ পেস্ট

ব্যবহারে দাঁত ঝক্‌ঝকে ও মাজী শক্ত
হয় এবং দাঁতের অম্ল হয় না।

ক্যান্ডরল

মাথায় মেখে স্নান করলে কি আরাম।
ভাছাড়া মাথায় কত চুল হয়।



দি কাল কাটা কে মি কাল কোং লিঃ



এমনাবেজা, কোয়ানিমোভো ও গির্জার ঘণ্টা

বধ্যস্থানে নিরে বাবার সময়/সুলভ দড়ির সাহায্যে এই অদৃশ লোকটি মেয়েটিকে গির্জার এক অদৃশ গজ্ঞার টেনে নিরে গেল। পুঠান ধর্মের নিয়ম : উপাসনার স্থানে কেউ আশ্রয় নিলে তাকে আর গ্রহণার করা বার না। যে অদৃশ লোকটি এই মেয়েটির প্রাণরক্ষা করেছিল, সে কোয়ানিমোভো বা গির্জার কুঁজো লোকটি। কোনো রাজা বা কোনো মৈন্য গির্জার পবিত্র আশ্রয় হতে মেয়েটিকে আর জোর করে নিরে বেতে পারবে না।

সৈন্যদের হাত হতে মেয়েটি পরিত্রাণ পেল বটে, কিন্তু প্যারি সহরের ভবঘুরে বেদেরা এই মেয়েটির সম্বান করতে লাগল। তারা তাকে নিজেদের দলে কিরিয়ে আনবেই। গির্জা আক্রমণ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করবে—এই হোল তাদের অভিসন্ধি।

গভীর রাতে এই ভবঘুরের দল একত্র হয়ে মেয়েটির উদ্ধারের জন্য চিংকার করতে করতে

এই ছোট মেয়েটি একটা ছাগলের দাক্ষ্য সঙ্গে নিরে প্রাচীর গির্জার সামনে এসে দাঁড়াতো। ছাগল নিরে সে নানারকম খেলা সকলের সামনে দেখাতো। কোয়ানিমোভো মেয়েটির খেলা দেখতে দেখতে তার ঘণ্টা বাজানোর কাজ তুলে বেত।

বেদের মেয়ে বলে তার অনেক শত্রু ছিল। এই শত্রুরা মেয়েটিকে একদিন বন্দী করে হত্যা ও 'ডাকিনীর' অপরাধে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দিল। বিচারকরা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলো। কিন্তু সেই সমরকার নিয়ম অংশারে তাকে নোতার দাম গির্জার সম্মুখে নিরে যাওয়া হোল। গির্জায় তাকে দোষ স্বীকার করতে হবে. এবং তারপর হবে তার ঠান্ডা।

গির্জার ভিতরে পাঠীদের সম্মুখে যখন এই বেদেনী-কন্যা তার পাপের জন্য অত্যাচার ও প্রায়শ্চিত্ত করছিল, তখন একজন দর্শক গির্জার অন্ধকার স্বর্গশের মধ্যে থেকে এই সব দৃশ্য দেখছিল। স্বর্গ-পথের স্বর্গের সঙ্গে সে একটা ফাঁসমুক্ত দড়ি তুলিয়ে দিল। গির্জা থেকে বেদেনী-কন্যাকে

মৌচাক—পৌষ, ১৩৬৯



শীতের কুয়াশা

কবি : শ্রী অশোককুমার কল্যাণাখ্যায়



ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটক

টু সীলরা পিছনের পাখনা দুটি বৈকিয়ে সামনে আনতে পারে না। কাজেই ডাঙ্কার এদের চলাফেরা অনেকটা শুঁহাশোকার মত। শুঁহাশোকা যেমন একবার শরীরটাকে টান করে ও গুটিয়ে চলে—এটাও বুক ও পাখনার সাহায্যে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলে। এইভাবে এরা একজন দ্রুতগামী লোকের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে।

সীল ও ওয়ালরাসদের শরীর নাহুস-হুহুস, তেলতেলে ও ছিমছাম এবং পায়ে পুরু চবির ত্বর থাকতে মেক অকলের নীতে এবং কনকনে ঠাণ্ডা জলেও ওদের মোটেই কষ্ট হয় না। এলিফেণ্ট, জ্যাব-ইটার, ওয়েডেল, লেপার্ড, বিহারডেড, হুডেড, হারপ,

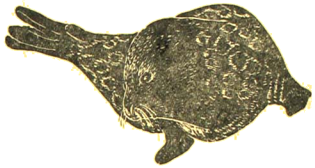
রিংড, রিবনড, গ্রে হারবার প্রভৃতি প্রায় আঠার বকমের সীল আছে।

ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটকরা হলো সীল পরিবারদের মধ্যে আর একটা দল। এদের মধ্যে দুই বলেরই বিশেষত্বটুকু দেখা যায়। এরা কানওয়ালা সীলদের মত পিছনের পাখনাগুলো বৈকিয়ে এনে পারের মত ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু টু সীলদের মত এদেরও কান নেই—আছে হু'পাশে দুটো ছিদ্র। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো—এদের উপরের মাড়ির হু'ধারের দুটো গজ-দাঁত হাতীর দাঁতের মত বাইরে বেরিয়ে থাকে। নামে 'ঘোটক' হলেও ডাঙ্কার ঘোড়ার সঙ্গে এদের চেহারা বা স্বভাবের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সীলদের প্রধান বাগ্ন মাছ, জিল ইত্যাদি। তবে কয়েক জাতের সীল আছে যারা কয়েকটি বিশেষ ধরনের বাগ্ন পছন্দ করে। জ্যাব-ইটাররা কাকড়া অক্টোপাস ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এলিফেণ্ট সীলদের প্রিয় বাগ্ন হুইড। বিহারডেড সীল ও ওয়ালরাসদের প্রিয় বাগ্ন হলো। শামুক ও গুলি জাতীয় প্রাণীরা। লেপার্ড সীলদের প্রিয় বাগ্ন হলো পেনগুইন ও অন্যান্য সামুদ্রিক পক্ষী।

সীল ও ওয়ালরাসদের মধ্যে এলিফেণ্ট সীলরাই আকারে সব চেয়ে বড় হয়। এদের নাকটা

প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং হাতীর
 ঠাণ্ডের মত মুখের সামনে ঝুলে
 থাকে। তবে হাতীর মত লম্বা
 নাকটা ওরা অস্ত্র কাজে ব্যবহার
 করতে পারে না। এরা এক-
 একটা ওজনে ষাট-সত্তর মনের
 মত হয়ে থাকে এবং লম্বায় দশ-
 বার হাতের মত হয়। গায়ে
 রং হয় মোটে-বাদামী এবং সাদা



রিংড সীল

গা মোটা ও কর্কশ লোমে ভর্তি থাকে। এদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের সাউথ জর্জিয়া দ্বীপে দেখা যায়।

উত্তর মেরু অঞ্চলের সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে যে সব হুডেড সীল দেখা যায়, তাদের দেখতেও অনেকটা এলিফেন্ট সীলের মত। এরা 'ব্রাবার পোসড' সীল নামেও পরিচিত। এদের নাকটা এলিফেন্ট সীলের নাকের মত সামনে ঝুলে পড়ে না। তবে নাকের গোড়াটা ওরা বেলুনের মত ফোলাতে পারে। ফোলান অবস্থায় এদের নাকটা সাপের কণায় মত দেখায় বলে এদের এই নাম হয়েছে। হুডেড সীলদের গায়ে রং কাল-বয়েসী।

জ্যাক ইটারদের বাগ কুমেরু অঞ্চলে। হুম্বল মহাদেশে জমাট বরফ-স্তরের মধ্যে যে অবলম্ব বাতাস থাকে সেখানেই এরা বাসা বেঁধে থাকে। বরফের মধ্যে গর্ত করে মাঝে মাঝে মাথা উঠিয়ে হাওয়া টেনে নেয়। এদের প্রিয় খাদ্য কঁকড়া। এরা কঁকড়ার সঙ্গে ছোট ছোট পাখরও খেয়ে কেলে। বাতে কঁকড়ার শক্ত খোলা পেটের মধ্যে গিয়ে পাখরের সাহায্যে ভেঙ্গে বায় ও হজমে সুবিধে হয়। এদের গায়ে রং ধপধপে সাদা।

ওয়েডেল সীলদের দক্ষিণ মেরুর সমুদ্র অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এরা সাধারণতঃ দল বেঁধে একই জায়গায় থাকে। এরা প্রায় একশ গজ অন্তর অন্তর লাইন করে বরফের উপর গর্ত করে, বাতে গর্তগুলো দিয়ে বরফের নীচে হাওয়া ঢুকতে পারে। গর্ত দিয়ে হাওয়া ঢোকার দরুন এরা বরফে চাপা সমুদ্রের জলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। মাঝে মাঝে অবস্র বাস নেবার জন্য গর্তের মুখে আসতে হয়। এরা বরফে গর্ত করার সময় প্রত্যেক তৃতীয় গর্তটি বেশ বড় করে, বাতে কিলার তিমি বা লেপার্ড সালের আক্রমণের সময় তাড়াতাড়ি বড় গর্তটি দিয়েই জমাট বাঁধা বরফের উপর উঠে আসতে পারে। এদের গায়ে রং হয় নীল ধূসর এবং জায়গায় জায়গায় হালকা কাল রং-এর ছোপ আছে। মুখের উত্তর অংশের লোমগুলো সাদা।



বিয়ারডেড

কৃতসামী। এদের দাঁতও খুব ধারাল, হাঁটিও বিরাট। ছয় সাত হাতের মত লম্বা হয়ে থাকে। এরা ভাসমান বরফের ধারে ওত পেতে থাকে। পেনগুইনরা কাছে এলেই বা জলে নামলে লাক দিয়ে ধরে নেয়। রাফ্‌সে ক্রিডে এদের। একবার একটা লেপার্ড সীলের পেট চিরে উনিশটা সন্ত-ভুত পেনগুইনের দেহ পাওয়া গিয়েছিল।

বিয়ারডেড সীলদের উত্তর মেক অফলেই দেখা যায়। উত্তর মেক অফলের সীলদের মধ্যে এরাই আকারে সব চেয়ে বড় হয়। সাধারণতঃ ছয়-সাত হাতের মত লম্বা হয়। গায়ের রং ধূসরী-ধূসর। বাক্সা বিয়ারডেড সীলদের গায়ে হাল্কা লাল রং-এর ছিটেকোটা দেখা যায়। এদের মুখের উপর বেশ লম্বা লম্বা গোঁক আছে এবং ঐগুলি মুখের দু'পাশে দাড়ির মত কুলে থাকে। এসকিমোদের কাছে এদের মাংস খুব প্রিয়। এদের চামড়া দিয়ে ওর চাবুক, নৌকা, ভতো ইত্যাদি তৈরী করে।

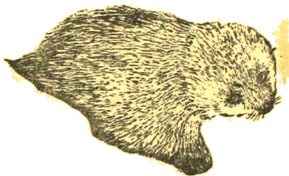
হারাপ সীল, রিংড সীল ও রিবনড সীলদের বাসও উত্তর মেক অফলে। হারাপ সীলদের গায়ের রং হাল্কা ধূসর-বাদামী। মূণ ও মাথা কাল শরীর দু'দিকে ও শিঠের খানিকটার লম্বা চওড়া কাল দাগ আছে। রিংড সীলদের গায়ের রং ধূসর-ধূসরী। সারা গায়ে গোলাকার সাদা হাল্কা রং-এর কাল দাগ। গলার কাছটার ও সামনের পাখনার দু'ধারে ও পিছনের পাখনার উপরের ও নীচের অংশে দাঁড়ের মত চওড়া ও গোলাকার সাদা সাদা দাগ আছে। উত্তর মেক অফলের এই তিন জাতীয় সীলই দেখতে বড় চমৎকার।

হারবার সীলদের আমেরিকার নিউ জার্সি ও উত্তর মহাসাগরের তীর সংলগ্ন নানান জায়গায় দেখা যায়। এরা সীলদের মধ্যে আকারে সব চেয়ে ছোট হয়ে থাকে।

গ্রে সীলদের আটলান্টিকের নির্জন দ্বীপগুলিতেই দেখা যায়। এদের গায়ের রং হয় ধূসর এবং গায়ে সাদা-কালোর ছোপ আছে। বাক্সাদের প্রথম অবস্থায় গায়ের রং থাকে প্রায় সাদা।

সিকুঘোটকদেরও বাস উত্তর মেক অফলে। এদের দেহও হয় বিরাট। এক-একটা প্রায় আট নয় হাতের মত লম্বা এবং ওজননে এক-একটার প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মনের মত। গজদন্তের

মত দু' পানের লম্বা দাঁতগুলো এক-
একটা প্রায় পঁচিশ ইঞ্চির মত লম্বা।
ওলেনে এক-একটা প্রায় চার-পাঁচ
সেরের মত হয়। ওদের দেহ এত
বিরাট হলে কি হবে, ওরা শামুক,
গুপ্লি ও কুচো চিড়ি জাতীয় প্রাণী-
দের খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের
লম্বা দাঁতগুলো দিয়ে ওরা শামুক
জাতীয় প্রাণীদের শক্ত খোলা ডালে



হার্ভ, সীলের বাক্স

ও সমুদ্রের বালি খুঁড়ে শামুক জাতীয় প্রাণীদের খুঁজে বার করে। ভাসমান বরকের উপর নির্জন
দীপে এরা দল বেঁধে বাস করে। বত দূর জানা যায়, দু'বছর অন্তর অন্তর এদের একটা করে বাক্স
হয়। বাক্সা ওদের মায়েদের পিঠে চড়ে বেড়ায় এবং সে সময় সামনের পাখনা দুটে দিয়ে ওদের
মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে থাকে।

সি-লারন বা সিঙ্ক-সিংহদের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। এরা
প্রায় সকল সময় ডাল্ফিন উঠে রোদ পোহায়। এরা পোষ যানে এবং মিস্তকে ও ভত্র। এদের চেহারা
অনেকটা কার সীলদের মত। গায়ের রং ধূসরী-কাল। তবে মোটা লোমের নীচে নরম লোমের
কোন আন্তরণ নেই। এদের ধরে এনে সার্কাসের লোকেরা নানা রকম খেলা দেখায়। এরা
তাড়াতাড়ি সেইগুলি শিখেও বেলে। ইউরোপ ও আমেরিকার চিড়িখানায়, সার্কাসে ও
ছায়াছবিতে যে সব মজার মজার খেলায় রত সীল দেখা যায়, তারা বেশীর ভাগই সি-লারন।

সীলদের বছরে একটা করেই বাক্স হয়। সীল বাক্সা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং
খুব অল্প দিনে সীতারও শিখে বেলে। সীল মায়েদের দুধ গরুর দুধেরও বেশ গুণ বেশী স্নেহ-জাতীয়
পদার্থ আছে। এই স্নেহ-জাতীয় পদার্থ আটলান্টিক গ্রে সীলদের দুধে সব চেয়ে বেশী থাকে। সে
জন্য গ্রে সীলদের বাক্সা দিনে দু'দের থেকে আড়াই সেরের মত বাড়তে থাকে।

সীলদের মধ্যে কয়েকটি জাত আছে যারা বাক্স দেবার সময় প্রাতি বছর কয়েকটি বিশেষ স্থানে
এসে জড় হয়। এই সময় স্থানে স্থানে যে সব সাংঘিক আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে, তাদের ইংরেজীতে
বলে 'সীল ককারী'। এদের মধ্যে দক্ষিণ হেম অঞ্চলের সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের 'এলিফেন্ট সীল ককারী'
ও বেরিং সাগরে অবস্থিত প্রিবিলক দ্বীপের 'কার সীল ককারী' খুব বিখ্যাত।

কার সীলেরা সারা শীতকালটা সমুদ্রে কাটিয়ে জুনের প্রথম দিকে প্রিবিলক দ্বীপে হাজির হয়।



দুই পুরুষ কার সীলের দৃষ্টি

বড় হয়ে ওঠে। পুরুষ কার সীলেরা ঘোপে এসেই সমুদ্র তীরে নিজের নিজের জায়গা ঠিক করে নেয়। এরাও অন্তান্ত সীলদের মত উঁচু পাথুরে জায়গাই পছন্দ করে। সেই জায়গার উপর দিবে যদি কোন পুরুষ সীল যেতে চায় বা দখল করতে চায়, তখনই শুরু হয়ে যায় রক্তারক্তি কাণ্ড। বেহেরে বায় সে পালিয়ে যায়। বিজ্ঞতা পুরুষ কার সীলটিকে বলা হয় ‘বিচ মাঠার’। বিচ মাঠারকে সব সময় হতে হবে শক্তিশালী, সাহসী, দৃঢ় ও মাঝ-মুখে। যে কোন পুরুষ সীল তার অধিকার নিয়ে প্রদ্বন্দ্ব করবে, তাকেই মেরে হাটিয়ে দিতে হবে। কার সীলদের গায়ের রং হয় কাল ধবেরী। পুরুষরা ওজনে সাত আট মনের মত হয়ে থাকে। স্ত্রীরা সে তুলনায় বেশ ছোট্টই হয়—ওজনে এক মন দেড় মনের মত। জুনের মাঝামাঝি সময় থেকে স্ত্রী কার সীলরা একে একে আসতে আরম্ভ করে। তীরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিচ মাঠাররা যে খতগুলো শারে ততগুলো স্ত্রী কার সীলদের নিজের নিজের আঙুলের জড়ো করে। এই জড়ো-করা স্ত্রী কার সীলদের জায়গাকে বলা হয় পুরুষ সীলটির ‘হারেম’। এক একটি পুরুষ কার সীলদের হারেমে চল্লিশটা থেকে একশটা পর্যন্ত স্ত্রী সীল থাকে। পুরুষ সীলদের স্ত্রী সীল যোগাড় করার রকমটা ভারী মজার। যখনই কোন স্ত্রী সীল জল থেকে মাথাটি তুলল, তখনই দেখল তার লক্ষ্য একটি পুরুষ সীল তীরে অপেক্ষা করছে। পুরুষ সীলটি

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এরা আগের বছর ঘোপের বে জায়গাটিতে হাজির হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই হাজির হয় সামনের বছরে। এমন কি বাচ্চারা পর্যন্ত ঘোপের বে জায়গার জন্মে ছিল ঠিক সেই জায়গার আসে পরবর্তী বছরে—যদিও সে সময় ওরা আর বাচ্চা থাকে না। এক বছরে বেশ

সিংহের প্রমের উত্তরে সে বললো, আমাদের ভেতরে এক বয়গোস আছে সে জানে আমরা কেন পালাচ্ছি।



বয়গোস হাত-মোড় করে বললে, 'হে ঐতু !'

সিংহ উত্তেজিত হয়ে বললো, কোথায় সে ?

কতকগুলি সাহসী লোক আক্রমণ করে তাকে বন্দী করে ফেলল। তারা পরামর্শ করে বল, যেখা, তোমার উঠতি বয়েস—এই বয়েসে এত বীরত্ব দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি; সেজন্য তোমাকে মেয়ে ফেলতে চাই না। তবে তুমি আমাদের যে বন্ধুদের মেরেছ, তাদের মস্তকের দাম যদি দিতে পার, তাহলে তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব। কিন্তু তোমাকে এরকম ভাবাতি করা



সেদন বহানসের কাছে আস্তে আস্তে কাহিনীটি শুধিয়ে করতে লাগল।

ছেড়ে দিতে হবে এবং শপথ করতে হবে। তোমার বা শক্তি ও বীরত্ব ভাতে অনায়াসেই পারস্তের স্বলতান তাঁর রেসালার তোমাকে চাকরি দেবেন !

—“রক্ত-মূল্য দশ হাজার দিনার দ্বিগুণ করা হ’ল। একথা শুনে হৃৎক উত্তর মিল, ‘দাম দিতে রাজী আছি—এমনকি দশ হাজারেরও বেশী, কিন্তু আমার কাছে অত দিনার নেই। যদি তোমাদের

মৌচাক—মাঘ,



বন্দীর মুক্তি

বিখ্যাত চিত্রকর জন দিলায়েস অঙ্কিত। বন্দীর দুর্ভাগ্য বাবেশ এসেছে। হুঁ ও লগ্গান ক'ছেই।

মৌচাক

[৪৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

হোট খেয়ে

রক্ত-ঝরা

মাড়িয়ে কাটা

চলবে হুঁরা

দীর্ঘশ্বাস পড়বে না পড়বে না ।

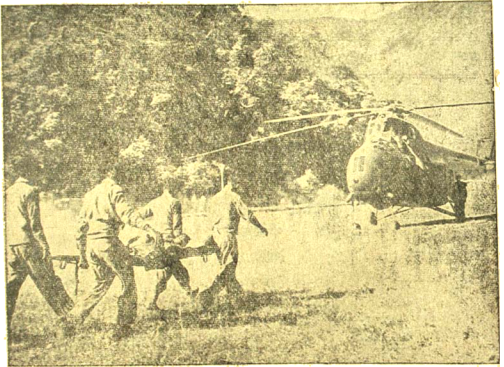
সৈনিক সে

নির্ভীক সে

অগ্রদূত

মানবতার

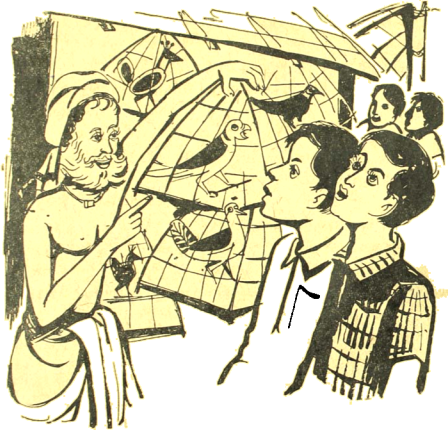
চরণ কতু টলবে না টলবে না ।



বেকার রণাঙ্গনে আহত একটি সৈনিককে হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছে ।

দেখতে আর হল না; শোনা গেল দেখতে না দেখতেই। খানিক বাসেই পাখিদের কিচির মিচির কানে এল ওদের। সেই পাখোরাঝি গানের অহসরণে একটু না বেতেই পাখির বাজার দেখা হিল। খাঁচায় খাঁচায় পাখির ভটল্লা। পাখির হুলা।

‘আমাদের একটা ভোতাপাখি দাও তো।’ এক বোকানীকে গিয়ে তাঁরা বললে।



হর্বর্ধন আর মোবর্ধন পাখিওয়ালার নানা এর করতে লাগল।

‘কি রকম ভোতা? শিকিত, অধিশিকিত, না, উচ্চশিকিত?’ জানতে চাইল পাখিওয়ালার।

‘কি রকম উচ্চশিকিত?’ কৌতূহল হয় হর্বর্ধনের।

‘বাংলা জানে, হিন্দী জানে, উর্দু জানে, তামিল জানে...’

এভাবে দিনের পর দিন নতুন নতুন যন্ত্রপান্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেদের জয় করে চলেছে। প্রকৃতির ব্রহ্ম ডের করে অসংখ্য বকবের প্রাণবাতী অস্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং মানুষজাতির বিকছেই আবার সেগুলো প্রয়োগ করেছে। যে যন্ত্রপান্ত্র মানুষ তৈরি করেছে তা ঘোষ করবার ক্ষমতা তার নিম্নেরই নেই। কামান ত মানুষই তৈরি করেছে। কিন্তু আকাশ থেকে যেমন বহুপাত হয়, তেমনি কামানের মুখ থেকে যখন গুলি হয় মৃত্যুবরণ, তার সামনে কি ঠাঁড়তে পারে কোনো সৈন্তবাহিনী? বড় কামানের একটি গোলা সবকিছু ছারখার করে দিতে পারে। গোলা বেখানে পড়ে তার চতুঃসীমানার প্রাণের চিহ্ন থাকে না, স্বর্ধকয়োল্লসল হরিং কেবল নিমেষে অশ্রুতে পরিণত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ আজও পর্বন্ত পৃথিবী থেকে লোপ পেল না, দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। যেদিন লোকে বুঝবে যুদ্ধ ব্যাপারটা এত ভীষণ হয়ে ঠাঁড়িয়েছে যে যুদ্ধ অসম্ভব, আর যুদ্ধ করাই চলবে না—সেদিন সম্ভবতঃ পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ হবে। কিন্তু সে কবে?



গাজাকের প্যাংগে লোক অঞ্চলে আমেরিসের লোহাঘরা শত্রুর সন্ধান ঘুরছে।

কিশোরীদের শব্দ হল কিশোরদের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলবে। আসলে ক্রিকেট খেলার ওস্তাদ হচ্ছে ছেলেরা, আর মেয়েরা, কড়িবেলার। ক্যামামবোর্ড, কানামাছি, কোটবন্দী, কুমীর-কুমীর—এ-সব মেয়েরাও খেলে। কিন্তু ক্রিকেট? ছেলেরা পই-পই ক'রে নিষেধ করল। তবু গুনছে কে? মেয়েরা খেলবেই। কার্ডিক মাসে 'ক' আছে। অতএব এইটাই ভাল সময়। ছেলেরা কিস্তি করতে গেল। কাবেরী তাড়াতাড়ি এসে ব্যাট ধরলে। কেটি বোলিং-এ ওস্তাদ। বন্ধুকের গুলির মত বন্দু ক'রে বল ছুটল। বাসু, সঙ্গে সঙ্গে কাবেরী ব্যাট কেলে ধৌড়। এক বলে আউট। এবার এল কাকন-মালা। ছিপ-ছিপে কর্সা মেয়েটি। সাহস আছে, গালাল না। কিন্তু ব্যাট দিয়ে যেই-না বল মেয়েছে অমনি সেটা সটান লাকিরে উঠে লাগল ওর নাকে। তখন ধপাস ক'রে মাটিতে পড়েই ঠাঁতকপাটি। নাক দিয়ে রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগল। ক্রাবের কিশোরীরা হাউমাউ ক'রে কঁদে উঠল। প্রথমে খুবই লজ্জা পেয়েছিল ছেলেরা, কিন্তু ব্যাপার হুবিধে নয় দেখে ওরা জল আনতে গেল ধৌড়ে। কেউবা গেল ডাক্তার ডাকতে। হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার। খবর পেয়ে কাকন-মালায় মা, কাকিয়া, দিদি, ঠাকুরমা সবাই এসে কাঁদতে লাগল : ওরে কি হল রে, কাকন, তুই আমাদের ফেলে কোথায় গেলি রে—

সকলের চীৎকারকে টেকা দিয়ে ঠাকুরমার গলা শোনা গেল : ওরে কি হল রে—ওরে কাকন রে।—

কেণ্টু ভাবলে, কেরির কথাই ঠিক হল। সত্যিই ক্রাবটা ঠাকুরমা হয়ে গেল।



ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শেখ অলম্বারহুৎও প্রতিরক্ষা তহকিমে দিয়ে নিচ্ছেন।

সাপ ও বৈজি

সংকটপূর্ণ ও নিম্নল অবস্থ; তার কালো নাকটা সামান্য একটু কাগছে—সে এখনও মরেনি—
এই অবস্থায় বৈজি গোবরো সাপের সামনে ঠাঁড়িয়ে আছে। স্বযোগের অপেক্ষায় আছে—যখন সে
সাপকে ভীষণ আঘাত করবে।

শেষ মুহূর্তে সাপ ফণা তুলেছে, তার বিবাক্ত বিষদাঁত ও জিভ বের করেছে, মাথাটা সে এগিয়ে
দিয়ে বৈজিকে কাষড়ে বিষ ছেড়ে দেবে। কিন্তু হায়! দুর্গন্ত বৈজি একপলকে দেহের সমস্ত লোম



বৈজি ও সাপের লড়াই

কুলিয়ে একধারে বৈকে এক সেকেন্ডও কম সময়ের মধ্যে তাঁর ভীষণ দাঁত সাপের গলার গভীরভাবে
বসিয়ে দিয়েছে। দেখতে বৈজিকে একটা সামান্য নিরীহ জন্তু বলেই মনে হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকা
মহাদেশের সর্বত্রই বৈজিকে দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষের বৈজির নাম-ডাকই খুব বেশী।
আকারে এটা প্রায় সাধারণ বেড়ালের মত। এর লোমের রং বাগারী ধূসর—সাদার ও বুকের কাছে

মৌচাক—ফাল্গুন, ১৩৬৯



দু'টি হাঁস

কিন্তু দিন চলে গেল; শূকরছানাটা আর কিরলো না। পরদিন বুড়ী বেধে, তার শাশা মুরগীটাও নেই। বুড়ী কারণ জানতে চাইলে শেয়াল পূর্বের মত এবারও জানালো, মুরগীটা ঐ ক্ষেতে গেছে, এখনি কিরবে। কিন্তু শাশা মুরগীটাও কালো শূকরছানার মত হারিয়ে গেল। আর বাড়ী কিরলো না।

সন্ধ্যাতে বুড়ী দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে মুরগীর ঘরের পাশ দিয়ে বাড়িলো। বেয়াল হতে একবার ওদের ঘরের ডেতর চুকলো। ঘরে ঢুকেই বুড়ী দেখে মুরগীগুলো ভয়ে ঘরের এদিক থেকে ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর প্রাণপণে চীৎকার করছে। হঠাৎ বুড়ীর চোখ পড়লো দরজার দিকে। দেখে—তার আদরের শেয়াল একটা মুরগীকে মুখে নিয়ে চোরের মত পালাচ্ছে।

বুড়ী টেচিয়ে উঠলো—তবে রে ছটু শেয়াল, তুই তাহলে আমার সাধের শূকরছানা আর মুরগীটাকে সাবাড় করেছিস; আবার নিয়ে চলেছিস আরেকটাকে! কিন্তু একে তুই সাবাড় করতে পারবি না। এই বলে বুড়ী তার হাতের দুধের বাটিটা ছুঁড়ে মারলো শেয়ালকে।

আঘাত খেয়ে শেয়ালের মূখ দিয়ে বেই কাতরোজি বেরিয়েছে, অমনি মূখ থেকে খসে পড়লো মুরগীটা। আর একটুও ঘেরি না করে মুরগীটাকে ছেড়ে শেয়াল আশ্রয় নিল পাশের ঝোপে। কিছুদূরে গিয়ে সে তাকিয়ে দেখে দুধে ভিজে তার লেজের শেয়াংটা হয়েছে দুধের মত শাদা।

বুড়ীর বেগুয়া এ কলঙ্ক শেয়াল আর কোনও দিন মোচন করতে পারলো না। চিরকালের মত একটা শাশা দাগ থেকে গেল লেজটাতে। সবাই জানলো শেয়াল বড় দুর্ভ—স্বযোগ পেলেই কতি করে।

চিড়িহাথানার গিরে বুড়ীর বেগুয়া এ দাগটাকে তোমরা একদিন দেখে এসো, কেমন?





বাস্তবের ঘটিতি শূন্য পাত্র

মুখ বাহ্যিকের মন উদ্ভাস্ত ।

কবী—তোলানাথ দেব

ইলেক্ট্রিক মাছ



হাজার হাজার বছর আগে, মানুষ ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী বা ডায়নামো আবিষ্কার করার অনেক আগে, মাছ ও চাষা গাছরা ইলেক্ট্রিক উৎপাদন করে আসছে। এর মধ্যে ইল মাছ সবচেয়ে বেশী ইলেক্ট্রিক উদ্ভাবক। এই ইল মাছরা এদের দেহে বৈদ্যুতিক স্রোত উৎপাদন করতে পারে। বৈদ্যুতিক ইল সাধারণতঃ দক্ষিণ আমেরিকার কারা-ভলে বাস করে। নমুনা হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন aquarium এ এদের রাখা হয়। যদিও এরা মাছ নামে অভিহিত, কিন্তু এদের বৈদ্যিক গঠন মাছ হতে ভিন্ন।

এরা লম্বায় সাত ফিট এবং এদের গায়ের রং বাদামী ও কালোতে মেশান। এদের মাথা এবং দেহ শরীরের মাত্র একের আট অংশ। আর সমস্তটা এদের ল্যাম্ব—এই ল্যাম্বই থাকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর কোষ। এই ল্যাম্বের আছে স্ফেরিক মত কোষের সমষ্টি, যাকে বলা হয় electroplate. এই কোষ স্তরে স্তরে একটার উপর আর একটা সাজানো। এই সমগ্র বৈদ্যুতিক ব্যাটারী মায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগ আছে। ইল মাছের দেহে সব সময় এই বৈদ্যুতিক স্রোত চলে না। স্পর্শ করলে বা কোন জিনিসের সংস্পর্শে এলে বৈদ্যুতিক শক্তি মস্তিষ্কে উৎপাদিত হয়। এখন দেহের ব্যাটারীগুলো চালিত করলেই মস্তিষ্ক হতে সমস্ত দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি এসে যায়। এরা আক্রান্ত হলে বা কেউ স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করে এরা আত্মরক্ষা করে এবং বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে অন্য মাছকে বধ করে। বৈদ্যুতিক স্রোত মস্তিষ্ক থেকে ল্যাম্ব পর্যন্ত ক্রমাগত চলে—তবে এর গতি একদিকে

ল্যাজের দিকে। তার সজ্জিত ব্যাটারী দ্বিধায়ে গেলে বৈদ্যুতিক শক্তি আর চলে না, তখন আবার ব্যাটারী ভরাই করতে হয়। ইল তখন অল্পত আশ্রয় নিয়ে নিজের মেহে ব্যাটারীর সাহায্যে সক্ষম করে। এই বৈদ্যুতিক ইল জলের নিচে ২৪০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপে বিভ্রাৎ উৎপন্ন করতে পারে, আর ভলের উপরে ৪০০ ভোল্ট উৎপন্ন করতে পারে।

সাধারণ জ্ঞানের উত্তর

পর পর তিনটে গোল সেওয়া বা পরপর ক্রিকেটে তিনজনকে আউট করাকে Hat trick বলে।

চুন।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হয়েছে ১লা জানুয়ারী ২০১ থেকে।

১৮টা। পিছনের প্রত্যেক খাবার চার, এবং সামনের প্রত্যেক খাবার পাঁচ।

দোলের ভোল :: ছড়া ও ছবি :: সূর্য্য রায়



ভুলে ভুলে বঃএঃ
সোল ওলো—কাণ্ডা,

বোকানী আবার মাপে
গান ধরে অণ্ডা

কালিকুলি বেধে নর
ভুতুড়ে এ-অচরণ-

ভক্তি ও ঐতি আনো
অনো গাছা খুশোস্তন।



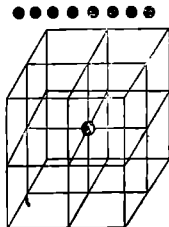
বাজিকর

দু'মিক সমান

২। এমন একঘনের নাম ও উপাধি বলা—বা
বা-মিক থেকে বা ডান-মিক থেকে পড়লে একই হয়।



ঠিক ঠিক জায়গা বার করে।



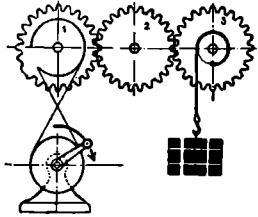
তার দিগে তৈরি একটা কিউব (বা ঘন, অর্থাৎ
বার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ আছে) এখানে পাশের ছবিতে
দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর মধ্যে আটটি
ঘর আছে। যেখানে একটা তার আর একটা তারের উপর
দিয়ে বাঁধে—এমন জায়গা আছে দশটা। নব্বুটি বল ঐ
দশ জায়গায় এমন ভাবে লাগাতে হবে, যেন প্রতিটুক
লাইনে একটা বল থাকে এবং কোন লাইন বাদ
না যায়।

একটা বল মাঝখানে বসিয়ে দেখা হয়েছে—

অষ্টগুলি কোথায় কোথায় বসবে দেখাতে পার ?

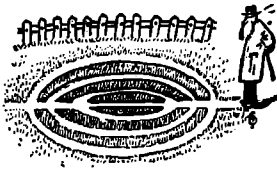
পর্যবেক্ষণ

৪ ছবিটির উত্তর-চিহ্নিত স্থানে নির্দেশ মত হাতদণ্ড ডান থেকে বাঁ-দিকে ঘুরালে ডান দিকের আটোর খুলানো ওলনটি উপরের দিকে উঠবে,—না। নীচের দিকে নামবে বলতে পার? কলকজা বেধে ভড়কে যেয়ো না। ব্যাপারটা এমন কিছু শক্ত নয়, একটু স্থির মস্তিষ্কে দেখলেই বার করতে পারবে।



বার বলে।

কালকের আগের দিন যদি শনিবার হয় তবে আগামী কালের পরের দিন কি বার হবে?



গোলক ধাঁধা

৬। গোলক ধাঁধার পথ। সব পথটাই চলতে হবে, কিন্তু একই পথে দু'বার না গিয়ে বা কোনও পথ না ভিনিয়ে কি করে, কোন্ পথ ধরে বের হওয়া বাবে বলতে পার?

(আগামীবার উত্তর পাবে)



আজ যে শিশু
কাল সে হবে
দেশের নেতা

আজ যে শিশুর শিশু প্রতিদিন ভাতেই
মিশ্রিত হবে বেশ মানবের সুবাসনা ছাড়াই।
কতকই শিশুরের কল ও স্বাস্থ্য করে
করে ছাড়ে।



সাধনা বালামৃত

কল ও স্বাস্থ্য শিশুরের স্বাস্থ্য, কল ও স্বাস্থ্য করে করে তোলে।
শ্যাবনা ঔষধালয়, ঢাকা, কার্বানাইটক্যাল ডিশট্রিবিউট, ৫৬, এল. কে. রোড, কলিকাতা-৭০